

३३/२६ १.३
११/२५८

PRESENTED

LIBRARY	
No.	३३/२६
SI	ashram
BANARAS	



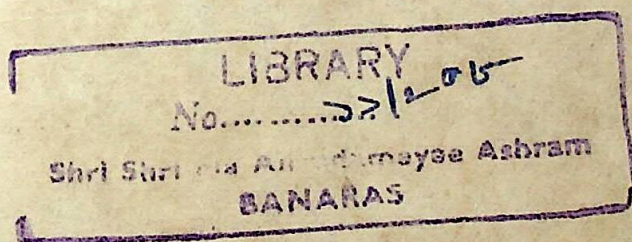
2/3/6

दीर्घाश्रम भवन

PRESENTED

LIBRARY	
No.	2212 ✓
Sri Sri	Sri Sri Ashram
B.A. 1845	

11/258

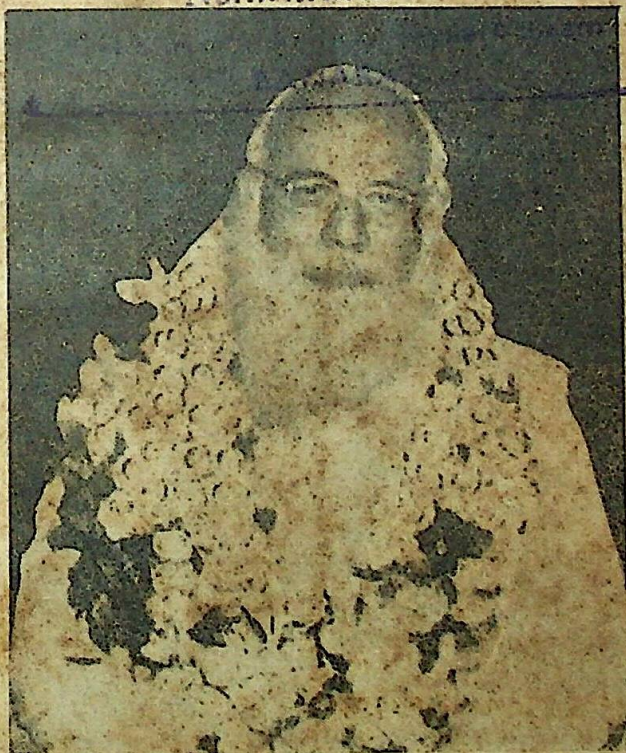


PRESENTED

প্রতিধ্বনি

LIBRARY

No.



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

বৈশাখ,] সম্পাদিকা:—ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী [৯ম বর্ষ
১৩৬৭] বার্ষিক মূল্য ৬, বাৎসরিক ৩০ টাকা। [১ম সংখ্যা

এই সংখ্যার মূল্য আট আনা বা ৫০ নয়া পয়সা।

টেলিগ্রাম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবকে বারাণসীতে টেলিগ্রাম হইলে নিম্ন ঠিকানা ব্যবহার করিতে হয়—AYACHAK, VARA

১লা জানুয়ারী (১৯৬০ ইং) হইতে কলিকাতার জন্ম নিম্নলিখিত টেলিগ্রাফিক ঠিকানা চালু হইয়াছে । যথা,—

AYACHAK, CALCUTTA.

সকলেরই জানা থাকা দরকার যে, টেলিগ্রাফিক সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামই করা যায়, টাকা মনিঅর্ডার করা চলে না ।

পূর্বে কলিকাতায় টেলিগ্রাফিক ঠিকানা ছিল, Onkar কিন্তু এই বৎসর হইতে সেই ঠিকানা বাতিল করা হইয়াছে । হইতে সেই বাতিল করা Onkarerjay ঠিকানায় কেহ করিবেন না ।

নিবেদক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচ

**১৩৬৭ সালে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী
স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব-প্রবর্তিত সমবেত উপাস
বিশেষ বিশেষ তারিখ :—**

১লা বৈশাখ, ১৩৬৭ সন, ইং ১৪ই এপ্রিল ১৯৬০ সা
৮ ঘটিকা । এই তারিখেই অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্ব
পরমহংসদেব জগতের কাছে গুরুরূপে প্রথম ধরা দিয়াছিলেন ।
এই দিবসটি অখণ্ড মাত্রেরই নিকট বিশেষ ভাবে অবশ্য-পালনীয়
১৫ই বৈশাখ, ২৮শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার (অক্ষয়তৃতীয়া) প্রাতে
২৮শে বৈশাখ, ১১ই মে, বুধবার (বুদ্ধপূর্ণিমা) সন্ধ্যা ৭টা ।
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ৩১শে মে, মঙ্গলবার (আরণ্যযষ্টি) সন্ধ্যা ৭টা ।
২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ৯ই জুন, বৃহস্পতিবার (পূর্ণিমা) সন্ধ্যা ৭টা ।
১২ই আষাঢ়, ২৬ জুন, রবিবার সন্ধ্যা ৭টা (রথযাত্রা) ।
২৪শে আষাঢ়, ৮ জুলাই, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা (গুরুপূর্ণিমা) ।

PRESENTED

বৈশাখ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

১০

“প্রতিধ্বনি” এই বৈশাখে

নবম বর্ষে

সাদার্পণ করিল।

“প্রতিধ্বনি” প্রত্যাশা করে যে,
ইতঃপূর্বে যাঁহারা “প্রতিধ্বনি”কে নিয়মিত ভাবে পৃষ্ঠ-
পোষকতা দ্বারা বাঁচিয়া থাকিতে এবং সমাজের সেবা
করিতে সামর্থ্য যোগাইয়াছেন, তাঁহারা নিজেরা ত
গ্রাহক হইবেনই, দশ বিশ জন করিয়া

নূতন গ্রাহক সংগ্রহও করিবেন।

ছয় জন গ্রাহক সংগ্রহ করিলে একটি

পত্রিকা আপনি বিনামূল্যে পাইবেন।

অথবা ছয় জনের বার্ষিক মূল্য (৬×৬=৩৬
টাকা) সংগ্রহ করিলে নিজ পারিশ্রমিক
বাবদ ৬ টাকা নিজেই রাখিয়া দিতে
পারিবেন। টাকাকড়ি গ্রাহক-সংগ্রহকারী
মহাশয় নিজের বায়ে বারানসী প্রতিধ্বনি-
কার্যালয়ে মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবেন
এবং উক্ত কমিশনের ৬ টাকার একখানা
রসিদ লিখিয়া সহি করিয়া পাঠাইতে হইবে।

১৩৬৭ সালের টাকা পাঠাইতে

দেবী করিবেন না।

“প্রতিধ্বনি”র বার্ষিক টাঁদা বারাণসী “প্রতিধ্বনি”-কার্যালয়ে পৌঁছবার পরে আমরা দায়ী হইব। এজেন্টের নিকট বা অন্যতর টাকা পড়িয়া থাকিলে তজ্জন্য আমরা দায়ী হইতে পারিব না।

“প্রতিধ্বনি”র

যে-কোনও প্রচলিত সংখ্যা পাঠ করিলেই ইহার বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। বাংলা মাসের পয়লা (ইংরাজি মাসের চৌদ্দ-পনের তারিখ) “প্রতিধ্বনি” সাধারণতঃ ডাকে দেওয়া হয়।

“প্রতিধ্বনি”

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অমর-লেখনী-প্রসূত বাণীই বহন করিবে।

“প্রতিধ্বনি”র বার্ষিক টাঁদা ছয় টাকা মাত্র।
ষাণ্মাসিক টাঁদা সাড়ে তিন টাকা।

“প্রতিধ্বনি”র যাবতীয় টাকা নিম্ন-ঠিকানায় পাঠাইবেন।

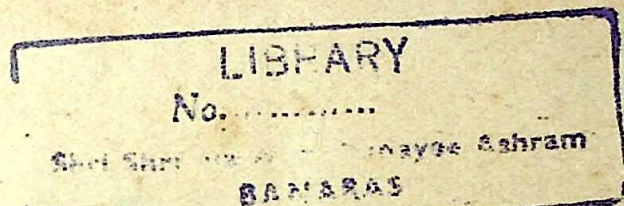
কুপনে নিজ নিজ পূর্ণ নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

ম্যানেজার—প্রতিধ্বনি

অশ্রম আশ্রম

ডি ৪৩।১৯এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী (১)

দ্রষ্টব্য :—ঔষধ, পুস্তক ও প্রতিধ্বনির টাকা বারাণসীতে পাঠাইবেন। মন্দিরের টাকা কলিকাতায় ও মঙ্গলবাঁধের টাকা পুণনু পাঠাইতে হইবে।



প্রতিধ্বনি

(মাসিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ { জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ { ২য় সংখ্যা

কবি

[অখণ্ড-মণ্ডলেখর শ্রীশ্রীশ্যামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

হিমাঙ্গি বিস্ময় আর বিস্ময় সাগর-দিগ্‌বলয়,
 গগন বিস্ময় আর গ্রহগণ শূন্যনভোময়,
 বিস্ময় উষার আলো, বিস্ময় সন্ধ্যার রক্তমেঘ,
 বিস্ময় বাত্মার বায়ু, বিদ্রুতের কপিলিকা-বেগ,
 পূর্ণ জ্যোছনার চেয়ে অমাবস্তা অধিক বিস্ময়,
 বিস্ময়ের অধিরাজ অন্তহীন কবির হৃদয়।

প্রতিধ্বনি

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

৮৮

অখণ্ড-বাণী

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর ত্রীত্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(২০)

বই প'ড়ে, বিদুষী হয়েই নারীর এ দেবীত্বের প্রস্ফুটন হয় না। মহাপণ্ডিতাও হয়ত দানবীয় আকর্ষণের আধার হ'তে পারেন, কারণ হয়ত তাঁর অন্তরের বিগুহ্মি সম্পাদিত হয়নি। মহামূর্তীও হয়ত দেবীত্বের অধিকারিণী হ'তে পারেন, কারণ হয়ত তাঁর অন্তরের বিগুহ্মি সম্যক সম্পাদিত হয়েছে। শিক্ষা আত্মোৎকর্ষের আনুকূল্য দান করে সত্য কিন্তু শিক্ষা নিজেই আত্মোৎকর্ষ নয়। আত্মোৎকর্ষ আসে সাধনে, ভগবৎ-সাধনে, পরমাত্মার সেবায়, অনাদি-অনন্ত-অসীম পরব্রহ্মের সহিত নিজের সকল সাদি-সান্ত-সসীম আবেদনের যোগ-সংস্থাপনায়। ভগবানে আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়ে যে অমৃতময়ী শান্তি আসে প্রাণে, সেই শান্তিই আত্মোৎকর্ষের রূপ, শিক্ষা তার রূপ নয়, বিদ্যাবত্তা তার প্রকাশ নয় অধিকাংশ স্থলে সহায়িকা মাত্র।

(২১)

আজ তোমরা সেই দেবীত্বের বিকাশে যত্নশীলা হও। পুরুষের তোমাদের ঘণা ক'রেছে বা তোমাদের কাছ থেকে ভয় পেয়ে দূরে সরে গেছে, শুধু তোমাদের দেবীত্ব-প্রকাশের অপ্ৰাচুর্য্য দেখে। পুরুষের গাল দিও না, কারণ তাতে ফল নেই। বিদেষে বিদেষ বাড়ে। প্রাণপাত নিজেদের দেবীত্বের প্রকাশের যত্নশীলা হও। এই ভারতের

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

অথ-বাণী

প্রতিধ্বনি

৮৯

কোটি পুরুষ, লক্ষ্মী আর সরস্বতী, দুর্গা আর কালীর চরণে জীবন নুত্তিত
ক'রেছে, তোমাদের পায়ে কেন কর্কে না? নারী মাত্রেই নরকের
দ্বার নয়, কিন্তু যে নারীর ভিতরে দেবীত্বের প্রকাশ ঘটেনি, পুরুষের
পক্ষে, বিশেষভাবে দুর্বল পুরুষের পক্ষে, সে নারী বিপজ্জনক।

(২২)

নারীকে সম্মান যে না করে, সেই পুরুষকে মানুষ ব'লে
স্বীকার কত্তে আমি প্রস্তুত নই। সে পশু বা নরপশু।
পুরুষকে উচ্চপ্রেরণা যে না যোগাতে পারে, সেই নারীকে মানুষ ব'লে
স্বীকার আমি করি না। মানুষ যদি হয় সে, তবে সে অসম্পূর্ণ মানুষ,
অব-মানুষ। নারীকে সম্মান করার মানেই হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক
নারীর ভিতরে পরব্রহ্ম সুপ্রকাশোন্মুখ হ'য়ে বাস কচ্ছেন, এই কথাটি
নিরন্তর অন্তরে জাগরুক রাখা এবং অনুভব করার চেষ্টা করা।
পুরুষকে উচ্চপ্রেরণা প্রদানের মানে, সমীম থেকে অসীমের দিকে, ক্ষুদ্র
থেকে বৃহত্তের দিকে, স্বার্থ থেকে পরার্থের দিকে, পঙ্কিলতা থেকে
পবিত্রতার দিকে, দুর্বলতা থেকে সবলতার দিকে, ক্ষণ-সুখ থেকে
নিত্যানন্দের দিকে অগ্রসর হবার জগু উৎসাহিত করা। নারীর নারীত্ব
এইখানেই সার্থক, নারীর দেবীত্বের এইখানেই প্রকাশ। ক্ষণিক সুখ
দিয়ে নারী যেন পুরুষের অন্তরের অসীম উন্নতির সম্ভাবনাগুলিকে
অবরুদ্ধ ক'রে না রাখে, এই হ'ল পুরুষের প্রতি নারীর কর্তব্য। নিজের
প্রলোভনময়ী চলনার মূর্তিকে পরিবর্তিত ক'রে নারী যেন প্রেরণাদায়িনী
প্রতিভার মূর্তিকে প্রকটিত করে এবং এই ভাবে পুরুষের জীবন-যুদ্ধের
হয় মহাশক্তি-সঞ্চারিনী, এই হ'ল পুরুষের প্রতি নারীর কর্তব্য। এই
কর্তব্যের ব্রত সূষ্ঠরূপে উদ্ঘাপন কত্তে তোমরা কাতর হয়ে না।

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[২ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

২০

(২৩)

নারীকে যারা নিন্দা করে, ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে, নারীকে যারা অকর্মণ্য, নিপ্রয়োজনীয় বা জঘন্য বলে জ্ঞান করে, তারা মূর্থ। কিন্তু মা, প্রশংসার যাতে পাত্রী হও, পূজার যাতে যোগ্য হও, আদরের যাতে জিনিষ হও, তা' করা তোমাদের কর্তব্য। দেশ, সমাজ, জাতি ও জগতের পক্ষে অপরিহার্য হও। দেহে, মনে, প্রাণে পবিত্রতার আবহাওয়াকে সৃষ্টি ক'রে পৃথিবীকে লালসার বিষ থেকে মুক্ত কর। হও আজ তোমরা নরক-নিবারিণী, হও আজ তোমরা মোক্ষপ্রদায়িনী, হও আজ তোমরা চির-কল্যাণ-বিধায়িনী, হও আজ তোমরা অমৃত-নিঃশ্রুদ্দিনী, হও আজ তোমরা মৃতকঙ্কাল-পরিবেষ্টিত ভারত-শ্মশানে মৃতসঞ্জীবনী-স্বরূপিণী।

(২৪)

ভাবুকতা আর ভাব-প্রবণতা এক জিনিষ নয়। জগন্ময় কোটি কোটি মহাভাব মানব-চক্ষুর অদৃশ্য ভাবে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে! ভাবুক ব্যক্তি সেই সকল মহাভাবকে দর্শন করেন, গ্রহণ করেন, কথায় বা লেখনীতে অথবা আচরণে প্রচার করেন। আর, কতকগুলি লোক থাকে, মহাভাব দর্শনের শক্তি যাদের ফোটে নি, কিন্তু ভাবুক ব্যক্তির প্রচারিত ভাবগুলির সঙ্গে পরিচয় হওয়া মাত্র যারা হিষ্টিরিয়ার ফিটের মত একটা আকস্মিক ঝাঁকুনির বশে সেই ভাবকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করে। বিচার-শক্তি এদের প্রথর নয়, কিন্তু ঐকান্তিকতা এদের অত্যধিক; তাই বুঝে বা না বুঝে যাকে ধরে, তার জগৎ শেষ পর্যন্ত সত্য, ধর্ম, ত্রায়, আত্মমর্যাদা, সম্ভ্রমবোধ, এমন কি মনুষ্যত্ব পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

ইজ্যেষ্ঠ, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

২১

PRESENTED

(২৫)

দলাদলির এই হ'ল নিদান, আর এই হ'ল পরিণাম। কয়েকজন স্থিরবুদ্ধি ভাবুক লোকের ভাব নিয়ে অসংখ্য ভাবপ্রবণ লোক একপ্রকারের উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত হয়। এই হ'ল দলাদলির স্বরূপ। এই উন্মত্ততার তীব্রতা এত বেশী যে, যুক্তি দিয়ে কাউকে থামানো যায় না, শত আলোচনায়ও আপোষ আসে না; বার বার সঙ্গে এদের মতের মিল নেই, মারমুখো হ'য়ে তাদের প্রতি বিদ্বেষ-সাধন ব্যতীত আর কিছুতে মন বসে না; যে মহত্বদেহ সাধনের জন্ত এরা একটা নির্দিষ্ট ভাবের অনুবর্তী হ'য়েছিল, সেই মহত্বদেহের দিকে বাক্য, কর্ম, চিন্তা কতদূর এগুচ্ছে, তার প্রতি দৃষ্টি দেবার অবসর নেই, রুচি নেই, কিন্তু কেউ যদি এই মতটাকে না মানে, তবে তার মাথায় লাঠি চালাতে হবে, এই প্রতিজ্ঞাই প্রধান হ'য়ে পড়ে। অর্থাৎ, মুস্ত-মস্তিষ্ক দুই-চারিজন ভাবুক লোকের ভাবের আওতায় একদল বিকৃত-মস্তিষ্ক ভাবপ্রবণ ষোদ্ধার আবির্ভাব হয়। নিজেদের ভ্রমকে এরা ঢেকে রাখে আত্মপ্রবঞ্চনা দিয়ে, একটা ভ্রমকে শতগুণিত করে বেহিসাবি আচরণ দিয়ে, আর ভ্রমকে সমর্থন করে গায়ের জোরে। শেষটার এমন হয় যে, নেতা যিনি, তিনি আর শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত কতে পারেন না একবিন্দুও, নিজের দলের লোকদের খুশী রাখবার জন্তই তাকে সমগ্র শক্তি এবং প্রতিভা অপব্যয়িত কতে হয়।—এই হ'ল দলাদলির স্বরূপ।

(২৬)

আমি কন্যা না সাধক, একথা আজও আমি বুঝতে পারিনি।
কিন্তু দলাদলির যে কি ভীষণ পরিণাম, তা জানি বলেই আমি কি

প্রতিধ্বনি

অথ-বাণী

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

৯২

ধর্ম-দল কি কর্ম-দল, কোনও দলের ভিতরেই কখনো প্রবেশ করিনি। আমি আমার স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিকে কারো উপদেশেই পরাধীন কত্তে পারিনি, এ জগতের একটি প্রাণীরও স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিকে আমি আমার ইচ্ছার পদতলে চেপে রাখবার চেষ্টা করিনি। আমার আত্মসমর্পণ উচ্চতম আদর্শবাদের কাছে, ব্যক্তির কাছে নয়, দলের কাছে নয়। উচ্চতম আদর্শবাদ যাদের প্রাণকে এনে আমার প্রাণের সাথে, যাদের কণ্ঠকে এনে আমার কণ্ঠের সাথে, যাদের বাহকে এনে আমার বাহুর সাথে আপনি যুক্ত ক'রে দেবে, তাদের নিয়েই আমার সম্প্রদায়। আমার প্রার্থনা,—ভাবপ্রবণেরা সব ভাবুক হোক, পরবুদ্ধি-পরিচালিতেরা আত্মবুদ্ধির সাথে পরিচয় স্থাপন করুক, অপরের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজের দলপুষ্টির প্রতারণামূলক কুবুদ্ধি জগৎ থেকে দূর হ'য়ে যাক, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হ'য়েও মানুষ কর্তৃত্ব-লিপ্সার মোহজাল হ'তে মুক্ত হোক। এতে যদি কেউ মনে করে যে, আমি জগতের বা দেশের শত্রু, তবে আমার কামনা, আমি যেন কোটি কোটি নরজন্ম লাভ করি, আর এইরূপ শত্রু হ'য়েই জন্ম গ্রহণ করি।

(২৭)

ভগবৎসৃষ্ট সবগুলি ইন্দ্রিয়েরই নির্দিষ্ট ব্যবহার আছে, আবার অপব্যবহারও আছে। একটি ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার কল্লে, অপরগুলিও অপব্যবহারে প্ররোচিত হয়। যেমন পাঁচ ছেলের মা একটি ছেলেকে অত্যায়ে প্রশ্রয় দিলে বাকী চারিটিও প্রশ্রয় পেতে চায়। চক্ষুকে বিপথে যেতে দাও, কর্ণ বলবে,—“আমিও কুকথা শুনব।” কর্ণকে বিপথে চলতে দাও, স্পর্শেন্দ্রিয় বলবে,—“আমিও বিধিভঙ্গ করব।”

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

অক্ষয়-প্রাণী

প্রতিধ্বনি

No.

২৩

এইরকম ক'রে একজনের উচ্ছৃঙ্খলতা সকলের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণস্বরূপ হয়। তাই পূর্বাচার্য্যেরা শতবার বলেছেন,—গোড়া সামলাও, গোড়া সামলাও, গোড়া সামলাও।

(২৮)

এই গোড়া হচ্ছে রসনা। জিহ্বাটাকে যে শাসন করেছে, তার পক্ষে অত্র ইন্দ্রিয় শাসন করা ক্রমশঃ সহজ হ'য়ে আসে। জিহ্বার শাসন মানে বাক্-সংযম আর আহার-সংযম। যে কথা জীবনের কল্যাণ-সাধন কর্কে না, তাকে বর্জন করাই বাক্-সংযম। একেবারে মৌনী হ'য়ে যেতে হবে, তার কোনো মানে নেই। যে আহার দেহের কল্যাণ কর্কে না, তাকে বর্জন করাই হচ্ছে আহার-সংযম। একেবারে অনাহারী হ'য়ে থাকতে হবে বা শরীর-রক্ষার পক্ষে অনুপযুক্ত অন্নাহার কত্তে হবে, তা নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাজে কথা বলবার রুচি থাকবে, বাজে কথা কইবার উদ্গ্রীবতা থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্-সংযম হয়নি বলে বুঝতে হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আহারীয় বস্তুর প্রতি লোভ থাকবে, প্রয়োজন নেই তবু তার জন্ত আকাজক্ষা থাকবে বা প্রয়োজনীয় জিনিষ দরকার-মত পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে, তবু আরো পাবার জন্ত আগ্রহ হবে, বুঝতে হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আহার-সংযম হয়নি।

(২৯)

আহারীয় বস্তুকে ভগবানে নিবেদন করলে আহার-সংযমের সাহায্য হয়। কারণ, নিবেদন করলে তা হয় প্রসাদ, আর সেই প্রসাদের তিত্ত-কটুত্বের বিচার নিষিদ্ধ, প্রসাদে বস্তুবুদ্ধি অত্যাশ্রয়। ভক্তেরা প্রসাদকে অতীন্দ্রিয় আনন্দ বলে জ্ঞান ক'রে থাকেন,

প্রতিনিধি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

২৪

প্রমাদের ভিতরে বস্তুবুদ্ধির আরোপ থাকতে দেন না। এইখানেই ভক্তিপন্থীদের একটা অভূতত্ব। ক্ষেত্রের ধানের শাঁস নিয়ে যে অন্ন হয়েছে, সেই অন্ন পরমাত্মায় নিবেদন করলে, সে পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব পায়, তখন তাতে আর ইন্দ্রিয়সুখ-বুদ্ধি থাকে না, নিবেদনেই তা' অমৃত হ'য়ে যায়, আর অমৃতকে স্মরণ করলেই সুখস্বাদুতা লাভ করা যায়, অমৃত কোনও পার্থিব বস্তু নয় যে সন্দেশ বা রসগোল্লার মত চোটে আর চিবিয়ে খেতে হবে। এইভাবে আহার-সংঘমের একটা উৎকৃষ্ট উপায় পূর্বাচার্য্যেরা জীব-হিতার্থে প্রবর্তিত ক'রে গিয়েছেন। ভোগ-রন্ধনে বস্তুকে করেছেন তাঁরা নির্দিষ্ট এবং প্রসাদ-গ্রহণে ভাবকে করেছেন তাঁরা প্রধান।

(৩০)

বাজে কথা বলার চাইতে কাজের কথা বলা, এক-প্রকারের শৃঙ্খলা বা সংযম। অতিবাক্য-বিলাসী ব্যক্তিদের পক্ষে বাক্-সংঘমের এইটা হচ্ছে প্রথম স্তর। কাজের কথা আবার সাংসারিক আর পারমার্থিক দুই রকম হ'তে পারে। সাংসারিক কাজের কথা বলার চেয়ে পারমার্থিক কাজের কথা বলা হ'ল আর একপ্রকারের শৃঙ্খলা বা সংযম। বাক্-সংঘমের এইটা হ'ল দ্বিতীয় স্তর। পারমার্থিক কাজের কথা আবার দুই রকম হ'তে পারে। এক রকম,—শ্রুত ও গ্রন্থপাঠলব্ধ, আর এক রকম,—উপলব্ধ। শ্রুত ও পাঠলব্ধ পারমার্থিক কথা বলার চাইতে উপলব্ধ পারমার্থিক কথা বলা একপ্রকারের শৃঙ্খলা ও সংযম। বাক্-সংঘমের এইটা হ'ল তৃতীয় স্তর। সাধারণ লোক প্রথম স্তরের বাক্-সংঘমে স্থিত হন। ধর্ম-প্রচারকেরা দ্বিতীয় স্তরের বাক্-সংঘমে বিচরণ করেন। ঋষি বা ঋষিকল্প সাধক তৃতীয় স্তরের

ঐজ্যষ্ঠ, ১৩৬৭]

অথ গুণাবলী

প্রতিধ্বনি

৯৫

বাক্-সংঘমে অবস্থান করেন। কদাচিৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীব-কল্যাণার্থে নিম্নাধিকারীর ভূমিকাও অভিনয় করেন। কিন্তু বাক্-সংঘমের এর উপরেও একটা স্তর আছে, সেইটাই হচ্ছে ব্রহ্মানন্দী পুরুষের ভূমানিষ্ঠ সিদ্ধসম্বিতের অবস্থা, যে অবস্থায় তিনি ভাবকে প্রচারের জন্ত কথার কইবার আবশ্যকতাই হয়ত অনুভব করেন না। তাঁর চখে মুখে ভাবের ফোয়ারা ছুটতে থাকে, অথচ রসনা চিরশূন্য। এমন কি, কখনো কখনো জগতের লোককে দেখা দেবার আবশ্যকতা পর্যন্ত তাঁরা অনুভব করেন না, নীরবে নিভূতে বিশ্বজগতের কল্যাণের জন্ত যে পুঞ্জীভূত সচ্চিন্তার সম্পদ সঞ্চয় ক'রে রেখে যান, তাতে জগতে ভাব-মহাভাবের বিপ্লব ঘটে।

(৩১)

শব্দকে ব্রহ্ম ব'লে জ্ঞান করাই হচ্ছে বাক্-সংঘমের প্রকৃষ্টতম উপায়। যে শব্দই উচ্চারণ করছি, সেটাই ত' ব্রহ্মবাচক শব্দ। এইরূপ ভাবতে ভাবতে বেশী কথা বলার প্রবৃত্তি আপনিই প্রশমিত হ'য়ে যায়। রসনায় চপলতা যতই আসুক না কেন, ভাবতে হবে,—“ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম, সব শব্দই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মবাচী ব্যতীত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোনও কোণায়ও একটীমাত্র শব্দ নেই।” অবিরাম মন বলবে ওঁ ব্রহ্ম, প্রাণ বলবে ওঁ ব্রহ্ম, আত্মা বলবে ওঁ ব্রহ্ম। ফলে এক বাক্-সংঘমের উপলক্ষ্য ক'রে সকল সংঘম এসে যাবে।

(৩২)

তোমাদের হৃদয় ভগবানের পবিত্র সিংহাসন, এই কথা যদি বিশ্বাস কর জননীগণ, সত্যি তোমরা ভগবতীতে পরিণত হবে। ভারত চিরকাল ভগবতীরই পূজা ক'রেছে জননীগণ।

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

৯৬

ভোগবতীর নয়। তোমরা ভগবতী হও। বিয়বিনাশন গণনায়ক তোমাদের পুত্র হোক, বিদ্যা বিনয়শালিনী ভারতী তোমাদের কন্যা হোক। চিরকৌমার্য্য-ব্রতধারী বল-বিক্রান্ত কার্ত্তিকেয় তোমাদের পুত্র হোক, ধন-ধাত্ত-ঐশ্বর্য্যাকর লক্ষ্মী তোমাদের কন্যা হোক। মৃত্যুলাঞ্জন-বিক্রম সত্যের কেশরী হোক তোমাদের বাহন, দানবীয় অহঙ্কার হোক, তোমাদের ক্রুপাণাঘাতে মৃত্যুমুখে নিপাতিত। বিশ্বাস কর জননীগণ, তোমরাই সাক্ষাৎ ভগবতী, মাটির প্রতিমা গ'ড়ে ঘরে ঘরে যে লোকেরা ভগবতী-পূজার অভিনয় করে সে শুধু তোমাদের ভিতরে তোমরা জেগে ওঠ নাই ব'লে।

(৩৩)

মাতা ভগবতী নিজেকে প্রকাশিত করেন, শুধু পবিত্র আধারে। আধার পবিত্র কর জননীগণ, আধার পবিত্র কর, নীচ চিন্তার নির্বাসন দাও, উচ্চ চিন্তাকে হৃদয়ে ধারণ কর। মণিমুক্ত যদি হয় শরীরের অলঙ্কার, তবে জেনো, সত্য হচ্ছে বাক্যের অলঙ্কার, সত্যই হচ্ছে দেহের অলঙ্কার, শুদ্ধ চিন্তা হচ্ছে মনের অলঙ্কার, নিকামতা হচ্ছে প্রাণের অলঙ্কার। অলঙ্কৃত হও জননীগণ, পবিত্রতার স্তম্ভভ মূশোভন অপরূপ ভূষণে।

(৩৪)

বিশ্বাস কর জননীগণ, পবিত্র হওয়া যায়। দেহে মনে প্রাণে পূর্ণ পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় আচরণে। দৈনন্দিন পবিত্র থাকা যায়। দাম্পত্য ব্যবহারেও পবিত্র হওয়া চলে। ঠাছা যার আছে, উপায় তারই হয়। কেউ জানায় নি, তাই তোমরা জান না মা, কত মেয়ে আজ পবিত্রতার ব্রত গ্রহণ করেছে, কত মেয়ে আজ পবিত্রতার

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

৯৭

ব্রত পালন কচ্ছে। জানো না ব'লেই তোমাদের কাছে নূতন মনে হয়, অসম্ভব মনে হয়। আস্ছে ভারতে এমন দিন, যে দিন সবাই জানতে পাবে, কত রমণী রমণ-সুখের মোহ পরিহার ক'রে সংসারী জীবনের মধ্যেও সংসারের ভিতর দিয়ে সত্যসুন্দর প্রেমসুন্দর পরমাত্মার সেবা করেছেন।

(৩৫)

জননীগণ, এই মহনীয় আদর্শ তোমরা নিজেদের ভিতরে প্রতিষ্ঠা কর, আর চতুর্দিকে সম্প্রসারিত কর। নারী বলতেই যেন পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিকে বুঝায়। নারী বলতেই যেন মানুষের মনে নিঃশ্রুততার প্রতিচ্ছবিই ফুটে ওঠে। আজ যেমন একদিকে নারীর দেবীমূর্ত্তি, আর একদিকে তার দানবীমূর্ত্তি যুগপৎ দেখা যাচ্ছে, ফলে একদল মানব নারীর অবিরাম স্তুতি ক'রে পূর্ণ সত্যকে অস্বীকার কচ্ছে, অপর দল মানব নারীর জুগুপ্সা ক'রে পূর্ণ সত্যকে অসম্মান কচ্ছে, সেই অস্বীকার আর অসম্মান থেকে মানুষকে তোমরা বাঁচাও। এমন এক পবিত্রতার প্রতিভা নিয়ে ফুটে উঠুক প্রত্যেক রমণীর জীবন, যেন একটি নারীও এই জগতের কোনও অন্ধকার কোণে মানুষের পাপের সহকারিণী না হয়। এমন পবিত্রতার পুণ্য প্রভাব নিয়ে চতুর্দিকে নারী-জাতির নবাবির্ভাব ঘটুক, যেন একটি নারীও এই জগতে একটি মানবের পঁতনের কারণ না হয়। হে জননীর জাতি, পবিত্র হও, পবিত্র কর, হও নরকনিবারিণী জাহ্নবীর মত পাপতাপহারিণী, আর সকলকেও কর তাই। নিজের অন্তরে পুণ্য-প্রতিভা জ্বালে, সকলের অন্তরে পুণ্য-প্রতিভা জ্বালাও।

(৩৬)

ভগবানে নির্ভরই হচ্ছে প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত আনন্দ। নির্ভরেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, পরম কল্যাণ। নির্ভরশীল কখনো বলবে না,—“হে ভগবান্, এটা দাও, ওটা দাও।” নির্ভরশীলের কথা হচ্ছে—“তোমার কাছে কিছুই আমার চাইবার নাই। যা তোমার খুশী দিও, যা তোমার খুশী নিও, যাতে তোমার সুখ তাই তুমি ক’রো, আমার মন কিসে খুশী হয় আর না হয় তার দিকে তুমি তাকিয়ে না।” আমার পাগল ক’রে দাও, আমাকে তোমার নামে মাতাল কর, বিভোর কর, আমার সকল লোহশৃঙ্খল চূর্ণ ক’রে দাও, আমাকে তোমার সঙ্গে যুক্ত করে নাও, আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিন্ধিত ক’রে দাও,—সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ব্যক্তি ভগবানের কাছে এ প্রার্থনাও করেন না। তোমার ইচ্ছা হ’লে এ সব কর, তোমার ইচ্ছা না হ’লে কিছু ক’র না, তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তোমার উপরেই আমার ভার, আমার নিজের কোনও কর্তৃত্বও নেই, কর্তৃত্বাভিমানও নেই,—এই হচ্ছে নির্ভরের স্বরূপ। দুঃখ যখন দিচ্ছ তুমি, তখন আর আমার কঁাদা চলে না, তোমার দে’য়া দুঃখ নিশ্চয়ই তোমার অভিপ্রায়েই বহন ক’রে নিয়ে এসেছে, হে ভগবান্, তোমার গেই শুভ অভিপ্রায় আমার উপরে পূর্ণ হোক, তাই আমি দুঃখ সহিব, ব্যথা সহিব, লাঞ্ছনা গঞ্জনা অত্যাচার উৎপীড়ন সহিব, তোমার মুখের পানে চেয়ে আমি এইগুলিকে হাসিমুখে বরণ করব। দুঃখ পেয়ে আমি তোমাকে দোষ দিব না, আমার হাসিমুখ দেখতে তুমি সুখ পাও আমি জানি, তাই আমি এত দুঃখেও হাসব, দৈত্যো হাসি নয়, প্রাণখালা মনখোলা হাসি হাসব,—এই হ’ল নির্ভরের স্বরূপ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

৯৯

PRESENTED
(৩৭)

এক প্রকারের নির্ভর আছে, তাকে বলা যায় দায়ে পু'ড়ে নির্ভর। যতক্ষণ দাঁতে জোর ছিল, ততক্ষণ ব্যাভ্ররাজ ঈশ্বরে নির্ভর করেন নি, আজ গণ্ডারের সঙ্গে লড়াই দিতে গিয়ে দাঁত ভেঙেছে, আজ তিনি বড়ই নির্ভরশীল। এ নির্ভর নির্ভরই নয়। মিথ্যা মামলা ক'রে দরিদ্র প্রজার ভিটে-মাটি উচ্ছেদ করবার সময়ে ভগবানের কথা মনে হয় নি, তখন শুধু ধ্যান চলেছে দলিল-জালিয়াতের মিথ্যাবাদী উকিলের আর তার ততোধিক মিথ্যাবাদী মোহরারের আর টন্নির, সত্যজ্ঞানহীন হাকিমের আর তার ঘুষখোর পেস্কারের। কিন্তু যদি নিজের সম্পত্তি হঠাৎ নিলামে উঠল, অম্নি হ'লাম নির্ভরশীল। এসব নির্ভর নির্ভরই নয়। তবু বলতে হবে এ সময়েও যদি কেউ নির্ভর করে, তবে প্রাণে আশা হয়, বুকে বল আসে, হৃদয়ে উৎসাহ জাগে। কিন্তু এ সব ক্ষণস্থায়ী,—আকাশের ঘনঘটাও গেল, চিত্তের নির্ভরও গেল।

(৩৮)

ঈশ্বর-নির্ভরের মূল হচ্ছে ঈশ্বর-প্রেম। তাকে যে বাসে ভালো, তারই নির্ভর খাঁটি হয়। প্রেমের মাটিতে যে নির্ভর নির্ভর গজায়, তার আর লয় নেই ক্ষয় নেই, অবিরাম তার বৃদ্ধি, অবিরাম তার পুষ্টি, অবিরাম তার বিস্তার। সেই নির্ভরের ছায়া দিনের পর দিন বিশাল থেকে বিশালতর হ'তে থাকে, বাড়তেই থাকে অবিরাম সেই ছায়ার শীতলতা, স্নিগ্ধতা, শ্রমাপহারিতা, মাধুনা-প্রদায়িতা ও অভয়-সঞ্চারিতা।

(৩৯)

এই ধর ঘেন স্বাধীনতার বুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে। তোমার গৃহে তোমার কন্যা ভগ্নী, পত্নী রয়েছেন,—প্রত্যেকেই যৌবনবতী বা তার

প্রতিধ্বনি-

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১০০

কাছাকাছি। তোমাকে লড়াই করতে যেতে হবে স্তূদুর সীমান্তে, কারণ ঐ রকমই হুকুম এসেছে। তোমার একটা বন্ধু আছেন, তোমার প্রতিবেশী। তিনি কোন কারণে সৈনিক হন নি বা হ'তে পারেন নি, কিম্বা এখনো তাঁর ডাক পড়ে নি। ঘরের মেয়েদের তত্ত্বাবধানের ভার বন্ধুটির উপরে দিয়ে তুমি কি নিশ্চিত্তে যুদ্ধে যেতে পারবে, যদি তোমার বন্ধুটি চরিত্রবান্ না হন?

(৪০)

চরিত্র বলতে সত্যসন্ধতা, সততা এবং হিংদ্রিয়-সংযমের ক্ষমতা বুঝায়। একজন লোক একটু অলস, কর্তব্য কার্য্যে একটু গয়ংগচ্ছ প্রকৃতির, কিম্বা একটু বেশী কথা বলে, অথবা একটু বেশী ঘুমায়, এইজন্ত তাকে চরিত্রহীন বলা চলে না। কিন্তু সত্যে যার অনুরাগ নেই, সততা যে রক্ষা করতে চেষ্টা করে না, হিংদ্রিয়ের উদ্দাম তাড়নাকে যে প্রশমিত করবার জন্ত যত্ন নেয় না, তাকে চরিত্রবান্ বলা চলে না। তোমার বন্ধু যদি চরিত্রবান্ না হন, তা হ'লে তার হাতে কত, ভগ্নী বা পত্নীর ভার সমর্পণ ক'রে যেতে তোমার প্রাণ ছক ছক ক'রে কাঁপবে, যে কার্য্য-সম্পাদনে স্তূদুর সীমান্তে চলে গিয়েছ, সে কার্য্যে নিশ্চিত্ত হ'য়ে আত্মনিয়োগ করতে পারবে না। এমন কি, হয়ত তুমি প্রাণের তাড়নায়, মনের দুর্বলতায় গভীর রজনীতে সেনানিবাস ত্যাগ ক'রে পুনরায় ঘরে ফিরে আসবার অনুচিত চেষ্টা করতে পার।

(৪১)

আকতেই যখন শুরু করেছি, তখন এস, চিত্রটাকে আমি আরও একটু ভাল করে আঁকি। প্রথম প্রথম হয়ত বন্ধু তোমার ঘরের মেয়েদের খুবই যত্ন করলেন, পরে হয়ত সব সম্পত্তির খাজানা বাকী রেখে কৌশলে নিলামে তুলে দিয়ে সেখান থেকেই

PRESENTED

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিদিন

১০১

বেনামী ক'রে কিনলেন। তোমার কথা, তোমার ভগ্নী, তোমার পত্নী নিরাশ্রয়া হ'লেন, ভিক্ষুকী হ'য়ে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা শুরু করলেন। আর, এও যদি তিনি না করেন, তবে চরিত্রবান্ যখন তিনি নন, তখন একে একে মেয়েদের সতীত্বের উপরে হাত দিতেও তার আটকাবে না। তুমি বলবে, আমার ঘরের মেয়েরা সচ্চরিত্রা, স্মতরাং সে কিছু কত্তে পার্বে না। তা হলেই তোমাকে স্বীকার কত্তে হ'ল যে, বন্ধু চরিত্রবান্ হোন্ আর না হোন্, তোমার ঘরের মেয়েদের চরিত্রবত্তার প্রয়োজন আছে। আর এই চরিত্রবত্তা তারা বিনা শিক্ষায় বিনা উপদেশে বিনা সদাদেশ-পালনে লাভ কত্তে পারেন নি। ফলে আমার চরিত্র-আন্দোলনকেই সমর্থন করা হ'য়ে গেল।

(৬২)

কিন্তু এইখানেই বাবা শেষ হ'য়ে গেল না। যত মেয়েরা কুলটা হয় বা চরিত্রগত ভুল করে, তারা কেউ গোড়া থেকেই অসতী থাকে না। পতিতারা দোকান খুলে রেখেছে ব'লেই পুরুষেরা সেখানে যায়, তা নয়। পুরুষেরা অসতী মেয়ে চায়, তার জন্তেই এমন অনেক মেয়ে অসতী হয়, যারা আগে সতীই ছিল এবং হয়ত আত্মত্যাগ সতীই থেকে যেত। পরনারীর প্রতি পুরুষ জাতির একটা বড় বিষম লিপ্সা। সেই লিপ্সাটাকেই নানা প্রকারের দাবীরূপে তারা মেয়েদের উপরে প্রসারিত করে। তা থেকেই অধিকাংশ স্থলে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা আর ঘৃতাচির আবির্ভাব হয়। বাজারে যার চাহিদা আছে, তারই সরবরাহ হয়। পুরুষের জোর চাহিদাই মেয়ে-গুলিকে অসতী করে। মাথায় যদি রোগ না থাকে কিম্বা শিক্ষায় যদি গুরুতর ত্রুটি না থাকে, তবে মাধারণ কত্তে মেয়েরা সচ্চরিত্রাই

প্রতিধ্বনি-

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১০০

কাছাকাছি। তোমাকে লড়াই কতে যেতে হবে সুদূর সীমান্তে, কারণ ঐ রকমই হুকুম এসেছে। তোমার একটা বন্ধু আছেন, তোমার প্রতিবেশী। তিনি কোন কারণে সৈনিক হন নি বা হ'তে পারেন নি, কিম্বা এখনো তাঁর ডাক পড়ে নি। ঘরের মেয়েদের তত্ত্বাবধানের ভার বন্ধুটির উপরে দিয়ে তুমি কি নিশ্চিত্তে যুদ্ধে যেতে পারবে, যদি তোমার বন্ধুটা চরিত্রবান্ না হন?

(৪০)

চরিত্র বলতে সত্যসন্ধতা, সততা এবং ইংদ্রিয়-সংযমের ক্ষমতা বুঝায়। একজন লোক একটু অলস, কর্তব্য কার্যে একটু গয়ংগচ্ছ প্রকৃতির, কিম্বা একটু বেশী কথা বলে, অথবা একটু বেশী ঘুমায়, এইজন্ত তাকে চরিত্রহীন বলা চলে না। কিন্তু সত্যে যার অনুরাগ নেই, সততা যে রক্ষা কতে চেষ্টা করে না, ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম তাড়নাকে যে প্রশমিত করবার জন্ত যত্ন নেয় না, তাকে চরিত্রবান্ বলা চলে না। তোমার বন্ধু যদি চরিত্রবান্ না হন, তা হ'লে তার হাতে কত্যা, ভগ্নী বা পত্নীর ভার সমর্পণ ক'রে যেতে তোমার প্রাণ হুক হুক ক'রে কাঁপবে, যে কার্য্য-সম্পাদনে সুদূর সীমান্তে চলে গিয়েছ, সে কার্য্যে নিশ্চিত্ত হ'য়ে আত্মনিয়োগ কতে পারবে না। এমন কি, হয়ত তুমি প্রাণের তাড়নায়, মনের দুর্বলতায় গভীর রজনীতে সেনানিবাস ত্যাগ ক'রে পুনরায় ঘরে ফিরে আসবার অনুচিত চেষ্টা কতে পার।

(৪১)

আকতেই যখন শুরু করেছি, তখন এস, চিত্রটাকে আমি আরও একটু ভাল করে আঁকি। প্রথম প্রথম হয়ত বন্ধু তোমার ঘরের মেয়েদের খুবই যত্ন কল্লেন, পরে হয়ত সব সম্পত্তির খাজানা বা কী রেখে কোঁশলে নিষাধে তুলে নিজেদের তরফ থেকেই

PRESENTED

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০১

বেনামী ক'রে কিনলেন। তোমার কথা, তোমার ভগ্নী, তোমার পত্নী নিরাশ্রয়া হ'লেন, ভিক্ষুকী হ'য়ে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা শুরু করলেন। আর, এও যদি তিনি না করেন, তবে চরিত্রবান্ যখন তিনি নন, তখন একে একে মেয়েদের সতীত্বের উপরে হাত দিতেও তার আটকাবে না। তুমি বলবে, আমার ঘরের মেয়েরা সচ্চরিত্রা, স্মতরাং সে কিছু কত্তে পার্বে না। তা হলেই তোমাকে স্বীকার কত্তে হ'ল যে, বন্ধু চরিত্রবান্ হোন্ আর না হোন্, তোমার ঘরের মেয়েদের চরিত্রবত্তার প্রয়োজন আছে। আর এই চরিত্রবত্তা তারা বিনা শিক্ষায় বিনা উপদেশে বিনা সদাদেশ-পালনে লাভ কত্তে পারেন নি। ফলে আমার চরিত্র-আন্দোলনকেই সমর্থন করা হ'য়ে গেল।

(৬২)

কিন্তু এইখানেই বাবা শেষ হ'য়ে গেল না। যত মেয়েরা কুলটা হয় বা চরিত্রগত ভুল করে, তারা কেউ গোড়া থেকেই অসতী থাকে না। পতিতারা দোকান খুলে রেখেছে ব'লেই পুরুষেরা সেখানে যায়, তা নয়। পুরুষেরা অসতী মেয়ে চায়, তার জন্মেই এমন অনেক মেয়ে অসতী হয়, যারা আগে সতীই ছিল এবং হয়ত আমৃত্যু সতীই থেকে যেত। পরনারীর প্রতি পুরুষ জাতির একটা বড় বিষম লিপ্সা। সেই লিপ্সাটাকেই নানা প্রকারের দাবীরূপে তারা মেয়েদের উপরে প্রসারিত করে। তা থেকেই অধিকাংশ স্থলে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা আর ঘৃতাচির আবির্ভাব হয়। বাজারে যার চাহিদা আছে, তারই সরবরাহ হয়। পুরুষের জোর চাহিদাই মেয়ে-গুলিকে অসতী করে। মাথায় যদি রোগ না থাকে কিম্বা শিক্ষায় যদি গুরুতর ত্রুটি না থাকে, তবে সাধারণ ক্ষেত্রে মেয়েরা সচ্চরিত্রাই

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১০২

হয়। সতীত্বের শিক্ষা মেয়েদিগকে জোর ক'রে দিতে হয় না। নিজেদের নিরাপত্তার দিক্ তাকিয়েই স্মরণাতীতকালে মেয়েরা এই বিষয়ে নিজেদের জ্ঞাত নিজেরা সতীত্ব রক্ষার আইন করেছিল। এই আইনের সুযোগ নিয়ে পরবর্তী সময়ে পুরুষেরা মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে, কিন্তু তথাপি, সতীত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। নিজের স্বভাবের যদি একটা স্পন্দন না থাকত, তা'হলে পুরুষেরা কাব্য লিখেছে বলেই মেয়েরা সতী, সীতা, সাবিত্রী আর চিত্তার চরিত্রে আবদ্ধ হ'ত না। সীতা, সতী, সাবিত্রীর চরিত্রের ভিতরে রমণীমূলভ স্বাভাবিকতা রয়েছে বলেই প্রত্যেক মেয়ের প্রাণে তাদের চরিত্র এমন আবেদন সৃষ্টি করে। স্বভাবমূলভ লজ্জাও নারীর সতীত্বেরই অবিরাম রক্ষণ ও সমর্থন কচ্ছে। কিন্তু পুরুষের পাপমূলক দাবী স্নকোশলে আস্তে আস্তে তার লজ্জার বাঁধন শিথিল করে এবং ভদ্রতা, সামাজিকতা, আর্ট, আতিথেয়তা বা অথ কিছু একটা নাম দিয়ে পুরুষের লাম্পাট্য নারীর উপরে ক্রমশঃ আত্মপ্রসার করে। এই ক্ষেত্রে নারীরা সচ্চরিত্রা বা সতীত্ব-সমৃদ্ধা হ'লেও অনেক স্থলে ক্রমশঃ পুরুষের ক্রমবিবর্দ্ধমান দাবীর কাছে নত হ'য়ে পড়ে। সুতরাং সতী স্ত্রী বা কন্যা বা ভগ্নীটিকে ঘরে রেখে গিয়েই তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার না, তোমার প্রতিবেশী ও বন্ধুর চরিত্রের উপরও তোমাকে নির্ভর করতে হবে। সুতরাং চরিত্র-আন্দোলনের আবশ্যকতাকে এখানে স্বীকার করতে হচ্ছে।

(৪৩)

কিন্তু তুমি যদি বেপরোয়া হও এবং আমাকে বলে বস যে, মেয়েদের সতীত্ব থাকুক কি যাক, তাতে কিছু আসে যায় না, তা'হলেও আমার বলবার কথা রইল এই যে, মেয়েরা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০৩

যেখানে একনিষ্ঠ নয়, সেখানে সমাজেই বল, পরিবারেই বল, ঘোরতর ঘেঁষ, হিংসা, কলহ রাজত্ব কর্কে। একনিষ্ঠার মর্যাদা যে সমাজ স্বীকার কর্কে না, সেই সমাজে একটা মেয়েকে নিয়ে দশ জনের মধ্যে অবৈধ প্রতিযোগিতা অবশ্যতাবী। অনেক স্থলে তার ফল রক্তপাত ও হত্যাতে পর্যন্ত গিয়ে গড়াবে। একে নিবারণ করার উপায় নেই। Convention (প্রণাম) ই বল আর Superstition (কু-সংস্কার) ই বল, নারীর একনিষ্ঠার মর্যাদাকে যে সমাজ স্বীকার ক'রেছে, সেখানে অন্ততঃ অধিকাংশ স্থলেই রীরংসার তাড়না নরহত্যায় গিয়ে পৌঁছতে পারে না। তাই সমাজকে বৃথা শক্তিক্রয় ও অনুচিত আত্মকলহ থেকে রক্ষা করার জন্তই নারীর সতীত্বকে দামী জিনিষ ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে এবং হবে। নারীকে Nationalise (সমগ্র জাতির সম্পত্তি ব'লে পরিগণিত) করবার চেষ্টা কেউ কেউ কচ্ছে ব'লেই মনে করো না যে, নারীর সতীত্বের মর্যাদা জগৎ থেকে উঠে যাবে। এক দল যখন নারীর সতীত্বকে অনাবশ্যক ব'লে ঘোষণা কর্কে, শত দল তখন এই সতীত্বকে আবশ্যক জ্ঞান ক'রে পূজা কত্তে বাধ্য হবে। পৃথিবীর ইতিহাসই বারংবার এই ঘটনার পুনরাবর্তন ঘটাবে। আর নারীর ভাগ্য-নির্ণয়ের জন্ত তোমরা পুরুষেরা যখন সতীত্ব অনাবশ্যক ব'লে ঘোষণা কর্কে, তখন তাদের উপরে তোমাদের অনধিকার-চর্চার প্রতিবাদ ক'রে নারীরা নিজেরাই নিজেদিগকে Nationalised (সর্বসাধারণের সম্পত্তি) ব'লে পরিগণিত হ'তে দিতে বাধ্য দেবে।

নারীজাতির মধ্যে আজকাল তোমরা স্বাধীনতার প্লহা দেখতে পাচ্ছ। তা থেকে ভ্রম ক'রে তোমরা অহুমান কচ্ছ যে, তারা সতীত্বহীনা হ'তে চায়। এতকাল তোমরা তাদের স্বাধীনতাকে

যে ভাবে খর্ব্ব ক'রে রেখেছ; তাতে প্রতিক্রিয়ার মুখে তাদের স্বাধীনতা-লিপ্সা আত্মপ্রকাশ করেছে। তারই জন্ত এতে একটু ঝাঁজ বা অতিচার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অতিচার আর ব্যভিচার এক কথা নয়! অতিচার অনেক স্থলে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু তোমাদের অস্থায়ের প্রতিবাদের মূলে যে অতিচার ফুটে উঠেছে, ব্যভিচার তার স্বরূপও নয়, লক্ষ্যও নয়। যাই তোমরা তাদের স্বাধীনতাকে মোটাগুটি ভাবে স্বীকার করে নেবে, তখন দেখবে তাদের আন্দোলন নত্ন হ'য়ে এসেছে, উগ্গা কমে গেছে, সিন্ধুতার বৃদ্ধি হচ্ছে এবং নারীর স্বভাব তাদের পুরুষের সাথে যেরূপ সহযোগিতা দেবার যোগ্য করেছে, তারা ঠিক সেই স্বভাবের অনুবর্তন কচ্ছে। তখন দেখবে, সেই হেঁসোলও তাঁরা যাচ্ছে, সেই বাসন-কোশনও তাঁরা মাজ্ছে, সেই ঘর-ঝাঁটও তাঁরা দিচ্ছে, সেই ছেলেমেয়ের কাঁথাসেলাইও তাঁরা কচ্ছে, কিন্তু উৎপীড়িতা ক্রীতদাসীর মতন নয়, সদাসম্মুখিতা সদানন্দময়ী জ্ঞানবদী ব্রহ্মবাদিনীর মতন।

(৪৪)

নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা, নারীর ঐক্যবদ্ধতা প্রভৃতি আন্দোলনের মধ্যে যদি কোথাও পাপ ঢুকে থাকে, তবে জেনো, অনেকগুলি দৃশ্চরিত্র পুরুষ এই সব আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে নিজেদের হীনবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন কত্তে চায়,—এ সব তারই ফল। পুরুষ নারীদের কাছ থেকে যা' চায়, তা মুখে প্রকাশ করে না, অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে নারীদের উন্নতি সাধনের অভিনয় করে এবং আস্তে আস্তে তার জঘন্য বৃত্তির চরিতার্থতার দাবীকে নারীর উপরে প্রসারিত

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

PRESENTED

অগস্ত্য-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০৫

করে। নারী-উন্নতির নাম ক'রে যে অর্থ, যে শ্রম পুরুষ দিয়েছে, তাতে নারী কল্লীরা এত কৃতার্থ হ'য়ে যায় যে, এর পরে পুরুষ পৃষ্ঠপোষকরা যখন নিজেদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জাল আন্তে আন্তে চারিদিকে ছড়াতে থাকে, তখন মেয়েগুলি ঠিক ঠাউরে উঠতে পারে না যে, ব্যাপারটা কি হচ্ছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন যেখানে যেখানে ব্যভিচারে গিয়ে পৌঁছেছে, সেখানে সেখানে বিশ্বাস ক'রো যে, লম্পট পুরুষের কৌশলী দাবীই আন্তে আন্তে নারীদের সর্বনাশ সাধন করেছে। সেই সব নারীর অন্তরের বেদনা তোমরা জান না, কিন্তু আমি জানি, আমাকে অনেক মেয়ের চুখের বারতা শুনতে হয়েছে। আমি জানি সবাই তারা রাফসী ছিল না, পুরুষ তাদের রাফসী করেছে। অধিকাংশস্থলেই এই সব আন্দোলনের নারীরা প্রথম সময়ে দেব-নিষ্ঠাল্যের ছায়াই নিষ্পাপ ছিল।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি যে, নারীজাতির মঙ্গলের জন্তই পুরুষ জাতির মধ্যে চরিত্র-আন্দোলনের প্রসার একান্ত আবশ্যক। পুরুষ পরনারী চায়, তাই নারীকে সতীত্ব দিতে হচ্ছে। পুরুষ গোপনে প্রেম করতে ভালবাসে, তাই নারীকে অজানিত হস্তে ভাগ্য সমর্পণ ক'তে হচ্ছে। পুরুষ ভদ্রবরের মেয়েদের নাচিয়ে তাদের সঙ্গে মাখামাখি ক'তে চায়, তাই তারা নাচে, গায় এবং পরে জীবন ভ'রে কাঁদে। পুরুষ পরামর্শ দেয়, তার পরে মেয়েরা কুলভাগ করে। পুরুষ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেয়েদের ভিতরের হিংস্র পশুটাকে জাগিয়ে তোলে, তার পরে মেয়েরা ব্যাঘ্রিনী হয়। পুরুষ মেয়েমানুষের রক্তমাংস ভালবাসে, তাই তারা ভোগের জিনিসে পরিণত হয়। সুতরাং দুর্ভাগা মেয়ে-জাতটার কল্যাণের জন্তই পুরুষ-জাতটার ভিতরে অটলা চরিত্র সাধনার সুপ্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন হয়েছে।

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১০৬

(৪৫)

যার দোহাই দিয়েই তোমরা আমার চরিত্র-আন্দোলনকে নিন্দা কর না বাছা, এমন দিন আসবেই, যেদিন আমার এই শ্রমের প্রতি পুনরায় তোমরাই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ কত্তে বাধ্য হবে। তরুণ কৈশোরে যে জীবন-ব্রতকে গ্রহণ করেছিলাম, সেটা শুধু ঝোঁকের বেশেই করিনি বাপ, আর, তাকে শত শত বার বিচার কত্তেও কুণ্ঠিত হই নি। কিন্তু আমি স্পষ্টই অনুভব করেছি, ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র।

যুবক শুধু বয়স দিয়ে বা মেজাজের উষ্ণতা দিয়ে চেনা যায় না, চেনা যায় তার প্রাণবন্তায়, তার সেবা-বুদ্ধিতে, তার কর্মঠতার প্রাচুর্য্যে, তার সর্ব-জীব-কল্যাণকামিত্বে।

(৪৬)

ক্লেব্য এবং আলস্য যখন সমগ্র ভারতের আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, তখন হে ভারতের যুবক, তুমি বুধা কলহে আর আত্ম-অপচয়ে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত ক'রো না। শক্তিকে সংগ্রহ কর, ধারণ কর। ভারত তপশ্চার শক্তিতে বিশ্বাসী। তোমরাও জীবনকে তপোভিগুখীন ক'রে ঋষি-রক্তের পরিচয় দাও। বুধা কর্মে, বুধা চেষ্টায়, বুধা চিন্তায়, বুধা বাক্যে নিজেদিগকে অপব্যয়িত ক'রে দেওয়ার নামই যৌবন নয়। নিজের ক্রমবিবর্দ্ধমান অনুভূতিশীলতাকে নিত্যকালের কল্যাণের সেবায় আছতি দেওয়ায়ই যৌবনের প্রকৃষ্ট পরিচয় ও পরম সার্থকতা। ঋষির বংশধর, আজ সার্থককর্ম্মী হও, সার্থকবাক্ হও, সার্থকবুদ্ধি হও।

বৈজাঠ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

১০৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরমুখাপেক্ষা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল :- ১৮ই এপ্রিলের তিরুশিরা-
পল্লীর সংবাদে প্রকাশ, চীন ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমাত্মক-কার্য
পরিচালনা করায় ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সাহায্যপ্রার্থী
হওয়া উচিত বলিয়া স্বতন্ত্র পটির নেতা শ্রী সি রাজাগোপালাচারী যে
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এন সঞ্জীব রেড্ডী
তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন।

পূর্বরাত্রে এক জনসভায় বক্তৃতা করিয়া শ্রী রেড্ডী বলেন, শ্রী রাজা-
গোপালাচারী এই যুক্তির ভিত্তিতে তাহার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে,
ভারত দুর্বল এবং অপরের সাহায্য ছাড়া তাহার আত্মরক্ষার ক্ষমতা
নাই। কিন্তু যেদিন ভারত সাময়িক সাহায্যের জন্ত বিদেশের দ্বারস্থ
হইবে, সেদিনই ভারত নিশ্চিত দাস-জাতিতে পরিণত হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি বলেন, নিরপেক্ষ নীতির দ্বারাই ভারত আজ
বিশ্বের রাষ্ট্র-সভায় “বিশিষ্ট” স্থানের অধিকারী হইয়াছে। সিংহল, ব্রহ্ম,
ইন্দোনেশিয়া ও সংযুক্ত আরব-প্রজাতন্ত্রও ভারতের এই নীতি অনুসরণ
করিতেছে।

তিনি আরও বলেন, রাশিয়া ও চীনের পক্ষভুক্ত হইবার জন্ত
কম্যুনিষ্টরা যে যুক্তি দেখান, তিনি তাহারও বিরোধী।

আমরাও মনে করি যে, পরমুখাপেক্ষা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। পুনরায়
চীন বা মার্কিনের পদানত হইতেই যদি হয়, তবে ইংরাজের কাছ হইতে
স্বাধীনতা আদায়ের জন্ত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া নানা আন্দোলন না করাই
উচিত ছিল।

কিন্তু দুখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, কংগ্রেস-পরিচালিত স্বাধীন ভারত নিজ নিরপেক্ষতা-নীতি রক্ষা করিবার সম্পর্কে যতটা সতর্ক, দেশের অথগুহ, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, যোগ্যতা, সাময়িক শক্তির অজ্ঞেয়তা প্রভৃতি রক্ষা সম্পর্কে ততটা সতর্ক ছিলেন বা আছেন কি না, তাহা নিয়ে দেশবাসীদের কোনও প্রত্যক্ষ ধারণা নাই। এমতাবস্থায় শ্রীরাজাগোপালাচারীর মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া কংগ্রেস সভাপতি শ্রী রেড্ডি সুযুক্তিসূক্ত বচন বলিলেও, একমাত্র তাহারই ফলে সকল দেশবাসীর উদ্বিগ্ন মনে প্রশান্ত ভাব আসিয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

গরীব শিক্ষক ও গণরাজ :—করিমগঞ্জের ১৩ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ যে, গত ৩রা এপ্রিল করিমগঞ্জ হইতে প্রায় ৪৪ মাইল দূরবর্তী লোয়াইপোয়ায় আসামের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণবনাথ মুখার্জীর সভাপতিত্বে করিমগঞ্জ জেলা প্রাইমারী শিক্ষক-সম্মিলনীর একাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সভাপতি তাঁহার ভাষণে বলেন, সংবিধানে আছে যে, ৬ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত দেশে অবৈতনিক প্রাইমারী শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা দিবেন রাজ্য-সরকার এবং এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাবোর্ড গঠিত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার জন্ত উপযুক্ত ও সুখী শিক্ষক প্রয়োজন—যাহারা একেবারে কাদা হইতে ঠাকুর তৈয়ার করিবেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের উপর জাতির বুনয়াদ স্থাপনের ভার। তাহারা যদি উপযুক্ত ও সুখী না হন, তবে উপযুক্ত বুনয়াদ গড়িয়া উঠিবে না। উপযুক্ত শিক্ষক পাইতে হইলে তাদের উপযুক্ত বেতন দিতে হইবে। কিন্তু চারিদিকের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়, প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন কম। তিনি মনে করেন, প্রাইমারী শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন না দিলে গণরাজ প্রতিষ্ঠার কার্য ব্যাহত হইবে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

১০৫

আমরাও বলি, সুখী এবং সমৃদ্ধ শিক্ষকরাই গণরাজ প্রতিষ্ঠার যোগ্য পুরুষ কিন্তু ইহার সহিত আর একটি কথা যুক্ত হওয়া আবশ্যক। শিক্ষককে চরিত্রবান এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্নও হইতে হইবে, শিক্ষককে স্বদেশপ্রেমিক এবং আদর্শবাদী হইতে হইবে।

কুর্টনৈতিক জয় না পরাজয়? : ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর আমন্ত্রণে চীনের প্রধান মন্ত্রী শ্রী চু-এন্ লাই ভারতে আসিয়াছেন। এই আগমন কি শ্রী নেহেরুর কুর্টনৈতিক জয় না পরাজয়, তাহা অনেকেই বুঝিতে সমর্থ হন নাই। এই আগমনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দেশের বহু চিন্তাশীল হিতৈষীর মনে কি জাগিয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ সংগঠন, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ পি পারিজা, উপাচার্য উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রী কে.বি.মেনন এম পি (কেরালা), শ্রী এ গোপাল কৃষ্ণ মূর্তি (অন্ধ্র), মীর মুস্তাফা আহমেদ, পিটার আলভারেস (বোম্বে), শ্রী এন জি গোরে এম পি (মহারাষ্ট্র) শ্রী সুরেন দ্বিবেদী, এম পি (উড়িষ্যা) শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ (মধ্যপ্রদেশ), শ্রীরামনাথ ছবে (বিহার), ডঃ বি পি ত্রিবেদী, কাজী আব্দুল ওহুদ, অধ্যাপক সমর গুহ, শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জি প্রভৃতি চু-এন-লাইয়ের ভারত আগমন উপলক্ষে নিম্নোক্ত মর্মে একটি বিবৃতি দিয়াছেন :—

“সমস্ত মানবতা” বোধকে এবং ভারতের নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকারকে পদদলিত করিয়া চীন তিব্বতের স্বাধীনতাকে হরণ করিয়াছে, সেখানকার সহস্র সহস্র নরনারীকে হত্যা করিয়াছে, তার প্রাচীনতম ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিয়াছে। ভারতের জনসাধারণ ও সরকার চীনের এই সম্ভ্রান্ত-বিরোধী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে এবং

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১১০

সমগ্র বিশ্বের জনমত ভারতের এই নীতিকে সমর্থন জানাইয়াছে। চীনের ভারতভূমি দখলে ভারতের আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছে এবং ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত চীনা সম্প্রসারণবাদকে প্রতিরোধ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

“চীনের প্রধানমন্ত্রী চু-এন লাই ভারতে আগিয়াছেন। এতদিন ধরিয়া চীনের নীতির বিরুদ্ধে হাজার হাজার জনসভা ও পত্র-পত্রিকার যে অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, এই উপলক্ষে আমাদের তাঁহার প্রতি আচরণে প্রমাণ করিতে হইবে যে, ইহাই আমাদের অন্তরের কথা, ইহা ভাবালুতায় পরিচালিত সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়। চীন ভারত-ভূমি ত্যাগ না করা পর্যন্ত চু-এন লাইয়ের সঙ্গে ভারতের আলোচনাই চলিতে পারে না—এই অভিমত বারংবার ব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও লোকসভার কোন অভিমত না চাহিয়াই ভারতের প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করা উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন অথচ ঠিক এই সময়েই ভারতের উত্তর প্রান্তে তুবারমৌলী হিমালয়ের বুকে চীনের শাপিত বেয়নেট ভারতের দিকে উদ্ভূত হইয়া রহিয়াছে।

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার চিন্তা-ধারাকে কার্যকরী করিতে বাইতেছেন, তাহার স্বার্থতা আমরা ঠিকভাবে নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নামে আমরা নূনকল্পে এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দাবীই তুলিতে চাই যে, একজন চীনা সৈন্যও ভারত-ভূমিতে থাকিতে কোন আপোষ-আলোচনাই চলিতে পারে না। ভারত-সরকার যেন এই কথাই চীন সরকারকে জানাইয়া দেন।

“স্বভাবতই আজ এই প্রশ্ন জাগিতেছে যে, চীনের প্রতিনিধি চু-এন লাই এদেশে আসিলে ভারত তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

১১১

“ভারতের যুগ-যুগান্তর-খ্যাত-সৌজন্য-বোধ ও অতিথিপরায়ণতা আমাদের অবাঞ্ছিত অতিথির প্রতিও সামান্যতম কঠোর ব্যবহার হইতে আমাদের নিবৃত্ত করিবে। নেহরু কর্তৃক আমন্ত্রিত চু এদেশে আসিলে, তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র অপমানসূচক বলিয়া মনে হইবে, এইরূপ ব্যবহার হইতে আমরা নিবৃত্ত হইব। কিন্তু তাই বলিয়া যাহার প্রতিটি কাজের আমরা এতদিন ধরিয়া দ্বিধাহীন ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছি, তাঁহার প্রতি কি আমরা আন্তরিক অভ্যর্থনার হস্ত প্রসারিত করিব? এই রকম কিছু করা আমাদের মতে চরম অবমাননাকর হইবে। চু-এর প্রতি যে কোন অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন ভারতীয় জাতীয় সম্মান-বোধের এবং বিশ্বমানতাবোধ ও বিচারের বিলুপ্তি ঘটাইবে। সাধারণ-ভাবে বৈদেশিক অতিথিদের প্রতি চিরাচরিত অভ্যর্থনার সঙ্গে এই অভ্যর্থনার কোনও সম্বন্ধ নাই। তাহার আগমনে ভারতীয় জনতার যে-কোনও উল্লাসধ্বনি আমাদের চরম লজ্জা, আমাদের ভাবাবেগের সংকীর্ণতা, মানবতা ও ভারতের বিরুদ্ধে চীনের-অপকর্মের প্রতি আত্মসমর্পণের সামিল হইবে।

“সর্বশেষে আমাদের আবেদন, দেশবাসী ক্ষণিকের জ্ঞাত চিন্তা করুন যে, যে হাত সহস্র সহস্র তিব্বতবাসী ও ১২ জন ভারতীয়ের রক্তে রঞ্জিত, আমরা কি সেই হাতের সঙ্গে করমর্দন করিব? আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করিব যে, চু-এর প্রতি ব্যবহার যেন চিরাচরিত কূটনৈতিক প্রথার মতোই আবদ্ধ রাখা হয়। কাহারও দ্বারা কোন গণ-সম্বন্ধনার আয়োজনে সাহায্য করিতে তিনি যেন বিরত হন।”

কয়েক বৎসর যাবৎ দেশের দায়িত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের অধিকারীরাই চীন-ভারত মৈত্রী প্রসঙ্গে এত অযথা ঢাক পিটাইতেছিলেন যে, সেই

ঢাকের বাণিজ্যের আওয়াজের আড়ালে কয়েক হাজার মাইল ভারতীয় ভূমি চীন জোর করিয়া পদতলগত করিয়াছে। চীন আজ তার প্রধান মন্ত্রীকে ভারতে পাঠাইয়াছেন কি জ্ঞাত, শ্রী নেহেরুই বা ডাকিলেন কি জ্ঞাত? আমাদের নিকট তাহা রহস্যময় বলিয়া মনে হইতেছে। পরবর্তী ঘটনায় সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, চু-এন-লাই প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও আপোষ-আলোচনা করিতে আসেন নাই, ভারতের চিত্ত-দুর্বল প্রধানমন্ত্রীর অযথা সৌজন্তের সুযোগে নিজের অযথার্থ দাবীকে একটা নজির দিয়া বলবৎ করিবার কাজটা তিনি হাসিল করিতে আসিয়াছিলেন।

সূর্য্যের সংখ্যা :—বিজ্ঞানবিদেরা বলিতেছেন যে, আকাশের ছায়াপথে সূর্য্যের সংখ্যা হইতেছে বিশ হাজার কোটি। এই বিশ হাজার কোটি সূর্য্যের মধ্যে মাত্র দুই হাজার সূর্য্যের এই ক্ষমতা রহিয়াছে যে, জীবন সমৃদ্ধ গ্রহ-দিগকে নিজের আকর্ষণে বাঁধিয়া রাখিতে পারে। একটা সূর্য্য যে কয়টা গ্রহকে বাঁধিয়া রাখিতেছে, তাহা দেখিয়াই আমরা অবাক্। দুই হাজার কোটি সূর্য্যের কথা ভাবিতে ত বিস্ময়ের আর সীমাই থাকে না।

সূচ্যগ্র ভূমিও বেদেশীকে দিব না :—২২শে এপ্রিলের কাঠ-মাগুর সংবাদে প্রকাশ যে, নেপালের সংযোগরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীগণেশ-মন সিং এভারেষ্ট-রক্ষা-কমিটির এক প্রতিনিধি-দলের সহিত সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে বলেন, এভারেষ্টের উপর চীনের দাবির বিরুদ্ধে নেপালে যে উত্তেজনা দেখা দিয়াছে, সরকার তাহার যৌক্তিকতা সমর্থন করেন তিনি বলেন, সরকার নেপালের জনগণকে এই আশ্বাস দান করিতেছেন যে, তাঁহারা নেপালের এক ইঞ্চি পরিমাণ ভূমিও কাহারও নিকট সমর্পণ করিবেন না।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭] **PRESENTED** সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

১১৩

আমরাও আমাদের প্রধান মন্ত্রীর মুখে এই আশ্বাস-বাণী প্রায়ই শুনিতেছি যে, ভারতভূমির এক ইঞ্চি ভূমির উপরেও বিদেশীর পদভার সহ করা হইবে না।

এই জাতীয় আশ্বাস-বাক্য কার্যে পরিণত হইলে রাষ্ট্রকর্ণধারদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা নিশ্চিতই অটল অচল হইয়া থাকে।

প্রবীণের উপদেশঃ—নয়াদিল্লীর ২৮শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রী এম. সি. দাভার চীনের প্রধান মন্ত্রী চু এন-লাইয়ের নিকট লিখিত এক পত্রে তাঁহাকে দলাই লামার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুরোধ জানাইয়া বলিয়াছেন, “আপনি হয়তো বলিবেন আমি আপনাকে অসম্ভব কিছু করিবার জ্ঞাত অনুরোধ করিতেছি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনের জ্ঞাত গুরুত্বপূর্ণ কার্যের প্রয়োজন। দলাই লামা ও আপনার মধ্যে যদি সাক্ষাৎকার হয় এবং শ্রী নেহেরুর মধ্যস্থতায় যদি আপনারা উভয়ে অচল অবস্থার অবসান ঘটান, তাহা হইলে ভারত ও চীনের মধ্যে বিরোধ সংক্রান্ত বহু বিষয়ের অনায়াসে সমাধান হইয়া যাইবে।”

শ্রীদাভার তাঁহার পত্রে আরও বলেন, “দলাই লামার সহিত আপনার সাক্ষাৎকার ঘটিলে আপনার ভারত আগমনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হইবে এবং মানচিত্র কিম্বা ইতিহাসের জীর্ণ পাতা ঘাটিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। দলাই লামা তাঁহার দেশের সীমান্তের সহিত পরিচিত এবং আপনিও আপনার দেশের সীমান্তের সহিত পরিচিত এবং আমরাও আমাদের সীমান্ত কি, তাহা জানি সুতরাং সীমান্ত-বিরোধ বলিয়া কোন কিছু থাকিবে না কারণ ভারতের সহিত তিব্বতের কোন দিন সীমান্ত-বিরোধ ছিল না।”

সংবাদটী পাঠ করিয়া আমাদের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, প্রবীণের এই সঙ্গত ও সরল উপদেশে অতবড় রণোদ্ধত মহান্ দেশের নেতা কর্ণপাত করা নিজের পক্ষে পদোচিত বলিয়া মনে করিবেন কি? পরবর্তী ঘটনাবলী সেই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিয়াছে। লোকসভায় শ্রীনেহেরু চৌ-নেহেরু আলোচনার যে ফলশ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে, সীমানার দলিল দেখিতে চৌ-মহাশয় আসেন নাই, তিনি আসিয়াছেন নিজের অবাস্তব দাবী স্বপক্ষে কতকগুলি মিথ্যা নজির তৈরী করিতে। যেখানে বিসমিল্লাতেই গলদ, সেখানে সফলের প্রত্যাশা কি করিয়া করা যাইবে?

দণ্ডকারণ্যে:—প্রাচীন দণ্ডকারণ্যে খর-দূষণ নিধন হইয়াছিল, হৃদয়গত নাসাচ্ছেদ ঘটয়াছিল আর হইয়াছিল সীতা-হরণ। বর্তমান দণ্ডকারণ্যে ইহাদের মধ্যে যে কোনটা হইবে, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। কলিযুগে রামের তুণ থাকে, তীর থাকে না, দণ্ডর থাকে, যোগ্যতা থাকে না, দুর্নীতিতে ভূবন ভরিয়া গিয়াছে—কে কাহাকে পদচ্যুত করিবে, কে কাহার অত্মায় দমন করিবে? মনে হয় না যে, শ্রীনেহেরু দৃঢ় ভাবে এই বিষয়ে কোনও মনঃস্থির করিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় যে বিলাপ করিতেছেন, তাহা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে কি না, তাহাও জানা যায় নাই। কেন্দ্রীয় পুনর্কাসন মন্ত্রী লোক-সভায় নাকি হক্ কথা কহিয়া ফেলিয়াছেন, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা কেবল পূর্ববঙ্গের বাস্তুভাগীদের জন্য হইতে পারে না, এই পরিকল্পনায় চারিদিকের অনেক রাজ্যেরই ভূমিহীনদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এদিকে দণ্ডকারণ্যের দোহাই দিয়া অবার নানাস্থানেব আশ্রয়-শিবিরগুলি গুটাইয়া ফেলা হইতেছে। পাশার দান এবার শকুনির হাতে না যুধিষ্ঠিরের হাতে, সঠিক বুঝা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

১১৫

যাইতেছে না। দাঁড়কাকগুলি নাকি কা কা করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—দণ্ডকারণ্যে জল নাই, দারুণ গ্রীষ্মে কোন্ বস্তু পান করিয়া ভ্রম মিটাইবে?

১৯শে এপ্রিলের জগদদলপুরের সংবাদে প্রকাশ,—নয়া-দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ রহিয়াছে, এমন একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা বলেন “কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার ‘গদী’ ত্যাগ প্রায় নিশ্চিত। এই সম্পর্কে ডাঃ বি সি রায় পূর্বেই প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর নিকট শ্রীমতী রেণুকা রায়, ডাঃ ফুলরেণু গুহ ও শ্রী পি সি সেনের নাম পেশ করিয়াছেন। ইহাদের ছাড়া শ্রীমতী সূচেতা কুপালনীর নামও এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইতেছে।”

পূর্বোক্ত নেতা আরও বলেন, “এবারে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহেরু দণ্ডকারণ্যের কেলেকারী সম্পর্কে নীরব দর্শকমাত্র নহেন; পক্ষান্তরে উহার পরিচালনা ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তিনি বলেন, “ডাঃ বি সি রায়ের আসন্ন দণ্ডকারণ্য সফরের উপর দিল্লীর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। যদি ঘটনাচক্রে শ্রী খান্নার অপসারণ বিলম্বিত হয়, তাহা হইলে তথ্য নির্ধারণকল্পে একটি কমিটি নিয়োগ করা হইবে। যেভাবেই হউক, দণ্ডকারণ্যের ব্যাপার এক মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি হইবে।”

শ্রায়, সুবিচার ও ভবিষ্যদৃষ্টির পরিচয় যদি এই নিষ্পত্তির ভিতর থাকে, তবেই তাহা অভিনন্দনযোগ্য হইবে। নতুবা দণ্ডকারণ্য চিরকাল অশান্তির আগারই রহিয়া যাইবে।

দণ্ডকারণ্য সফর করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরই পশ্চিম-

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১১৬

বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না দিল্লি যাইতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। দণ্ডকারণ্য প্রসঙ্গ লইয়া রাজ্য-সরকার এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের মধ্যে যে মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা মিটাইয়া ফেলার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরু তাঁহাদের দিল্লিতে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

দণ্ডকারণ্য কেবল পরিকল্পনার অরণ্য হইয়া থাকিলেই চলিবে না। আমরা ইহার মধ্য দিয়া উদ্বাস্তু-সমস্যা়ার সঙ্গত সমাধান চাহি। কেন্দ্রীয় নেতারা বাঙ্গালী-বিষে পরিহার করিলে সঙ্গত ও স্মৃষ্ট ব্যবস্থা এখনো সম্ভব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। মরার উপরে খাড়ার ঘা দিয়া কাহার গৌরব বাড়িতেছে, তাহার বিচার একদিন ইতিহাস নিশ্চিত করিবে। অমর যশোলোভী নেতাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

ইহার পরবর্তী সংবাদ এই যে দণ্ডকারণ্যের কোরাপুট নামক স্থানে উচ্চস্তরের মন্ত্রী-সম্মেলন হইয়াছে। সম্মেলনে কতকগুলি আপাত-মনোরম প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রথমতঃ ১৯৬১ সনের মধ্যে তাড়াহড়া করিয়া উদ্বাস্তু শিবির তুলিয়া দেওয়া হইবে না। দ্বিতীয়তঃ দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনার রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও সাহায্য গ্রহণ করা হইবে এবং এই জন্ত তিনমাস অন্তর অন্তর মধ্য-প্রদেশ, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রীগণ সলাপরামর্শ করিবেন ইত্যাদি প্রস্তাবগুলি, শ্রীমেহের চাঁদ খান্না সম্মতি দিলে, তবেই কার্য্যকরী হইতে পারে।

এই আলাপ, আলোচনার ফলে ইহাও ঠিক হইয়াছে যে, উদ্বাস্তুদের বঙ্গসংস্কৃতি সংরক্ষণের মানসে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। আমরা কিন্তু বুঝিলাম না, জোর করিয়া যাহাদের হিন্দী

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

১১৭

এবং উড়িয়া শিখান হইবে তাহাদের বঙ্গসংস্কৃতি কিভাবে রক্ষিত হইবে? কোনও মল্লীনাথ ইহার টীকা করিতে পারিলে আমরা স্তুতী হইতাম।

সম্পাদকের বর্ষাবিদায় :- আসাম, নাগা হিলের মণিপুর রোড অখণ্ডমণ্ডলী বিগত বর্ষে রথোৎসবে ব্যয় করিয়াছেন ৫২৮/১০, জন্মোৎসবে ৫৭৭/০, মঙ্গলবাঁধের জন্ত ব্যয় ১২৮ টাকা ৩১ নং পং, বিভিন্ন স্থানে সংগঠন-কাজে পত্র দিয়াছেন ৫৩৩টি, নানা স্থানের ৭টি প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন, সমবেত উপাসনা করিয়াছেন স্থানীয় মণ্ডলীতে ৮৮টি ও ভক্তদের গৃহে ২০টি, নূতন মণ্ডলী উদ্বোধন করিয়াছেন ২টি, নগর-সঙ্কীর্্তন করিয়াছেন স্থানীয় ৫টি, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া ৪টি, সমগ্র বৎসরে মণ্ডলীর সমবেত উপাসনায় উপস্থিতি সংখ্যা ৭৭৫ জন।

সম্পাদক শ্রীমুকুমার চক্রবর্তী তাঁহার ভাষণে বলেন,—

“আজ ৯ই বৈশাখ আমাদের পরম পবিত্র দিন। এই দিনই ১৩৫৯ বাং পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীবাবামণি এই নগণ্য অবহেলিত ডিমাপুরে (মণিপুর রোডে) প্রথম দীক্ষা দিয়াছিলেন। কাজেই উপাসনার মাধ্যমে প্রত্যেক বৎসরই আমাদের প্রাণে জেগে উঠে সেই পবিত্র পুণ্য দিনটির উৎসব-উদ্দীপনার স্মৃতি।

“অপর দিক্ দিয়ে এই দিনটি গুরুত্বপূর্ণও বটে। কারণ, গত একটা বৎসরের কাজের হিসাব সম্পাদকের কাছ থেকে পাওয়া যায়। আমরা কে কতটুকু কিভাবে মণ্ডলীর তথা অখণ্ড-সঙ্ঘের কাজে লেগেছি ইত্যাদি।

“উপাসনায় উপস্থিতির রেকর্ড-বইখানা এখানে ধরে তুলতে চাই না এবং পূর্বকথানুসারে ইহার নকল বাবামণির কাছে পাঠাতেও চাইনে।

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১১৮

আমি শুধু বলতে চাই, আমাদের সকলের খুব ভালভাবে ভেবে দেখা উচিত, কাজে কে কে ইচ্ছাকৃত ফাঁকি দিয়েছি, যার ফল আমাদের নিজেদেরই ভোগ করতে হবে।

“আমুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি, এখন হতে সাপ্তাহিক উপাসনায় আর অনুপস্থিত থাকবো না। আমুন, নিজেদেরই কুশলের কথা চিন্তা করে প্রতিজ্ঞা করি, মণ্ডলীর ব্যাপারে পারিবারিক কলহকে বাধা বাঁধতে দেব না। অবশ্য এ বিষয়ে আমরা প্রায় মুক্ত—একথা বলা যায়।

“একটা কথা আজ আমাকে অকপটে বলতে হচ্ছে যে, এমনও ভাই এখানে আছেন, যারা—কাজটা করেন আগে এবং সুবিধা মত যুক্তিটা করেন পরে। যুক্তি ক’রে কাজ করাটাই সম্ভব। যেমন, ‘গতকাল উপাসনায় আসেন নি কেন?’ ‘যাব কি ভাই, আপনারা বড় দেরী করেন, সময়মত করলে যেতে পারি’ ইত্যাদি। অথচ দীর্ঘদিন ধ’রে, আশ্বিন হতে ফাল্গুন এবং চৈত্র হতে ভাদ্র পর্যন্ত সাপ্তাহিক উপাসনা যথাক্রমে ঠিক সন্ধ্যা ৭।০টায় ও ৬টায় হয়ে আসছে। বিভিন্ন অমার্জ্জনীয় দোষ আমাদের আছে যা প্রকাশ না করতে করতে এমন এক অবস্থা এসে পৌঁছেছে যে, সংশোধনের জন্ত, প্রকাশ করাটাই যেন দোষ। এই অবস্থার পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। সংঘের আদর্শ-বহির্ভূত কর্মে যারা দেয় উৎসাহ ও যোগান, তারা হয় পরম বন্ধু আর যারা দেয় বাধা, তারা হয় শত্রু। এই দুর্দিন যাতে অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহাই প্রার্থনা করি।

“ধর্ম্য নিজ নিজ ঘরে ব’সেই—করা যায়, তবু কোথায় যেন অসম্পূর্ণতা অনুভূত হয় এবং এই হয় বলেই সমবেত উপাসনার প্রবর্তন ক’রে দিব্যশক্তিধর আমাদের শ্রীশ্রীবাবামনি আনুলেন পূর্ণতা, ঘটালেন

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

PRESENTED

১১৯

ভারতের পুনরুদ্বোধ, যার তাৎপর্য আমাদের বোঝা উচিত। বোঝা উচিত যে দেড় দু' ঘণ্টায় রাজা বা ফকির কেউ হয় না, বরং নিদারুণ দ্রুখে অনাবিল শান্তি পাওয়া যায় এই উপাসনায়। আশুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করি যে, আমরা নিজেদিগকে আর ফাঁকি দেব না। প্রত্যেকের ঘরে এই চলিত পুণ্য মাসে একবার ক'রে উপাসনা দিয়ে আশুন আমরা প্রমাণ করি যে, এই বৎসর আমরা আমাদের সংঘের আদর্শপ্রচারে যত্ববান হবই।

“ধারাবাহিক একঘেয়ে সম্পাদকত্ব আর ভাল লাগে না। আমার বিশেষ অনুরোধ, অত্র কাউকে এই দায়িত্ব অর্পণ করুন। গত কয়েক বৎসর কিভাবে সম্পাদককে কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে, তা আপনারা সকলেই জানেন। আমি আশা করি, এবার যিনি সম্পাদক হবেন, তিনি কোনও জটিল অবস্থায় পড়বেন না বরঞ্চ সকলের সহযোগিতা অর্জন করতে পারবেন এবং পূর্বাশ্রয় অধিকতর উল্লেখযোগ্য ভাল কাজ করতে পারবেন।

“আপনারা কেউ আমার শত্রু নন, আপনারা আমার ভাই। ভাল-মন্দ যা কিছু বলেছি, তা বলেছি শুধু সংঘের দিকে তাকিয়ে। যাতে আমাদের ব্যক্তিগত আচরণ দ্বারা সংঘের গায়ে কলঙ্কের লেপ না পড়ে, সে কথা ভেবে। কারণ, ভাল বা মন্দ ছেলেব পিতৃ-পরিচয় সকলেই স্বাভাবিক নিয়মে জানতে চায়।

“আমরাও যাতে আদর্শবান হয়ে সজ্জপিতার উজ্জল আদর্শ উজ্জলতর করতে পারি, সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি যেন নিবদ্ধ হয়। আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার পবিত্র ‘জয়গুরু’ গ্রহণ করুন।”

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

প্রতিধ্বনি

১২০

ধৃতঃ প্রেম্না

[শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব লিখিত
'সমসাময়িক পত্রাবলী']

(৫১৮)

হরি-ওঁ

কাটিগড়া (কাছাড়)

২৩শে মার্চ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার সহকর্মী রূপে কাজ করিবার সম্ভাবনা বাহার ছিল, তুমি কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া না আসাতে অভিযানের ভার পাইয়া সে মনু এবং লঙ্গাই উপত্যকাতে চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গে স্বল্প কতিপয় সহকারী সে পাইয়াছে। যে যে মণ্ডলী হইতে আর্থিক সহযোগ বাইবার কথা ছিল, তাহারা আশানুরূপ সহায়তা করিতে সমর্থ না হওয়াতে শ্রীমানকে কতকটা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেই কাজ করিতে হইয়াছে। বর্ষকালপূর্বে যে অভিযান তোমরা পরিচালন করিয়াছিলে, তাহাতে তোমরা গোড়ায় গলদ করিয়াছিলে। অর্থাৎ, তোমরা বড় বড় গ্রাম আর বড় বড় পাহাড়ী সর্দারদের দিকে তাকাইয়া কাজ করিয়াছ। এবার শ্রীমান ল—ছোট ছোট 'বাড়ী' বা পার্বত্য গ্রাম এবং ছোট সর্দারদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ চালাইতেছে। অর্থাৎ শ্রীমান ঠিক বুঝিয়াছে যে, আমি এককাল কি কথা কহিয়া আসিয়াছি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

LIBRARY

No.

প্রতিধ্বনি

১২১

চিরকাল আমি বলিয়াছি যে ছোটদের ছোট মনে করিও না, তাহাদের মধ্যে অনেকে তোমাদের কল্পনার পরিধি অতিক্রম করিয়াও অনেক বিরাট, অনেক বৃহৎ, অনেক উচ্চ, অনেক মহৎ। শ্রীমান ল—ছোট ছোট 'বাড়ী'গুলিকে এবার উপেক্ষা করে নাই। ফলও ফলিয়াছে হাতে হাতে। ছোটদের মধ্যে যে অনেক বড় লুকাইয়া আছে, তাহার প্রমাণ সে অহরহ পাইতেছে।

তুমি কুলাই অঞ্চলে রূপিণীদের মধ্যে কাজ করিবার জন্ত বিশ বাইশ দিন দিতে পারিবে জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু খ্রীষ্টান মিশনারীরা সেই অঞ্চলে খুব বাতায়াত করিতেছেন বলিয়াই তোমাদিগকে তৎপর হইতে হইবে, এই দৃষ্টিভঙ্গী আমার প্রশংসা অর্জন করিল না। ভারতীয় ভাবে না হইলেও কোনও না কোনও প্রকারে খ্রীষ্টান প্রচারকেরা অবনত মানবের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের সেই সেবার সহিত আমাদের বিরোধ থাকিতে পারে না। খ্রীষ্টান প্রচারকেরা প্রবেশ করেন নাই বা করিতে সাহস পান নাই, এমন অঞ্চলের অভাব পাহাড়-পর্বতে নাই। তোমাদের দৃষ্টি সকলের আগে কি সেই দিকে পড়া প্রয়োজন ছিল না? যাহা হউক, মন ও লঙ্গাই উপত্যকার কাজ শেষ হইবার পরে তোমাকে সহকর্মী দিবার চেষ্টা করিব। ইতিমধ্যে তুমি নিজে ভাবী কাজের জন্ত যোগ্যতা সঞ্চয় করিবানু হও। ইচ্ছা করিলেই জীব-সেবা করা যায় না, তার-জন্ত যোগ্যতা সঞ্চয়ের চেষ্টাও করিতে হয়। আত্মগঠনে ন্যূনতা থাকিলে কোনও সেবাই সেবার নিকটে পৌছান সম্ভব নহে। থাকিবে না তোমার প্রতিষ্ঠা-লিপ্সা, থাকিবে না তোমার অর্থ-পিণামা, থাকিবে না তোমার কোনও প্রকার জৈব-দুর্বলতা,—ইহা মনে রাখিতে হইবে। থাকা চাই দুর্দমনীয় দুঃসাহস, থাকা

প্রতিধ্বনি

১২০

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

ধৃতঃ প্রেম্না

[শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব লিখিত
'সমসাময়িক পত্রাবলী']

(৫১৮)

হরি-ওঁ

কাটিগড়া (কাছাড়)

২৩শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার সহকর্মী রূপে কাজ করিবার সম্ভাবনা যাহার ছিল, তুমি কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া না আসাতে অভিযানের ভার পাইয়া সে মনু এবং লক্ষ্মাই উপত্যকাত্তে চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গে স্বল্প কতিপয় সহকারী সে পাইয়াছে। যে যে মণ্ডলী হইতে আর্থিক সহযোগ যাইবার কথা ছিল, তাহারা আশানুরূপ সহায়তা করিতে সমর্থ না হওয়াতে শ্রীমান্কে কতকটা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেই কাজ করিতে হইয়াছে। বর্ষকালপূর্বে যে অভিযান তোমরা পরিচালন করিয়াছিলে, তাহাতে তোমরা গোড়ায় গলদ করিয়াছিলে। অর্থাৎ, তোমরা বড় বড় গ্রাম আর বড় বড় পাহাড়ী সর্দারদের দিকে তাকাইয়া কাজ করিয়াছ। এবার শ্রীমান ল—ছোট ছোট 'বাড়ী' বা পার্শ্বত্যা গ্রাম এবং ছোট সর্দারদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ চালাইতেছে। অর্থাৎ শ্রীমান্ টিক্ বুঝিয়াছে যে, আমি এতকাল কি কথা কহিয়া আসিয়াছি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

LIBRARY

No.

প্রতিধ্বনি

১২১

Sri Sri Anandamaye Ashram

চিরকাল আমি বলিয়াছি যে ছোটদের ছোট মনে করিও না, তাহাদের মধ্যে অনেকে তোমাদের কল্লনার পরিধি অতিক্রম করিয়াও অনেক বিরাট, অনেক বৃহৎ, অনেক উচ্চ, অনেক মহৎ। শ্রীমান ল—ছোট ছোট 'বাড়ী'গুলিকে এবার উপেক্ষা করে নাই। ফলও ফলিয়াছে হাতে হাতে। ছোটদের মধ্যে যে অনেক বড় লুকাইয়া আছে, তাহার প্রমাণ সে অহরহ পাইতেছে।

তুমি কুলাই অঞ্চলে রূপিনীদের মধ্যে কাজ করিবার জন্ত বিশ বাইশ দিন দিতে পারিবে জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু খ্রীষ্টান মিশনারীরা সেই অঞ্চলে খুব বাতায়াত করিতেছেন বলিয়াই তোমাদিগকে তৎপর হইতে হইবে, এই দৃষ্টিভঙ্গী আমার প্রশংসা অর্জন করিল না। ভারতীয় ভাবে না হইলেও কোনও না কোনও প্রকারে খ্রীষ্টান প্রচারকেরা অবনত মানবের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের সেই সেবার সহিত আমাদের বিরোধ থাকিতে পারে না। খ্রীষ্টান প্রচারকেরা প্রবেশ করেন নাই বা করিতে সাহস পান নাই, এমন অঞ্চলের অভাব পাহাড়-পর্বতে নাই। তোমাদের দৃষ্টি সকলের আগে কি সেই দিকে পড়া প্রয়োজন ছিল না? যাহা হউক, মনু ও লঙ্গাই উপত্যকার কাজ শেষ হইবার পরে তোমাকে সহকর্মী দিবার চেষ্টা করিব। ইতিমধ্যে তুমি নিজে ভাবী কাজের জন্ত যোগ্যতা সঞ্চয় করিবান্ হও। ইচ্ছা করিলেই জীব-সেবা করা যায় না, তার-জন্ত যোগ্যতা সঞ্চয়ের চেষ্টাও করিতে হয়। আত্মগঠনে ন্যূনতা থাকিলে কোনও সেবাই সেবার নিকটে পৌছান সম্ভব নহে। থাকিবে না তোমার প্রতিষ্ঠা-নিপ্সা, থাকিবে না তোমার অর্থ-পিণামা, থাকিবে না তোমার কোনও প্রকার জৈব-দুর্কলতা,—ইহা মনে রাখিতে হইবে। পাকা চাই হৃদয়মনীয় হুঃসাহস, পাকা

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম।

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১২২

চাই যে-কোনও অপ্রত্যাশিত প্রতিকূলতার সহিত লড়াই দিবার মতন প্রত্যাশনমতীত্ব, থাকা চাই একই কাজে দীর্ঘকাল লাগিয়া থাকার ধৈর্য্য, থাকা চাই বারংবার পরাজিত হইয়াও পরাজয় স্বীকার না করিয়া নবোৎসাহে মাতিয়া সংগ্রাম-পরিচালনের তুর্কীর জিদ। এই সকল গুণ তোমাকে সঞ্চয় করিতে হইবে।

আজ হইতে ত্রিশ বৎসর পূর্বে, এমন কি চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি সভ্যতাসর্ব্বী সংস্কৃতিদর্পী অন্তঃসারহীন বাঙ্গালী জাতিকে তারস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়াছি, যাও সবে বনে, যাও জঙ্গলে, যাও পাহাড়-পর্ব্বত-উপত্যকতায়-অধিত্যকায়। কে সেই কথায় কর্ণপাত করিয়াছে? আজ হইতে কমপক্ষে উনিশ বৎসর পূর্বে এক মাস মাসের আটই তারিখে হাজার হাজার পুস্তিকা ছাপিয়া আমি সমগ্র দেশ জুড়িয়া বিতরণ করিয়াছি, বাহার একমাত্র বক্তব্য ছিল, যাও সবে বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, যাও সংস্কৃতির প্রকৃষ্টতম ধারা লইয়া অক্টোবলজ অনুমত লক্ষ লক্ষ সভ্যতাবঞ্চিত মানব-সমাজের মধ্যে, প্রাচীন ভারতের কৃষ্টি ও সাধনার অমৃত-বারি বর্ষণে তাহাদের সঞ্জীবিত কর, নিজেরাও নূতন প্রেরণা, নূতন প্রাণনা, নূতন উদ্দীপনা লাভ কর। কেহ সেই কথায় এক কাণাকড়ি দাম দাও নাই। আজ বুঝি খ্রীষ্টান মিশনরীদের প্রচণ্ড উত্তম ও বিপুল আয়োজন দেখিয়া অন্তরে তোমাদের ভাষা আসিয়াছে? আশ্চর্য্য! সময় থাকিতে যে কাজ করিলে বিশ্বমানবের প্রতি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ-প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য লঘু হইত, তাহা তখন কর নাই। এমন কি, তাহা করিলে আজ তোমাদিগকে ললাটদেশে উদাস্তর পঙ্ক-তিলক ধারণ করিয়া শিবিরে শিবিরে “ডোলে” চাউল ভিক্ষা করিতে হইত না, তোমাদের অর্থনৈতিক সমস্তা চিরতরে

জৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেরা

প্রতিধ্বনি

১২৩

মিটিয়া যাইত। ভাবিয়া অবাক্ হই, সময় থাকিতে কে কাহার কথা শুনিবে?

আজ যদি মনে করিয়াছ যে, পাহাড়-পর্বতে ধর্ম ও সাধনার অভিব্যক্তি লইয়া তোমাদের যাইতে হইবে, তাহা হইলে এই কথাটি সর্বদা মনে রাখিও যে, পাহাড়ীদিগকে তোমাদের সর্বভুক্ ক্ষুধার শিকারে পরিণত করিতে তোমরা পার না। আগে যে কাজে হাত দিলে তোমাদের প্রতিটি সংসারের উদয়ের ক্ষুধা নিবাহিবার সরল সহজ ব্যবস্থা আপনা আপনি হইয়া যাইত, আজ সেই কাজে হাত দিবার সময়ে তোমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পার্থিব কোনও স্বার্থ-সিদ্ধির গোপন কামনাও যেন তোমাদের অন্তরে না থাকে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১৯)

হরি-ওঁ

কাটিগড়া

২৪শে মাঘ ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি নিশ্চিন্তে পড়িতে থাক। কে একজন সাধু বলিয়াছেন যে, তুমি পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিবে না, ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। সাধুদের কি লোকের পরীক্ষার ফলাফল, মামলা-মোকদ্দমার হারজিতের খবর বলা ছাড়া আর কোনও কাজ নাই? মানুষের মনে উৎসাহ-উদ্বীপনা সঞ্চারণার কি ইহাদের

প্রতিধ্বনি

ধ্বংস প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১২৪

অবসর নাই? কেবল কুড়াক ডাকিবার জন্তই কি গৃহস্থের ছেলেরা সংসার ছাড়িয়া সাধু হইয়া থাকে? কেবল মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতকগুলি শক্তিহারক মন্তব্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্তই কি গৃহস্থেরা নিজেদের কষ্টার্জিত অন্ন এই সকল ভিক্ষান্নজীবী পরপিণ্ড-প্রত্যাশী অলসদিগকে দিয়া থাকে? আমি বলি, ইহারা সাধু নহে। ইহাদের কথায় আস্থা স্থাপনের কোনও প্রয়োজন নাই। তুমি ইহাদের প্রলাপ-বচনে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করিও না। এই সকল দায়িত্বজ্ঞানহীন অযথা উক্তিভেদে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করিও না। তুমি মন দিয়া তোমার পড়া চালাও মা, পড়া চালাও! নিজের পৌরুষেই তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। তোমার পরিশ্রমের ফল তোমারই করায়ত্ত। বুখা-প্রজলী সাধুবেশধারী ভবিষ্যৎ-বক্তাদের অপকথায় বিচলিত হইবার তোমার কোনও প্রয়োজন নাই। ইতি—

আশীর্বাদক
অরূপানন্দ

(৫২০)

হরি-ও

কাটিগড়া (কাছাড়)

২৪শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্বশক্তি দিয়া পড়াশুনা শুরু কর। পরীক্ষা নিকটবর্তী, এখন অল্প কোনও বিষয় চিন্তা করিও না। পিতামাতার শ্রমলব্ধ অর্থে লেখা-পড়া শিখিতেছ, এখন তুমি এক কথাতেই কোনও মঠ বা আশ্রমের কর্মীরূপে সংসার-ত্যাগ করিতে পার না। সন্ন্যাসী হইতে হইলে এক

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম।

প্রতিধ্বনি

১২৫

মুহুর্তে হওয়া যায়। কিন্তু পিতামাতার প্রীতি ও শুভেচ্ছার মধ্য দিয়া যে ব্যক্তি সংসার ছাড়ে না, সে বারে বারে পিছন-টানে বাধা পায়। যদি সাধুই হইতে চাহ, তবে এই পিছন-টানকে আগে পিতৃমাতৃসেবা ও পিতৃমাতৃভক্তির মধ্য দিয়া যতটা পার শিথিল ও দুর্বল করিয়া লও। কাজ করিবার ইহা এক পরম কৌশল। অকৃতজ্ঞতা দ্বারা সাধুত্ব অর্জন করা যায় না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২১)

হরি-ও

কাটিগড়া (কাছাড়)

২৪শে মাঘ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জীবনে আঘাতের প্রয়োজন আছে। দুঃখ, কষ্ট, অনটন ও উৎপীড়ন যে জীবনের উপরে কখনও আসে নাই, তাহা মাথনের মত কোমল ও অকর্মণ্য হইয়া যায়, নয়ত শুধু কল্লনা-বিলাসে মজ্জমান হয়। আঘাত যদি বেশী হইয়া যায়, তুমি তোমার মন-শক্তি দ্বারা তাহাকে সহিয়া নিও কিন্তু মুহূর্ত্তমান হইও না। জগতে আঘাতের ক্ষমতা বেশী না তোমার মনের ক্ষমতা বেশী? নিজেকে দুঃখের নিকটে ছোট হইতে দিও না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিবন্ধি

ধৃতং প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১২৬

(৫২২)

হরি-ওঁ

কাটিগড়া (কাছাড়)

২৪শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। সজ্বগত ভাবে কোনও বিরাট বিশাল সংগঠন-কার্য চালাইতে হইলে কার্য্যকরী সমিতি গড়িয়া সম্পাদক, সভাপতি প্রভৃতিকে কার্য্যভার বণ্টন অত্যাবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু পদ বা পদবী লাভের পরে অনেকের ভিতরেই প্রকৃত সেবার আগ্রহ কমিয়া যায়। ইহাতে সজ্ব-গঠনের আসল উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়। তোমার এই অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা নহে। অনেক ক্ষেত্রে ইহা শতকরা একশতাংশই সত্য। এই কারণে কোথাও কোথাও পরীক্ষা করিয়া দেখা সঙ্গত যে, পদ্ধতিবদ্ধ সমিতি বা কমিটি না গড়িয়া কিম্বা সম্পাদক বা সভাপতি রূপে কাহাকেও প্রধান বা বিশেষ রূপে ক্ষমতার অধিকারী অধিষ্ঠিত না করিয়া কাজ করা যায় কিনা। প্রয়োজন হইতেছে অকপট সেবার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫২৩)

হরি-ওঁ

শ্রীগৌরী (কাছাড়)

২৪শে মাঘ, ১৩৬৫

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ওফার-বিগ্রহে অঞ্জলি দানের নিয়ম সম্বন্ধে তোমাদের কতকগুলি

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

দ্বিতীয় প্রেক্ষা

প্রতিশ্রুতি

১২৭

সংশয় জন্মিয়াছে। তাহার নিরসনকল্পে আমি কয়েকটি সাধারণ কথা লিখিতেছি।

অঞ্জলি দান অশুচি শরীরে উচিত নহে। ঘুম হইতে উঠিয়া পাইখানার কাপড় ছাড় নাই, দাঁতন কর নাই, চোখ-মুখ ধোও নাই, এমতাবস্থায় তুমি অঞ্জলি দিতে পার না।

কোনও মৃতদেহ বা ব্যাধিগ্রস্ততা হেতু অশুচি দেহ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছ। এমতাবস্থায় জ্ঞানাদি না করিয়া অঞ্জলি দিতে পার না। অবশ্য, মৃতসংস্কার-কালে তাহার বক্ষে বিগ্রহ রাখিয়া তখন অঞ্জলি দিতেছ, তখনকার কথা বলা হইতেছে না।

অতি নিকট আত্মীয় মারা গেলেও মৃত-সংস্কারের পরে জ্ঞান সারিয়াই তুমি বিগ্রহে অঞ্জলি দিতে পার।

অঞ্জলি একক বা সমবেত ভাবে দিতে পার। কিন্তু কোনও বিগ্রহ-মন্দিরে নিয়মিত অঞ্জলি হইয়া যাইবার পরে মন্দির দ্বার বন্ধ হইয়া গেলে তখন আবার তোমার অঞ্জলি দেওয়া হয় নাই বলিয়া দ্বার খুলিতে মন্দির-রক্ষককে বাধ্য করিতে পার না। তিনি দ্বার খোলায় খুলিয়া দিলে তখনও অঞ্জলি দিতে গুরুতর বাধা নাই। তবে এইরূপ পরি-
স্থিতির সৃষ্টি যত কম হয়, ততই ভাল। কারণ, জগতে শৃঙ্খলার প্রয়োজন আছে।

রজস্বলা অবস্থায় প্রথম চারিদিন জ্বীলোকেয়া অঞ্জলি দিবেনা, কিন্তু যুক্ত করে স্তোত্র পাঠ করিতে পারিবে এবং বিগ্রহ স্পর্শ না করিয়া প্রণাম করিতে পারিবে। যদি হাতে পুষ্পাদি নিয়াই স্তোত্র পাঠ করে, তবে সে সেই পুষ্পাদি জলে নিক্ষেপ করিবে, বিগ্রহে নহে।

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেমা

[১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

১২৮

ব্যক্তিগত উপাসনায় অখণ্ড-স্তোত্রের তিন স্তবকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি হইবে। সমবেত উপাসনায় অঞ্জলি হইবে শেষ স্তবকের সময়ে। সমবেত উপাসনায় লোক-সমাগম অধিক হইলে প্রত্যেকে স্তোত্র-পাঠান্তে শান্তিপাঠ করিয়া অপেক্ষা করিবে, সংগ্রাহকেরা অঞ্জলির ফুল সাজিতে করিয়া সংগ্রহ করিয়া নিয়া প্রণতঃ হইয়া বিগ্রহে অর্পণ করিবে।

দৈনিক চারিবারের ব্যক্তিগত উপাসনায় মাত্র একবারের উপাসনাতেই অঞ্জলি বিধেয়, প্রত্যেকবারের উপাসনাতে নহে।

কোনও অবস্থাতেই বিগ্রহের গায়ে পুষ্পাদি ছুঁড়িয়া মারা হইবে না।

ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২৪)

শ্রীগৌরী (কাছাড়)

হরি-ওঁ

২৫শে মাঘ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াম্ :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সংসারে চতুর্দিকে কেবল জ্বালা, কেবল দুঃখ। তাই বলিয়া সংসার ছাড়িয়া যাইবে কোথায়? যেখানে যাইবে, সেইখানেই সংসার। যতক্ষণ শরীর আছে, ততক্ষণ জ্বালার হাত হইতে রক্ষা নাই। তাই এই জ্বালাকে পদানত করিবার জন্ত চাই অসীম ধৈর্য্য আর অতুল ভগবদ্বিশ্বাস। তুমি সেই পথ ধর মা। যাহাদিগকে জ্বালার কারণ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহারা প্রকৃত কারণ নহে। তাহারা উপলক্ষ্য মাত্র। জ্বালার কারণ তোমার আসক্তি, অপর কারণ তোমার ঈশ্বরানুগত্যের অভাব। ঈশ্বরপরায়ণতা—

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১২৯

তাই তোমাকে জ্বালার হাত হইতে রক্ষা করিবে। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২৫)

শ্রীগৌরী (কাছাড়)

হরি-ওঁ

২৫শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। আমি এবং সাধনা এইবারকার ভ্রমণে অনেক স্থানেই গিয়াছি এবং স্থানীয় ছাত্রসমাজের অবস্থা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি। কাটিগড়ার ছাত্রদের সহযোগবুদ্ধি, সেবাপরায়ণতা, আত্মোন্নতির ইচ্ছা, সম্ভবদত্ততা এবং শ্রমে অকাতরতা যদি স্বচক্ষে দেখিয়া না আসিতাম, তাহা হইলে তুলনায় বুঝিতে পারিতাম না যে, অগ্রাগ্র স্থানের ছাত্র-সমাজ নৈতিক মানে ইহাদের অপেক্ষা কত নীচে রহিয়াছে। কাটিগড়ার ছাত্রগকে উচ্চ-প্রেরণা, আদর্শবাদিতা এবং সংকল্পে রুচি প্রদান করিয়া তোমরা শিক্ষকেরা যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছ, কেননা কেবল বি-এল-এ ব্রে আর সি-এল এ ক্রে পড়াইতে পারিলেই কেহ শিক্ষক হয় না। ছাত্রদের ভাবী জীবনের নৈতিক ভিত্তি শক্ত করিয়া গড়িয়া দেওয়াও শিক্ষকদের কর্তব্য। কাটিগড়ার ছাত্ররা অতিশয় ভাগ্যবান যে তোমাদের মত কয়েকজন শিক্ষক তাহারা পাইয়াছে। এই সুযোগে আমি কাটিগড়া হাইস্কুলের প্রতিটি শিক্ষককেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৩০

তোমরা ছাত্রদিগকে যে আদর্শ দেখাইয়াছ, তাহাতে বাহাতে তাহারা
অবিচলিত থাকে, সেই দিকে প্রথম দৃষ্টি দিও। একটা ছাত্রকেও তোমরা
বিপথে চলিতে দিও না। একটা তরুণ কিশোরকেও তোমরা জীবনের
মূল্য সম্পর্কে খেলো ধারণা রাখিতে দিও না। প্রত্যেকে হউক বীর্ষ্য-
বরীয়ান্ ওর্দ্ধবৃত্তেজ্ঞা অমিতশক্তিশালী যোদ্ধা, যাহারা জীবন-সংগ্রামে
বিপরীত ও প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রেই অস্ত্র ফেলিয়া ভীক
ফেরুপালের ত্রায় পলায়ন করে না। ইতি

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২৬)

-হরি-ওঁ

শ্রীগৌরী (কাছাড়)

২৫শে মাঘ, ১৩৬৫

-কল্যাণীয়েষু :-

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের দেশ আত্মের দেশ। আত্ম ফলসই তোমাদের দেশের
ধান, গম, পাট, যব। ইহাই তোমাদের অধিকাংশের জীবনোপায়,
কাহারও কাহারও বা বিপুল সম্পদের মূল। সেই আত্ম ফলে লৈষ্ঠ
মাসে। তাই বলিয়া কি কান্তিক মাস হইতেই গাছের গোড়ায় নানা
রূপ যন্ত্র-তন্ত্রের সুরূ হয় না?

সংগঠন-কার্য্যকে জানিবে তজ্জপ। দুই বৎসর পরে যেই
ঘটনাটি ঘটিবে, তাহার জন্ম দুই বৎসর পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইতে থাকার
নাম হইতেছে সংগঠন। চারিদিকের যতগুলি উপাদান ও উপকরণ
সংযুক্ত হইয়া হইয়া নির্দিষ্ট একটা ঘটনাকে করিবে জন্মদান ও সাফল্য-

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেয়া

প্রতিধ্বনি

১৩১

মণ্ডিত, তাহাদের প্রত্যেকটার সহিত দুই বৎসর পূর্ব হইতেই অন্তরের আশ্রয়িতা স্থাপনের নাম সংগঠন। দূরবীণের সাহায্যে বহু দূরবন্দী শত্রুচমূকে দেখিয়া যাইয়া তাহাদের অবলম্বনীয় সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সকল রকমের চাল সম্পর্কে সাবধান হইয়া নিজেদের সৈন্যদলকে ধীরে ধীরেই অতিশয় সন্তুপিত পদক্ষেপে, সকলের অজ্ঞাতসারে বাহবদ্ধ করিয়া যাওয়ার নাম সংগঠন। এই সংগঠনে তোমরা এখনই ব্রতী হইয়া যাও।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া একই কর্ম-তালিকা লইয়া আমি একই কর্মক্ষেত্রে কাজ করিয়া যাইতেছি। ইহার মধ্যে আমি বাধা পাইয়াছি সহস্র স্থান হইতে সহস্র বার, কিন্তু কর্মতালিকায় পরিবর্তন-সাধন করি নাই। কর্মক্ষেত্র দিনের পর দিন বিস্তৃততর হইয়াছে পরিবর্তনের মধ্যে মাত্র এইটুকুই, নতুবা অত্র পরিবর্তন কিছুই হয় নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ভিক্ষাবৃত্তির উপাসক মঠ ও আশ্রমধারীরা আমার রচিত পুস্তক বিনামূল্যে চাহিয়া নিয়া নিজেদের পাঠাগারের আলমিরার শূণ্যতা পূরণ করিয়াছেন, আবার দুই দিন পরে তাহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ এই পুস্তকগুলিকে অপাঠ্য ও কদর্য বলিয়া গালি দিয়া ছাত্রাবাসে প্রতিপালিত এক পাল ছাত্রের সম্মুখে প্রকাশ্য ভাবে আশ্রমঙ্গনে অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়াছেন। জীর্ষ্যার আমি অনেক রকমের খেলা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। গৈরিকের অন্তরালে কত প্রকারের যে ভেদ-বিসম্বাদের বুদ্ধি লুকাইয়া থাকিতে পারে, তাহার এক একটা নমুনা আমি এক একটা সহরে এক প্রকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, গোহাটা, ডিগবয়, বদরপুর, লামডিং, গোলাঘাট, নগাঁও, এমনকি খাস পুপুনকী পর্য্যন্ত গৈরিকে আচ্ছাদিত অপ্রশংসনীয় মনোবৃত্তি নানা ভাবে নানা অণুচেষ্টা করিয়াছে। কাহারো জেদ এই যে, তাহার ভাগ্যক্রমে যেই অবতারের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন,

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেয়া

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

১৩২

তঁাহাকেই সৃষ্টির শেষ মহিমা বলিয়া মানিতে হইবে, তঁাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করিলেই যথেষ্ট হইবে না, তঁাহার সম্পর্কে মোনাবলম্বন করিয়া চলিলেও হইবে না। কাহারও আতঙ্ক এই যে, একজন বা একদল লোক যদি অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জনসমাজের সেবার চেষ্টায় অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ভিক্ষায় নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানগুলির যদি চাঁদা আদায় ব্যাহত হয়? কাহারো মনোগতি নিছক জীষায় রুগ্ন, তঁাহারা নিজেদের জ্ঞাত অথকাহারো প্রতিষ্ঠা সহ করিতে পারেন না। কিন্তু পারিয়াছে কি এই সকল অপচেষ্টা আমার দুর্ব্বীর গতিকে দাবাইয়া রাখিতে? আমি অসীম প্রতিভাধর, অলৌকিক গুণমণ্ডিত কোনও অসামান্য মহাপুরুষ নহি। আমি একটী সাধারণ মানুষ। কিন্তু আমি সত্য ও পবিত্রতায় বিশ্বাস করি, আমি প্রেমের অনুপম ক্ষমতায় আস্থা রাখি, আর আমি জানি অনেক দিনের পরের একটী ঘটনা ঘটাইবার জন্ত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আস্তে আস্তে সংগঠন চালাইয়া যাইতে। কে না স্বীকার করিবে যে, ভিক্ষা সংগ্রহে বিধ্বাসীদের পক্ষেও রহিমপুর বা ডিক্রগড়ের অনুষ্ঠান একটা আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় ঘটনা, কে না জানে যে, এই দুই অনুষ্ঠানকে পণ্ড করিবার জন্ত সক্ষীর্ণতাবাদীদের সর্ব্বশক্তি সম্ভববদ্ধভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল? কিন্তু তিলে তিলে সংগঠন করিয়া যাওয়ার ফলে কল্পনাতীত বাধার মধ্য দিয়াও এই দুইটী অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করিয়াছিল। তোমরা সংগঠনে বিশ্বাসী হও এবং তজ্জন্ত আগে সংগঠন কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে যত্নশীল হও।

একদিকে চালাও সংগঠন, অত্ৰদিকে নিজেরা প্রাণপণে সাধন কর। সাধন-বল-সম্পন্ন ব্যক্তিদের চেষ্টাই সহজে সফল হয়। সাধন করিলে সহজাত সংস্কারের দ্বারা অন্তরে প্রেমের জন্ম হয়, আর সাধনেরই ফলে

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধ্বং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

১৩৩

তাহা ফুলকমলের ছায় দিকে দিকে পাপড়ী মেলিয়া প্রসন্ন নয়নে
নিখিল বিশ্বের পানে তাকায়। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২৭)

হরি-ওঁ

শ্রীগৌরী (কাছাড়)

২৫শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াস্তু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ২ই কান্তিকের পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।
অনবসরহেতু এতদিন খামখানা খুলিতেই পারি নাই। এই সাড়ে
তিন মাস পত্রখানা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল। আমি ত মা প্রাণপণ
চেষ্টা করি প্রত্যহ বত অধিক-সংখ্যক সম্ভব পত্র ডাকে দিতে। কিন্তু
আশ্রমে অবস্থান-কালে অবিরাম দর্শনার্থীর ভিড়ে সময় করিতে পারি
না। যদিও কড়া হুকুম দেওয়া আছে যে, রবিবার ছাড়া কেহ দেখা
করিতে আসিবে না, তবু সেই নির্দেশ অপালনের দ্বারাই যেন লোকেরা
ভক্তির পরিচয় দিতে চাহে। শৃঙ্খলাজ্ঞান এ দেশের লোকের ধাতের
মধ্যেই নাই। ভ্রমণ-কালে যাহাতে ভাষণস্থান ও স্থিতিস্থান অত্যন্ত
কাছাকাছি হয়, তার জন্ত হাজার বার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও এবার
ভ্রমণে আসিয়া দেখিলাম যেন সকলে জিদ করিয়াই এই দুই স্থানের
মধ্যে দূরত্ব রক্ষা করিয়া সকল ব্যবস্থা করিয়াছে। কত পথ ঘুরিয়া
এক এক স্থানে আসিতেছি। আসিয়াই দেখিতেছি যে, বহু লোককে
খুশী করিবার জন্ত বহু কার্যের তালিকা বহু স্থানে হইয়াছে। সব কার্য

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেমা

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৩৪

এক স্থানে করিলে কত অল্প সময়ে কত অধিক কার্য্য করিতে পারিতাম। ইহারা স্থানীয় দুই একজন লোককে খুশী করিবার জন্ত এমন ভাবে সব কাজের স্থান নিরূপণ করিয়াছে যে, আমাদের শরীরের উপর দিয়া দস্তুরমতন অত্যাচার হইতেছে। লক্ষ্য করিতেছি, প্রায় কেহই প্রকৃত কাজ চাহে না, প্রায় সকলেই সাময়িক প্রতিপত্তি রক্ষাকেই বড় কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। তাই মা পত্র লিখিবার পর্য্যন্ত অবসর পাই না। এক এক স্থানে নিদারুণ জিদ করিয়া শেষ-রাত্রি দুইটা আড়াইটার সময়ে বসিয়া পত্র লেখা আরম্ভ করি। অসময়ে অতিরিক্ত শ্রম করিয়া ক্লান্ত শরীর পীড়াগ্রস্ত হইতেছে। এই সকল কারণে কত কত জরুরী পত্রের জবাব দিয়া উঠিতে পারি না। তোমরা এজন্ত দুঃখিতা হইও না মা।

তোমাদের ওখানে শারদীয় অখণ্ড-উৎসবে তিনদিন ধরিয়া সমবেত উপাসনা করিলে আর তোমার দীক্ষিত গুরুভ্রাতাদের মধ্যে সপ্তমী দিন দুই জন, অষ্টমী দিন আট জন আর নবমী দিন বারো জন মাত্র উপস্থিত হইলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য সংবাদ। সংখ্যায় ত তোমরা ঐ ক্ষুদ্র রেলষ্টেশানটীতে কমপক্ষে বাষটি জন আছ বলিয়া জানি। ইহারা এমন সফল বিশেষ উপাসনায় তোমাদের এই সর্ব্বজনীন মিলনক্ষেত্রে যোগ দিতে আসিল না, ইহার হেতু কি? বাষটি জন লোকের কাছ হইতে উৎসবানুষ্ঠানের জন্ত মাত্র পনের টাকা সহায়তা পাইলে আর বাকী সমস্ত ব্যয় তোমাদের দারিদ্র্য্য সত্ত্বেও নিজেদের স্বক্কে বহন করিয়া এমন ব্যাপার করিলে যে, হাজার দেড় হাজার লোক মহানন্দে কীৰ্ত্তন করিলেন, প্রসাদ নিলেন, ইহার মধ্যে তোমাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব অশেষ কিন্তু কেন তোমার গুরুভ্রাতারা এমন অনুষ্ঠানে নিজেদের প্রাণের পরিচয় দিতে পারিলেন না? তোমাদের ওখানে ত অত্যন্ত

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধৃত-প্রেরণা

প্রতিধ্বনি

LIBRARY

১৩৫

স্থানের স্থায় দলাদলি নাই, কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব নিয়া স্বগড়ী-কৌন্দিল নাই।
 তবে ইহা হইল কেন? তোমরা ইহা ভাবিয়া দেখ। আমি বারংবার
 তোমাদের বলিয়া আসিতেছি যে, তোমরা লোককে দীক্ষাগৃহে প্রবেশ
 করিতে উৎসাহিত করিও না। আমি বারংবার বলিয়াছি যে, নব
 নব গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী সংগ্রহের জন্ত তোমরা কোনও চেষ্টা করিও
 না। তোমরা কি নিজেদের আচরণে তাহার ব্যত্যয় ঘটাইতেছ?
 তোমরা কি লোককে হুজুগাকৃষ্ট হইয়া দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিতে
 প্রণোদনা দিতেছ? তোমাদের কোনও অসতর্ক আচরণের ফলে কি
 কতকগুলি অযোগ্য ও অপাত্র নরনারী গিয়া দীক্ষা নিয়া আসিয়া আমার
 বাড়াইতেছে কেবল দুশ্চিন্তার ভার? দীক্ষা নিবে অথচ সমবেত
 উপাসনায় আসিবে না, ইহা কেন হইবে? গুরুর আদেশই যদি পালন
 করিবে না, তবে দীক্ষা নিতে আসা কেন? ডিক্রগড়, তিনমুকিয়া
 আদি স্থানে যখন বিশেষ বিশেষ সংঘ বা মঠের শিষ্যরা নবদীক্ষার্থীদের
 কাণে কাণে গিয়া অপপ্রচার করিয়া বলিয়াছিল, “নিও না স্বরূপনানন্দের
 কাছে দীক্ষা” তখন সেই সকল প্রচ্ছন্নচারী ভদ্রলোকদিগকে আমি
 আমার পরম বান্ধব বলিয়া গণনা করিয়াছিলাম। কারণ, তাঁহাদের
 চেষ্টার ফলে বাজে লোকগুলির আসা নিবারণ হইবে। কিন্তু এখন
 দেখিতেছি যে, বিভিন্ন ধর্মসমাজের লোকদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার
 সেই উপকারটুকু সাধিত হয় নাই। এত ঘটনা ঘটিবার পরেও দীক্ষা-
 গৃহ বাজে জঞ্জালপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সময় আসিয়াছে, যেই সময়ে
 সমবেত-উপাসনায় অনাস্থাকারী বাজে জঞ্জালগুলিকে আমি আমার
 সম্মান বলিয়া স্বীকার করিতে বিরত হইব। একটা বিশেষ
 উপাসনাতেও বাষটি জন পরমার্থ-ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে তোমাদের
 পরিবারস্থ চারিজন বাদে মাত্র দুইটা প্রাণীর যোগদান সম্ভব হইল, ইহা

প্রতিধ্বনি

ধ্বংস প্রোয়া

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১০৬

ভাবিবার পরে চিত্ত-প্রসন্নতার করুণাময়ী ভাগীরথী শুকাইয়া গিয়া কঠিন নিষ্করণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়া যায়। এখন হইতে তোমাদের আরও সাবধান হওয়া প্রয়োজন। দীক্ষা নিতে কেহ আসিলে হর্ষিত না হইয়া আতঙ্কিত হওয়া উচিত। গুরুবাক্য পালনে যাহাদের আগ্রহ নাই, অপালনেই যাহাদের চূড়ান্ত কৃতিত্ব, কেন তাহারা দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিবে? কে চাহে জগজ্জোড়া সকল লোককে নিজের শিষ্য করিতে? আমি তাহা চাহি না।

তোমরা স্বামি-স্বামীতে মিলিয়া এই বৎসর চাতুর্দশী ব্রতপালন করিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। বৎসরে চারিটি মাস কঠোর নিয়ম ও ব্রতের মধ্যে থাকা অত্যন্ত শুভপ্রদ। নিরামিষ ভোজন ও সংযমব্রত পালন দ্বারা তোমরা চাতুর্দশী পালন করিয়াছ। ইহার ভিতরে যদি আত্মপ্রচারজনক কোনও ভ্রম প্রবেশ না করে, তবে ইহার মত কুশল আর কিছুতেই নাই। এক-এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বৎসরের এক-একটি সময় চাতুর্দশী ব্রতের পক্ষে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বর্ষার সময়ে ইহা করিতেন এবং অন্নভক্ষণের জন্ত তাঁহারা এই সময়ে পাহাড় পর্বত হইতে সমতলে নামিয়া আসিতেন। বৈষ্ণবগণ এক-একটি নির্দিষ্ট বৈষ্ণব পর্ব হইতে ধরিয়া অপর এক-একটি বৈষ্ণব পর্ব পর্যন্ত চারিমাস কাল সাধারণতঃ এই ব্রত যাপন করিয়া থাকেন। তোমাদের পক্ষে এই চাতুর্দশী শারদীয়া বোধন-বস্তু হইতে শুরু করিয়া পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত পালনীয় হইতে পারে। কোনও বৎসর শারদীয়া বস্তু আশ্বিনে পড়ে, কোনও বৎসর কার্তিকেও পড়ে। সুতরাং এই চাতুর্দশী কোনও বৎসর সাড়ে তিনমাস, কোনও বৎসর ততোধিক কাল জুড়িয়া হইবে। এই স্থলে “চাতুর্দশী” কথাটিকে ঠিক চারিমাস না ধরিয়া যোগরূঢ় শব্দ-রূপে গ্রহণ করিও।

শ্রীমন্ত, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম

প্রতিধ্বনি

১৩৭

সংসম-ব্রত এক মহাব্রত। ইহা একদিন পালন করিলেও তাহার সুফল অবশ্যস্বতী। এক সপ্তাহ পালনে তাহার ফল কতকটা প্রত্যক্ষই করা যায়। তোমরা যদি প্রত্যেকটা দম্পতী ব্রতাবদ্ধ হইয়া এই নিয়মে চল যে, শারদীয়া বস্তু হইতে পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত একটা শরীরও ভোগার্থে ব্যবহৃত হইবে না, তাহা হইলে সকলের সম্মিলিত সাধনা মিলিয়া এমন একটা অভাবনীয় আবেষ্টন সমগ্র দেশটা জুড়িয়া সৃষ্টি করিবে, বাহার দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইবার জ্ঞাত প্রাচীন যুগের মহামহর্ষিরা স্বপ্নদেহ ছাড়িয়া স্থূল দেহেই এই ভারতভূমিতে পুনরায় ভ্রমণ করিয়া যাইতে প্রলুব্ধ হইবেন।

তুমি অপর সময়েও যেই সকল ব্যক্তিগত নিয়ম পালন করিয়া চলিয়াছ, তাহা তোমার ও তোমার পরিবারস্থ সকলের মহৎ কুশল সম্পাদন করিবে। কেবল সাধন করিয়া যাও। সাধন করিতে করিতে অন্তরে দিব্য-প্রেমের জাগরণ হইবে, প্রত্যেকটা জীবে শিবদর্শন ঘটিবে। আমি কেবলই এই আশীর্বাদ তোমাদিগকে করিতে চাহি যে, তোমাদের যেন গুরুদত্ত সাধনে শিথিলতা না আসে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১২ই ফাল্গুন ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এই কয়টা দিন শরীরের উপর দিয়া একটা বড় বহিয়া গিয়াছে।

পনের দিন অসুস্থ হইয়াছিলাম যে, শরীর আর এত অনিয়ম

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম।

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৩৮

সহ করিতে পারিবে না। শ্রীগৌরীতে পীড়া আত্মপ্রকাশ করিল, বদরপুরে শ্বাসকষ্ট শুরু হইল, মাইবংএ অর্দ্ধমৃতের মত কাজ করিয়া আসিলাম, শিলচরে পৌছিয়া শরীর একেবারে সর্বকর্মের অযোগ্য হইয়া পড়িল। এই কয়দিন লেখনী ধরিবারও সাহস পাই নাই। অগ্র লিখিতে বসিয়াও লেখনী ছাড়িয়া দিলাম। অত্বে দিয়া পত্র লিখাইতে হইতেছে।

কিন্তু কেন শরীরের এই অপটুতা? কারণটা তোমাদের জানিয়া রাখা উচিত। দেশ-দেশান্তরে ছুটাছুটি করিয়া যাঁহারা কাজ করিবেন, তাঁহাদের কাছ হইতে পুরা কাজ আদায় করিতে হইলে স্থানীয় জনসাধারণের এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, তাঁহারা যেন বৃথা সময়ের অপচয় করিতে বাধ্য না হন, তাঁহারা যেন সকলগুলি কাজ শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া করিতে পারেন। স্থানীয় কর্তব্যগুলি ছাড়াও তাঁহাদের অগ্রাগ্র অনেক শ্রমপূর্ণ কাজ যে থাকা সম্ভব, এই বিষয়ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। স্থানীয় অব্যবস্থার ফলে আমরা অগ্রা করণীয় কর্তব্য রাত্রি জাগিয়া করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু রক্তমাংসের শরীর প্রতিদিন এ ভাবের অভিনয় কেন সহিতে সক্ষম হইবে?

(১৫ই ফাল্গুন)

তোমাদের অঞ্চলে ত কয়েক মাস পরে আসিতেছি। উপরিলিখিত কথাগুলি তোমরা মনে রাখিবে ত? সময়ের বড় দাম। কর্মস্থান হইতে স্থিতিস্থানে আধ স্থিতিস্থান হইতে কর্মস্থানে সারাদিনে বারংবার যাতায়াত করিতেই যদি সময় নষ্ট হইয়া যায়, তবে তোমাদের জ্ঞাত কাজটুকু করিব কখন? হাজার টানাটানি করিয়াও ত চার্বশ ঘণ্টার দিনটাকে পঁচিশ ঘণ্টা লম্বা করা যায় না। কাজের সমষ্টটুকু

বৈশাখ, ১৩৬৭]

বৃত্তং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

১০৯

ওর বাড়ী তার বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করিয়া নষ্ট করার ভিতরে সার্থকতা কি রহিয়াছে? কেন তোমরা সময়কে অপচয়িত হইতে দিবে? অল্প সময়ে অধিক কাজ করিবার দিকে কেন তোমাদের লক্ষ্য থাকিবে না? কেন তোমরা সাময়িক হুজুগকে স্থায়ী কাজের অপেক্ষা অধিক কোলীণ দিবে? কেন তোমরা আমাদের ছায় নিরন্তর কণ্ঠ্যদিগকে অবান্তর শ্রমে বাধ্য করিবে? এই কথাগুলি তোমাদের ভাবিতে হইবে।

পাশের গ্রামের বিদ্যালয়ের চাকুরী তোমাকে ছাড়িয়া দিতে হইল জানিয়া ব্যথিত হইলাম। সত্যিকারের সেবার এরূপ অমর্যাদা বড়ই বেদনাদায়ক। তোমার সাত মাসের বেতন ডুবিয়া গেল, ইহা দুঃখদ সংবাদ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখজনক সংবাদ এই যে, বিদ্যালয়-পরিচালক-মণ্ডলীর ভৈরবী-চক্র একজন সত্যিকারের সেবককে নির্দাসন দিল। নামমাত্র কিছু বেতন নিলেও তুমি প্রকৃত প্রস্তাবে করিয়া আসিতেছ, জনসেবা। ছাত্রদের মধ্যে তুমি তোমার গুরুদেবকে দর্শন করিতেছিলে। তাহাদের মধ্য দিয়া তুমি তোমার গুরুসেবা চালাই-তেছিলে। তবে এজন্ত মৰ্ম্মাহত হইও না। সত্যিকারের সেবা কখনও ব্যর্থ হয় না। তাহার পরিমাণ যদি এক কণাও হয়, তবু তাহা হীরক-সুল্যে যাচাই হইবে। তোমার মাহিনার টাকা ডুবিয়া গেলেও তোমার জনসেবাপ্রাণতা ডুবিয়া যাইবে না। দেখিও, একদিন না একদিন তাহার স্বীকৃতি আসিবে। মন হইতে সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া দাও।

তোমাদের ওখানে আশ্রম স্থাপনের জন্ত তিন একর চৌদ্দশতক জমি পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু এই প্রসঙ্গে অনেক গুলি কথা মনে রাখিবার মত রহিয়াছে। কতকটা জমি পাইলেই আশ্রম করা করা যায় না। আশ্রম গড়িবার জন্ত মানুষ চাই। শুধু জমিটাই আশ্রম নহে, তাহার ঘর-বাড়ী, কুশি-ক্ষেত্র, গোশালা, বিদ্যালয় বা মন্দির-

ও আশ্রম নহে। আশ্রম মানুষের শুদ্ধ চিত্ত। তোমরা প্রত্যেকে শুদ্ধচিত্ত হইতে চেষ্টা কর।

বিগত ৮ই ফাল্গুন শুক্রবার প্রাতে সাড়ে নয়টায় স্থানান্তরে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা আমাকে পঞ্চম বা ষষ্ঠবার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল যে, কাহারও দান-করা ভূমির উপরে আশ্রম করা যে, কত অসঙ্গত। তিন চারি একর জমি তোমরা চেষ্টা করিলে যে কোন স্থানে সঙ্গত মূল্যে কিনিয়া নিতে পার। নবকীর্ত্ত ভূমিতে একমাত্র আশ্রমীয় কার্য্য ব্যতীত অগ্রা কিছু হইবে না, এই সংকল্প নিয়া তোমরা যদি দশ বিশ জন কর্ম্মী অর্থের বিনিময়ে গ্রামের পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, রাস্তাঘাট মেরামতি এবং লোকের গৃহাদি নিৰ্ম্মাণের কাজে পরিশ্রম কর, তাহা হইলে তিন চারি একর জমি কিনিবার মতন টাকা তোমাদের হাতে অনায়াসেই আসিতে পারে। তার পরে যদি কার্য্যারম্ভ কর, তখন দেখিবে, হুইটী সুলক্ষণ গোড়া হইতেই আত্মপ্রকাশ, করিয়াছে। একটা সুলক্ষণ এই যে, তোমাদের কার্য্যে অগ্রা হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ দানাভিমানী অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদের এক কণাও থাকিবে না। দ্বিতীয়টি এই যে, কার্য্যারম্ভেই তোমাদের স্বাবলম্বন লোকমনে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবে। অশুদ্ধ-চেতা, অবিশ্বাসী, অভিসন্ধি-পরায়ণ দাতার দান গ্রহণ করিলে ওজ্জ্বল যাবজ্জীবন মনঃকষ্ট পাইতে হয় এবং সেই দানকে বমন করিয়া ফেলিয়া দিতে না পারা পর্য্যন্ত প্রাণে শান্তি আসে না। দাতাদের কেহ কিম্বা দাতৃবংশের কেহ যদি কোনও অগ্রায় বা অবৈধ-আচরণের দ্বারা তোমাদের নিঃস্বার্থ জনসেবা-প্রচেষ্টাকে অসম্মানও করে, তথাপি দান গ্রহণ করিয়া নিজেকে ছোট করিয়া দিয়াছ বলিয়া সমরোচিত উপস্থিতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে তোমাদের মনে নৈতিক কুণ্ঠা জাগিবে। সুতরাং কেহ এক খণ্ড ভূমি দিবেন

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেমা

প্রতিধ্বনি

১৪১

বা কেহ একখানা দালান তুলিয়া দিবেন, এই সংবাদে উৎফুল্ল না হইয়া বরঞ্চ স্তব্ধ হওয়া উচিত। দাতৃদ্বয়ের অহমিকা লইয়া যাহারা দান করে, তাহারা অতি অল্পমূল্যের ক্ষুদ্র দান করিয়াও অতি বৃহৎ প্রতিদান প্রত্যাশা করে। কতজন কত উদ্দেশ্যে দান করে, তাহার খবর কে রাখিবে? সেই উদ্দেশ্যকে চিনিতে না পারিলে দানকে চেনাও কঠিন। আর দানকে চিনিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখ মনস্তাপ, অন্তজ্বালা ও অশান্তি অবশ্যস্তাবী। ভূমি-খণ্ড পাইতেছ, আশ্রম করার পক্ষে ইহাই খুব বড় কথা নহে। এই ভূমি খণ্ডের বাহা মূল্য, তাহার শতগুণ অর্থ গৃহ-নির্মাণে আবশ্যক হইতে পারে, তাহার হাজার গুণ অর্থ এই ভূমির উন্নয়নে তোমাকে ব্যয় করিতে হইতে পারে, তাহার লক্ষগুণ অর্থ প্রতিষ্ঠানটিকে ধারাবাহিক ভাবে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া লোক-কল্যাণের পথে পরিচালনা করিবার কাজে আবশ্যক হইতে পারে। অর্থই ভূমি স্বকীয় শ্রমবলে সংগ্রহ করিয়াছ কিন্তু অতি সস্তা দামের কতটুকু ভূমি গোড়াতে দাতার কাছ হইতে দানরূপে লইয়াছিলে বলিয়া তোমার সমস্ত শ্রম, আয়, কৃতিত্ব ও স্বাধীনতা সেই একটি মাত্র ক্ষুদ্র-হৃদয় দাতার এবং তাহার বংশধরদের নিকটে বন্ধক রাখিতে হইবে। সুতরাং আমার মত এই যে, যদি দান গ্রহণ না করিয়া ভূমি সংগ্রহ করিতে পার, তাহা হইলেই তোমাদের পক্ষে উত্তম হইবে। এক কণা ভূমির বাহা দাম, ভূমির এক দশমাংশে একখানা বিতল গৃহনির্মাণ করিতে তাহার দশ, বিশ বা পঞ্চাশ গুণ অর্থ প্রয়োজন হইতে পারে।

আশ্রমের জন্ত মানুষই আগেকার কথা। মানুষ মিলিলে আশ্রম

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেমা

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৪২

গড়িতে কতক্ষণ? তোমরা প্রত্যেকে মানুষ হইবার সাধনায় লাগিয়া যাও। যে কয়জনে দীক্ষা পাইয়াছ, তাহারা নিজ নিজ সাধনের প্রতি আগ্রহশীল হও। আমরা যে কৃত্রিম উপায়ে দলবৃদ্ধি চাহি না, এই কথাটা সর্বদা মনে রাখিও। তোমাদের ভিতরের শক্তি জাগ্রত হউক, তোমাদের সাধন-বল চতুর্দিকে প্রসারিত হউক। ইহার ফলে অকৃত্রিম সাংঘিক-বুদ্ধিসম্পন্ন সাধনেচ্ছু নরনারীরাই শুধু আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হউক। স্বার্থপর, কুচরিত্র, আত্মধর্ম্মাধেষী অসংযমী, অমিতাচারী, কদভ্যাসপরায়ণ, উদ্ধত ও দুর্বিনীত কতগুলি গোয়াড়-গোবিন্দ হুজুগে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া আমাদের শান্তির নীড়টির ভিতরে ঢুকিয়া ইহাকে নখে ছিঁড়িয়া, দশনে চর্কণ করিয়া বিপন্ন করিবার চেষ্টা না করে, তাহার দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিও। হাজার হাজার লোক কে চাহে? কিন্তু ভাবে, চরিত্রে, আদর্শে ও আচরণে ভারী ও দামী লোকগুলি যেন তোমাদের প্রচার-কার্যে উদ্বুদ্ধ হয়। তোমরা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিও। ধন থাকিলেই মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হয় না, বিদ্যা থাকিলেও না। এই সকল থাকুক বা না থাকুক, তবু, যাহা থাকিলে মানুষ প্রথমে হয় নরোত্তম, পরে হয় দেবোত্তম, তাহা থাকিলেই হইল। তাহার নাম প্রেম। প্রেম পঙ্কিলকে পবিত্র করে, দুর্বলকে সবল করে, অভিমানীকে বিনীত করে, দর্পিতকে সুশান্ত করে, দান্তিককে আত্মপরীক্ষণে নিয়োজিত করে, ক্রোধীকে ক্ষমাশীল করে। সেই প্রেমের দিকে তাকাইয়া পথ চলিও বাবা। ইতি—

আশীর্বাদক

অরূপানন্দ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেম

প্রতিধ্বনি

১৪৩

(৫২৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনীয়াস্তু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অত্যাণ্ড জেলাতেও এই পাপের কথা শুনিয়াছি এবং ইহাকে কঠোর হস্তে দমন করিয়াছি। ধর্মের নাম করিয়া নরনারীদিগকে ব্রহ্মদ্বার কক্ষে প্রবেশ করাইয়া হরিনামের দোহাই দিয়া নানা পাপাচরণ করার প্রতিবাদ করিয়া আমি ত্রিপুরা, নোয়াখালি আদি অঞ্চলে এক শ্রেণীর গোসাই প্রভুদের নিকটে আতঙ্কের পাত্র হইয়াছিলাম। কাছাড় জেলাতেও এই পাপ চলিতেছে এবং কৃষ্ণপ্রেমের নাম করিয়া নারীকে পরপুরুষ-সংসর্গে আর পুরুষকে পরনারী-সঙ্গমে প্ররোচিত করা হইতেছে, একথা কিছুদিন যাবৎ কাণে আসিতেছিল। তুমি তোমার মতিভ্রান্ত স্বামীটাকে নিয়া ভাস্করপারে আমার নিকট না আসিলে আমি ধারণাই করিতে পারিতাম না যে, এই পাপের প্ররোচনা এমন একজন গোসাই দিয়া যাইতেছেন, যিনি লোকের কাছে কৃষ্ণপ্রেমের কথা কহিয়া কান্দিয়া নান্দিয়া লোককে বশীভূত করিয়া ফেলেন এবং পরে পরিচয় দেন যে, তিনি আমারই এক ধর্মভ্রাতা। “দাদায় কইছুন” বলিয়া তিনি আমার প্রিয়জনদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া অনেককে নিজ নিজ দীক্ষামন্ত্র পর্য্যন্ত পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছেন। ইহাকে আমি কিছুই মনে করি নাই। কিন্তু তিনি তোমাদের ত্রায় সরলা সতী নারীদিগকে পরপুরুষ-সংসর্গে প্ররোচিত করিতেছেন, একথা তোমার মুখে শুনিবার পরে আমার বিশ্বাস হইয়াছে। এই সকল গোসাইদের সম্পর্কে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের খড়াহস্ত হওয়া

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৪৪

প্রয়োজন। তোমরা আর এই দুর্নীতি-প্রচারক, গোস্বামী নাম-
ধারণের অযোগ্য, কামুকতার পূজারীকে ক্রোধের পূজারী বলিয়া ভ্রম
করিও না। তোমরা ইহার সংস্পর্শ হইতে শত যোজন দূরে থাকিও।
এইরূপ অগ্রায় চূপ করিয়া সহ্য করিলে অধর্ম হয়। এইরূপ আচরণ-
কারীদিগকে কঠোর ভাবে শাসন করিলেই প্রকৃত ধর্ম হয়। তুমি
তোমার বুদ্ধি-বিলান্ত স্বামীকে আর এই অসৎ-সংসর্গে যাইতে দিও
না। স্বামীর চরিত্রের বলা শক্ত হাতে মা তোমাকেই টানিয়া ধরিতে
হইবে। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫০০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বর্তমান পরিস্থিতিতে তুমি খুব সাবধান হইয়া চলাফেরা করিও।
স্বার্থবুদ্ধি, ভ্রান্ত সম্মান-বোধ, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা এবং অন্তরের অগ্রাণু
জানিত অজানিত কালিমা মানুষকে দিয়া কি যে করাইতে পারে আর
কি যে না করাইতে পারে, তাহার ঠিকানা নাই। যাহারা তোমাдиগকে
অকল্পনীয় অসম্মান করিয়া বিনিময়ে তোমাদের কাছ হইতে একটা
তুচ্ছ প্রতিবাদ-বাক্য পর্য্যন্ত শোনে নাই, তাহারাও যে
আরও অনিষ্ট করিতে পারে না, এই কলিকলুষিত জগতে তাহা
ভাবিতে যাওয়া মূর্থতা। অসম্মানের বিনিময়ে কাহাকেও অসম্মান

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১৪৫

LIBRARY

দিও না, অনিষ্টের বিনিময়ে কাঁহারও অনিষ্ট করিও না কিন্তু অত্যাচার করিয়া বাহাদের অনুতাপ আনয়ন না, তাহাদের দ্বারা যে আরও অনেক অত্যাচার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এই ধারণাটাকে মন হইতে একেবারে মুছিয়া দিও না। অত্যাচারের প্রতিকার যে অত্যাচারের দ্বারা করিবে না, অত্যাচারের সংশোধন যে কামনা করিবে কেবল প্রেমের দ্বারা, তাহার পক্ষেও সতর্ক থাকা দোষ নহে, সাবধানতা পাপ নহে।

একদা আমার পিছনেও গুপ্তবাতক লাগান হইয়াছিল। দুইটি বৎসর কাল আমি ব্যাপারটার কিছুই জানিতে পারি নাই। অকারণে আমার সতর্ক থাকিবার ইচ্ছা হইত। অহেতুক সাবধানতার মধ্য দিয়া আমি দুইটি বৎসর কাটাইয়াছি। মনে হইত, কে যেন অস্ত্রহস্তে পিছনে পিছনে চলিয়াছে। পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া কিছুই দেখিতে পাইতাম না। অন্তর্যামী মন কেবল অজানিত এক বিপদের আশঙ্কা জাগাইয়া দিত। মন ছাড়া এই ব্যাপারের কোনও সাক্ষী ছিল না। একজন অভিন্নহৃদয় স্নহদের কাছে কথটি প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি দীর্ঘকাল গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন থাকিবার পরে বলিলেন, জগতে কিছুই অসম্ভব নহে, স্মরণ্য সাবধান থাকাই ভাল। সাবধান থাকিতেছি ভাবিয়াও আমি সাবধানই থাকিয়াছিলাম। কিন্তু একদিন অত্ৰ এক ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকৃত কথটি প্রকাশ পাইয়া গেল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সাবধান থাকার সত্যই প্রয়োজন ছিল।

আশ্রমে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল। আশ্রমে পাঁচ ছয় জন ব্রহ্মচারী গভীর রজনীতে গুরুতর ভাবে আহত হইল। একমাত্র আমি ছাড়া আশ্রমের আর একটা প্রাণীও অনাহত ছিল না। প্রত্যেককেই একবার করিয়া হাসপাতালে বাইতে হইল। তন্মধ্যে একজনকে সাত দিন, একজনকে তিন মাস হাসপাতালে কাটাইতে হইল। পুলিশ

আসিয়া ব্যাপার হাতে নিলেন, সরকার-পক্ষ মামলা পরিচালনা করিলেন। চারিজন আততায়ী আসামীরূপে অভিযুক্ত হইল এবং হাজত-বাস করিতে লাগিল। সেটা বৈশাখ মাস।

আমি বিচারালয়ে গিয়া আসামীদের ক্ষমা করিলাম। বলিলাম, মনুষ্য-মাত্রেই আমাদের ভ্রাতা, কেহ ভুল করিয়া কোনও অত্যাচার আমাদের উপর করিয়া থাকিলেও আমরা তাহার প্রতিশোধ চাহি না। প্রেম ও ক্ষমাই আমাদের ধর্ম। বিচারক আসামীদিগকে ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, আসামীরা যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা সাক্ষ্য-প্রমাণে চূড়ান্ত ভাবেই নির্দ্বারক হইয়াছে। আমার মাত্র রায় দিবার বাকী। এই অপরাধ কেবল আশ্রমের সাধুদের বিরুদ্ধেই নয়, রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে। গুরুতর ভাবে আহত হইয়াও আপনারা ক্ষমা করিতেছেন, ইহা আপনাদের পক্ষে শোভনীয়। আপনাদের ক্ষমা আসামীদিগকে গুরুতর শাস্তি হইতে বাঁচাইল কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাহার জন্ত কিছু শাসন আমি না করিয়া পারিব না।

বিচারক আসামীদিগের প্রত্যেককে তিনটি মাসের জেল দিলেন। তাহারা হাজারিবাগ জেলে স্থানান্তরিত হইল। আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, এই চারিটি উপার্জক ব্যক্তির অভাবে চারিটি পরিবার অনশনে দিন কাটাইতেছে। ঘরে প্রত্যেকের স্ত্রী, শিশু পুত্রকন্যা সব কাঁদিতেছে। আমার তখন আশ্রমের আয় আর কত? আশ্রমের সব ব্রহ্মচারীদের পেট ভরিয়া খাওয়াইবার মত আয় আমার নাই। পুস্তক-বিক্রয় দ্বারা কলিকাতা হইতে যাহা আসে, তাহা আমাদের কয়জনের গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষেও নিতান্তই অপরি্যাপ্ত। তবু এই চারিটি পরিবারকে বাঁচাইয়া রাখিবার দায়িত্ব নিলাম। অকারণে

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেরণ

প্রতিধ্বনি

১৪৭

কাজ সৃষ্টি করিলাম। বিনা কাজে অমনি অমনি চারিটা যুবতী নারীকে আমি অর্থ-সাহায্য করিতে পারি না। কেননা, তাহা করিলে একদিকে আলস্যের দেওয়া হইবে প্রশ্রয়, অতীতকে দুর্গামরটনেচ্ছু নিন্দকদিগকে কুখ্যাতি সৃষ্টি করিবার অবসর দেওয়া হইবে। নিশ্চয়োজনে প্রয়োজন সৃষ্টি করিলাম। আশ্রমে ইট কাটা, মাটি কাটা আরম্ভ করিলাম। জীলোক চারিটার প্রচুর অন্নের ব্যবস্থা হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে হাজারিবাগ জেলের অধ্যক্ষকে মাসে মাসে পত্র ও অর্থ পাঠাইতে লাগিলাম। লিখিলাম,—বেচারীরা মনের ভুলে অন্তায় করিয়া জেলে দুঃখ ভুগিতেছে, তাহাদের সাহায্যে মনের শান্তি হয়, সেই ভাবে যেন তাহাদের রুচিমত কাজে এই অর্থ ব্যয়িত হয়।

একদিন আমি জেলার সদর সহরে গিয়াছি। বেলা তখন দুইটা। দেখিলাম, মলিন-বেশধারী এই চারিটা ব্যক্তি পথ চলিতেছে। ডাকিয়া কাছে আনিলাম। শুনিলাম, তাহাদিগকে সদর সহর পর্যন্ত আসিবার রেল ভাড়া মাত্র দিয়া জেল হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। সারাদিন খায় নাই। এখন চৌত্রিশ মাইল পথ পায়ে হাটিয়া স্বগ্রামে যাইবে। আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মিঠাইর দোকানে বসাইয়া চারিজনকে পেট ভরিয়া লুচি, হালুয়া, তরকারী খাওয়াইলাম। মোটর-বাসের ভাড়া দিয়া দিলাম। আর বলিলাম, তোদের শিশুরা জানে না যে, তোরা জেলে ছিলি। তোদের ধারণা, তোরা বিদেশে চাকরি করিতে গিয়াছিলি। বাড়ীতে পৌছা মাত্র তাহারা হয়ত মিঠাই মণ্ডা প্রত্যাশা করিবে। শিশুদের জ্ঞান কি নিয়া যাইবি বল! তাহারা ক্ষুব্ধ ভাবে হইলেও জিলাপী পছন্দ করিল। আমার উপর তাহাদের রাগ কমে নাই, ইহা বুঝিয়াও প্রতিজনকে সোয়া সের করিয়া জিলাপী কিনিয়া

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরা

[চম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৪৮

নিজে গিয়া তাহাদিগকে বাসে উঠাইয়া দিয়া আসিলাম। হাতের টাকা এভাবে খরচ হইয়া যাওয়ায় আমার সেই জরুরী কাজগুলি আর হইল না, বাহার জন্ত আমি সদর সহরে আসিয়াছিলাম। পকেট নিঃশেষ হওয়াতে আমি নিজে চৌত্রিশ মাইল হাটিয়া আশ্রমে ফিরিলাম।

এদিকে শ্রীমানরা ঘরে পৌছিবার আগেই পথে বাহার সহিত দেখা হইয়াছে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহাদের স্ত্রীপুত্রেরা বাঁচিয়া আছে কিনা। সকলের কাছেই সন্তুস্তর পাইয়াছে, তবু আমাদের উপর মনের ঝাল তাহাদের কমে নাই। গৃহে পৌছিতেই পত্নীরা তাহাদের জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ব্যক্তি-চতুষ্টয় আশ্ফালন করিয়া বলিতে লাগিল, যার দরুণ তাহাদের এই দুর্দশা, সেই আমাকে তাহারা শীঘ্রই এই দুনিয়ার ঝকমারি হইতে চিরতরে রেহাই দিবে।

স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—বল কি! যাঁহার দয়ায় এই তিনটা মাস এক কণা অস্বাভাব অনুভব করি নাই, আবার তাঁহার অনিষ্ট করিবে?

এতক্ষণে ইহাদের ধারণা হইল, হাজারিবাগ জেলে যে মাসে মাসে টাকা পাঠান হইয়াছে, তাহা ত' তবে অভিনয় নয়। ইহাদের মন গলিল। ইহারা চিরতরে আশ্রমের বন্ধু হইল। ইহাদের মধ্যে একজন ত বলিতে গেলে একরূপ সাধুই হইয়া গেল। রামায়ণ গান শোনা আর রামনাম জপ করা তাহার জীবনের পরমাশ্রয় হইল।

তখন সর্বজন-সমক্ষে এই কথাটা ইহাদেরই সর্বকনিষ্ঠের মুখে প্রকাশ পাইল যে, দুইটা বৎসর ধরিয়া কোনও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির প্ররোচনায় এই ব্যক্তি নিয়ত টাক্সী হস্তে আমার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছে, যেন আমার মস্তকটিকে হুকুম হইতে বিচ্যুত করিয়া আমাকে দ্রুত

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেম

প্রতিধ্বনি

১৪৯

ভবপারে যাইবার সাহায্য করিতে পারে। প্রলোভন ছিল দশ বিঘা জমির।

এই ঘটনা এত সত্য যে, ইহা ঐ অঞ্চলের শত শত লোকে জানে। স্মরণ্য আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া তুমি আশ্রমে বাস করিবার কালে হঠাৎ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইও না যে, লোককে প্রেম করিয়াও সতর্ক থাকিবার প্রয়োজন আছে। প্রেম মানুষের জন্ত আত্মদানে প্রবৃত্ত করে, এজন্ত প্রেম স্বর্গীয়। সন্দেহ মানুষের প্রতি মনকে বিবাক্ত ও বিদ্বিষ্ট করে, এজন্ত সন্দেহ নারকীয়। কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ, সন্দেহ এবং বিরূপ ভাব পোষণ না করিয়াও সতর্ক থাকা যায়। সতর্কতা প্রেমের বিরোধী নহে। তুমি প্রেমিক হইলেও রাতে দুয়ার খোলা রাখিয়া ঘুমাইও না। তুমি প্রেমিক হইলেও বাক্সের তালা খোলা রাখিয়া বাহিরে চলিয়া যাইও না। তুমি প্রেমিক হইলেও না জানিয়া কাহাকেও হঠাৎ ধন, অন্ন বা বিত্ত দান করিও না। সতর্কতার সহিত কোনও পুণ্য কার্যেরই বিরোধ নাই। প্রেমের অনুশীলন কর, সকলকে ভালবাস, সকলের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা কর কিন্তু কেহ আচম্বিতে তোমার বা সমাজের কোনও অনিষ্ট সাধন না করিতে পারে, তদ্বিষয়েও সজাগ থাক। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০১)

হরিঃ

কলিকাতা

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা উপলক্ষে তোমরা তোমাদের এই ক্ষুদ্র গাহাড়ী

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

১৫০

রেল-স্টেশানটীতে উদয়াস্ত হরি-ওঁ কীর্তন করিতেছ জানিয়া অত্যন্ত স্মৃখী হইলাম। আরও স্মৃখী হইলাম এই সংবাদে যে, নিকটবর্তী নাগা বস্তীর এবং কাছাড়ী বস্তীর পাহাড়ী নরনারীরা আমন্ত্রিত হইয়াছে এবং তাহারা দলে দলে আসিবে। অজ্ঞানতাবশতঃ উহারা অপরিচ্ছন্ন থাকে। কতকটা পূর্বাভাস এবং দারিদ্র্য বশতঃও বটে। কিন্তু কেহ অপরিচ্ছন্ন, অজ্ঞান এবং অশিক্ষিত, এই যুক্তিতেই কাহাকেও হেয় জ্ঞান করা উচিত নহে। তাহার উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এমন কথাও কেহ বলিতে পারিবে না, মানুষকে বিচার করিও তাহার সম্ভাবনা দিয়া। খুঁজিয়া বাহির কর, কাহার নিকটে ভাবীকালে কি প্রত্যাশা করা যায়। গড়িয়া তুলিতে পারিলে যাহার নিকটে উন্নতি বা সমুজ্জ্বল প্রতিভার প্রত্যাশা আছে, তাহার পিছনে জোঁকের মতন আমাদিগকে লাগিয়া থাকিতে হইবে। এক দলা মাটি ছানিয়া হয়ত প্রতিমা হইবে। কাদা-মাটি সুন্দর নহে। কিন্তু প্রতিমার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। আর একদলা মাটি দিয়া হয়ত উৎকৃষ্ট ইষ্টক হইবে—যেই ইষ্টকের দ্বারা অভ্ৰভেদী গ্রাসাদ নির্মাণ সম্ভব। আর একদলা মাটি দগ্ধ করিলে হইবে স্ফটিক অথবা শুচিশূল কাচ, যেই কাচে পারদ ধরাইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের সকলের মুখের সম্মুখে দর্পণ হইয়া দাঁড়াইবে। যাহাদিগকে আমরা অবজ্ঞেয় মনে করি, তাহারা অবজ্ঞেয় নহে।

কিন্তু এই কথার প্রত্যয় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইবে কি করিয়া? প্রেম না থাকিলে কেবল বুদ্ধির বলে ইহা বুঝা যায় না। প্রেমিক মানুষ সাধারণ মানব-সন্তানের ভিতর দুইটা বিশেষত্ব বা চারিটা অলৌকিকত্ব দেখিয়া তাহাকে একেবারে ঈশ্বরের অবতার বানাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার পূজা করিয়াছে, তাহাকে অর্চনা করিয়া প্রাণভরা শান্তি কুড়াইয়াছে। ইহা প্রেমেরই শক্তি, অবতারের শক্তি নহে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেমা

প্রতিধ্বনি

১৫১

তোমাদের ভিতরে এমন প্রেমের শক্তি জাগুক, যাহার বলে ঐ লালং, রূপিনী, কুকি, ডিমাছা, নাগা, লুমাই প্রভৃতির মধ্যে শত শত ঈশ্বরাবতারের আবির্ভাব ঘটিতে পারে। তোমরা বিশ্বাস করিও, পরমেশ্বরের এই ক্ষমতা আছে যে, তিনি যে-কোন জীবের মধ্য দিয়া তাঁহার দিবা সত্তার অকল্পনীয় বিকাশ ঘটাইতে পারেন, তিনি বহুজন-পদবিদলিত তুচ্ছ তৃণখণ্ডকে ত্রিদিব-বাস্তিত করল-পাদপে পরিণত করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ যাহার করুণায় শক্তিমন্ত হইয়া ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু হইয়াছেন, তাঁহারই করুণায় তুমি কিম্বা আমি কিম্বা ঐ লালং, কুকি, নাগা কোটি অন্ধের দৃষ্টিদাতা, কোটি বন্ধের মুক্তি-দাতা, কোটি-অজ্ঞানের আত্মসম্বিতের পরিস্ফূরক ঈশ্বরাবতার হইতে পারে। মানুষের প্রেম আর পরমেশ্বরের রূপা—এই দুইটিরই মাত্র অপেক্ষা।

প্রচলিত ধর্মমত, দার্শনিক মতবাদ, কুলাগত সংস্কার, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং অভ্যস্ত চিন্তা-প্রণালীর বহু উর্দ্ধে উঠিয়া তোমরা প্রত্যেকটি মানুষের ভিতর পরিপূর্ণ ভগবানকে দেখিতে এবং দেখাইতে প্রস্তুত হও। এক একটা করিয়া নূতন নূতন ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে আর এক একদল শিষ্য নিজ নিজ গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার জন্ত সর্বশক্তির অপচয় করিবে, এই কলঙ্কের সহিত আপোষ করিও না। তোমরা প্রতিজনের ভিতর ঈশ্বরাবতার খুঁজিয়া বাহির কর। নির্বিঘ্নে বিচার-বুদ্ধি, নিঃস্বার্থ সত্যানুসন্ধান, অকপট সত্যানুসরণ এবং অকৃত্রিম সৈবেষণা সম্বল করিয়া তোমরা কর্মপথে ধাবিত হও,—বজ্রের ধরিয়া সাহস, বাত্যার লইয়া বিক্রম, সমুদ্রের লইয়া উদারতা, আকাশের লইয়া বিশালতা। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেমী

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৫২

(৫৩২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩০শে, ফাল্গুন ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু :—

ম্নেহের বাবা—, প্রাণভরা ম্নেহ ও আশিস নিও

মৃত্যু দেহেরই হয়, আত্মার হয় না। স্মৃতরাং মৃত্যুর পরে আত্মা থাকেন। দেহধারী অবস্থায় জীব যেই সকল কাজ করিয়াছেন, সংস্কার রূপে তাহার প্রতিফলন আত্মার উপরে থাকিয়া যায়। এই সংস্কারগুলির ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মা সংস্কারের অধীন হইয়া বারংবার জন্ম-মরণ দুঃখবরণ করেন। জড় দেহ ত্যাগ মাত্রই আত্মাকে সংস্কার অনুযায়ী নূতন দেহ-ধারণ করিতে হয়। পুরাণাদিতে স্বর্গ-নরকাদি ভোগের যে কাহিনী আছে, তাহা আক্ষরিক ভাবে সত্য নহে, রূপক-মাত্র। সুখ-দুঃখাদি ভোগ সম্পূর্ণরূপে কাল-নিরপেক্ষ এবং তাহা একান্তই মানস-সংস্কার-সঞ্জাত। মৃত্যুর পরে কোন আত্মাই কোন আত্মার আত্মীয় থাকে না। প্রত্যেকেই পরমাত্মার আত্মীয় হইয়া পড়ে। জীবৎকালে ষাহাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছি মরণের পরে ষাহাদের সঙ্গে দেখা হইত, তাহা হইলে হয়ত পরলোকেও ফৌজদারী কোর্টের আবশ্যক হইত। প্রত্যেক জীবই কর্ম্মানুসারে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহান্তর পাইতেছে। অতএব মৃত্যুর পরে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎকার সম্ভব নহে। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের চিত্ত-সংস্কার ছায়া রূপে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকে। তাহার সাক্ষাৎকার অনেক হইয়া থাকে। সেই সাক্ষাৎকারও নিজ নিজ সংস্কারানুগ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক আত্মাই নিজ নিজ পরম অভিলষিতের পথে চলিতে থাকে। তাহার সঙ্গে কবে কুটুম্বিতা হইয়াছিল, ইহা অব

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধ্বং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

১৫৩

রাখিবার অবকাশ তাহার থাকে না। এক অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের আকর্ষণে আত্মা ছুটিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন আত্মার সহিত বিভিন্ন জড়দেহে তাহার যে পরিচয় হইতেছে, তাহার মূল প্রয়োজন পরমপ্রেমময়কে লইয়া। তাই মৃত্যুর পরে ইহ জীবনের আত্মীয়কে দিয়া তাহার আর কোন প্রয়োজনই নাই।

প্রচলিত মন্ত এবং বিশ্বাসের সহিত কথাগুলি মিলিবে না। কিন্তু ইহা আমার উপলব্ধির কথা। তোমাকে অকপটে না লিখিয়া পারিলাম না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩৩)

হরিওঁ

কলিকাতা

২রা চৈত্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি “পারম্পরিক-সাহায্য-সমিতি”র যে একখানা ফরম পাঠাইয়াছ, আমার দৃষ্টিতে ইহা স্বকৌশলী ধনলব্ধের টাকা লুটিবার ফাঁদ। ইহা এক হিসাবে লটারীর সমতুল্য। কিন্তু জুয়া-আইন হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত ইহাতে একটু সরস চতুরতার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। আবার, ইহার যদি ইচ্ছা করিয়া প্রতারণা করে, তাহা হইলে যাহাতে কেহ ইহাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা না নিতে সমর্থ হয়, তাহারই সতর্কতা হিসাবে প্রতিজ্ঞনের মনিঅর্ডারের রসিদখানা আগে পাইবার জন্ত সতর্ক রাখিয়াছে। তোমরা সরল বুদ্ধিতে ইহাদের ধুর্ভুতাকে লোককল্যাণ-বুদ্ধি বলিয়া ভ্রম করিয়াছ। আমার মতে, তোমাদের প্রত্যেকের এই

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৫৪

পাপ হইতে দূরে থাকা উচিত। যাহার সুদূরপ্রসারী ফল লোক-প্রবঞ্চনা, তাহা হইতে তোমাদের আশ্রম লাভবান হইতে চাহে না। এক লক্ষ বাষটি হাজার টাকার লোভ দেখাইয়া অনেক সরল গ্রাম্য লোককে ইহার। এমন একটা স্বীমে টানিয়া আনিয়াছে, যেই স্বীম কিছুকাল পরে আর বাড়িতে পারিবে না। তোমরা আশ্রমকে সাহায্য করিবার জন্ত এই পথের আশ্রয় নিতে পার না।

স্বীকার করি পুপুন্যী আশ্রম এখন আমার গলার কাঁটা, ঘাড়ের বোঝা, হাড়ের যন্ত্রা হইয়াছে। তোমরা এই আশ্রমের সম্পর্কে অনেকে সচেতন হইয়াছ দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি। অতীতে কখনও তোমরা তোমাদের আশ্রম সম্পর্কে এতটা সচেতন হও নাই। হয়ত এই আশ্রমের অনেকটা অংশই চিরতরে পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য হইব কিন্তু তোমরা অপরের লুক্ক কোশলের নিরীহ শিকার হইয়া টাকা পাইবার আশায় তাহাদের অসুন্দর পরিকল্পনার সহিত হাত মিলাইবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আশ্রমটার বর্তমান সঙ্কট দেখিয়া তোমাদের যদি প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, তবে প্রতিজ্ঞা কর এক বেলা উপবাস করিয়া সেই টাকা পাঠাও। পাপের অর্থ আমি চাহি না। তোমরা না জানিয়া সহযোগ করিতেছ, পাপ তোমাদের নহে। কিন্তু যাহাদের পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্ত তোমরা দলে দলে লোক শ্রম করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছ, তাহারা নিশ্চিতই সাধু ব্যক্তি নহেন। সাধু ব্যক্তির। এমন কোনও পরিকল্পনায় হাত দেন না, যাহার আশুগুণ্টিটুকু সুন্দর উজ্জল আর পরিণামফল লক্ষ লক্ষ লোকের হতাশা, মনোভঙ্গ ও অর্থহানি। তোমরা এসব ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হও।

দ্বৈত, ১৩৬৭]

বৃত্ত প্রেরণ

প্রতিধ্বনি

১৫৫

কয়েকটা মিশনরী স্কুল হইতে বিতালয়ের অর্থ-সংগ্রহের জন্ত লটারি হইতে দেখিয়াছি। ইহাদের অনুকরণে সাধারণ স্কুল বা হাসপাতালের জন্তও লটারি হইতে দেখা যায়। দৈবের উপরে নির্ভর করিয়া কেহ টাকা পাইবে, পরন্তু পরিশ্রমের ফলে নয়। ইহা অনাদর্শ ব্যাপার। তথাপি অনেক নীতিজ্ঞ ব্যক্তি এই সকল লটারিকে এই যুক্তিতে সমর্থন করেন যে, যে লটারির টিকিট কিনিল, সে যখন টাকা পাইল না, তখন সে তাহার টিকিটের টাকাটাকে “সংকার্যে দিলাম” বলিয়া “উড়ো থৈ গোবিন্দায় নমঃ” গোছের একটা অস্পষ্ট আশ্রুতৃপ্তি অনুভব করে এবং এতগুলি লোকের তুচ্ছ তুচ্ছ অপ্রাপ্তি মিলিয়া একটা সংপ্রতিষ্ঠানের জন্ত কিছু মোটা টাকার সংস্থান হয়, লোকহিত ও হয়।

“উড়ো থৈ গোবিন্দায়” কোনও মিস্তি কথা নহে। তবু ইহাতে একটু খানি ত্যাগের গোলাপি খোশরু রহিয়াছে। কিন্তু তোমাদের কথিত “পারম্পরিক-সাহায্য সমিতি”তে তাহাও নাই। এখানে সব কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্ত। নিজের স্বার্থকেই বোল আনা লক্ষ্য রাখিয়া টাকাটি দেওয়া। এমন কাজ হইতে তোমরা বিরত হও।

লটারিরও আমি সমর্থক নহি। “লটারির টিকিট অফ্রমের সম্বল”,—একথাই আমি চিরকাল বলিয়া আসিয়াছি। আমার জীবন কল্পে দৈবের উপরে নির্ভর রাখিবার কোনও স্থান নাই। সবটাই নির্ভর রাখিব বাহুবলের উপর, পরিশ্রমের উপর। আমার আশ্রমকে সহায়তা করিবার জন্ত অর্থ সংগ্রহের জন্ত কখনই আমি কোনও লটারি হইতে দিব না, আমার পরবর্তীরাও তাহা দিবে না।

তথাপি একটা দুর্বল স্থানে আমি মনে মনে লটারিরও সমর্থক। আমার কোনও মূল্যবান সম্পদ বেচিয়া তাহার বিনিময়ে যে অর্থ আহরণ হইবে, তাহার অংশবিশেষ গ্রাহকদের মধ্যে পুরস্কার রূপে

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম।

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৫৬

বিতরণ করিয়া দিয়া বাকীটার সবই যদি আসমুদ্র হিমাচলে প্রণব-বৃক্ষ-
গায়ত্রী মন্ত্র রেকর্ডে তুলিয়া ঘরে ঘরে প্রচারের কেহ আয়োজন করে, তবে
কতক নীতিবিরুদ্ধ হইলেও এমন কাজে আমি অনিচ্ছায় সমর্থন করিব।
যেখানে প্রত্যেকটি উদ্যোগীর উদ্দেশ্য স্বার্থহীন, যেখানে তাহাদের পরি-
কল্পনালব্ধ অর্থ আমার আশ্রমে আসিবে না, সেখানে আমার ত্যাগের ফলে
অন্ততঃ বৃহৎ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইলে লোকের প্রদত্ত অর্থের সমমূল্যের
জিনিষ লোককে দিয়া মাত্র লাভের টাকা হইতে ভাগ্যফল নির্ধারণ হইলে
এমন অল্প ভাগ্যকে তিরস্কার করিতে চাহি না।

কিন্তু আমাকে বা আমার স্থলাভিষিক্তকে সাহায্য করা, আমার
আশ্রমকে সাহায্য করা, আমার সৃষ্ট অথ কোনও লোকহিতকর
প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা, আমার জন্মোৎসবের তহবিল বৃদ্ধির সহায়তা
করা প্রভৃতির জন্ত আজ কিম্বা ভবিষ্যতে তোমরা কেহ কোনও
লটারির আয়োজন করিলে, তাহা কখনই আমার সম্মতি পাইবে না,
জানিও। সরকারী অনুমতিই অনুমতি নহে, বিবেকের অনুমতিও চাই
ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাকে সমবেত উপাসনার স্মরণ শিক্ষা দিবার জন্ত উত্তরবঙ্গে

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১৫৭

পাঠান হইতেছে। ইহাকে তুমি জীবনের একটা পরম সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিও। জগতে যত প্রকারের পুণ্য কার্য্য আছে, তন্মধ্যে সমবেত উপাসনার সুরশিক্ষাদানকে আমি শ্রেষ্ঠতম পুণ্য বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। তুমি সেই শ্রেষ্ঠ পুণ্যটী অর্জন করিতে যাইতেছ। মনে রাখিও, যতটা সম্ভব নিঃস্বার্থ ভাবে এই পবিত্র কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। জন-সমাজে সমবেত উপাসনার সুরশিক্ষাদানকে বাহারা জীবনের পরম ও চরম সাধনা রূপে গ্রহণ করিবে, পৃথিবীতে চিরকাল আমার আপনার জনেরা তাহাদের সর্বপ্রকার হুশ্চিন্তার দায়িত্ব নিজেদের স্বক্কে সানন্দে বহন করিয়া তাহাদিগকে সাংসারিক উদ্বেগ হইতে মুক্তি দিবে। তুমি পরম পবিত্র দেহে, নির্মল উদার মনে সংস্কারমুক্ত সরল চিত্তে প্রতিজনকে প্রাণপণে বিশুদ্ধ স্বরলিপি-সম্মত নিভুল সুর শিখাইতে ব্রতী হও।

তোমার সহিত যেই সঙ্গীটিকে দিতেছি, তাহার স্বরলিপি-জ্ঞান নাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে সুরবোধ ও কণ্ঠমাধুর্য্য তাহার আছে। কনিষ্ঠ সহোদর জ্ঞানে প্রাণপণে তাহাকে বিশুদ্ধ সুর শিখাইও। যেখানে সে ভুল করিবে, সেখানে তাহার ভুল সংশোধনের জন্ত প্রাণান্ত শ্রম করিবে। কোনও অবস্থাতেই সহিষ্ণুতা হারাইও না। সে বাহাতে তোমার সঙ্গ ছাড়িবার পরে তোমার প্রদত্ত শিক্ষার গুণে সর্বত্র একেবারে নিভুল রূপেই সকলকে সুরশিক্ষা দিতে পারে, এমন শ্রম তুমি তাহার পশ্চাতে দিও।

শিক্ষাদান করিতে গিয়া অনেকে দান্তিক হইয়া পড়ে। নিজেদের শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞান তাহাদিগকে এমন ভাবে অভিভূত করে যে, তাহাদের দর্প, দম্ভ, অহঙ্কারের নানা বিকারের আওতায় পড়িয়া অতিশয় সাবিকচিত্ত শিক্ষার্থীরও মন দূষিত হইয়া যায়। কাজ করিবার কালে মনে রাখিও,

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৫৮

করিতেছ সেবা, মাষ্টারী নহে। সেবা নিষ্ফল হয়, যদি অন্তরে প্রেম না থাকে। ইহা কখনও ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৫ই চৈত্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের মণ্ডলীর ভিতরে সজ্জশক্তিকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত করিবার জন্ত তোমরা কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ ভাবে অবহিত হইও। যথা,—

(১) বুদ্ধ, মাননীয়, পূজ্য ব্যক্তিদিগকে সম্মান করিবে, তাঁহাদের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার সুশিক্ষা অর্জন করিবে, অপরাপরকে তাঁহাদের প্রতি সমস্ত্রম ব্যবহারে প্রণোদিত করিবে। বুদ্ধরাই অধিকাংশ নূতন সজ্জের সহিত বিরোধিতা করিয়া থাকেন। সম্মান সশ্রদ্ধ ব্যবহার পাইলে তাঁহাদের বিরোধেচ্ছা দুর্বল হইবে, সৌজন্যের ফলে তোমাদের নৈতিক শক্তি বাড়িবে।

(২) সকলের হিতোপদেশই শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিবে এবং তাহার সবটুকু গ্রহণীয় না হইলেও যেটুকু নিরাপদে গ্রহণ সম্ভব, তাহা গ্রহণ করিবার জন্ত সচেষ্ট থাকিবে। লক্ষ্যের একতানতা ও ইষ্টানুরাগের একনিষ্ঠাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া যত উপদেশ কার্য্যতঃ পাওয়া যায়, তাহা আদরেরই বস্তু। কাহারও কোনও অযাচিত বা

জৈষ্ঠ, ১৩৬৭

LIBRARY

প্রতিদিন

No.

১৫২

Sri Sri Anandamayee Ashram

যাচিত উপদেশ পালন অসম্ভব হইলেও ব্যক্তিগত ব্যবহারে অসৌজন্য প্রদর্শন করিবে না।

(৩) মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সাধারণ ব্যক্তিকেও ব্যক্তি হিসাবে সমাদিকার দিবে এবং গ্রহণযোগ্য হইলে তাহারও পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করিবে। ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছকে অবহেলা না করিলে তাহাদের সংহতি যে বৃহৎ ও অসাধারণ ঘটনা ঘটাইতে পারে, এই বিশ্বাস রাখিবে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য ব্যক্তির মনেও এই বিশ্বাসের রেখাপাত নিয়ত করিতে থাকিবে যে, একাগ্র সাধনা ও একনিষ্ট তপস্যার বলে সে জগতের পরম বরণীয় মহাপুরুষ হইতে পারে।

(৪) পদ এবং পদবীর উপরে প্রত্যেকে আসক্তি পরিহার করিবে এবং নিজে নেতা না থাকিয়াও কি করিয়া অপর প্রতিজ্ঞনের কর্মসূচনী প্রতিভাকে জাগরিত করা যায়, সর্বদা তাহার চিন্তন ও অনুচিন্তনে মগ্ন থাকিবে।

(৫) বাহারা মণ্ডলীর প্রকৃত কাজগুলিতে অবহেলা করিবে অথচ নিজ পদবী ও পদাদিকার রক্ষার জন্ত উহার প্রতি পৈত্রিক-সম্পত্তির ত্রায় অন্ধ অনুরাগ প্রদর্শন করিবে, তাহাদিগকে দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকিয়া বৃথা অপরের প্রকৃত কার্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে দিতে বিরত রহিবে। অপদার্থ অকর্মণ্য লোকদিগকে কেবল চক্ষুলাজ্জার দায়ে নৈবেদ্যের মণ্ডার-মত নামকে-ওয়াস্তে অত্যাচারে বসাইয়া রাখিলে সজ্জ্বর সম্মান না বাড়িয়া বরং কমে।

(৬) সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে যোগদানের জন্ত প্রত্যেককে সাদর আহ্বান দিবে।

(৭) কেহ কর্তব্যে অবহেলা করিতেছে বলিয়া তাহাকে লোকচক্ষে

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৬০

হেয় করিবার জন্ত ভ্রমেও নিন্দা করিবে না। কিন্তু তাহাকে সঙ্গত ভাবে উপদেশ দিবে এবং তাহার শুভ বুদ্ধির উদয়ের জন্ত ভগবানের চরণে অকপট প্রাণে প্রার্থনা করিবে।

(৮) সজ্জ্বর এক সভ্য অপর সভ্যের সহিত প্রাণান্তেও কোনও আর্থিক বা নৈতিক অপরাধ করিবে না। বিশ্বাস করিয়া নিয়ত মিশে বলিয়া একটা কুমারী বা যুবতীর প্রতি বা অগ্র নারীর প্রতি নিন্দনীয় আসক্তি প্রদর্শন করিবে, ইহা যেন না ঘটে। ধার চাহিয়া টাকা নিয়া তার পরে তাহা ফেবৎ দিবার কালে নানা অজুহাত সৃষ্টি করিবে, ইহা যেন না হয়।

(৯) কাহারও পারিবারিক ব্যাপার লইয়া কেহ জটলা, রটনা বা অনধিকার-চর্চা করিবে না। সজ্জগত ভাবে এক হইলেও অনেকে আছে, যাহাদের পক্ষে জন্মতঃ লব্ধ সামাজিক পরিবেশ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া আসা সম্ভব নহে। এই সকল লোকের সামাজিক ব্যাপারে প্রতি জনে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকিবে। মুচি, মেধর, মুদ্দফরাস, ঢুলী, মালী, কপালী, কায়স্থ, বৈজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ভেদে যে নানা প্রচলিত সমাজ আছে, তাহাদের আচার-আচরণের জটিল পার্থক্যারণ্যে প্রবেশের তোমাদের প্রয়োজন নাই। খোঁচাও দিও না, ঘাও খাইও না, একে-বারে উদাসীন থাক। শক্ত রকমের সংসাহন যাহার আছে, সে সামাজিক ব্যাপারে ষোল আনা অখণ্ড হও। কিন্তু-অত্বেরা অগ্ররূপ করিতেছে বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে উত্ততায়ুধ হইও না।

(১০) প্রেমকে কার্যোদ্ধারের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া জানিবে। চালাকীর পথে যাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেমা

প্রতিধ্বনি

১৬১.

(৫৩৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৬ই চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

একজন ধর্মপ্রচারক গোস্বামী মহাশয় তোমাদের ওখানে আসিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম । তাঁহার প্রচার-মধ্যে তোমাদের সাধনাত্মকুল যে যে বাণী পাইবে, তাহা সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিবে । সকলেরই নিজ নিজ মত প্রচারের স্বাধীনতা আছে কিন্তু তুমি বা আমি তাহা হইতে কতটা গ্রহণ করিব আর কতটা ত্যাগ করিব, তাহা যেন তোমার আমার নিজ আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নির্ণীত হয় । কেহ তোমার মত-পথের বিরুদ্ধে কথা বলিলেই তোমার ক্ষতি হইয়া যাইতে পারে না, অবশ্য যদি নিজের মতে নিজের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে চলিবার সাহস, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সংসাহস তোমার থাকে । তোমার মত-পথের রক্ষক ও বিনাশক তুমি নিজে, অতঃ প্রচারকেরা ইহার কিছুই করিতে পারেন না । তবে অযৌক্তিক কথা বলিয়া, হিংসাত্মক প্ররোচনা দিয়া, মিথ্যাশ্রিত তথ্য পরিবেশন করিয়া কেহ তোমাদের মত-পথকে জনসমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া কোনও প্রতিবাদের সম্মুখীন না হইয়াই বিজয় গর্বে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবেন আর পরনিন্দাশ্রবণে পুলকিত তামসিক ব্যক্তিদিগের করতালি এবং অজ্ঞান নরনারীকুলের ফুলমাল্য কুড়াইবেন, এই অবস্থা তোমরা চিরকাল চলিতে দিতে পার না । অন্তরের স্বচ্ছতা, ব্যবহারের সজ্জনতা, প্রাণের প্রীতি ও হৃদয়ের প্রেমকে বিন্দুমাত্র হ্রাস না করিয়াও ভদ্রভাবে এই সকল অপচেষ্টার কার্য্যকর প্রতিবাদ করা যায় ।

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরণা

[১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৬২

কিন্তু সফলতম প্রতিবাদ হইতেছে, নিজের মত ও পথের বিরুদ্ধে শত নিন্দাবাদ উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও বুক ফুলাইয়া নিজের পথেই অবিচলিত বিক্রমে চলিতে থাকা এবং সহস্র জনের সমক্ষেও অকুতোভয়ে নিজের মত-পথ প্রচার করা। নিন্দককে নিন্দা দ্বারা নিবৃত্ত না করিয়া তাহার নিন্দাকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার সমর্থক-দলকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার অপচেষ্টায় প্রভাবিত অন্ত্রান মানবকুলের নিন্দা-প্রশংসাকে গণনায় না আনিয়া নিজের মতে নিজের পথে অনুপম শোণ্ডো চলিতে থাকাই সকলের সার্থকতম প্রতিবাদ।

আজ সমবেত উপাসনা দ্বারাই কত স্থানে শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও অন্ন-প্রাশনাদি হইতেছে। আপনা আপনি জন-সাধারণে ইহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অনুষ্ঠানিক ভাবে আমার দীক্ষিত শিষ্য নহেন, তাঁহারাও এই সকল অনুষ্ঠানে মানন্দে যোগ দিতেছেন। সহস্র সহস্র জ্ঞানী গুণী মানী ব্যক্তি আজ নবপ্রবর্তিত এই সহজ বিধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অনেকে ইহার ভিতরে এক নূতন ধর্ম্যবিপ্লব দেখিতে পাইয়াছেন। কেহ কেহ ইহার ভিতরে সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠাভাগ দেখিতেছেন। কেহ কেহ বা এই সকল অনুষ্ঠানের সারল্য এবং ব্যয়-বাহুল্যহীনতার মধ্যে জাতীয় অর্থের বৃথা অপচয় নিবারণ লক্ষ্য করিতেছেন। হুই একজন প্রাচীন-পন্থী ভদ্রলোক ইহার প্রতি গন্ধিষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও সাধারণ ভাবে এই সকল অনুষ্ঠান জন-সমাদরে সমর্থিত হইতেছে। কে একজন নবদ্বীপ বা ভট্টপল্লী হইতে আসিয়া ভাগবত পাঠ করিতে করিতে ইহাকে কালাপাহাড়ী কাণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিলেন বলিয়া তোমাদের চিন্তিত হইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। প্রাচীন-পন্থীরা পুরাতনকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেনই। নূতনের প্রতি তাঁহাদের মান্দেহ ও আতঙ্ক এক হিসাবে

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেরণা

প্রতিধ্বনি

১৬৩

প্রাচীনের সদলুষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার পক্ষেও সহায়ক হইয়াছে। সংরক্ষণশীলতা কেবলই মন্দ নহে, ইহার মধ্যে ভালও যথেষ্ট রহিয়াছে। কোনও কোনও সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণপণ্ডিত বা তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত কতক শূদ্রসন্তান তোমাদের নবপ্রবর্তনে ভীত হইয়া যে সকল কল্পিত ও কটুক্তি উচ্চারণ করিতেছেন, তাহাতে তোমাদের ভীত হইবার প্রয়োজন নাই, ক্রুদ্ধ হইবারও নহে। যেই সনাতন ধর্মকে ইঁহারা নিজেদের সংরক্ষণশীলতা দ্বারা রক্ষা করিতেছেন বলিয়া মনে করিতেছেন, তোমরা তোমাদের নবপ্রবর্তিত সমবেত উপাসনার দ্বারা সেই সনাতন ধর্মকেই যে রক্ষা করিতে যাইতেছ, এই অকাট্য সত্য উপলব্ধি করিতে ইঁহাদের একটু সময় লাগিবে মাত্র। চিরকাল ইঁহারা তোমাদের বিরোধিতা করিতে পারেন না। বর্তমান বিরোধিতা দ্বারা ইঁহারা একদিকে করিতেছেন তোমাদের নিষ্ঠার পরীক্ষা, অত্ৰদিকে তোমাদের এক বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। তোমরা নিজেদের মত প্রচারের দ্বারা যতগুলি লোককে তোমাদের সমবেত উপাসনা ও ভূতি সম্পর্কে ভাবাইতে পারিতে, ইঁহাদের বিরুদ্ধ রটনায় তাহার শতগুণ লোক বিচার করিয়া দেখিবার জন্ত উৎসাহিত হইতেছে যে, তোমরা মেকী সোনা দিয়াই একটা গোটা জাতিকে স্বর্ণ-বিলম্বে প্রতারিত করিতে আসিয়াছ কিনা।

অনেক সংস্কারপন্থী লেখক ও বাগ্মী ভারতের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও পুরো-হিতগণকে সাধারণতঃ যে দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন, আমার দৃষ্টি-ভঙ্গী তাহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে পৃথক। আমি এই সকল গোড়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে তাঁহাদিগকেও দেখিয়াছি, যঁহারা কেবল চাল-কলার লোভেই শাস্ত্রচর্চা করেন নাই, পরন্তু যঁহারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও মোগল-পাঠানের অস্ত্রের মুখে প্রাণপণে শাস্ত্র ও তাহার-মর্মার্থকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আজও

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেয়া

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

১৬৪

হিন্দুধর্ম নামে একটা উদারচিন্তার ধর্ম এই পৃথিবীতে আছে। গোড়া-ব্রাহ্মণদের সহিত আমার মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু আমি তাঁহাদের সরল অনাড়ম্বর জীবন ও নিরলোভ জীবিকার জন্ত তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি। তাঁহাদিগকে আমি শ্রদ্ধা করি বলিয়াই আমি গোড়াপন্থীদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রতি অন্তরে কোনও বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারি নাই। তোমরাও তাঁহাদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ রাখিও না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৬ই চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কন্যার বিবাহ অখণ্ডমতে সমবেত উপাসনার দ্বারা দিতে চাহিয়াছি জানিয়া সুখী হইলাম। পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষ এই উভয় দিকের পরিবার সমূহই যখন অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত, তখন সমবেত উপাসনা দ্বারা অখণ্ডমতে বিবাহ অতিশয় প্রশংসনীয় কাজ। চারিদিকেই ত আজকাল অখণ্ডমতে বিবাহ হইতেছে। এই সম্পর্কে আপনা আপনি যে বিধি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা কিছুদিন আগেকার প্রতিধ্বনিত প্রকাশিত হইয়াছিল! আমি নিজে কোনও বিধি প্রবর্তিত করি নাই।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭]

LIBRARY
No.....

প্রতিধ্বনি

১৬৫

Shri Sri Sri Anandamayee Ashram

একদা আমি শ্রীশ্রী উপাসনা-প্রণালী পুস্তিকায় ত্রিখিয়াছিলাম যে, একদিন বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন আদি যাবতীয় কার্য সমবেত উপাসনার দ্বারা হইবে। ইহার জন্ত কোনও প্রচার বা বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইবে বলিয়া আমি মনেও করি নাই, তাহার নির্দেশও দেই নাই। আপনা আপনি ইহা হইবে বলিয়া আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার দায়িত্ব মাত্র এইটুকু। দেশ প্রচলিত কুলপ্রথাগত পদ্ধতির সহিত যুদ্ধ করিবার প্রেরণাও আমি কখনও কাহাকেও দেই নাই। আপনা আপনি সমবেত উপাসনা দ্বারা বিবাহ হইতে লাগিল, গুরুরূপে আমি তাহা অনুমোদন করিলাম এবং তাহাতে আশীর্বাদ জানাইলাম। গণদেবতা নিজের ব্যবস্থা নিজে করিয়া নিলেন, গণগুরু তাহাতে সম্মিলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে সমর্থন জানাইলেন। আমার দায়িত্ব এতটুকুই। আমি প্রচলিত মত-পথ ভাঙ্গিবার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নই। যাহা আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাহাকে জোর করিয়া রক্ষা করিবার মিথ্যা শ্রমেও আমি রুচি বোধ করি নাই। নিন্দা বা প্রশংসা আমার এই এতটুকুই পাওনা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে একের পর এক করিয়া বহু স্থানে সমবেত উপাসনা দ্বারা বিবাহাদি হইতে লাগিল। যাহারা আমার মন্ত্রের মন্ত্রী বা আমার তন্ত্রের তন্ত্রী নহেন, তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের বিবাহ এ ভাবে হইতে শুরু করিল। আজ ইহা দেশের বহু স্থানে একটা বদ্ধমূল প্রথার রূপ পাইতে চলিয়াছে। সুতরাং নিজ কতাকে পাত্রপক্ষের ইচ্ছা ও সমর্থনের মধ্য দিয়া সমবেত উপাসনা দ্বারা পাত্রস্থ করিতে চাহিয়াছ, ভালই ত করিয়াছ। তুমি ইহাই যদি না করিতে, তবে আমি বিরক্ত হইতাম না। কিন্তু ইহা করাতে সুখী হইয়াছি। বিবাহ একটা পরম পুণ্য অনুষ্ঠান। ইহার মধ্যে মনের ফাঁকী থাকা উচিত নহে।

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

১৬৬

একদা মানুষ একটা নদী সাক্ষী রাখিয়া, একটা বৃক্ষ সাক্ষী রাখিয়া বা এতটুকু অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া বিবাহ করিত। কারণ, তখন মানুষ বিশ্বাস করিত, ইহারা ভগবানের প্রতীক। তাহার পরে আসিল সেই যুগ, যেই সময়ে এই সকলের পরিবর্তে অদৃশ্য দেহধারী দেবতাদের সাক্ষী করিয়া বিবাহ আরম্ভ হইল। বর্তমান যুগে মানুষের মন প্রচলিত অধিকাংশ দেবতার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। এই যুগে বিবাহ-কালে শত শত দেবদেবীর নামোচ্চারণ আর পরিতর্পণ অনেকের পক্ষে অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। যুগের গতি ঈশ্বরকে এখনও অস্বীকার করে নাই, কিন্তু ঈশ্বরের স্থলে যে সকল দেবদেবীকে বসান হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে কুণ্ঠাহীন আনুগত্য আর নাই। এমন সময়ে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অবিসম্বাদিত প্রতীক ওঙ্কারকে সন্মুখে রাখিয়া বিবাহের প্রচলন যুগেরই প্রয়োজনে হইয়াছে, আমার কোনও কুতিত্বে নহে। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

“ধ্বতং প্রেম্না”র অমূল্য পত্রাবলী পৃথক পুস্তকরূপে “ধ্বতং প্রেম্না” নামে প্রথম খণ্ড হইতে অষ্টম খণ্ড পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১১০ টাকা। যে কেহ (ব্যক্তিগত পার্ঠের জন্য, বিক্রয়ার্থ নহে) আট খণ্ড একত্রে নিলে প্রতি খণ্ড ১৮ টাকা মূল্যে পাইবেন। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

নিবেদক—

স্নেহময় ব্রহ্মচারী,—ম্যানেজার, অধ্যাপক আশ্রম,
ডি ৪৬/১২এ স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারানসী।

প্রতিধ্বনি

(মাসিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৬৭ { ৩য় সংখ্যা

অখণ্ড-বাণী

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(৪৭)

কোনও কুমারী মেয়ে তোমার চ'থে পড়া মাত্র তুমি তোমার জননীর কুমারী-জীবনের চিত্র মনের পটে আঁকতে শুরু করবে। এতে তোমার মন পবিত্র হবে এবং জগতের প্রত্যেক নারীর প্রতি সন্ত্রমবুদ্ধি জাগ্রত হবে।

(৪৮)

জীবনকে ভগবানের পায়ে লুটিয়ে দিব, এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর পবিত্র নাম জপ কতে শুরু করাই হচ্ছে দীক্ষা নেওয়া। আমার কাছ থেকে কোন মন্ত্র না নিয়েও সে দীক্ষা তোমার হ'তে পারে। তোমার অন্তরই

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৬৮

ত জানে, জগতে কোন্ নাম পবিত্রতম। প্রাণ ভ'রে সেই নামে ভগবানকে ডাকে।

(৪৯)

অসংযম মাত্রেই বর্জ্যনীয়, এখন সে অসংযম বে ইন্দ্রিয় সম্পর্কেই হোক। শুধু উপস্থের দিকেই সংযম প্রয়োজন, তা নয়। চ'খে, মুখে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, হাবে, ভাবে, বাক্যে, লিপিতে, সব কিছুতেই সংযমের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এক জায়গায় সংযমী হ'য়ে যদি অপর জায়গায় অসংযমী হও, তবে তোমাকে আর সংযমী বলা চলবে না। এইদিকে হয়ত মৌনব্রতী, ওদিকে কিন্তু খাবার সময়ে এক নম্বরের ছল্লাভ, এমন লোককে সংযমী বলবে? এদিকে হয়ত পিতলের কোপীন প'রে উপস্থ-সংযম করা হচ্ছে, ওদিকে সুন্দরী রমণী দেখলে চোখ ছুটো দিয়ে তাদের গিলে খেয়ে ফেলতে চায়, তাকে সংযমী বলবে? এদিকে সপ্তদিবস ব্যাপী উপবাস ক'রে লোভ-সংযম করা হচ্ছে, ওদিকে বাচালতা, দিগে লোকের কানের পোকা খসান হচ্ছে, একে সংযমী বলবে? এদিকে হয়ত মোহ জয় ক'রে সংসারের সকল ব্যাগারে অনাগন্ত ভাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, ওদিকে হয়ত হাবে-ভাবে ব্যবহারে জীপুরুষনির্বিশেষে সকলকে চুষন, আলিঙ্গন প্রভৃতি দ্বারা স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা জানাবার দুর্নিবার কদভ্যাস সঞ্চয় করা হয়েছে,—একে সংযমী বলবে? একে লোক কি ভাবে খায়, কি ভাবে শোয়, কি ভাবে কথা বলে, কি ভাবে চলে-ফিরে, তা দিয়েও তার সংযম-অসংযমের বিচার করা চলে। চাই সর্বদীপ সংযম, চাই সর্বতোমুখ সংযম, হ'তে হবে সর্বদেহে ভাবে সংযমী। একুপ সংযমই যেন তোমাদের আদর্শ হয়।

আষাঢ়, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রাতিদিনি

১৬৯

(৫০)

দর্জির দোকানে গেলে এক এক জনের জুতা এক এক মাপের জামা কিন্তে হয়, একই জামা সকলের গায়ে লাগে না। নির্দিষ্ট দেবদেবীর ভাবোদ্দীপক সাম্প্রদায়িক মন্ত্রগুলি ঠিক সেই প্রকারের,—একজনের মন্ত্র দিয়ে আর একজনের কাজ চলে না। কিন্তু কঞ্চলের দোকানে গেলে সকলেরই এক মাপের কঞ্চল কিন্তে হয়, আমি মোটাই হই আর সরুই হই, কঞ্চল মুড়ি দিয়ে বম্লেই শীত খতম্। ওঙ্কার-মন্ত্র সেইরূপ। সাকারে বা নিরাকারে, যে ভাবেই যে ভগবানকে ভজনা করুক, একই মন্ত্রে সকলের কাজ হবে। শুধু তাই নয়, দর্জির দোকানের জামাকে কখনো পরবার কাপড়, কখনও বিছানার তৌষক, কখনও জপের আসনরূপে ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু কঞ্চলকে সবরূপেই ব্যবহার করা যায়। ওঙ্কার ব্যতীত অপরাপর প্রায় সব মন্ত্রেই দ্বৈতভাবে সাধন কত্তে হবে, অদ্বৈত-সাধন চলে না। কিন্তু ওঙ্কার-মন্ত্রে দ্বৈতভাব, অদ্বৈতভাব, সব ভাবেই ভগবানকে ডাকা যায়।

(৫১)

সব নামেই ওঙ্কার প্রচ্ছন্ন। একই হরীতকী যেমন সোণার ডিবায়ে, রূপার পাত্রে, পিতলের কোটায়, খোলা রেকাবিতে, শালের দোনায় বা খালি হাতে দেওয়া যেতে পারে। পাত্রটা কিসের, তা প্রাধান নয়, প্রাধান হচ্ছে, পাত্রটায় ক'রে কি দেওয়া হচ্ছে। ঠিক তেমনি। ওঙ্কারই সব নামে প্রচ্ছন্ন, এ কথাই মানে হচ্ছে, ওঙ্কারই সব নামের প্রাণ।

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৭০

(৫২)

যে গৃহে বয়স্ক পুত্রকণ্ঠা আছে, বিশেষ ভাবে বয়স্ক কুমারী কণ্ঠা রয়েছে, সে গৃহে প্রত্যেক পিতামাতার সংযতেন্দ্রিয় হ'য়ে বাস করা দরকার। শুধু দরকার বলি কেন, এটা তাদের পরম কর্তব্য। নইলে তাদের পুত্রকণ্ঠার মনকে তারা নিজেদের অসতর্ক আচরণ দিয়েই যে ভোগমুখীন ক'রে দেবে !

(৫৩)

যে নাম তুমি জপ ক'রে যাচ্ছ, জান্বে, এই নাম ছাড়া নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে আর কোনও বস্তু নেই। এই নামই একমাত্র সত্য, অপর সকল বস্তু মিথ্যা। এই নাম দিয়েই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, শিবের শিবত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব। এই নামেই দেবতার দেবত্ব, ঋষির ঋষিত্ব। এই নামেই আত্মারাম পুরুষের পরিপূর্ণত্ব। আর সব ছেড়ে দাও, আর সব ভুলে যাও, একমাত্র এরই সঙ্গে করাও আত্মার মিলন, একমাত্র এরই কর সঙ্গ। নামকেই জান বন্ধু, স্বজন, মাতা, পিতা, প্রভু এবং পতি। নামকেই জান গুরু এবং আশ্রয়দাতা। সকল আশ্রয় ত্যাগ ক'রে একেবারে নিরাশ্রয় হও আর, মায়ের কোলের শিশুর মত নির্ভয় হ'য়ে নামের আশ্রয়ে ব'সে নামের অবিরাম সেবা কর।

(৫৪)

জননীগণ, এই ভারতের রমণী একদিন ঋষিমহর্ষিদিগকে প্রসব কর্তেন, ত্যাগী, কন্মী আর জ্ঞানীদের জননী হতেন,

আষাঢ়, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

১৭২

তোমরা তাঁদেরই বংশবাহিনী। পুনরায় কি ভারত এই আশা কর্তে পারে না জননীরা যে, আবার ভারত-রমণী ঋষিমহর্ষিদের জন্ম দেবে, মহাত্মাগী দধীচি, মহাসত্ত্ব বুদ্ধ, মহাবীর্য্য শঙ্করকে স্তম্ভরস দানে পরিপুষ্ট কর্বে? অতীত ভারতের রমণীর কাছে বা আশা করা যেত, বর্তমান ভারতের রমণীদের নিকট কি সে আশা করা অনুচিত? বর্তমান ভারত কি ভারত-রমণীর নিকটে এ দাবী করতে পারে না মা?

(৫৫)

আজ নারীজীবনকে অপধর্ম্য এসে আশ্রয় করেছে, পুণ্যের নামে পাপ আজ নারীর উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে, তথাকথিত গুরু আজ নারীর পবিত্রতার রক্ষক না হ'য়ে ভক্ষক হচ্ছে। প্রাচীন ভারতের মহীয়সী নারী অপধর্ম্যের এই প্রভুত্বকে স্বীকার করেন নি, ধর্ম্মের নামে লাম্পটাকে পূজা করেন নি, ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চরিতার্থতার সঙ্গে আপোষ-রফা করার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেন নি। তাই ভারতে এক মহাভারতীয় পুণ্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল। তোমাদের শ্রামল-কোমল পল্লীর গ্রাণ কুটবুদ্ধি তথাকথিত ধর্ম্ম-প্রচারকদের কলাকৌশলের কুহকে পড়ে যেন ধর্ম্মের নামে গুপ্ত পাপকে সমর্থন না করে, জননীগণ। পাপের বিরুদ্ধে তোমরা খড়্গহস্ত হও, দুষ্চরিত্রতার তোমরা বিধেয়িণী হও, একমাত্র পবিত্রতার হও তোমরা উপাসিকা, সংযমের হও তোমরা সাধিকা। পল্লীর জীবন পাপাভিনয়ের লীলা-নিকেতন হ'তে ক্ষান্ত হোক। তোমাদের জীবন হোক মধুময়, তোমাদের পরিচয় হোক মধুময়, তোমাদের প্রজ্ঞা হোক মধুময়।

প্রতিবন্ধি

অখ-গুণাবী

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৭২

(৫৬)

দৈব এবং পুরুষকার নিয়ে বহু সহস্র বৎসর ধরে পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই হচ্ছে। তোমাদের সে লড়াইতে যোগ দিয়ে শক্তিক্ষয় করার দরকার নেই। দৈবই বড় হোক আর পুরুষকারই বড় হোক, তোমরা যে শক্তিটুকু ভগবানের কাছে পেয়েছ, সেইটুকুকে আত্মোন্নতিতে, গ্রামোন্নতিতে, সমাজোন্নতিতে, দেশোন্নতিতে এবং সর্বজীবের উন্নতিতে প্রয়োগ ক'রে খালাস হও। ভগবান্ তোমাদের যে শক্তি যেদিক দিয়ে প্রদান করেছেন, জান্বে, সে যেন ঋণের টাকা, শোধ করার দায়িত্ব তোমাদের র'য়েই গেছে। সেই শক্তিকে নিজেদের এবং পরের উন্নতিকল্পে নিঃশেষে প্রয়োগ ক'রে ধার শোধ কর। চেষ্টায় যদি বিফলতা আসে, পুনরায় চেষ্টা কর্কে। কিন্তু অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে গালে হাত দিয়ে ব'সে থাক্বে কেন? পরোপকারই হোক আর ধর্মসাধনাই হোক, তোমাদের প্রত্যেক চেষ্টাতেই দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে কে প্রধান, কে অপ্রধান, সেই বিচারের স্থান হবে অন্ন, নিজেদিগকে নিঃশেষ ক'রে সংকার্যে অর্পণ ক'রে দেওয়া হয়েছে কিনা, সেই বিচারেরই স্থান হবে স্তপ্রতুল। একথা কখনো ভুলে যেও না।

(৫৭)

তোমার যদি এমন ধারণা হয়ে থাকে যে, ভগবান্ তোমাকে কোনো কাজেরই উপযুক্ত শক্তি দেন নি, তবে জান্বে, সত্যি তিনি তোমাকে একেবারে শক্তিহীন ক'রেই দিত করেননি কিনা, তার একটা পরখ নেওয়া প্রয়োজন। বিনা পরীক্ষার

আষাঢ়, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

১৭৩

তুমি এ' কথার সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ধারণ কতে পার না। কঠিন কাজে ভয় পাও, সহজ সহজ কাজেই হাত দিয়ে দেখ। দু'মণ বোঝা তুলতে পারবে না ব'লে সন্দেহ হচ্ছে, দু'সের বোঝা তুলেই একবার দেখ না! তবু তোমার কোন্ দিকে যে কতখানি শক্তি আছে, তার পরীক্ষা ক'রে তোমাকে দেখতেই হবে। একবার যে পরীক্ষায় ফেল মেরেছ, আবার চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে যে, তাতে পাস করার শক্তি সত্যি তোমার একেবারেই নাই কি না। এ ভাবে দিনের পর দিন নিজেকে সহজ সহজ সংকল্পের মধ্যে ফেলে নিজের শক্তির সন্ধান নিতে হবে। ফলে, কিছুদিন পরে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে, তুমি নিতান্তই শক্তিহীন নও,—এক দিকে হয় ত তোমার শক্তি ভাল ক'রে খেলছিল না, অপর দিকে তুমি নিজেকে তার শতগুণ তেজে পরিচালিত কতে পাচ্ছ। সুতরাং তুমি শক্তিহীন নও।

(৫৮)

ধর্মজীবন আর কর্মজীবন, এই দুই জীবনে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে নাও। নিজের এবং পরের ঐহিক উন্নতির জন্ত কর্ম কর, নিজের এবং পরের পারমাণবিক উন্নতির জন্ত ধর্ম কর। ধর্মকে আর কর্মকে যমজ ভ্রাতার মত একসঙ্গে বেঁধে নাও। ধর্ম যদি তোমাকে দুর্বল করে, তবে সে ধর্ম ধর্মই নয়। কর্ম যদি তোমাকে মলিনতাগ্রস্ত করে, তবে সে কর্ম অপকর্ম। অপকর্ম আর অপকর্ম হ'তে নিজেদের রক্ষা কর। সদ্ধর্ম আর সংকর্মে নিজেদিগকে নিয়োজিত কর। যেখানে প্রয়োজন, একাই কর; যেখানে সম্ভব, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কর। মোট কথা, কর সেই কর্ম, পাল সেই ধর্ম, যা সত্য, যা সং, যা অবিনশ্বরের অভিমুখী।

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

১৭৪

(৫৯)

আয় আমার প্রভাত-গগনের প্রথম সূর্য্যরশ্মিদল, আর আজ পবিত্রতার দীপ্তি দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে, ধাতু হায়ে নিজেরা আর ধাতু ক'রে জগৎকে। তোরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তোদের দেখেই জানতে পারি, ভবিষ্যতের গতি কি হবে। তোরাই আমার ধ্যানের ধন। তোদের ভিতর দিয়েই আমি ভবিষ্যতের আলেখ্য দর্শন করি।

(৬০)

যে অমৃতময় একাক্ষর অথও নাম তোমাকে গুণাইরাছি, তাহার অর্থ জানিতে চাহিয়াছি। তাহার অর্থ তেজ, তাহার অর্থ বল, তাহার অর্থ বীৰ্য্য। তাহার অর্থ সর্বকল্যাণের মূল, আত্মশুদ্ধির আশ্রয়। অথবা, আরও সংক্ষেপে বলিতে হইলে, তাহার অর্থ 'তুমি', যাহার সহিত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাতার অভেদ স্বরূপে বিद्यমান রহিয়াছে কিন্তু লীলায় ভেদ প্রতীয়মান হইয়া প্রেমরসের সঞ্জনন ঘটাইতেছে। তুমিই সেই অমৃতমধুর সত্ত্বা, যিনি নামরূপে নামীর সহিত অভেদ, ভক্তরূপে ভগবানের সহিত অভেদ।"

(৬১)

কি বস্তু এই অথও নাম? ইহাই ত তোমার জিজ্ঞাসা?
It is the source of all strength that you need on
your long, lonely and tedious journey towards

perfection. But what is perfection ? It is the ability to sacrifice oneself at any moment for any ideal high and noble. [পূর্ণতার সুদীর্ঘ, জনবিরল, ক্লান্তিপ্রদ পথে পাদচারণ করিতে যে শক্তির তোমার প্রয়োজন, অখণ্ড নাম তাহার মূল উৎস । কিন্তু পূর্ণতা কাহাকে বলে ? যে-কোনও মুহূর্ত্তে যে-কোনও উচ্চ ও মহৎ আদর্শের জন্ত নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়ার সামর্থ্যই পূর্ণতা ।]

(৬২)

কেবল আধুনিক কালের যুবক-যুবতীরাই ধর্ম্মদ্রষ্ট, একথা সত্য নয় । যৌবন এমনি একটা বিষম সময়, যে সময় সকল কালের যুবক-যুবতীদের ভিতরেই আংশিক উচ্ছৃঙ্খলতা অবশ্যস্তাবী । এইজন্ত সকল কালেই মানব-জাতির হিতাকাজ্ঞী ব্যক্তিরা যুবক-যুবতীদের চরিত্র-নিষ্ঠা, ধর্ম্মপ্রবণতা ও সদাদর্শপ্রিয়তা বর্দ্ধনের জন্ত চেষ্টা ক'রে থাকেন । এই চেষ্টা কোথাও সমালোচনা রূপে, কোথাও পাপাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা রূপে, কোথাও সদাদর্শ-প্রদর্শন রূপে, কোথাও মহাদর্শের প্রতি উৎসাহ-বর্দ্ধন রূপে, কোথাও হাতে ধ'রে যুবক-যুবতীগুলিকে মাহুষ করা রূপে আত্মপ্রকাশ করে । কিন্তু বালক-বালিকা আর যুবক-যুবতী-দিগকে ধর্ম্মপ্রাণ ও নীতিনিষ্ঠ করার আগে যে তাদের অভিভাবকদের নীতির মূল্য ধর্ম্মের মূল্য শিখতে হবে । নিজেরা নীতিকে, ধর্ম্মকে, সংযমকে, সদাচারকে পদে পদে অবহেলা ক'রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই জিনিষগুলিকে আদৃত দেখার আশা করা অত্যাশ । কিন্তু আমি ত'আর বুদ্ধদের উপদেশ দেবার দায়িত্ব নিয়ে আসিনি । কচি ঘাস আমি ভালবাসি, তাই আমি ছেলেদেরই সেবক হ'য়ে এসেছি ।

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

১২ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

১৭৬

(৬৩)

ঠাকুর মানে দেববিগ্রহ, ঠাকুর মানে পিতা। আবার ঠাকুর মানে পূজক ব্রাহ্মণ, ঠাকুর মানে পাচক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ চাকরেরই প্রকার-ভেদ। মন্দিরে বসে দেববিগ্রহ ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। কিন্তু আমি পূজা গ্রহণের জন্ত আসিনি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্তও আসিনি, আমি ছয়ারে ছয়ারে ঘুরে বেড়াতে এসেছি। যে মহাজাতির জন্মদান কতে আমার প্রাণে অনুক্ষণ ব্যাকুলতা হচ্ছে, হয়ত সে জাতিকে জন্ম দিয়ে যেতে আমি পারব না, তাই সেই অর্থেও আমাকে ঠাকুর বলা চলবে না। যারা নবমহাজাতির জন্মদান করেন, তাঁদের পূজা করার প্রয়াস নিয়েই উদ্ধার মত ছুটে বেড়াচ্ছি, সুতরাং ছেলেদের পূজক হিসাবে আমাকে ছেলেদের ঠাকুর বলা চলে বৈ কি? চাল, ডাল, আলু, পটল, লবঙ্গ, লবণ, হলুদ, ঘৃত এসব কোনো পাচক ব্রাহ্মণ নিজে সৃষ্টি করেন না। অপরের সৃষ্ট জিনিষ নিয়ে এসে যত্ন করে রেখে যিনি লোককে পরিবেশন করেন, তিনিও ঠাকুর। আমি সেই প্রকারের ঠাকুর অর্থাৎ আমি ভৃত্য। আমি সেবক। নিজের জিনিষ দিয়ে নয়, শত মন্তের শত পথের মহৎ ব্যক্তিদের উপদেশগুলি সংগ্রহ করে এনে আমার সেবা-পাত্র যবকের কাছে হজম করার যোগ্য করে পরিবেশন করছি। পরের জিনিষ নিয়ে এসে আমি আমার মনিবকে আহারীয় তৈরী করে দিচ্ছি। তবে, এইটুকু তফাৎ আছে যে, ব্রাহ্মণ পাচক কাউকে নিজের উচ্ছিষ্ট পরিবেশন করেন না, কিন্তু আমি মুসলমান বাবুজির মত সবগুলি আহারীয় নিজের জিভে আশ্বাদন করে তার পরে পরিবেশন করছি।

আষাঢ়, ১৩৬৭]

অথঙ-বাণী

প্রতিধ্বনি

১৭৭

(৬৪)

ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবনকে নিত্যতা দান করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, নিত্য যিনি, সত্য যিনি, পূর্ণ যিনি, শুদ্ধ যিনি, সেই পরম-পুরুষের সঙ্গে জীবনের সকল কার্য, বাক্য ও চিন্তাকে যুক্ত ক'রে দেওয়া। তোমার কোনো কাজ তাঁকে ছেড়ে হবে না, কোন কথা তাঁকে বাদ দেবে না, কোনো চিন্তা তাঁর স্পর্শকে অতিক্রম করবে না,—এই হোক তোমাদের জিদ। অনিত্য জীবনকে এইভাবেই নিত্য ক'রে তোল। ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বকে এইভাবেই চিরস্থায়ী কর।

(৬৫)

মনকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করুন। কি দুঃখ পাচ্ছেন, আর কেন দুঃখ পাচ্ছেন, তা জেনেই বা লাভ হবে আর কত? মনকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করুন, বিষয়-প্রপঞ্চের সকল জটিলতা থেকে ভুলে এনে সর্বদা সর্বতোভাবে তাকে ব্রহ্মপদ-প্রবেশের জন্ত জাগরুক কতে থাকুন। এতেই সব কর্মফল খণ্ডিত হ'য়ে যাবে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মালে আর কর্মফলের দায় ভুগতে হয় না। জীবনমুক্তি হ'য়ে গেলে আর দুঃখের ঝাপটা সহিতে হয় না।

(৬৬)

প্রলোভন যার সমক্ষে আসে নি, এমন মানব জন্মে নি। যীশু বল, বুদ্ধ বল, আরো আরো ত্রিলোকপূজিত মহাপুরুষ বল, মানুষের দেহ নিয়ে মানুষের ঘরে ধারা আবিভূত হয়েছেন, প্রলোভন তাঁদের প্রত্যেকের সমক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। নাস্তীর নিকটে প্রলোভন এসে দাঁড়িয়েছে পুরুষের মনোমোহন রূপটী ধ'রে,

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৭৮

পুরুষের নিকট প্রলোভন এসে দাঁড়িয়েছে নারীর চিত্তোন্মাদিনী হৃদি নিয়ে। কিন্তু বিচার, বিবেক, দীরতা, সঙ্কল্প, দৃঢ়তা এবং বিশ্বাস এই কয়টি জিনিষের জোরেই তাঁরা নিজেদের পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তোমরাও তা পার, একথা আজ বিশ্বাস কর। তোমরাও বিচার ক'রো, কোন্টী তোমাদের পন্থা আর কোন্টী বিপথ। তোমরাও হিসাব ক'রো, যেক্ষেত্রে চিত্ত উদ্দাম বেগে আকৃষ্ট হচ্ছে, সে দিকে তোমাদের নিত্যমুখকে পাবে কি না। তোমরা ধৈর্য্য ধারণ ক'রে অপেক্ষা করে এবং চিত্তের দুর্বলতা প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত কঠোর সহশক্তি আশ্রয় নাও, কোনও অবস্থাতেই কোনও অত্যাচার কামনার পদতলে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে দিও না। তোমরাও বিচার করো যে, অযশস্কর, অনুচিত, অসঙ্গত, অহিতপ্রদ, আকাজক্ষার অনুরোধ প্রাণান্তেও বাঁপ দিয়ে পড়বে না। তোমরাও দৃঢ় হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয়ী নিষ্ঠার পবিত্রতার সঙ্কল্পে দাঁড়িয়ে থেকো। তোমরাও বিশ্বাস করো, তোমরা আর তোমাদের পিতা এক—'I and my Father are one', 'ব্রহ্মাস্মি', 'পুণ্যোহং'—'নিত্যোহং'—অনিত্যের কাছে নিজেকে বলি দিতে পারি না। বীণ-বুদ্ধ যা' কন্ঠে পেরেছেন, তোমরাও তা পারবে। তোমরা তাদের চাইতে ছোট নও।

(৬৭)

যে সব পরিবারে আশ্রিত যুবক প্রতিপালিত হ'য়ে সেই সব পরিবারের জননীদেব উচিত নয়, নিজের কুমার কন্যাটিকে নিজের সঙ্গে ছাড়া অত্যাচার যুগ্মে দেওয়া। মেয়ে আপনাকে খুবই সং হ'তে পারে, কিন্তু যতক্ষণ সে বিবাহিতা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যে কতটা কাঁচকাঁচ, সে জানে। তোমরাও তোমাদের পিতার আশ্রিত হ'তে পারবে।

আষাঢ়, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

১৭৯

থেকে সেটা আপনার দেখা দরকার। স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম ক'রে কুমারী মেয়েকে লোকের গুপ্ত প্রভাব থেকে রক্ষা করার চেষ্টায় যারা বিরত থাকে, তারা মেয়েদের দুঃখ এবং পরাদীনতাকেই চিরস্থায়ী করে। কুমারী মেয়েকে চ'থে চ'থে রাখা দোষের কথা মোটেই নয়। বিবাহিতা মেয়েকেও অনেকস্থলে চ'থে চ'থে রাখার দরকার হয়। মেয়েরা জীবনে যত ভুল করে, তার অপিকাংশের জন্তই দায়ী তাদের পিতামাতার নিশ্চিন্ততা। তা ব'লে নিজের মেয়ের প্রতি সদা-সন্দিগ্ধ ভাব পোষণ করাও ঠিক নয়। সন্দিগ্ধতা পাপকে বিপরীত ভাবে আহ্বান করে। সাধুকে চোর ব'লে মনে করলে, অনেক সময় জিদ ক'রে সে চুরী করে। সে ভাবে,—চুরী না ক'রেও যখন লোকের কাছে চোরই হয়েছি, তখন আর চুরী করলে কি দোষ হবে? চুরী না করায় যে কৃতিত্ব, তার জন্তই লোকে সাধু থাকে, তা ত' নয়। অনেকেই সাধু থাকে, লোকের নিকট নিন্দিত না হবার জন্ত। এই রকম সাধুদের সংখ্যা জগতে খুব কম নয়, বরং এদের সংখ্যাই খুব বেশী। সুতরাং সাধু থেকেও যখন অসাধুর অপবাদই পেতে হল, তখন আর অসাধু কাজ করবার বাধা কি? এইরূপ মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে অনেকে জিদ ক'রে পাপ করে, অগ্রায়্য করে। অতএব ছেলেমেয়েদের প্রতি কোনো পিতামাতারই সন্দিগ্ধ ভাব রাখা উচিত নয়। এমন কি, কোনো ব্যাপারে সন্দেহের কারণ আছে ব'লে মনে করলেও সন্দেহের ভাব বাইরে প্রকাশ করা আদৌ উচিত নয়। কিন্তু দৃষ্টি রাখতে হবে খুব সজাগ। চ'খ বুজে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। চ'খ বুজে যারা থাকে, দুঃখ তাদের পেতে হয়। একটা মেয়ের অধঃপতনে গুণু যে তার পিতামাতারই দুঃখ বা লজ্জার কারণ ঘটল, তা ত' নয়। তার পিতামাতার চেয়ে ক্ষতি হ'ল তার নিজেরই বেশী। কিন্তু এর চেয়েও বেশী হল তার, যে

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৮০

ভবিষ্যতে এই অধঃপতিতা মেয়েটার পেটে জন্মাবে। এরই জন্ত কোন সমাজ তার মেয়েদের পতন সহ্য কতে চায় না। অবশ্য ছেলেদের পতন রুদ্ধ কতে হবে, কিন্তু মেয়েদের পতনকে চিরকালই এই এক সঙ্কত কারণেই আমরা অধিকতর অবাঞ্ছনীয় বলে গণনা করব। মেয়েদের পেটেই আমাদের জন্ম নিতে হয় এবং তাদের স্তন্যপান করে আমরা মানুষ হই।

(৬৮)

আমি মনে করি, তোমাদের আশ্রয় সাধনাই আমাদের জীবনের যথার্থ কাহিনী। আমার জীবনের অতীত কোনও পৃথক কাহিনী সংগ্রহ করা নিশ্চয়োজ্ঞীয় মনে হয়। অলৌকিক শক্তির লীলা প্রকাশই মহাপুরুষের জীবনের সব নয়, এমন কি একটা যথার্থ জীবন একটা জাগ্রত জীবনের কোনও উল্লেখযোগ্য অংশও নয়। খৃষ্টি তোমরা আমার মত শত শত লোকের জীবনে অনেক আশ্চর্য্য আদর্শ অলৌকিক কাহিনী পাইতে পারিবে, কিন্তু এই অলৌকিকত্ব সমস্ত জগতের লাভালাভের সহিত কোনও কল্যাণপ্রদ সংশ্লিষ্ট রক্ষা করে না। অলৌকিকত্বের ভিতর দিয়া নহে, লৌকিক আচরণের মধ্য দিয়াই আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্যের ছাপ তোমাদের জীবনব্যাপী তুমুল কর্মের প্রকাশ সাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে চাই।

(৬৯)

আমাকে বিশ্বাস কতে পারিস্ না ত? বিশ্বাস করিস্ না।
বিশ্বাস কতে পারিস্, তাকেই বিশ্বাস কর। সেই বিশ্বাসই আমি

আবাদ, ১৩৬৭]

No... অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

১৮১

BANARAS

আমাকে ছেড়ে জগতের সব স্থানে যিনি আছেন আর যাঁরা আছেন, তাঁদের সবার মধ্যে আমিই আছি।

(৭০)

দেখতে যারা জানে, তারা ভগবানকে উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতরেও দেখতে পায়, অসংঘমের ভিতরেও দেখতে পায়। কিন্তু সংঘমের ভিতর দিয়ে ভগবানকে যত সহজে লাভ করা যায়, যেচ্ছা-চারিতার ভিতর দিয়ে তত সহজে লাভ করা যায় না। এই জগুই দেখ সকল শাস্ত্র, সকল পন্থা, সকল ধর্ম সংঘমের এত প্রশংসা কচ্ছেন। তোমরাও সাধ্যমত সংঘমী হও। কারণ, সংঘমই তাঁকে পাবার সহজ পথ।

(৭১)

গায়ের জোরে সংঘম হয় না। ভগবানকে ভালবাসলে সহজে সংঘম হয়। পৃথিবীর সব ভালবাসার বস্তুর চেয়েও তাঁকে বেশী ভালবাসার জিনিষ ব'লে জানলে আপনি সংঘম প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়। তাই, প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে তাঁকেই ভালোবাসো। তাঁকে ভালবেসেই জীবের পূর্ণতা, তাঁকে প্রেম ক'রেই জীবের শিবহ।

(৭২)

ক্রমণে হচ্ছে মনটার বিশ্রামের স্থান। শিশুটা স্থির হ'লেই যেমন বিছানায় শুয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি মনটা স্থির হ'লেই ক্রমণে গিয়ে বিশ্রাম নেয়। ব্যাঘ্রটা যেমন সারারাত বনে বনে শিকারের অন্বেষণে ভ্রমণ ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে শেষে ঘুমায় তার গুহায় এসে,

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৮২

মনটাও তেমন ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে
বিশ্রাম নেয় এই ক্রমধ্যে। কিন্তু শুধু বিশ্রামেরই নয়, সজীবনের স্বপ্ন
এই ক্রমধ্যে। এখানেই মনের সাত্ত্বিক প্রকাশ। এখানেই মনের নিম্ন
বিকাশ। এখানেই এসে মন রাজসিক ত্যাগ করে আর তামসিক কামিনী
হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ভূমার অনুসন্ধানে বে'র হবার শক্তি অর্জন করে।
এইজন্তেই যোগীরা মনকে ক্রমধ্যসেবী ক'রে সাধন করার জন্য
উপদেশ দেন।

(৭৩)

ভগবানকে পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় নামজপ। অর্থাৎ
তঁার নাম ধ'রে তঁাকে ডাকতে হয়। নিমিষের জন্য
তঁাকে না ভুলে প্রাণপণে তঁাকে ডাকতে হয়। তঁার নাম
আর তঁার নামকে অভেদ বস্তু জেনে ডাকতে হয়। তঁার নাম হ'লে
জগতে আর দ্বিতীয় বস্তু কিছু নেই, দ্বিতীয় সত্য কিছু নেই, এই জ্ঞানে তঁাকে
ডাকতে হয়। নামকে নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক জেনে নাম জপ
হয়। এরই নাম হচ্ছে প্রাণবন্ত নামজপ। প্রাণ যদি ছাড়ি, তাহলে
ক্ষতি নেই, কিন্তু নাম যদি ছাড়ি, তবেই ম'লাম, এই রূপ বোধ
যে নামজপ, তাকে বলে প্রাণময় জপ। প্রাণহীন বৃক্ষমূলে জলসিক
কল্পে তাতে ফল মিলে না। তাই সকল অনুরাগ দিয়ে, সকল ভাল
দিয়ে, সকল নিষ্ঠা দিয়ে, সকল বিশ্বাস দিয়ে, সকল দৃঢ়তা দিয়ে
সকল নির্ভর দিয়ে নামকে প্রাণবান ক'রে নিতে হয়।

(৭৪)

নাম কতে কতেই নামে প্রাণ আসে। ঠোকা
কতে কতে যেমন পাষাণ থেকে আগুন বেরোয়, জপ

আষাঢ়, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

১৮৩

জপতে তেমন নামের ভিতরে প্রাণের সঞ্চার হয় । তাই জপ ছাড়তে নেই । ভক্তি না এলেও ছাড়তে নেই, বিশ্বাস না এলেও ছাড়তে নেই, প্রত্যক্ষ কোনো ফল না দেখতে পেলেও ছাড়তে নেই, দীর্ঘকাল জ'পে জ'পে ক্লান্ত বা হতশ্রদ্ধ হ'য়েও ছাড়তে নেই । লেগে থাকতে হয়, জোঁকের মতন । প্রাপ্য আমার পাই আর না পাই, দেন্দারের ঘর ছাড়ব না, এই জিদ নিয়ে সুদখোর কাবুলীওয়ালার মত লেগে থাকতে হয় । লেগে যে থাকে, সে মেগে খায় না, পাষণ ফেটে তার জন্ত অমৃতনিঝর বইতে থাকে ।

(৭৫)

নামে যখন প্রাণ জাগে, তখন আর চেষ্টা ক'রে নাম জপতে হয় না । দেহে, মনে, প্রাণে, চিত্তে, বুদ্ধিতে, আত্মায় শুধু নামের হিলোল চলতে থাকে, আকাশে, বাতাসে, জলশ্রোতে, নামের বন্ধার বাজতে থাকে । গতিতে, স্থিতিতে, জাগরণে আর নিদ্রায় সমভাবে নামের প্রবাহ বইতে থাকে । নামময় তখন জগৎ, জগন্ময় তখন নাম । অর্থাৎ প্রেমময় তখন জগৎ আর জগন্ময় তখন প্রেম । অর্থাৎ পরমাত্মায় তখন জগৎ, আর জগন্ময় তখন পরমাত্মা ।

(৭৬)

ক্ষুদ্র এই জগৎ, আর বিশাল আমার এই ভালবাসা । এই বিশাল বস্তুকে রাখব কোথায় ? তাই মানুষ স্ত্রী ছাড়ে, পুত্র ছাড়ে, বিষয় ছাড়ে, সম্পদ ছাড়ে, সংসার ছাড়ে, প্রতিষ্ঠা ছাড়ে এবং ভালবাসার শ্রেষ্ঠ পাত্র ভগবানকে তা অর্পণ ক'রে কৃতার্থ হয় । মানে, ভগবানকে সব দিয়ে মানব ভগবানই হ'য়ে যায় ।

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[২ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৮৪

(৭৭)

আমি কি ভগবানকে ভালবাসি? তাঁকে ভালবাস
বড় কঠিন কথা। নিজে জোর ক'রে কি তাঁকে ভালবাস
যায়? তিনি বাসালেই বাসা যায়, তা নইলে নয়। তিনি যদি প্রয়োজন
বোধ করেন, তবে আমাকে ভালবাসতে শেখাবেন, এই বিশ্বাস নিয়ে
তাঁর প্রতি উন্মুখ হ'য়ে থাকাই হচ্ছে ভালবাসার উপায়। ভালবাসা
ব'লে ভালবাসা যায় না। আমি তাঁরই হ'য়ে রইলুম, তিনি নিজ খুশীমত
আমার প্রাণে সর্বস্ব-উজাড়-করা প্রেম সঞ্চারিত করুন,—এই ভাব নিয়ে
নিজেকে তাঁর পায়ে অনুক্ষণ সমর্পণ কত্তে কত্তে হঠাৎ ভালবাসা
অজানিতে এসে যায়। ঝড়ের বাতাস যেমন পাঁজি দেখে বয় না,
ভালবাসাও তেমন হিসেব ক'রে আসে না। “আমি তাঁর, আমি তাঁর,
আমি তাঁর,”—ভাবতে ভাবতে আপনি হঠাৎ বিনা নোটিশে প্রাণটি
বলতে থাকে, “সে আমার, সে আমার, সে আমার”। এই হ'য়ে
ভালবাসার সূচনা

(৭৮)

পাপে, অপরাধে, অনুতাপে, আত্মমানিতে কোটি কোটি
লোকের চিত্ত মুহুমান হ'য়ে রয়েছে। তাদের সবাইকে তোমরা
শুনাও যে, তাদেরও উদ্ধারের উপায় আছে। পাপের মালিন্য,
দুশ্চরিত্রের তাড়না, অপকারীর কলুষ থেকে রক্ষা পাবার পথ তাদের জ্ঞাত
রয়েছে। শুনাও তাদের, ধার্মিকদের উন্নতির জন্তই যুগে যুগে ঈশ্বর
কল্প মহাপুরুষেরা প্রাণপাত করেন নি, পাপী তাপী দুষ্কৃত দুর্গত অসহায়

আষাঢ়, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

১৮৫

অশরণকে বল দেবার জন্ত, ভরসা দেবার জন্ত, উত্থানের পথ দেখাবার জন্তও তাঁরা এসেছেন।

(৭৯)

আমার মন্ত নরনাথের কি উদ্ধার আছে?"—এই সন্দেহে, এই সংশয়ে ত্রিয়মান হ'য়ে রয়েছে কত মানবের আত্মা। তাদের প্রাণে তোমরা বিশ্বাস দাও, তাদের হৃদয়ে তোমরা আশা যোগাও। শুনাও তাদের—“যত মহাপাপীই হোক না কেন, প্রেমময়ের রাজ্যে বঞ্চিত কেউ হবে না, উপেক্ষিত কেউ থাকবে না।”

তেলিয়ামুড়া সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ *

শ্রদ্ধের প্রতিনিধিবর্গ, সমাগতা মাতা ও ভগিনীগণ এবং মাননীয় অতিথিবর্গ,

ত্রিপুরা-রাজ্যের প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তাহার কারণ শ্রীশ্রীবাবামণি। কয়েক বৎসর পূর্বে পুণ্য এক মাঘের দিনে আমাদের পরমারাধ্য বাবামণি, শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব, এই ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাতে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। সেদিন ত্রিপুরার এই প্রসিদ্ধ সহরের রাজপথে একত্র তিন লক্ষ লোকের

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, ১২ই জুন, ১৯৬০, রবিবার ত্রিপুরা রাজ্যস্থিত তেলিয়ামুড়াতে অনুষ্ঠিত অঞ্চল-প্রতিনিধি-সম্মেলনে প্রদত্ত।

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৮৬

সমাবেশ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ছায়াছবির পাঁচখানা ক্যামেরায় সেই ছবি ধরিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং আমি যদি বলি যে, রাজনৈতিক হিসাবে যাঁহার ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁহারও এত বড় জন-সম্মুখীন পান নাই, তবে তাহা রূপালী পর্দার আলোছায়ার ছবি দিয়া অনর্থকাল ধরিয়া প্রমাণ করা চলিবে। পাসপোর্টের অশেষ কড়াকড়ি থাকি সত্ত্বেও সেই সময়ে প্রায় সত্তর হাজার নবনারী পূর্ববঙ্গ হইতে এই উপলক্ষে সমাগত হইয়াছিলেন এবং তাহার প্রমাণ আমি ত্রিপুরা-রাজ্যের তৎকালীন ফুড সেক্রেটারীর এক উক্তি হইতে প্রদান করিতে পারিব। ত্রিপুরা-রাজ্যে দুর্ভিক্ষের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি সাংবাদিকদের নিকটে একটা অদ্ভুত কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, যাহা ইউ, পি, আইর গারফতে ভারতের সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহার ফলিতার্থ এই যে, আট লক্ষ লোকের সম্মুখের খোঁরাকী পূর্ববঙ্গ হইতে আগত সাধুদর্শনার্থী এই সত্তর হাজার নবনারী এক সপ্তাহে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফুড সেক্রেটারী মহাশয় নিজেদের কোনও গলদ ঢাকিবার জ্ঞান সংসারত্যাগী সাধুর পরিত্যক্ত কোপীন দিয়া মুখ ঢাকিয়াছিলেন, ইহাই এই জাতীয় উক্তির কারণ হইলেও, এই উক্তি হইতে একটা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা এই যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ আগরতলায় আসিলে এবং পাসপোর্টের শৃঙ্খল সাময়িক ভাবে শিথিল করিয়া দিলেও পূর্ববঙ্গের যতগুলি লোক আগরতলা আসে না, তাহার অনেক গুণ অধিক লোক পূর্ববঙ্গ হইতে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের শ্রীচরণ দর্শন করিতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা দুইটা সত্য প্রমাণিত

আষাঢ়, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

১৮৭

হইয়াছে। একটী হইতেছে আচার্য স্বরূপানন্দের অসাধারণ জনপ্রিয়তা, অপরটী হইতেছে ত্রিপুরা-রাজ্যের ভক্তগণের অতুলনীয় যোগ্যতা।

আমরা সেই দিন হইতে অন্তর দিয়া ত্রিপুরারাজ্যকে ভালবাসি। আজ আপনাদের প্রেমময় আমন্ত্রণে সেই ত্রিপুরার একটী উল্লেখযোগ্য স্থান তেলিয়াগুড়াতে আসিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আপনাদের সুধন্য প্রেম ও অপার ভালবাসা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আজিকার পবিত্র অনুষ্ঠানের গ্রায় গরীয়ান্ ব্যাপারে সভাপতির আসনে বসিতে বাধ্য করিয়াছে। ইহা আমার কোনও যোগ্যতা নহে, ইহা আপনাদেরই অকুণ্ঠ স্নেহ। আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমি আমার সহস্র অক্ষমতা সত্ত্বেও যেন সেই পবিত্র কর্তব্য আংশিক ভাবে হইলেও পালন করিতে পারি, বাহার জন্ত আমরা সকলেই এখানে সমবেত। আমরা ভাষণ দিতে আসি নাই, ভাষণ শুনিতেও আসি নাই, আসিয়াছি কাজের মত কিছু কাজ করিবার জন্ত। যদি কিছু কথা কহিতে হয়, তবে তাহা অংশই কহিব বৈকি! তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু কথা কহিতে কহিতে আমরা অনেক সময়ে কেবল কথার জন্তই কথা বলি, কাজ ভুলিয়া যাই, কাজে ফাঁকি দেই। এই সত্যটী বড়ই মর্মান্তিক। এজন্তই শ্রীশ্রীবাবুগণি বলিয়াছেন,—“কাজের শত্রু বেশী কথা।” *

কিন্তু আমাদের কাজ কি? কি করিলে আমাদের কাজ করা হয়? কি না করিলে আমাদের কাজ করা হয় না? এই প্রশ্নটী একান্তই প্রাসঙ্গিক। আমার মতে, আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ শ্রীশ্রীবাবুগণিকে চেনা। আমরা অনেকেই তাঁহাকে চিনি না। মুখে

* শ্রদ্ধেয় শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ যাবৎ মঙ্গল-বাঁধের জন্ত নিজে কদমকে গোন হই হাজার টাকা দিয়াছেন। (প্রঃ সঃ)

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৮৮

মুখে “বাবামণি” “বাবামণি” করি, কিন্তু তিনি যে কে, তাহা জানি না। অবশ্য, তিনি দয়া করিয়া নিজে কে চিনাইয়া না দিলে আমাদের কি ক্ষমতা আছে যে তাঁহাকে চিনিব। তবু, চিনিবার চেষ্টা ত একটা প্রয়োজন। কেহ কি আমরা নিজেদের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, কেন তিনি দীক্ষাদানকালে মাত্র কয়েকটী হরীতকী গ্রহণ করিয়া থাকেন? কেন তিনি বস্ত্র, অর্থ, তৈজস-পত্রাদির প্রত্যাশা করেন না? আমরা কি আমাদের মনকে কখনো জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, কেন তিনি শূদ্র আর স্ত্রীলোকদিগকে পবিত্র ঔঙ্কারমন্ত্রে দীক্ষা দিতেছেন, কেনই বা তিনি বুদ্ধিভেদজনয়িতা ধর্মপ্রচারকদের গ্রায ভিন্ন মতকে আক্রমণ করিতে বা ভিন্ন পথকে গর্হণ করিতে কখনো প্রবৃত্ত হন নাই? কেন তিনি নিজ শিষ্যসংখ্যাবৃদ্ধিতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক বা চেষ্টিত নহেন, কেন তিনি অণু মতের অণু পথের লোকদের সম্প্রদায়-বিস্তার দর্শনে বিন্দুমাত্র কাতর বা জীর্ণায়িত হন না? আমরা কি নিজেদিগকে এই সকল প্রশ্ন কখনো জিজ্ঞাসা করিয়াছি? আমরা কি নিজেদিগকে কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, ষাটশ বর্ষ ব্যাপিয়া যিনি আস্তে আস্তে বিরাট মঙ্গল-বাধকে নির্মাণ করিতেছিলেন, কেন তিনি তাঁর এত বড় সৃষ্টির সংবাদ আমাদের কাহাকেও জানানাইয়া আর্থিক সহযোগ লাভ করিতে প্রলুব্ধ হন নাই? আমরা কি নিজেদিগকে কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, যেই পুপুন্যকীর্তে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সামান্য পর-হইতেই তাঁহাকে কেবল অপরিমিত বাধা আর বিপত্তির মধ্য দিয়াই করিয়া যাইতে হইয়াছে লড়াই, ঠিক সেই স্থানটীরই পাথর ভাজিবার কাজে আজও কেন তিনি জোঁকের মতন লাগিয়া রহিয়াছেন। যিনি কোদাল ছাড়িয়া লেখনী ধরিলে এখনো জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের অগ্রতম হইতে

আবাহ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

১৮৯

পারেন, ভিনি কোদাল ছাড়িতেছেন না কেন? কি সেই স্বার্থ, কোন্ সেই প্রয়োজন, তাহা কি আমরা নিজেদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি?

তাহা আমরা করি নাই। তাহা করি নাই বলিয়াই আমরা অমূল্য স্বরূপানন্দ-সাহিত্যের সঙ্গে নিজেদের কোনও ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করি নাই। আমাদের মনে এই পবিত্র জিজ্ঞাসা জাগে নাই বলিয়াই আমরা আমাদের প্রাণারাদ্য শ্রীশ্রীবাবামণিকে চিনিতে চেষ্টা করি নাই। গুনিয়াছি, বিশ্বভারতীর একজন অধ্যাপক আচার্য্য স্বরূপানন্দ সম্পর্কে এক গবেষণা-প্রবন্ধ রচনায় কয়েক বৎসর যাবৎ আত্মনিয়োজিত হইয়া রহিয়াছেন। আচার্য্য স্বরূপানন্দকে জানিবার জ্ঞান বহু বহু বিদেশী মনীষীও উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছেন কিন্তু হতভাগ্য আমরাই তাঁহাকে জানিবার জ্ঞান, চিনিবার জ্ঞান ব্যাকুল নহি। শ্রীশ্রীবাবামণি এতদিন বলিয়াছিলেন,—“ওরে, আমাকে চিনিতে হইলে বিশ বৎসর ধরিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়া দুঃখার্ভ জীবকুলের জ্ঞান কেবল দুঃখ কেবল বেদনা সহিতে হইবে, তবে আমাকে চিনিতে পারিবি।” একপার একবর্ণও মিথ্যা নহে! আমরা তাঁহার পবিত্র চরণ-শান্নিধে দাঁড়াইয়া দুঃখার্ভ জীবকুলের জ্ঞান কোনও দুঃখই নিমেষের জ্ঞান সহিতে রাজি নহি। আমরা তাঁহাকে চিনিব কি করিয়া?

এই জ্ঞানই আমরা অনেকেই বুঝিতে পারি নাই যে, মঙ্গলবাঁধের জ্ঞান বাবামণি এত শ্রম কেন স্বীকার করিতেছেন। জলীন দেশে বিরাট এক নবসৃষ্ট জলাধার,—মঙ্গলবাঁধের পরিচয় শুধু ইহাই নহে। ইহা জীবসেবার বিরাট একটা পরিকল্পনার গোড়ার শিকড়। মঙ্গলবাঁধ ভাঙ্গিয়া একটা জলাশয়ই মাত্র নষ্ট হয় নাই, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্তর্গত ভগবতী আর বাণী বিদ্যাদায়িনী এক সঙ্গে হাত মিলাইবেন বহু তরুণ কন্ঠ ও উদ্যমশীল বিদ্যার্থী শোপাঙ্কনের

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৯০

মহিমায় উন্নত শ্রেণীর বিদ্যালয় করিয়া অবিস্থাকলুপিত পৃথিবীতে নূতন যুগ-চেতনার এক অভিনব যুগান্তর আনয়ন করিবে,—ইহাই মঙ্গলবাঁধ। মঙ্গলবাঁধ একটা জড় পদার্থ মাত্রই নহে। মঙ্গলবাঁধ একটা বিরাট সুপরিকল্পিত ধারাবাহিক জীবকল্যাণের সূর্ত্তিমন্ত প্রতীক। অপ্রত্যাশিত একটা জলের ধাক্কায় আমাদের গুরুদেবের নিজ শ্রমে নির্মিত বারো বৎসরের একটা কীর্ত্তি নষ্ট হইয়া গেল, মঙ্গলবাঁধ ভাঙ্গা ব্যাপারটা মাত্র এতটুকু ঘটনাই নহে। মঙ্গলবাঁধকে আশ্রয় করিয়া যে বিরাট এক পরিকল্পনা লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ-ভঞ্জনের জন্ত গড়িয়া উঠিতেছিল, মঙ্গলবাঁধের বিপর্যয় তাহাতে সৃজিল অবরোধ। মঙ্গলবাঁধের প্রকৃত তাৎপর্য ইহা।

আপনারা অনেকেই জানেন যে, মঙ্গলবাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে আমার ত্রায় অযোগ্য ব্যক্তির উপরেই শ্রীশ্রীবাবামণি অপার কৃপা প্রদর্শন করিয়া মেরামতের প্ল্যান ও এস্টিমেইট তৈরী করিবার ভার দেন। আমার প্লানের উপরে ভিত্তি করিয়া ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং বাবামণির পরম ভক্ত, বর্ত্তমানে বারাগমীবাগী শ্রীকালীনাথ দে মহাশয় একটা নবতর পরিকল্পনা দেন। তাহার সহিত শ্রীশ্রীবাবামণির চূড়ান্ত পরিকল্পনা মিলিত হইয়া আমাদের পরিকল্পিত বাঁধ একটা বিরাট ছাত্রাবাসের আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে। বাঁধ-মেরামত উপলক্ষে যে বিপুল ব্যয়-সমন্বিত ভিত্তি পুণ্ড্রকীর জলাশয়ের ভগ্নমুখে নির্মিত হইয়াছে, তাহার উপরে দেখিতে না দেখিতে অনায়াসে এবং অল্প ব্যয়ে একটা ত্রিতল, চতুস্তল বা পঞ্চতল প্রাসাদ নির্মিত হইয়া যাইতে পারে। এবং তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বাঁধ-মেরামত-পরিকল্পনা আংশিক ভাবে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অর্থাৎ মঙ্গলবাঁধটুকুর পুনর্নির্মাণ ঘেই মুহূর্ত্তে

আষাঢ়, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

১১১

শেষ হইবে, তদুত্তরেই যে নূতন ইষ্টক খণ্ড এই বাঁধের উপরে জোড়াই হইবে, সেখান হইতে আরম্ভ হইবে একটা বিরাট ছাত্রাবাসের নিৰ্ম্মাণ, যাহার এক এক তলে কমপক্ষে ত্রিশ হইতে চল্লিশটা ছাত্রের স্বচ্ছন্দ অবস্থানের জন্ত একটা করিয়া তক্তপোষ ও একখানা করিয়া টেবিল রাখিবার যথেষ্ট স্থান হইবে।

পুপুন্যকীর বিদ্যানিকেতনের বৈশিষ্ট্য আলোচনার ইহা স্থান নহে, তদ্বিষয়ে আমার যোগ্যতাও স্বল্প। তবে এই বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত হইতে পারেন যে, প্রাতঃকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১০।০টা পর্য্যন্ত ঠায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাজ দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ আচার্যের পা ফুলিয়া গেল, তিনি শ্রম করিতে করিতে চলচ্ছত্রহীন হইয়া পড়িলেন,—এত বড় ঝুঁকি তিনি যে নিজ স্বাস্থ্যের উপরে নিলেন, তাহা কেবলই মাত্র একটা মস্ত বড় পুকুরের পার মেরামতেরই জন্ত, তাহা নহে। ইহার পশ্চাতে ব্রহ্মচর্য্যবলে বলীয়ান একদল শক্তিমান বিদ্যার্থীর জীবকল্যাণকল্পে আত্মগঠনের সুব্যবস্থার সুপরিকল্পিত এবং বহু বর্ষের নিরন্তর অনুধ্যানের নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ভাবী ভারতে এমন ছাপমারা ছাত্ররা বাহির হইবে, যাহারা অনার্জ্জনের জন্ত পরমুখাপেক্ষী হয় না, যাহারা পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপালনে পরাজুথ হইয়া গেরুয়া পড়িয়া ডিফার্টনে ও ডিফানে জীবন অতিপাত করে না, যাহারা নিজেদের অর্জ্জিত বিদ্যা ও সঞ্চিত শক্তি জগতের মঙ্গলের জন্ত প্রয়োগ ও নিয়োগ করে, যাহাদের জীবিকা ও জীবন উভয়ই পুরাণে এবং পরমাণুতে, কেবলই স্বার্থের জন্ত

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৯২

নয়। এমন এক অভিনব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রতিষ্ঠানই শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব গড়িয়া তুলিবার জন্ত বিগত চৌত্রিশ বৎসর যাবৎ একই বন্ধুর মৃত্তিকায়, একই কঙ্কর-প্রস্তরে অবিশ্রাম গাতি আর শাবল ঢালাইয়া যাইতেছেন। সেই মৃত্তিকার নাম পুপুন্কা। সেই নিষ্করণ প্রস্তরের নাম পুপুন্কা। অনাতিথেয় যেই দুঃস্বপ্নকে সর্বজীব-প্রীতিকর মুখময় সত্যে পরিণত করিবার জন্ত ধৈর্যের অধিতীয় দৃষ্টান্ত শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব কলিযুগের দধীচির ত্রায় নিজের অস্থিদান করিতেছেন, তাহার নাম পুপুন্কা আশ্রম। পাথর কাটিয়া তিনি জল বাহির করিতেছেন, মরুভূমি ভাঙ্গিয়া তিনি নন্দনোত্তান সৃষ্টি করিতেছেন আর তাহারই জন্ত তিলে তিলে আয়ুষ্কর্য করিতেছেন, এই বৃদ্ধ বয়সেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছেন। চোট-লাগা পায়ের অমহা বেদনা নিয়া এই সেই দিন, বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি সাড়ে আটটার সময়েও নিজ হস্তে ছরমুজ ঢালাইয়াছেন। পরক্ষণেই তিনি ট্যাক্সিতে চাপিয়াছেন চিকিৎসকের নির্দেশে আর আজ তিনি রুগ্নাবস্থায় মুম্বরীর পর্বতকোড়ে অনিচ্ছায় বিশ্রামরত। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই গুরুতর অসুস্থতার জ্ঞাত আগামী ১৮ই আশ্বিন তারিখে পুপুন্কা আশ্রমে তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না এবং পুপুন্কা মঙ্গলবাদের উৎসব তাঁহার জন্মদিন ১২ই পৌষে পিছাইয়া গিয়াছে।

আমাদের ভিতরে কি এতটুকু মমতা বা সহানুভূতি বিধাতা প্রদান করেন নাই, যাহার বলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, কেন শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুন্কাতে এত কঠোর শ্রম করিতেছেন? আমাদের কল্লনাশক্তি কি এতই জড়; আমাদের বুদ্ধিবল কি এতই বিকল যে আমরা বুঝিতে সমর্থ হইব না, কেন এই বৃদ্ধ বয়সে একজন পদ্ধগুপ্তশ্রদ্ধাধারী। লোকাচার্য্য নিভূতে বসিয়া পরপারের কড়ি না গণিয়া পাথরের টুকরা

আষাঢ়, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

১৯৩

আর সিমেন্টের বস্তা গণিতেছেন? অলোকসামান্য সাহিত্যের স্রষ্টা, অতুলনীয় জনসেবার প্রসিক্ত, বাগ-বিভূতিতে যুগধর, অল্পম কৰ্ম্মযোগের প্রবর্তক এই অশাধারণ মহাপুরুষ কি বুধাই এই পরিশ্রম করিতেছেন?

আমাদের যদি এক কথা বুদ্ধি থাকিত, এক তিল মমতা থাকিত, তাহা হইলে হাজার ওজর-আপত্তি দূরে সরাইয়া রাখিয়া আমরা এই শক্তিদর স্রষ্টার পাদমূলে উপনীত হইয়া বলিতাম—“হে গুরো, আমরা অবোধ্য হইলেও এই শিষ্যদের হাতে তোমার সৰ্ব্বকৰ্ম্ম অর্পণ কর।”

ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণ, বলুন আপনারা, আজ কি আপনাদের গুরুদেবকে এই কথা বলিয়া আশ্বাস দিতে পারিবেন? পারিবেন কি তাঁহার হস্ত হইতে জোর করিয়া সব গুরুভার কৰ্ম্ম কাড়িয়া লইতে? পারিবেন কি তাঁহাকে বিশ্রাম দিবার জন্ত নিজেদের ক্ষুদ্র-বুৎ সৰ্ব্বস্বার্থ বিসর্জন দিতে? যদি পারেন, তবেই আমাদের এই মঞ্চে কণা কণা সার্থক হইবে, সঙ্গত হইবে। কথা আমরা জীবন ভরিয়াই কহিয়াছি, আরও হয়ত কত না কহিব, কিন্তু কাজ করিবার সুযোগ জীবনে কয়বার আসিবে? এই বিষয়টাই আজ আমাদের বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

অন্য আমার বাহা কিছু বক্তব্য ছিল, সবই আমার বলা হইয়াছে, এখন আমি ক্ষান্ত দিলেও পারি। কিন্তু স্থানীয় একটা অনাতি আপনাদের মনে অশেষ বেদনা সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া সেই বিষয়ে হই একটা কথা বলিব। শুনিয়াছি, এখানে একজন ভাগবত-পাঠক আনিয়াছিলেন এবং তিনি বাবামণির ধর্মমত ও ধর্মপথ সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য ও সমালোচনা করিয়া লোকের মন ভাজিয়াছেন। এক্ষণে কারা সঙ্গত বা অসঙ্গত হইয়াছে, ইহা নিয়া আলোচনার আমাদের

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৯৪

প্রয়োজন নাই। আমাদের মাত্র ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, বিশাল হিমাচলের গাত্রে যদি শকুনরা নিষ্টিবন ত্যাগ করে, তাহা হইলে হিমাচলের তাহাতে কিছু যায় আসে না। শকুনিকে গালি দেওয়া ভাল। হিমাচল চিরকালই দেবতাত্মা থাকিবেন। হিমাচলের মহিমা কিছুতেই খর্ব হইবে না। আপনারা নিজেদের কীর্তনে সাধনে অধিকতর নিষ্ঠাবান হউন, নিজেদের ভজন-পূজনে অধিকতর একাগ্র হউন, নিজেদের ধ্যান-ধারণার অধিকতর মনোযোগ প্রদান করুন। আর একটা কাজ এই করুন যে, বাবামণির শুভাগমন উপলক্ষে বাহাতে হুজুগার্ট লোকেরা দীক্ষার ঘরে না ঢুকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন। জীশূদকে ওঙ্কারমন্ত্রে দীক্ষা-দানের যোগ্যতা বাঁহার আছে, তিনি তাহা দিবেনই। জীশূদকে ওঙ্কারমন্ত্র তিনিই দিবেন, যিনি ইঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা রাখেন। বাবামণিকে কেহ নিন্দা করিলেন বলিয়া আপনারা আবার অপরের প্রতিনিন্দায় প্রবৃত্ত হইবেন না। তবে নিজেদের উপাসনা-কীর্তনে অধিকতর উৎসাহ ও উত্তম প্রদান করিবেন। পরনিন্দা আমরা করিব না, অপরের কৃত নিন্দাতেও আমরা বিচলিত হইব না,—ইহাই হইবে আমাদের পণ। স্বরূপানন্দ-সাহিত্য ঘরে ঘরে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করুন। ইহারই ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের ভ্রম অপনোদিত হইবে। আমুন আমরা নিজেদের জীবন হইতে অসত্য, প্রবঞ্চনা ও দুর্বলতা দূর করি। তাহার বলেই আমরা জগতে শাস্ত হইয়া থাকিব। হিংসার পথে আমরা যাইব না, প্রেমই আমাদের পথ।

আপনাদের স্নেহ-প্রেমে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত। আপনাদের কাছ
আমি চিরস্থায়ী। মুখের কথায় আপনাদের আতিথেয়তার বিনিময়

আষাঢ়, ১৩৬৭]

স্মৃতির অর্থ্য

প্রতিধ্বনি

১৯৫

দেওয়া যায় না। আশীর্বাদ করুন, একনিষ্ঠ গুরুভক্তি লাভ করিয়া আমি যেন আপনাদের ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

(চিনামারা, যোরহাট)

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতির অর্থ্য

(৩বিমলানাথ পাল চৌধুরীর মৃত্যুতে)

দিন যায়, কথা থাকে। এই মায়া-প্রপঞ্চময় সংসারে চলিয়াছে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলা, যত আনন্দ ও বিরহের অশ্রু-মালা গাঁথা হইতেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে, জীবনযুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কাহিনী লিখিত হইতেছে অলক্ষ্যে অজানা অক্ষরে। কাহারও মাধ্যম নাই এই গুলির খতিয়ান রাখার, মানুষের মনের গহনে প্রবেশ করিয়া মৃত্যু আবিষ্কারের, কিম্বা পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট নর-নারীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে হাজির করার।

কিন্তু এত বড় কথারই বা কি প্রয়োজন? কেহ কি পারিয়াছে তাহার অতি আপন জনেরই জীবনের খুঁটিনাটি সব ঘটনার খবর রাখিতে? সে কি জানিয়াছে তাহার পরমাত্মীয়ের, পরমারাধ্যের জীবন-দর্শনের সব বুভুক্ষু? পারে নাই। আমরাও জানিতে পারি নাই আমাদের ৩পিভূদেবের, পরিপূর্ণ রূপটি। বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিয়াছি এক নিরভিমান, নিরহঙ্কার, নিরলস, অহিংসাকৃতি মানব-প্রেমিককে। প্রত্যক্ষ-দর্শীরা বলেন—তিনি জীবনে দারিদ্র্যের কণাধাত নিঃশব্দে মৃত্যু করিয়াছেন, সহিয়াছেন কত কষ্ট, কত

প্রতিধ্বনি

স্মৃতির অর্ঘ্য

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৯৬

বেদনা! ইহার মাঝেও পরোপকারের কোন সুযোগ আসিলে তিনি সবার আগে তাহাই পরিতেন। বিশ্রাম কি বস্তু, তাহা তিনি জানিতেন না। কাজের মধ্য দিয়া তিনি করিতেন নাম জপ, কিন্তু বাহিরে তার প্রকাশ নাই। বাহিরে তিনি ছিলেন নিতান্তই দীন, অন্তরে ধ্যানে ধারণায় অতিশয় মগ্ন। তাঁহার হৃদয়-দ্বার ছিল সকলেরই স্তম্ভ উন্মুক্ত। সেইখান দিয়া যে-কেহ প্রবেশ করিয়াছে, সে-ই তাঁহাকে জানিয়াছে আপনার জন রূপে। তিনি দীক্ষা নিয়াছিলেন কুলগুরু কাছ হইতে। কিন্তু সন্ন্যাসী গুরুর কাছ হইতে পুত্রদের দীক্ষা গ্রহণে তাঁহার ছিল কোন আপত্তি, বরঞ্চ আমাদের সদগুরুলাভ তাঁহার গুভাশিসে ছি পুত্র। আমরা দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জানিলাম—“বহু প্রতীক জপের শব্দ” ও পিতৃদেবকে তাহা স্তাপন করিলে তিনি আমাদের নিত্য পূজার স্থানে একমাত্র অখণ্ড-বিগ্রহকেই দিলেন সার্বভৌম অধিকার, - অত্যাশ্চর্য দেবীর মূর্তি হইলেন অপসারিত। পূর্বসংস্কার নিমেঘে কাটাইয়া ফেলিলেন। এইভাবে আমাদের সংস্কার-মুক্তির পথে, আমাদের ইষ্টনিষ্ঠার অনুরোধ তিনি দিয়াছিলেন তাঁহার অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

তবু তাঁহাকে আমরা সম্যক চিনিতে পারি নাই। আজ তিনি পৃথিবীর সকল ধরা-ছোয়ার বাহিরে। তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া আমরা পঞ্চভ্রাতা জননী-সমেত অখণ্ডমতে এগার দিনের দিন নগর সংকীর্ণ সহ স্মৃতি পরিচর্যা, সমবেত উপাসনা, হরি-ও কীর্তন, নামসম্বল, গরীপ দুঃখীদের মধ্যে অন্নদান, বস্ত্রদান, ও স্বর্ণদান, প্রভৃতির ভিতর দিয়া করিয়া আসিয়াছি বিগত ৩০শে ফাল্গুন কাছাড় লক্ষ্মীপুরের অন্তর্গত তিলকা চা-বাগানে। ইহারও একটা ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে।

একবার শারদীয়া পূজার সময় আমি ও আমার ভ্রাতা কল্পদাম্রস

জনক-জননী সমভিব্যাহারে যাঠ পূণ্যধাম বারধামী। আমাদের

আষাঢ়, ১৩৬৭]

স্মৃতির অর্থ্য

প্রতিপদনি

১৯৭

খাওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছিল স্থানীয় এক ধর্মশালায় : কিন্তু একটাবেলা
 সাতক্রান্ত হইতে না হইতেই শ্রীশ্রীবাবামণির অসমীম-অনুগ্রাহে স্থানান্তরিত
 হইলাম। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার নিজ বাসকক্ষে আমাদের বাসস্থানের
 দিগেন নির্দেশ, আর নিজে নামিয়া আসিলেন আশ্রম-বিল্ডিং-এর নীচের
 তলায়। আশ্রমে কয়দিন থাকার পরই লক্ষ্য করিলাম—আমাদের
 ৩পিতৃদেব অথও আদর্শ, তথা বাবামণির মত ও পথের প্রতি একেবারে
 ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। এ যেন অনেকটা নাড়ীর টানের মত। কাশীতে
 আমরা প্রায় দেড় সপ্তাহ ছিলাম। তার মধ্যে মাত্র একদিন কি দুইটি
 দিন তিনি গিয়াছেন বিশ্বনাথের মন্দিরে। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাস
 করিলাম....“বাবা, তুমি দেখি আর বিশ্বনাথের মন্দিরে গেলে না?”
 “হাছি-ই ত, বাবা, বিশ্বনাথের কোলে,” উত্তর করিলেন ৩পিতৃদেব।
 সন্তুষ্ট হইলাম, মুগ্ধ বিশ্বাসে তাঁহার মুখ-পানে রহিলাম তাকাইয়া।
 তারপরে নিঃশব্দে উঠিয়া প্রবেশ করিলাম উপাসনা-প্রকোষ্ঠে।
 দেওয়ালে টাঙ্গান রহিয়াছে কতিপয় বৃহৎ বৃহৎ তৈলচিত্র—শ্রীশ্রীবাবামণির
 সাধন-জীবনের বিভিন্ন অবস্থার নীরব সাক্ষী। এই সকল চিত্রের মধ্যে
 রহিয়াছে একখানি স্মৃচীশিল্প। কোন ছবি নয়—জলন্ত অন্তর যেন
 লিখা রহিয়াছে একটি প্রার্থনা—

“তুমি-ই যে শিব,

‘তাহা বুঝিতে দিও।’

বুঝিলাম, উক্ত স্মৃচী-শিল্পের ভিতর দিয়া যে চরম আকৃতি পরম প্রার্থনা-
 রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাই পবিত্রপূর্ণ সত্যরূপে উপলব্ধি
 করিয়াছেন আমাদের পিতৃদেব। তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—
 “বাবা, তোমাদের যুহান পর আমরা কোন্ সতে তোমাদের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য

প্রতিধ্বনি

স্মৃতির অর্থ্য

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

১৯৮

করিব ?” “বাবামণির মতেই করিও। তাহাতে আমার আত্মার শান্তি হইবে,” উত্তর করিলেন পিতৃদেব। শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতি পিতৃদেবের অসীম ভক্তিব পরিচয় পাইয়া সে দিন আমি যেন তাঁহাকে নূতন করিয়া চিনিলাম, শ্রীহনুমান যেমন শ্রীনাথ ও জানকীনাথকে পরমাত্মা হইতে অভেদ জানিলেও রাজীবলোচন রামচন্দ্রই ছিলেন তাঁহার জীবন-সর্ব্বার্থক তেমনি বাবামণিকে ও আমাদের পিতৃদেব জানিলেন তাঁহার আরাধ্য দেবতা রূপে। ‘বাবামণি’ শুধু একটি denotation নহে পরন্তু conotation ও বটে ; ‘বাবামণি’ তাঁহার জপমন্ত্র।

বারাণসী হইতে ফিরার পথে পিতৃদেব তাঁহার বিদ্বাংসের অনুকূলে লাভ করিলেন আর একটি প্রেরণা। আমাদের এক আত্মীয় বেল-বিভাগে চাকুরী করেন। তিনি আমাদের মাতৃদেবীর জন্ত এক-খানি ‘পাশ’ সংগ্রহ করিয়া দেন। এই ‘পাশ’ খানি লইয়াই ফিরার পথে বাধিল এক মহা অনর্থ। আমরা যাহারা শিলংএর যাত্রী, শিলং চলিয়া আসিয়াছি। তাই পথিমধ্যে পিতৃদেব এই আকস্মিক উৎপাত অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। গাড়ী তখন আমাম হিলসেন্সনের কোন এক ষ্টেশনে আসিয়া থামিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জনৈক টিকিট-চেকার ঐ কামরায় প্রবেশ করিলেন। তিনি ‘পাশ’ খানির মধ্যে কি একটি ক্রটি বাহির করিলেন এবং বেনারস ক্যান্ট হইতে বদরপুর জং পর্য্যন্ত সমস্ত পথের ভাড়া দাবী করিয়া বসিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই এই ভাড়া দিবার মত সামর্থ্য পিতৃদেবের ছিল না। অনন্তোপায় হইয়া পিতৃদেব মনে প্রাণে বাবামণিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটয়া গেল। ট্রেনের কামরার এক দিকের একখানি দরজা—কেহ ঠেলিয়া দিলে যেমন হয়, তেমনি খুলিয়া গেল

আষাঢ়, ১৩৬৭]

স্মৃতির অর্থা

প্রতিধ্বনি

১৯৯

আর এক মোম্যা-দর্শন, শ্রাদ্ধগুপ্ত বিশিষ্ট মহাপুরুষ তাঁহার অভয়-হস্ত
খানি উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে টিকিট-চেকারও কাহার
নির্দেশে কোন্ মুহূর্তে যে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তাহা কেহ জানিতেও পারিল
না। বিভূতি দর্শন সকলের হয় না; জগৎ-আলোড়নকারী, ভাব-
বিপ্লবক অশেষ দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণও বিভূতি প্রদর্শন সময়ে
এড়াইয়া চলেন। কিন্তু ভক্তাধীন ভগবান, তাই ভক্তের আকুল
প্রার্থনায় তাঁহাকে সেদিন ছুটিয়া আসিতে হইল বারানসী ধাম হইতে।

কোন এক মনীবী বলিয়াছেন—মানুষের জন্মস্থান তিনটি, তিনটি-ই
একত্রজড়িত। প্রথমটি পৃথিবী, দ্বিতীয়টি স্মৃতিলোক, এবং তৃতীয়টি
আত্মিক বা চিত্তলোক। চিত্তলোক সর্বমানবচিত্তের এক মহাদেশ।
অন্তরে অন্তরে সকল মানুষেরই যোগক্ষেত্র এই চিত্তলোক, মহাপুরুষেরা
এই চিত্তলোকেই বিচরণ করেন, কিন্তু কখন কখন সাধারণ মানুষের-
ও আহ্বানে আসেন। অকস্মাৎ তাহার চিত্তলোকের দ্বার খুলিয়া যায়।
আমাদের পিতৃদেবেরও জীবনের শেষ অধ্যায়ে এমনি একটি আহ্বান
আসিয়াছিল।

জীবন-সাম্রাজ্যে পিতৃদেব সবকিছু ত্যাগ করিয়া মৌনী তাপসের স্থায়
নিরাসক্ত ভাবে তাঁহার দিন কাটাইতেছিলেন, কিন্তু ত্যাগ করেন
নাই দুইটি বস্তু। ইহাদের একটি হইতেছে তাঁহার প্রিয় জপমন্ত্র
“বাবামনি”, অপরটি বাবামণিরই একখানি ফটো। উহা মৃত্যুর পরেও
তাঁহার শিয়রে টাঙ্গানো ছিল। এই ফটো খানির মধ্যে তিনি লাভ
করিয়াছিলেন সেই আনন্দ, বাহার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া উপনিষদ
বলিয়াছেন ‘আনন্দরূপমমৃতংষদ্বিভাতি’। আর মৃত্যুর পর সেই
আনন্দরূপ অমৃত্যুই তিনি লাভ করিলেন চিরশান্তি। শ্রীশ্রীবাবামণির
সাম্বনা-পত্রেও ইহার রহিয়াছে সুস্পষ্ট উল্লেখ—

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২০০

“আমার এমন ভক্তের অপ্রকটে আগিও অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেছি। তবে তিনি যান নাই, আমায়ই স্নেহের বৃক্ষে ঠাঁই লইয়াছেন। তাঁহার আত্মা শান্তিতে আছে-জানিও।”

তাই, বাঁহার স্নেহের স্নানীতল বক্ষে আমাদের অপিতদেব ঠাঁই নিয়া তাঁহার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারই পাদপদ্মে আমার এই স্মৃতি-অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম।

নিবেদক :—পূর্ণচন্দ্র পালচৌধুরী, শিল্প

ধৃতং প্রেম্না

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর জীজীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
লিখিত সমসাময়িক পত্রাবলী]

(১৩৮)

ইন্দি-ও

কলিকাতা

১৮ই চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ভক্তি-বিনম্র পত্র পাঠে প্রাণ স্নেহে বিগলিত হইল। ত্যাগ, ভক্তি, সেবা এই তিনটি মানুষ-হৃদয়ের পরম অলঙ্কার। এই তিনটি বাহার আছে, তাহার মতন স্নান নাই, তাহার মতন ধনী নাই, তাহার ত্রায় মৌভাগ্যবান্ কেহ নাই। ত্যাগ আসে চিত্তের শুদ্ধি হইতে, ভক্তি আসে ভালবাসার নিঃস্বার্থতা হইতে, সেবা আসে সর্বভূতে ইষ্ট-দর্শনে

আষাঢ়, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্য

প্রাতিপদনি

২০১

রুচি হইতে। তোমাদের প্রতিজ্ঞনের এই পরম সৌন্দর্য্য, পরম সম্পদ, পরম সৌভাগ্য লাভ হউক।

অত্ন লোকে তোমার প্রতি ঈর্ষ্যা-পরতন্ত্র হইয়া বা বিবেচ-বশে কি করিতেছে বা বলিতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি কম দিবে। তুমি তোমার অন্তরের গুঢ়ি বজায় রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। পৃথিবীর একটা প্রাণীর প্রতিও তোমার প্রেম এক কণা বাহাতে না কমে, তার দিকে লক্ষ্য দিও। সাময়িক মানসিক উত্তেজনায় কক্ষভ্রষ্ট হইও না, ক্ষণিকের অবস্থাদে দুর্বলতার কবলে পড়িও না। যে ঘৃণা করে, সে ছোট হইয়া যায়। যে ভালবাসে, সেই বড়। ক্ষমার স্থান নয়নে রাখিয়া জগতের প্রতি বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি তাকাইবে। সহিবুত্তার বশে বন্ধ-পৃষ্ঠ আবৃত্ত করিয়া সংসারে চলিবার অভ্যাস করিবে। তোমাদের আচরণের মধ্য দিয়া প্রকৃত মাধকের দিব্য মূর্তি ফুটিয়া উঠুক।

আর কতকদিন পরেই তোমাদের অঞ্চলে আমার ভ্রমণ-তালিকা করিবার কথা ছিল। কিন্তু পুপুন্যী আগ্রমের কতকগুলি ব্যাধার অত্যন্ত জটিল ও জরুরী হওয়াতে আমি আগামী শারদীয়া পূজার আগ পর্যন্ত ভ্রমণ-তালিকা করিতে হয়ত পারিব না। আত্মসম্মানজ্ঞান, সংবেদন, কুশল এবং তোমাদের নিজস্ব এই লোককল্যাণ-প্রতিষ্ঠানের স্বকীয় বিশিষ্ট-ভঙ্গীতে ভালভাবে চালু হইবার প্রয়োজনের দিক তাকাইয়া তোমাদের শত অনুরোধ আমাকে উপেক্ষা করিতে হইতেছে। তোমরা আমাকে দেখিতে ভালবাস। আমিও কি তোমাদের দেখিতে ভালবাসি না? আমিও বাসি কিন্তু আশু কর্তব্য আমাকে ভ্রমণ-বিরত হইতে বাধ্য করিতেছে। তোমরা অনেকেই লিখিতেছ যে, আমি আসিব বলিয়া উত্তরবঙ্গ আগ্রহে অধীর হইয়াছে। একটীবার মাত্র

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২০২

ভ্রমণে মালদহ, বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহারকে আমি বাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমারও প্রাণের পিপাসা অল্প হইবার কথা নহে। দৈর্ঘ্য ধর এবং দিব্যজীবন যাপন কর। তোমাদের দিব্যজীবনের প্রভাব চারিদিকে বিস্তারিত হউক। সেই প্রভাবের মধ্য দিয়া জনগণ তোমাদের সঙ্গ পাইয়া আমার সঙ্গ লাভ করুক। প্রেমময়স্বভাব সাধকেরা জগতের দুর্লভ রত্ন। তোমরা প্রতিজ্ঞে আমার সেই সুদুর্লভ রত্ন হও। ইতি—

আশীর্বাদক

অরুণাচল

(৫৩৯)

হরি-ও

কলিকাতা

১৮ই চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

মেহের বাবা—, প্রাণভরা মেহ ও আশিস জানিও।

বারংবার কেবল পুপুনকী আর কলিকাতা, কলিকাতা আর পুপুনকী করিতেছি। তোমাদের পত্রের জবাব দিবার ক্ষমতা কোথায়?

দীর্ঘকালের অবাঞ্ছিত পানান্যাসের বিরুদ্ধে যে রুদ্ধ প্রতিরোধ দিবার অঙ্গীকার করিয়াছ এবং যেই অঙ্গীকার এত দিন ধরিয়া সকলের বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছ, তাহার প্রতি তোমার নিষ্ঠা যেন নিমেষের জন্তও শিথিল না হয়। নিমেষের জন্ত নিজের কর্তব্য, নিজের দায়িত্ব, নিজের মহত্ত্ব ভুলিয়া যাইও না। খোয়াই, নামডাং, টাটানগর,—ত্রিপুরা, আমাম, বিহার,—সকল স্থানে অত্যাচার

আষাঢ়, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেমা

প্রতিধ্বনি

২০৩

দৃষ্টান্ত সমূহ রহিয়াছে। ইহারা তোমার অগ্রজ। দিবা-পৌরুষ-বলে ইহারা দীর্ঘকালের পূর্বাভ্যাস বর্জন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে। এই সকল জলন্ত দৃষ্টান্ত চখের মন্মুখে থাকিতে তুমি কেন দুর্লব হইবে? ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

মেহের বাবা—, প্রাণভরা মেহ ও আশিস নিও।

কুদ্র কুদ্র প্রয়োজনে যাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একে অত্বে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়া কার্যোদ্ধার-চেষ্টার অনুশীলন করে না, বড় বিপদে বা বৃহৎ প্রয়োজনে তাহারা দশজনকে ডাকিতে ডাকিতে বিপদ তাহার করণীয় বিপর্যায় সাধিয়া দর্পভরে চলিয়া যায়, তাহাকে লড়াই দিবার উপযুক্ত চেষ্টাটুকু পর্য্যন্ত করিবার আর সুযোগ মিলে না। এই কথা কে ক্রম সত্য জানিয়া তোমরা তোমাদের দৈনন্দিন ও সাপ্তাহিক প্রতিটি উল্লেখযোগ্য কাজে নিজেরা-যাচিয়া অপরকে সহযোগ দিও, অপরের সহযোগে তোমাদের প্রয়োজন না থাকিলেও নিজের কাজে অপরকে ডাকিও। ইহার শুভময় ফল কেবল তোমাদের কর্মের, সাফল্যই পাইবে, তাহা নহে, তোমাদের স্বভাবের সুন্দরতায়, চরিত্রের মধুরতায়, আচরণের স্নিগ্ধতায় ও বিচারের সহনশীলতায়ও প্রকাশ পাইবে।

প্রতিবর্ষান

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২০৪

তোমরা ইচ্ছা করিলে তোমাদের সাধনার পরম সত্যকে নিজেদের জীবনের আচরণের মধ্য দিয়া দিকে দিকে প্রমারিত করিতে পার। সম্ভবশক্তির বল যেমন সে কার্যের সহায়ক, তোমাদের অন্তরের পরিশুদ্ধ স্কন্দরতাও তদ্রূপ। সাধনের বলেই তাহা লভ্য হয়। তোমরা তোমাদের জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হইতে কখনও বিচ্যুত হইও না। বক্তা বড় নহে, বক্তার বক্তব্যই বড়। তথাপি বক্তার জীবনের সহিত তাহার বক্তব্যের সামঞ্জস্য দেখিতেই জনগণ ব্যগ্র হয় এবং যেখানে এরূপ সামঞ্জস্য বিদ্যমান, সেখানেই বক্তব্য মনোগ্রাহী হয়, অজের হয়। ইতি—

আশীর্বাদক

অরূপালঙ্কার

(৫৪১)

হরিণ্ড

কলিকাতা

২৫শে চৈত্র, ১৩৬১

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

মেহের বাবা—, প্রাণভরা মেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রে তুমি যে পতিতা মায়েদের কথা লিখিয়াছ, শুনিয়াছিলাম, তাহারা পতিতা-বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। দীক্ষার পূর্বেও ইহা আমাকে বুঝিতে দেওয়া হইয়াছিল যে, ইহারা জীবনের মোড় ফিরাইবে। মহাপুরুষের কাছে দীক্ষাও নিলাম, আবার পূর্বাচরিত ঐগিত গণিকাবৃত্তিও চালাইতে থাকিলাম,—এই দুইটা অবস্থা এক সঙ্গে চলিতে পারে না। একটা নিদ্বিষ্ট ওরুকে আশ্রয় করিয়া যে লতা বাড়িয়া চলে, সে-বৃক্ষের শির্ষদেশে পৌঁছিতে পারে। প্রতিদিন যে

আষাঢ়, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

২০৫

লতার বৃক্ষান্তর হয়, সে বাড়ে না, বাড়িবার অভিনয় করে এবং প্রাত্যহিক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে ধূলায় লুটায়। গণিকাবৃত্তি অনুসরণ করিয়া নিজের ভিতরের মহত্ত্ব ও গুরুত্বকে প্রকাশিত করা যায় না। জীবিকা হিসাবে যেই ব্যক্তিই যাহা গ্রহণ করুক, তাহা তাহার ভিতরের ব্রহ্মকে জাগাইয়া তুলিবার সহায়ক হওয়া প্রয়োজন,—অন্ততঃপক্ষে তাহা যেন তাহার উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভের পরিণম্য বা হস্তারক না হয়। এক একটা জীবিকার এক একটা বিশেষত্ব আছে। আরও দুই চারিটা জীবিকার ছায় গণিকা-বৃত্তিও সেইরূপ একটা বৃত্তি, যাহা বাহ্যতঃ স্কুমার বৃত্তির পোষক বলিয়া ধরা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তরের স্কুমারত্বকে বিনাশ করে। এই জন্তই কাব্যে ও পুরাণে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, দ্ব্যতী প্রভৃতির রূপ-বর্ণনা যতই সমারোহ সহকারে হইয়া থাকুক, মানুষের সমাজে তাহাদিগকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

দেহধারীমাত্রদেরই মধ্যে দেহদান বা গ্রহণ একটা স্বাভাবিক জন্তব প্রেরণা। ইহার মধ্য দিয়া জীবনশ্রুতি ঘটে বলিয়া কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের পিতামাতার জীবনেও ইহার আবশ্যকতা পড়িয়াছিল। বুদ্ধ-চৈতন্যাদি তাঁহাদের সাংসারিক জীবনাংশে দৈহিক এই আদান-প্রদানকে বর্জন করিয়াছিলেন, এমন ইতিহাস নাই। পুরুষ ও নারীর দৈহিক মিলন কেবল সন্তান লাভেরই সাধন নহে পরন্তু উভয়ের মধ্যে গভীর আন্তরিক প্রীতিরও সাধক। একে অত্ৰকে নিবিড় ভাবে পাইয়া এই দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া একত্ৰতারও অনুশীলন করে। ইহার ফলে ক্রমশঃ অনুভূতির দিগন্ত বাড়িতে বাড়িতে তাহারা দেহাতীত একত্রে গিয়াও কখনো কখনো পৌছায়। এই কারণেই নরনারীর এই দৈহিক

প্রতিধ্বনি

দ্বিতীয় প্রেরণা

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২০৬

মিলনকেই যোগতত্ত্বানুসন্ধী আচার্য্যেরা কেবলই নিন্দনীয় বলিয়া দ্বিধা দিতে পারেন নাই, পূজাদৃষ্টিতেও দেখিয়াছেন।

কিন্তু গণিকার পক্ষে এই ব্যাপারীর প্রভাব-শক্তি পৃথক রকমের। সেই মনস্তত্ত্ব, সেই আচরণের সহকৃত স্বাভাবিক পরিণতি প্রভৃতি সবই একটা আলাদা জাতের জিনিষ। সমাজবদ্ধ জীবনের প্রতি অনুরাগী জন-সাধারণ এই জন্তই গণিকাকে ঘৃণা করিয়াছে। অনেক রমণীরই পাতিত্বের জন্ত সমাজের প্রচলিতচারী ইতরচরিত্র লোকগুলিই দায়ী, তথাপি গণিকাকে সমাজ পূজার বেদীতে বসাইতে পারে নাই। দুই একজন গণিকা গ্রীস, ফ্রান্স বা অন্য দেশের রাজনীতিতে অসাধারণ স্থান অধিকার করিয়া সমসাময়িক কূটনীতিজ্ঞ ধুরন্ধরদিগকে চমকিত করিলেও সমাজ গণিকাকে সমাজ-নেত্রীর স্থান দিতে কখনো স্বীকৃত হয় নাই। গণিকাবৃত্তি আর গণসেবা একাধারে চলিতে পারে না।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যুগান্তরকারী ধর্ম্মান্দোলনের অষ্টা ব্রাহ্ম সমাজ গণিকার জন্তও স্বাধিকারের বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতিরও সীমা ছিলনা, দুঃসাহসেরও অন্ত ছিলনা। গণিকাদিগকে গাণিক্য ত্যাগ করাইয়া সোজাসুজি ব্রাহ্ম সমাজের বধু-রূপে গ্রহণ করাইবার চেষ্টা ও দুঃসাহস তাঁহারা করিয়াছিলেন। উহার সামাজিক সফল বা কুফল যাহাই হউক, একই সময়ে একজন গণিকাও থাকিবে, কুলবধু ও থাকিবে, ইহা ঘটিতে পারে নাই। অনেক গণিকা গাণিক্য ছাড়িয়া কুলবধু হইয়া উঠিয়া আসিয়াছিল দেবী-পূজার বেদীতে, আবার তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন কুলবধুর নরমধুর সলাজ সুন্দরতাকে অসহন বন্ধন গণনা করিয়া পুতিগন্ধময় পাপাচারের প্ররোচনায় ফিরিয়াও চলিয়া গিয়াছিল পতিতা-পল্লীর প্রেতপুরীতে। কিন্তু যুগপৎ দুইটী বৃত্তি চলিতে পারে নাই। পতিতার বাসুধর্ম্মের দীক্ষায়

আষাঢ়, ১৩৬৭]

বৃত্তং প্রেম্যা

প্রতিধ্বনি

২০৭

শুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মপরিবারের বধূরূপে প্রবেশ করিলে মানুষের মনুষ্যত্বকে যে বিরাট সম্মান দেওয়া হইবে, তাহার আত্মপ্রসাদে ব্রাহ্মসমাজের ভক্ত ও অনুবর্ত্তিগণের বুক সেদিন দুহাত ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আবার বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামীর মতন অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রাহ্ম প্রচারক ব্রাহ্ম-সমাজকে এই আগুনে হাত না দিতে সতর্ক করিয়াও দিয়াছিলেন। উদ্ধারকর্মীরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া চাঁৎপুর, গরাণহাটা, রামবাগান, হাড়কাটা গলি আদি গণিকাদের প্রখ্যাত পল্লীগুলিতে নিয়মিতভাবে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। দুই দিকেই ইহার ফল দেখা যাইতে লাগিল। কোনও কোনও গণিকা পতিত জীবনের দুর্গন্ধময় পসরা সেখানেই ফেলিয়া রাখিয়া শুচিন্মিত দেবকন্য়ার ত্রায় মহাসমাদরে উদারচেতা পুরুষগণের গৃহে কুললক্ষ্মীর পবিত্র আগনে বসিলেন। আবার কোনও কোনও উদ্ধারকর্মী অপরকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেই চিরকালের জন্ত নরকের পক্ষে ডুবিলেন, সেই পুত্তিগন্ধময় মলপ্রবাহের উর্দ্ধদেশে আর তাহার মাথা তুলিতে পারিলেন না। কিন্তু পরিণাম-ফলে ইহাই সুসিদ্ধ হইয়া গেল যে, গণিকার উদ্ধার পাইবার অধিকার আছে কিন্তু গণিক্য আর সামাজিক অধিকার একসঙ্গে চলিতে পারে না।

গণিকার কি ধর্মজীবনের প্রয়োজন নাই? গণিকা কি ঈশ্বর-ভজন করিবে না? গণিকার হাত হইতে কি ঈশ্বরকে ডাকিবার অধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইবে? ইহার উত্তর নিশ্চয়ই নেতিবাচক হইবে না। গণিকারও ধর্মজীবনের প্রয়োজন আছে। গণিকাও ঈশ্বর-ভজন আবশ্যই করিবে। গণিকার হাত হইতেও কেহ ঈশ্বরকে ডাকিবার অধিকার কাড়িয়া লইতে পারে না। ঈশ্বর পবিত্রচেতারও আশ্রয়, পরম পাণিষ্ঠেরও আশ্রয়। কিন্তু ধর্মজীবন তাহার যাহাই হউক, গণিক্যবৃত্তি ছাড়িয়া না দিয়া মানুষের সামাজিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবে, আর

প্রতিধ্বনি

দ্বিতীয় প্রেরণা

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২০৮

সমাজবদ্ধ জীবেরা তাহাকে উদার সহিষ্ণুতা সহকারে গ্রহণ করিবে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। তোমাদের ওখানে সম্প্রতি সমবেত-উপাসনা-প্রসঙ্গে যে সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সমাধানকালে এই কথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে।

যাহাদিগকে পতিতা বলিয়া লোকে ঘৃণা করে, তাহাদের প্রতি আমার অসীম উদার স্নেহ ও সহানুভূতি সর্বজনবিদিত। পতিতায়েরা দীক্ষা নিতে আসিলে আমি এই যুক্তিতে তাহাদিগকে কখনও ফিরাইয়া দেই নাই যে, তাহারা পতিতা, অতএব গুরুকৃপা পাইবার অযোগ্য। কিন্তু মহাপুরুষের কাছে যে ব্যক্তি দীক্ষা নিবে, সে কি এমন ভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিবে না, যাহাতে তাহার পতিতা-পন্নীত আর ফিরিয়া যাইতে না হয়? মাতাল, দুশ্চরিত্র, লম্পটকে দীক্ষা দিতে যাহারা পারে, পতিতা নারীকে দীক্ষা তাহারা কোন্ যুক্তিতে দিবে না? দীক্ষার ফলে অনেক মাতাল মদ ছাড়িয়াছে, অনেক বহুনারীগামী লাম্পট্য ত্যাগ করিয়াছে, দীক্ষার ফলে পতিতা কেন পাতিতা ছাড়িতে পারিবে না? মদপান মাতালের জীবিকা নহে, বহু নারীগমন লম্পটের জীবিকা নহে কিন্তু বহুপুরুষগামিতা গণিকার জীবিকা। এই জন্যই দীক্ষার পরেও অনেক গণিকার পক্ষে গাণিক্য ত্যাগ কঠিন হইয়া থাকে। কিন্তু গাণিক্যও ত্যাগ করিব না, অথচ সামাজিক অনুষ্ঠান সমবেত উপাসনাতেও যোগ দিব, ইহা চলিতে পারে না। নিত্য নূতন পুরুষকে যে দেহদান করিয়া অর্থার্জন করিবে, সে সকাল বেলা স্নান করিয়া আসিয়া ধোপার ধোয়া চলী পড়িয়া বসিয়া গেলেই সমাজের সকলের অনুষ্ঠান সমবেত উপাসনায় যোগ দিবার যোগ্য হইয়া গেল, অতি সহজে ইহা ভাবিয়া বা মানিয়া লইতে সমাজের লোকেরা পারে না।

আষাঢ়, ১৩৬৭]

স্বতং প্রেমী

প্রতিধ্বনি

২০৯

একত্ব সমাজের লোকদিগকে অনুদার বলিয়া গালি দিয়া লাভ নাই।

তুমি যেই পতিতা মায়েদের কথা লিখিয়াছ, শুনিয়াছিলাম, তাহারা পতিতা-বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। ঠিকই যদি সত্য হয়, তবে তাহাদের এখন প্রয়োজন বর্তমান বাসস্থান পরিবর্তন। তাহা হইলেই আর কাহারও আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। জীবনের কোন ভগবতঃ দৃষ্টান্তক্রমে একবার যে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, জীবনের যে-কোন সময়ে তাহার মনে যদি সত্যিকারের অনুশোচনা আসে, তবে তাহার সংপথে প্রত্যাভর্তনের রাস্তা খোলা থাকাই প্রয়োজন। তবে, সেজন্তু অপরের মনোভঙ্গিকে আহত না করিতে হয়, তেমন ভাবে চলাও তাহার কর্তব্য। সেই কারণেই আমার পতিতা মায়েদের পূর্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। পূর্ব-পরিচিতদের সঙ্গও সম্পূর্ণ-ভাবে বর্জন একান্ত অপরিহার্য। মনের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে তাহাদের বাহ্যিক আচার-আচরণের পরিবর্তন এমন সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যাহাতে দূর হইতেও সকলে অনুভব করিতে পারে যে, তাহাদের সংসর্গ আর কাহারও অনিষ্টের কারণ হইতে পারে না। নতুবা তাহারা একদিকে সমবেত উপাসনায় ভদ্রসমাজের সকলের সঙ্গ মিলাবার সুযোগ গ্রহণ করিবে, আবার পূর্ব পরিবেশও বজায় রাখিবে, তাহা হইতে পারে না।

পতিত বা অধম বলিয়া কাহারও প্রতি আমাদের অপ্রেম থাকিতে পারে না। প্রেমই জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছে। জগতের একটা প্রাণী সম্পর্কেও আমরা অপ্রেমিক হইতে পারি না। কিন্তু আমাদের প্রেম পণ্ডিতের উত্থানে সহায়ক হওয়া চাই, আমাদের প্রেম সমাজের প্রতি-

প্রতিধ্বনি

ধ্বংস প্রেম

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২১০

জনের কুশলের সহিত অবিরোধী হওয়া চাই, আমাদের প্রেম মানব-
মাত্রের পাপ হইতে অব্যাহতি, চিত্তশুদ্ধিতে রুচি এবং সর্বজনহিত
আত্মনিয়োগের হেতুভূত হউক। ইতি

আশীর্বাদক

অরুণাচল

(৫৪২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৫শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বহু প্রতীক বর্জন সম্পর্কে তোমার ভ্রাতাভগ্নীদের অশেষ দুর্বলতা
লক্ষ্য করিয়াছ এবং তাহাদের দুর্বলতা অচিরাৎ যে দূর হইবে, সেই
আশাও প্রকাশ করিয়াছ। তবে, জিদ-জবরদস্তি বা অপরের অন্তরে
আঘাত দানের পথে তোমরা যাইওনা। অত্যাচার, উৎপীড়ন, নীচতা
এবং ভীতি-প্রদর্শন পরিহার করিয়া কি করিয়া ইহাদের মনে অশ্রু-
প্রেম-বোধ জাগান যায়, তাহার দিকেই লক্ষ্য রাখিবে। অতের দেখা
দেখি হজুগে মত্ত হওয়া আমাদের উচিত নহে। বাহু আড়ম্বরের ধর্মী
বিলাসিতা অপেক্ষা আন্তরিক প্রেমের ধর্মীয় একাগ্রতার মূল্য সহস্রগুণ
বেশী।

জন্মোৎসব-কালে তোমরা বহু সজ্জনকে লইয়া যে আনন্দ করিয়াছ
তাহার বিবরণ পাঠে মুগ্ধ হইলাম। আমার জন্মোৎসবকে তোমরা
কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্মোৎসব বলিয়া মনে করিওনা। আমার জন্ম
তোমাদের মধ্য দিয়া। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ব্রহ্ম

আষাঢ়, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেমা

প্রতিধ্বনি

২১১

উঠিবেন, তবে ত' আমার জন্ম হইল ! আমাকে জানিবে, তবে ত' আমার জন্মোৎসব করিবে ! জন্ম ধাতু হইতে জ্ঞা ধাতু অধিক দূরে নহে। জানিলেই জন্মলাভ হইল, না জানিলে কিসের জন্ম ? আমার জন্মকে জানিয়া তুমি হইলে জ্ঞানী। সঙ্গে সঙ্গে তোমারও হইল জন্ম। অতএব আমার জন্মোৎসব তোমারও জন্মোৎসব। এতকাল সাম্প্রদায়িক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজ নিজ মজ্জাবলুপ্তিতা বৃদ্ধির জন্তু নিজ নিজ গুরুদেবের জন্মোৎসব করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা আমার জন্মকে উপলক্ষ করিয়া বিশ্বের সকলের জন্মের উৎসব করিবে—ইহাই তোমাদের আদর্শ। কতজন কত দেহ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, হয়ত কেহ উৎসব করে নাই। কতজন কত নবতর দেহ লইয়া আবির্ভূত হইবেন, কেহই জন্মোৎসব করিবে না। আগত ও অনাগত সেই সকলের জন্মকে লইয়া যে উৎসব, তাহাই আমার জন্মোৎসব। আমার জন্মের উৎসব উপলক্ষে তোমরা একটা ব্যক্তিরই জন্মোৎসব করিও না। নিখিল বিশ্বের কোটি কোটি পৃথিবীতে যতজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং করিবেন, সকলের সমষ্টি জন্মকে লইয়াই এই উৎসব, ইহা মনে রাখিও। নীচ, হীন, অন্ত্যজের মধ্যেও আমি পরমেশ্বরকে দেখিয়াছি, ঐ কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপের ভিতরেও আমি পরমেশ্বরের বানী শুনিয়াছি। এই দেখা এবং শুনা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনিরপেক্ষ। আমি নিজেকে পরমেশ্বরে এবং পরমেশ্বরকে নিজেতে ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান, আবার সর্বতোভাবে অভিন্নরূপে, উপলব্ধি করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-অতিক্রম করিয়াছি। আমিই যুগে যুগে অবতার হইয়া এই পৃথিবীতে পূজা সংগ্রহ করিয়াছি। আবার আমিই দীন আর্ত পূজক হইয়া পরমেশ্বরকল্প অবতার ও অবতারতুল্য মহাপুরুষগণের পাদবন্দনা করিয়াছি। আমি আমাকে তোমাদের সহিত

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্য

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২১২

অভিন্ন দেখিতেছি। দেখিতেছি, আমিই ঈশ্বর। দেখিতেছি, তোমরাই ঈশ্বর। দেখিতেছি, বাহারা “ঈশ্বর, ঈশ্বর” বলিয়া কাঁদিয়া মরে, তাহারা ঈশ্বর। দেখিতেছি, বাহারা ঈশ্বর নাই বলিয়া জগতে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণিত এবং মানুষের সেই ঘৃণাকে সহ করিতে না পারিয়া মনের আক্রোশে ঈশ্বর-বিগ্রহ বলিয়া পূজিত প্রতীক সমূহকে হাতুড়ীর ঘায়ে চূর্ণ করিয়া অটুহাত্রে দিগন্ত প্রকম্পিত করিতেছে, সেই পরধর্মদ্রোহী, অসহিষ্ণু, ক্ষমতাদর্পী, অতিদুর্বল মানুষগুলিও ঈশ্বর। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই, সবই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরের বোধ যখন বাহার জাগিল, তখনই তাহার জন্ম হইল। তাই আমার জন্মদিন নিখিল ভুবনের সকল জীবের জন্মদিন।

তোমরা আমার জন্মদিনের উৎসবকে সাম্প্রদায়িকতার সন্ধীর্ণতায় বাধিওনা। আবার, অসাম্প্রদায়িকতার ধ্বজা উড়াইয়া আক্ষালন করিবার সন্তা আগ্রহে সকল মত ও সকল পথকে সম্মান দেখাইবার ওজুহাতে প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সাহিত্যে আপোষ করিও না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৬শে চৈত্র, ১৩৫১

পরম কল্যাণীয়াস্তু :—

মেহের মা—, প্রাণভরা মেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের বিবাহ-সংবাদে সুখী হইয়াছি। একই গ্রামের দুই

সম-সাধক-বাধিকা গুরুজনদের একান্ত আগ্রহের ফলে পবিত্র বিবাহ

আষাঢ়, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেরা

প্রতিদ্বন্দ্বি

২১৩

বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি, ইহা বড়ই সুখের। বিবাহের পূর্বেই উভয়ে
লীকার মাধ্যমে জীবনের পরমলক্ষ্যের প্রতি দাবমান হইয়াছিলে।
এখন বিবাহিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের অন্তরঙ্গ হইলে। এখন
তোমরা প্রবল বিক্রমে লক্ষ্যের দিকে নিরন্তর অগ্রসর হইতে থাক।
কিসে অগ্রগমন হইবে, কিসে সংসারের হীন পরিবেশের উদ্ধদেশে
তোমাদের দেহমন বিরাজ করিবে, তার দিকে রাখ খেয়াল। অনন্ত-
বীৰ্য্য অনন্তশক্তি অপরাজ্য-পরাক্রম হও তোমরা দুইজনে। বিবাহ
তোমাদের দেহের বল, মনের মাধুর্য্য, আত্মার শক্তি বিকশিত
করুক,—সমুচিত যেন না করে। তোমাদের বিবাহ তোমাদের শাস্ত
সুখের কারণ হউক।

বেশ কয়েক মাস আগেই আমি তোমাদের বিবাহের সংবাদ
পাইয়াছি। কিন্তু আমার আশীর্বাদ-পত্র প্রেরণের ফুরসৎ কোথায়?
প্রায়শতাব্দিক পত্রের উত্তর দিয়াও সব পত্রের জবাব শেষ করিতে
পারি না। শত শত পত্রের স্তুপ জমিয়া যায়। কিন্তু যে কোনও পত্র
তোমাদের স্বদেশের ডাকঘরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই এখান হইতে
আমার আশীর্বাদ রওনা হয়। প্রত্যেকখানা পত্রকে আমি আমার
পরমপ্রিয় সন্তানদের অবয়ব জ্ঞানে মহাসমাদরে গ্রহণ করি
এবং পত্রে লিখিতে পারি আর না পারি, প্রাণঢালা
আশীর্বাদ তনুহুর্ন্তে প্রেরণ করি। সেই আশীর্বাদ কি
গ্রীষ্মকালীন হিমবায়ুর মত অপ্রত্যাশিত স্নিগ্ধ শিহরণ তোমাদের প্রাণে
জাগায় না? তোমরা কি আমার সেই আশীর্বাদের শীতল পরশ
প্রাণের কোণে পাওনা মা? অনেকে ত পায়। অনেকে ত প্রত্যক্ষ
ভাবে অনুভব করে। অনেকে ত আশীর্বাদের সুশীতল স্পর্শের মাঝে
আমাকে আমার স্বরূপে উপলব্ধি করে।

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২১৪

তোমাদের বিবাহটি ঘটয়াছে পরম শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া। জৈব আকর্ষণ ইহাতে ছিল না, ছিল বিশ্বাস। বিবাহের সম্পর্কে কণামাত্র চিন্তা না করিয়া উভয়ে উভয়কে দীর্ঘকাল দেখিয়া আসিয়াছ পরমভক্ত ঈশ্বর-সাধক রূপে। একের নয়নে অপরের সাধন-পরায়ণ ধ্যানরূচি স্মৃতি নিয়ত শ্রদ্ধা জাগাইয়াছে। এমন সময়ে তোমাদের গুরুজনের তোমাদিগকে সারা জন্মের মত মিলাইয়া দিলেন। দিলেন তোমাদিগকে অন্তরঙ্গ হইবার অধিকার। দিলেন তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া পরমমঙ্গলনিলয় পরপ্রভুর সেবাকে সহ্য করিবার অনুশীলনে দায়িত্ব। আমি তোমাদের বিবাহে সুখী হইয়াছি তোমাদের বিবাহে ত্রিভুবন সুখী হউক।

অতঃ কোনও প্রতিকূল কারণ না থাকিলে বিবাহের পরে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক ব্যবহার স্বাভাবিক। আমি তোমাদের অবস্থাটি বুঝিয়াছি। “ভোগ করিব” বলিয়াই তোমরা দৈহিক প্রমত্ততার অধীন হও নাই, কিন্তু কেমন জানি ব্যাপারটা, এই জাতীয় কোতূহল তোমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। একবার দুইবার মিলিত হইবার পরে তোমরা মনে মনে হিসাব করিয়াছ, লাভ কি হইল, ক্ষতি কি ঘটিল কিন্তু থামিতে পার নাই। যাহা পাইয়াছ বা হারাইয়াছ, তাহা আরও পাওয়া যায় কি না, তাহা আরও হারাইলে অবস্থাটি কি দাঁড়ায়, এই জাতীয় কোতূহল তোমাদের স্বক্ষে ভূতের মতন চাপিয়াছিল। ইহা লইয়া অতিরিক্ত অনুতাপের প্রয়োজন নাই। স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মিলন কোনও অবৈধ, অশাল্লীষ বা অত্যাচার কাজ নহে। তবে মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলিও। তোমার দেহে ও তোমার স্বামীর দেহে পরমদয়াল সদগুরু নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, এই বোধ হইয়া

আবাদ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেমী

প্রতিধ্বনি

২১৫

পাইবে, তোমাদের দুইজনের ভালবাসা না কমিয়াও তোমাদের দৈহিক উচ্ছৃঙ্খলতা কমিয়া যাইতেছে। শরীর ত, শরীরকে ভোগ করে না, আত্মাই আত্মাকে ভোগ করে। শরীর শরীরের সহিত যুক্ত না হইলেও আত্মা আত্মাতে রমণ করিতে পারে। তোমরা উভয়ে আত্মারাম হও। মাত্রাদীন দৈহিক রমণ তোমাদিগকে সীমা-মাত্রা-ইয়ত্তাহীন আত্মার রমণে সমর্থ করুক।

বিবাহের পরেও পড়াশুনা ছাড়িয়া দিবে না। গুনিয়া শ্রুতী হইয়াছি। বিত্তার জ্ঞান ব্রহ্মচর্য্য চাই, কথাকাটা মনে রাখিও। ব্রহ্মচর্য্যহীনের বিত্তা তরল হয়। ব্রহ্মচর্য্য পালনকারীর বিত্তা প্রগাঢ় হয়। স্বামীর সহিত ভালবাসার টান একবিন্দু না কমাইয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালনের সফলতা বিবাহিত জীবনে সম্ভব। এই ধ্যান নিয়ত জপিও। আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ত তোমাদের সঙ্গে আছে। অথবা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি, আমি নিয়ত আমার সন্তানের সাথে সাথে ছায়ার তায় বিরাজমান রহিয়াছি। অথবা অধিকতর সত্য করিয়া কহিতে গেলে, আমি তাহাদের আত্মার আত্মা হইয়া বাস করি। সময় হইলেই স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইবে। আমি কদাচ মিথ্যা আশ্বাস দেই না, ইহা জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

ধ্বংস প্রেরণা

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২১৬

(৫৪৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু :—

২৬শে চৈত্র, ১৩২৫

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। শ্রীমান্
নি—র নামে পুপুন্যকীর ঠিকানায় যে চিঠি লিখিয়াছিলে, তাহা
আমার এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাই আমি জবাব দিতেছি।

তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছ। ইহা বড়ই
স্বথের কথা। আমি আশীর্বাদ করি, তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালনে সমর্থ হইয়া
জগতে মহীয়ান্ পুরুষ রূপে প্রতিষ্ঠিত হও।

তুমি সাময়িকভাবে পুপুন্যকী আশ্রমে অবস্থান করিতে চাহিয়াছ।
স্বথের কথা। ছেলেরা সব বাপমায়ের কথা ভুলিয়া গিয়া সারাজীবন
আশ্রমে বাস করুক, ইহা আমি চাহি না। যে উন্নত মানব-সমাজ সৃষ্টি
করিতে আমি চাহিতেছি, তাহার জন্য গৃহস্থের ঘরে।

সমাজ তোমাকে অনুকূল পরিবেশ দেয় নাই—এজন্য হতাশ হইয়া
বাইও না। মহাবীর্য্যবলে তোমাকে সকল প্রতিকূল অবস্থা জয় করিতে
হইবে। জগতে বিজয়ীরই সম্মান—পরাজিতের কোনও সম্মান নাই।
ব্রহ্মচর্য্য তোমাকে মহাবীর্য্য দিবে। তাহার প্রভাবে তুমি অবশ্যই জীবন-
সংগ্রামে জয়ী হইবে। বীর্য্যহীনের আশ্ফালন মিথ্যা। শৌর্য্যহীনের
আড়ম্বুর নিষ্ফল। ব্রহ্মচর্য্যের বলে বীর্য্যবান ও শৌর্য্যশালী হও।

তোমারই মত যুবকদিগকে আমি জীবন ভরিয়া সহায়তা করিয়া
আসিয়াছি। গৃহস্থের ঘরের স্নেহের পুতলকে কোশল করিয়া সন্ন্যাসী
করা আমার রীতি নহে। দুর্বলকে সবল করিয়া হতাশকে আশার
উৎসাহে সঞ্জীবিত করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার যোগ্য

আষাঢ়, ১৩৬৭]

দ্ব্যতং প্রেরণা

প্রতিধ্বনি

২১৭

করিয়া মাতৃপিতৃ-সন্নিধানে পুনঃ-প্রেরণাই আমার নীতি, দলে দলে
 দ্বিফোপজীবী সন্ন্যাসীর সংখ্যা-বৃদ্ধিতে জগতের কুশল কোথায়?
 পিতৃমাতৃ-সেবা হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিয়া জগজ্জনের অকুণ্ঠ সেবার
 অধিকার চলিছে বস্তু। তুমি পিতামাতার সেবা জীবন ভরিয়া করিবে এই
 সংকল্প নিয়া আশ্রমে আসিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৭শে চৈত্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চাকুরীর একটা বদলীর ব্যাপার নিয়া মন অত খারাপ করিয়া বসিয়া
 আছ শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। মানুষের জীবন সংগ্রামেরই জীবন।
 শত দুঃখ, বাধা ও বিঘ্নের মধ্য দিয়াও অপরাজেয় সঙ্কল্পে তাহাকে জয়-
 লান্ধের আকাঙ্ক্ষা নিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। ভগবানের যে পরম-
 মঙ্গলময় নাম জগতের সকল বিঘ্নকে পরাহত করিতে পারে, সামান্য একটা
 বদলীর ব্যাপারে তোমার উদ্ধতন কন্সকর্তাগণ তোমার অভিলাষ-পূরণ
 করেন নাই বলিয়াই সেই নাম হইতে তোমার মন উঠিয়া গেল, ইহা
 আশ্চর্য্য খবরও বটে, অগৌরবের কথাও বটে। নিজেকে কেন তুমি
 এত দুর্বল হইতে দিবে? যেখানে যে অবস্থায় থাক, নামের সেবার মধ্য
 দিয়া নিজেকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা কর। দুর্বলের অক্ষম ক্রন্দনে
 জগতের একটা প্রাণীও গলিবে না। সবলের ধন-হুকার তোমার কণ্ঠে

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২১৮

শুনিতে চাই। সবল কখনও দিনরাত বসিয়া হায় হায় করে না। তুমি দুর্বলতা পরিহার কর। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৭শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

তোমাদের অঞ্চলের অনেক ভক্ত ব্যক্তি যে দর্শনের আশায় বা দীক্ষার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন, তাহা আমি জানি। দরং জিলার ঐ সুদূর অঞ্চলে যাইবার আকাঙ্ক্ষায়ও আমার অনেক কাল ধরিয়া। কিন্তু এখনই যাওয়া হইয়া উঠিতেছে না। যাবৎকাল আমার আগমন সম্ভব না হয়, তাবৎকাল হরি-ওঁ মহানামের কীর্তন দ্বারা সকলের মনকে জগৎপরায়াণ রাখ। অথগুসংহিতা পাঠ করিয়া করিয়া প্রত্যেককে বারংবার শুনাও এবং প্রত্যেকের মনে স্থায়ী আধ্যাত্মিক উন্মাদনা ও ধর্মলাভের শাস্ত্র আগ্রহ সৃষ্টি কর। বেশী চাষে জমি কখনও নষ্ট হয় না। অল্প চাষের জমিতেই ফসল কম ওঠে। প্রত্যেকের মনের ভূমি অথগুসংহিতার সীতা * বারংবার চালাইয়া উর্বর করিতে থাক। তুমি একটী রমণীমাত্র, কিন্তু রমণী যে কত শক্তি ধরে, তাহার পরিচয় তুমি তোমার

* সীতা = লাক্ষ্মীর ফলা।

আষাঢ়, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেয়া

প্রতিধ্বনি

২১৯

একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং সংগঠন-প্রতিভার মধ্য দিয়া দাও। তোমার “হরি-ও-মন্দির” এক চিরস্থায়ী অধ্যাত্মপ্রেরণার কেন্দ্র ইউক।

মনুষ্য-সমাজ তিন দিকে তিনটি বিপত্তির মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি বিপত্তি এই যে, সংঘবলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে লইয়া একদল লোক প্রচুর লোকবল ও অর্থবল প্রয়োগ করিয়া করিয়া জগদ্ব্যাপিয়া এই ধারণাকে প্রসারিত করিবার জন্ত চেষ্টা পাইতেছে যে, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর অলৌকিক, ঈশ্বরকে শিখণ্ডী রূপে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া মুকোশলী চাল-কলা-ভোজী রাজক সম্প্রদায় কেবল পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার আয়োজনে ব্যস্ত। অপর একদল লোক কোনও প্রকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী না হইয়াও বুদ্ধি, প্রতিভা ও নিষ্ঠার বলে স্বপমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছেন এবং তাহারা কায়-মনোবাক্যে স্বতঃ ও পরতঃ মানুষের মনে ঈশ্বর-সম্পর্কে-তীক্ষ্ণ-সমালোচনা পূর্ণ সংশয় সমূহের জনক হইয়াছেন ও হইতেছেন। অপর এক দল লোক যাহা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ, যাহা কিছু অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে, যাহা কিছু বুদ্ধির অগম্য বা ব্যাখ্যার সহিত অসমঞ্জস, তাহাকেই অকৃত্রিমতম ধর্ম বলিয়া অনিচ্ছুক মনগুলির উপরেও জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া বলিতে চাহিতেছেন যে, এই পথেই চল, নতুবা তোমাদের বংশনাশ হইবে, অনন্ত নরক হইবে।

এই ত্রিধা-মল্লটের মাঝখানে তোমাকে শক্ত মেরুদণ্ডে দাঁড়াইতে হইবে। এমন ধর্মের বার্তা তোমাকে শুনাইতে হইবে, যাহা নিম্নাধর-বাদীদের প্রচারকে ভয় করে না। এমন ধর্মের বাণী তোমাকে উদ্গীর্ণ করিতে হইবে, যাহা সকল সন্দেহবাদী ও সংশয়াত্মক সংশয়-সন্দেহকে স্তব্ধ করিয়া দিবে। এমন ধর্মের পৌরুষ তোমাকে প্রচার করিতে

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২২০

হইবে, বাহ। কুসংস্কারের রাহগ্রাস হইতে শাস্ত্র সনাতন অক্ষয় অব্যয়
অনুপম ধর্মকে অক্ষত এবং নুক্ত রাখিবে।

এই শক্তি তোমার আছে। কেবল বিশ্বাস রাখ।

পুপুন্যকীর সাম্প্রতিক বিভ্রাটে মা—হইতে খুব ভাল সাড়া আসে
নাই। মনে হয়, তোমার পুত্রস্তানীয় স্ত্রীমান্ প্র— অথও-সাধারণের
সহিত অন্তরের গভীর কোনও যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই।
তোমাদের ধর্ম কত বড়! তোমাদের লক্ষ্য কত উচ্চ! তোমাদের
মন্ত্র কত মহৎ! কিন্তু তোমাদের মধ্যে যোগাযোগের বড়ই অভাব।
পরম্পরের প্রতি পরম্পরের প্রেম না আসিলে যোগাযোগে রুচি হইবে
কি করিয়া? প্রশান্ত প্রাণে সকলে নাম করিলে তবে ত রুচি আসিবে।

দশজনে মিলিয়া একটা কাজ করিলে ঐ কাজের মধ্য দিয়া দশ-
জনের মধ্যে একটা একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্তই দশ জন চোব,
দশ জন জুয়াড়ী, দশ জন গাঁজাখোর, দশ জন মদ্যপ পরম্পরের প্রতি
এত অনুরাগী। দশজনে মিলিয়া জনসেবা করিলেও পরম্পরের প্রতি
অনুরাগ জন্মে। দশজনে মিলিয়া জগতের শ্রেষ্ঠতম কাজ উপাসনা
করিলে এই অনুরাগ একদিকে যেমন গভীর হয়, অপর দিকে তেমন
হয় আসক্তিবর্জিত, নিরালস ও নিকাম। তোমরা সমবেত উপাসনাকে
এখনও উপযুক্ত সমাদর করিতেছ না। সমবেত উপাসনা আমার
প্রিয়তম অনুষ্ঠান, একথা জানিবার পরেও তোমরা সপ্তাহে একটা
দিন সকলে সমবেত উপাসনায় সম্মিলিত হইতে আগ্রহী হও নাই।
তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের একটা স্থায়ী সূত্র সৃষ্ট হইবে
কি করিয়া?

এই কথাটা সকলকে বারংবার বলিয়া যাইতেছি। কিন্তু
শোনে কে?

আষাঢ়, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম।

প্রতিধ্বনি

২২১

আরও একটা কথা বহুবার বলিয়াছি, বাহার প্রতি কর্ণপাত করিবার লোক অতি অল্পই দেখা যাইতেছে। বাহাদের আগে জানিতে না, চিনিতে না, গুরুভাই হইবার পরে তাহাদের সহিত তোমাদের পরিচয় স্থাপিত হইল। এই পরিচয়কে পরস্পরের আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় রূপে গ্রহণ না করিয়া তোমাদের মধ্যে অনেকে বৈষয়িক উন্নতির সুযোগ রূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাক। ডাক্তার গুরুভাই রোগী গুরুভাইদের চোখে ধূলা দিয়া অবৈধ অর্থ অর্জনের চেষ্টা করিতেছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে। ব্যবসায়ী গুরুভাই অব্যবসায়ী ধনী গুরুভাতার টাকার খলি আনিয়া অপব্যয়ের ছিনিমিনি খেলিয়া শেষোক্তকে পথে বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে। অধর্মগুরুভাই, অনুরোধে উপরোধে বাধ্য হইয়া যে গুরুভাই তাহাকে কিছু টাকাকড়ি সাময়িক হাওলাত রূপে দিয়াছে, তাহাকে দিনের পর দিন ভাঁড়াইয়া ভাঁড়াইয়া শেষ পর্যন্ত অষ্টরম্ভা প্রদর্শন করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে। নূতন একটা ধর্মার্থী সজ্জন দীক্ষা লইয়া তোমার গুরুভাই না হইলে তাহার সহিত পরিচিত হইবারই কোনও সুযোগ হয়ত দশ বিশ বৎসরে, এমন কি সারা জীবনেও, হইত না। তাহার সহিত আর্থিক ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া এবং তারপরে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাহার ক্রতির কারণ হওয়া প্রশংসনীয়? কতবার বলিয়াছি, ধর্ম জগতের এক সতীর্থ অপর সতীর্থের সহিত বৈষয়িক ব্যাপারে কখনও ছলনা করিও না, কিন্তু কে তাহা শুনিতোছে?

কেহ হয়ত বলিবে, ইহা যুগধর্ম। কিন্তু এইরূপ যুগধর্মকে পালটাইয়া দিবার যদি ক্ষমতা না থাকিল, তবে আমরা কি ধর্ম এতকাল পালন করিলাম, কি ধর্মই বা এতকাল প্রচার করিলাম? ইতি—

আশীর্বাদক

অরূপানন্দ

প্রতিদ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২২২

(৫৪৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৭শে চৈত্র, ১৩৬১

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পর পর তোমার দুইখানা পত্র পাইয়াছি। দুইখানা পত্রই আমার প্রাণমন হরণ করিয়াছে। তোমার পত্রের প্রত্যেকটি অক্ষরে তোমার অন্তরভরা প্রেম ক্ষরিত বিক্ষরিত হইয়াছে। এ ত কথা নয়, এ যে স্মৃতি!

আমি তোমাকে পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে দেই নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছি। কিন্তু বাবা, আমি যে আমার অপাদমস্তক সবকিছু নই। তোমার ভিতরে নিয়ত অবস্থান করিতেছি, সেই খবর কেন রাখিতেছ না? বাহিরের চরণ-মুগল লইয়া অত মাতামাতি করিতেছ, অথচ আমি সহস্র চরণ-মুগল লইয়া তোমার প্রতি রোমকূপে বিচরণ করিতেছি।

পুনরপি আশিস নিও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৮শে চৈত্র, ১৩৬১

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি আমার শিষ্য হও নাই বলিয়া কুণ্ঠিত হইবার কিছু নাই। শিষ্য বা অশিষ্য সকলের প্রতি আমার সমান প্রেম, সমান ভালবাসা। জগতে

আষাঢ়, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

২২৩

কেহই আমার পর নহে। কেহ শিষ্য না হইলেই আমার পর হইল, আর কেহ মন্ত্রদীক্ষা লইয়া শিষ্য হইলেই আমার আপন হইল, এই জাতীয় কুসংস্কার আমার নাই। তোমরা আমার নিকটে নিঃসঙ্কোচে আসিও। তবে, আমি কলিকাতা থাকা কালে রবিবার ব্যতীত যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করা যাইবে না, এই নিয়মটা পালন করিও। সপ্তাহে সাতটা দিন ধরিয়াই যদি দর্শনার্থীরা ভিড় করিতে থাকেন, তাহা হইলে আমার অল্প দশ দিকের শত শত কাজে যে ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি ব্যক্তিগত ভাবে আমার নহে, কারণ আমি নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছি দশ জনের মঙ্গলমূলক কাজে। তাই এই ক্ষতি দেশের ও দেশের। আমার উপরে তোমাদের সকলের সমান অধিকার। জগতের প্রত্যেকটি জীবের সহিত আমার সমান প্রীতির সম্বন্ধ।

তুমি ব্রহ্মচর্যা পালনের দিকে বিশেষ ভাবে অবহিত হইবে। নিজের বন্ধুবান্ধবদিগকেও ব্রহ্মচর্যা বিষয়ে উৎসাহিত করিবে। কুরুচি, কুমতি, কদাচার প্রভৃতির সহিত কখনও আপোষ করিবে না। নিজের বা অপরের নৈতিক অপমান কখনও নীরবে সহ্য করিবে না। যেখানে গেলে বা যাহাদের সঙ্গে মিশিলে মনের গুচিতা ও দেহের স্নিগ্ধতা বিনষ্ট হইতে পারে, সেখানে যাইবে না, তাহাদের সঙ্গ করিবে না। জগতের প্রত্যেক মানুষের ভিতরে দেবত্ব আছে বিশ্বাস করিবে কিন্তু সেই দেবত্ব মন্দিরের মত পবিত্র স্থানেই পূজিত হয়, আস্তাকুঁড়েতে দেব-বিগ্রহ কেহ পূজা করে না। কেহ প্রতিভাবান্ কবি বা মণীষাসম্পন্ন দার্শনিক বলিয়াই তাঁহার আচরণের নিন্দনীয় অংশ সমূহ তোমাদের অনুকরণীয় হইবে, এই জাতীয় দাসমনোভাব অন্তর হইতে সমূলে উৎখাত করিবে। 'আদর্শচরিত্র লোকহিতব্রত সংঘমণরায়ণ সদাচারী লোকদিগকে নিজেদের আদর্শরূপে গ্রহণ করিবে এবং ঐকান্তিকী

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেয়া

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২২৪

সাধনার দ্বারা জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সমকক্ষ হইবার যে
তোমার যোগ্যতা আছে, এই আত্মবিশ্বাসের নিয়ত অনুশীলন করিবে।
স্বৈচ্ছাচারী উৎপীড়কদের হাতে মার খাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার
প্রতীকার করিবার দুর্বলতা পরিহার করিবে এবং নিজভূজবীৰ্য্যে জগতি
স্বপ্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্ত সর্বদা সন্মুখ হইবে। সাংসারিক কর্তব্য
সমূহকে আধ্যাত্মিক কর্তব্যের সহিত অভেদ করিয়া তাহাদিগকে
যথাযথভাবে পালন করিবে। ইতি—

আশীর্বাদক

অরূপানন্দ

(৫৪৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৮শে চৈত্র, ১৩৫৫

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার সহধর্মিণী শ্রীশ্রীউপাসনা-প্রণালীর সংস্কৃত স্তোত্র সমূহ
শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন না, এজন্ত জানিতে চাইয়াছে যে,
তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠ দ্বারা উপাসনা নির্বাহ করিতে পারেন কিনা।
কিন্তু চেষ্টা করা উচিত বারংবার শুনাইয়া শুনাইয়া ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত
স্তোত্র তাঁহাকে কণ্ঠস্থ করাইতে। বাংলা অনুবাদটা যদি ছন্দে হইত,
তবে তত দোষ হইত না। ছন্দোবদ্ধ স্তোত্র মনের উপরে বিশেষ
প্রভাব বিস্তার করে এবং সুর সহযোগে যখন গীত হয়, তখন উহার
বাঙ্গার প্রাণের ভিতরেও প্রবেশ করে। সংস্কৃত বাঙ্গালীর নিকট
পরভাষা নহে, বাংলা ভাষার শতকরা সত্তরটি শব্দ সংস্কৃত। অতএব

আষাঢ়, ১৩৬৭]

বৃত্তং প্রেম।

প্রতিধ্বনি

২২৫

সংস্কৃত স্তোত্রে অনুরাগের অভাব বা ভীতি থাকা সঙ্গত নহে।
ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৮শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের গুণগৌ এই বৎসরের জ্ঞাত তোমাকে সম্পাদক করিয়াছে,
জানিয়া মুখী হইলাম। তুমি তোমার অত্যাশ্রিত সতীর্থদের তুলনায় ছোট
বা বড়, এই বিচারের আর প্রয়োজন কি? নিষ্কাম চিত্তে কাজ করিয়া
যাও তোমার অকপট সেবার মধ্য দিয়া তোমার যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত
হইবে। বিনীত মন লইয়াই সজ্জ্বর সেবা করিও, কর্তৃত্বের ভাব লইয়া
নহে।

যাহাদিগকে নিতান্ত অকর্মণ্য মনে হইতেছে, তাহাদের ভিতরেও
অশেষ সদগুণ রহিয়াছে। ভগবৎকৃপায় এই সদগুণগুলির সদ্যবহার
হইবে। নম্রতা সহকারে কালপ্রতীক্ষা কর। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

বৃত্তং প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২২৬

(৫৫১)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

২৮শে চৈত্র, ১৩৫৯

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। চাকুরীর দরুণ নিত্য নূতন স্থানে ঘাইয়ে হয়, এজন্ত কোথাও শ্রীবিগ্রহের আসন বসাইতে পারিতেছ না বলিয়া অনুবিধা বোধ করিতেছ। তুমি আসন বসাইতে পারিতেছ না এক্ষেত্রে তাহাতে কি আসে যায়? যেখানেই থাক, নাম করিয়া যাও উপাসনার সময়টা হইলে চুপ করিয়া সাধনে ডুবিয়া যাও। গুরুদেব সাধন যে-কোনও স্থানে যে-কোনও অবস্থায় করা যায়। নির্দিষ্ট একই স্থানে আসন বসাইতে পারিতেছ না বলিয়া দুঃখ করিও না। নামজপ করিবার কালে মনে মনে কল্পনা করিয়া নিবে, যেন ধূপদীপ তোমার ঠাকুরের সম্মুখে দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে মানস পূজা করিলে তাহাতেই তোমার সব হইতে পারে। মনে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি লইয়া যেখানে বসিয়াই নামজপ কর না কেন, সবই তিনি গুণিত পান, সবই তিনি দেখিতে পান, সবই তিনি জানিতে পান, সবই তাঁর পায়ে পৌছায়। বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য না দিয়া অহর্নিশ নামজপ করিতে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

আবার, ১৩৬৭]

দ্বিতীয় প্রেরা

প্রতিধ্বনি

২২৭

(৫৫২)

হরি-ও

কলিকাতা

২৮শে চৈত্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেমুঃ—

মেহের বাবা—, প্রাণভরা মেহ ও আশিস জানিও।

কিছুদিন আগে শ্রীমান্ অ—কে তোমাদের ওখানকার অখণ্ড-মণ্ডলীর সম্পাদক পদে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং নিয়মানুসারে তুমি পদত্যাগ করিয়াছ। এই ব্যাপার নিতান্তই গতানুগতিক এবং স্বাভাবিক। এই পদত্যাগের ব্যাপারটাকে তোমার ব্যক্তিগত মান-অভিমানের বিষয়ীভূত করিও না। প্রত্যেক স্থানেই প্রতি বৎসর কর্মকর্তার পরিবর্তন হয়। নূতন নূতন কর্ম্মীদিগকে কাজ করিবার সুযোগ দিয়া প্রতিষ্ঠান এভাবে নিজের যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। একই ব্যক্তি চিরকাল সম্পাদক বা সভাপতি থাকিলে এই সকল ক্ষেত্রে সুবিধা না হইয়া অসুবিধাই ঘটয়া থাকে। তাই প্রায় সর্বত্র এবস্থিৎ-নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। মণ্ডলীর সম্পাদক রূপে তুমি অতীতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছ। তোমার সেই মূল্যবান অভিজ্ঞতার দ্বারা মণ্ডলীর নূতন সম্পাদককে তুমি সর্ব সময়ে সহায়তা করিও। মণ্ডলী হইতে দূরে সরিয়া বা নূতন সম্পাদকের প্রতি অসহযোগের মনোভাব লইয়া কখনও কোনও কাজ করিও না, এমন কি, চিন্তা এবং বাক্যেও এই সত্যকে লজ্জন করিও না যে, ঐক্যের ভিতরেই অভ্যুদয়ের বীজ নিহিত রহিয়াছে, অনৈক্য আসিলেই ধ্বংস আসিবে। কোনও রূপ অনৈক্য আসিয়া তোমাদের পবিত্র ভ্রাতৃ-বোধকে না কলঙ্কিত করিতে পারে, তাহার দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিও।

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেয়া

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২২৮

এখন যদি কেহ বলাবলি শুরু করে যে, অসং কুটিল লোকদের হাতে মণ্ডলী চলিয়া গেল, তবে তাহা কোনও কাজের কথা হইবে না। কেননা, তোমাদের ওখানে যখন দীক্ষার ঘরে কল্লনাভীত ভিড় হইয়াছিল, তখন ত তোমরা কাহাকেও বাধা দিতে চেষ্টা কর নাই। তখন ত তোমরা কাহাকেও বল নাই যে, অন্তরের কুটিলতা বিসর্জন দিয়া দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করিতে হইবে! আমি তখন দীক্ষার্থীদের ভিড় কমাইবার জন্ত কত প্রয়াস পাইয়াছি, তোমরা আমার সেই চেষ্টাকে ব্যাকুল দীক্ষার্থীর উপরে জুলুম বলিয়া মনে করিয়াছ। কত দূর হইতে পায়ে হাটিয়া লোকগুলি আসিয়াছে, দীক্ষা না পাইলে বড়ই ব্যথা পাইবে! তখন ত তোমরা কুটিল ও অসং লোকগুলিকে দূর রাখিবার জন্ত চেষ্টা কর নাই! বরং তখন তোমাদের ভিতরে একটা চাপা উল্লাসই দেখিয়াছিলাম। গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের সংখ্যা সহস্র ছাড়াইয়া লক্ষ গেল, ভাবিয়া তোমাদের কতই না আনন্দ। কাজেই এখন আর বলিতে পার না যে, অমুকেরা অসং, অমুকেরা হুঁচরিত্র, অমুকেরা চোরা-কারবারী। একথা তখনই বিচার করিবার প্রয়োজন ছিল। যাহারা সজ্জ্বর ভিতরে প্রবেশ করিলে সজ্জ্ব তাহার নৈতিক আদর্শ, আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও শুচিতার লক্ষ্য হইতে বিচূর্ণ হইবে, তাহাদিগকে দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করিতে না দেওয়াই তোমাদের উচিত ছিল এবং ভবিষ্যতেও তাহাই কর্তব্য হইবে। প্রাণপণেই করিয়া অসংকে সং, অসাধুকে সাধু, কুটিলকে সরল, হীনবুদ্ধিকে মধ্যপ্রাণে পরিণত করিবার চেষ্টা তোমাদিগকে করিতে হইবে। এই চেষ্টার নামই সংগঠন। তোমরা কি আগে সংগঠন কথাটির তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা কর নাই? আমি ত হাজার বার হাজার রকম তোমাদের বলিয়া আসিয়াছি যে, মানুষের অন্তর-ভিত্তির ও অন্তর-প্রাণের

বারাণসী, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেরণা

প্রতিধ্বনি

২২৯

দূরের চেষ্টাই তোমরা করিও, আমার শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্ত এক কণা শ্রমও করিও না। তাহা শুনিয়াছ কি ?

মণ্ডলীর পুনর্গঠন যে ভাবেই হইয়া থাকুক, অধিকাংশের সম্মতিতেই হইয়াছে। অধিকাংশ লোক কখনও অসৎ হইতে পারে না। বর্তমানে যদি দুই-চারি জন অসৎ লোক মণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে তাহাদের চরিত্রের সংশোধনের প্রকৃষ্ট সুযোগ তোমরা দাও। আর, যাহাতে তাহারা তাহাদের কোনও প্রকার বহুমূল পাপাভ্যাসের দরুন মণ্ডলীর মর্যাদা-হানিকর কোনও কাজ না করিতে পারে, তজ্জন্ত সতর্ক হইয়া চল। পরস্পর পরস্পরকে পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্ত আত্মি বাড়াইয়া যাও। শত্রুর প্রতি শত্রু নহে, ভাতার প্রতি ভাতা অগ্রসর হইতেছে, এই ভাব লইয়া চল।

অবশ্য, যে-কেহ মণ্ডলীর অন্তর্গত বা তোমাদের সমসাময়িক হইলেই যে মণ্ডলীর কর্মকর্তৃপদে বৃত্ত হইতে পারে, তাহা নহে। মত্তপ, পরনারীরত, পরপুরুষাসক্ত, টাকাকড়ির ব্যাপারে প্রবঞ্চনাকারী বা উন্মাদ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কোনও অবস্থাতেই মণ্ডলীর কর্ম-কর্তাদের একজন রূপে নির্বাচন করা চলিতে পারে না। কোনও ব্যক্তি সংক্রামক-ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও তাহার পূর্ণরোগ্য লাভের পূর্ব পর্যন্ত তাহাকে সভ্যপদ হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে।—এগুলি নিয়ম। নিয়ম সকলকেই মানিতে হইবে। কাহার অতীত জীবন কি ছিল, তাহা নিয়া বিতণ্ডায় প্রবেশ করিয়া লাভ নাই, কাহার বর্তমান জীবন কি, তাহাই আলোচ্য হইবে। ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে থাকিয়াও একজন আসিয়া মণ্ডলীর কর্মকর্তাদের অন্ততম হইয়া থাকিবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না।

ত এমন ঘৃণিত ব্যক্তি তোমাদের নতুন মণ্ডলীতে আছেন বলিয়া

প্রতিধ্বনি

ধাতং প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৩০

আমার মনে হয় না। তবে ছোটখাটো দোষ কাহারও থাকিতে পারে। তোমরা সকলে মিলিয়া ইহাদিগকে আত্মদোষ সংশোধনে অনুকূল আবহাওয়া প্রদান কর। ইহাদিগকে দিনের পর দিন গুচিতায় চারুতর, চরিত্রে দৃঢ়তর হইবার সহায়তা তোমরা কর। তোমরা এক স্নমহান্ সজ্জ-তরুর ছায়াতলে মিলিত হইয়াছ। তোমরা মল, মূত্র আর নিষ্টিবন নিক্ষেপ করিয়া এই তাপহর ছায়ার সম্মান না করিতে পার না। কোনও পক্ষেরই কেহ এমন কিছু করিতে পার না, যাহা দ্বারা সজ্জের মর্যাদা-ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। তোমাদের আচরণ দ্বারাই জনসাধারণ তোমাদের সজ্জের ভালমন্দ বিচার করিবে। এমন কি, তোমাদের দরুণ আমাকেও হয় বা শ্রদ্ধেয় জ্ঞান করিবে! অতএব তোমরা সকলে সকলের প্রতি প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিও। একে অপর দোষত্রুটি সংশোধনের দিকেই লক্ষ্য রাখিও। সজ্জের বাহাতে মনঃ বুদ্ধি পায়, তাহাই তোমাদের বাঞ্ছিত হউক। ব্যক্তিগত মান-অভিমান অতলে ডুবিয়া যাউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

(৫৫৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৯শে চৈত্র, ১৩৫৫

পরমকল্যাণীয়েষুঃ—

মেহের বাবা—, প্রাণভরা মেহ ও আশিষ জানিও।

তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমাকে খেজুড়ি গুড় ও দধি খাওয়াইবে।

ঐ স্বপ্ন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তুমি সেই সময় এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলে।

আরাট, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

২৩১

তৎকালে আমার খেজুড়ি গুড় ও দধিসেবনের প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। নামে তোমার রুচি থাকার দরুণ সুস্থ ভাবে আমার সেই ইচ্ছার পরিচয় পাইয়াছিলে। এজতাই একরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলে। যখন সময় ও অবসর হইবে, তখন নাগা পাহাড়ের কোলে তেমাদের ঐ ক্ষুদ্র ষ্টেশানটিতে যাইব। তখন তুমি আমাকে দধি এবং খেজুড়ি গুড় খাওয়াইয়া তোমার যত্নের সফলতা সম্পাদন করিতে পারিবে। অদীর হইও না।

তোমার অন্তরের ভালবাসাই তোমাকে এইরূপ স্বপ্ন দেখাইয়াছে। প্রেমহীন ব্যক্তি কখনও এমন মধুর স্বপ্ন দেখিতে পারে না। তোমার ভিতরে প্রেম আছে, তুমি ভাগ্যবান। কিন্তু তোমার এই স্বপ্ন প্রেমকে অনন্ত প্রেমে রূপায়িত করিতে হইবে। অল্পে সুখ নাই, অনন্তেই সুখ। একটুখানি খেজুড়ি গুড় আর একটুখানি দধি খাওয়াইয়া তোমার পরম সুখ লাভ হইবে না। কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অফুরন্ত মধু অর্জন করিয়া আনিয়া তুমি আমার সেবায় লাগাইবে। তবেই তোমারও দেওয়া সার্থক, আমারও পাওয়া সার্থক। গুড় মধুরতার দ্যোতক। আর খেজুড়ি গুড় সুবাস, সৌগন্ধ, সুরভিতার দ্যোতক। দধি দীর্ঘায়ু, পবিত্রতা ও পুণ্যতার দ্যোতক। সুতরাং তোমার স্বপ্ন তোমাকে কি ইঙ্গিত দিতেছে, ভাবিয়া দেখ। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবে যে, ভগবান কত বড় প্রেরণা তোমাকে দিয়া গেলেন। স্বপ্নকে নিতান্ত জড়ীয় অর্থে তোমরা দেখিও না। অধিকাংশ স্বপ্নেরই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাইবে,—অবশ্য যদি তুমি নামে রুচিমান থাক। গুরুদর্শন, দেবদর্শন, তীর্থদর্শন প্রভৃতি স্বপ্ন আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত লইয়া আসে। উহারা কেবলই মনের বিকার নহে অথবা অর্থহীন কথা নয়।

আরও কত স্বপ্ন জীবন ভরিয়া দেখিবে। স্বপ্ন তোমার ইঙ্গিত হউক। কিন্তু স্বপ্ন লইয়া বেশী মাথা ঘামাইওনা। জীবনের আগ্রহ

সত্যো যাহার হইবে প্রতিষ্ঠা, সেই পরমমঙ্গলময় অনুভূতির জন্ম হইবে
 ব্যাকুল। আজ স্বপ্নে আমাকে দেখিয়া পুলকিত হইতেছ, কাল তোমার
 সাধনার ফলে জাগ্রতেই হয়ত দেখিতে পাইবে যে, আমি কলিধাম
 বা কলিকাতা বসিয়া থাকিয়াও সরুপাথরে তোমাকে দর্শন দিয়াছি।
 এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে না, তাহা নহে। কখনও ঘটে নাই, তাহা
 নহে। কিন্তু আমার কোনও মহিমায় নহে, তোমাদেরই একান্ত
 সাধনায় ইহা সম্ভব হইবে। অলৌকিক ঘটনা কেবল অলৌকিকই
 নহে, তাহা লৌকিকও। লৌকিক জীবনে সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত
 কর। দেখিবে, লোকে যাহাকে অলৌকিক বলে, তাহা তোমার
 নিকটে জল-ভাত হইয়া যাইবে। নিতান্ত সাধারণ ব্যাপারকে তোমার
 অসাধারণ বলিয়া গণনা করিয়া থাক। যাহারা সাধন করে, তাহাদের
 নিকটে কিছুই অসাধারণ নহে। তবে এইগুলির মূল্য প্রকৃত সাধকের
 সাধনজীবনে অতি অকিঞ্চিৎকর। বহু মহাপুরুষ সম্পর্কে অনেক
 অলৌকিক ঘটনা সালঙ্কারে বর্ণিত হয়। ঐ গুলিকে আমি মূলতঃ মিথ্যা
 বলিয়া মনে করি না। কেননা, নিজ জীবনে কত অলৌকিক কিছু
 দেখিয়াছি। কিন্তু এই গুলিকে আমি অনাবশ্যক বলিয়া জ্ঞান
 করিয়া থাকি। ইহা অপেক্ষাও শতগুণ মূল্যবান্ মানুষের প্রতি
 মানুষের পাপলেশহীন নিষ্কাম প্রেম। অলৌকিক ক্ষমতা অনেক সময়
 মানুষের সাধন-জীবনের আপদ-বিশেষ কিন্তু স্বার্থহীন অকপট প্রেম
 প্রত্যেকেরই জীবনের পরম সম্পদ। ইতি—

আশীর্বাদক
 স্বরূপানন্দ

আষাঢ়, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্য

প্রতিধ্বনি

২৩৩

(৫৫৪)

হরি-ও

বারাণসী।

৩রা বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু, :-

স্নেহের বাবা—,তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা নববর্ষের আশিস জানিও। নববর্ষ সকলের পক্ষে শুভ হউক।

তোমরা ছুই গুরুভ্রাতা মিলিয়া উত্তর-বঙ্গের কতকগুলি স্থানে সমবেত উপাসনা ও হরি-ও নামকীর্তনের সুরশিক্ষাদান করিয়া করিয়া বেড়াইতেছ এবং সর্বত্র প্রচুর আনন্দ পাইতেছ, সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমাদের এই আনন্দ সার্থক হইবে, যদি তোমাদের প্রদত্ত শিক্ষাদান হয় নির্ভুল এবং যাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছ, তাহারা প্রদত্ত শিক্ষাকে ভালভাবে আয়ত্ত ও প্রয়োগ করিতে পারে। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিও, যেন তোমাদের প্রদত্ত শিক্ষার কোনও ক্রটিতে ইহাদের মধ্যে কোনও অসাধারণ ভুল আবার মজ্জাগত হইয়া না দাঁড়ায়।

স্বরজ্ঞ তোমার যে গুরুভ্রাতা তোমাদের এই সুরশিক্ষাদানের অভিযানের নেতৃত্ব করিতেছে, তাহার নিকট হইতে সুরকে বিগুহভাবে শিখিয়া লইবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিও। আগের ভুল গুলি যাহাতে একেবারে নির্মূল হইয়া যায়, ভ্রমেও তাহা আর যাহাতে তোমার কণ্ঠে আসিয়া বাসস্থান রচনা করিতে না পারে, তাহার দিকে কড়া নজর দিও। শিখিবার এই সুযোগকে ভাল ভাবে যদি সদ্ব্যবহারে আনিতে না পার, তাহা হইলে এইবারকার সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় এক হিসাবে ব্যর্থই হইয়া যাইবে। একটা দিন মানে জীবনের একটা মূল্যবান অংশ, পরমায়ুর একটা ভাগ। ইহাকে অপব্যয়িত হইতে দেওয়া

প্রতিধ্বনি

দ্বুতং প্রেম।

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৩৪

মহামুখতা। চেষ্টা করিয়া নিজের সব গুলি ভুলকে আগে ভাল করিয়া বুঝিয়া নাও, তাহা হইলে ভ্রমসংহারে অসম্পূর্ণতা থাকিবে না। তোমাকে পূর্বাভাস একেবারে বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। কেননা, ইহার পরে তোমার উপরে বহুজনের শিক্ষার ভার পড়িতে পারে। তুমি সতর্ক না থাকিলে মহা-অনর্থ হইবে।

কল্যাণীয়া মা কি—র জ্ঞান তুমি ভাবিও না। তুমি যখন স্থির করিয়াছ যে, ঘরের চাষ-আবাদ নষ্ট হইয়া গেলেও তুমি সুরক্ষিত থাকিবে, কাজ ছাড়িয়া গৃহে ফিরিতে চাহ না, তখন তোমার সহধর্মিণীর ব্যয়ভার আশ্রয় হইতে বহন করিবার ব্যবস্থা আমি করাইতেছি। ভগবানের উপরে যে নির্ভর করে, তাহার ভার ভগবানই গ্রহণ করেন। ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। আমি ভগবানের হইয়া তোমার বাড়ীর আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিব। ভগবান অনেক সময়ে অতি সাধারণ মানুষের রূপ ধরিয়া জগতের জ্ঞান কাজ করিয়া থাকেন। কখনো কখনো তিনি আমারও রূপ ধারণ করেন। তুমি একেবারে নিশ্চিত হইয়া তোমার ধর্মপ্রচারকার্যে লাগিয়া যাও। অজ্ঞান কোণে চিন্তাকে মনের কোণে স্থান দিও না। নামে আর প্রেমে জগৎ প্লাবিত, মগ্নিত, আন্দোলিত ও নিমজ্জিত কর।

যেই সকল স্থানে এখন ভ্রমণ করিতেছ, সেই সকল স্থানে ইহার কিছু দিন পরেই আবার আমিবার ভ্রমণ-তালিকা হয়ত তোমাকে করিতে হইবে। যে যে স্থানে মাত্র এক দিন দুই দিন করিয়া ভ্রমণ করিয়া গেলে, সেই সেই স্থানে সাত আট দিন ধরিয়া দুই বেলা সমানে লোককে সমবেত উপাসনার সুর শিক্ষাদান করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জ্ঞান হরিনামের কীর্তন-প্রবাহিত প্রবাহিত করিতে হইবে। কোনও কোনও স্থানে পাথেরাদির অঙ্গবিশেষ

আষাঢ়, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

২৩৫

তোমার হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল অম্লবিধার দিকে তাকাইও না। তোমার পরবর্তী প্রণাম তৈরী হইয়া বাইবার পরে তোমার সহিত আশ্রম হইতে কিছু বিক্রয় পুস্তক দিতে চেষ্টা করিব, যেন তাহার দ্বারা তুমি পাথের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পার। দেশ দরিদ্র, অন্তরে বিপুল ধর্মভাব অতি অল্প লোকেরই আছে, তত্পরি নানা প্রকার অপধর্মের প্রচার ও প্রসারের দ্বারা এক শ্রেণীর ধর্মবাজকেরা সরল বিশ্বাসী জনসাধারণের মনকে এমন ভাবে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, শিক্ষিত সাধারণের কাছে ধর্ম একটা ব্যবসাদারী ব্যাপার বাতীত অত কিছুই বলিয়া প্রতিভাত হইতে চাহে না। তাহার উপরে আবার আছে ধর্মকে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাজিবার ফিকির বলিয়া বিপুল প্রচার। এত সব-বিপরীত অবস্থার মধ্যে তোমাকে কাজ করিতে হইবে। অতএব মনে রাখিও যে, তোমাকে কাছা ঠিক রাখিতে হইবে। নিজের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিটি কাজ করিবে, প্রতিটি কথা বলিবে, প্রতিটি চিন্তা করিবে। জীবনের মধ্যে আদর্শের বিরোধকে প্রবেশাধিকার দিবে না। এই বিষয়ে কঠোর হইতে না পারিলে এই পুণ্য কার্যের ভার দীর্ঘকাল তোমার উপরে নাও থাকিতে পারে।

অন্তরভরা প্রেম লইয়া, অবিচলিত আত্মবিশ্বাস লইয়া, অতুলন চরিত্রবল লইয়া অগ্রসর হও বৎস, কুঠাহীন আত্মবিসম্বন্ধনের পথে বীরবিক্রমে চলিতে থাক। বিবাহ একদা একটা করিয়াছিলে বলিয়াই তুমি পচিয়া যাও নাই, এই কথাটি স্মরণে রাখিও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেমা

[২ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৩৬

(৫৫৫)

হরিণ

বারাণসী

৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। পয়লা বৈশাখ উপাসনাতে বসিয়া আমি নিখিল ভুবনের প্রাণীরা কুশল কামনা করিয়াছি। তাহাতেই তোমাদের সকলের জন্ত নববর্ষের আশিস বর্ষণ হইয়াছে। আলাদা করিয়া জনে জনে এই জন্তই আশীর্বাদ করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। এই জন্তই এই বার পয়লা বৈশাখ চিঠি পত্র বড় একটা লিখি নাই।

দেখ মা, নববর্ষই তোমাদের প্রণাম করিবার একটা বিশেষ দিন এবং নববর্ষই তোমাদের প্রতি আশীর্বাদ প্রেরণের বিশেষ একটা উপলক্ষ্য, ইহা আমি মানি না। প্রতি দিনই একটা করিয়া নূতন দুর্ঘা উদ্ভূত হইতেছে, প্রতি দিনই তোমরা নূতন জন্মে প্রবেশ করিতেছ, প্রতিটি মুহূর্ত্তেই তোমাদের উপরে নূতন নূতন দায়িত্বভার পড়িতেছে। আমার প্রয়োজন, প্রতি দিনই প্রতি ক্ষণেই তোমাদিগকে আশীর্বাদ করা এবং তাহাই আমি করিতেছি।

অমুখ অশান্তি পৃথিবী জুড়িয়াই আছে এবং থাকিবে। ছায়া ছাড়া আলো নাই, আলো ছাড়া ছায়া নাই। নানারূপ বিরূপ অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ইহার মধ্য দিয়া তোমাকে জীবনের কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। দুশ্চিন্তা ও ব্যস্ততা, ইহারই মধ্য দিয়া চালাইয়া যাইতে হইবে জীবনতরণী পারের ঘাটের দিকে। সর্বদা প্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্যটি স্থির রাখিও। ভুলিয়া যাইও না যে, তোমার পরমপ্রভুর প্রতি তোমার আসল কর্তব্য কি। জগতের সকল কর্তব্যকে তাহার

আষাঢ়, ১৩৬৭]

ধ্বং প্রেম।

প্রতিদর্শন

২৩৭

অধীন করিয়া পালন করিও। সংসারী হইতে শাস্ত্রকারেরা কাহাকেও
বারণ করেন নাই, স্ত্রী স্বামী গ্রহণ করিবে, স্বামী পত্নী স্বীকার করিবে,
মাতাপিতা পুত্রকন্যার জনকজননী হইবে, পুত্রকন্যা মাতাপিতার প্রতি
নিজেদের প্রতিটি কর্তব্য পালন করিবে, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া প্রতি
জনে নিজ নিজ আসল কাজের পুরাটুকু আদায় করিয়া লইবে। এইরূপ
করিতে চেষ্টা করিলেই দেখিবে, সকল সমস্তার জটিল গ্রন্থি আপনা
আপনি সরল ও সাবলীল হইয়া যাইতেছে।

তবু ভয়কে অন্তর হইতে দূর করিয়া দাও। নিখিল বিশ্বের প্রতি-
জনের প্রতি তোমার অপার অগাধ প্রেম তোমাকে বিশ্বপতির প্রেমে
নিমগ্ন করুক। আবার, তাঁহার প্রতি প্রেম বিশ্বের সকলকে তোমার
আপন করুক।

এই আপনত্বকে কেবল পুণ্ড্রগত বাঁধা গতে আবদ্ধ থাকিতে দিলে
হইবে না। অনুকূল কৰ্ম্ম ও ত্যাগের মধ্য দিয়া তাহার অনুশীলনও
চাই। ইতি—

আশীর্বাদক

অরূপানন্দ

(৫৫৬)

হরি-ওঁ

বারাণসী

৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬

কল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।
চাকুরীতে বদলী হইয়া নূতন স্থানে আসিয়াছ। হয়ত পরিবেশ
একান্তই অপরিচিত এবং পরিস্থিতিও আলাদা রকমের। কিন্তু ইহাতে

ঘাবড়াইয়া যাইবার দরকার নাই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে দেবতা বাস করেন, তাঁহাকে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে দেখিবার চেষ্টার ভিতর দিয়া সকল সমস্তর আশুসমাধান করিও। প্রাণভরা প্রেম লইয়া মানুষের সহিত করিবে ব্যবহার, পরিচিত-অপরিচিত-নির্বিশেষে সকলকে সমাদর করিবে। আস্তে আস্তে দেখিবে, নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার উপাদান ও উপকরণ সমূহ তোমার করতলগত হইয়া যাইতেছে। সৃষ্টির তুমি শিল্পী, এই কথা কখনও ভুলিও না। যেখানে যাইবে, কেবল নূতনের পর নূতন করিয়া সৃষ্টির বাহাদুরী তুমি দেখাইয়া যাইবে। জগতের সকলে যখন তোমাকে একটী সাধারণ সরকারী চাকুরে মাত্র মনে করিতেছে, সেই সময় তুমি তোমার সৃষ্টির অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া যাইতে থাক, প্রতিটি মানবের মনের মধ্যে। পশুকে মানুষ করিতে হইবে, মানুষকে দেবতা করিতে হইবে, দেবতাকে ব্রহ্মে রূপান্তরিত করিতে হইবে। এ ব্রত সাধারণের নহে,—তুমি সাধারণ মানুষ হইয়াও অসাধারণ, তাই এই ব্রত তোমার।

তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ-স্থাপন একটা বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়া হইয়াছে। তাহা এই যে, তুমিও জানিয়াছিলে যে আমি তোমাকে দীক্ষাদানকালেই জগৎকল্যাণের সঙ্কল্পে আবদ্ধ করিব, আর আমিও জানিয়াছিলাম যে, তুমি কেবলই হুজুগাকৃষ্ট হইয়া আস নাই। আমাকে আমার কর্মজীবনে ও প্রচারণার মধ্য দিয়া ভাল করিয়া দেখিবার জন্ত তুমি এক যুগ সময় পাইয়াছিলে। এখন সময় আসিয়াছে তোমার প্রাণপণ শক্তিতে আমার সকল প্রত্যাশা পূরণ করিবার জন্ত আশুয়ান্ হইয়া আসিবার। চারিদিকে যত জনকে দেখিতে পাইতেছ, তাহাদের প্রতিজনকে দিয়া জগৎকল্যাণ সাধন করাইতে হইবে। সত্যই

আবাদি, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেম।

প্রতিধ্বনি

২৩৯

যদি নূতন বংশের আসিয়া থাকে, তাহা হইলে এখনই কাজে লাগিয়া
বাও ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫৭)

হরিণ

বারাণসী

৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াস্তু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আশাবাদী মন লইয়া তরুণ কৈশোরে যে সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলে,
যৌবনের নিদ্রাভঙ্গে দেখিতে না দেখিতে তাহা আকাশে মিলাইয়া
গেল। ইহা তোমার জীবনের এক বেদনান্ত পরিচ্ছেদ। কত
খানি দুঃখ ও আশাভঙ্গজনিত কতখানি ক্ষোভ লইয়া তোমার
জীবন চলিয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া আমি তোমার জ্ঞাত
অশেষ বেদনা অনুভব করি মা। তোমাকে এই সময়ে হিতোপদেশ
দিয়া যে বলিবে,—ভয়ভাবনাকে মন হইতে দূর করিয়া দাও,
সুদীর্ঘকালব্যাপী উপেক্ষাকেও গণনায় না আনিয়া মানুষরূপে তোমার
নিজের মূল্য বাড়াইবার সাধনায় আত্ম-নিয়োগ কর, হাহতাশ
করিয়া সময় না কাটাইয়া অথবা বিলাস-ব্যসনে নিজেকে লিপ্ত না করিয়া
নিজের ভিতরে ব্রহ্মচর্যের শক্তিকে, সংযমের বলকে, প্রত্যাহারের
প্রত্যাপকে প্রতিষ্ঠিত কর,—সে তোমার প্রকৃত বান্ধবের কাজ করিবে।
বারংবার ঘাতপ্রতিঘাতে বিহ্বল হইয়া তোমার মন চপল-চঞ্চল হইয়া
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোথায় আশ্রয়, কোথায় শান্তি, কোথায়

প্রতিশ্রুতি

ধৃতং প্রেমায়

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৪০

নির্ভরের স্থান, তাহা খুঁজিয়া মরিতেছে। নির্ভরের স্থান অনেক আগেই
পাইয়াছিলে কিন্তু নির্ভর করিতে পার নাই। সমস্ত প্রাণমন দিয়া
নির্ভর করিলে সংসারের দুঃখ ও তাহার কারণগুলি কনুকের
না কনাক, মনের প্রশান্তি বাড়ে, যাহার বলে অনায়াসে শত দুঃখের
নিষ্পেষণে থাকিয়াও মাথা উচু করিয়া দাঁড়ান যায়। আমার সন্তান
বলিয়া যদি নিজেকে নিমেষের জ্ঞান ও অনুভব করিয়া থাক, তাহা হইলে
দুঃখকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া পথ চলিবার সাহস সঞ্চয় কর। ভোগ
নহে, ত্যাগই তোমার লক্ষ্য হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫৮)

হরি-ওঁ

বারাণসী

৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস
জানিও।

তোমার পত্রে যদিও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ নাই, তবু ইহার ভাষা
হইতে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, তুমি রোগমুক্ত হইয়াছ। তোমার
রোগমুক্তি-সংবাদ আমার কাছে যে কত বড় সংবাদ, তাহা আমি পত্র
লিখিয়া কি বুঝাইব। তোমার সুস্থ অবস্থায় তোমার ভিতরে জীব-
কল্যাণের স্রুতীর আকাজক্ষা দেখিয়াছি, দেখিয়াছি। তোমার নিরভিমান
জগদ্ধিতৈষণা। তুমি যে আমার কতখানি প্রিয়, তাহা লিখিয়া কি
জানাইব।

আষাঢ়, ১৩৬৭]

ধ্বং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

২৪১

তোমাকে আজ আশীর্বাদ করি, যে কর্মক্ষেত্রে বহুদিন পরে পুনরায় প্রবেশ করিলে, তাহা তোমার অসাধারণ কৃতিত্বের দ্বারা নিয়ত চিহ্নিত হউক। সর্বভূতে পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া এবং পরমেশ্বরে সর্বভূতকে দর্শন করিয়া তুমি তোমার পথ চল। ইতি—

আশীর্বাদক

অরূপানন্দ

(৫৫৯)

হার-ওঁ

বারাণসী

৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরলকালীনেষুঃ—

মেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের মণ্ডলীতে জন্মোৎসব উপলক্ষে তোমরা দুইটা দল নাকি করিয়াছ। তোমাদের নবগঠিত কার্যানির্বাহক-সমিতির সভ্য-তালিকার মধ্যে এই সংবাদটি পাইলাম। এই তালিকা আমি সাময়িক ভাবে অমুমোদন করিলাম কিন্তু তোমরা যাহাতে সকলে মিলিয়া একটা মাত্র দলে পরিণত হইতে পার, তাহা অবিলম্বে কর। একটার পর একটা করিয়া প্রয়োজন আসিতেছে, যেই সময়ে তোমাদের সকলের সর্বশক্তি একটা মাত্র কাজে লাগিয়া অভাবনীয় মঙ্গলসৃষ্টিতে বা অপ্রত্যাশিত অমঙ্গল-নিবারণে প্রয়োজিত হওয়া আবশ্যক। সেই কথা ভুলিয়া গিয়া কেন তোমরা অপ্রেমবর্দ্ধক আত্মাভিমানের পূজা করিবে? ইতি—

আশীর্বাদক

অরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৪২

প্রধান অতিথির ভাষণ ❀

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ,

তথা প্রতিনিধিবর্গ,

সর্বাগ্রে জানাই প্রণাম। প্রণাম জানাই আপনাদিগকে, প্রণাম জানাই আমাদের সকলের প্রাণের প্রভু বাবামণিকে, প্রণাম জানাই বিশ্বের সকল আচার্য্যকে, সকল সম্প্রদায়কে, সকল মত ও পন্থার অনুবর্তীদিগকে। আমার প্রভু শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবই সম্ভবতঃ জগতে সর্বপ্রথম উচ্চারণ করিলেন,—“জগতের সকল সম্প্রদায় আমার, আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের।” তাঁহার কৃপাকণা লাভে ধাত্তাতিথ্য আমরা বিশ্বের একজনকে প্রণাম জানাইবার যথাদিয়া কোটি বিশ্বের সকলকে জানাইব অন্তরের প্রকৃষ্ট বিনতি। জগৎগুরুর শিষ্য হইয়া আমরা জগদ্ব্যাপী সকলের সহিত যেন প্রীতি, ভক্তি, মমতার সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে পারি। আমার ভক্তিবিনয় প্রণামের সঙ্গে এই আশীর্বাদ করি আমি প্রার্থনা।

আপনারা আমাকে এই স্মহান্ নগরে বিশেষ অতিথিরূপে আহ্বান করিয়াছেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি কোন্ কৃতিত্বে যে এমন সম্মানে অধিকারী হইতে পারি, তাহাই ভাবিয়া পাইতেছি না। থাকি অথবা আলিপুরদুয়ার জংশনে, চাকরি করি রেলের লোকে শেড়ে। আলিপুরদুয়ার অথগুণের কর্মকর্ত্তিদীপ্তিময় কোনও বিশেষ সহর নয়, আদিবাসী সেখানকার কোনও উল্লেখযোগ্য বা প্রশংসিত সংকল্পী নহি। আলিপুরদুয়ার অথগুণগুলি যেখানে যেটুকু সংকীর্ণ স্থাপনে চেষ্টিত হইয়াছে

* বিগত ২৯শে মে, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার শিলচরে অনুষ্ঠিত কাছাড় প্রতি

নামেবনে প্রদত্ত শ্রীরাধাকান্ত বসুদেব ভাষণ।

আবাদ, ১৩৬৭]

প্রধান অতিথির ভাষণ

প্রতিধ্বনি

২৪৩

তাহাতে আমার সেবা বা প্রতিষ্ঠা এত গৌণ যে, এত যোগ্য লোক এত স্থানে থাকিতে আমাকেই যে কেন শিলচরের মতন ঐতিহ্য-সম্পন্ন শহরের এমন একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে এমন সম্মানের পদবী প্রদান করা হইল, তাহা ভাবিতে আশ্চর্য্যও লাগে, লজ্জাও বোধ হয়। হয়ত ছোটকে সম্মান করাতেই আপনাদের আনন্দ, হয়ত ক্ষুদ্রকে মহৎ বলিয়া ভাবাই আপনাদের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য, তাহাও বিচিত্র নহে, কারণ আমাদের পরমারাধ্য বাবামণি শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব নিয়তই বলিতেছেন,—

“ছোট বলি’ কারে করিবি ঘৃণা,
 নীচ বলি’ কারে ভাবিবি পর,
 তোর কাছে নাই কাহারো মানা,
 সবারে লইয়া বাঁধিবি ঘর।
 ছোট-বড় আর উঁচুনিচু বাছা
 ভ্রান্ত মনের ব্যাধির জড়।”

বন্ধুগণ, এই কথা সমস্ত্রমে স্বীকার করাই ভাল যে, শিলচর শহর যথেষ্ট আমার মনে বিশেষ একটি মোহ আছে। এই শহর আমার বাবামণিকে অশেষ ভাবে বৃদ্ধিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই শহর বাবামণির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে কথ্যে মূর্ত্তিমান করিবার জন্ত বারংবার অসমসাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সাথেই শ্রীশ্রীবাবামণি এই শহরকে লক্ষ লোকের উপাগনার পক্ষে যোগ্য স্থান বলিয়া নির্ধারণ করেন নাই। অবিকশিত অবস্থায় হইলেও নিশ্চয়ই এখানে মানুষের মনের কোণে এমন রতন লুক্কায়িত রহিয়াছে, যাহার দ্বারা প্রভাষ একদা দিগদোষ উদ্ভাসিত হইবে।

প্রতিধ্বনি

প্রধান অতিথির ভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৪৪

আমার মতন নগণ্য ব্যক্তি একটা নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়া বাইরে পারিবে, এমন ভ্রাশা আমি রাখিনা। তবু আপনাদের ডাকে নিঃসৃত ছুটিয়া আসিয়াছি। আসিয়াছি শুধু এই আশায় যে, আমার মতন মরি-পড়া লোহাও যদি আপনাদের মতন পরশমাণিক্যের স্পর্শে কখনো সোনা হয়। শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিয়াছেন,—

“প্রাণভরা প্রেম ভক্তি নিয়ে—

ভজন করে বারা,

ওরে, পরশমাণিক্য তারা।”

শিলচর যে অখণ্ড-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে একথা বলিলে সম্ভবতঃ অতুক্তি হইবে না। তেমন স্থানে কোন নূতন উদ্দীপনা, প্রেরণা বা অনুপ্রাণনা পরিবেশন করিবার জন্ত আমি আসি নাই। আসিয়াছি শুধু প্রাণ ভরিয়া নূতন প্রেরণা, নবী-সঞ্জীবনা, অভিনব দিগদর্শন সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে। দিবেন আপনারা আমাকে সেই পথ-নির্দেশ, বাহার বলে আমি ব্যক্তিগত অহমিকা চিরতরে ভুলিয়া যাইয়া গুরুগতপ্রাণ হইতে পারিব? বাহার ফলে একলবোর ত্রায় গুরুর প্রীতি-সাধনের জন্ত পারিব নিজ কৃপা ছেদন করিয়া দিতে, উদ্দালক ও উপমন্ত্যুর ত্রায় অশেষ ক্রেশন করিতে, উত্কলের ত্রায় মৃত্যুপুরীতে অভিযান করিতে, তেমন নিঃস্বপ্ন আপনারা আজ কিছু দিয়া দিন। দীক্ষা নিয়া নামেই আমরা হইয়াছি, প্রকৃত অখণ্ড হইতে পারি নাই। আমাদের উদ্ধৃত অর্থ আবাদিগকে গুরুদেবের আদেশ পালন হইতে বিরত করিয়া অর্থ-গুলির চুলচেরা বিচার করিতেই শিখাইয়াছে। অহেতুক সেই বি-
বিভ্রম আমাদের কন্ঠের গতি শিথিল করিয়াছে, উদ্ধৃত চেষ্টাকে

আষাঢ়, ১৩৬৭]

প্রধান অতিথির ভাষণ

শ্রীশ্রীশ্রী

২৪৫

করিয়েছে, কর্মোদ্ভমকে বিনষ্ট করিয়েছে। কাজ না করিয়া কি ভাবে
 পারা যায়, সেই উপায় আবিষ্কার করিতেই আমরা আমাদের বুদ্ধি-শক্তির
 অপচয় করিতেছি। মস্তিষ্কের এই অপব্যবহার হইতে আমাদের
 মুক্তি লাভ করিবার পথ আপনারা দেখাইয়া দিন। আমরা কথায় বড়
 কিছু কাজে দড়। সাত মাইল লম্বা কথা না কহিলে আমাদের চলে না
 কিছু কাজ তিন ইঞ্চিও অগ্রসর হয় না। আমাদের গুরুদেব
 আমাদের সর্ববিষয়ে অসাধারণ স্বাধীনতা দিয়াছেন, আর, সেই
 স্বাধীনতার আমরা অপব্যবহার করিতেছি। একথা আমি স্পষ্টকার
 সহিত বলিতে পারি যে, বর্তমান ভারতের কোনও প্রান্তে এমন আর
 একজন গণতন্ত্রী গুরু দেখা যায় নাই। অতএব দেখিতেছি, গুরুদেবের
 পূজাকেই বিধদেবের পূজা বলিয়া আন্দোলন চালান হয় আর ইনি
 নিজের পূজাকে বন্ধ করিয়া আদর্শের পূজার দিতেছেন উপদেশ।
 সেই সুযোগে গুরুদেবের অভিপ্রায়কে পূরণ না করিয়া
 চলিতে পারাকেই আমরা অনেকে আদর্শবাদ বলিয়া
 গ্রহণ করিয়াছি। আসুন আপনারা, আমাদের ভিতর হইতে এই
 পাপ সর্বপ্রযত্নে দূরীভূত করুন। অথগু-দীক্ষা পাইবার আগে আমরা
 অনেকেই ব্রাহ্মণদিগকে কটাক্ষ করিতাম, কটুক্তি করিতাম, বিদ্রোপ
 করিতাম। অথগু-দীক্ষার গুণে ব্রাহ্মণ্য-মাধনার অধিকার পাইবার
 পরেও আমরা চিন্তায়, কর্মে, আচরণে সেই পচা শূদ্রই রহিয়া গিয়াছি,
 ত্যাগ আমাদের আসে নাই, পরোপকার-প্রবৃত্তিও না। ইহা গুরুদত্ত
 সাধনে অমনোযোগেরই ফল। আসুন আপনারা গুরুদত্ত সাধনে
 যুগভীর রুচি প্রদান করিয়া আমাদের শূদ্রত্ব-মোচনে সাহায্য করুন।

কত কত গুরুদেবেরা বলিতেছেন,—“আমাকে মানো, আমাকে
 পূজা কর, আমাকে দীক্ষার অবতারণা বলিয়া প্রচার কর, গৃহে গৃহে

প্রতিধ্বনি

প্রধান অতিথির ভাষণ

[১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৪৬

যাইয়া অনুরোধ, উপরোধ, প্রলোভন, ভয়প্রদর্শন এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা সর্বত্র আমার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা কর,”—আর আচার্য্য স্বরূপানন্দ বলিতেছেন,—“আমার পূজা প্রবর্তনের জন্ত তোমরা বৃথা শ্রম করিও না, প্রভাত-সূর্য্যের মত যেখানে যেখানে প্রকাশ হইবার আমি আপন আপনিই হইব, তোমরা মতোর অনুগত হও, মতোর জন্ত প্রয়োজন হইলে তোমরা আমাকে ছিন্ন কঙ্কর মতন পরিত্যাগ কর।” কে আছেন পৃথিবীতে দ্বিতীয় গুরুদেব, যিনি এমন করিয়া নিজেকে নিষ্কৃত করিয়া দিয়া হইলেও শিষ্যের নিজস্ব বিকাশকে কামনা করিতেছেন? এই হিসাবে আচার্য্য স্বরূপানন্দ জগতের সকল আচার্য্যদের অপেক্ষা পৃথক, তাঁহার এই বিশিষ্টতা একান্তই তাঁহার নিজস্ব। তিনি এই দিক দিয়া সম্পূর্ণ মৌলিক। তিনি কাহারও অনুকরণ নহেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে অনুকরণ করিবার যোগ্যতা কয়জন আচার্য্যের আছে, তাহাও একমাত্র ভাবী ইতিহাসই বলিতে সক্ষম। কিন্তু এমন স্বাধীনতা-দাতা গুরুকে আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। তিনি আমাদেরকে যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহার অর্থ আমরা বুঝিয়াছি, তাঁহার আদেশ অমান্য করা। আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা যে একমাত্র তাঁহার আদেশ পালনের যোগ্যতা অর্জন করা দ্বারাই আসিবে, তাহা কে বুঝিবে? আপনারা এমন কিছু করুন, যাহাতে কেবল অযোগ্য শিষ্য আমরাই নহি। জগদ্বাসী সকলেই বুঝিতে পারে, স্বরূপানন্দ কে, অথও কথটির মানে কি, অথও-মণ্ডলী কি জিনিষ। বাবামণি কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না বলিয়াই কি একটা সহরে ছই, তিন বা চারিটা করিয়া অথও-মণ্ডলী স্থাপিত হইবে? বাবামণির আসন খানা বিগ্রহের সম্মুখে স্থাপন করিবার পরে মাত্র ছইজন মিলিত হইলেই যখন সমবেত উপাসনা চলে, তখন সমবেত উপাসনার জন্ত একটু দূরে আমরা কী

আষাঢ়, ১৩৬৭]

প্রধান অতিথির ভাষণ

প্রতিধ্বনি

২৪৭

করিয়া যাইব কেন,—এই যুক্তিতে একটা গ্রাম বা সহরকে কয়েক ভাগে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলে তাহার ফলে কি সেই গ্রাম বা সহরের মধ্যে সর্বাত্মক ঐক্য সৃষ্টি হইতে পারে? কেন আমরা পরল বৈশাখের উৎসব, শারদীয়া উপাসনা, জন্মোৎসব আদি অতি-বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি চতুর্দিকের সকল মণ্ডলীর পূর্ণ সহযোগে একটীমাত্র স্থানে করিয়া আনন্দ ও আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টিতে পূর্ণতার পরাকাষ্ঠায় নিতে চেষ্টা করি না? পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডলী করিয়াছি বলিয়া কি জন্মোৎসবও পাড়ায় পাড়ায় করিতে হইবে? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামাদাতা গুরু জন্মোৎসবে কেন আমরা নিজ পাড়ার বা নিজ গ্রামের জিদ ও মায়া ত্যাগ করিয়া সকলে এক স্থানে মিলিত হইতে পারিব না? কেন্দ্র হইতে যদি নির্দেশ আসে বা ডিক্রগড়ের মতন সেবায় কুলীন মণ্ডলী হইতে যদি সুপ্রস্তাব আসে যে, জন্মোৎসবের আড়ম্বর কমাইয়া সকল মণ্ডলীর বৃহত্তম শক্তি যুগপৎ কোনও এক স্থানে সজ্জের একটী স্থায়ী সম্পদ সংরক্ষার্থে বা সৃষ্টির জন্ত বিনিয়োজিত হউক, তাহা হইলে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্ত কি আমাদের প্রত্যেকের আপ্রাণ প্রয়াস পাওয়া উচিত নহে? শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না যে, ডিক্রগড়ের প্রস্তাব কার্য্যকর করিবার চেষ্টা করায় পাশ্চমবঙ্গের একটী বিখ্যাত রেল-নগরীতে ভাতা-ভগিনীরা সঙ্গে সঙ্গেই হস্তসঙ্কোচ করিলেন। উত্তরবঙ্গের একটী সহরে অনেক ভাতা-ভগ্নী জিদ করিলেন, খিচুড়ী যদি না করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা উৎসবের জন্ত একটী পয়সাও দিবেন না, জন্মোৎসবে তাঁহারা অন্নদান রূপ পুণ্য কার্য্যটি সুবিস্তারে করিবেনই করিবেন। ডিক্রগড় অথও-মণ্ডলী খিচুড়ীর পাট তুলিয়া দিয়া মঙ্গল-বাদের জন্ত এক হাজার এক টাকা পাঠাইবার সামর্থ্য দেখাইলেন কিন্তু

প্রতিনিধি

প্রধান অতিথির ভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৪৮

এমন সুদৃষ্টান্ত আর কয় স্থানে, আমরা দেখাইয়াছি?—অথচ মঙ্গল-বাঁধ সমগ্র সমাজের একটি স্থায়ী সম্পদ।

মঙ্গল-বাঁধের জন্ত ত্যাগ-স্বীকার করিতে আমাদের কুণ্ঠার অনু-অবধি নাই। প্রকাণ্ডেই আমরা আলোচনা করিতেছি যে, প্রতিনিধি-সম্মেলন করিয়া আমরা সকলের উপরে অর্থের চাপ বৃদ্ধি করিতেছি। অথচ সকলেই ভুলিয়া যাইতেছি যে, মঙ্গল-বাঁধ আজই ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু প্রতিনিধি-সম্মেলন ইহার আগেও হইতেছিল। একজন নির্দিষ্ট অপ্রার্থী সন্ন্যাসীর বার্তাক্যের মূল্যবান পরমায়ুর বিনিময়ে বারোটা বৎসর ধরিয়া যখন মঙ্গল-বাঁধ আস্তে আস্তে নিশ্চিন্ত হইতেছিল, সেই সময়ে কেহ কি বৃণাক্ষরেও এত বড় একটা সৃষ্টির নিদারুণ ইতিহাস জানিতে পারিয়াছেন? বুদ্ধ নিপুণ হস্ত কেমন করিয়া বিরাট বিরাট পাথর ভাঙিতেছে, কেমন করিয়া একটা জলশূন্য মরুভূমিকে আস্তে আস্তে বিশাল সরোবরে পরিণত করিতেছে, সেই সংবাদ কি তখনকার দিনের একটি প্রতিনিধি-সম্মেলনেও পরিবেশিত হইয়াছিল? আশ্রমের প্রয়োজনে অর্থ-সংগ্রহ করিবার জন্ত একটি প্রতিনিধি-সম্মেলনেও কি আলোচনা হইয়াছিল? প্রতিনিধি-সম্মেলনগুলির নিজস্ব কর্তব্য আছে, তাঁহারা সেই কর্তব্যই পালন করিতেছিলেন। হাঁ, বাহাদুরী বলিয়া স্বীকার করিতাম, যদি সম্মেলনগুলি পুণ্ড্রকী আশ্রমে কোনও নবমুষ্টির স্বাক্ষর রাখিতে পারিতেন। একটা বিরাট কীর্তি দৈবভাবাপন্ন ধ্বসিয়া পড়িল, ইহাকে চিত্র-লোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত সম্মেলন-গুলি প্রশংসনীয় এক চেষ্টা শুরু করিয়াছেন। সম্মেলনগুলি যদি এ কাজ এই সময়ে না করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র অথও-সমাজের মুখে অনপনয় কলঙ্ক-লেপন হইত। এই সময়ে সম্মেলনগুলিকে অথওদের উপরে অর্থের চাপ দিবার ফন্দী বলিয়া বর্ণনা করা সত্যই দোষাবহ।

আষাঢ়, ১৩৩৭]

প্রধান অতিথির ভাষণ

প্রতিনিধি

২৪৯

আমল কথা হইতেছে এই যে, মঙ্গল-বান্ধ নিয়া আলোচনা করা ছাড়াও মঙ্গলনগুলির বহুবিধ কর্তব্য রহিয়াছে ইহা যেমন সত্য, তেমন আবার সংকার্যো দান না করিতে করিতে, গুরুদেবের কাছ হইতে কখনও অর্থের দাবী না পাইতে পাইতে, চাঁদা-সংগ্রহকারী ভিক্ষুক-সত্ত্বগুলিকেই আমরা মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর, চাঁদা দিতে অভ্যস্ত হইয়াছি এবং আজ আমাদের নিজ গুরুধামে হঠাৎ গুরুতর বিপদ ঘটতে সেখানে আবার টাকা পাঠাইতে হইবে ভাবিয়া মনে মনে বিরক্তি বোধ করিতেছি। ইহা যে আমাদের মনের রুগ্নতা, চিন্তের দুর্বলতা, হৃদয়ের সহানুভূতিহীনতা, এই রূঢ় সত্য কথাটা আমাদের অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া নেওয়া উচিত। আত্মদোষ স্বীকার না করিলে দোষের সংশোধন হয় না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিষ্যরাই তাঁহাদের মঠ গড়িয়া দিলেন, রামঠাকুরের শিষ্যরাই কৈবলাধাম, বাদবপুর আশ্রম গড়িলেন, কেবল আমাদের গুরুদেবই নিজে খাটিয়া আমাদের জগু ও আমাদের পরবর্ত্তীদের জগু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া বাইতেছেন, আমরা আগাইয়া আসিতে কুণ্ডাবোধ করিতেছি,—ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জাকর ব্যাপার নহে?

অথও-প্রতিনিধি-সম্মেলনের কর্তব্য অতি ব্যাপক ও বিশাল। শুধু মাত্র মঙ্গল-বান্ধ সংস্কার বা তাহার তীরে তীরে ভাবী কালের শ্রেষ্ঠ-বিধবিধ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজটুকুতেই প্রতিনিধি-সম্মেলন আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তবে, বর্ত্তমানে মঙ্গল-বান্ধ হইতেছে সর্বাপেক্ষা জরুরী বিষয়, এই বিষয়কে উপেক্ষা করিলে পরম কর্তব্য-সাধনে চরম অবহেলার পরিচয় দেওয়া হইবে। কেন তাহা হইবে, তাহা সাম্প্রতিক কয়েকটা প্রতিনিধি-সম্মেলনের সভাপতি ও প্রধান অতিথিদের ভাষণে সুস্পষ্ট হইয়াছে। আমি সেই সকল বিষয়ের পুনরুক্তি করিতে চাহি না।

প্রতিনিধি

প্রধান অতিথির ভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৫০

কিন্তু মজল-বাঁধ সম্পর্কিত বিষয়ের এই priority বা প্রাথমিক দাবী থাকার সত্ত্বেও একথা ভুলিলে চলবে না যে, প্রতিনিধি-সম্মেলনগুলি যেন আমাদের কথার ফানুস উড়াইবার গড়ের মাঠেই পর্যাবসিত না হয়, কথার তুবাড়ি জ্বালাইবার অন্ধকার গলিতে না পরিণত হয়। প্রত্যেকটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান দ্বারা আমরা যেন শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—“শক্তি আসে প্রেম থেকে, শক্তি আসে বিশ্বাস থেকে।” প্রত্যেকটি প্রতিনিধি-সম্মেলন যেন আমাদের প্রেম ও বিশ্বাস বর্দ্ধিত করে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—“প্রেমই বল আর বিশ্বাসই বল, সবই আসে সাধন হইতে।” আমরা যেন সাধক হই।

সুদীর্ঘ কথার মালা গাঁথিয়া আর আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে চাহি না। তবে একটি প্রত্যাশার কথা প্রকাশ করিব। আমি প্রত্যাশা করিতেছি যে, শিলচর মহরের প্রত্যেকটি অথও এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন। আরও প্রত্যাশা করি যে, জেলার ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক মণ্ডলী ৫।১০ জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। এ জেলার উপর বিরাট ভার তুলু রহিয়াছে। সেই ভার “লক্ষ লোকের উপাসনা।” সামগ্রিক ভাবে প্রস্তুত না হইলে কার্যকালে সফলতা আহরণ করিবেন কি করিয়া? আর, দেশ তৈরী না হইলে বাবামণিই বা কেন তারিখ নির্দ্ধারণ করিবেন?

আপনারা অযোগ্য স্বন্ধে গুরুতর কর্তব্য অর্পণ করিয়া আমাকে বিরক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পশ্চাতে আপনাদের সুগভীর মেহ রহিয়াছে জানিয়া আমি চিরঞ্চলী হইয়াছি। আমার সমস্ত দোষত্রুটি অসম্পূর্ণতা ও রূঢ় বাক্য ক্ষমা করিয়া আমার সানন্দ “জয়গুরু” গ্রহণ করুন। পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

আলিপুরছার
জংশন

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বকশী

আষাঢ়, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

২৫১

প্রতিনিধির কণ্ঠবাণী

বিগত মাসে বিভিন্ন জিলায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অথও-প্রতিনিধি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, যাহাতে প্রত্যেকটি জেলাতেই বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবে সেই সকল অথও-প্রতিনিধি-সম্মেলনের মূল্যবান ভাষণগুলি আমরা সম্পূর্ণতঃ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম না। কয়েকটি ভাষণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম।

নগাঁও-জেলা ও মিকির-পাহাড় অথও-প্রতিনিধি-সম্মেলনের লক্ষ্য অধিবেশনে সভাপতি শ্রীব্রজনাথ মজুমদার (তিনসুকিয়া) বিগত ৫ই জুন ২২শে জ্যৈষ্ঠ বলেন,—

“আজ এই মহতী সভায় সমবেত সকলের দিকে তাকাইয়া অথাক্ বিশ্বয়ে ভাবিতেছি, আমরা ত সকলেই একে অতের অপরিচিত ও অনাত্মীয় ছিলাম। কাঁহার মোগার কাঠির স্পর্শে পরস্পর শুধু পরিচিতই হইলাম না, পরন্তু আমাদের ভিতরে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবোধেরও সৃষ্টি হইল? কে এই বিচিত্র মহিমময় বাবামণি? তাঁহাকে আমরা কতটুকু বুঝিতে বা জানিতে পারিয়াছি?.....জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগের ত্রিবেণী-সঙ্গমে দাঁড়াইয়া এই বিরাট শাশ্বত মহাপুরুষ কেবল আমাদের নিকটেই নহে, সমগ্র বিশ্বে আজও দ্বেজ্য ও রহস্তময়।.....কর্ম্মযোগ সাধনার মধ্য দিয়া তিনি লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন কর্ম্মশক্তি ও স্বাবলম্বনের অপূর্ণ আলেখ্য। আসিয়াছে বাধাবিপত্তি, আসিয়াছে দুঃখোগ। লক্ষ বাধার সীমাহীন ক্রুদ্ধ তরঙ্গ সর্ব্বশক্তি লইয়া কুথিয়া দাঁড়াইয়াছে তাঁহার অগ্রগতির পথে কিন্তু তাঁহার দ্বেজ্য

প্রতিধ্বনি

প্রতিনিধির কণ্ঠবাণী

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৫২

কর্মশক্তির নিকট পরাজিত হইয়া নিস্তেজ জুজুঙ্গের দ্যত অচল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে তাঁহার পদতলে । তাঁহার কর্মসাধনার একটা অধ্যায় পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিল পুপুন্যের শ্রাপদ-মঙ্গুল প্রস্তরাকর্ষণ বন্ধুর গহন অরণ্যে । লেখনী রচনা করিয়া চলিয়াছে নবযুগের বেদ , গাইতি কোদাল রচিয়া চলিয়াছে নবযুগের নৈমিষারণ্য । নামজপের সঙ্গে সঙ্গে অপমৃত হইয়াছে প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড, কর্মকে যোগ আর যোগকে কর্মে রূপান্তরিত করিবার অভিনব দৃষ্টান্ত হইয়াছে সৃজিত ।..... অবশেষে কঠোর সাধনায় আসিল অকল্পনীয় শিদ্ধি, “বজ্রকঠোর এই পাথরে, ফুটবে ফুল ধরে ধরে” কথাটি সত্য হইল, জলহীন প্রান্তরে সৃষ্ট হইল। বরাট বিশাল জলাধার মঙ্গলবাধ । পুপুন্যী অখণ্ডের পরমপবিত্র তীর্থক্ষেত্র, আর মঙ্গলবাধ হইল তাহার প্রাণকেন্দ্র । দৈবদ্রবীপাকে মঙ্গলবাধ ভাঙ্গিয়া গিয়া এক গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে । কর্তব্য আজ আমাদিগকে বজ্রগর্জনে ডাকিয়া কহিতেছে,—আর ঘুমাইও না । আমরা কি এই ডাকে সাড়া দিবার জ্ঞাত প্রস্তুত বইয়াছি ?..... আমরা কি নিজ নিজ জীবনের সমস্তার সঙ্গে আমাদের আশ্রম-প্রতিষ্ঠানের সমস্তাকে অভিন্ন রূপে গ্রহণ করিয়াছি ?..... এত বড় গুরুতর সংবাদ পাইবার পরেও মঙ্গলবাধের সংস্কার কার্য্য প্রতিপদে হোঁচট খাইয়া খাইয়া চলিতেছে, আর সেই ভগ্ন বাধের উপরে শ্রমক্লিষ্ট পরমপিতার সর্ব্বশরীর খর রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইয়া মসৌবর্ণ ধারণ করিয়াছে । আমরা আমাদের বৃদ্ধ আচার্য্যের এই মর্ম্মস্তুদ রূপ আর দেখিতে চাহিব না, ইহাই অগুকার সম্মেলনের অপরিহার্য্য সঙ্কল্প হইবে ।..... পুপুন্যী আশ্রম শ্রীশ্রীবাবামণির সৃজনী প্রতিভার এক অসামান্য নিদর্শন ।

আষাঢ়, ১৩৬৭]

প্রতিনিধির কর্তব্যাবলী

প্রতিধ্বনি

২৫৩

মঙ্গলবাদের সম্পূর্ণতা সেই সৃজনী শক্তিকে শত গুণে বিস্তারিত
করিয়া এক অভিনব বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দিবে। এই সময়ে ইহা
প্রশ্ন নহে যে, আমরা কে কত দিব, কে কত কাল দিব। আমরা
প্রতিজ্ঞনে আমাদের সর্ব্বশ্রম দিব এবং যাবৎকাল দেহ ধারণের জন্ত
নিজ নিজ আহারীয় সংগ্রহ করিব, ততকাল আমাদের এই মেবা
অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে। মঙ্গলবাদ শুধু একটা বিরাট
জলাশয়ই নহে, ইহা বিশালতর ভাবী পরিকল্পনার নির্ভরযোগ্য
একটা base,—ইহার উপরে নির্ভর করিয়া অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে
এক স্থায়ী অভিযান ধারাবাহিক ভাবে পরিচালিত হইবে।....
কেহ কেহ এই ব্যাপারে ভ্রম-পরিচালিতও হইয়াছেন। প্রতিনিধি-
সম্মেলনগুলি মঙ্গলবাদের জন্ত অর্থ সংগ্রহার্থেই অনুষ্ঠিত হইতেছে,
অথ কোনও উদ্দেশ্য বা উপযোগিতা নাই, এবং ইহা দ্বারা দানে-
অনিচ্ছুক একদল ভ্রাতার উপরে আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা হইতেছে,
এমন অভিযোগ কোথাও কোথাও শুনা গিয়াছে। কিন্তু মঙ্গলবাদ
আজই ভাঙ্গিয়াছে, প্রতিনিধি-সম্মেলন ত আজিকার জিনিষ নয়! এত
কাল ধরিয়া মঙ্গলবাদ নীরবে নির্মাণ চলিতে ছিল, কৈ তখন ত
কোনও প্রতিনিধি-সম্মেলনে ইহার কথা ওঠে নাই! এতকাল
ধরিয়া প্রতিনিধি-সম্মেলনগুলি যাহা করিতে চাহিয়াছে, তাহা করিতে
পারে নাই। পারে নাই তাহারা সংঘাতবোধ সৃষ্টি করিতে। পারে
নাই তাহারা অখণ্ড-সংহিতার ব্রহ্মবাণী দিকে দিকে প্রচার করিতে।
তাহারই জন্ত আজ এমন অশোভনমন্তব্যের সৃষ্টি হইতে পারিয়াছে।
আমুন আমরা প্রতিজ্ঞনে প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করি এবং যেখানে
একটা মাত্র অখণ্ড আছে, সেখানেই বাহিরের লোকের কাছে
প্রত্যহ একটা ঘণ্টা করিয়া অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া শুনাইবার

প্রতিধ্বনি

প্রতিনিধির কণ্ঠবাণী

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৫৪

পূণ্য দায়িত্ব গ্রহণ করি। আর যে সকল অথগুেরা দূরে সরিয়া
আছেন, তাঁহাদিগকে অথগুসংহিতার মাধ্যমে সমীপস্থ করি।”

লক্ষ্যার উল্লিখিত অধিবেশনে শ্রীঅবনীকান্ত দাশ (মনাছড়া) প্রাধান্য
অতিথিরূপে যে ভাষণ প্রদান করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে
লিখিত হইল। যথা—

“সভা আমরা অনেক করিয়াছি, সুললিত ভাষণ ও অনেক
হইয়াছে, সভাস্থলে অনেক অশ্রুবর্ষণও হইয়াছে। কিন্তু কাজ
আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। কথায় বলে, “বৃক্ষ তোমার নাম
কি?” উত্তরে বৃক্ষ বলে,—‘ফলেন পরিচীত’। আমরা
সভা-সমিতি করিতেছি, তাহার অবশ্য নানাবিধ তাৎপর্য্য আছে।
পরস্পরের মিলিত হইবার অভ্যাস এক অতি বড় জিনিষ। আরও
বহু স্থানে বহু বার ছোট-বড় সম্মেলন ও আলোচনা-সভা হইবার
প্রয়োজন আছে। মঙ্গলবোধ আমাদের সজ্জের সম্পদ,—কেবল
তাহাকে রক্ষা করিবার জন্তই নহে, এক ডাকে এক স্থানে সরলের
মুহূর্ত্ত-মধ্যে মিলিত হইবার যে ক্ষমতা, তাহার অনুশীলনের জন্তও
ইহা প্রয়োজন। সমস্ত জেলার প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া
নিজেদের ভালমন্দ আলোচনা করিবেন, ইহা যেমন প্রয়োজন,
তিনটি কি চারিটি মাত্র পান্থবর্ত্তী মণ্ডলী মিলিত হইয়া আলোচিত
বিষয় সমূহের পুনরালোচনা করিবেন, ইহাও তেমন প্রয়োজন।
তবে সর্ব্বত্ৰ এই যে, কথা যেন কথার জন্তই না হয়, কাজও যেন হয়।
আমার কিশোর পুত্র খবর পাইল যে, তাহার দাভ্রমণি, আমাদের
বাবামণি, কলিকাতা আসিয়াছেন। চরণ দর্শনে গিয়া দুঃখভারাক্রান্ত
হৃদয়ে লিখিল,—“দাভ্রমণির সাথে দেখা করিতে যাইয়া তাঁহার
শরীরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে বিবেক মার

আষাঢ়, ১৩৬৭]

প্রতিনিধির কর্তাবালী

প্রতিধ্বনি

২৫৫

দিল না, সাহস হইল না। পুপুনকীর অতিশ্রম ও স্বাস্থ্যের উপর উৎপীড়নের ফলে তিনি শয্যাসায়ী এবং চিকিৎসকগণের পর্যা-
বেক্ষণাধীন।' কিন্তু দুদিন পরেই পুনরায় তিনি পুপুনকী ছুটিয়া
গেলেন এবং আবার মঙ্গলবাঁধের জন্ত শ্রম করিতে করিতে পীড়িত
হইলেন। এখন তিনি বাধ্য হইয়া মুম্বরীর শৈলনিবাসে বাধ্যকর বিশ্রাম
নিতেছেন। সন্দেহের কারণ ঘটয়াছে যে, আগামী শারদীয়া পূর্ণিমার
উপাসনার সময়ে পুপুনকী উপস্থিত থাকিতে পারেন কি না।
হয়ত পুপুনকীতে আমাদের মিলনোৎসবের তারিখ পিছাইয়া পৌষ
মাসে জন্মদিনে নিয়া ফেলিতে হইবে। শ্রীশ্রীবাবামণি কোনও এক
ব্যাপারে আমাকে একবার স্বামী বিবেকানন্দের অকাল-প্রয়াণ
সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন,—“বঙ্গালী জাতি মোণার তরী ছাই বোঝাই
করিয়া গঙ্গায় ডুবাইয়া দিল।” আমরাও কি ঠিক সেই ভুলটীরই
পুনরাবৃত্তি করিতেছি না? আমরা শ্রীশ্রীবাবামণিকে অতি সাধারণ
একটি মানুষ মাত্র মনে করিতেছি! তাহার নির্দেশ ও অভিপ্রায়
অনুসরণ না করিয়া অনেক মূল্যবান সময় বৃথা তর্ক ও অর্থহীন
বিচারে ব্যয়িত করিতেছি। কথায় কথা বাড়িতেছে, কাজ
হইতেছে না। শ্রীশ্রীবাবামণি এই জন্তই বোধ হয় এক পত্রে
লিখিয়া থাকিবেন,—“আমি যে অযাচক-বৃত্তি নিয়াছি, তাহার
পিছনের বল ঈশ্বরে নির্ভরতা। তিনি ইচ্ছা করিলে যখন যাহার
বাহা প্রয়োজন, তাহাকে তখন তাহা দিতে পারেন। তবু লোকে
মৎকাজে দশজনের সহযোগ প্রত্যাশা করে। তোমরা যদি
উপস্থিত-কর্তব্য তোমাদের ভাবে বিভাবিত মতীর্থদের আর্থিক
সহযোগ লাভ প্রয়োজনীয়ই মনে করিয়া থাক, তাহা হইলেও এই
সাধারণ নীতিবাক্যটুকু মনে রাখিও যে, অপাত্রে প্রার্থনা অকাল-

প্রতিদিনি

প্রতিনিধির কর্তব্যাবলী

[২ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৫৬

মৃত্যুর ত্রায় অবাস্তিত।” সুতরাং আমাদের প্রেমিক হৃদয়গুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মঙ্গলবান আজ সাম্প্রতিক জরুরী প্রয়োজন কিন্তু আমাদের মন্থুখে ইহার পরেও ব্যাপকতর কর্তব্য রহিয়াছে। সজ্জহিসাবে জগতের কাছে আমাদের স্বামী কল্যাণের বিশালতম অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া অখণ্ড-সংজ্ঞের শক্তি ও মহিমার প্রমাণ রাখিতে হইবে। আমরা যেন প্রতিটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মিলন-সভায় আমাদের এই উপস্থিত কর্তব্যের সাথে আমাদের সেই শাপ্ত কর্তব্যের কথা পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান সহ স্মরণ করি। সভা-সম্মেলন আদির অনুষ্ঠানকে মুখর কৃষ্ণকির আঘাতে স্রিয়মান করিতে না দিয়া আমরা যেন চলমান সংকল্পের সুনিশ্চিত অগ্রগতির মধ্য দিয়া তাহাদের সার্থকতা প্রসারিত করি। এখানে যদি আজ সাক্ষাৎ সহকারে জেলা-প্রতিনিধি-সম্মেলন হইয়া থাকে; তাহা হইলে সাত হইতে পনের দিন মধ্যে যেন জেলার প্রতিটি গ্রামে একটা করিয়া স্থানীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় এবং তাহাতে আমরা সজ্জানুষ্ঠিত এবং সাধনানুরাগ উভয়ই যেন অনুশীলন করিতে পারি।”

ত্রিপুরা-রাজ্য অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলনের তেলিয়ামুড়া অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাবণে বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১২ই জুন শ্রীমুকুন্দ চক্রবর্তী (মণিপুর রোড) যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে দিতেছি। যথা,—

“ত্রিপুরা পাহাড়ের ভ্রাতাদের ডাকে নাগা পাহাড়ের দীন ভ্রাতা ছুটে এসেছে সেখানকার ভ্রাতাদের গৃহেচ্ছা এখানকার ভ্রাতাদের জানাতে এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সেবা কহে। সেবক মূল্যহীন হয়ে যায়, যদি তার সেবা কেউ গ্রহণ না করে। আমরা

আষাঢ়, ১৩৬৭]

প্রতিনিধির কর্তব্যাবলী

প্রতিনি

২৫৭

দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই সেবকাধর্মের সেবা নিজগুণে গ্রহণ ক'রে তাকে ধৃত্য করবেন।

“এই যে আমরা মাঝে মাঝে সম্মিলিত হই, নিশ্চয়ই তার একটা ব্যাপক তাৎপর্য আছে। নিশ্চয়ই আমরা পরস্পরকে সেবা দেবার জন্তই আসি। শ্রীশ্রীবাবামণি বলেছেন,—‘যার যা প্রয়োজন, তাকে তা দেওয়ার নামই সেবা।’ কিন্তু জগতে প্রয়োজন দ্বিবিদ, একক প্রয়োজন আর সামূহিক প্রয়োজন। আমাদের একক প্রয়োজন দাবী কচ্ছে আমরা যেন গুরুদত্ত সাধনে প্রত্যেকে নিষ্ঠাবান ও একাগ্র হই। আমাদের সামূহিক প্রয়োজন দাবী কচ্ছে, আমরা যেন সর্বজননের শুভ প্রয়াসে পরস্পর পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করি। আমরা দীক্ষা নিয়েছি, সাধন করিনা, এমতাবস্থায় প্রত্যেক অথঙের অধিকার আছে, আমাদের চোখে আগুল দিয়ে আমাদের দোষ-ত্রুটি গুলি দেখিয়ে আমাদের প্রতি-জনের মনকে সাধনপথগামী করার। আমরা আমাদের সকলের মিলন-তীর্থ সংঘের মূল কেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি দিই না, এই অবস্থায় আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেকের মনে ত্যাগের উদ্দীপনা ও শক্তি জাগিয়ে তোলা। সামর্থ্য যার যতই কম হোক, সে তারই পূর্ণ সম্ভাবহার করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আপনাদিগকে সেবা দিতে এসেছি। আপনারাও আপনাদের মহনীয় দৃষ্টান্তের আলোকে আপনাদের এই অধ্যম ভ্রাতার অন্তরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর ক'রে দিয়ে তাকে অমানুষ থেকে মানুষ ক'রে তুলবেন, মানুষ থেকে দেবতায় উন্নীত করবেন, আপনাদের কাছে এই সেবা পাবার প্রত্যাশাও নিয়ে আজ এসেছি। আমাদের সকলের সর্বোচ্চ উন্নতি আমাদের শাশ্বত লক্ষ্য, আর

মঙ্গলবাদের মত জিনিষকে রক্ষা করার জন্ত সর্বশক্তি নিয়ে অবিলম্বে কাজে বাঁপিয়ে পড়া আমাদের আজিকার সর্বাপেক্ষা নিকটতম লক্ষ্য। আমাদের সম্মেলনগুলি উভয় দিকেই আমাদের সাফল্য প্রদান করুক।

“ব্যষ্টিকে ছেড়ে সমষ্টি হয় না। আগে ব্যষ্টিকে খাঁটি হতে হবে, তবেই সমষ্টিকে খাঁটি করা সম্ভব। কাজেই প্রত্যেক অখণ্ডকে মনে প্রাণে হ’তে হবে প্রকৃত অখণ্ড। তবেই না সম্ভব হবে! আজ আমাদের নিকটে এটাই এক বিরাট প্রশ্ন,—যে প্রশ্নের সমুত্তর আমাদের নিজ নিজ জীবনের আচরণের দ্বারা দিতেই হবে,—কেন আমরা ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ থাকব? কেন আমাদের জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে অসাধারণ হ’তে উঠবে না? কেন আমরা জীবে জীবে ব্রহ্মের উপস্থিতি উপলব্ধি করে মানব-কল্যাণ সাধনে নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করবার মন্বর করব না? কেন আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্দ্ধে উঠতে পারব না? কেন আমরা নিজেদের জীবনকে সুপরিচালিত করবার জন্ত নিজেরাই দৃষ্টান্ত স্থাপনের যোগ্য এমন আচরণ করব না, যা দেখে নিজেরাই অধিকতর উত্তমে উদ্বীপিত, অধিকতর ত্যাগে আগ্রহী হ’য়ে উঠতে পারি? কেন আমাদের জীবন এমন হবে না, যা অপরকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে সংপথে নেবার পূর্বে আমাদেরকেই সতর্ক প্রহরীর হ্রায় নিত্য প্রহরা দিয়ে সত্যের পথে, ধর্মের পথে, কল্যাণের পথে অপরাজেয় বিক্রমে পরিচালিত করবে? আজ মঙ্গলবাদ আমাদের নিকটে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন দাঁড়িয়েছে! না, আমরা নিজেদিগকে দেখে মনে প্রাণে মহৎ কাজের জন্ত গড়বার তেমন চেষ্টা কখনো

আষাঢ়, ১৩৬৭]

প্রতিনিধির কণ্ঠবাণী

প্রতিধ্বনি

২৫২

করি নি। আমাদের প্রতিজ্ঞার শক্তি মিলিত হয়েই না এই মহৎ ব্রত উদ্‌ঘাপিত হবে!

“মঙ্গলবাধ আমাদের নিকটে কেবলই একটা সমস্যা নয়। এই সমস্যা অল্প দিকে আমাদের অনেক গুটতর সর্ব-সমস্যার সমাধানও। এক বলহীন বীর্ঘ্যবরীয়ান্ জাতিসৃষ্টির সুখস্বপ্নই না আচার্য্য স্বরূপানন্দ তাঁহার জীবনের বিগত পঞ্চাশাধিক বৎসর ধরে দেখে এসেছেন, তারই প্রেরণায় না তিনি বিশ্রাম-সুখকে জীবন হতে একেবারে নির্বাসিত করে দিয়ে জেলার পর জেলা প্রদেশের পর প্রদেশ ভ্রমণ করে লক্ষ লক্ষ কর্ণে বীর্ঘ্যের বাণী, ব্রহ্মচর্য্যের বাণী নব-ভারতের পুনরুদ্ভবের বাণী শুনিতে আসছেন! তাঁর দ্বারা উপদিষ্ট জন-সমাজ আজ বার্কাক্যের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে অথচ তিনি পক্ষকেশ পক্ষশ্রাবিমণ্ডিত মুখমণ্ডল নিয়ে আজও সেই ব্রহ্মবাণী হুড়িয়ে যাচ্ছেন, আজও কোদাল গাইতি শাবল নিয়ে পুপুন্যকীর পাথর ভাঙছেন। মঙ্গলবাধের তীরে তীরে তাঁর মহাজাতিগঠনের সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানটা গড়ে উঠবে। মঙ্গলবাধের শীতল জল সেই মরুভূমির বুকে নূতন জীবন-বেদ রচনা করবে। এই জগৎই বলিছি, মঙ্গলবাধ আমাদের নিকট কেবলই সমস্যা নয়, মঙ্গলবাধ আমাদের সর্বসমস্যার সমাধানও। বীর্ঘ্যহীন, দুর্বল, ভীক, কল্লকুণ্ঠ ছাত্রদল নয়, শক্তিমান্ আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ, স্বাবলম্বী, পরহিতকারী নবজাতির সৃষ্টির সেখানে হবে পত্তন। এই প্রয়োজন আমাদেরই। ক্রীতবাস্যবান্ আমাদের প্রয়োজনেই আজ মঙ্গলবাধের ভগ্নতীরে দাঁড়িয়ে কঠোর শ্রমে পরমায়ু ক্ষয় করে রক্ত ও ক্লান্ত হয়েছেন। আমাদের নিজ প্রয়োজনের দাবীতেই আজ আমাদের আত্মত্যাগে প্রস্তুত হতে হবে।

প্রতিধ্বনি

প্রতিনিধির কর্তৃবাণী

[৯ম বর্ষ, ৩য় সপ্তাহ]

২৬০

“আজকের অনুষ্ঠানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও আর একই কথা আমাকে স্থানিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে বলতেই হচ্ছে। সেটি হ’ল এই যে, শ্রীশ্রীবাবামণি আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণে গুহ্যরহস্য বিতরণ ক’রে যে শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন, সেই শক্তি আধুনিক যুগে খুবই চর্জিত। এই মহাশক্তি নিজ মহিমায় নিজ কাজ করতে যাবেন, কেউ একে কুথে রাখতে পারবে না। আপনারা নিজে ব্যক্তিদের মুখে শাস্ত্রের নানা অপব্যাত্য্য শুনে বিভ্রান্ত হবেন না। আচার্য স্বরূপানন্দ শিষ্যসংখ্যাবর্দ্ধনে আগ্রহী নন, এ কথা আপনাদের কে না জানেন? তিনি দীক্ষার দিন আপনাদের বলেই দিয়েছেন—“গুরুভাতা ও গুরুভগ্নীর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্ত লালায়িত হয়ে না। পৃথিবীতে সকল গুরুরা নিজ নিজ শিষ্য-সংখ্যা ইচ্ছামত বৃদ্ধি করে যাবার পথে যে অল্প কয়েকটা লোক পৃথিবীতে থাকবে, তারাই আমার গুরু যথেষ্ট।” এমন হেজের কথা পৃথিবীতে আর কোন্ গুরুর মুখ থেকে নির্গত হয়েছে, বলুন ত! আচার্য স্বরূপানন্দ পৃথিবীর এই গুরু, শাস্ত কাল তাঁর এই শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হবে। এজন্তই তিনি শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধনে আগ্রহী নন। এজন্তই তিনি জীবনে কোনও মত, পথ বা প্রচারকে নিন্দা করেন নি। এমন অদোষী এবং শত্রুর প্রতিও সম্মান প্রদর্শনকারী মহান গুরুকে যদি কেউ কুবুদ্ধির প্ররোচনায় নিন্দা করেন, তিনি স্ত্রীশূদ্রকে ব্রাহ্মণের অধিকার স্বরূপ প্রণব-ব্রহ্মগায়ত্রী দিয়ে বৈদিক ঋষিদেরই অনুসরণ কচ্ছেন বলে যদি কেউ তাঁর বিরুদ্ধতা করে, তবে এমন ব্যক্তির বাক্যে আপনারা কোনও মূল্য আরোপ করবেন না। আপনারা আরও অধিক বিক্রম সহকারে নিজ নিজ গুরুদত্ত সাধন করে যান।

বলেছেন,—“গুরোৱাৎ সত্যম্, অন্ত্যমতং, গুরুবাক্যই সত্য।”

আষাঢ়, ১৩৬৭]

প্রতিনিধির কর্তৃবাণী

প্রতিধ্বনি

২৬১

লোকের কথা অসত্য, স্মৃতিরাং অগ্রাহ্য।” আপনারা অন্নপাণ কীর্ণদৃষ্টি অদূরদর্শী এই সকল প্রচারকদের অনুসার-বিসর্গ শুনে চুপ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। এসব বাধা জলবুধুদের দ্বারা আপনিই কাল-সাগরে মিশে যাবে। আচার্য্য স্বরূপানন্দের পবিত্র নাম অনন্ত কাল ভারত-সভাতার বুকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে, একথা আপনারা বিশ্বাস করুন।”

উল্লিখিত ভাষণ সমূহে অনেক দরকারী কথা আছে। তন্মধ্যে একটি কথাকে আমরা বিশেষ ভাবে সমর্থন করিতে চাই। তাহা এই যে, যাহাতে আমাদের দ্বারা আরও যে কোনও সাংঘিক আন্দোলন অতি শ্রম সময়ে দেশের প্রতি স্থানের অথগুদের মধ্যে বিপুল ভাবে, ব্যাপক ও গভীর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাইতে পারে, তাহার অনুশীলন প্রয়োজন। আমাদের হাজার হাজার ভ্রাতা-ভগ্নী দেশব্যবচ্ছেদের দরুণ এবং অত্যাচারে জনারণ্যে হারাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরও আজ এই ভাবেই খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। সকলের সর্বশক্তি একটার পর একটা কাজে লাগাইয়া আমরা আস্তে আস্তে অনেক অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন করিতে পারি। প্রতিনিধিদের কর্তৃ-বাণীর এই জন্তই সর্বত্র প্রতিধ্বনি হওয়া প্রয়োজন। এতদিন আমাদের ভ্রাতারা নিয়তই প্রত্যাশা করিয়াছেন যে, ক্রীশীশ্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবই একাকী খাটিয়া তাঁহাদের যাবতীয় কলনাকে বাস্তবে রূপায়ণ দিয়া যাইবেন। এই ভ্রান্ত প্রত্যাশার মধ্যে যে একদেশদশিতা রহিয়াছে, তাহা দূর হইবার পথ বাহির হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। অলমতিবিস্তারেণ। ইতি
২নং গণ্ডক রোড,
শাকচি,
জামশেদপুর।

শ্রীকেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সাময়িক প্রসঙ্গ

জল চোর :- বোলপুরের ১৫ই মে তারিখের সংবাদে প্রকাশিত চতুর্দিকে জলাভাব হওয়াতে কেহ কেহ লোকের দেওয়াল টপকাই বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া বাগতি দিয়া কুয়া হইতে জল চুরি করিয়াছে। যে দেশে জলদান মহাপুণ্য, সেই দেশে জলও চুরি করা সংগ্রহ করিতে হইতেছে। এই দুর্ব্যবহার প্রতীকারের চেষ্টা আর কোথায়?

পুরস্কার না তিরস্কার :- কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীসঞ্জীব বসু কলিকাতা আসিয়াছিলেন। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে ভোটদাতা কংগ্রেসকে ভোট না দিয়া একটা প্রতিক্রিয়াশীল ও বিদেশের অনুগত দলকে কি করিয়া সমর্থন করিলেন, এই কথা ভাবিয়া বিস্ময় ও বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হয়ত ভাবিয়া দেখেন না আয়তনে সঙ্কুচিত অথচ জনসংখ্যায় ক্ষীণ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিকে সাধারণের মনে ব্যাপক ব্যর্থতা-বোধ ও নৈরাশ্র সৃষ্ট হইয়াছে। নির্বাচন কমিউনিষ্ট দল জয়ী হইয়াছেন, ইহার অর্থ এই নহে যে, কমিউনিষ্ট দল পশ্চিমবঙ্গকে এমন কিছু সেবা দিয়াছেন, যাহার পুরস্কার তাঁহা পাইলেন। পরন্তু যে রাজনৈতিক দলটা পশ্চিমবঙ্গের শাসন পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের কর্মে ও কীৰ্ত্তিতে এই সকল ভোটদাতার ভাবী সুখের কোনও চিত্র পরিস্ফুট হইতেছে না। বিরুদ্ধে ভোটদাতার তাহারই তিরস্কার। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি মহাশয় ইহা বুঝিতে পারিলেন দেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলটাকে সুগঠিত ও সংশোধিত করিয়া হয়ত উদ্ধৃত্ত হইবেন।

আষাঢ়, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

২৬৩

শরীরের দৈর্ঘ্য :—লণ্ডন হইতে ২৬মে তারিখে রয়টার সংবাদ দিতেছেন যে, একটি চাকুরী লাভের জন্ত এক ব্যক্তি তাঁহার শারীরিক দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চি বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন। ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সাময়িক পত্রিকা “ফ্যামিলি ডক্টর” আজ তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি যেন এই চাকুরীর জন্ত সকাল বেলায় সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। সাধারণতঃ সকালবেলায় মানুষের যতখানি শারীরিক দৈর্ঘ্য থাকে, সন্ধ্যা নাগাদ তাহার পরিমাণ সর্বদাই প্রায় আধ ইঞ্চি হ্রাস পায়। একজন পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে ‘ফ্যামিলি ডক্টর’ এই সংবাদ জানাইয়াছেন।

‘ফ্যামিলি ডক্টর’ তাঁহাকে আরও জানাইয়াছেন যে, “তিনি যেন হুনিজা লাভের জন্ত আগের দিন রাত্রিতে শীঘ্র শয়ন করেন এবং প্রাতঃরাশের সময় প্রচুর পরিমাণে তরল পদার্থ পান করেন।”

মানুষের মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অস্থির মধ্যে যে টক্কাকার খাঁজ আছে, দিনের শেষে তাহা সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং মানুষের শরীরে জলাভাব ঘটিলে এই সঙ্কোচনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়।

ব্রহ্মে ভারতীয় :—জাপানে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীলালজী মেহেরোত্রা, যিনি পূর্বে ব্রহ্মে ভায়তের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, পাটনায় অতিষ্ঠিত এক সম্বন্ধনা-সভায় বলেন,—যে সমস্ত ভারতীয় ব্রহ্মদেশে বসবাস করে, তাহাদের কেবল মাত্র নিজেদের স্বার্থেই নহে, ভারতের স্বার্থেও সেই দেশের নাগরিক হওয়া উচিত। তিনি বলেন,—ব্রহ্মে এখন পাঁচ লক্ষ ভারতীয় আছে কিন্তু তাহার মধ্যে মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার জন ভারতীয় ব্রহ্মের নাগরিক অধিকার লাভের জন্ত আবেদন করিয়াছে।

ভূরস্বে বিপর্যয় :—ভূরস্বে বিপর্যয় হইয়াছে।

বলিবে। কিন্তু গণতন্ত্র সাময়িক ভাবে লুপ্ত হইল।—প্রধান মন্ত্রী আদানান মেগোরেস সৈনিকদের হাতে বন্দী হইয়াছেন, এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, জেনারেল গুরসেল একাধারে প্রেসিডেন্ট প্রধান মন্ত্রী এবং নিরাপত্তা-বাহিনীর অধিনায়কের ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীরাফিক কোরাতানের বাসভবনের বাহিরে মশস্ত্র প্রহারী মোতায়েন করা হইয়াছে। মিলিটারী আকাদেমীর গোপন কক্ষে আবদ্ধ ক্ষমতাচ্যুত শ্রীমান্দায়ে এক সাময়িক কর্মচারীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, যথাসাধ্য যে তিনি মাতৃভূমির সেবা করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় রহিয়াছে।

মিশর, পাকিস্তান, তুরস্ক—পর পর তিনটি দেশেই সাময়িক নেতৃত্ব ক্ষমতা হাতে নিয়া নূতন ইতিহাস লিখিয়াছেন। সকলেরই প্রকৃতি ও পরিণাম এক হইবে কিনা, অনুমান করা কঠিন। কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে মুস্তাফা কামাল পাশার গণতন্ত্রী তুরস্কে এরূপ হইবার কারণ কি?

কলিকাতায় একটা চিন্তাশীল পত্রিকা এই বিষয়ে চমৎকার সম্বন্ধ করিয়াছেন। যথা,—

“দীর্ঘকাল নিরঙ্কুশ আধিপত্য গণতান্ত্রিক দেশে কখনও কল্যাণের হয় না, ইহার ফলে ক্ষমতার শীর্ষে আসীন নেতৃবৃন্দের মনে একটা অহমিকা, একটা দান্তিকতা, একটা ক্ষমতামত্ততা জাগিয়া উঠে; জনগণের সহিত তাঁহাদের সকল সম্পর্ক লুপ্ত হয় এবং প্রতিকূল সমালোচনার প্রতি তাঁহাদের একটা অবজ্ঞার ভাব আসে। চোখের উপর তখন যে পর্দা নামিয়া আসে, তাহাতে হয় সত্য তাঁহারা দেখিতে পান না। নয় তাহার এক অপ্রকৃত বিকৃতরূপ তাঁহাদের নজরে পড়ে। আত্মবিশ্বাস-সিদ্ধি বা দলীয় সংহতিরক্ষাই তখন তাঁহাদের একমাত্র ধ্যানের বস্তু।

আষাঢ়, ১৩৬৭]

জরুরী নির্দেশ

প্রতিধ্বনি

২৬৫

কর্মের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। জনস্বার্থ তখন হয় উপেক্ষিত ও অবহেলিত। ইহাই হইয়াছিল ইরাকে, লেবাননে, ঘরের কাছে পাকিস্তানে, মেদিন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় এবং আজ সেই কলঙ্কিত নাটকেরই পুনরাবৃত্তি ঘটনাছে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন-সেতু তুরস্কে।”

কথাগুলি প্রাণিধান-যোগ্য।

সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে জরুরী নির্দেশ

ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ঐক্যবোধ ও প্রেমসংস্থাপন নব-স্বাধীনতাকে দীর্ঘকাল রক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। দূরদৃষ্টির অভাবে অকারণে ভাষা-সমগ্রা নিরা কলহ-সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে আমিই সর্বপ্রথম ধুবুলিয়ার পঁয়ত্রিশ হাজার জনতার সমক্ষে এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলাম যে, সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা রূপে স্বীকার করিতে হইবে। ভারতের প্রায় সর্বভাষা এই ভাষা হইতেই উৎপন্ন, এখনও ঋদ্ধি লাভের জন্য প্রত্যেক-ভাষাকে এই ভাষা হইতেই ঋণগ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাষার জন্তই ভারত বিদেশের নিকট পূজাস্থানীয় ও গৌরবাস্পদ। আমিই ধুবুলিয়াতে নবদ্বীপের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যাতীর্থ মহাশয়কে প্রেরণা দিয়াছিলাম, “অবিলম্বে পণ্ডিতগণের মধ্যে কাজ আরম্ভ করুন।” তৎপ্রেরণায় তিনি গুণ্যধাম নবদ্বীপে নিখিলবঙ্গের বিবৃদ্ধমণ্ডলীকে নিয়া সম্মেলন করেন। তাহার ফলে বর্তমানে নিখিল ভারতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সংস্থা গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। সম্প্রতি শ্রীচণলাকাণ্ড

প্রতিধ্বনি

জরুরী নির্দেশ

[৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

২৬৬

ভট্টাচার্য্য এম, পি, ভারতীয় লোকসভায় একটি বিল আনয়ন করিয়া হিন্দীর সঙ্গে সংস্কৃতকেও বিকল্প রাষ্ট্রভাষা করিয়া ভারতের ঐক্যবোধ রক্ষার স্থায়ী মীমাংসা করিতে অগ্রণী হইয়াছেন। এই সময়ে তোমাদের সকলের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন। নিউ দিল্লীতে কম পক্ষে ৮৭ লক্ষ পত্র স্বরাষ্ট্র-কন্সসচিবের নামে যাওয়া প্রয়োজন। তোমরা অবিলম্বে কাজে লাগ। নিয়রূপ পত্র অবিলম্বে হিন্দী, বাংলা, ইংরাজি, উড়িয়া অসমিয়া ও সংস্কৃত ভাষায় যাওয়া প্রয়োজন। বাহারা বাহারা এইরূপ পত্র দিলেন, তাঁহাদের নাম-ঠিকানাগুলি তোমরা মনে করিয়া ত্রীপ্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, ৩২, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা (৩) ঠিকানায় অবশ্য পাঠাইবে। ইহা দ্বারা কার্য্যের সুবিধা হইবে।

To

The Secretary,

Ministry of Home Affairs,

Government of India,

New Delhi.

Dear Sir,

The Bill introduced in the Lok-Sabha by Sri Chapala Kanta Bhattacharya, M. P., on 16-4-60 to amend Article 343 of the Constitution has our fullest support for two potent reasons. Firstly it will splendidly serve the purpose of removing bitterness engendered by the official-language

आवाह, १७७१]

जक्रूनी निर्देश

प्रतिक्षनि

२७१

controversy. Secondly, it will ensure the enrichment of all the regional languages equally and thus will create the safest and a permanent common platform for all the citizens of the new Union of India.

Thanking you,

Yours truly,

Signature

Address

सेवा में

सचिव महोदय,

गृहमंत्रणालय (स्वराष्ट्र-कर्मसचिव)

भारत सरकार,

नया देहली ।

महाराय,

लोकसभा में संसद-सदस्य श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य द्वारा उत्थापित भारतीय संविधान के ३४३ अनुच्छेद के संशोधन-प्रस्ताव में निम्नलिखित दो कारणों से मेरा पूर्ण समर्थन है । एक, इसके द्वारा राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर जो कटुता की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका बहुत कुछ निराकरण हो जायगा । दूसरा,

प्रतिक्षनि

जक्रौ निर्देश

[२४ वर्ष, ७४ गृहशा]

२७८

यह प्रस्ताव गृहीत होने से प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की सम्यक् अभ्युन्नति होगी तथा भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता बनी रहेगी।

हस्ताक्षर—

पता—

भारतवर्ष-शासनाधिकृतस्य

गृहमंत्रणालय-सचिव-(स्वराष्ट्र-कर्मसचिव-)

महाभागानां समीपे—

निउ देहली ।

महोदयाः,

लोकसभायां १६-४-६० दिवसे श्रीमता चपलाकान्त-भट्टाचार्य एम, पी, महाशयेनानीतः भारतीयसंविधानस्य ३४३ संख्यकानुच्छेदसम्बन्धी संशोधनप्रस्तावः बलवता कारणद्वयेन अस्माभिः वाढं समर्थितोऽस्ति । प्रथमं, अस्य राष्ट्रभाषामधिकृत्य साम्प्रतं उत्पन्नानां आन्तःप्रान्तीय-कटुविवादानां दूरीकरणे निर्भरसाधकत्वं, द्वितीयं च अस्य सर्वासामेव प्रान्तीयभाषाणां सर्वांगीण-भृशमभ्युन्नतिसम्पादकत्वं तत्फलतया समग्र-भारतभूमेः जनस्य ऐक्यग्रथने सहायकत्वं च, इति अस्माकं द्रढीयान् विश्वासः ।

हस्ताक्षरम् श्री—

स्थानम्—

আষাঢ়, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

২৬২

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্বরাষ্ট্র-কর্মসচিব সমীপেষু :— ভারত সরকার, নিউ দিল্লী

তারিখ.....

মাত্তবরেণু :—

সবিনয় নিবেদন এই যে, শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, এম, পি. লোকসভাতে বিগত ১৬।৪।৬০ তারিখে ভারত-সংবিধানের ৩৪৩ অনুচ্ছেদ সংশোধন করিবার জন্ত যে বিল উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত দুইটি অতি প্রবল যুক্তিতে আমি/আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। প্রথমতঃ, সরকারী ভাষার ব্যাপার লইয়া যে প্রান্তীয় তীব্র তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে, এই বিল গৃহীত হইলে তাহার সুনিশ্চিত, অবমান হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই বিল গৃহীত হইলে সকল প্রান্তীয় সাহিত্যই সমভাবে সমৃদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবে এবং নবীন ভারতকে একতাবন্ধনে বদ্ধ করিবার উপায় স্থায়ী এবং নিশ্চিত করা হইবে। ইতি নিবেদক—

(স্বাক্ষর)

(ঠিকানা)

উড়িষ্যা বা অসমিয়া অনুবাদ তাড়াতাড়িতে দিতে সমর্থ হইলাম না। সরকার মত অনুবাদ করা হইয়া লইও।

এই কার্যটি তোমরা দ্রুত করিবে। আমি মন্থরীতে পীড়িত না থাকিলে এবং তোমরা মঙ্গল-বাধের বিপর্য্যয়ে উদ্বিগ্ন না থাকিলে অশেষ কাজই হইত, জানি। আমি ১লা জুলাই ডাক্তার দেখাইতে কলিকাতা যাইব। তখন গিয়া জানিতে চাহি, প্রিয়কান্তের নিকটে কোথা হইতে কি সংবাদ গেল। আমি ৪ঠা জুলাই কলিকাতা হইতে পুণনকী যাইব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পুপুনকীর একখানা পত্রের অংশ-বিশেষ

পুপুনকীর সংবাদ জানিবার জন্ত অনেকে উদ্গ্রীব। জনে জনে পত্রের জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না। এই জন্ত প্রকৃত অবস্থা আমি বর্ণন করিয়া নিম্নে লিখিতেছি।

বাহা টাকা পাইতেছি, তাহাতে কুলী-মজুরদের দৈনন্দিন প্রাণ্য শোধ করিতে পারিতেছি না। এ দেশে এখন দারুণ অভাব পড়িয়াছে। আগের মত কেহ এখন আর সপ্তাহে একবার পেমেণ্ট নিতে রাজি নহে। দৈনিকই সন্ধ্যায় টাকা দিতে হয়। বাবামণিকে মুন্সুরীতে রেজিষ্টার্ড পত্র দিয়াছি যেন, ইতিমধ্যে যদি টাকার আমদানী না হয়, তাহা হইলে তিনি যেন টেলিগ্রাম করিয়া কাজ বন্ধ করিবার আদেশ জানান। ঠিক এই সময়ে মঙ্গল-বাঁধের কাজ হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া সর্বনাশকর হইবে। এই ধানবাদ-মানভ্রম অঞ্চলে এমন লোক ত' দেখি না যে, ধার চাহিলে টাকা পাইব। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণিকে “তার” করিয়া কাজ বন্ধ করিব কিনা, জানাইতে আবেদন করিয়াছি। বাবামণির বিনা অনুমতিতে কাজ বন্ধ করিবার আমার সাহস নাই, অধিকারও নাই। আবার, কাজ চালু রাখিতে হইলে যে টাকার দরকার, তাহারও আপাততঃ কোনও ব্যবস্থা নাই। সঙ্কীর্ণ অর্থ সব আগেই শেষ হইয়াছে। মজুরেরা পেমেণ্টের জন্ত দুই এক দিন সবুজ করিতে বলিলে ভুখের দায়ে তাহা মানে না। ইতি

নিবেদক—শ্রীনিত্যসুন্দর ব্রহ্মচারী
পুপুনকী আশ্রম, পোঃ চাশ, ভায়া পুরুলিয়া, এস-ই-রেলওয়ে।

LIBRARY

No.....

Sri Sri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

প্রতিধ্বনি

(বার্ষিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ { শ্রাবণ, ১৩৬৭ { ৪র্থ সংখ্যা

গান

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব]

(১)

সেই হৃৎকের দিনে

তুমি ছিলে মোর সাথী,

আমিও তোমাতে হৃদয়ে আবরি'

জাগিতাম সারা রাত্টি ॥

হৃৎখ শুধুই হৃৎমহ নয়,

হৃৎখই ছিল ভালো,

আমার আমার তিমিরের মাঝে

ফুটাইত প্রেম-আলো ;

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

২৭২

আজিকে হুংথ নাই,—
 ভুবন খুঁজিয়া তাই কি তোমারে
 কোনোখানে নাহি পাই?
 কোথায় লুকালে মোহন মুরলি,
 আঁখির বিজলী-ভাতি'?

সুখ-শয্যায় কণ্টক-রাশি
 একি বিপত্তি হায়!
 অবাধ স্বাধীন জীবনের মাঝে
 পদে পদে শুধু দায়।
 হুংথ এড়ায়ে তোমারে হারানু,
 সম্পদে শুধু অভাবই বাড়ানু,
 পলে অনুপলে নিশ্চিন্ত হ'ল
 আমার জীবন-বাতি;—
 হুংথ দাও, হুংথ দাও,
 নিব সব মাথা পাতি' ॥

অখণ্ড-বাণী

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(৮০)

শত শত বার ভগবান অনাথশরণ, পতিতপাবন, দীনবন্ধুরূপে আত্ম-
 প্রকাশ করেছেন। হুংখীর হুংথ দূর করবার জন্ত, ব্যথিতের ব্যথা

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

২৭৩

অপসারণের জন্ত, আর্ন্তের শোকাশ্রুত অপনোদনের জন্ত আরো শত কোটি বার তিনি দীনবন্ধু মূর্তিতে আবির্ভূত হবেন। সবাইকে দল “মাঠেঃ”, সবাইকে বিলাও অভয়বাণী, সবাইকে দাও আশার আলো, ভরসার বল।

(৮১)

বিশ্বাসের মৃতসঞ্জীবনী প্রভাবে তাদের শুষ্ক, শীর্ণ, জীর্ণ হৃদয় নবযৌবনের শুভাগমন অনুভব করুক। বিশ্বাস তাদের প্রাণের পরতে পরতে হৃৎক সইবার, বোঝা বইবার শক্তিকে সঞ্চারিত করুক। হৃৎক পেয়ে যে নিস্তেজতা এসেছিল, বিশ্বাস তাকে দূরীভূত করুক। হৃৎকের ভিতর দিয়েই যে সুখ-স্বরূপের কাছে পৌঁছতে হয়, এই প্রত্যয় তাদের দৃঢ় হোক এবং হৃৎককে শত্রু ব'লে দূরে সরিয়ে নয়, বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন ক'রে তারই সহায়তায় পরম সুখকে তারা লাভ করুক।

(৮২)

অতীতকে অতীতের গর্ভেই থাকতে দাও। নিজের চরিত্র সংশোধনের জন্ত যখন অতীতের আলোচনা প্রয়োজন, তখন ছাড়া অত্র সময়ে অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি না করাই ভাল। রামই বল আর রাবণই বল, বাল্যকালে মলমূত্র দিয়ে শয্যা অপবিত্র করেছিলেন প্রত্যেকেই, কিন্তু এদের জীবনী-গ্রন্থে সে কথার ত' উল্লেখ নেই! অতীতের নিন্দনীয় ব্যাপার অতীতের গহ্বরেই ডুবে যাক।

(৮৩)

তাকাবে ত' ভবিষ্যতের দিকে ভাকাও বলবে ত' ভবিষ্যতের কথা বল, ভাববে ত' ভবিষ্যতের কথা ভাব। উজ্জল ভবিষ্যৎ, নির্মল ভবিষ্যৎ, মঙ্গলময় গৌরবময় সৌন্দর্য্যময় ভবিষ্যৎ শোভনীয় শোভনীয় রমণীয় ভবিষ্যৎ, পাশহীন তাপহীন স্বপ্নহীন

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

২৭৪

ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নকে কর তোমাদের দৈনন্দিন ঘরকন্নার উপজীব্য।

(৮৪)

এগিয়ে চল সামনের দিকে। অতীতের পাপ হারানি—তার দিকে তাকিও না। চ'খ ছুটো ভগবান্ তোমাকে সামনের দিকেই দিয়েছেন। সম্মুখের অগ্রগতি বাড়াবার জন্ত বধন প্রয়োজন, মাত্র তখনই হু'একবার ঘাড় ফিরিয়ে অতীতের শিক্ষাকে স্বীকার করবে। নতুবা নয়।

(৮৫)

আশ্রয় চাস্ আমার? আমি কে? আশ্রয় নির্দি তোর নিজের। তুই না সেই সর্বদেবদেব পরমাত্মা, যাকে পূজা ক'রে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কৃতার্থ! তুই-ই না কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ পেয়েছিস্! তুই-ই না অপরূপ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নিজের স্বরূপকে, নিজের চৈতন্যকে, নিজের আনন্দকে, নিজের প্রেমকে, নিজের লীলাকে বিকশিত কচ্ছিস্? আশ্রয় নে তোর নিজের। নিজ মানে আত্মা, আশ্রয় নে তাঁর। আত্মা মানে আপন, আশ্রয় নে তাঁর।

(৮৬)

অনুতাপ কচ্ছ? কর, যদি তাতে তুমি ভগবানের সন্নিহিত হও। যে অনুতাপে মানুষ ভগবানের দিকে এগোয় না কিন্তু নিজেকে হীন আর জঘন্য ব'লে মনে করে, সে অনুতাপ পাপ। আর যে অনুতাপ হৃৎখ-বেদনার ভিতর দিয়েও সত্য-স্বরূপ পবিত্রতা-স্বরূপ কণামাত্র নিত্যানন্দ-স্বরূপ পরমসুখ-স্বরূপ ভগবানের দিকে তোমার হ'লেও অগ্রগতি বুদ্ধি করে, সে অনুতাপই যথার্থ ধর্ম্য। চ'খের জল বি

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

২৭৫

ভগবানের দিকে যাবার পথ তোমার সুগম ক'রে দিচ্ছে? তবে এ চোখের জল শুধু জল নয়, এ হচ্ছে সর্বপাপ-তাপহারিণী মন্দাকিনীর পতিতপাবনী ধারা। এ জলে তুমি গুদ্র হবে, পুণ্য হবে।

(৮৭)

গড়া আর ভান্ডা, এর উপরে কারো কর্মের সাফল্য নির্ভর করে না। রাণা প্রতাপ বনে পাহাড়ে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হ'য়েও জীবনে যতখানি সফল, সম্রাট ঔরংজেব দিগ্বিজয়ী বীররূপে সমগ্র ভারত জয় ক'রেও তার অর্দ্ধেক সফল নন। ভান্ডা আর গড়ার উপরে তোমার কৃতার্থতা নয়, তোমার কৃতার্থতা তোমার আত্মদানের দৃঢ়তার উপরে।

(৮৮)

সকামতা থেকেই দুঃখ আসে। কাজ কর, কিন্তু নিষ্কাম হ'য়ে। অবশ্য, নিষ্কাম হওয়া খুব শক্ত। কিন্তু শক্ত ব'লেই ত আর হাল ছেড়ে দেওয়া চলবে না। সর্বজীবের হিতবুদ্ধিতে কাজ ক'রে যাও, কিন্তু নিজের গড়া জিনিষের ধ্বংস যদি নিজের চ'খেও দেখতে হয়, তবে ব্যথিত হ'য়ো না। কারণ, যার জন্ম আছে, তার মরণ থাকবেই। মরণ যার আছে, তার অকালমৃত্যু নিবারণ করার জন্য চেষ্টা তুমি করবেই, কিন্তু মৃত্যু যদি ঘটেই যায়, শোক ক'তে পার না।

(৮৯)

অবিরাম ধ্যান কর, তোমরা জরা-মরণাতীত। অবিরাম ধ্যান কর, তোমরা গুদ্র, অপাপবিদ্র, নিত্যপবিত্র। এই ধ্যানের জোরেই জীবন সকল পাপের অতীত হবে। “আমি পাপী”,

প্রতিধ্বনি

অথও-বাশী

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

২৭৬

“আমি পাপী”, বলে অনুক্ষণ মনকে দুর্বল ক’রো না। “আমি সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ, মুক্তিস্বরূপ, আমি নিত্যস্বরূপ, স্ন্যস্বরূপ, পূর্ণতাস্বরূপ”—এইরূপ ধ্যান ক’রে ক’রে প্রাণের বল বাড়াও।

(৯০)

আত্মাকে পরমাত্মা বলে, নিজেকে পরব্রহ্ম বলে ভাবতে যে পারো না, তার পথ আত্ম-সমর্পণের। আমি তাঁর, যিনি পবিত্রতাস্বরূপ। আমি তাঁর, যিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। আমি তাঁর, যিনি অমৃতস্বরূপ। আমি তাঁর, যিনি প্রতিক্রিয়ারহিত। আমি তাঁর, যিনি শান্তিস্বরূপ। আমি তাঁর, যিনি ভ্রান্তির অতীত। আমি তাঁর, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমি তাঁর, যার বিকার নেই। এই ধ্যান কর। এই ধ্যানে আপনি সকল দুর্বলতা সকল পাপ পলায়ন করে।

(৯১)

যার যেমন মনের গঠন, সে তেমন ক’রে সফল হও, কৃতকৃতার্থ হও। হয় ভগবান্ হও, নয় ভগবানের হও। পাপও হও না পাপেরও হয়ো না। যে ভগবান, পাপ-তাপ তার পদানত। যে ভগবানের, পাপের প্রভু তার উপরে খাটে না। তোমরা পাপের অতীত হও।

(৯২)

কি পুরুষ কি জীলোক, চিরকৌমার্যটো কারো পক্ষেই
সোঁজা নয়। বিশেষতঃ জীলোকের পক্ষে। আবাল্য

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

অথগু-বাণী

প্রতিধ্বনি

২৭৭

স্বপ্ন দেখছে স্তমহং কর্তব্যরাশির, আজন্ম যে ধ্যান কচ্ছে জগন্মঙ্গল
কর্মে নিঃশেষে আত্মদানের অথবা নিতান্তই ভগবৎরূপা যার পক্ষে
সুপ্রতুল, একমাত্র তার পক্ষেই চিরকৌমাৰ্য্য রক্ষা সহজ। স্মৃতরাং
ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, চিরকৌমার-ব্রত কারো ঘাড়েই
জোর ক'রে চাপান ঠিক নয়। মহৎ জীবনের প্রতি সকলের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট
কর, বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, গার্গী, আত্রেয়ী, সম্ভবমিত্রা, এঁদের দিকে সবাইকে
চ'খ তাকাতে শিখাও, কিন্তু এঁদের জীবনকে নিজেদের জীবনরূপে কে
গ্রহণ করবে আর না করবে, তার নিয়ামক যেন তাদের নিজেদেরই অন্তর
হয়। ক্ষণিক আগ্রহ নয়, অনির্বাক্য দীপশিখার মত জ্বলবে যার অন্তরের
উজ্জ্বল আলো, চিরকৌমাৰ্য্যে তারই অধিকার।

(২৩)

জোর ক'রে চাপান চিরকৌমাৰ্য্য কারোই কল্যাণ
করে না, না করে নিজের, না করে জগতের। হৃদয়ের সহস্র
কামনা তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি ক'রে জ্বলতে থাকে, আর
বাইরে শুধু ত্যাগের অভিনয় চলতে থাকে। কৌমাৰ্য্যের রুচিবুদ্ধির
সাহায্য সবাইকে দিতে পার। কারণ, সংসারীর আবিলতা-প্রমুক্ত
বুদ্ধদেতা কতকগুলি নরনারীর সেবায় জগতের প্রয়োজন বাস্তবিকই
আছে। কিন্তু কৌমাৰ্য্যের ব্রত তুমি হঠাৎ কাউকে দিয়ে দিতে পার না,
যদি তার কৌমাৰ্য্যের সঙ্কল্পটী কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বারংবার সত্য
বলে প্রমাণিত না হ'য়ে থাকে।

(২৪)

চিরকৌমাৰ্য্যের ব্রতকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলা হয়
নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্য্য। নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্য্যে আর সন্ন্যাসে পার্থক্য অতি

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

২৭৮

সামান্য। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে আর সন্ন্যাসীকে অভেদ ব'লে জ্ঞান ক'রে থাকি। ফলে, চিরকৌমাৰ্য-ব্রহ্মচারী মাত্রকেই সন্ন্যাসী ব'লে মনে করা যেতে পারে। এই সন্ন্যাসীর পূজা ভারতবর্ষে বহুকাল ধ'রে হচ্ছে এবং অনন্তকাল হবে। লোকে বার পূজা দেখে, তাঁরই মত হ'তে চায়। একজন রায়বাহাদুরকে পাড়ার লোকে খুব মানে দে'খে, সবাই ইচ্ছা করে যেন নিজেরা এক একজন রায়বাহাদুর হ'তে পারে। ঠিক তেমনি একজন শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব বা রামানুজ লোকের পূজা পান দেখে, অনেকেই তাঁদের দেবদূত চরিত্রের অনুসরণ কত্তে ইচ্ছুক হন। তাই থেকে সন্ন্যাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। আবার ত্যাগীরা কিরূপ নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটান, তা' দেখেও অনেক শান্তিকামী ব্যক্তি সন্ন্যাসী হন। এটা সন্ন্যাসীর সংখ্যাবৃদ্ধির অগ্রতম কারণ। কিন্তু সন্ন্যাসীদের দাক্ষণ সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হ'ল গৃহ-জীবনের পক্ষিলতা, দুর্নীতি ও একবিবোধিতা। যখনই কোনও সমাজের গৃহীদের জীবন খুব বেশী পক্ষিল হয়েছে, তখনই দলে দলে লোক গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেছেন। কারণ, তখন সন্ন্যাসের আদর্শ ও ভাবের প্রাধান্য না ঘটলে গৃহীর জীবন আত্মস্থতার দিকে আর অগ্রসর হ'তে পারবে না।

(৯৫)

যখন তালে-বেতালে লোকে সন্ন্যাসী হ'তে থাকে, তখন আবার তাতেও পক্ষিলতা চোকে। যেমন ঊনসৎ বাড়ীর পাচক ব্রাহ্মণ শত সতর্ক থেকেও নাকের মুখের ঘাম ছুঁচার কিছু হ'লেও অন্ন-ব্যঞ্জনের হাঁড়িতে না ঝেড়ে পারেন না। তখন আবার সন্ন্যাসের নিন্দা চলতে থাকে এবং গার্হস্থ্যাশ্রম সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

২৭৯

বর্ণিত হয়। তখন শাস্ত্রকর্তারা উপদেশ করেন,—“কলিতে সন্ন্যাস নেই”। কিন্তু “কলিতে সন্ন্যাস নেই,” কথাটা বুদ্ধ মানেন নি, শঙ্কর মানেন নি, চৈতন্য মানেন নি, মীননাথ মানেন নি, গোরক্ষনাথ মানেন নি, শ্রীচন্দ্র মানেন নি। এঁরা প্রত্যেকেই সন্ন্যাসীর রাজা এবং এঁদের প্রত্যেকের জীবনাদর্শের অনুসরণ করেছেন লক্ষ লক্ষ বীরচেতা ধীরবুদ্ধি দৃঢ়সহস্র লোকেরা। এঁরা সবাই কলিযুগেই জন্মেছেন। সুতরাং এই দৃষ্টিতে কলিতে সন্ন্যাস নেই, কথাটার কোনো মানেই হয় না। কথাটার প্রকৃত মানে এই যে, কলির প্রাধাত্যকালে অর্থাৎ কারো চিত্তবৃত্তির উপরে নীচতার প্রাধাত্য থাকলে তারপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ বিপজ্জনক, তাই নিষিদ্ধ। চিত্তবৃত্তি যার উর্দ্ধমুখ ও সাংঘিকতাপূর্ণ, সন্ন্যাস তারপক্ষেই গ্রহণীয় ও শোভনীয়।

(৯৬)

মোহ এক অদ্ভুত বস্তু। কেমন ক’রে যে বলবান ব্যক্তিরও চিত্তকে সে অভিভূত ক’রে দেয়, তার নির্ণয় নেই। এই মোহাক্ষণের উর্দ্ধজগতে যাওয়ার নামই সন্ন্যাস। সন্ন্যাস সর্বসংস্কারের অতীত এক নিত্যানন্দময় অবস্থা। এই অবস্থায় পৌছুবার জ্ঞান আবার সংস্কার গ্রহণের প্রয়োজনও আছে। সেই সংস্কার গ্রহণকেই প্রচলিত কথায় বলা হয় সন্ন্যাস গ্রহণ। যেমন ব্রহ্মকে জানাই হচ্ছে ব্রাহ্মণ হওয়া। ব্রাহ্মণত্ব এক ব্রহ্মনিষ্ঠ পরমমঙ্গলময় অনির্বচনীয় উচ্চাবস্থা। কিন্তু এই অবস্থায় পৌছুবার জ্ঞানই যজ্ঞোপনয়নের সংস্কার গ্রহণ আবশ্যক হয়। তারই জ্ঞান প্রাচীনকালে জীলোকদেরও পর্যাপ্ত যজ্ঞোপনয়নের সংস্কার হ’ত। আজ আমাদের নারীরা সেই সংস্কার হারিয়েছেন, আর আমরা জীলোকদিগকে বেদে ও ব্রহ্মমন্ত্রে অনধিকারিণী বলে

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

২৮০

ঘোষণা করেছি। কলিযুগে নিষিদ্ধ হ'লেও সন্ন্যাসের সংস্কার অনেক ব্রহ্মকল্মষ পুরুষেরা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং 'কলিতে সন্ন্যাস নেই' একথাটা বললেই তা মেনে নেওয়া চলে না।

(৯৭)

শুধু সন্ন্যাসের সংস্কারটা গ্রহণ কল্লেই ত' হ'ল না, সন্ন্যাসের অবস্থাটা আসা চাই। বহুজনে সন্ন্যাসের সংস্কার গ্রহণ কচ্ছেন কিন্তু সন্ন্যাসের অবস্থাটা লাভের জন্ত চেষ্টা কচ্ছেন না। এই দেখে একদল গৃহস্থ সাধক সন্ন্যাসকে অনাবশ্যক, অশাস্ত্রীয় বা নিষিদ্ধ ব'লে প্রমাণ কত্তে চেষ্টা করেন। কিন্তু সন্ন্যাস সংস্কারটা গ্রহণ কর্ক, অথচ সন্ন্যাসের অপূর্ব অবস্থাটা আমি লাভ কত্তে পার্ক না, এক্রূপ কেন হয়? কখন এক্রূপ হয়? যখন আমি গৈরিক পরিধানের অধিকারটা পেয়েই মনে করি যে আর কিছু কর্ক আর নেই, তখনই এক্রূপ হয়। সন্ন্যাস-সংস্কার গ্রহণ করার পর থেকে যদি তোমার অন্তরে এই প্রত্যয় দৃঢ়রূপে থাকে যে সন্ন্যাসের পরমশ্লাঘ্য অবস্থাটা না লাভ করা পর্যন্ত তোমার আর বিশ্রাম করার অধিকার নেই, তবেই তোমার সন্ন্যাস গ্রহণ সার্থক হবে। অনেকে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেও সন্ন্যাসী হন না, তাই চতুর্দিকে এত সন্ন্যাস-গর্হণ, এত সন্ন্যাস-জুগুপ্সা, এত সন্ন্যাস-বিদ্বেষ।

(৯৮)

জগতের প্রত্যেকটা পরমাণুর প্রতি প্রত্যেকটা পরমাণুর আকর্ষণ আছে। এ'কে বলা চলে প্রেম। বিশ্ব-ভুবন প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ পরস্পরের সাথে

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

২৮১

প্রেমের খেলা খেলছে। চারদিক দিয়ে প্রত্যেকের জন্ত প্রত্যেকের প্রেমের আকর্ষণ। এ প্রেম বিশ্ববাপী, কাউকে বাদ দিয়ে নয়, কারো সংস্পর্শ ছেড়ে নয়, কারো প্রভাব অতিক্রম ক'রে নয়, সকলকে নিয়ে, সকলকে দিয়ে, সকলকে সাথে ক'রে। চলতি ভাষায় আমরা হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের আকর্ষণকে প্রেম বলি, বহিজ'গৎ আর অন্তর্জ'গৎ সকল জগতের সব-কিছুর সাথে পরস্পরের এই ব্যাপক সম্বন্ধের কথা চিন্তাই ত' করি না। কিন্তু হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের আকর্ষণ, তাও যে জগতের কোটি কোটি হৃদয়ের স্পর্শ, প্রভাব ও ঘনিষ্ঠতাকে বর্জন ক'রে নয়, তা ত' বুঝে দেখি না। তাই অনেক সময়ে একটা দিকের আকর্ষণেই বুঁকে পড়ি, সকলের সাথে যে আমাদের সমান যোগ, তা ভুলে যাই। এ'কেই বলে মোহ। সব আকর্ষণ যে দেখে, তার আর মোহ থাকে না। এ'কেই বলে প্রেমিক। আর কোনো দিকের কোনো আকর্ষণই যে দেখে না, সেই হ'ল সন্ন্যাসী। প্রেমিকেরও পতন নেই, সন্ন্যাসীরও পতন নেই।

(৯১)

ভাবতে গেলে প্রেমিকের অবস্থা আর সন্ন্যাসীর অবস্থা যেন পরস্পর বিপরীত। রামকেও ভালবাসি, শ্রামকেও ভালবাসি, ষড়্কেও ভালবাসি, মধুকেও ভালবাসি, লতাকেও ভালবাসি, শাখাকেও ভালবাসি, সরোজিনীকেও ভালবাসি, মনোরমাকেও ভালবাসি, তোমাকেও ভালবাসি, আমাকেও ভালবাসি, কাউকে একটু কম বাসি না, কাউকে একটু বেশী বাসি না, ভালবাসা আমার সকলের প্রতি এক, সকলের প্রতি সমান,—এই হ'ল প্রেমিকের অবস্থা। ননীকেও

প্রতিধ্বনি

অথও-বাদী

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

২৮২

ভালবাসি না, ফণীকেও ভালবাসি না, সুষাংগুকেও ভালবাসি না, হিমাংগুকেও ভালবাসি না, সীতাকেও ভালবাসি না, শান্তাকেও ভালবাসি না, তোমাকেও ভালবাসি না, আমাকেও ভালবাসি না, ভালবাসা নেই কারো উপরে, কারো প্রতি অপেক্ষা নেই, কারো উপরে নির্ভর নেই, সকলের সাথে সর্বসম্পর্কবিরহিত এই যে অদ্বিতীয় অবস্থা—এই হ'ল সন্ন্যাসীর অবস্থা। স্ততরাং এ দুটো অবস্থা পরস্পর বিপরীত ব'লেই মনে হবে। কিন্তু সন্ন্যাসীও প্রেমিক হন, প্রেমিকও সন্ন্যাসী হন। ভালবাসি, অথচ বাসি না, ভালবাসি না, অথচ বাসি, প্রেম আছে অথচ নাই, প্রেম নাই অথচ আছে, এই যে অনির্বচনীয় অবস্থা, এইটাই হ'ল প্রেমিক সন্ন্যাসীর।

(১০০)

আনন্দ-স্বরূপ নামের অবিরাম ধ্যান কর। এমন ধ্যান জমাও, যেন যেকোনো তাকাত, শুধু নামই দেখতে পাও। বৃক্ষে, লতার, মাঠে, ঘাটে, জলে, পর্বতে, গৃহে, অরণ্যে, সবস্থানে যেন নামই তার দিব্যজ্যোতিতে ফুটে ওঠে। নামকেই অবিরাম ধ্যান কর। এমন ধ্যান কর, যেন চ'খ বুজলে তোমার হৃদয়ে নাম দেদীপ্যমান হ'য়ে জলে ওঠে। এমন ধ্যান জমাও যেন, তোমার পৃথক্ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আর না থাকতে পারে। তুমি নামময় হ'য়ে যাও, নাম তোমাময় হ'য়ে যাক্, তোমাতে আর নামে মিলে অথও এক পরমসত্তা হোক্।

(১০১)

বিশ্বাস কর, ভগবানকে ডাকাই তোমাদের জীবনের প্রধান কাজ। অথ সব কাজকে এ কাজটির অধীন ক'রে নেবে। আপন

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

শ্রীমদভ্যাসকর পরিকার

প্রতিধ্বনি

২৮৩

থেকে সকল কাজ তোমাকে না ছেড়ে দিলে জোর ক'রে কাজ ছেড়ো না। কিন্তু কুলির কাজই কর আর ছুতোরের কাজই কর, কামারের কাজই কর আর কুমারের কাজই কর, ভগবানকে ডাকার কাজটা রাখ প্রধান। যেমন, খাত্তের মধ্যে অন্তই প্রধান, ব্যঙ্গনাতি অপ্রধান, তেমন কাজের মধ্যে ভগবৎ-স্মরণই প্রধান, অর্থার্জন বা জীবসেবাদি অপ্রধান। যেখানে ব্যঙ্গন নইলে অন্ত চলে না, সেখানে জোর ক'রে ব্যঙ্গন ত্যাগ ক'রো না। যেখানে অত্র কাজ না কল্লো ভগবানকে ডাক্তে বিয় হয়, সেখানে অত্র কাজ জোর ক'রে পরিত্যাগ ক'রো না। শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্ত শ্রম না কল্লো ভগবানকে ডাক্তার সামর্থ্য থাকে না। তাই শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্তও শ্রম অবশ্যই কর্কে! কিন্তু সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, তোমার প্রধান কাজটি কি

(১০২)

জড়কে সত্য ব'লে জ্ঞান করাই কামের হেতু। চৈতন্যকে সত্য ব'লে জ্ঞান করাই প্রেমের সেতু। চৈতন্যস্বরূপকে আরও অন্তরের জিনিষ কর, প্রাণ দিয়ে তাঁর সাথে প্রাণবিনিময় কর, কামলেশবর্জিত নিষ্কলুষ জীবনের তোমরা অধিকারী হবে।

(১০৩)

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যে ভগবানের নাম, সেই নামকেই জান্বে তোমার সকল সম্পদ, সকল অবলম্বন। নামকেই জান্বে তোমার স্বামী, নামকেই জান্বে তোমার পিতা, নামকেই জান্বে তোমার গুরু।

(১০৪)

যেখানে যুবক-স্বামী যুবতী-পত্নীকে ঈশ্বরের অংশ জ্ঞান করে, যেখানে যুবতী-পত্নী যুবক স্বামীকে ঈশ্বরের প্রকাশ ব'লে বিশ্বাস করে, যেখানে

প্রতিধ্বনি

অথও বাণী

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

২৮৪

প্রলোভনের কারণ থাকা সত্ত্বেও একজনের প্রতি আর একজন নির্লিপ্ত, যেখানে প্রেম থাকা সত্ত্বেও কাম নেই, তেমন গৃহস্থের গৃহই দেবশালা।

(১০৫)

আমার নয়ন দ্বিবিধ দেবী-প্রতিমা দেখবার জন্ত সর্বদা লালায়িত। এক দেবী-প্রতিমা হচ্ছেন তিনি, যিনি আবাল্য কোমার্যের ধ্যান ক'রে এসেছেন এবং সর্বস্ব দিয়ে পবিত্রতারই অর্চনা কচ্ছেন। আর এক দেবী-প্রতিমা হচ্ছেন তিনি, যিনি বিবাহের পূর্বে পর্য্যন্ত সাধারণ গৃহস্থ কন্যাদেরই মত শিক্ষা ও উপদেশ পেয়েছেন কিন্তু বিবাহের পরেই সংযমী স্বামীর সঙ্গ এবং ত্যাগী গুরু উপদেশ পেয়ে অপ্রত্যাশিত সংযম-ব্রতে সিদ্ধি অর্জন করেছেন। এই দুই দেবী-প্রতিমার ভিতর কে বড়, কে ছোট, বিচার করার প্রয়োজন নেই। বিচার করা সম্ভবও নয়। কিন্তু যে আত্মসংযমের পূজা ক'রে এঁরা এত সুন্দর, এই সংযমের জ্যোতি এঁদের মুখে দেখ, এঁদের চোখে দেখ, আর ভক্তি-বিনীত নম্রতায় এঁদের চরণে প্রণত হও।

(১০৬)

ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ উৎকর্ষ সাধনের দিকে যদি প্রত্যেকটি নরনারী দৃষ্টি রাখে, তাহা হইলে দেশের সর্বোচ্চ উন্নতি সাধিত হইত কতদিন লাগিবে? ব্যক্তিকে লইয়াই জাতি হয়, ব্যষ্টিকে লইয়াই সমষ্টি হয়। এই একটা ছোট কথা কেই আজ অতি বড় কথা বলিয়া মনে করা সম্ভব। একটা ব্যক্তি যখন সুন্দর হইবে, সবল হইবে, তখন অপর দশটা ব্যক্তি ত' তাহাকে দেখিয়াই সুন্দর ও সবল হইতে চেষ্টা করিবে! নিজে আগে সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

অথ ও-বাণী

প্রতিধ্বনি

২৮৫

হও, তখন অনেককেই অতি সহজে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে পারিবে। আশ্রমগঠনই জগতের সবচেয়ে বড় কথা।

(১০৭)

স্ত্রী, পুরুষ, বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা, বিপত্নীক সবাই মিলে যখন স্ত্রী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার জন্ত আগ্রহান্বিত হবেন, তখনই সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি সম্ভব হবে। কেমন শিক্ষা চাই, কারা শিক্ষা দেবেন, শিক্ষার লক্ষ্যই বা হবে কি, লক্ষ্যই বা হবে কি, এই বিষয়ে তীব্র আলোড়ন হওয়া চাই। শুধু একটা বা দুটা মেয়ের মুখপানে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকলেই চলবে না।

একটা দুটা সদাশ্রম যুবক আদর্শ নারীজীবনের বিকাশকে সম্ভব করার মত স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্পনা কচ্ছেন। কিন্তু দেশে সহস্র সহস্র লোক এই বিষয়ে ঘোরতর উদাসীন। এতে কি কখনো সত্যিকারের প্রতিষ্ঠানের জন্মগ্রহণ সম্ভব হয়? এই যে মেয়েদের শত শত স্কুল আর গুটিকতক কলেজ হচ্ছে, তার পশ্চাতের প্রেরণা কি নারীকে তার পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা, পরিপূর্ণ লাভণ্যে বিকশিত করা? নিশ্চয়ই নয়। অন্ধের মত চলেছে দেশের চিন্তাহীন মনগুলি। নারীর শিক্ষা দরকার, তাই নারীর শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু শিক্ষা কেন দরকার, শিক্ষা কেমন দরকার, সে কথা ভাববার অবসর কারো নেই। এই জায়গায় হচ্ছে আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার ব্যর্থতা।

এই যে আধুনিক মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্ত এত আয়োজন, তার পশ্চাতে কতাদায়গ্রস্ত পিতার বরণগভীত আতঙ্কগ্রস্ত মনের বিকার ও বিক্ষিপ ছাড়া আর কিছুই নেই। নাচ

শেখালে যদি বিয়ে দেওয়া সহজ হয়, তবে এরা নাচও শেখাবে। মেয়েটাকে মানুষ করার জন্ত নয়, মেয়েটাকে পাত্রস্থা করার জন্তই এদের যত প্রাণের তাগিদ। মেয়ে মানে একটা আপদ, এই আপদটাকে কি ক'রে বিদায় করা যায়, আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের পশ্চাতে রয়েছে সুপ্রধান হ'য়ে সেই একটীমাত্র মনোরত্তির ছনিবার তাড়না।

কিন্তু সত্যিকারের স্ত্রী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এই তাড়না থেকে উদ্ভূত হবে না। তার উদ্ভব হবে, নারীকে মানুষ করার জন্ত, তার মানব-দেহ-ধারণকে সার্থক করার জন্ত, শক্তিশালী, বীর্যশালী, বলবিক্রমশালী, মহিমাম্বিত জাতির পত্তন করার জন্ত। তার উদ্ভব হবে, নারীকে কেন্দ্র ক'রে যাতে মনুষ্যত্ব-সাধনার শ্রেষ্ঠ তপস্বীরা সমাজবদ্ধভাবে দলে দলে আবির্ভূত হ'য়ে অতীতের পাপ, বর্তমানের আত্মবঞ্চনা ও ভবিষ্যতের নিশ্চিন্তাকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে বলহুর্দ্ব, বীর্ঘ-বরীয়ান, আত্মস্থ এক মহাজাতির আবির্ভাবকে সম্ভব কতে পারে, তার জন্ত। স্ত্রী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হবে, কয়েকটা পরগলগ্রহ মেয়েকে কোনো রকমে সেলাইয়ের কাজ ক'রে, মাষ্টারী ক'রে, কেরাগীর কাজ ক'রে বা বীমা কোম্পানীর দালালী ক'রে অনার্দজন করাবার জন্তে নয়, পরন্তু এক ত্রিলোক-বিস্ময়কারী মহাজাতি সৃষ্টির মহাঋক্ রচনা করার জন্তে, পুরাতনের ধ্বংসাবশেষের উপরে নূতন জীবনের গৌরব-রবি-বন্দী দীপ্ত কালজয়ী অশোকস্তম্ভ নির্মাণ কতে।

(১০৮)

জীব-কল্যাণের দুইটা পন্থা আছে। একটা পন্থা সঙ্কল্প-পূর্বক জীব-কল্যাণ করা। অপর পন্থা সঙ্কল্প-বর্জিতভাবে জীব-কল্যাণ করা। প্রথম পন্থায় তুমিই কর্তা, তোমার পুরুষকারই প্রধান, বিনা পুরুষকারে তুমি জীবের কোনো হিতসাধন কতে পার না।

শ্রাবণ. ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

২৮৭

দ্বিতীয় পন্থায়, তুমি কর্তাও নও, অকর্তাও নও, তুমি নিরপেক্ষ, উদাসীন, তুমি নিজেকে অবিরাম পরব্রহ্মে লগ্ন করছ, ব্রহ্মসাগরের গভীর অমূর্তে ডুবে যাচ্ছ, তার ফলে আপনা-আপনি তোমার অজ্ঞাতসারে জগতের অপরিমিত হিতসমূহ সাধিত হ'য়ে যাচ্ছে,—এক্ষেত্রে জীবকল্যাণের জন্ত তোমার পুরুষকারের কোনো প্রয়োজন নেই, তোমার পুরুষকার প্রয়োজন শুধু ব্রহ্মে ডুবে যাওয়ার জন্ত, তারপরে বাকী যা হবার আপনি হচ্ছে। শেবোক্ত জীব-কল্যাণের পন্থাটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মনিষ্ঠ সিদ্ধপুরুষদের এইটাই পন্থা। তাই বাইরের লোকেরা সমাজের পক্ষে তাঁদ্বিগকে নিপ্রয়োজন ব'লে মনে করে, হয়ত তাচ্ছিল্যও করে।

(১০৯)

সফলপূর্বক জীব-কল্যাণ করারও ক্ষেত্র আছে, পাত্র আছে। জীবের দুঃখ দেখলে প্রাণ আমার কাঁদে, আমি কি চূপ ক'রে ব'সে থাকব? নিশ্চয়ই নয়। আমি জীবের দুঃখ দূর করার জন্ত নিশ্চিতই চেষ্টা পাব। দুঃখী যেখানে কাঁদে, রুগ্ন যেখানে কাতর, নিরন্ন যেখানে ক্ষুধার্ত, আমি কি সেখানে আমার সাহুনা, আমার গুণবা, আমার অন্নখালিকা নিয়ে যাব না?

যাব, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আমাকে সচেতন থাকতে হবে। জীব-কল্যাণ করব, এই সফল যখন করেছি, তখন এই সফল করার উদ্দেশ্য কি, তা আমাকে ভুলে গেলে চলবে না। জীবের দুঃখ দূর করাই যদি আমার উদ্দেশ্য হয়, তবে এও বিচার ক'রে দেখতে হবে যে, জীবের দুঃখ কতটুকু আমি দূর করতে পারি, কতদিনের জন্তই বা পারি, আর, ক'জনের দুঃখ দূর করবারই বা ক্ষমতা আমার

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

২৮৮

আছে। সকলের দুঃখ দূর কতে আমি পারব না, সকল দুঃখও দূর কতে পারব না, চিরকালের মত দুঃখকে দূর করাও হয়ত হবে না, তবু আমি চেষ্টা করব। কেন করব? সেই চিন্তা আমাকে কতে হবে। করব, আমার চিত্তশুদ্ধির জন্ত। নিঃস্বার্থ হয়ে পরোপকার করলে চিত্তের ময়লা কেটে যায়, মন ভগবানে সহজে বসে, আনন্দস্বরূপকে লাভ কতে ইচ্ছে যায়। তাই আমার জীবসেবা। চিত্তশুদ্ধিই জীবসেবার প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই কথা ভুললে চলবে না।

অনেকে একথা ভুলে যান, জীবসেবা কতে গিয়ে অহংকারের সেবা, বুথা দর্পের সেবা, আত্মকৃতিত্বের সেবা করেন। অনেকে জীবসেবা কতে গিয়ে জীবের অকল্যাণও করেন। উদ্দেশ্য যদি ভুল হ'য়ে যায়, তবে সেবারও অপ্রয়োগ হ'তে পারে। জয়লাভই উদ্দেশ্য, এই কথা যদি ভুলে যাই, তা হ'লে মাটি চ'বে হয়ত খুলো ক'রে দেব, কিন্তু পুকুর খনন হবে না। দেশলাই দিয়ে প্রদীপ না ধরিয়ে উদ্দেশ্য-বিস্মৃতিহেতু কেউ কেউ নিজের গায়ের কাপড়ে চোপড়েও আগুন ধরিয়ে দেয়। জীবসেবা অনেকে অনেক রকমে করেন। কেউ শরীর খাটিয়ে, কেউ মনকে খাটিয়ে, কেউ অর্থবলে, কেউ বাক্যবলে, কেউ যোগবলে। কিন্তু যিনিই যেভাবে করুন, মনে রাখতেই হবে যে, চিত্তশুদ্ধিই এর প্রধান উদ্দেশ্য, আর সব উদ্দেশ্য গৌণ। মনে না রাখলেই বিপদ, পতন এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরম-দুর্গতিভোগ

(১১০)

দল ত' আপনিই বুদ্ধি হবে, তার জন্তে আবার একটা বুদ্ধির পোষণ করার কি দরকার? দলবুদ্ধি কপটতা আনে, ভান আনে

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

২৮৯

পরকে প্রবঞ্চনা কতে প্ররোচনা দেয়। দলবুদ্ধি ছল এবং চাতুরীর প্রশ্রয় দেয়। তাই যথার্থ সাধক-সমাজে দলবুদ্ধি অত্যন্ত নিন্দিত।

তোরা দলবুদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিস না। নিজেরা প্রাণপণে সাধন কর, তার ফলে সহস্র সহস্র লোক স্বভাবতই তোদের চরিত্রে আকৃষ্ট হ'য়ে ছুটে আসবে। এইটাই হচ্ছে দলবুদ্ধির নির্দোষতম উপায়।

(১১১)

সজ্জবদ্ধ সাধুদের জনসেবা আর একক ধ্যানী সাধুদের জনসেবায় তফাৎ কি ?

হালের চাষে আর কোদালের চাষে যে তফাৎ। প্রথমটাতে চাষ হয় extensive (বহুব্যাপক), আর দ্বিতীয়টাতে চাষ হয় penetrative (সুগভীর)।

(১১২)

সনাতন ধর্মকে প্রচারের জন্ত বক্তৃতার প্রয়োজন নেই। তার জন্ত চাই শাশ্বত, সনাতন, মৃত্যুহীন জীবন। যারা ক্ষণে মরে আর ক্ষণে বাঁচে, প্রতিক্ষণে যাদের উত্থান আর পতন, কটাক্ষে কটাক্ষে যাদের নিকট সত্য হয় মিথ্যা, মিথ্যা হয় সত্য, তাঁরা কখনো সনাতন ধর্মের প্রচার কতে পারেন না। সনাতন জীবন নেই, তাই আজ সনাতন ধর্মও নেই।

(১১৩)

তোমরা হচ্ছে গোকুলের অধিবাসী ভগবদ্ভক্তের দল। ভগবানই তোমাদের প্রাণের প্রাণ।

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

২৯০

তোমাদের সখা, তোমাদের সহচর, তোমাদের সম্মান, তোমাদের দয়িত। প্রাণপ্রিয় ভগবানকে ছাড়া আর কিছু তোমরা জান না। তাই তোমরা কামক্রোধবর্জিত, রাগহীন, বিরহিত, সমৃদ্ধ ও সানন্দ। তোমাদের সবকিছু ভগবানের জন্ত, ভগবানই তোমাদের সব।

(১১৪)

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, যোগ তিনটা আলাদা আলাদাই বটে। কিন্তু একটা মানুষের জীবনেই এই তিনটা যোগ এসে সমঞ্জস্য লাভ করে। যোগ তিনটা আলাদা হ'লে যোগী তিনজন আলাদা হ'তে পারে না। জ্ঞানযোগী ভক্তি আর কর্মকে বাদ দিতে পারেন না। ভক্তিযোগী জ্ঞান আর কর্মকে বাদ দিতে পারেন না। কর্মযোগী ভক্তি আর জ্ঞানকে বাদ দিতে পারেন না। তপস্তার ভঙ্গীতে কারো জ্ঞান, কারো ভক্তি, কারো বা কর্ম প্রাধান্য,—তাই, একজনকে আমরা জ্ঞানযোগী, অপরকে ভক্তিযোগী, অপরকে কর্মযোগী ব'লে থাকি। কিন্তু দুপক্ষে, ইক্ষুরসে আর খর্জুরসে যেমন জল আর শর্করা সর্বদাই আছে, তেমনি জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী, কর্মযোগী এই তিনজনের ভিতরেই যোগ আর শান্তি নিরন্তরই রয়েছে মূল লক্ষ্যে আর প্রাপ্তিতে তফাৎ নেই। তফাৎ শুধু বাহ্য ভঙ্গিমা যোগ কাকে বলে? পরাৎপর পরমমুন্দরে লেগে যাওয়া। লগ্ন হওয়া বড় কথা, কে কেমন ভাবে লগ্ন হ'লেন, তা বড় কথা নয়। পরমকে কেউ রোমাঞ্চিত কলেবরে ভক্তি-ব্যাকুলিত চিত্তে ভোজন করেন, কে

প্রশান্ত হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানস্ততার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করেন, কে

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

বিনোবাজী-সকাশে ডাকাত-দল

প্রতিধ্বনি

২৯১

কেমন ক'রে ভাত মাখা হ'ল প্রতি মুষ্টি অন্ত কতবার চৰ্চণ করা হ'ল, সেই সবগুলিকে শৃঙ্খলামত চালিয়ে ভোজন করেন। কিন্তু ফল এক পরমানন্দকেই লাভ করা। স্মরণাং জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি পরস্পর বিরোধী পদ্য নয়।

বিনোবাজী-সকাশে ডাকাত-দল❀

॥ রেজাউল করীম ॥

এতদিন বা ছিল কিংবদন্তী মাত্র, রূপ-কথায় অবিশ্বাস্ত গল্পের মধ্যে বা ছিল সীমিত, তা যে আমাদের চোখের সামনে এমনভাবে বাস্তবরূপে প্রকটিত হয়ে উঠে, তা আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। বা অঘটন তাই আজ ঘটে গেল। অতীত যুগের উপকথায় পড়েছি যে 'চোর রত্নাকর গুধু'রাম' নাম উচ্চারণ করেই মহর্ষি বাল্মীকী হয়েছিলেন, এবং জগতের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য লিখে বিশ্বমানবকে নৈতিক আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন। —একজন হৃৎচরিত্রা নর্তকী মেরী ম্যাগডালেন মহাত্মা বিগু বুটের পুণ্য পরশ লাভ করে সাধ্বী মেরিতে পরিণত হয়েছিলেন। দুর্ধর্ষ জগাইমাধাই চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসে একেবারে নূতন মানুষ হয়ে গিয়েছেন—এসব অতীতের কথা। বর্তমান জড়বাদী যুগে মানুষ এসব কথা শুনে, আর সন্দেহের হাসি হেসে বলে, “রেখে দাও তোমাদের অতীত-যুগের পুরাণের কথা, বর্তমান আণবিক যুগে এসব নয়।” কিন্তু বর্তমানের এই বস্তুতাত্ত্বিক যুগেও যে এমন ঘটনা সম্ভব, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ

* ভূদানবজ্র ৪ঠা আষাঢ়, ১৮ জুন (১৯৬০) সংখ্যা হইতে পূর্ণমুদ্রিত।

প্রতিধ্বনি বিনোবাজী-সকাশে ডাকাত-দল [২২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]
২২২

দিলেন আচার্য্য বিনোবাবাবো। তাঁর মত দেবচরিত্র মানুষের পক্ষে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা যে সম্ভব তা বিশ্বয়বিস্ফারিত নেত্রে দেখল জগতবাসী। মধ্য-প্রদেশের চম্বল উপত্যকার দুর্ধর্ষ ডাকাতদলের কয়েকজন নেতা তাদের হৃদয় পরিবর্তন ক'রে বিনোবাজীর নিকট বিনামূলীে আত্মসমর্পণ করেছে। বিনোবাজী মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ক'রে বাস্তব-জীবনে দেখালেন যে অতীত যুগের সেই সব কাহিনী অলীক নয়, মিথ্যা গালগল্প নয়, —একেবারেই সত্য।

ইংরাজ আমল থেকে চম্বল উপত্যকার বিস্তৃত অঞ্চল দুর্ধর্ষ ডাকাতদলের দ্বারা উপদ্রুত হয়ে আসছিল। ডাকাতদল গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করত। প্রয়োজন বোধে নরহত্যাও করত, নানা ভাবে সম্ভ্রাস সৃষ্টি করে বেড়াত। নিরীহ মানুষকে সর্বদা সসবাস্ত করে রাখত। তাদেরকে দমন করবার জন্য কোনরূপ চেষ্টার ক্রটি হয় নি। সুনিপুণ পুলিশবাহিনী লেগেছিল ডাকাতদের পেছনে। আদেশ জারি হয়েছিল হয় জীবন্ত অবস্থায় অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আন ডাকাতদেরকে খোঁটা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল তাদের মাথার উপর। কেউ কেউ ধরাও পড়েছে। তাদের বিচার হয়েছে —তার পর হয়েছে তাদের চরমকর্ম দণ্ড। পুলিশের গুলির আঘাতে কেউ কেউ নিহত হয়েছে। কিন্তু তবুও ডাকাতদল নিমূর্ল হয়নি। যত জোরে পুলিশের সতর্কতা বেড়েছে, তত জোরে বেড়ে চলছে ডাকাতদলের উপদ্রব। স্বাধীন ভারতেও এই উপদ্রব বিশেষ হ্রাস পায়নি। শাসন-কার্যের দায়িত্ব বাদে হাতে তাঁয়ে বুঝা উচিত যে এইভাবে রুদ্রনীতির তাণ্ডব দেখিয়ে কোন দেশের মানুষকে ভ্রাল করা যায় না। এভাবে ডাকাতদের উপদ্রব কমে না। মহামহিষার্ক ঠিকই বলেছেন *Terror is not always the effect of force and an armament is not a victory.*

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

বিনোবাজী-সকাশে ডাকাত-দল

প্রতিধ্বনি

২২৩

শক্তি দেখিয়ে মানুষকে ভীতিগ্রস্ত ক'রে বশীভূত করা যায় না। তাই দেখি দীর্ঘ দিন ধরে শক্তি প্রয়োগ করে কেউ চম্বল উপত্যকার ডাকাত দলকে শাস্তা করতে পারেনি।

অপরাধ করার জন্ত অপরাধীকে কঠোর দণ্ডদান ব্যতীত অত্ৰ কোন পন্থা পুলিশ বা সরকারের জানা নাই। তাই তাঁরা নৈতিক আবেদনের কথা কে হেসেই উড়িয়ে দেন। মানুষ নরহত্যা করেছে, অতএব তাকে কাঁসী দাও। চোর চুরি করেছে, ডাকাত ডাকাতি করেছে, অতএব তাকে দীর্ঘ-মেয়াদী জেলে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই হ'ল পুলিশের মনোবৃত্তি। এই ভাবে ছনিয়া জুরে হাজার হাজার লোকের জেল হয়েছে, কাঁসী হয়েছে। কিন্তু তাতে কোথাও অপরাধ কমেনি। মানব-সভ্যতার আদিযুগে যখন প্রথম মস্তানে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকেই অপরাধীদের দণ্ড হয়েছে। কিন্তু কৈ, পৃথিবীর কোন দেশে ত অপরাধ বন্ধ হয়নি। অপরাধ নিরোধের জন্ত যেমন যেমন কঠোর আইন প্রবর্তিত হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে নব নব পন্থায় চুরি ডাকাতি নরহত্যা হয়েছে। দণ্ডভোগের পর আবার অপরাধ করেছে, এমন অপরাধীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। চোর ডাকাতগণ বেশ বুঝে নিয়েছে যে কারাগার হল তাদের অপরাধের শেষ পরিণতি। বেশ ক বছর না হয় জেলই খাটলাম। তারপর আবার দ্বিগুণ উদ্ব্রমে ও কৌশলে অপরাধ করা যাবে। এমনও শুনা যায় যে কোন কোন ডাকাত দণ্ডভোগের মেয়াদ শেষ হয়ে এলে যারা এখনও কারাগারে থাকে তাদেরকে এই বলে আশ্বাস দেয় “আবার কিছুদিন পর তোমাদের মধ্যেই ফিরে আসছি।” কারামুক্তির পর আবার অপরাধ করে, আবার তাদের বিচার হয়, আবার দণ্ড হয়। অবস্থাটা যথা পূর্বমু তথা পরম। প্রথম অপরাধের সময় যদি চোর ডাকাতির সহিত উদার ও সদয়

প্রতিধ্বনি বিনোবাজী-সকাশে ডাকাত-দল [২ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
২৯৪

ব্যবহার করা হত, তবে ভাল ফল পাওয়া যেত। আবার অতীতকে দেখা গেছে যে প্রথম অপরাধী জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার শক্ত-চোর হয়ে পড়েছে। তাদের মনের ভাবটা এইরূপ, “বখন দাগী হয়ে গেলাম তখন আর লজ্জা কিসের, এবার থেকে পাকা চোর হব।” কিভাবে আইনকে ফাঁকি দিতে হয়, কি ভাবে চললে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম হয়, সে তখন সেইসব বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। কেননা তার হৃদয়-পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থাও হয় না। জেলের মধ্যে অপরাধী অপরাধীদের সঙ্গে মেলামেশার পর সে তখন শিখে ফেলে, কি ভাবে কি পন্থায় চুরি করলে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে পারে—সে চুরি ডাকাতির সব কৌশল শিখে ফেলে এবং জেল থেকে মুক্তি পর নব নব কৌশলে চুরি ডাকাতির প্রক্রিয়া আয়ত্ত্ব করে ফেলে। বস্তুতঃ চুরি ডাকাতির পথ বন্ধ করার কৌশল পুলিশ জানে না। আসল কথা এই যে, চোর ডাকাতদের হৃদয়-পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেটাই আসল পন্থা। কিন্তু কোন শাসনকর্তৃপক্ষ সে পন্থা অবলম্বন করে না। তাই তারা চুরি ডাকাতি নিবারণে বার বার ব্যর্থ হয়েছে। পুলিশি পদ্ধতির ফলে যারা “জাত-ডাকাত” তারা ডাকাতি ছাড়েনি, বরং আরও নূতন নূতন লোক ডাকাত দলে ভর্তি হয়েছে। আজকাল অনেক ভদ্রলোকের ছেলেরাও ডাকাত দলে যোগ দিয়েছে এবং ডাকাতির দ্বারা বেশ উপায়সা রোজগার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না।

দেশে যে এত চুরি ডাকাতি হয় তার প্রধান কারণ “অভাব”। চুরি করাটা কারুর জন্মগত প্রবৃত্তি নয়। অবস্থার পাকে পড়েই মানুষ চোর হয়ে পড়ে। সুতরাং জগতে যদি অভাব, দুঃখ দারিদ্র্য না থাকত তবে চুরি

শ্রাবণ, ১৩৬৭] বিনোবাজী-সকাশে ডাকাত-দল

প্রতিধ্বনি

২২৫

চোর ডাকাত হ'ত না। বঙ্কিমচন্দ্র “আনন্দমঠে” এইটাই দেখিয়েছেন।

ভিক্টর হিউগোর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘লা মিজারেবল’ এই কথাই বলে যে, অভাব মানুষকে পশুতে পরিণত করে। দেখা গেছে যে, দেশে দুর্ভিক্ষ হলে, অরাজকতা সৃষ্টি হলে চোর ডাকাতের উপজব বৃদ্ধি পায়। অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, চৌধুরিত্তি, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি ধরনের অপরাধ কেবল দণ্ড দিলেই সমূলে বিদূরিত হয় না। দণ্ড অপরাধের মূল কারণ দূর করতে পারে না। এই মূল কারণ দূর করতে হ'বে, মানুষের হৃদয়-পরিবর্তন ক'রে। আর অভাব থাকলে শুধু কথায় কোন লোকের হৃদয়-পরিবর্তন হয় না। এইটাই হল প্রকৃত পন্থা। মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন লোকের হৃদয় আবেগের বশে ঠঠাৎ পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে সমাজের একটা বৃহৎ অংশের হৃদয়-পরিবর্তন করতে হলে গান্ধী বিনোবার পন্থাই অবলম্বন করতে হ'বে। বর্তমানে দেখছি বিনোবাজী এমন একজন মহাত্মানব যিনি ব্যাপকভাবে হৃদয়-পরিবর্তনের আবেদন করেছেন এবং তাতে বহুলাংশে সফলতাও অর্জন করেছেন।

ডাকাতদলের যে সব নেতা বিনোবাজীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে, তিনি তাদেরকে কোন প্রকার মিথ্যা আশ্বাস দেন নি। তিনি একথা বলেন নি যে অপরাধ স্বীকার করলে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে, বা লম্বদণ্ড দেওয়া হবে। দোষস্বীকার করার পূর্বে তিনি পরিষ্কারভাবে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে, সমস্ত প্রকার দণ্ড গ্রহণ করবার জন্ত প্রস্তুত হ'তে হবে। আর

প্রতিধ্বনি বিনোবাজী-সকাশে ডাকাত-দল [২ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]
২২৬

ডাকাতনেতাগণও আত্মসমর্পণের সমস্ত ঝুঁকি মাথা পেতে গ্রহণ করতে সম্মত আছে। ডাকাতদলের সদাঁরদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে বিনোবাজী কোন 'ফাঁকির' অবকাশ রাখেন নি। তিনি একেবারে অপকটভাবে ডাকাতদেরকে সংপরামর্শ দিয়েছেন। আত্মসমর্পণ বিপদ আছে জেনেও ডাকাতদলপতি যখন তাঁর নিকট অপকটে তাদের সবকথা বলেছে, এতে কি মনে করার কারণ নাই যে তাদের হৃদয়ের সম্পূর্ণ না হোক কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে? মহাজনের পুণ্যপরশে তাদের শক্ত হৃদয়ও গলে গেছে, একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এতদিন মহৎ লোকের সন্ধান তারা পায়নি' সৃজন লোকের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ তাদের হয় নি। নিশ্চয় তারা শুনেছে এই ভারতের মধ্যে এমন একজন মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে যিনি মানুষের মঙ্গলের জন্ত দেশের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি মানুষের কাছে সমস্ত প্রাণটাই দাবী করেন, আর এর বিনিময়ে মানুষকে তিনি দেন শান্তি, স্বস্তি ও নির্ভরতা। এতদিন ডাকাতদল লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। দিনের আলোতে সাধারণের সম্মুখে আসবার সাহস তাদের ছিল না। এই হৃদয় ডাকাত দল লুণ্ঠন করে ধনসম্পদ প্রচুর পেয়েছে। কিন্তু মনের শান্তি কোনদিন পায় নি। দিনে দিনে তাদের হৃদয় দগ্ধ-বিদগ্ধ হচ্ছিল। তারা হয়ত খুঁজছিল শান্তি ও স্বস্তি কিন্তু পুলিশ তাদেরকে তা দেয় নি। কিন্তু এই সব ডাকাত-দল যখন শুনল যে বিনোবাজী তাদেরকে বাঞ্ছিত শান্তি দিতে পারেন তখন তারা বিনা দ্বিধায় তাঁর কাছে এসে আত্মসমর্পণ করল। তারা দণ্ড মকুবের দাবী করে নি। নির্বিঘ্নে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ সুবিধার প্রাপ্তি তারা তোলে নি। তারা বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। যতজন

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

বিনোবাজী-সকাশে ডাকাত-দল

প্রতিধ্বনি

২০৭

ডাকাত বিনোবাজীর কাছে এসেছে, তিনি তাদের প্রত্যেককে বলেছেন “গত পাপের জন্ত অনুশোচনায় হৃদয়-পরিবর্তন কর, সংপথে চলবার সঙ্কল্প কর। বিচারে যে দণ্ড প্রাপ্য তা গ্রহণ করবার জন্ত প্রস্তুত হও।” একথা শুনার পর ত তারা বিনা বিধায় আত্মসমর্পণ করেছে এবং অগ্নান বধনে পুলিশের হেফাজতে চলে গেছে। এবং সেজন্ত কাতরতা প্রকাশ করে নি। অহিংসা ও প্রেমের এক নূতন পরীক্ষা আরম্ভ হ’ল। এইভাবে যাদেরকে পুলিশ কোনদিন নাগালের মধ্যে পায় নি, এবং হয়ত জীবিত অবস্থায় কোনদিন পেত না, আজ তারা হাস্তে হাস্তে পুলিশের সঙ্গে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের নিকট আপনাদেরকে সঁপে দিল। এ যদি ‘মিরাকল’ না হয় তবে এ জগতে ও-জিনিষটার কোন অস্তিত্বই নাই।

গান্ধীজী নূতন পন্থায় দেশ স্বাধীন করেছেন আর তাঁর ভাব-শিষ্ট্য বিনোবাজী সেই পন্থাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে নূতন মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর এই পন্থায় ডাকাতদলের একটা বিরাট অংশ যে সত্যকার ভাবে ‘মানুষ’ হবার সুযোগ পাবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। মূল সমস্যা ছু দশজন ডাকাতকে ধরে জেলে ভরা নয়, সমস্যা হচ্ছে কেমন ক’রে দেশ থেকে ‘ডাকাতিটাকে একেবারে বন্ধ করা। পুলিশী পন্থায় তা বন্ধ হ’বে না। তার জন্ত চাই হৃদয়ের পরিবর্তন। মানুষের সামনে মহৎ আচরণ দ্বারা উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে হ’বে, দরিদ্রের অত্যাচার দূর করতে হ’বে। এমন সমাজ সৃষ্টি করতে হবে যেন তাতে কেউ না অভুক্ত থাকে, কেউ গৃহহীন হ’য়ে গাছ ডলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য না হয়। সে পন্থা হচ্ছে সর্বোদয় ও ভূদান। বিনোবাজীর ভূদান আন্দোলনের মধ্যে ডাকাতি বন্ধের ইঙ্গিত আছে। যদি সমগ্রভাবে

প্রতিধ্বনি

একটি স্বপ্ন

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

২৯৮

সারা ভারতে ভূদান আন্দোলন সার্থক হয়, তবে তা বহু সমস্যার মত ডাকাতি সমস্যারও সমাধান করতে পারবে। বিশ্বাসই বিশ্বাস আনে। বিনোবাজীকে ধন্যবাদ দিব যে তিনি মানুষের মধ্যে সেই বিশ্বাস আনবার সাধনা করছেন। আজ তিনি জাতির ধ্রুবতারা।

একটি স্বপ্ন

গত ১৩৬৬ সনের ২৪শে বৈশাখ একটি স্বপ্ন দেখি। মধ্যাহ্ন আহ্বারের পর বিশ্রাম নিবার জন্ত শয্যা গ্রহণ করিয়াছি। (আমার পিতৃদেবের শয্যাতে তিনিও শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন)। কখন যে আমি নিদ্রিত হইয়া গেলাম, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি যে কোন একস্থানে বিশ-পঁচিশ জন লোক একত্র হইয়া আলোচনা করিতেছেন যে, ভগবান, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা তাঁহারা আছেন কিনা? যদি থাকেন, তবে কোথায় এবং কি প্রকারে আছেন? আর যদি নাই থাকেন, তবে তাঁহাদের পূজার্ত্তনা কেন করি? ঐ আলোচনা প্রায় দুই ঘণ্টা তাঁহাদের চলিতেছে। ঐ সময় আমি সাইকেল চালাইয়া সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছি, তখন তিনজন জ্বীলোক ও একজন পুরুষ আমাকে ডাক দিলেন এবং এই প্রশ্ন করিলেন, আমাদের মধ্যে ভগবান, কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা আছেন কিনা। যদি থাকেন তবে কোথায় এবং কি ভাবে আছেন এবং যদি নাই বা থাকেন, তবে তাঁহাদের পূজা আমরা কেন করি? এই কথার উত্তর তাঁহারা আমার কাছে চাহেন,—তখন আমি বলিলাম, ভারতীয় ঋষিরা ইহা

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

একটি স্বপ্ন

প্রতিধ্বনি

২২২

মীমাংসা বহু গ্রন্থেই করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়, তবে কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন? তখন তাঁহারা বলিলেন,—তবু আপনার মত কি, ইহাই বলুন। তখন আমি বলিলাম,—আপনারা হিন্দু কিনা, তাহার উত্তর দিন, তারপর আমি আলোচনা করিব। ঐ সময় সকলে বলিলেন, আমরা হিন্দু নয় তো কি? আমরা কালী, দুর্গা, শিব ইত্যাদি মানি, তাই আমরা হিন্দু। আমি বলিলাম,—না, ইহাতে হিন্দু হওয়া যায় না। কালী, দুর্গা, শিবকে মানেন, এমন মুসলমান বহু আমার পরিচিত আছেন। আমার মতে, যে লোক স্বীকার করেন, আমি পূর্বেও ছিলাম এখনও আছি এবং দেহ ছাড়িয়া গেলেও থাকিব, সেই হিন্দু। তখন তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ, আমরা ইহা স্বীকার করি। তখন আমি বলিলাম, হ্যাঁ, এখন আলোচনা হইতে পারে। আপনারা জানেন, পুরীধামে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ। জগন্নাথের হাত-পা নাই, তাই চলিতে ও কাজ করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা আছে। যখন তাঁহার ইচ্ছা হইল তো তিনি মাসীর বাড়ী, পিসীর বাড়ী ও খণ্ডুরবাড়ী যাইবেন। অথচ হাত-পা নাই, কি করিয়া যাইবেন? তখন একটি রথের প্রয়োজন। একখানা রথ তৈরী হইল এবং সেই রথে জগন্নাথ আরোহণ করিলেন। তখন রথখানার নাম হইল জগন্নাথের রথ। সাত দিন তিনি ইচ্ছামত মাসীর বাড়ী, পিসীর বাড়ী ও খণ্ডুরবাড়ী ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং যখন রথ হইতে চলিয়া গেলেন তখন আর রথের প্রয়োজন রহিল না, রথখানা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। কারণ, প্রয়োজনে হইল রথের সৃষ্টি, কাজের জন্ত সাত দিন স্থিতি এবং কর্ম্ম অন্তে হইয়া গেল লয় কাহার? রথের। এইরূপ

প্রতিধ্বনি

একটি স্বপ্ন

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩০০

জগতের যত প্রাণী আছে, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, জন্তু প্রভৃতি এক একটি ভগবানের এক একটি রথ তাঁহার প্রয়োজনে হয় সৃষ্টি, স্থিতিও হয়, লয়ও হয় এবং সকল প্রাণীর অন্তরে তিনি অখণ্ডনাদ রূপে বাস করেন এবং নিয়ম মত খেলা করেন। তিনি আনন্দস্বরূপ। তাই যে যেখানে আছেন, তাহাতেই আনন্দ চান এবং আকৃতি অনুযায়ী প্রকৃতি হয়, তাই ব্যাঘ্রের ও গরুর আকৃতি যেমন ভিন্ন, তাহাদের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। এবং প্রকৃতি যখন ভিন্ন হয়, তখন স্থলে বাস করেন। স্থলেই আহার, নিদ্রা, মৈথুন আছে। তিনি এই তিনের অতীত। তিনি সকল বিশ্বরূপে নাদরূপেতে আছেন। তিনি জন্মেতেও নাই, মৃত্যুতেও নাই। তিনি রথেলার প্রয়োজনে সৃষ্টি করিয়াছেন স্থূল জগৎ এবং নিয়মটি দিয়াছেন ইহার সাথে। তাই জগতের যখন আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে, তখন তিনি জগতের স্থূল দেহ লইয়া অবতীর্ণ হন। যেমন নন্দের ঘরে জন্ম নিয়ে যিনি খেলা করিলেন, তিনি কে? তাহা গর্গমুনি ধ্যানে জানিলেন— ইনি সেই জগৎপতি কৃষ্ণ। যিনি সকল জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার কাজ শেষ হইয়া যাওয়ার পর এই দেহরথ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কি কৃষ্ণ ধ্বংস হইয়া গেলেন? না, তাহা হন নাই। কৃষ্ণ ঠিকই আছেন। নন্দের পুত্ররূপে যে দেহরথ লইয়া খেলা করিয়াছেন, তাহা লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপে কালী, দুর্গা, বিষ্ণু ইত্যাদি রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন এবং খেলা শেষ করিয়া তাঁহার নিয়ম মত চলিয়া যান। সকল শাস্ত্রেই বলিতেছে, ভগবানের স্বরূপ ওঁকার।—এই কথা বলার সাথে সাথেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং আমার সমস্ত শরীর দিয়া ঘাম ছুটিল। তখন ঘড়িতে চারিটা বাজিয়াছে। আমার কর্মস্থলে যাওয়ার সময় হইয়াছে, তাই চলিয়া গেলাম এবং চিন্তা করিতে লাগিলাম,—যে বিষয়ের উপদেশ আমি দিলাম, এ বিষয়ের আদি

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

একটী স্বপ্ন

প্রতিধ্বনি

৩০১

কিছুই জানিতাম না। কি করিয়া ঐ বিষয় আমার দ্বারা বলা হইল? রাত্রে আসিয়া পিতৃদেবের নিকট বলায় তিনি বলিলেন,—“পরমগুরু সকলের হৃদয়ে বাস করেন, প্রয়োজন হইলে তিনিই বলান।” বহুদিন যাবতই মনে করিতেছি, তোমাকে জানাই। আবার মনে করি, তুমি সবই জান, তোমাকে কি আর লিখিব। কিন্তু আমি মূর্খ, তাই আজ আর না লিখিয়া পারিলাম না। তুমি জগৎময় খেলা করিতেছ, তবে কেন তুমি আমাকে ধরা দেও না বাবা? যখন যে দিকে তাকাই, কেবল তোমার মহিমাই দেখিতে পাই। এই জগতের সকল কাজই তুমি করিতেছ কিন্তু মানুষ মনে করে জীবই করে। এমন খেলায় রাখিয়াছ, যাহাতে তোমাকে কেহ চিনিতে না পারে। তাই এত মোহ দিয়াছ। আমার মোহ-ঘোর কাটাইয়া দাও, এই একমাত্র প্রার্থনা। মদীয় পিতৃদেব তোমার মহিমার কথা নিয়াই সদা আনন্দে আছেন। আমি নিজেকে বড়ই ভাগ্যবান্ মনে করি। কারণ, তোমার মত গুরু ও তাঁর মত জন্মদাতা পিতা লাভ করা বহু জন্মের তপস্তার ফল মনে হয়। আনন্দে আছি। কৃপা রাখিও। ইতি—

সেবকাধম—

“তোমার ধরনী”

সংস্কৃত রাষ্ট্র-ভাষা সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ

ভাষা লইয়া দেশবাসী কত সমস্যা ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতেছে। নেতৃবর্গ এই ভবিষ্যৎ হয়ত ভাবেন নাই। কিন্তু মহাকাল কোনও ফাঁকিই সহ্য করেন না। এই জন্তই সময় থাকিতে আমাদের সাবধান হওয়া আবশ্যিক। আমাদের আজ সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া প্রতিটি কাণ্ড করিতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেন সুদীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং হীন দলাদলির উদ্বেগ আমাদের উঠিতে হইবে।

ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ঐক্যবোধ ও প্রেমসংস্থাপন নব-ভারত স্বাধীনতাকে দীর্ঘকাল রক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। দূরদৃষ্টির অভাবে অকারণে ভাষা-সমস্যা নিয়া কলহ-সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে আমিই সর্বপ্রথম ধুবলিয়ার পঁয়ত্রিশ হাজার জনতার সমক্ষে এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলাম যে, সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা রূপে স্বীকার করিতে হইবে। ভারতের প্রায় সর্বভাষা এই ভাষা হইতেই উৎপন্ন, এখনও ঋদ্ধি লাভের জন্ত প্রত্যেক ভাষাকে এই ভাষা হইতেই ঋণগ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাষার জন্তই ভারত বিদেশের নিকট পূজাহীন ও গৌরবাহীন। আমিই ধুবলিয়ার নবদ্বীপের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যাতীর্থ মহাশয়কে প্রেরণ করিয়াছিলাম, “অবিলম্বে পণ্ডিতগণের মধ্যে কাজ আরম্ভ করুন। তৎপ্রেরণায় তিনি পুণ্যধাম নবদ্বীপে নিখিলবজ্রের বিবুধমণ্ডলীকে নি

শ্রাবণ, ১৩৩৭]

বিশেষ নির্দেশ

প্রতিধ্বনি

৩০৩

সম্মেলন করেন। তাহার ফলে বর্তমানে নিখিল ভারতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সংস্থা গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। সম্প্রতি শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এম, পি, ভারতীয় লোকসভায় একটি বিল আনয়ন করিয়া হিন্দীর সঙ্গে সংস্কৃতকে ও বিকল্প রাষ্ট্রভাষা করিয়া ভারতের ঐক্যবোধ রক্ষার স্থায়ী মীমাংসা করিতে অগ্রণী হইয়াছেন। এই সময়ে তোমাদের সকলের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন। নিউ দিল্লীতে কম পক্ষে দশ লক্ষ পত্র স্বরাষ্ট্র-কর্মসচিবের নামে যাওয়া প্রয়োজন। তোমরা অবিলম্বে কাজে লাগ। নিম্নরূপ পত্র অবিলম্বে হিন্দী, বাংলা, ইংরাজি, উড়িয়া অসমিয়া ও সংস্কৃত ভাষায় যাওয়া প্রয়োজন। যাহারা যাহারা এইরূপ পত্র দিলেন, তাঁহাদের নাম-ঠিকানাগুলি তোমরা মনে করিয়া শ্রীপ্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, ৩২, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা (৯) ঠিকানায় অবশ্য পাঠাইবে। ইহা দ্বারা কার্যের সুবিধা হইবে।

To

**The Secretary,
Ministry of Home Affairs,
Government of India,
New Delhi.**

Dear Sir,

The Bill introduced in the Lok-Sabha by Sri Chapala Kanta Bhattacharya, M. P., on 16-4-60 to amend Article 343 of the Constitution has our fullest support for two potent reasons. Firstly

it will splendidly serve the purpose of removing bitterness engendered by the official-language controversy. Secondly, it will ensure the enrichment of all the regional languages equally and thus will create the safest and a permanent common platform for all the citizens of the new Union of India.

Thanking you,

Yours truly,

Signature

Address

सेवा में

सचिव महोदय,

गृहमंत्रणालय (स्वराष्ट्र-कर्मसचिव)

भारत सरकार,

नया देहली ।

महाशय,

लोकसभा में संसद-सदस्य श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य द्वारा उत्थापित भारतीय संविधान के ३४१ अनुच्छेद के संशोधन प्रस्ताव में निम्नलिखित दो कारणों से मेरा पूर्ण समर्थन है।

आवण, १०७१]

विशेष निर्देश

प्रतिस्वनि

७०६

एक, इसके द्वारा राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर जो कटुता की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका बहुत कुछ निराकरण हो जायगा। दूसरा, यह प्रस्ताव गृहीत होने से प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की सम्यक् अभ्युन्नति होगी तथा भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता बनी रहेगी।

हस्ताक्षर—

पता—

भारतवर्ष-शासनाधिकृतस्य

गृहमंत्रणालय-सचिव-(स्वराष्ट्र-कर्मसचिव-)

महाभागानां समीपे—

निउ देहली ।

महोदयाः,

लोकसभायां १६-४-६० दिवसे श्रीमता चपलाकान्त-भट्टाचार्य एम, पी, महाशयेनानीतः भारतीयसंविधानस्य ३४३ संख्यकानु-च्छेदसम्बन्धी संशोधनप्रस्तावः बलवता कारणद्वयेन अस्माभिः वाहं समर्थितोऽस्ति । प्रथमं, अस्य राष्ट्रभाषामधिकृत्य साम्प्रतं उत्पन्नानां आन्तःप्रान्तीय-कटुविवादानां दूरीकरणे निर्भरसाधकत्वं, द्वितीयं च अस्य सर्वासामेव प्रान्तीयभाषाणां सर्वांगीण-भृशमभ्यु-न्नतिसम्पादकत्वं तत्फलतया समग्र-भारतभूमेः जनस्य ऐक्यग्रथने सहायकत्वं च, इति अस्माकं द्रढीयान् विश्वासः ।

हस्ताक्षरम् श्री—

स्थानम्—

প্রতিধ্বনি

বিশেষ নির্দেশ

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩০৬

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্বরাষ্ট্র-কর্মসচিব সমীপেষু :- ভারত সরকার, নিউ দিল্লী

তারিখ.....

মাতৃবরেষু :-

সম্মিলিত নিবেদন এই যে, শ্রীযুক্ত চণলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, এম. পি. লোকসভাতে বিগত ১৬।৪।৬০ তারিখে ভারত-সংবিধানের ৩৪৩ অঙ্কে সংশোধন করিবার জন্ত যে বিল উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত দুইটি অতি প্রবল যুক্তিতে আমি/আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থ করিতেছি। প্রথমতঃ, সরকারী ভাষার ব্যাপার লইয়া-যে প্রায় তীব্র তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে, এই বিল গৃহীত হইলে তাহার সুনির্দিষ্ট অবসান হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই বিল গৃহীত হইলে সকল প্রায় সাহিত্যই সমভাবে সমৃদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবে এবং নবীন ভারতের একতা-বন্ধনে বদ্ধ করিবার উপায় স্থায়ী এবং নিশ্চিত কর হইবে ইতি নিবেদক—

(স্বাক্ষর)

(ঠিকানা)

ওড়িয়া বা অসমিয়া অনুবাদ তাড়াতাড়িতে দিতে সমর্থ হইলেন দরকার মত অনুবাদ করাইয়া লইও।

এই কার্যটি তোমরা দ্রুত করিবে। আমি মন্থরীতে গীতিকা থাকিলে এবং তোমরা মঙ্গল-বাধের বিপর্য্যে উদ্বিগ্ন না থাকিলে কাজই হইত, জান। আমি আগামী ২৬শে আগষ্ট, ১০ই ভাদ্র ভাঙ্গা দেখাইতে কলিকাতা যাইব। তখন গিয়া জানিতে চাহি, প্রিয় কলিকট নিকটে কোথা হইতে কি সংবাদ গেল। ২৮শে আগষ্ট, ১২ই রবিবারের উপাসনা সারিয়া কলিকাতা হইতে সম্ভবতঃ দুই দিন পরে পনের দিনের জন্ত উত্তরবঙ্গে যাইব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

৩০৭

সভাপতির অভিভাষণ*

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও শ্রদ্ধেয়া ভগিনীগণ,

আজ এই কাছাড় প্রতিনিধি সম্মেলনের সভাপতিত্বে আহ্বান করে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন, তার জন্তে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এবং আপনাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সভাপতিত্ব করার যোগ্যতা আমার নেই। আমার পক্ষে এ শুধু মৌখিক বিনয় নহে, আমি ভাল করেই জানি যে, আমাদের অঞ্চল সমাজে অনেকে রয়েছেন, যারা ভক্ত, সাধক, বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞান-জ্যেষ্ঠ, যাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, তবুও আপনারা আমাকে ডেকেছেন। অযোগ্য হস্তে যে গুরুভার আপনারা তুলে করেছেন তার দায়িত্ব আপনাদের।

এটি কারণে আমি আপনাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারি নি। যে সাধনা ও আদর্শ কৈশোর থেকে বোঁবন, এবং বোঁবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের প্রথম পাদবিহরণ পর্যন্ত আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, সে সাধনা ও আদর্শ একদিন সমগ্রা বিশ্বের সাধনা ও আদর্শ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তাই বলে অগ্র ধর্ম ও ধর্ম সম্প্রদায়কে অশ্রদ্ধা কিম্বা হেয়-জ্ঞান করি না। সব ধর্ম ও ধর্ম-সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা করাও আমরা অঞ্চল ধর্ম থেকেই শিখেছি। সেই অঞ্চল-সমাজের তরফ থেকে আপনারা আমাকে ডেকেছেন—কাজেই অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছি।

দ্বিতীয় কারণ—আমাদের পরিচিত ধর্ম সংঘের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ

* শিলচরে অনুষ্ঠিত কাছাড় জিলা অঞ্চল-প্রতিনিধি সম্মেলনে ২৯শে মে, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী বি. এ, বি-টি প্রদত্ত অভিভাষণ।

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[২ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩০৮

পুণ্যস্মৃতিতে মঙ্গলবাঁধ “বিশ্বপ্রেমের দাবী” নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। তার জন্ম সার্থক করার জন্ত দিকে দিকে যে সকল আয়োজন-অর্থায়ন, বিবিধ পরিকল্পনা নিয়ে দেখা দিয়েছে, তার momentum বা গতিশক্তি বাতে কতকগুলি resolution-এর মধ্যেই সীমিত না হয়ে সত্যিকার কিছু কাজ করে, সেদিকটা সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা কর। আপনাদের কর্মবুদ্ধির সাথে আমার ক্ষুদ্র কর্মবুদ্ধিকে প্রযুক্ত করা। তাই আমি আজ এসেছি আপনাদের সহায়তা ও মঙ্গলাভ করব, আপনাদের কর্মপ্রচেষ্টার সাথে পরিচিত হব—এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। তাই আমার প্রথম কথা এই যে, আমি আপনাদের শিক্ষার্থী সভাপতি বুদ্ধিমান যাদের ‘স্রোতাপন্ন’ বলা হয়, আমি এখনও সেই স্বপ্ন অতিক্রম করি নি, জ্ঞান কিংবা ভক্তির পুঞ্জি ও মন্ডল আমার স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন পুঞ্জি নিয়ে আমি এসেছি এই ভেবে যে, যা’ কিছু অভাব ও হ্রাস আমার রয়েছে, তা’ আপনারা নিজগুণে পূরণ করে নেবেন।

“সংপ্রাপ্যেনমুখ্যায়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ

কৃতাত্মনো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ ।

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ

যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশস্তি ।”

—যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্মক্ষেত্রে পরমাত্মাকে দর্শন করে প্রশান্ত। যাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের মধ্যে যুক্ত হয়েছেন এবং সকলের মধ্যে প্রবেশ করেছেন—সদগুরু ব্রহ্মস্বরূপনন্দ পরমহংস দেব তাঁদের অগ্রতম। তাঁর কাহিনী এক বলবৎ

অমিত-তেজস্বী বীর সন্ন্যাসীর কাহিনী দিগ্বিজয়ী এক অসামান্য

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিদ্বনি

৩০৯

পুরুষকারের কাহিনী, এক অদম্য মানসিক শক্তির রোমাঞ্চকর ইতিহাস। চরিত্র ও পুরুষকারের বলে, জ্ঞান, কর্ম ও সাধনার সমন্বয়ে তিনি ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের আদর্শ পুরুষ। এমন অত্যাশ্চর্য অভূতপূর্ব স্বামী বিবেকানন্দের পরে এই প্রথম। তাঁর শুচি-শুভ জীবন-স্ফোতিতে, নিষ্কাম কর্মপ্রেরণায়, অভিক্রার আদর্শে তিনি একেশ্বর ধর্ম। অথবা তিনিই যেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী নারায়ণ, শঙ্খ নারায়ণের আহ্বান চিহ্ন, তিনি যখন আসেন তখন তিনি সকলকে যেন আহ্বান করে বলেন—“আমি এসেছি, তোমরা আমায় অবলম্বন কর।” আবার “বহু জন হিতায়” যখন তিনি কোন কষ্টানুষ্ঠানের সঙ্কল্প করেন, তখনও তাঁর শঙ্খ বেজে ওঠে; ভক্তজনেরা সেই পুণ্য কন্ঠে সহায়তা দিতে দলে দলে এগিয়ে আসে। চক্র তাঁর দ্বিতীয় চিহ্ন, তাঁর সমাক, নির্ভুল দৃষ্টির এবং বুদ্ধির প্রতীক। মানুষ যখন বিপদে দিশেহারা হয়ে পথ খুঁজে পায় না, তখন তিনিই মুক্তিপথের একমাত্র দিশারী; শ্রেয় ও প্রেয় এর পথে তিনিই তখন মানুষকে হাত ধরে নিয়ে যান। গদা তাঁর শক্তির প্রতীক। তিনি প্রত্যেক কাজেই বিজয়ী হবেনই। আর পদ্ম—তিনি যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন, যাতে হিংসা নেই, ঘেঁষ নেই, আছে তৃপ্তি, শান্তি, আনন্দ, তারই প্রতীক।

কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও সকলে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় না, সকলে তাঁর চক্রের খেলা দেখতে পায় না, এক দল বিরুদ্ধবাদী বরাবরই থেকে যায়। প্রতি যুগেই দেখা যায়, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বলবান ও শক্তিমান বারা তৎকালীন তাদের মধ্যেই এক শ্রেণীর লোক বিরুদ্ধবাদী হয়। আর ইষ্টানুরাগী বারা, তারা দুর্বল ও মুষ্টিমেয়। শ্রীরামচন্দ্রকে গ্রহণ করেছিলেন সুগ্রীব, হনুমান, গুহক ও বিভীষণ, অর্থাৎ বারা গৃহহারা,

প্রতিধ্বনি
৩১০

সভাপতির অভিভাষণ [৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

কিষা রাজ্যহারা, যারা অনামী ও বঞ্চিত। শ্রীকৃষ্ণকেও অবলম্বন করেছিলেন রাজ্যহারা, বনবাসী পাণ্ডবগণ,—মহামানী, মহাশক্তিশালী দুর্ঘোষন নহে। যীশুখৃষ্টকে অবলম্বন করেছিল মাত্র বারো জন জেলে। তথাপি তাঁদের প্রত্যেকের জয় হয়েছিল, কেননা—“প্রেরিত পুরুষ এসেছিলেন, প্রেরিত পুরুষ আসবেন, প্রেরিত পুরুষ জয়যুক্ত হবেনই।” এই জয় কার, কি ভাবে, কোন পথে হবে তা’ কেহই আগে থেকে বলতে পারে না। শ্রীশ্রীবাবামণিরও বিজয় বার্তা ঘোষণার সময় হয়। এখনও আসেনি। তবে আমরা সংখ্যায় ও শক্তিতে যতটো নগণ্য হই না কেন, আমাদের দিয়েই হবে তাঁর জয়। ইতিমধ্যেই সাক্ষ্যের যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বিরুদ্ধবাদীরাও স্তম্ভিত হচ্ছেন।

ভ্রাতা ভগিনীগণ, একদা ‘ওঙ্কারের জয়যাত্রা’ ছায়াছবির নির্মাণ কার্যে আমরা যেটুকু আর্থিক সহায়তা দিয়ে ছিলাম, তার তুলনায় মঙ্গলবোধের পুনর্নির্মাণ-কার্যে আমাদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন শত সহস্রগুণ অধিক। মঙ্গলবোধ—পূর্বেই বলেছি—বিশ্ব-প্রেমের দাবী নিয়ে নূতন করে জন্ম নিয়েছে। তা’তে সহায়তা দিয়ে আমরা আমাদের প্রেমের ঠাকুরকে কৃতার্থ করব না, নিজেরাই হব কৃতার্থ ও বরণীয়। মঙ্গলবোধ এক হিমাবে আমাদেরও মঙ্গলের বাঁধ, মঙ্গলের সেতু। ওঙ্কারের জয় যাত্রার শুভমুক্তি সম্পাদন করে, আমরা বঞ্চিত ভেবেছিলাম—মস্তবড় একটা কাজ করে ফেলেছি এবং কচ্ছপের মতন হাত পা গুটিয়ে সুখনিদ্রায় হলাম মগ্ন, তখন বিধাতার কোন এক জুজু বিধানে পুপুন্যী আশ্রমের উপর শনির কুটিল দৃষ্টি এসে গড়া। প্রবল বারিষর্বে মঙ্গলবোধ ধসে গেল। যে পুপুন্যী আমাদের সব কয়টি আশ্রমের feeder, আমাদের প্রাণ-প্রভুর কর্মজীবনের প্রে কীর্তি, তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠল। শজ্ঞাও সঙ্গে সঙ্গে বেলে উঠল।

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

৩ তিথি নি

৩১১

আমরা চঞ্চল হলাম, কেউ বা ব্যাধিত হলাম এত বড় একটা প্রাকৃতিক
অনর্থে; কিন্তু হলেন না তিনি, যিনি বাজালেন শজা, শজা বাজাবার
জন্তেই তাঁর আবির্ভাব। তাই তিনিই হেতু সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই
রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ যেন ঠিক 'সর্প হয়ে দংশন, ওঝা হয়ে
ঝাড়ে'। আমরা তা' বুঝি না বলেই চঞ্চল হই। তিনি সর্বব্যস্ত
'স্বত্বদী', এই জন্তই ত বলি-তিনি ঈশ্বর। কেননা ভগবান পতঞ্জলি
বলেছেন—“ক্লেশ-কর্ম-বিপাকাশয়েরপরানুষ্ঠঃ পুরুষ-বিশেষঃ ঈশ্বর।”—
অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা যিনি বিচলিত বা চঞ্চল
হন না, সেই পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। ভগবান পতঞ্জলি-বর্ণিত ঈশ্বরের
এই লক্ষণটি অসীম আকাশের কোন অমূর্ত দেবতা সম্পর্কে প্রয়োগ করা
যায় না, বরং মনুষ্যদেহধারী কোন পরম পুরুষকেই বোঝায়।

বাঁট হোক, সাময়িক ভাবে চঞ্চল ও ব্যাধিত হলেও কোন কোন
মহাপ্রাণ ভ্রাতারা ধারাবাহিক ভাবে সেখানে অর্থ প্রেরণ করছেন, আবার
কোন কোন ইষ্টগত-প্রাণ ভ্রাতা মেয়ের বিবাহের জন্ত সংগৃহীত অর্থ,
কিবা তাঁহাদের নববীপের বাড়ী বিক্রী করেও ঐ অর্থ পুপুন্যকীর্তে
পাঠ্যবার মহান সঞ্চয় করলেন। কিন্তু বাবামণি এ সঞ্চয় জানামাত্র
তাঁদের বারণ করেছেন, তিনি ত বারণ করবেন-ই, কিন্তু অন্তরের
যে শুদ্ধ, সাত্বিক ভাব থেকে তাঁদের এবাষদ্য বাসনা জন্ম নিয়েছিল,
সেই শুদ্ধ সেই সাত্বিক ভাবটি আমাদের প্রত্যেকের চাই। পরিমাণ
দিয়ে দান বা ত্যাগের মূল্য নিক্রপিত হয় না; হয় ভাব বা spirit
দিয়ে। একটি গল্প বলি শুনুন,—

একবার হজরত মহম্মদ তাঁর শিষ্যগণের নিকট কিছু অর্থ চাইলেন
ধর্মপ্রচারের জন্ত। শিষ্যদের কেহ কেহ নিজ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ
কেহ বা অর্দ্ধেক, কেহ বা সম্পত্তি হজরতের হাতে ভুলে ধরলেন। এর

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[২ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩১২

মধ্যে এক অতি বৃদ্ধা লাঠি ভর করে কাঁপতে কাঁপতে হজরতের কাছে এসে হজরতকে একখানি আধ-পোড়া রুটি ও কয়েকটি খেজুর দিয়ে গেল। হজরতের পূর্বোক্ত শিষ্যগণ বৃদ্ধার দানের বাহার দেখে মুগ্ধ টিপে হাসতে লাগলেন। হজরত তা' লক্ষ্য করে বল্লেন—“দেখ হে, আমি এক চমৎকার খোয়াব দেখছি। এক দেবদূত নিক্তি-হস্তে দাঁড়িয়ে আছেন। নিক্তির একদিকে রয়েছে তোমাদের প্রদত্ত অতুলঐশ্বর্য আর অপরদিকে ঐ দরিদ্র বৃদ্ধার রুটি ও খেজুর। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এমন নিক্তির রুটি-খেজুরের দিকটাই ভারী”। এই কাহিনী কি ইহাই ইচ্ছা করে না যে, দানের পরিমাণ দিয়ে দানের যথার্থ মূল্য নিরূপণ হয় না, হয় তাহার পশ্চাতে যে, শুদ্ধ, মহৎ ভাবটি থাকে তা' দিয়ে। অতএব, আমর, ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী মঙ্গলবাহের জর ধারাবাহিক ভাবে অর্থ সাহায্য প্রেরণ করতে থাকি। শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধ রচনার কার্ণে বনের কাঠবিড়ালীও তার যোগ্য সহায় করেছিল। আমরাও আমাদের সাহায্য—সে যতই ক্ষুদ্র হোক, তা নিয়মিত ভাবে প্রেরণ করবো—এই হবে আমাদের অঙ্গিকার সম্মেলনের পবিত্র সঙ্কল্প।

এবারে দক্ষিণ ভারতের একটি ছোট্ট গল্প শুনুন। একবার ডক্টর মুনী চাটার্জি এবং তাঁর দুই বন্ধু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন সেখানকার প্রসিদ্ধ মন্দির ও তীর্থস্থান সমূহ দর্শন সমাপন করে তাঁর তাজোর যাত্রা করেন। ট্রেন মন্দির গতিতে চলছে, পথও দীর্ঘ তাই ভ্রমণটি তাঁদের কাছে অত্যন্ত একঘেয়ে ঠেকছিল। এমন সময় একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে ট্রেন এসে থামল, সঙ্গে সঙ্গে একজন যাত্রী তাঁদের কামরায় এসে ঢুকলেন। তাঁর কটিদেশে সামান্য একখানি বস্ত্র, নগ্নপদ পুত্তি মস্তক, এবং হাতে সিন্দূর-চিহ্নিত একটি ঘটি। নবাগত যাত্রীটি কামরায়

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৩১৩

একপ্রান্ত হ'তে অত্র প্রান্ত পর্যন্ত তামিল ভাষায় অনর্গল কি সব বন্ধুতে বন্ধুতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অত্যাগত যাত্রীরা ঐ ঘটির মধ্যে এক পয়সা দু'পয়সা করে ফেলে দিতে লাগলেন। শুধু দিলেন না কিছুই, আমাদের বাঙ্গালী তিন জন যাত্রী, বরঞ্চ লোকটি ভিক্ষা করতে এসেছে জেনে তাঁদের অন্তর বিরূপ হয়ে উঠল। পার্শ্ববর্তী এক সহযাত্রী তাঁদের হাব-ভাব বুঝে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলেন। তাতে ডক্টর চার্জি এবং তাঁর বন্ধুদ্বয় যা' বুঝলেন তা' এই যে, লোকটি পেশাদারী ভিক্ষুক নহেন বরং সেই অঞ্চলের একজন অতি ধনবান শ্রেষ্ঠী। তিনি তাঁর ইষ্টদেবতার জগ্ন মন্দির নির্মাণ করবেন। তজ্জগ্ন প্রয়োজনীয় অর্থও তাঁর রয়েছে, তথাপি পুণ্যকর্মে সকলেই অংশগ্রহণ করুক, সকলেরই এ মন্দিরের উপর অধিকার থাকুক, এই পবিত্র ইচ্ছা নিয়ে তিনি জনসাধারণের কাছে অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করছেন। ডক্টর চার্জি ও তাঁর বন্ধুদ্বয়ের চোখের উপর থেকে যেন একটি পর্দা সরে গেল। তাঁরা ভারতের এক শাস্ত্র আত্মার মনোহর রূপ প্রত্যক্ষ করলেন এবং ঐ ঘটির মধ্যে কয়েকটি পয়সা ফেলে দেবার সুযোগ লাভ করে ধন্য বোধ করলেন। ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, যে শাস্ত্র অর্জন করলে বিশ্বের সকল শক্তি করায়ত্ত হয়, আমাদের বাবামণি সেই শক্তির আধার। তিনি আমাদের সাহায্য ব্যতিরেকেও মঙ্গল বাঁধের কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু তাঁতে তাঁর গৌরব বাডলেও আমাদের গৌরব একেবারেই ছাড়ে। পুণ্য কর্মে সকলেরই কিছু কিছু অংশ থাক, তাঁর সম্মান বর্গের হস্তের মঙ্গল স্পর্শে মঙ্গল বাঁধ নির্মিত হোক, তাঁর সম্মানেরা ভারতের বুকে এক বিরাট কীর্তি-স্তম্ভ স্থাপন করুক,—ইহাই তাঁর কাম্য। তিনি নিজের জগ্ন কখনও কিছুই চান নি, আর চাইবেনও না। মঙ্গল বাঁধের সহায়তা করে আমরা আমাদের গুরুকে সহায়তা দিচ্ছি, সহায়তা দিচ্ছি

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[২ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩১৪

বিশ্বমানবকে। আমাদের সঙ্কল্প জগন্মঙ্গলের সঙ্কল্প। আজ যখন জগন্মঙ্গলেরই একটা সুযোগ আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন কেন আমরা তা' গ্রহণ করবো না?

শ্রীশ্রীবাবামণির জীবন যেন অষ্টাদশপর্ব মহাভারত। মহাকাব্যেরই গরিমা তাঁর জীবনের অধ্যায়ে অধ্যায়ে অভিভ্যাক্ত। মহাভারতের অষ্টাদশ-পর্বব্যাপী অস্ত্রের ঝঙ্কারের মাঝ থেকে ছাপিয়ে উঠছে বৈরাগ্যের কলস্র। শ্রীশ্রীবাবামণিরও জীবন নিশ্চল বৈরাগ্যে উজ্জ্বল। এই দিব্য জীবনে সবকিছু ছাপিয়ে উঠছে তাঁর দীপ্ত পৌরুষ। মহাকাব্যেরই মত মহিমামণ্ডিত এই পৌরুষ, এই তুল্লভ সম্পদই তিনি রেখে যাবেন আমাদের ভক্ত। তাঁর জীবন বিদ্রোহীর জীবন। তা'ই না “জীবন-রঙ্গ-ভূমির প্রান্ত পর্যন্ত জয়ধ্বজা নিজের দ্বন্ধে একাকী বহন করে নিয়ে চলছেন” কিন্তু তাঁর বয়স হয়েছে। নারায়ণের অবতার হ'লেও দেহদ্বন্দ্বের তিনি অপদীন। আমরা কি তাঁর বোঝার অংশ গ্রহণ করবো না?

তাঁর প্রতিটি কাজে আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্ত স্বাক্ষর। কর্তব্যে দৃঢ় সঙ্কল্প, সুস্থির, নিন্দা-আঘাতে আত্মস্থ। নিকাশিত তরবারির ত্রায় তিনি উজ্জ্বল, অভ্রংলিহ অনলের ত্রায় তিনি দীপ্যমান, তাঁর কাছে আমাদের স্বার্থ শেষ নেই। এখাগ শুধু সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাধনার ক্ষেত্রে নয়, এখাগ জীবনের ক্ষেত্রেও। তাঁর জীবন সাধারণ সন্ন্যাসীর জীবন নয়, এ জীবনবেদ। আত্মবিস্মৃত জাতির বাঁচবার পক্ষে এ জীবনবেদ পাতের প্রয়োজনীয়তা আছে। এ প্রয়োজন কোনদিনই শেষ হবার নয়। তাঁর জীবন-চরিত অনুধ্যানে আমরা পাই প্রেরণার শাস্ত্রত উৎস, অগ্রগতির সার্থক দিগ্‌নির্দেশ। তা'হলে আসুন, আমরা তাঁর অভীক্ষা পূরণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হই এবং প্রণাম করে বলি—‘নমস্তুহস্ত, তোমাতে আমাদের প্রণাম সার্থক হোক।

শিলং

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র পালচৌধুরী

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

০১৫

একটি দিনের পুণ্যস্মৃতি

লঙ্কা-সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিলাম। দেখিয়া আসিলাম—দিগন্ত বিস্তৃত শত্রু প্রান্তরের মধ্যস্থিত লঙ্কাতে একটি ছোটখাট শহর গড়িয়া উঠিয়াছে, আর তাহারই সহজ সরল অধিবাসীগণ নব-কিশোর বৃক্ষের অন্তরালে বাঁদিয়াছে তাহাদের শান্তির নীড়। দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম—পল্লবদন তমাল বৃক্ষছায়ে অখণ্ড-মন্দিরে যেন আকাশের প্রচ্ছদপটে আঁকা প্রাণজুড়ান শ্রীশ্রীঅখণ্ড বিগ্রহ, আর সেই বৃক্ষশাখে কোকিলের কণ্ঠে কণ্ঠে তাহারই স্তুতিগান। দেখিয়া আসিলাম লঙ্কাতে ঋতুরাজের রাজত্ব—বাহা দৃষ্ট হয় না এতদঞ্চলে আর কোথাও।

আরও দেখিলাম—একাগ্রতা, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের প্রাণভরা দরদ, পরস্পরের প্রতি আনন্দোচ্ছল প্রেম-ভালবাসার আদান-প্রদান, একই পরম পিতার দুরাগত সন্তানদের সম্মেলনের আনন্দ-মেলায় পরস্পরের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য-বোধ, স্নেহপ্রেমানুরাগের অভিব্যক্তি, সংঘের প্রতি অক্লিম মমত্ববোধ এবং ত্যাগের অনড় সংকল্প, সর্বোপরি সংঘাধিপতির প্রতি অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং আনুগত্য। সকলেই মনে প্রাণে অনুভব করিলাম—এই সবই ত অখণ্ড-সম্মেলনের অত্যাৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ্য অবদান এবং ইহার প্রেরণা অমূল্য সম্পদরূপে অখণ্ডদের জীবনে স্থায়ী এবং অটুট ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারিলে মঙ্গলবাঁধের সমস্তা একটা সহজ-সাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে, পরন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠান এমন এক অকল্পনীয় প্রতিভা-সমারত হইয়া অপ্রতীত গতিতে গড়িয়া উঠিবে—যাহা শত শত বৎসরের কুসংস্কারের প্রচণ্ড আঘাতেও ধ্বসিয়া পড়িবে না।

মাহা বলিব আশা করিয়া গিয়াছিলাম, সম্ভবতঃ তাহা বলিতে

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩১৬

পারিয়াছি। যাহা শুনিব আশা করিয়াছিলাম, তাহার অধিক শুনিতে পাইয়াছি, যাহা পাইব আশা করিয়াছিলাম, তাহার অধিক মনে রাখিয়াছি। নানাবিধ বিপদ-বিপত্তির মধ্যে অক্লেশে বাতায়ত করিতে সমর্থ হইয়াছি, বিষমের সপেক্ষে আবেষ্টনীর মধ্যে সারারাত্রি নিদ্রা গিয়াছি। ফিরিব পথে ঘোরহাটে অসাবধানতা বসতঃ চশমা হারাইয়া আসিয়াছি, তাহাও সম্প্রতি ফিরিয়া পাইয়াছি। যেই পরম প্রভু কৃপায় এত সব সম্ভব হইল, তাঁহার রাতুল চরণে আমার সংখ্যাতীত ভক্ত্যাগ্নুত প্রণিপাত। মানুষের জীবনে অর্থ কিন্তু দু-দিনের, স্মৃতির মাধুর্য্য অবিনশ্বর। লক্ষা-সংগেলনের স্মৃতি আমার জীবনে অবিস্মরণীয়।

অখণ্ড-সংগেলনের সফল এবং প্রয়োজনীয়তা সমবেত সকলেই স্বার্থ অনুভব করিলাম। অতএব বলিব, এখন ছোট বড় সকল স্থানেই সংগেলন হওয়া একান্ত উচিত। প্রতি গ্রামের অখণ্ডগণ মিলিত হইয়া যেন পরামর্শে বসেন।

আমাদের মধ্যে আজ কাহারও পিছাইয়া থাকা চলিবে না। দরিদ্র-গণকেও যেমন আগাইয়া আসিতে হইবে তাঁহাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের সহযোগে লইয়া, ধনীদিগকেও তেমনি সাধারণ চূড়ান্ত সীমায় বাইতে হইবে বৈ। ভরা বর্ষার পূর্বেই মঙ্গল বাঁধের re-construction (ভগ্ন-সংস্কার) বিপদ সীমা পার করিয়া দেওয়া যায়। এ বিষয়ে অবহেলার পরিণাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং শোচনীয় হইবে।

বর্ষাকাল জুড়িয়াও পুপুন্যকীতে কাজ চলিতে থাকিবে অবিরাম শরীর একটু ভাল হইলেই বাবামণি ৪ঠা জুলাই পুপুন্যকী বাইবেন এবং সেখানে কয়েকদিন কাজ কর্ম পরিচালনা করিয়া পুনরায় স্বাস্থ্যোন্নয়ন

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

Our Language Problem

প্রতিধ্বনি

317

জন্তু মূষরী চলিয়া যাইবেন। পূজার পূর্বে পুপুনকী ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই।

অতএব পুপুনকীর প্রস্তাবিত সম্মেলন ১৮ই আশ্বিন না হইয়া ১২ই পৌষ খ্রীশ্রীবাবামণির শুভ জন্মদিনে অনুষ্ঠিত হইবে। সুতরাং সেই ভাবেই চারিদিক হইতে সকলের প্রস্তুতির প্রয়োজন।

তিনমুকিয়া

শ্রীব্রজনাথ মজুমদার

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ সন।

সম্পাদক, অখণ্ডমণ্ডলী, তিনমুকিয়া

Our Language Problem

Our leaders in the Lok Sabha by a majority of votes have decided to accept Hindi as our official language and their decision has won the sanctity of constitutional provision. But the seeds of contention remain dormant since the very day when the matter was discussed in the Congress Assembly Party meeting and the party representatives were equally divided on the point. Eminent scholars, scientists, linguists, litterateurs, politicians from all parts of the country raised their voice against this discriminatory provision in the fear of disruption of national unity and its being detrimental to the national prosperity. The jubilation of newly attained freedom prompted many to keep silence on the matter though an uncanny feeling of appre-

hension haunted over their minds. A special mention may be made here in this connection of a very recent statement of Dr. S. K. Chatterjee in course of an interview with the Press Representatives that the attempt at imposition of Hindi will undoubtedly disrupt the cultural as well as political unity resulting in the loss of independence of India.

Dr. Chatterjee was appointed Chairman of the Sanskrit Commission as well as a member of the Official Language Commission, and people know well about the unanimous decision of the Sanskrit Commission recommending acceptance of Sanskrit as one of the Official Languages of the Union under limitation of scope granted to this Commission, as well as the dissension statement submitted by him along with one other member expressing their concerted views against acceptance of Hindi as the only official language of the country, giving vent to the popular feelings prevalent throughout the country, which they could realise in course of their tour as members of the Commission. Dr. Chatterjee was the only person who had the widest scope of coming in contact with the people particularly in the question of language problem as none else was a member of both the Commissions. Hence, views expressed by him should be given due weight. More so, when we can realise the fact that Dr. Chatterjee was the only member

both the Commissions with world-wide fame as a linguist. Both the facts outweigh the opinion of other members of the Official Language Commission. Yet the politicians win over the greatest linguist of the day on language problem. As a result discontent has grown to an enormous extent and meetings and conferences were held in different parts of the country expressing clear proof of popular feelings in different shapes against acceptance of Hindi as the only Official Language of this multi-lingual country with a few regional languages definitely more developed than Hindi.

One such meeting attended by 35,000 people from all parts of the country was held at Dhubulia in Nadia district in West Bengal in the year 1957, presided over by a great saint and reformer Swami Swarupananda Paramahansa who is deemed to be the originator of the movement, demanding acceptance of Sanskrit as national language of Indian Union. Though a preacher; his propagation is not from a priestly attitude but purely from patriotic viewpoint. On subsequent occasions he has expressed his stand-point in unequivocal voice that language cannot be an inseparable factor with religion. Language is the medium of expression, be it religion, education administration or whatever else. Sanskrit is not the monopoly of Hindus. The literature and the vast realm of thought it covered, embodied the whole

mind of India. It is true that conservative minds often turn to the authorities in Sanskrit to buttress their opinion but there is nothing special to Sanskrit. Equally authoritative texts may be quoted from English or French to justify reaction. It is undeniable that authoritative texts can be found in Sanskrit to justify progressive views. Hence the fear of conservatism is baseless.

The movement thus started by the great saintly reformer is followed by the spontaneous movements throughout the country and the recommendation of the Sanskrit Commission as well as dissemination statement of Official Language Commission added fuel to the fire. Just after a year an all-India organisation-Akhil Bharatiya Sanskrita Rashtrabhasa Sammelanam has been established to arouse public opinion. On the other hand patriots began to think more deeply to find out ways to counter-act fissiparous tendencies arising out of the language problem. Even a section of the Congress members of Lok Sabha thought it prudent to re-consider the position and in the long run we find that a bill has been introduced in the Lok Sabha to amend Article 343 of the Constitution by adding the words "and Sanskrit" after the word "Hindi" in Clause (1) of that Article by Sri Chapala Kanta Bhattacharya an M. P. of the Congress group. In the event of this amendment having been accepted both Hindi and Sanskrit will be the Official Languages.

Ever since the publication of the news of this timely move, it is gaining support more and more day by day from all quarters. Of all the statements made in the Press during this short period in support of the move I cannot but quote a few lines from one made by Dr. S. K, Chatterjee, Sri Deva Prasad Ghosh, Sri P. N. Banerjee and others wherein unassailable reasons in favour of Sanskrit have been given in a nutshell. "This is a very appropriate and timely move which should receive support from every quarter. Sanskrit is an All-India language and has won international recognition. Acceptance of Sanskrit as an official language does not confer any particular advantage to any particular group or region.

"The bill is in pursuance of one of the most important recommendations of the Sanskrit Commission, e. g. that Sanskrit should be accepted as an additional official language.

"Sanskrit has a great unifying force and the proposed amendment will undoubtedly arrest the growth of fissiparous tendencies and linguistic parochialism which are at present threatening the unity of India. At the same time it will enrich all the regional languages of India."

In spite of the fact stated above it is true that there is little support in favour of Sanskrit on the part of our leaders, who run the administration.

But this lack of support is not from any reasonable point of view but absolutely due to the fact that they themselves do not know the language. We may have a clear proof of this from the very fact that no State has yet introduced the State language in official work. This is also clear proof why a large number of leaders support English to be retained as the official language. They think of themselves alone, they think of their interest neglecting that of the multimillions, they think of the present state of affairs only. They do not think about 95 % of those who are virtually illiterate, they cannot think of the future generation.

The charge that Sanskrit is difficult to learn is based on ignorance about the language. I do not like to narrate here the bold statement of Pandit Vishnu Sharma who was able to educate the dull sons of the King in six months' time but I cannot but state that even a boy of seven reading in class-II in Sanskrit Collegiate School, Calcutta can converse in Sanskrit. It can be demonstrated publicly. It is no doubt difficult to be well-versed in Sanskrit because of its infinite resources and it is equally true that to be well-versed in any language is a difficult job.

One may be conveniently ignorant about the wonderful achievement made in the field of

science during the golden age of India which is amply proved by the contributions she made to Algebra, Chemistry, Astronomy, Medicine, Surgery, Aeronautics etc. through the medium of Sanskrit, yet none can deny the fact that the store-house of Sanskrit vocabulary which stands supreme, is quite adequate to carry on the administration as well as scientific researches.

The charge that Sanskrit is a dead language is out of date now. After the report of the Sanskrit Commission the fact that it is widely cultured from time immemorial till this day throughout the length and breadth of this country cannot be denied. The fact that it can be spoken of with equal ease and speed is proved from speeches made by thousands of speakers in course of these few years of language controversy. These speeches are in no way inferior to those in English or in any other language. That it is used as mother tongue in a considerable number of families may be proved from the Census Report of 1951. If the epithet 'Dead' were applicable to a language, it may be said that Hebrew is more dead a language than either Greek or Latin and there can be no comparison with

Sanskrit. Yet the Israelites, due to love of their culture and creed and being true to their national prestige, accepted their own language of the hoary past, disregarding all possible disadvantages, and virtually they have overcome the initial difficulty in so short a period accelerating their progress by leaps and bounds. Will Indian leadership be wise enough to take lessons from Israel with so highly developed a language as Sanskrit and thereby ensure the future all-round prosperity of India dispelling the possibility of disrupting the unity of the republic ?

In recent years linguistic parochialism threatened the unity of the country more than once and the recent happenings in Assam once more remind us of the urgency of early solution of the language problem. Neither Hindi nor English nor a group of regional languages can solve this intricate problem. There can be no denying of the fact that Hindi is not only a regional language, howsoever large may the region be ; it lacks in resources also to attract esteem of the people of other linguistic groups. To retain English is not only derogatory to our national prestige, as admitted even by our progressive-minded Prime Minister Shri Nehru, but

it will also be detrimental to the all-round progress of this country where 95 % of the people are virtually illiterate and there is no affinity of this language with any of the regional languages. To accept a group of languages is impracticable as there can be no limitation of such languages without creating discontent to this or that region or group.

Judging from all points of view, the only solution of this intricate problem is acceptance of Sanskrit as an official language, as it is the one common national inheritance of India. When we talk of our national genius being unity in diversity, the fundamental oneness of the Indian mind, what we are really meaning is the dominance of Sanskrit which overrides the regional differences and linguistic peculiarities, and achieves a true national character in our thoughts and emotions and even gives form and shape to the languages. The unity of India will collapse, virtually it is on the verge of collapse, if it breaks away from Sanskrit and the Sanskritic tradition.

Hence, this appeal to the Members of Lok Sabha, who are the representatives of the people, to support the bill introduced by Shri Chapala Kanta Bhattacharya as stated above. Our earnest

326

appeal specially to those members of Lok Sabha whose mother tongue is Hindi is to support the bill in the name of equity and justice. Our appeal also to the conscientious public is to support the bill.

Before we conclude let us quote the immortal verse of Professor Wilson, a distinguished foreign scholar, to show how inseparably is this language connected with the very existence of the country itself—

यावद् भारतवर्षं स्यात् यावद् विन्ध्यहिमाचलम् ।
यावद् गंगा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम् ॥

"Yavad Bharatavarsham Syat

Yavat Vindhya-Himachalam

Yavad Ganga cha Goda cha

Tavadeva hi Sanskritam.

As long as India will exist, as long as the Vindhyas and the Himalayas will stay, as long as the Ganges and the Godavari will flow, so long will Sanskrit last.

STATEMENT

A Bill, to amend Act 343 of the Constitution by adding the words "and Sanskrit" after the word "Hindi" in clause (1) of the Article, was introduced in the Lok Sabha on 16-4-60. by Shri

Chapala Kanta Bhattacharya M. P. The effect of this amendment, if accepted, will be that both Hindi and Sanskrit will become the official languages of the Indian Union.

This is a very appropriate and timely move which should receive support from every quarter. Sanskrit is an All-India Language and has won international recognition. Acceptance of Sanskrit as an official language does not confer any particular advantage to any particular group or region.

The Bill is in pursuance of one of the most important recommendations of the Sanskrit Commission, e. g. that Sanskrit should be adopted as an additional official language.

Sanskrit has a great unifying force and the proposed amendment will undoubtedly arrest the growth of fissiparous tendencies and linguistic parochialism which are at present threatening the unity of India. At the same time it will enrich all the regional languages of India.

Sd/ Swami Swarupananda Paramhansa

Sd/ Suniti Kumar Chatterji.

Sd/ Nalini Ranjan Sen Gupta.

Sd/ Devaprasad Ghosh.

Sd/ Rishindra Nath Sarkar.

Sd/ Pramatha Nath Banerjee.

Sd/ Ramaprasad Mukherjee.

প্রতিধ্বনি

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩২৮

ধৃতঃ প্রেমা

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
লিখিত সমসাময়িক পত্রাবলী]

(৫৬০)

হরি-ওঁ

বারাণসী

৮ই বৈশাখ, ১৩৩৯

পরমকল্যাণভাজনেযুঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা মেহ ও আশীর্বাদ জানিও।

টেলিগ্রাম একটা পাইয়াছিলাম, বাহাতে প্রেরকরূপে তোমার নাম ছিল। বিষয়টা সর্বজনীন প্রয়োজনের, তাই তোমার অজ্ঞান সারেও কেহ তোমার নাম দিয়া ঐ টেলিগ্রাম করিয়াছে বলিয়া কোন গুরুতর অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, মনে করি না। টেলিগ্রামের প্রেরক হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, বিষয়টা যখন গুরুতর, তখন একাকী 'তঁহার' নাম প্রেরকরূপে থাকিলে আমি হয়ত ততটুকু মনোযোগ না দিতে পারি। অথবা তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে টেলিগ্রামের বিষয়ে গুরুত্ব-সংযোগের জন্ত 'যাঁহার' নাম সংযোগিত হইতেছে, দেখা হইবা মাত্রই তঁহার অনুমতি লইয়া বিষয়টার মীমাংসা করা যাইবে। আমার মনে হয়, এই জাতীয় ব্যাপারে সাধারণ জনম্যালিটিকে অতিরিক্ত বিচার ও গবেষণায় না আনা ভাল। সব চাইতে অবশ্য ভাল হইত, যদি টেলিগ্রামের প্রেরক আগেই তোমার সম্মতি নিত। কাজটা করিতেন। কিন্তু তাহা যখন করা হয় নাই, এবং ইহার ফল

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেম

প্রতিধ্বনি

৩২২

অন্য কোনও বিভ্রাট ঘটন সৃষ্ট হয় নাই, তখন এই ব্যাপারটাকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়া আগল কাজের দিকে বেশী লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

এখন তোমাদের সমক্ষে যে কাজটী আসিয়া হাজির হইয়াছে, তাহা তোমাদের সকলের সম্ভবদ্ব শক্তি প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে। কাজ ধরিবে অথচ সফলতা আসিবে না, ইহা বড়ই অমর্যাদাকর ব্যাপার। তোমাদের মধ্যে মনের ও মতের মিল আসা একান্তই দরকার। যেই সময়ে একটা কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সেই সময়ে এই সকল যুক্তি দিয়া দূরে সরিয়া থাকা পাপ যে, অমুকের ক্ষমতালিপ্সা অধিক, অমুকে নির্দোষ ভাবে কাজ করিতে পারে না, আমার ব্যবহার কর্কশ, আমার হুজুগপ্রিয়তা অপ্রীতিকর, ইত্যাদি। এক একটা অনুষ্ঠানের এক একটা সময় আছে। অনেক চেষ্টা করিয়া যে অনুষ্ঠানটী এত দিন করিতে পার নাই, হঠাৎ এমন হইয়া যায় যে, তুমি অপ্রস্তুত, কিন্তু কাজটী করিবার সুযোগ আসিয়া গিয়াছে, এমন কি তোমরা যদি সুযোগ গ্রহণ নাও কর, অত্রে তাহা অবশ্যই করিবে। এই সকল সময়ে সহকর্মীদের দোষগুণ বিচার করিয়া কাজ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা এক প্রকারের কাপুরুষতা মাত্র। এই দোষ তোমার মধ্যে কেন আসিবে?

তোমাদের গুণানকার সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান হয়ত শেষ হইয়া আসিবে, এমন সময়ে তুমি আমার পত্র পাইবে। সুতরাং আমার এই পত্র হইতে যদি কোনও উপদেশ সংগ্রহ করিতে পার, তাহা হইলে তাহা কাজে লাগাইবার আর সময় রহিল না। তাই আমি আশা করিতেছি যে, সাফল্য অসাফল্য তোমাদের যাহাই হইয়া থাকুক, তুমি কাজের সময়ে নিজেকে বিলম্ব করিয়া রাখিয়া ভ্রমের অনুশীলন কর নাই।

তোমাদের গুণানকার মণ্ডলীটিতে একটা অতি অগুণ্ড ব্যাপার

প্রতিধ্বনি

ধ্বং প্রেম

[২ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৩০

আমাকে নিরন্তর মনঃপীড়া দিতেছে। তাহা এই যে, তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত অভিমানকে অতি উচ্চস্তরে তুলিয়া ধরাতে পরস্পরের দ্বিধা প্রেম জমাইতে পারিতেছ না। তোমাদের নিজেদের মধ্যে প্রেম নাই বলিয়াই অগাধ শত শত প্রেমিক পুরুষকে তোমরা আকর্ষণ করিতে অক্ষম হইতেছ। অথও ধর্ম যে অসাধারণ আত্মীয়তা লইয়া জনসমাজে আবির্ভূত হইয়াছে, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেমময় আচরণের অভাবে বাহিরের লোকের নিকটে তাহার কোনও আবেদন পৌঁছিতেছে না। পৌরহিত্যের দাপট, বংশধর্মাদার আশ্রয়, কুসংস্কারের অত্যাচার সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া যেই মানুষগুলি সাম্যের ধর্মের জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, তোমাদের পারস্পরিক আচরণের মধ্যে অহৃদয়তা দেখিয়া তাহারা বিব্রত করিয়া তোমাদের পানে আগাইতেছে না। ইহা কি তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ? দার্শনিকতার অভ্রান্ত উচ্চতার সহিত প্রেমের স্নেহকোমল আদ্রতার সামঞ্জস্যময় সন্দেশ তোমাদের ধর্মোই ছিল। কিন্তু তোমরা মানুষকে আকর্ষণে অক্ষম হইয়া যাইতেছে। তোমাদের এমন আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্বাদ
স্বরূপানন্দ

(৫৬১)

হরিও

বারাণসী

৮ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সারা বছর ধরিয়া সকলের সহিত শুভসংযোগ রক্ষা করিয়া চলিবে।

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৩৩১

অকারণে জীবনের মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার করিতে বলিতেছি না, কিন্তু নিজের প্রতিদিনকার কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবার ফাঁকে ফাঁকে চারিদিকের সতীর্থদের সহিত যোগাযোগ রাখিবে। এই যোগাযোগকে আড্ডাবাজিতে পরিণত হইতে দিবে না। এই যোগাযোগ হইবে শুচিশুদ্ধ, মূল্যবান ও প্রাণময়। ইহার সহিত বাহ্য আড়ম্বরের যেন কোনও সম্পর্ক না থাকে। তাহা হইলেই দেখিবে যে, একদিন একটা নিমেষের চেষ্টায় সকলের সকল শক্তি একটি স্থানে আনিয়া প্রয়োগ করা কত সহজ হইয়া যায়। সকলের সকল শক্তি, সকলের সকল প্রতিভা, সকলের সকল চেষ্টা, উত্তম ও উৎসাহকে একটা মাত্র লক্ষ্যে চক্ষুর নিমেষে নিয়োজিত করার সামর্থ্যেরই নাম সংঘশক্তি। তোমরা ইহার অনুশীলন ছাড়িও না।

অহমিকা না কমিলে সংঘশক্তির উন্মেষ সাধন হয় না। প্রতি জনে ব্যক্তিগত মান-অভিমানের বোধকে একটু কমাইতে চেষ্টা পাইও। চারিদিকে শত বাধা, সহস্র বিঘ্ন। ইহারই মধ্য দিয়া তোমাদের পথ কাটিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। পাহাড় দেখিয়াও থামিলে চলিবে না, অরণ্য দেখিয়াও ফিরিয়া আসা যাইবে না, আগাইতেই হইবে। হাতুড়ির ঘায়ে পাথর ভাঙ্গিয়া, কুঠারের চোটে জঙ্গল কাটিয়া তোমাদের চলিতে হইবে। বাধাকে মানিও না, বিঘ্নকে গ্রাহ্য করিও না।

সকল মানুষকে ভালবাসিবে। বাধাদানকারীরাও তোমাদের পর নহেন। সকল মানুষেরই উপকার করিতে চেষ্টা করিবে। সকল মানুষের ভিতরেই হৃদয়ভাবে তুমি বিরাজ করিতেছ, এই ভাবটী অন্তরে রাখিবে। তাহা হইলেই সর্বভূতের সেবা সহজতর হইবে। নিজের জীবনকে সকলের সুখের জন্ত উৎসর্গ করিবে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৩২

(৫৬২)

হরি-ওঁ

বারাণসী

পরমকল্যাণীয়াসুঃ—

৮ই বৈশাখ, ১৩৬৩

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার স্বামীকে আমার বিশেষ আশীর্বাদ দিও। আমার সহিত তাহার এখনও দেখাশাফাৎ বা কোনও পরিচয় হয় নাই। এমন কি, পত্রযোগেও তাহার সহিত আমার কখনও কোনও ভাববিনিময় হয় নাই। তোমার বিবাহের সংবাদে তোমাদের দুই জনকে যে আশীর্বাদ-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহার অতিরিক্ত পরিচয় আমার সহিত তাহার নাই। কিন্তু ইহা আমি নিশ্চিতই আশা করিতে পারি যে, তোমার মধ্য দিয়া তাহার সহিত আমার পরিচয় নিশ্চয়ই একটা স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। কুমারী-অবস্থায় দীক্ষা নিয়া তুমি নিয়মিত সাধন করিয়াছ। তোমাকে বিবাহিতা পত্নী রূপে পাইবার পরে নিশ্চয়ই তোমার স্বামী জীবনে এমন কোনও সম্পদ আহরণ করিয়াছে, বাহ্যিক জ্ঞাত তাহাকে কৃতজ্ঞ নয়নে আমার পানে দুই এক বার হইতেই তাকাইতে হইবে। ইহা আমি প্রত্যাশা করিতে পারি। আগে আমি কুমারী মেয়েদের দীক্ষা দিতাম না। কারণ বিবাহের পরে কে কেম স্বামীর সঙ্গ পায় কেহ জানে না, হয়ত স্বামীর মতের সহিত ঋদ্ধি মতামত না মিলার ফলে সংসারে অশান্তি হইতে পারে। কিন্তু কয়েকটি কুমারী কি করিয়া দীক্ষিতা হইয়া গেল এবং তাহারা সাধন ভোজনে করিতে লাগিল। ইহাদের বিবাহের পরে দেখা যাইতে লাগিল যে, ইহারা ইহাদের স্বামীদের উপরে কল্যাণপ্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইতেছে। ইহার পর হইতে আমি সেই সকল কুমারী মেয়েদের

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

LIBRARY
বৃত্ত প্রেমা

No.

প্রতিধ্বনি

৩৩৩

দীক্ষা দিতে আর আপত্তি করি নাই; বাহাদের পিতামাতার সম্মতি পাওয়া গিয়াছে। তুমিও বিবাহের আগে অনেক সাধন-ভজন করিয়াছ। তুমি কি তোমার স্বামীর মনের উপরে কোনও কল্যাণ-প্রভাবই বিস্তার কবিতে পার নাই?

তোমার স্বামীকে আমার বিশেষ আশীর্বাদ দিবে। স্বামী ও স্ত্রী দুই জনে মিলিয়া সংসারকে মধুময় করিয়া তোল। তোমাদের দুই জনের জীবনের মহনীয় দৃষ্টান্ত সমূহ তোমাদের শিশুদের জীবনকেও সুন্দর ও সহজ করিয়া তুলুক। একে অপরকে ভালবাসে না বলিয়াই ত অধিকাংশ সংসারে স্বামি-স্ত্রীর আচরণের মধ্য দিয়া সন্তানগণের নিকটে গৃহিত দৃষ্টান্ত সমূহ উপস্থাপিত হইয়া থাকে। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে প্রাণ দিয়া ভালবাস। ভালবাসা-জীবনের পরম সম্পদ, এই সম্পদ হইতে তোমাদের যেন জীবনে একটি দিনের জ্ঞাও বঞ্চিত হইতে না হয়। দুঃখ-সংঘাত-ময় সংসারে তোমরা একে অপরকে পক্ষপূট দিয়া আচ্ছাদন করিয়া ঝড়ের ঝাপটা হইতে রক্ষা কর। স্বামী কেবলই প্রভু নহে, সে একটি অরক্ষিত অসহায় শিশুও। স্ত্রী কেবলই দাসী নহে, সে একটি রক্ষাবিধাত্রী মহাশক্তিও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬৩)

হরি—ওঁ

বারাণসী

৮ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু:—

তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ভক্তিমতী সহধাম্বিনী আমাকে তোমার রোগশয্যায় শিয়রে

বলিয়া তোমাকে আশীর্বাদ করিতে দেখে বলিয়া লিখিয়াছে। আমি সেই তারিখে সেই সময়ে পুপুন্যকী আশ্রমে স্তুপীকৃত পত্রের জবাব দিয়া আস্ত ছিলাম। এই সময়ে আমার মনই তোমাদের অনেক কাছে ভ্রমণ করিতেছিল এবং আশিস বিলাইতেছিল। আমার শরীর ভাবে যাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি তোমার সহধর্মী যাহা দেখিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে। তাহা জাজ্ঞ্যমান সত্য এবং সত্যের জন্ত দায়ী তোমার ভক্তিমতী সহধর্মীগীর প্রাণভরা ভক্তি। বা চৈতন্য সবই ভালবাসার অধীন। তোমার সহধর্মীগীর ভালবাসা অকপট ও অকৃত্রিম। তাই আমাকে আমার স্থল দেহ লইয়া সেখানে দূরে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছে। ইহাতে আমার কোনও দুঃখ বা মহিমা নাই। তোমাদের ভক্তিরই এখানে জয়জয়কার।

আমি আমাকে একটা পাঞ্চভৌতিক দেহধারী মানুষ মাত্রই মনে করি না। আমি বিশ্বের আত্মা। সর্বভূতের আমি পরমাশ্রয়, সর্বসৃষ্টির আমি বিধাতা। কিন্তু তোমরা আমার সহিত অভেদ-পরমাশ্রয় তোমাদের মধ্যে আমার খেলা চলিয়াছে, তাই তোমরা আমার তোমাদের কাছ হইতে আলাদা মনে করিতেছ।

শ্রীমতী শো— যাহা দেখিয়াছে, তাহা তাহারই সৃষ্টি। নিজেকেই দেখিয়াছে। আবার তুমি যে দেখিয়াছ যে শ্রীমতী তোমাকে অসাধারণ পরিচর্যা করিয়া বাঁচাইয়া তুলিল, তাহাও তোমার চোখের ভুল। আমিই তোমার পত্নী হইয়া তোমাকে রোগশয্যায় মতন গ্রহণ দিয়াছি, আমিই তোমার পত্নীর রূপ ধারণ করিয়া তোমার মলমূত্র কাচিয়াছি, তোমাকে ঔষধ দিয়াছি, পথ্য দিয়াছি, তোমাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছি। তুমি, আমি, তোমার পত্নী এই তিনটিই আলাদা অস্তিত্ব নহে। তুমি, আমি, তোমার পুত্রকণ্ঠাশ্রয়, ইত্যাদি

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

বৃত্তং প্রেম্যা

প্রতিধ্বনি

৩৩৫

আলাদা আলাদা অস্তিত্ব নহে। ইহারা সকলে মিলিয়া এক এবং অদ্বিতীয়, বাহাকে আমরা নাম দিয়াছি প্রণব বা ওঙ্কার। তুমি ওঙ্কার, তোমার পত্নী ওঙ্কার, তোমার শিশুরা ওঙ্কার, তোমার আত্মীয়বান্ধব সকলে ওঙ্কার, ইহাদের সকলকে একত্র লইয়া আমি ওঙ্কার। আমি যে মাঝে মাঝে তোমাদের দর্শন দেই বলিয়া অনুভব কর, তাহা এই ওঙ্কারেরই মহিমা। আলাদা করিয়া মনুষ্য-দেহধারী আমার ইহা মহিমা নহে।

তোমার গৃহে সমবেত উপাসনাতে অপ্রত্যাশিত ভাবে তোমার একটি গুরুভাই আসিয়াছিল জানিয়া সুখী হইলাম। ইহাদের অনেকের ভিতরে ব্রহ্ম জাগিবার জ্ঞান উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছেন। ইহারা জানে না যে, কত সামান্য যতনে ইহারা পরম রতন লাভ করিতে পারে। এই জ্ঞানই ইহারা সমবেত উপাসনার যতন আদরনীয় অনুষ্ঠানে এত দিন রুচি অনুভব করে নাই। তুমি ইহাদের সকলের রুচি আকর্ষণের জ্ঞান চেষ্টা করিও। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ভিতরে অশেষ মঙ্গলকর উপাদান সমূহ রহিয়াছে। ইহারা নিজেদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান্ নহে বলিয়াই সেই সকল উপাদান কাজে লাগিতেছে না। মৎসঙ্গ দিয়া ইহাদের অন্তরের আগ্রহকে পরিপুষ্ট কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬৪)

হরি-ভূ

বারাণসী

৮ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াস্তু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

পদে পদে তোমার ভক্তির পরিচয় পাইতেছি। তোমার ভক্তি

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৩৬

অমর হউক। অনুক্ষণ ওঙ্কার স্মরণ করিবে। আমি আর ওঙ্কার অভেদ। আমার প্রতি ধাবিত তোমার অন্তরের সমস্ত অনুবাসন নিঃশেষে ওঙ্কারে ঢালিয়া দাও। যেদিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিবে, যেখানে ওঙ্কারই দেখিবে। নিঃশ্বাসে ওঙ্কার, প্রশ্বাসে ওঙ্কার, শিথিল ওঙ্কার, জাগ্রতে ওঙ্কার, সর্বদা সর্বাবস্থায় ওঙ্কারই তোমার স্মরণীয় মননীয় হউক। আমার সম্পর্কে অলৌকিক ঘটনা সমূহের বর্ণনা করিয়া মানুষের মনে শ্রদ্ধা, সন্দেহ বা বিস্ময় সৃষ্টির কোনও চেষ্টা করি না। সকল শ্রদ্ধা, সকল সন্দেহ, সকল বিস্ময় ওঙ্কারকে লইয়াই হউক। সুদূর অনাগতে, যখন কল্পনা করিয়াও হয়ত আমার পার্থিব অস্তিত্ব সাদৃশ্য অনুমান করা যাইবে না, তখনও ওঙ্কারই থাকিবে আমার একমাত্র আধার। ওঙ্কারের সেবা করিয়াই মানুষ আমার সেবা করিবে। ওঙ্কারকে ভালবাসিয়াই জীবনে আমাকে ভাল বাসিবে। ওঙ্কার নিত্যসত্য সনাতন, ওঙ্কারই জগতের একমাত্র শরণা।

তোমরা অবতারবাদের দিকে ঝুঁকিও না। আমাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার দিকে তোমরা চেষ্টা-যত্নের অপচয় করিও না। অবতার রূপে প্রচারিত হওয়াটা এই প্রচারের যুগে সকলের জন্য সহজ কাজ। যে-কোনও একটা মতবাদ জোরের সহিত যদি কিছুকাল ধরিয়া প্রচার করা যায় এবং তাহাকে সমর্থন করিবার জন্য কয়েক জন মাত্র ধীমান্ নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করে, তাহলে কিছুকাল পরেই যে-কোনও সাধু-চরিত পুরুষ বা নারী অবতার রূপে গৃহীত হইয়া যাইতে পারেন। এ ভাবে এদেশে স্বল্পকালের মধ্যে অনেক মহাপুরুষ অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। জীবের ঘাহাদেও, দয়ার অন্ত নাই, এমন মহৎকে অবতার বলিয়া পূজা করি। লোকের ভালও লাগে। এইগুলি এই দেশের পক্ষে

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৩৩৭

মনস্তাত্ত্বিক তথ্য জানিও। আমি এই দেশের সকল শ্রেণীর নরনারীর সহিত একান্ত ভাবে মিশিয়া দেখিয়াছি যে, যে-কোনও ধর্মকে বিপুল ভাবে প্রসার দিতে হইলে এই দেশে অবতারবাদকে প্রাশ্রয় দিয়াই তাহা করা সহজতর। একটু বুদ্ধিপূর্বক যদি কয়েক শত বৎসরের ভারতীয় ধর্মজীবনের ও ধর্মান্দোলনসমূহের ইতিহাস অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে হয়ত এমন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যাইবে, যিনি জগতে অবতার প্রচারের জন্ত আসেন নাই, আসিয়াছেন, সকল মানবের মধ্যে আত্মিক সাম্যের বাণীকে প্রচার করিয়া যাইতে, কিন্তু অবস্থাদ্বীনে পড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত একজন অসাধারণ সাধক পুরুষকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার জন্তই সকল শক্তিসামর্থ্যকে প্রয়োগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহা এই সকল পূজ্যপাদ ব্যক্তিগণের কোনও ক্রটি নহে, ইহা এই দেশের ধাতের দোষ। গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার না করিলে যেন গুরুভক্তিই প্রদর্শিত হইল না, ইহাই হইয়াছে এ দেশের লোকের এক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি। অত্বেরা নিজ নিজ গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া কত সহজেই না নিজ সজ্জ্বর প্রসারকে বিপুল হইতে বিপুলতর করিয়া ফেলিতেছেন দেখিয়া কাহার না লোভ হইবে যে, নিজের গুরুকেই বিষ্ণুর বা শিবের অবতার বলিয়া প্রচার শুরু করিতে? অথচ হয়ত অবতার বলিয়া প্রচারিত মহাপুরুষ অপেক্ষাও দশগুণ ঐশ্বরিক প্রতিভা ধারণ করেন, তেমন একজন মহাপুরুষ, বাহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার জন্ত প্রতিভাশালী প্রচারকগণ আসিয়া গাঁড়ায় নাই বলিয়াই অনেকে চিনিতেও পারে নাই। অবতার, মঠ, মন্দির আদিই কেবল বাড়িয়াছে, মানুষের

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্যা

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৩৮

মনুষ্যত্ব বাড়িতেছে কৈ? মানুষের দেবত্বের সম্ভাবনা বাড়িতেছে কৈ?

তোমরা এই সহজ সত্যে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিও যে, অবতারবাদ তোমাদের প্রয়োজন নহে, তোমাদের জন্ত ব্রহ্ম নিজে স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া বলিয়া দিয়া গিয়াছেন যে, জীবে জীবেই আমি অবতার হইয়া আসিয়াছি, যত জীব তত অবতার হইয়াই আমি আবির্ভূত হইতেছি, কেবল আত্মদর্শন করিয়া সকলকে চিনিয়া লও।

তোমাদের সকলের কুশল সংবাদে সুখী করিবে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬৫)

হরিও

বারাণসী

৮ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্বাদ নিও।

তোমাদের অনেকেরই প্রেমপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। কিন্তু সকলে পত্রের যে জবাব দিয়া উঠিতে পারিব, এমন ত সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। সারা বৎসর যাহারা পত্র লেখে না, এই সময়ে তাহারাও মিলিত থাকে। সকলেই এক কণা আশীর্বাদের আকাজক্ষী। আমি অল্প প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ প্রতিজনকে করিতেছি। কিন্তু পত্রদ্বারা তাহা

প্রাণ, ১৩৩৭]

ধৃতং প্রেমী

প্রতিধ্বনি

৩৩৯

নাও হইতে পারে। বাহাদের নিকটে পত্র দিতে পারিলাম না, তাহাদের প্রতিজনকে আমার হইয়া আমার আশীর্বাদ বিতরণ-করিও।

তোমার পরিবারটীর প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে আমি বিরাজ করিতেছি। তাহাদের প্রতিজনের সেবার মধ্য দিয়া তোমরা আমাকে সেবা করিতেছ বলিয়া মনে করিও। তাহাদের প্রতি অন্তরের নিস্বার্থ প্রেম রক্ষা করিও। প্রেম যখন স্বার্থবারা কলুষিত হয়, তখন তাহার ভাগবতী মূর্তি মলিন হইয়া যায়। প্রেম সত্যই স্বর্গীয় বস্তু।

তোমার প্রতিটি গুরুভাই ও গুরুভগিনীকে জানাইও যে, তাহাদের নিজেদের মধ্যে পবিত্র প্রেমের অনুশীলন একান্তই আবশ্যক। তোমরা যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহ, এইটী তোমাদের প্রতিদিনকার আচরণের মধ্য দিয়া প্রমাণিত হওয়া চাই। তোমাদের উপাসনা, সমবেতভাবে এবং এককভাবে, সর্বদাই যেন পরম প্রীতির বর্দ্ধক হয়।

তোমাদের যেন কেহ পর না থাকে। তোমাদের যেন কাহারও প্রতি অমিত্রতা না থাকে। তোমাদের নিজেদের মধ্যে ত বটেই, অপরের সহিতও তোমাদের আচরণ সকল বিসম্বাদের উর্দ্ধে থাকা চাই।

আমি অবশ্য চেষ্টা করিব প্রতিজনকে আলাদা আলাদা পত্র দিতে। কিন্তু যদি না পারি? ইতি—

আশীর্বাদক

অরূপানন্দ

হরি-ও

(৫৬৬)

বারাণসী

১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

মেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার নববর্ষের প্রাণভরা মেহ ও আশিস নিবে।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তুমি বিগত ১৯ বৈশাখ হইতে এক বৎসরের জন্ত সংযমব্রত পালন করিবে বলিয়া ব্রতগ্রহণ হইয়াছে। ইহার চাইতে আনন্দের সংবাদ আর কি হইতে পারে? আমি তোমাদের বারংবার বলিয়াছি যে, ব্রহ্মচর্য্যই বলের উৎস। যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিবে, সে ততটুকু শক্তি আহরণ করিবে। এক দিনের ব্রহ্মচর্য্যও সেই এক দিনের মত কতকটা শক্তির সমান তোমাকে দান করিয়া যাইবে। এমন অনেক লোকই বর্তমান জগতে আছে, যাহাদের পক্ষে একটি দিনও সংযম-পালন করিয়া চলা সম্ভব নহে। আমি একটি দম্পতীর কথা জানি, যাহারা বিবাহের পরে প্রায় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একটি দিনও সংযম কাহাকে বলে, তাহা জানেন না। সংযম ইহাদের নিকটে এক অতি অসাধ্য ব্যাপার। সংযম ইহাদের বিচারে অতি অনাবশ্যক বিষয়। সংযমকে ইহারা উপহাসের সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই দম্পতী অনেকগুলি সন্তানের পিতা-মাতা হইয়াছে কিন্তু একটি সন্তানও তাহাদের দেখা যাইতেছে না। যাহার কাছে জগৎ কিছুমাত্র সেবা বা গৌরব আশা করিতে পারে পিতামাতার জীবনে নিজেদের বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়াস বা সেই প্রয়াস সাফল্য মাত্রও নাই বলিয়াই পুত্রকন্ঠাগুলি এই একটা বিষয়ে স্বভাবজাত সম্পদরূপেই কামুকতাকে আহরণ করিয়া লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। আবার আমি এমন কত দম্পতীর কথাও জানি, যাহারা লাগুত্বের সংযম-ব্রত পালন করিতে করিতে মাসিকব্রত পালনে সাহস পাইয়াছে। মাসব্যাপী সংযমে যে বল হইয়াছে, তাহার উপরে ভিত্তি করিয়া তাহার সম্ভবপরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের সাফল্য কোথাও কোথাও এমন হইয়াছে যে, এক বৎসর করিয়া পর পর বারোটি বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ইহারা অনুভব করিতে সমর্থ

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৩৪১

হইয়াছে যে, ব্রহ্মচর্যা পালন করাই মানুষের সহজ স্বভাব, কামোপভোগে রত হওয়াটাই একটা কৃত্রিম ব্যাপার। দুইটী শিশু পরস্পর দুই বৎসর একত্র বাস করিলেও পরস্পরের সহিত কামেন্দ্রিয়ের ব্যবহারে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রেরণা পায় না। ব্রহ্মচর্যা-ব্রতধারীরা ব্রহ্মচর্যা পালন করিতে করিতে এমন একটা অসামান্য অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়া যায় যে, তাহাদের আর মনেই থাকে না যে, দুইটী প্রাণীর জনেন্দ্রিয়ের ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন আছে। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকেরা হয়ত ইহা ধারণাই করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহা আমার নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা প্রত্যক্ষ সত্য। কয়েক বৎসর সংযম পালন করিতে করিতে দুইটী দম্পতী একেবারে ভুলিয়াই গেল যে তাহাদের উভয়ের শারীরিক মিলনের দ্বারা একটা জান্তব সুখ উৎপাদিত হইতে পারে, যাহার প্রলোভনে পড়িয়া জগতে কত জনে কত অসামাজিক অত্যাচার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেছে। এমন একটা দিব্য অবস্থা সত্যই আসে। ইহা কবির কল্পনা নহে। তবে এই অবস্থাটা আসিবার পক্ষে কেবল শারীরিক ব্রহ্মচর্যা পালনই যথেষ্ট নহে, অন্তরের দিক দিয়া সাধনের অনুরাগকে অধিকতর প্রাধান্য দিতে হয়। তোমাদের সম্পর্কেও আমি তত বড় আশা পোষণ করিতে পারি।

অতীতে তুমি বা তোমার মতন গৃহীরা যে জীবন যাপন করিয়াছ, তাহা অভ্যাসের দাসত্ব মাত্র। এতকাল ধরিয়া স্বামি-স্ত্রীর মিলনকে একেবারেই জান্তবস্তুরে নিয়া রাখিয়া চলিয়াছ, তাই অভ্যাসের দাসত্ব হেতু অনেক সময়ে প্রয়োজনের কোনও তাগিদ অনুভব না করিয়াও মিলিত হইয়া থাক। এই পরিবেশ ও পরিস্থিতি তোমার ভাবী সংযম-ব্রতকে যে অনেকাংশে দুর্বল করিতে চাহিবে, তাহা সত্য। তাই সংযম ব্রত গ্রহণের পর হইতে প্রথম কিছুকাল নিজেদের মধ্যে প্রায়

সকল ব্যাপারেই একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলা উচিত। কারণ, বাহাদেব নিত্য-সহবাস অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের পক্ষে অনাবশ্যক মাথা-মাখির ভাবটা পরিত্যক্ত না হইলে হয়ত সামান্য একটু তিল-প্রমাণ দুর্বলতা তালপ্রমাণ কদাচার সৃষ্টি করিয়া বসিবে। যাহা করিবার নয়, তাহা করিয়া ফেলিলে আর ধরিতেই পারিবে না যে, কোথায় চলিয়াছে। তাই নিজেদের শয্যা, বিশ্রামস্থান ইত্যাদি আলাদা করিয়া ফেলিতে হইবে।

কিন্তু পরস্পর পরস্পর হইতে অনেক দূরত্ব রক্ষা করিতে যাইও না। ব্রহ্মচর্যের এমনই শক্তি যে, কিছুদিন ইহা পালনের পরে অন্তরে অদ্বৈত প্রেমভাব জাগরিত হইয়া থাকে। ইহা ঐক্য সত্য বলিয়া জানিও। ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া যাহার বিশ্ববাসী প্রীতি প্রেমভাবের ক্ষুধা হয় নাই, তাহার ব্রহ্মচর্য ঠিক ঠিক হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মচর্যে শক্তি আসে, শক্তি প্রেম জন্মায়। যার শক্তি নাই, তাহার প্রেম আসিতে পারে না। সাধক পুরুষদের অনেককেই দেখা যায়, প্রতিটি মানুষকে এত ভালবাসেন যে, প্রতিজ্ঞেনেই মনে করে, তাহাকেই বুঝি তিনি সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। অথচ তিনি সকলকেই সমান ভালবাসেন। এই ভালবাসার শক্তি ব্রহ্মচর্য হইতে আসিয়া থাকে। কাহাকেও ভালবাসিলাম, কাহাকেও ভালবাসিলাম না, এইরূপ ভালবাসা অধিকাংশ সময়েই কামের রূপান্তর ছাড়া অত্র কিছু নহে। অবশ্য কেহ কেহ নিজ নিজ কৃতিত্বের দ্বারা অধিকতর ভালবাসা আদায় করিয়া থাকে, তাহা আলাদা কথা। কিন্তু মহাপুরুষদের ভালবাসা সকল লোকের প্রতিই সম ভাবে বিস্তৃত হয়। এই ভালবাসার কোন কারণ থাকে না। অমুক লোকটা আমাকে ভালবাসে, তাই তাহাকে ভালবাসিলাম, ইহা নহে। অমুক লোকটা আমাকে কত কাজে কত

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৩৪৩

সহায়তা করে, তাই তাহাকে ভালবাসিলাম, ইহাও নহে। অমুক লোকটা সর্বত্র আমার প্রশংসা করিয়া বেড়ায়, ইহাও নহে। চিনি না, জানি না, কখনও নামও শুনি নাই, স্বভাব জানি না, চরিত্র জানি না, তথাপি তাহার প্রতি আমার অকুরন্ত ভালবাসা প্রদাবিত হয়, ইহাই সেই ভালবাসা, যাহা ব্রহ্মচর্যের শক্তি হইতে উৎসারিত হয়।

দাম্পত্য যখন পারম্পরিক সহায়তায় ও সমর্থনে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতে আরম্ভ করেন, তখন ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেই তাহারা অসংখ্য জানিত-অজানিত সম্পর্কিত-নিঃসম্পর্কিত লোকের প্রতি প্রাণের একটা অকারণ দরদ অনুভব করেন। এই সময়টা দাম্পত্যের পক্ষে মারাত্মক। এই সময়টাতে নিজের পত্নী বা পতির প্রতি নিয়ত দৃষ্টি না থাকিলে ভালবাসার স্রোত কাহাকেও কাহাকেও অব্যাহিত স্থানে পৌছাইয়া দিয়া অনুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে। দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গিয়া হয়ত স্বামী অথবা নারীতে ঈর্ষা আসক্ত হইয়া গেলেন, অথবা নারী অথবা পুরুষের প্রতি অনুরাগিনী হইয়া পড়িলেন, ইহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। ইহা হইতে পারিয়াছে কেবল সেই সময়টাতে স্বামী ও পত্নীর মধ্যে যেই সরস সহজ মেলামেশার ভাবটা থাকে পরস্পর পরস্পরকে পাণ ও প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন, তাহা রক্ষা করিয়া না চলার ফলে। অনেকেই ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়ে আগ্রহী হয় কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াও যে পতিপত্নীর মধ্যে অন্তরের মধুরতাকে অব্যাহত রাখিতে হইবে, ইহা ভুলিয়া যায়। বিপত্তি আসে সেই খান দিয়া।

তোমাদের সম্পর্কে আমার তেমন কোনও আশঙ্কা নাই। তোমাদের সম্পর্কে আমার প্রধান আশঙ্কা হইতেছে, তোমার আত্ম-বিশ্বাসের অভাব। তোমার কত ক্ষমতা যে আছে, তাহা

তুমি জান না। তুমি জীবন ভরিয়াই নিজেকে একান্ত অধম এবং অসফল হইবায় জগত্ই জাত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক। তোমার এই আত্ম-অবিশ্বাসী মন তোমাকে বারংবার বিপদে ফেলিয়াছে, বিপথে টানিয়াছে। কিন্তু সকল বিপদ ও বিপথ অগ্রাহ করিয়াও যে তুমি আমার কোলেই ঠাই নিয়া বলিয়া আছ, এই ব্যাপারে যে তোমার কতবড় শক্তির পরিচয় আছে, তাহা তুমি একবারও ভাবিয়া দেখ নাই। তোমার নিজের শক্তি সম্পর্কে তোমার এই অন্ধতাই তোমাকে সবার চাইতে বেশী দুর্বল করিয়াছে।

সুতরাং এইবার আমি তোমাকে আদেশ দিব যে, তুমি নিজেকে অক্ষম বলিয়া আর ভাবিতে পারিবে না। এই ভারতে অনেক মহাপুরুষই আজীবন সত্বীক সংযম পালন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে দুই এক জনের জীবন-কথাই মাত্র লোকে জানে। কারণ, ইহা এমন একটা ব্যাপারই নহে যে, পালন করিয়া হাটে বাজারে গিয়া ঢাক পিটাইয়া প্রচার করিতে হইবে। কিন্তু দুই একজন মহাপুরুষের আজীবন দাম্পত্য সংযম পালন সম্পর্কে এত অধিক প্রচার হইয়াছে যে, অনেকে ইহাই মনে করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছে যে, দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য পালন কেবল একটা বা দুটা মহাপুরুষেরই কাজ, সাধারণ লোকের পক্ষে ইহার কল্পনা করিতে যাওয়া বাতুলতা। তোমরা সেই জাতীয় ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হইও না। তোমাদের বিশ্বাস করা উচিত, যাহা মহাপুরুষেরা পারেন, তাহা তোমরাও পার। তাহাদের সহিত তোমাদের পার্থক্য কেবল উন্নতির পরিমাণে। তাহারা মহাপুরুষ আর তোমরা পুরুষ তোমাদের পৌরুষকে সাধনার দ্বারা বাড়াইতে পারিলেই তোমরা মহাপুরুষ হইবে। মহাপুরুষেরাও মানুষ। তোমরাও মানুষ, তাহারা অতিমানুষ। তোমরা সাধারণ মানব, তাহারা মহামানব। যে আর

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৩৪৫

সাধারণ, তপস্বী দ্বারা সে কাল অসাধারণ হইতে পারে। মানুষেরাই
অতিমানুষ হয়, মানবেরাই মহামানব হয়। অতিমানুষ বা মহামানব
কোনও আলাদা জাতি নহে। একটা বিড়াল বড় হইতে হইতে ব্যাঘ্র
হইতে পারে না। একটা ঈছুর বড় হইতে হইতে হস্তী হইতে পারে না।
কিন্তু একটা সাধারণ মানুষ সাধন করিতে পারিলে বড় হইতে হইতে
মহাপুরুষ, মহামানব বা অতিমানুষ হইতে পারে। এই সত্যে বিশ্বাস
রাখিও। অভ্যাসের দাসত্ব বশতঃ তুমি এতকাল সাধারণ মানুষের
পর্ধ্যায়ে ছিলে, কিন্তু ব্রতধারী হইয়া অভ্যাসকে পদতলে চাপিয়া
রাখিয়া যে নূতন ঐতিহ্য তুমি তোমার জীবনে সৃষ্টি করিতে চেষ্টা
পাইতেছ, তাহাই অধ্যবসায় সহকারে চালাইয়া গেলে তুলি মহাপুরুষ
হইবে। মহাপুরুষেরা মাটি ফুড়িয়া আসেন না, আকাশ ফাঁড়িয়াও
নামেন না, সাধারণ মানুষ অসাধারণ সাধন করিতে করিতে মহাপুরুষ
হইয়া থাকে। তুমি সাধারণ মানুষ বলিয়া পচিয়া যাও নাই। বরং
আমি বলিব, হে সাধারণ মানুষ, তোমাকে শত সহস্র নমস্কার, কেননা
তোমার মধ্য দিয়াই দৃষ্টান্তীকৃত হইবে যে তোমাদের মধ্য দিয়াও মহা-
মানবের আবির্ভাব সুসম্ভব। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬৭)

হরি-ও

বারাণসী

১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস
জানিও।

তুই বৎসর পর্যন্ত তুমি পাহাড়ের উপকণ্ঠে ঐ ঝাড়জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটীতে বাস করিতেছ কিন্তু আমার একটাও পত্র পাও নাই। ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইয়াছ। ব্যথিত হইবারই কথা। কিন্তু বাবা, তোমারই আর একটা গুরুভাই ঐ অঞ্চলে বহু দিন বাস করিয়া গেল, বাহাকে আমি নিয়তই পত্র দিয়াছি যেন তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীদের দেখায় এবং সকলে মিলিয়া যেন বনপর্বতবাসী অনুরক্ত মানবসমাজের সহিত অন্তরের গভীর ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া তাহার মধ্যবর্তিতায় সেবার ভিতর দিয়া নিয়ত আমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পায়,—সেই সকল পত্র কি তুমি দেখ নাই? তোমারি একজন গুরুভাই বছরের পর বছর বনবিভাগের সরকারী একটা অফিসে বসিয়া চাকুরী করিয়া গেল, সাহার ফলে স্বভাবতঃই তাহার সহিত কত কত অপরিচিত পাহাড়ী নরনারীর পরিচয় হইয়াছে, তাহার সহিত এতগুলি দিনে তোমার পরিচয় স্থাপিত হইল না? অবশ্য, সে তাহার জনসেবার পুঙ্খবাস্তব স্বরূপে এখন অগ্রতর ভাল জায়গায় বদলী হইয়া গিয়াছে এবং সেখানেও পাহাড়ীদের সহিত মিলিবার মিশিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়া চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গেই জনসেবা করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সে এখন আর তোমাদের অঞ্চলে নাই বলিয়াই তাহার সহিত তোমার যাবৎ সম্প্রতি সাক্ষাৎকার সম্ভব নহে, কিন্তু এই কথাটা তোমরা সকলে যেন রাখিও যে, আমি যখন একটা ছেলে বা মেয়েকে একটা মাত্র পত্র লিখি, তখন তাহা আমার প্রতিটি ছেলে বা মেয়েকেই লিখিয়া থাকি। শুধু তাহাই নহে, আমি যখন আমার একটা সন্তানকে একটা পত্র দেই, তখন তাহার মধ্যবর্তিতায় আমি বিশ্বের প্রায় সকল মানবকেই সেই পত্রে আমার মনের কথা জানাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। এই একটা মাত্র কারণেই আমার মধ্যে সংক্ষীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বা হীন মনুষ্য

নাই। আমি যে আমার পুত্রকন্যাদিগকে আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে কখনও উপদেশ দেই না, তাহারও কারণ ইহাই। আমি নিজেকে একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বলিয়া মনে করিনা, এই কারণেই আমার প্রতি বিশেষ করিয়া একটা ভক্তি বা আনুগত্যের অনুশীলনকে আমি তোমাদের ধর্মসাধনার প্রধান একটা সর্ভ বলিয়া আরোপ করিতে উপদেশ দেই নাই। অতীত সর্বদাই দেখিতেছি যে, মানুষের বিচার-বুদ্ধি ও স্বাধীন বিবেচনার সামর্থ্যকে একেবারে পদবিদলিত করিয়া হইলেও ইহাই উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও যদি কুপিত হন, তাহা হইলে গুরু রক্ষা করিবেন কিন্তু গুরু যদি কুপিত হন, তবে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও হাজার চেষ্টা করিয়া রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমার রাস্তা, রীতি ও প্রকরণ তাহা নহে। তুমি আছ বলিয়াই ত তোমার গুরুর প্রয়োজন। তুমি না থাকিলে গুরু তাঁহার গুরুত্ব লইয়া কি কাজটা সাধিতে পারিতেন? সুতরাং আধ্যাত্মিক সাধন-জগতের প্রথম ও প্রধান জিনিষটা তুমি নিজে। তোমার ভিতরের মানুষটির আরাধনা করিয়াই গুরু তোমাকে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি যে শিষ্যের গুরু, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য। তিনি শিষ্যের মধ্যে পরমেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার সেবা-সাধনের মধ্য দিয়া নিজের জন্মকর্ম সার্থক করিবেন।

ইহারই জন্ত আমি তোমাদের প্রতি জনের জন্ত অসাধারণ রকমের পরিশ্রম করিয়া থাকি। কিন্তু তোমরা সংখ্যায় অগণিত। তাই ইহাও তোমাদের বলিয়া রাখিয়াছি যে একজনের জন্ত বাহা বলিতেছি, কহিতেছি, তাহা যে তোমাদের প্রায় প্রতি জনের জন্ত বলিতেছি, কহিতেছি, তাহা যেন তোমরা ভুলিয়া যাইও না। যে যেখানে যে কোনও কারণেই আমার যে বাণীটা পাইলে, সে-ই তাহার মধ্য হইতে নিতান্ত ব্যক্তিগত অংশ

টুকু বাদ দিয়া তাহার বাকী অংশটুকু তোমার সকল ভ্রাতা ও ভগিনীর গোচরে আনিবে। আমি আমার নিজের বাছ দিয়া তোমাদের প্রতিজনের কাছে আমার সেবাটুকুকে পৌছাইতে পারিতেছি না, তাই তোমরা আমার বাছ হইয়া আমার কাজটুকুকে সকলের কাছে আগাইয়া দিবে। ইহা তোমাদের উপরে এক সনাতন নির্দেশ।

আমি কি আমার সম্প্রদায়ের বিস্তার চাহি বলিয়াই তোমাদের উপরে আমার এই আদেশ? না, তাহা নহে। কারণ, সম্প্রদায় বহু সুদূর ভাবেই বিস্তারিত হউক না কেন, তাহারও বিস্তারের সম্ভাবনা একটা শেষ পরিধি আছে। একটা কাপড়ের মিল কত বড় হইলে পরে একজন ম্যানেজারের পক্ষে পরিচালন সম্ভব, তাহার একটা সীমা আছে। তাই যাহার হাজার মাইল জায়গা লইয়া একটা কাপড়ের কারখানা স্থাপনের আর্থিক ক্ষমতা আছে, সেও একটার বদলে দ্বিচারি পাঁচ দশটা আলাদা মিল স্থাপন করিয়া থাকে। একটা চা-বাগিচা কত বড় হইলে একজন ম্যানেজারের দ্বারা সুশাসিত হইতে পারে, তাহারও একটা সীমা আছে। তাই যাহার হাতে এক লক্ষ এক কোটি একর জমি আছে, সেও একটা মাত্র চা-বাগিচা না করিয়া অনেক গুলি ম্যানেজারের অধীনে অনেকগুলি বাগিচা চালাইয়া থাকে। মালিকের হয়ত সামর্থ্যের অভাব নাই, কিন্তু কোথায় পাইবেন তিনি এমন ম্যানেজার, যিনি একটা নির্দিষ্ট আয়তনের চেয়ে বড় বাগান চালাইতে পারেন? সম্প্রদায়ের ব্যাপার তাহাই জানিবে। যতই তুমি সুচারুরূপে তোমার প্রচার-যন্ত্রকে পরিচালন কর না কেন, এমন একটা সীমা আছে, যাহার পরিধি অতিক্রম করিয়া তোমার সম্প্রদায় আর বাড়িবে না। সুতরাং সম্প্রদায়-বিস্তারকে লক্ষ্য করিয়া মানব-সমাজকে অনন্ত সেবা দেওয়া যায় না।

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৩৪২

আরও একটা কথা রহিয়াছে বাবা। কোনও কালেই সকল মানুষের মন একরূপ হয় না। এক এক জনের তৃষ্ণা এক এক রকমের। তাই জগতে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবেনই। এই সত্যকে বিস্মৃত হইয়া কেহ যদি কেবলই হুঙ্কার করিতে থাকে যে, আমার গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া চালাও বিরাট বিরাট উৎসব আর মহোৎসব, তাহারই ফলে নিখিল জগৎ এই একটা অবতারের পূজক হইয়া বাইবে, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, ইহা নিতান্তই অসম্যাগদর্শিতারই ফল। ইহার সুপরিণতি সম্ভব নহে। সুতরাং সেই দিক দিয়াও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির প্রেশ্রয় দেওয়া পরিণামে লাভজনক নহে। তাই আমি বিশ্বের সকল মানবের দিকে তাকাইয়া তোমাদিগকে যখন বাহা উপদেশ দিবার দিয়া থাকি। তোমরা এই কথা মনে রাখিয়া আমার পত্র হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিও। নাই বা করিলে আমাকে ভক্তি, বিশ্বের মানবের জন্ত তোমার প্রাণ যদি কাঁদিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অশ্রুফণাগুলি হইতেই আমি আমার প্রতি প্রদত্ত অগাধ ভক্তির অতুল অর্থ্য সংগ্রহ করিয়া লইব। বিশ্ব দেবতাকে যখন পূজার পুষ্পাঞ্জলি দিবে, তখন তাহার একটা আধটা ফুল আমারও বুকে আগিয়া পড়িবে, কারণ আমি বিশ্বাত্মা হইতে অভেদ।

তুমি বনের মাঝে থাকিয়া থাকিয়া মৃতবৎ হইয়া আছ বলিয়া গিথিয়াছ। কেন বাবা মৃতবৎ থাকিবে? ঐ বনের অমার্জিত মানুষ-গুলির মধ্যেই চেষ্টা করিয়া প্রাণের জোয়ার আন। তাহাদের জীবন-ধারায় নূতন শ্রোতের কর আমদানী। তাহাদের নিশ্চল জীবনদীপে নূতন করিয়া দেওয়ালী খেলিবার আয়োজন কর। ইহার মধ্য দিয়া তোমারও জীবন জাগিয়া উঠিবে। পরকে জাগাইতে গিয়া মানুষ নিজে জাগে, পরকে বাঁচাইতে গিয়া মানুষ নিজে বাঁচে। তোমার আচ্ছ

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম

[১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৫০

নিজের জীবনমৃত্যু বুচাইবার জন্তই তাহাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্জীবনী সুধার করিতে হইবে পরিবেশন। সে যুগে দৈত্যদের বধিয়া দেবতাদের দেওয়া হইয়াছিল অমৃত, এ যুগে দেবদৈত্যনির্মিলনের সকলকে ইহা বিতরণ করিতে হইবে প্রাণভরা প্রেমে প্রাণত্যাগ ভালবাসায়। ইতি—

আদীর্ষ

স্বরূপানন্দ

(৫৬৮)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৭ই চৈত্র, ১৩৩৩

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। মাতৃসেবা পরম ধর্ম এই ধর্ম হইতে কখনও বিচ্যুত হইও না। মায়ের প্রতি অকৃতজ্ঞতা মানুষের পক্ষে এক অকল্পনীয় কলঙ্ক। যেই সভ্যতা মাকে ভজনা করিতে শিখায়, বৃদ্ধকালে তাঁকে পরের গলগ্রহ হইতে বাধ্য করে, সেই ধর্মমত মাকে অবহেলা করিতে দেয় প্ররোচনা এবং মায়ের প্রতি কর্তব্যকে লঘু করিবার জন্ত অগ্র দশটা অবাস্তব কর্তব্যকে প্রধান করিয়া ধরে, তাহা সভ্যতা বা ধর্ম নামের অযোগ্য। আমি আমার প্রাণে ধর্মমতে মাতৃপিতৃসেবাকে অতি প্রধান বলিয়া গণনা করিয়াছি।

পুপুন্যী আশ্রমে একবার আসিতে চাহ, ভাল কথা। আসিবে বলিয়াই সংসারের সকল কর্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়া আসিতে হইবে এমন কি কথা আছে? আমার মতে, প্রত্যেক মানুষেরই সংসার

পরিবেশ পরিহার করিরা কিছুকাল আশ্রমীয় জীবনে প্রবেশ করা এবং আশ্রমকে নিঃসার্থ নিষ্কাম সেবা দানের মধ্য দিয়া নিজের অন্তরের শুদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। আগে তীর্থাদি ভ্রমণের দ্বারা এই শুদ্ধি লাভের চেষ্টা হইত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ তীর্থ কতকগুলি তীর্থকাকের উৎপাতে তীর্থ নামের অযোগ্য হইয়াছে এবং সুফল লাভের পরিবর্তে তীর্থযাত্রার দ্বারা অনেকের মনে কতকগুলি কুসংস্কারও স্থান করিয়া গইতেছে। মননশীল মানব তীর্থকাকগুলির অন্তর্নিহিত লাভের প্রত্যাশায় রচিত নানা আজগুবি কাহিনীর মধ্যে সত্য বা মার খুঁজিয়া পাইতে অসমর্থ হইয়া বরং তীর্থ সম্পর্কে অত্যাশ্চর্য অভিমত গঠন করিয়াই গৃহে ফিরিতেছে। তাহার চাইতে সেই অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া প্রকৃত মাদ্বিক আবহাওয়াযুক্ত আশ্রমে কিছুকাল বাস করিয়া দেহ-মন-প্রাণের প্রশস্ততা ও বিস্তার বিধান করিয়া যাওয়াই অধিকতর সঙ্গত কার্য হইবে।

আগামী শারদীয়া উৎসবের পরে কোজাগরী পূর্ণিমায় পুপুন্যীতে একটা অখণ্ড মহাসম্মেলন করিবার আমার ইচ্ছা হইয়াছে। সেই সময়ে উহা সম্ভব না হইলে পরবর্তী পৌষমাসে আমার জন্মদিনে তাহা হইবে। ইচ্ছা এখনও প্রবল হয় নাই। চারি দিকের অবস্থা একটু অনুকূল বলিয়া মনে হইলে আমি এই মহাসম্মেলনের নিমন্ত্রণপত্র প্রচার করাইব। তোমরা যদি সকল স্থান হইতে এই সম্মেলনে আসিয়া যোগদান কর, তাহা হইলে আমরা সকলে মিলিয়া আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব যে, আমাদের সকল প্রয়াসের মধ্য দিয়া আমরা বিশ্বের প্রতিটি মানবের সহিত প্রেমের সম্পর্ক কি করিয়া স্থাপন করিতে পারি। জগৎ হইতে নানা মত নানা পথ কখনও দূর করা যাইবেনা। যে সকল মত-পথ আজ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কত মত-পথ বিলীন হইয়া যাইবে

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেন্না

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৫২

কিন্তু তাহাতে সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্য কমিবে না। কারণ, আরও নূতন নূতন মত-পথ আবিষ্কৃত হইতে কতক্ষণ? অথবা পুরাতন স্মৃধাকে নূতন ভূঙ্গারে ভরিয়া পরিবেশন করিতে যে নূতন নূতন লোক আসিবেন তাহার স্থিরতা কি?

যত দিন তোমার মাতা জীবিতা আছেন, ততদিন প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিবে। আর যে চাকুরিতে আছ, তাহাতে উন্নতি করিয়া জগৎ চালাকির আশ্রয় না নিয়া পরিশ্রম ও সততার আশ্রয় নিবে। ও পরিশ্রমী মন সদা প্রসন্ন থাকে। প্রসন্নতা পরমায়ু-বর্ধক। ইতি—

আদির্দ্যাম

স্বরূপান

(৫৬২)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৮ই বৈশাখ, ১৩৩৩

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

মেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা মেহ ও আশা জানিও।

সমবেত উপাসনা সম্পর্কে যতটা সম্ভব সুস্পষ্ট ধারণা সর্বত্রই উচিত। অতীতে ইহা থাকিলেও সেই সুদূর অতীতে যেমন কিছু এখন তাহাই হইতে পারে না। কারণ সুদূর অতীতের ইতিহাস প্রামাণ্য ভাবে আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে? রূপে যেখানে যাহা আসিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার ইতিহাসও কে জানে সেই ইতিহাস? আদিম আৰ্য্য জাতি শংখধ্বনি করিত

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

বৃহৎ প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৩৫৩

কিনা, বাণীর ব্যবহার জানিতেন কিনা, ঘণ্টা তাঁহাদের নিজস্ব জিনিষ না স্বত্ত্বের কাছ হইতে ধার করা, ঢাক পিটাইতেন কিনা, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরই মীমাংসা হইবার সাধ্য নাই। কিন্তু একথা সত্য যে, এই সকল ধ্বনি বর্তমান সময়ে অনেক সম্প্রদায়ের পূজার আড়ম্বরের দিকটাকে বিশেষ ভাবে সন্মুখ করে।

তোমাদের সমবেত উপাসনাতে সেই সকল আড়ম্বরগুলিকে কতকটা বর্জন করিয়া চলিতে না পারিলে ঠহা ইহার আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া মরুভূমির শুষ্ক প্রান্তরে পথ হারাইয়া যাইবে। এই জন্যই আমি সমবেত উপাসনা কালে সুরের সহিত হারমোনিয়াম, বাঁশী, সেতার বেহালা, রুট, জলতরঙ্গ আদি বাগকে সমর্থন করি নাই।

কিন্তু উপাসনার আরম্ভ কালে অখণ্ড-সংহিতা পাঠের পূর্বে আর সমবেত উপাসনা শেষ হইয়া গেলে শান্তি বাচনের পরে আমরা জয়ধ্বনি দিতে বারণ করি নাই। কারণ ইহা প্রারম্ভ ও সমাপ্তির সূচনা করে। এই সময়ে তোমরা উলুধ্বনিকে অনায়াসে স্থান দিতে পার কিন্তু বাগভাণ্ড আদির আমদানী করিয়া সমবেত উপাসনার গাম্ভীৰ্য্যকে নাশ করিতে পার না।

কেহ কেহ দেবমূর্তির সম্মুখে আরতি করিয়া আনন্দ পান। ওঙ্কার-বিগ্রহের সমক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় নহে। পাঠা কাটিবার সময়েই ঢাকঢোল পিটান মানান-সই। খণ্ড দেবতার অর্চনার কালেই ধূপধূনা আদি লইয়া আরতি শোভনীয়। তোমাদের সমবেত উপাসনার মধ্যে এই সকল অনুরূপের আমদানী করিয়া তোমরা তোমাদের সমবেত উপাসনাকে জটিল করিও না। আড়ম্বর দেখিলে লোক ভিড়িবে, এই আশায় আড়ম্বর করার মানে হইতেছে, নিজের ধন্যবোধ ও ধন্যানুভূতি সম্পর্কে অল্প মত্ত ও পৃথের সহিত অকারণ আপোষ করা। বেদান্তের

প্রতিধ্বনি

দ্বিতীয় প্রেরণা

[১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৫৪

প্রচার করিতে আসিয়া জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহাজনকে এই দেশে সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্ত এই জাতীয় তামসিক ও রাজসিক আড়ম্বর সমর্থন করিতে দেখা গিয়াছে। ইহার ফলে তাঁহার অন্তর্বিদ্য গণের মধ্যে বেদান্তের অত্যাচ্ছন্ন সমূহ প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বরং লোক-প্রচলিত ধর্মমতগুলিই যেন সালঙ্কারে সমৃদ্ধ হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের এই দেশে হয়ত অভাব নাই। তাই তোমাদের বলিতেছি যে, ধর্মসম্পাদন করিবার কালে সকল বাস্তবিক ব্যবহার কর, শোভাযাত্রার কালে সমস্ত প্রকারের ফুকারের যন্ত্র কাজে লাগাও, হরি-ওঁ নাম কীর্তনের সময় ইহার সহিত সম্ভব মতন সকল প্রকারের যন্ত্র-সঙ্গীতকে সুসমঞ্জস রূপে মিলাও, কিন্তু সমবেত উপাসনাটিকে এই সকল আড়ম্বরের মধ্যে নিফেলিও না।

আমার সুস্পষ্ট অনুভূতি এই যে শঙ্খ-নাদ বাঁহারা করিতেন, ঘণ্টা-নাদ বাঁহারা করিতেন, সুদূর অতীতের সেই দুইটি সম্প্রদায় এই জাতি ছিলেন না। বংশী-নিবাদ বাঁহারা করিতেন এবং কাসর বাঁহারা বাজাইতেন, প্রাচীন যুগে সেই দুই জাতি একই জাতি ছিলেন না। আর্য্য জাতির অধ্যাত্ম-সাধনার অত্যাগ্রসর একটা ওঙ্কারতত্ত্ব আয়ত্ত করিবার পরে ইঁহাদের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে প্রণবকেই অনুভব করিলেন। ইহার ফলে বহু আর্য্যোত্তর ও বিভিন্ন প্রকারের আর্য্য জাতির কাছ হইতে ইঁহারা সকল রকমের বাহ্যিক ব্যবহার গ্রহণ করিলেন। ওঙ্কার এই মহামিলন সম্ভব করিল, কিন্তু এই মহামিলন হইতে ওঙ্কারের অনুভূতি যেদিন হইতে লোপ পাইল, সেই দিন হইতে এই মহামিলন খিচুড়ির রূপ ধারণ করিল। আর্য্য জাতির খিচুরির স্তূপীকৃত পাহাড় হইতে মহাপ্রণবের মহাধ্বনিকে খুঁজিয়া বহু দিন ক্রটি হইতে সকলকে গলদঘর্ম্য হইতে হইতেছে। এই

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেমা,

প্রতিধ্বনি

৩৫৫

প্রচারিত ধর্মসাধনাকে বিরুদ্ধতায় রাখিয়া দাঁড়াইবার জ্ঞাত এমন লোককেও অগ্রণী হইয়া আসিতে দেখা যাইতেছে, যিনি শিষ্যদের নিকটে সাক্ষাৎ ভগবদবতার রূপে প্রচারিত হইতেছেন এবং এই অবতারত্ব প্রমাণের জ্ঞাত মাটির তলা হইতে পুরাতন পুথি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইতেছে।

তোমরা অকারণে নানা প্রকারের যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া পরিত্র ঈশ্বরোপাসনাকে জটিল করিও না। সরল মনে সরল প্রাণে সরল বিধানে সরল সুরসহকারে সমবেত উপাসনা করিয়া যে স্নিগ্ধ প্রশান্ত মনটা পাইবে, তাহাকে নিয়া এমন নিবিড়, গভীর, প্রেম-ঘন নাম-সাধনে লাগাইয়া দাও, যাহাতে শঙ্কষণ্টা আদির কোনও প্রয়োজনই নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭০)

হরি-ও

কলিকাতা

১৯শে বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অগ্ন কলিকাতা পৌছিয়াই তোমার তিন চারিখানা পত্র একসঙ্গে পাইলাম। তোমরা তোমাদের অঞ্চলে ভ্রমণ-তালিকা করিবার জ্ঞাত লিখিয়াছ। প্রস্তাব ত সাধু। কিন্তু ভ্রমণের উদ্দেশ্যটুকু স্বরণে রাখিয়াছ ত? মানুষ আত্মবিশ্বাসিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাই সে আপন পর চিনিতে পারে না, কেবল লালসার জালে জড়াইয়া জড়াইয়া নিজেকে

প্রতিধ্বনি

বৃত্তং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৫৬

বন্ধ ও পঙ্গু করে। তাহার আত্মবিস্মৃতি বিদূরণ করিয়া দিব্যদৃষ্টিতে জাগাইয়া তোলাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমি যদি যাইতে না পারি ত আমায় বাণীগুলির মধ্য দিয়া তোমরা নিজেরাই সে কাজ করিতে পার। আমি ত আমার জীবনের অনুভূত সত্যকেই কথার মধ্য দিয়া প্রকাশিত করিয়াছি, কাব্য রচিবার জন্ত কল্পনার ত বাবা কখনো প্রশ্রয় দেই নাই। তবু, যদি আমার বাণী সমূহ এই কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত, অপার্থাপ্য বা অপ্রতুল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে যাহাদের বাণী সেই অপযশের ভাগী হইবে না, তাহাদের বাণী সমূহ লইয়া তোমরা ঘরে ঘরে অভিযান চালাইতে পার। মোট কথা, আমার ভ্রমণ-তালিকার দিব্য তাকাইয়া তোমরা বসিয়া থাকিতে পার না। তোমাদের কাজ তোমাদের চালাইয়া যাইতে হইবে। কোথাও সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া কোথাও বা প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা তোমাদের কাজ করিবার সুযোগগুলির দুর্ব্যোগে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইতে পারে, কিন্তু প্রাণ বিসর্জন করিতে হইলেও তোমরা কাজ করিয়া যাইবে, থামিয়া পড়িবে না।

মহতের বাণীসমূহ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার সময়ে প্রবক্তাকে অলৌকিক শক্তিশালী এক ধারণাতীত মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া প্রচারের একটা রেওয়াজ এই দেশে আছে। ঘটনা, কাহিনী প্রচার, প্রবোধ, অতিরঞ্জন, অনুরঞ্জন, অত্যাক্তি, অবধার্তোক্তি ও নানাবিধ ব্যাপারের দ্বারা যদি জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যায় যে, ইনি সত্যই ব্রহ্মাদিরও আরাধ্য পুরুষ, তাহা হইলে ইহার উপদেশগুলি সহজে লোকে ধরিবে,—এরূপ একটা ধারণা এই সকল ক্ষেত্রে কতকটা কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার দ্বারা অবতার পূজারই প্রচলন হয়, তাহার মানবীয় জীবনে ও ব্যক্তিগত আচরণে অনুকরণীয় যেই সকল সম্পদ থাকে, তাহা অননুকূলই থাকে।

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

দ্বিতীয় প্রেরণা

প্রতিধ্বনি

৩৫৭

বায়। আমার বাণী লোকসমাজে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা যদি উপলব্ধি করিয়া থাক, তবে আমাকে অবতারণা, অভিজ্ঞানুষ্ণ, মহামানব আদি বলিয়া প্রচার হইতে বিরত থাকিবে। মানুষকে মানুষ হিসাবে সকলে গ্রহণ করুক, মানুষ হিসাবে তাহার সহিত অন্তরের সখ্য স্থাপন করুক। ভক্তবৃন্দের প্রচারশৈলীর অশেষ নিপুণতার মধ্য দিয়া আমি দেবতার পূজা পাইতে চাহি না।

সংগ্রামের মধ্য দিয়াই মানুষের জীবন,—আমি এখনো সংগ্রামই করিয়া যাইতেছি। প্রেমেই মানুষের জীবনের সার্থকতা, আমি জগতের প্রতিজ্ঞনের প্রতি অন্তরের প্রেমপেলব কোমল স্পন্দনগুলিকে প্রসারিত করিয়া যাইবারই সাধনা করিতেছি। ইহাকে যদি অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া থাক, তবে বলিব, ইহার অতিরিক্ত অলৌকিকত্ব আমার জীবনে নাই। ইতি—

অশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১২শে বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের মহত্ব তোমাদিগকে ত্যাগবুদ্ধি দিতেছে। তোমাদের ত্যাগবুদ্ধি তোমাদিগকে মহত্ব প্রদান করিতেছে। চিন্তাশুদ্ধির ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। ভিতর শুদ্ধ হইলে নিজের জিনিষ পরের কাজে দিতে ইচ্ছা করে। শুদ্ধতা অপরিমিত হইলে নিজের সর্বস্ব

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৫৮

দিবার ক্ষমতা আসে। সেই শুদ্ধ মানবদের অভ্যুত্থানের আশায় যুগযুগ ধরিয়া পিপাসিত নেত্রে পূর্বাচলের দিকে তাকাইয়া আছি।

অনেক সংগ্রামের পরে তোমার উপরে তোমার কর্তৃপক্ষের সুবিচার আদায় করিতে পারিয়াছি শুনিয়া সুখী হইলাম। জমী তুমি হইয়াছ, এখন তুমি পরাজিত পক্ষের প্রতি উদার হও। তোমার বাহারা বিরোধিতা করিয়াছে, তাহারা তোমার শত্রু নহে। এমনকি, তাহাদের অত্যাচারগুণিও শত্রুতা নহে। তাহারা তোমার শক্তি ও যোগ্যতার পরীক্ষকের ভূমিকা নিয়াছিল। তুমি উত্তীর্ণ হইয়া তাহাদের ভূমিকা-গ্রহণকে সার্থক করিয়াছ। তাহাদের বিরোধিতা তোমার সর্বশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার উত্তেজক হইয়াছিল। সেই বিরুদ্ধাচরণের দ্বারা তুমি তোমার নিজের শক্তিকে চিনিয়াছ। বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহাদের উপরে রুষ্ট হওয়া অপেক্ষা তুষ্ট হওয়া তোমার অধিকতর সদ্বৃত্ত। বলিতে পার, ইহারা তোমাকে একেবারে চূর্ণও করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন পারে নাই, তখন আমি বলি, উহা নিয়া ভাবনার আর কি আছে? এখন প্রস্তুত হও যেন তোমার ভাবী কর্ম-জীবনে কোনও বাধাই তোমাকে না আটক করিয়া রাখিতে পারে। আত্মশক্তি পরিচয় পাইয়াছ, এখন তাহার অনুশীলনের দ্বারা তাহাকে শতগুণ সহস্রগুণে বাড়াও। ইতি—

আশীর্বাদ
স্বরূপানন্দ

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৩৫৯

(৫৭২)

হরি-ওঁ

পুপুন্যী আশ্রম

২৪শে বৈশাখ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষুঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিয়ত ভগবানের নামে লাগিয়া থাকিও। সকলের প্রতি প্রেমভাব রক্ষা করিও। ভগবানকে ভালবাসিলেই তাহা সহজে সম্ভব হইবে। ভগবানে ভালবাসা আসিলে ত্রিভুবন মধুময় হইবে। তখন শত্রু-মিত্র সব তোমার আপন হইতে আপনত্তর হইয়া যাইবে। ভালবাসাতেই আনন্দ, বিদেষে সুখ কোথায়? ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭৩)

হরি-ওঁ

বারাণসী

পরমকল্যাণীয়াসুঃ—

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

স্নেহের মা—, তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। পরপর তোমার দুই তিন খানা পত্র আমি পাইয়াছি। সকল পত্রেরই সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দেওয়া সম্ভব নহে। পত্র লিখিয়াই তোমরা মনে মনে বিশ্বাস করিতে থাকিও যে, তোমাদের প্রার্থিত বিষয়ে আমি কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। আমি মাত্র একটা মানবদেহই নই বা মানবদেহধারী একটা সীমাবদ্ধ আত্মাই নহি, তোমাদের প্রতিজ্ঞনের বাহা স্বরূপ, আমি তাহার সহিতও অভিন্ন। সাত্ত্ব ও অনন্ত দুই ভাবেই আমি

তোমাদের আপন জন হইয়া রহিয়াছি। দীক্ষাদান আমার পক্ষে
কুলপ্রথা বা লোকাচারের অনুবর্তন মাত্র নহে, দীক্ষার দ্বারা তোমাদের
আত্মার সহিত আমার আত্মার নিত্য সম্বন্ধ সৃষ্টি হইয়া যাইতেছে।
তোমরা কি, তাহা তোমরা জানিতে না, কিন্তু আমি কি, তাহা আমি
জানিতাম। আমার সেই জ্ঞানকে তোমাদের অন্তরে সংক্রামিত করিয়া
দেওয়ার নাম দীক্ষা। কেহ কেহ এই সংক্রমণকে স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার
বলে সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিয়া থাকে, কেহ কেহ ইহাকে সাধন করিয়া
আন্তে আন্তে অনুভবে আনে। ইহার সহিত কুসংস্কার বা সম্বোধন-
বিচার কোনও সম্পর্ক নাই। ইহা আপনা আপনি অনুভূতিতে আসিয়া যায়।
এই অনুভূতিকে আনিবার জন্ত প্রচারকার্যের দরকার হয় না। শ্রীশঙ্ক-
রদেবের অলৌকিক যোগবিভূতির বিষয় অক্লান্ত ভাবে প্রচার করিতে
করিতে শ্রোতৃগণমনোমধ্যে যে নানাবিধ ধারণার পূর্বভাস সৃষ্টি করিয়া
রাখার কৌশল জগতে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সহিত ইহার কোনও
সংশ্রব নাই। ইহা নিত্য সত্য যে, দীক্ষা দিয়া আমি “তুমি” হইয়া
গিয়াছি, তুমি “আমি” হইয়া পড়িয়াছ। তোমার ভিতরে প্রবেশ
করিয়া আমি তোমার সহিত নিজেকে অভেদ করিয়া লইয়া তোমার
সৌম্যবক্তার সকল গ্লানিকে দূর করিয়া দিবার জন্ত তোমার ভিতরে
বসিয়া বসিয়াই আপন সাধন করিয়া যাইতেছি, আর আমার ভিতরে
তোমাকে টানিয়া আনিয়া আমার আসনটীতে তোমাকে বসাইয়া আমার
বাবতীয় শক্তি ও সাধনার সমাবেশে তোমার সমীমত্বের গ্লানি দূর করিয়া
দিয়া তোমাকে নিত্য স্বরূপে অবস্থিত করাইবার প্রয়াস পাইতেছি।
ইহা একটা অতি সাধারণ সত্য। তবে ইহাকে একই
অসাধারণ দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হয়, এই মাত্র। প্রচলিত দৃষ্টিতে দেখিলে
গেলে, ইহা এক অসাধারণ ব্যাপার। ইহা অসাধ্যও মনে হইবে।

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৩৬১

কিন্তু ইহা অসাধারণ হইলেও অসাধ্য নহে। নিখিল বিশ্বের কোটি কোটি নরনারীকে আমার সহিত এক ও অভিন্ন করিবার সাধনাই ত আমি করিয়া বাইতেছি। এই জগুই ত যত-সংখ্যক তোমরা আমার কাছ হইতে কর্ণমূলে মত্ত পাইয়া দীক্ষিত হইয়াছ, তাহা অপেক্ষাও আমার স্বপ্নযোগে দীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা অধিক। আমি মানুষের জাগরণে ও স্বপ্নে সকল অবস্থায় তাহাদের জগু আমার কাজ করিয়া বাইতেছি। আমি তোমাদের প্রতি জনকে আমার সহিত অভিন্ন করিয়া গড়িতেছি। পত্র লিখিবার পরে তাহার আক্ষরিক জবাব হাতের লেখায় না পাইলে তোমাদের ব্যস্ত হওয়া সাজে না মা।

তোমার প্রেরিত ধুতিখানা আমি সানন্দে পরিয়াছি। সাধনা এবং সংহিতা তাহাদের জগু প্রেরিত শাড়ী দুইখানা পাইয়া খুবই খুশী হইয়াছে। তাহাদিগকে ইহাতে মানাইয়াছেও অতি চমৎকার। সংহিতা যখন তাহাকে দেওয়া শাড়ী খানা পরিয়া আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল, তখন তাহাকে দেখিতে তাহারই উপযুক্ত দেখাইতে ছিল। বিংশ শতাব্দীর এক ব্রহ্মচারিণী নহে, অতীত বৈদিক যুগের এক ব্রত-চারিণী তপস্বিনীর মতই তাহাকে দেখা যাইতেছিল। তাহারা তাহাদের শাড়ী দুইখানা পাইয়া খুবই খুশী হইয়াছে। এই দিক্ দিয়া তোমার বস্ত্রদান সম্যকই সার্থক হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিষয়ে তোমরা আর অর্থের অপচয় করিও না। দেশে হাজার হাজার নরনারী আজ বস্ত্রাভাবে দিন কাটাইতেছে। অনেকে লজ্জানিবারণে অক্ষম হইয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত করিয়া লজ্জার দায় এড়াইতেছে। এই জাতীয় সংবাদ ত প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সংবাদপত্র সমূহে দেখিতে পাই। ইহাদিগকে কাপড় পরাইবার জগু তোমরা আগ্রহী হও। আমার এক টুকরা কোপীন ও বহির্বাস যেমন তেমন করিয়া জুটিয়া বাইতেছে, আমাকেই আবার

প্রতিধ্বনি

ধ্বংস প্রেরণা

[১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৬২

বস্ত্রসন্তারে সাজাইবার ভিতরে সার্থকতাটা কোথায়? তোমাদের দেহের জিনিষ অবশ্যই আদর করিয়া নেই, অনাদর করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি ইহার চাইতে বড় জিনিষ চাই। জগতের সকল বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান হউক তোমাদের মূলমন্ত্র। আর তাহার চাইতেও বড় জিনিষ আমি ইহা চাই যে, তোমাদের প্রতি জনের মধ্যে সাধনের এমন নিষ্ঠা আসুক, যাহার পরোক্ষ প্রভাবেই শত শত অবিবাসী বিশ্বাসী হয়, শত শত নাস্তিক আস্তিক হয়, শত শত আত্মস্বার্থলোভী পরহিতৈষণার প্রেরণা লাভ করে। আমি চাই যে, তোমাদের অকুণ্ঠ ভগবৎসেবার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিখিলভুবনব্যাপী কোটি কোটি ইহমুখ স্থূলসব্ব ভক্তি ভগবানের নামের স্তব্ধ সেবায় আত্মদান করিয়া তাহার মধ্য দিয়া চিত্তশুদ্ধির চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্বে পৌছিয়া জগতের যাবতীয় কাজে অকৈতব জনসেবায় নিজেদিগকে নিয়োজিত রাখুক। ইহা যদি তোমরা আমাকে দিতে পার, তাহা হইলে ইহার চাইতে বড় প্রাপ্তি আমার আর কিছু কাম্য নাই। সমগ্র জগৎ তোমাদের দ্বারা নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে আরম্ভ করুক।

সঙ্গীয় পত্রগুলি যথাপাত্রে প্রেরণের ব্যবস্থা করিও। অনেক সময়ে আমি ডাকব্যয় বাঁচাইবার জন্তও একই খামে অনেক পত্র দেই। কখনো কখনো এই জন্তও দেই যে, অনেককে কি লিখিলাম, তাহা যেন আবার তোমরা কেহ কেহ জানিতে পার। নিতান্ত গোপনীয় গোছের পত্র না হইলে অত্রের খামের মধ্যে দিবার ইহাই তাৎপর্য। যে যে স্থানে তোমার নিজে যাইয়া পত্র দেওয়া সম্ভব বা সম্ভব নহে সেই সকল স্থানে অত্র কাহারও দ্বারা পত্র গুলি পাঠাইও। অসম্ভব সম্ভব করিবার চেষ্টা ভাল, কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা ভাল নহে। তোমার সম্পর্কে আমার অতিশয় উচ্চ ধারণা আছে।

পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের মন এখনও অদোষদর্শী হয় নাই, উপযুক্ত পরিমাণে পবিত্রতাও সঞ্চয় করে নাই। তাই নিজেকে সকল অনাহত সমালোচনা হইতে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করা সম্ভব। মেয়েদের মধ্যে পত্রগুলি বিলি করিতে অবশ্য তুমি নিজেই যাইবে এবং অবাধে যাইবে। ইহাতে তোমার কুণ্ঠা করিবার কিছু নাই। পুরুষদের ভিতরে নিজে না যাইয়া যাতায়াতের কাজটী অত্রের দ্বারাই করাইবে। যেখানে ছেলেদের হাত হইতে সংগঠনের নেতৃত্ব মেয়েদের হাতেই আসিয়া পড়ে, সেখানেই নেতৃস্থানীয়াদের এই সকল বিষয়ে একটু সতর্কতার দরকার। সংকাজ করিতে বাইতেছ, লোককে কুডাক ডাকিবার অগ্রায় স্বেবোগ যাচিয়া বাছিয়া দিতে যাইবে কেন? মেয়েদের মধ্যে তুমি নিঃসঙ্কোচে কাজ করিয়া যাইবে। যেখানে মেয়েদের ভিতরে নিষ্ঠা, ভক্তি, ব্রতপরায়ণতা, হিতৈষণা ও কর্তব্যজ্ঞান গভীর ভাবে আসিয়াছে, সেখানে পুরুষেরা সহজেই আদর্শের অনুগত হইয়া থাকে। নারীর এই মহিমার কথা কখনও ভুলিও না মা। নারী যে মহাশক্তি, ইহা কেবল কথার কথাই নহে, ইহা সত্যও। এই মহাশক্তির কেহ করিয়াছে অবহেলা, কেহ করিয়াছে অপব্যবহার। তোমরা আবার নূতন করিয়া শক্তির খেলা দেখাও মা।

ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া শক্তির খেলা খেলাইবার কালে তোমাদের ঘরে ঘরে নিজ নিজ দুর্বল স্বামীর বলবর্দ্ধনের মধ্য দিয়াও তাহা দেখাইতে হইবে। কোথায় তাহাদের দুর্বলতার উৎস, তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। অনেক স্বামী দুর্বল হইয়া যায় নিজের পত্নীকে পূরাপূরী ভালবাসিতে না পারার দরুণ। অনেক স্বামী দুর্বল হইয়া যায়, নিজের পত্নীকে অপরিমিত ভালবাসার দরুণ। কোথাও প্রেমের অভাব, কোথাও প্রেমের আতিশয্য তাহাদের দুর্বলতা বিধান করিয়া থাকে। এই দুর্বলতা কত

প্রতিধ্বনি

বৃত্ত প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৬৪

যে বিচিত্র রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহা ধারণা করাও অনেক সময়ে শক্ত হয়। স্বামীরা যে অনেক সময়ে মত্তপ হয়, তাহা বহু ক্ষেত্রে স্ত্রীকে ভালবাসিতে না পারার দরুণ। স্বামী ও পত্নীর সম্পর্কের মধ্যে এমন কত কি যে অনাবিস্কৃত কোণ রহিয়াছে, যেখানে বাহিরের কেহ প্রবেশ করিতে অধিকারী নহে, অথচ সেই সকল স্থান হইতেই পরস্পরের প্রতি সকল দুর্বোধ্য ব্যবহারের মূলোৎপত্তি। এই জগুই মহাশক্তি স্বরূপিণী নারীকে অতিশয় বুদ্ধিচতুরা হইয়া, বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়া, সহিষ্ণুতা সহকারে কেবল নিজ স্বামীকে অধ্যয়ন করিয়া বাইতে হইবে। ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, ধীরতা এবং অবিচলিতচিত্ততার গুণে তাহাকে আস্তে আস্তে অবস্থা আয়ত্তে আনিতে হইবে। কথার্থই খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিও। ইতি—

আশীর্বাদ
স্বরূপানন্দ

(৫৭৪)

হরি-ও

বারাণসী
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্বাদ জানিও।

পাঁচই বৈশাখ তোমাদের গৃহে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইয়াছে জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। যেখানে সমবেত উপাসনা হয়, সেখানে আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের পরম পবিত্র নাম গান করি থাকি। তোমাদের কর্তে সেখানে কর্তৃ মিলাইয়া আত্মোপাস্ত তোমাদের

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

৩৬৫

সঙ্গ করিয়া থাকি। সমবেত উপাসনায় রত নরনারীদের সঙ্গ আমার নিকটে স্বর্গ-স্থলের চাইতে প্লাবনীয় মনে হয়। তাই যেখানে যে বখন সমবেত উপাসনায় বসে, তখনই তাহার কাছে আমার প্রাণ-মন ছুটিয়া যায়। তোমরা এই পরম সত্যকে বিশ্বাস করিও। যেখানে সবাই আসিয়া সমবেত উপাসনার জন্য মিলিত হইয়াছে এবং সমবেত কণ্ঠে সমবেত উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, শরীর লইয়া আমি সেখানে উপস্থিত হইতে না পারিলেও বা নিকটে থাকিয়াও অগ্র গুরুতর কাজে বাস্তব-ব্যাপৃত থাকিলেও জানিবে যে আমার প্রাণ-মন-চিত্ত-আত্মা সেখানেই ডুবিয়া রহিয়াছে। ইহার চেয়ে প্রিয়তর অগ্র কোনও অনুষ্ঠান আমার নাই এবং ইহার প্রতি আমার অন্তরের আকর্ষণের কোনও তুলনা নাই। সমবেত উপাসনা তোমাদের পাপ-তাপ নাশ করুক, তোমাদের অন্তরের সকল সঙ্কীর্ণতার বিলোপ-সাধন করুক, তোমাদের সহিত নিখিল জগতের আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করুক। সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া তোমরা সকলে জগতেরই তরে জীবন ধারণ করিতেছ, জগতেরই তরে তোমাদের মরণ আলিঙ্গন করিতে হইবে। সমবেত উপাসনার মহিমায় তোমাদের দৃষ্টির সকল দৈগ্ৰ্য ঘুচিয়া যাউক তোমরা সকলের ব্যথা-বেদনায় নিজেদের অন্তরে তাহার সহস্পন্দন অনুভব করিয়া সকলকে দুঃখমুক্ত আনন্দময় জীবনের দিকে ধাবমান করিবার জ্ঞাত আগুয়ান হইয়া যাও।

সংসারে নানা ভাবে তোমাদের অর্থদণ্ড হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া মনে মনে ইহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই যে গ্রহেরা শূণ্ণে বসিয়া এই সকল করাইতেছে। গ্রহভাৱাচয়ের সহিত মানুষের কোনও সম্পর্ক নাই, ইহা নহে, কিন্তু তাহারা তোমার ভালমন্দকে সৃষ্টি করিতে পারে

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৬৬

না। সবই করিতেছেন পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বরে অনন্তচিত্ত হইয়া
আত্মনিবেদন করিয়া সংসারের সকল বিভীষিকাকে জয় কর। ইতি—

আশীর্বাদ

স্বরূপানন্দ

সাময়িক প্রসঙ্গ

চারিটি সাফল্যপূর্ণ সম্মেলন :—সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে পর পর
এবং যুগপৎ চারিটি সাফল্যপূর্ণ অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলন হইয়া গেল।
একটি কাছাড় জেলার শিলচরে, একটি নগাঁও জেলার লক্ষাতে, একটি
জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর ছায়াতে এবং একটি ত্রিপুরা রাজ্যে
তেলিয়ামুড়াতে। চারিটি সম্মেলনেই অসাধারণ সাফল্য অর্জিত
হইয়াছে বলিয়া আমরা রিপোর্ট পাইয়াছি।

এই চারিটি সম্মেলনের পৃথক পৃথক বিশেষত্ব এই যে, তিনমুখি
ভ্রাতা শ্রীব্রজনাথ মজুমদার যখন লক্ষা সম্মেলনের সভাপতিরূপে দণ্ড
আদর্শবাদ ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ভাষণ দিতেছিলেন, তখন
এক অপার্থিব অবস্থার সৃজন হইয়াছিল। মনাছড়ার ভ্রাতা শ্রীব্রজ
কান্ত দাস যখন তাঁহার প্রধান অতিথির ভাষণে প্রত্যেক
উপস্থিত কর্তব্য সম্পর্কে বলিতেছিলেন, তখন এক অপ্রত্যাশিত উল্লস
লক্ষ্য করা গিয়াছিল। শিলংএর ভ্রাতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী নিম্ন
সম্মেলনে যখন তাঁহার সভাপতির ভাষণ
আত্মশ্রদ্ধার সৃষ্টি করিতেছিলেন তখন

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

৩৬৭

“miss-a-meal” এক বেলা অনাহার করিয়া সেই অর্থ উপস্থিত সাংঘিক প্রয়োজনে মঙ্গলবাঁধে দিবার প্রস্তাব নিমেষে গৃহীত হইয়াছিল। ভ্রাতা শ্রীরাজেন্দ্রকুমার বকসীর ভাষণও বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিল। আলিপুর ছয়ারের সভাপতির ভাষণ অনবত্ত হইয়াছিল এবং ভগিনী শ্রীমতী সুলতা রায়, মালদহের ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী কাব্যতীর্থ, গোহাটীর ভ্রাতা শ্রীগণেন্দ্র চৌধুরী এবং মালদহের ভ্রাতা শ্রীসুধীর কুমার সাহা প্রভৃতির ভাষণে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। কাটিহারের ভ্রাতা শ্রীউপেন্দ্রনাথ দামের প্রত্যেকটি কথা সকলের প্রাণে দাগ কাটিয়াছে এবং শিলংএর ভ্রাতা শ্রীরাকেশ রঞ্জন দাশগুপ্তের ভাষণ আলিপুর ছয়ারে সমাগত প্রতিনিধিদের বুদ্ধি ও বুদ্ধিকে বিশেষ ভাবে জাগ্রত করিয়াছে। অনেককাল পরে হারাণো ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলে যেমন হয়, ভ্রাতা কৃষ্ণবন্ধুর ভক্তিপূর্ণ ভাষণে ঘন ঘন তাহার আমেজ পাওয়া যাইতেছিল। আলিপুর ছয়ারের সম্মেলনে শ্রীশ্রীবামণির অগ্রতম ভগিনী পূজনীয়া পিসিমাতা শ্রীযুক্তা কল্যাণী চক্রবর্তীর শুভাগমন বিশেষ প্রেরণাদায়ক হইয়াছিল। তেলিয়ামুড়ার সম্মেলনে আগরতলার বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ, অ্যাডভোকেট, এম্. এ, বি. এল. মহাশয়ের উপস্থিতি সম্মেলনকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করিয়াছে এবং অখণ্ড সম্মেলনের বাহিরে সাধারণ জনসভাতেও তাঁহার “আচার্য স্বরূপানন্দ ও জীশূদ্রে গুণবাধিকার” সম্পর্কিত অপূর্ব ভাষণ শত শত প্রাণে প্রেরণা যোগাইয়াছে। তেলিয়ামুড়া অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলনের সভাপতিরূপে চিনামারা (জোরহাট)-র ভ্রাতা শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণকালে অনেকের চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। ভ্রাতা শ্রীসুকুমার চক্রবর্তীর ভাষণে উদ্দীপনা ছিল আর, মধুপুর (আগরতলা) অধ্যাক

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৬৮

আশ্রমের কর্মী ভ্রাতা প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারীর ভাষণে এই ভীষণ দুর্ঘ্যোগময়ী পরিস্থিতিতেও যেন একটি অসাধারণ উচ্ছ্বাস জাগিয়াছিল। প্রত্যেক স্থান হইতেই আমরা টেলিগ্রাম পাইয়াছি,—“সম্মেলন” আশাতীত মঙ্গল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও খোয়াই, কল্যাণপুর আদি স্থানের ভ্রাতারা জীবন বিপন্ন করিয়া ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পদব্রজে আসিয়াছিলেন। ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে মোটর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আগরতলার পশ্চিম ও দক্ষিণের একটি মণ্ডলীও তেলিয়ামুড়ায় যোগদান করিতে পারেন নাই। এই জন্ত আগামী ২রা আশ্বিন ১৩৫১ সেন্টেম্বর রবিবার তারিখে উদয়পুরে (রাধাকিশোরপুরে) পরবর্তী ত্রিপুরা রাজ্য অথও-প্রতিনিধি-সম্মেলন হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা হাফলং-নিবাসী একটি ভ্রাতার একথানা পত্রের অংশ-বিশেষ উদ্ধার করিতে প্রলুব্ধ হইতেছি। লক্ষা, নগাঁও, শিলং, গৌহাটী, হাইবরগাঁও, লামডিং, বদরপুর বঙ্গাইগাঁও, জয়ী বালুরঘাট, ডবকা, মনিপুর রোড আদি স্থান হইতে পূর্বোক্ত স্থান সম্মেলন-চতুষ্টয়ের সাফল্য ও প্রভাবশক্তি সম্পর্কে বৈরাগ্য প্রশংসাপূর্ণ পত্র ও টেলিগ্রাম পাইয়াছি, তেমন আবার জনৈক ভ্রাতার কণ্ঠ হইতে বেরুয়া সঙ্গীতও শুনিতেছি। যথা,—

“লক্ষা ও শিলচরের প্রতিনিধি সম্মিলনিত প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলাম। প্রত্যক্ষ ভাবে যাহা জানি, তাহাতে এই সম্মেলনের দ্বারা মঙ্গলবোধের যে বিশেষ কোন কিছু হইতেছে—এরূপ মনে হয় না। প্রধান উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়ই মঙ্গলবোধ। কিন্তু মঙ্গলবোধের টাকা প্রাপ্তির পরিমাণত এ বাড়াইতে দেখি না। মনাছড়ার সম্মেলনে যে সব মণ্ডলী যাহা প্রতিনিধি

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিনিধি

৩৬৯

দিয়াছিলেন,—তাহার অনেক মণ্ডলীই অতিরিক্ত দেয়া ত দূরের কথা, খবর পাইতেছি, সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকাটাও পাঠাইতেছেন না। সম্মেলনের দ্বারা প্রেরণা জাগে বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে কিন্তু কার্য্যত তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের বর্ত্তমান প্রধান সমস্যা হই মঙ্গলবোধ। মঙ্গলবোধের বিষয়ে চিন্তা করিলে মনে হয় যে, প্রতিটি সম্মেলনীতে (বাহিরের প্রতিনিধিদের যাতায়াত খরচ এবং আবাস্যক মণ্ডলীর বহিরাগত প্রতিনিধিদের প্রতি আতিথ্য ব্যয়বাবদ) যাহা খরচ হয়, ঐ টাকাটা যদি পুণুনুকীতে চলিয়া যায়,—বরং এর চেয়ে বেশী উপকার হইবে। সংগঠন সম্পর্কেও কোন সমালোচনা হয় না এবং ২১টি মণ্ডলী ছাড়া সংগঠন-কাজ কোথায়ও হইতেছে বলিয়া কোন খবর নাই। কাজের পরিমাণ আগেকার চেয়ে যে কিছু বাড়িয়াছে, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। তবুও সম্মেলনের একটা না একটা উপকারিতা যাহা আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিব না। তবে আমাদের বর্ত্তমান এবং উপস্থিত সমস্যা সম্পর্কে, মঙ্গলবোধের আসন্ন সঙ্কট সম্পর্কে, সম্মেলনগুলির উপকারিতা নিতান্ত সাধারণ এবং হয়ত অতীব নগণ্য।”

হাফলংএর শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার উল্লিখিত মন্তব্যো সত্য নাই,—তাহা নহে। কিন্তু সম্প্রতি চারিটি স্থানে যে চারিটি সম্মেলন হইয়া গেল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা এই বিষয়ে অনেকটা স্বচ্ছতর ধারণা করিতে পারিতেছি। এতাবৎ নানা স্থানে যে সকল প্রতিনিধি-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একমাত্র ডবকার সম্মেলন ব্যতীত অত্র কোথাও এইবারকার এই চারিটি সম্মেলনের মতন উদ্দীপনা জাগে নাই। আর, আত্মশুদ্ধার কথা কহিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে যে,

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

৩৭০

এই বারকার সম্মেলনগুলি অসাধারণ। সম্মেলনের পরেও যাহা কহা
আছে, তাহা যদি প্রতিনিধিরা সর্বত্র করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইবে
এই চারিটি সম্মেলনের দ্বারা তাঁহারা এক নবযুগ বা নবান্দোলনের
করিলেন বা তাহার পটভূমিকা নির্মাণ করিলেন। কোনও কোনও
মণ্ডলী জল-ঝড়-বৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও স্ব স্ব স্থানের প্রতিনিধি প্রেরণ
করেন নাই। সেই সকল স্থান হতভাগ্য, সেই সকল স্থানের অধিবাসী
মণ্ডলীকে মৃত বলিয়া মনে করিতে হইবে। কিন্তু এইবার দেখা গিয়াছে
দারুণ ঝড়বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়াও এমন কি নাগা আক্রমণে প্রাণহানি
আশঙ্কা আছে জানিয়াও অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া
কোনও কোনও স্থান হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়াছেন,—আবার, যাহা
আশ্চর্য্য, ১৫ মাইল দূরের মণ্ডলী, যাহার ঘরের কোণায় রেলষ্টেশন
তাহারাও আসিতে ঔদাসীন্য করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্তই যুগপৎ
গিয়াছে। তবু এই চারিটি প্রতিনিধি-সম্মেলন নিঃসন্দেহে এক
আন্দোলনের পটভূমিকা। প্রতিনিধিরা সম্মেলনে আসিয়া যাহা বলিয়াছেন
কহিয়াছেন করিয়াছেন ও করাইয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি প্রতি
প্রতি মণ্ডলীতে প্রতি গৃহে তুলিবার জন্ত শ্রম করিবেন কি? বলা
এই একটা কাজ সুচারু রূপে হইলেই সম্ভবতঃ সম্মেলনগুলির অর্থ
বিকল্পে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না।

এই প্রসঙ্গে তেলিয়ামুড়া সম্মেলনে ভ্রাতা শ্রীগিরীন্দ্রকুমার মহুমদার
বলেন, তাহা প্রনিধান যোগ্য। তিনি বলেন,—“দারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
মধ্যেও সুদূর আসাম হইতে ভক্ত ও কন্যী ভ্রাতৃদ্বয় আসিয়াছেন, আশ্চর্য্য
বিভিন্ন মণ্ডলীগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে। এই প্রতি
সম্মেলনের মাধ্যমেই আমরা প্রতিটি মণ্ডলীর ভ্রাতা ও ভগিনীগণ

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৩৭১

হইয়া ভাববিনিময় করিতে পারি, প্রতি মণ্ডলীর কর্তৃত্বপরতার সংবাদ পাই এবং নবভাবে কর্মে প্রেরণা লাভ করি। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলে আগর-তলার ভগিনী শ্রীমতী শৈলজা বর্মনের ভাষণে। তিনি বলেন—“বাবামণির বিরাট কলনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্ত সকলের আগাইয়া আসা উচিত, বিশেষতঃ ভগিনীদেরই হইতে সাড় দেওয়া কর্তব্য।” দৃষ্টান্তস্বরূপে জয়ন্তীর ভগিনী শ্রীমতী সুলতা রায়, আলিপুরছারের ভগিনী শ্রীমতী লক্ষ্মী সরকার, গোহাটীর ভগিনী শ্রীমতী কিরণবরা প্রভৃতি অনেকের নামোল্লেখও করিতে পারি।—সম্মেলন কখনো বুধা যায় না, যাইতে পারেনা।

ঘাটশিলার সম্মেলন :—পশ্চিমবঙ্গ-উড়িষ্যা-দক্ষিণ-বিহার প্রতিনিধি-সম্মেলন ঘাটশিলাতে ২৬শে আষাঢ় হইবার কথা ছিল। তাহা আগামী ২৬শে ভাদ্র রবিবার হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। উক্ত তিন প্রদেশের প্রতিস্থান হইতে প্রতিনিধিরা যোগাযোগ করুন নিম্ন ঠিকানায়:—শ্রীশেবেন্দ্র নাথ রায়, ঘাটশিলা অথও-মণ্ডলী, পোঃ ঘাটশিলা, সিংভূম।

ভারতের বিশেষত্ব :—আচার্য্য বিনোবা ২-৫-৬০ তারিখে আগ্রাতে প্রাথমিক ভাষণে বলেন,—যে কেহ গামার মত পালোয়ান হইতে পারে না। যত চেষ্টাই আমি করি না কেন, গামার মত পালোয়ান আমি হইতে পারিব না। প্রত্যেকেই রাষ্ট্রপতি হইতে পারে না। কাহারও রাষ্ট্রপতি হওয়া, না হওয়া বিশেষ পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমি জোরের সহিত এবং স্বাভাবিক ভাবেই ইহা লিখিয়া দিয়াছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই হিতপ্রজ্ঞ হইতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি আশা করি যে, প্রাচীনকালে যে ভারতে ব্রহ্মবিজ্ঞা দর্শন আবিষ্কৃত হয় এবং যে দেশে পরমাত্মার রূপায় সংপুরুষের অথও পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে, সেই ভারত আজও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। মাখনের পরিমাণের দ্বারা হৃদয়ের গুণাগুণ নির্ধারিত হইয়া থাকে। মহাপুরুষ সমাজরূপী

দুধের মাখন, বাহা দুধ হইতেই আসিয়াছে। সমাজের কতখানি শক্তি
 নৈতিক শক্তি আছে তাহার পরীক্ষা সেই সমাজে কি পরিমাণ ও কোন
 শ্রেণীর মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার দ্বারা হইয়া থাকে।
 ভারতের ইতিহাসের গত এক শত বৎসরকাল আমরা ইংরাজের গোলাম
 ছিলাম, অত্যন্ত অধঃপতিত অবস্থায় ছিলাম। এই অপমানিত অবস্থায়
 আমাদের দেশে এমন ১০।১২ জন মহাপুরুষের নাম করা যাইতে পারে
 যাহাদের চেয়ে উচ্চ স্তরের নাম হয়তো আর কোন দেশে পাওয়া
 যাইবে না। এই যুগেও ভারতে যে শ্রেণীর মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন
 তাহাদের সমকক্ষ মহাপুরুষ অত্র দেশে বিরল। যে দুধ এত দূর
 অবস্থায়ও একরূপ 'বাটার পারসেন্টেজ' অর্থাৎ একরূপ পরিমাণ দান
 উৎপন্ন করিতে পারে, সেই দুধে যথেষ্ট শক্তি আছে, ইহা স্বীকার করিতে
 হইবে। ইউনান, মিশর, রোম, লোপ পাইয়াছে কিন্তু এখানে নিশ্চয়ই
 এমন কোন জিনিষ আছে যাহার ভিত্তির উপর ভারত বাঁচিয়া আছে
 এখানে ধন সম্পদ বেশী নাই, ব্যবহার-কুশলতা বেশী নাই, বিজ্ঞানও
 নাই। এত সব হওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ড হইতে আগত এক ভাই
 তাহার কথা—যাহারা কাল আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন
 তাহারা বলিলেন যে, তাহারা সমগ্র ভারত ঘুরিয়া আধ্যাত্মিকতার
 লাভ করিয়াছেন। একথা সর্বজন স্বীকৃত। ইহা আমাদের পূর্বপুরুষের
 অর্জিত সম্পদ। ভারতে ভগবদ্ভিষাস কাজ করিয়া থাকে।
 চীনা লেখক লীন, ইউ, টাংগ বলিয়াছেন, India is a Good
 toxicated land. ভারতে ভগবদ্ভক্তির নেশা আছে, সন্দেহ নাই।
 কাজেই আমি আশা করিতেছি যে, এখানে ব্রহ্মবিদ্যার ভিত্তির উপর
 একদল নিষ্কাম সেবকদল গড়িয়া উঠিবে।

পুণ্যপুরুষ আচার্য্য বিনোবার এই আশা পরমমঙ্গলময় পূর্ণ করুন। এই একটা আশার শিবরাত্রির সলিতা জ্বলাইয়াই আচার্য্য স্বরূপানন্দের বিগত পঞ্চাশটি বৎসর ধরিয়া দুর্গমের পথে যাত্রা চলিয়াছে। জাতি হিসাবে আমরা সং হইব, সদাচারী হইব, প্রেমিক হইব, ব্যক্তি হিসাবে আমরা সমষ্টির উন্নতির সহায়ক হইব, সরল হইব, সুন্দর হইব, —প্রত্যেকটা যুগ-পুরুষের অন্তরের ইহাই না কামনা!

স্বর্গীয় কুলেন রায় :—স্বলেখক, ভাবুক, চিন্তাশীল দার্শনিক পাণ্ডু মালিগাঁও নিবাসী কুলেন্দ্র কিশোর রায়ের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে আমরা মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিতেছি। একজন গুরুভ্রাতা তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর অর্থ ধার নিয়াছিলেন। সেই ধার শোধ করিবার যোগ্য চেষ্টা ভ্রাতাটি করেন নাই। ভ্রাতা কুলেন্দ্র কিশোরের মৃত্যুর সহিত এমন একটা অশুচি ঘটনার সম্পর্ক আছে জানিয়া আমরা লজ্জায় অধোবদন হইয়াছি। কথা বলিবার আজ ভাষা নাই।

কুলেন রায় স্বলেখক ছিলেন। বুদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্পর্ক বিষয়ে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। একদা তিনি ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সহিত বিশেষ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন, এই কথাটি হয়ত অনেকেই জানেন না। তাঁহার গুরুভক্তি অনুপম ছিল। নিজে দরিদ্র হইলেও পুপুন্যকীর বিপদ-আপদে তাঁহাকে মুক্তহস্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

বিগত ৫ই আষাঢ়, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী প্রীতিকণা রায় মালিগাঁও কল্লকুঠিতে অখণ্ড-মতে তাঁহার শ্রদ্ধা সমাপন করেন। অখণ্ড-সংহিতা পাঠ, সমবেত উপাসনা, হরি-ওঁ কীর্ত্তন, নিমন্ত্রিতদের ভোজনা-পায়ন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা প্রভৃতি সবই ক্রটিহীন ভাবে উদ্ঘাপিত হয়।

গোহাটা অথও-মণ্ডলী হইতে ৩০ জন ভ্রাতা এবং ১২ জন ভগিনী আসিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

আমরা পরলোকগত আত্মার নিত্যশান্তি প্রার্থনা করি।

বঙ্গভাষার প্রসার :- চিদাম্বরমের ৫ই জুলাইএর সংবাদে প্রকাশ আনামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা প্রবর্তনের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার বার্ষিক ৫০০০ টাকা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে চাহিয়াছেন। আনামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে বর্তমানে তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মালয়ালম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

নরমাংস ভোজীর দল :- আমরা পিশাচসিদ্ধদের কথা শুনিয়াছি। হিন্দুদের মধ্যে ঘোরাচারী সাধকেরা নরমাংস খাইত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মুসলমানদের মধ্যেও যে তাহা আছে, ইহা কাহারও কল্পনা ছিলনা। ঢাকার ৬ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি রাজশাহী জেলায় শয়তানের উপাসক নরমাংসভোজী এক সম্প্রদায়কে আবিষ্কার করা হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের একজন ধৃত হইবার পর পুলিশের নিকট সে স্বীকারোক্তি করে। তাহাতেই এই চাক্ষুস্যের বিষয়টি উদ্ঘাটিত হয়। এই ব্যক্তির নাম সুলতান। সে মুসলমান নাম ধারণ করিলেও মুসলমান ধর্মের আদর্শে বিশ্বাস করে না। রাজশাহী টিরাপাড়া কবরখানা হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। সে পুলিশের মনে প্রথমে এই বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করে যে, সে একজন কফিন চোর মাত্র, কিন্তু তল্লাসী করিয়া পরে দেখা যায় যে, কফিনের কাপড়ের ভিতরে সে সদ্য কবর দেওয়া একটি মৃত দেহের মাংস ও হৃদপিণ্ড লইয়া চলিয়া বাইতেছে। ধরা পড়িয়া যে সত্যকথা বলিতে বাধ্য হয়। এই সম্প্রদায়ে প্রায় ৫০ জন লোক আছে। তাহার সকলেই শয়তানের উপাসক। আবহুস সোভান নামে এক

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৩৭৫

ব্যক্তি তাহাদের ধর্মগুরু। সে এখন পলাতক। সুলতান বিচারাধীন অবস্থায় হাজতে আছে।

কংগ্রেস-সভাপতির সতর্ক-বাণী :- পাটনার ৬ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, বিগত ৫ই জুলাই সন্ধ্যায় আজ্ঞামান ইসলামিয়া হলে এক যুবসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এন সঞ্জীব রেড্ডী ভাষা লইয়া বাড়াবাড়ির জন্তু অসহিষ্ণু যুবকদের তীব্র ভৎসনা করিয়া বলেন যে, তাঁহারা যদি ভারতকে ঐক্যবদ্ধ দেখিতে চান তবে তাঁহাদের শৃঙ্খলা-পরায়ণ ও সহিষ্ণু হইতে হইবে।

শ্রী রেড্ডী বক্তৃতার সূচনায় বলেন যে, হিন্দীই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হউক, ইহাই তাঁহার কাম্য হইলেও ভালো হিন্দী জানেন না বলিয়া তিনি ইংরাজীতে ভাষণ দিবেন। নিজের এই অক্ষমতার জন্তু তিনি ক্ষমা প্রার্থী। শ্রোতৃবৃন্দের কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিলে শ্রী রেড্ডী তাহাদের তিরস্কার করিয়া বলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাঁহার মাতৃভাষা তেলেগুতে বক্তৃতা দেওয়ার পক্ষপাতী। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার মাতৃভাষায় বলিবেন এবং আবার কেহ উহা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে বাধ্য হইতেছেন। শ্রী রেড্ডীর ভাষণ অনুবাদ করিয়া শোনান প্রাক্তন কংগ্রেসী সংসদ-সদস্য শ্রী ভাগবৎ ঝা।

শ্রী রেড্ডী যুবকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তাঁহাদের জ্ঞান উচিত যে, দক্ষিণ ভারতে হিন্দী-বিরোধী মনোভাব রহিয়াছে। সুতরাং হিন্দী ভাষীরা যদি অসহিষ্ণু হন—সারা দেশ টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে।

শ্রী রেড্ডী উত্তর দিক হইতে ভারতের বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, হিমালয়ের ওপার হইতে যদি আক্রমণ আসে, তবে শুধু বিহার

৩৭৬

বা উত্তর প্রদেশ বা পাঞ্জাবই বিপন্ন হইবে না—বিপন্ন হইবে সমগ্র দেশ। সুতরাং এই সঙ্কটজনক সময়ে সকলেরই কথায় ও কাজে বীরত্বের হওয়া উচিত। নহিলে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা হারাইতে হইবে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় ব্রিটিশরা জনগণের উপর লাঠি চালাইয়াছে, গুলী চালাইয়াছে, দেশ-প্রেমিকদের জেলে আটক রাখিয়াছে কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তাহারা হত্যা করে নাই। তারা ব্রিটিশরা ছিল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। কম্যুনিষ্টরা বিরোধী দলের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সহ করে না। বিরোধী মাত্রকেই কম্যুনিষ্টরা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে। সুতরাং এবার স্বাধীনতা হারাইলে তাহা পুনরুদ্ধার করিতে লাগিবে শত শত বৎসর।

কংগ্রেস সভাপতি বিজ্ঞোচিত কথাই বলিয়াছেন। জাতীয় ঐক্যের দিকে সুদূর প্রসারিণী দৃষ্টি রাখিয়াই আজ প্রত্যেকের চলা, বলা, ভাব উচিত। সাময়িক অসহিষ্ণুতা দিয়া দেশে ত্রিভুতার সৃষ্টি করিয়া সত্যি ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে।

ফিজোর পলায়ন :- লণ্ডনের ৫ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ যে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন এক বিবৃতি প্রদান করেন যে, ডাঃ এ. জেড্. ফিজো যে ভারত অর্থাৎ নাগা পর্বত হইতে ইংল্যাণ্ডে পলায়ন করিয়াছেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, ফিজোর নিজের লোকেরাই তাহাকে অগ্রাহ করিয়াছে।

চমৎকার কথা! এমন বুদ্ধি দিতে না পারিলে কি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গদি দখল করিয়া রাখা যায়? কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, ফিজোর নিজের লোকেরা ফিজোকে মানে না, তাহা বরং সত্যই হইল, কিন্তু নাগা বিদ্রোহ ধামিল না কেন?

শ্রাবণ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

ক

বন্ধু হে, শাক দিয়া মাছ ঢাকার রীতি অতি প্রধান হইলেও ইহা আত্মপ্রতারণার নামান্তর। “কিছু না” “কিছু না” বলিয়া সবগুলি গুরুতর ব্যাপারকে উড়াইয়া দেওয়া চতুরতা হইতে পারে কিন্তু প্রতি-রক্ষার সহায়ক নহে।

সমবেদনা প্রকাশ :- আসামের সমূহ গোলযোগে যে সকল ভ্রাতা-ভগিনী অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে আজ আমরা দুঃখ-ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা ও সাহায্য জানাইতেছি। আসামস্থিত সকল স্থানের সকল ভ্রাতা-ভগিনীদের বিস্তারিত কুশল সংবাদ জানিবার জন্ত আমরা উদ্বিগ্ন।

পত্র লেখকগণের প্রতি

এতদিন চাশ ডাকঘরের সকল চিঠিপত্র এস-ই রেলওয়ে দিয়া এবং ভায়া পুকলিয়া আসিত। সম্প্রতি ডাক বিভাগের ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন হইতে ডাকের সব চিঠি-পত্র ও মনিঅর্ডার প্রভৃতি ই-রেলওয়ে এবং ভায়া ধানবাদ আসিতেছে। সুতরাং এখন হইতে পুপুন্যকীতে পত্রাদি লিখিতে বা টাকা পাঠাইতে নিম্নরূপে ঠিকানা-পরিবর্তন করিয়া লিখিবেন। যথা—

পুপুন্যকী আশ্রম

পোঃ চাশ, (ধানবাদ), ইষ্টার্ন রেলওয়ে.

কেহ আর “ভায়া পুকলিয়া” লিখিবেন না। ইতি—

বিনীত—

শ্রীনিত্যসুন্দর ব্রহ্মচারী

পুপুন্যকী আশ্রম

পোঃ চাশ, (ধানবাদ), ইষ্টার্ন রেলওয়ে।

পশ্চিমবঙ্গ-উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-বিহার অথগু-প্রতিনিধি-সম্মেলন

স্থান :—ঘাটশিলা, সিংভূম

সময় :—অপরাহ্ন একটা ।

তারিখ—২৬ ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর, রবিবার ।

উদ্বোধক :—শ্রীমোহিত কুমার রায়চৌধুরী (কলিকাতা)

সভাপতি :—শ্রীনবকিশোর সেনগুপ্ত

প্রধান অতিথি :—শ্রীমতী ভূষণ রায় (কোলাঘাট)

বিশেষ অতিথি :—শ্রীমুকুল সেনগুপ্ত (খাতড়া)

রেলের টাইম টেবলের সংক্ষিপ্ত সার

খড়গপুর ছাড়ে ৫-২০ ; ঘাটশিলা পৌছে ৮-১৪

টাটানগর ছাড়ে ১০-২৯ ঘাটশিলা পৌছে ৩-২২

ঘাটশিলা ছাড়ে রাত্রি ১২-২৯ টাটানগর পৌছে ২-৫

ঘাটশিলা ছাড়ে ২৩-২৫, খড়গপুর পৌছে ১-৫২

নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :—

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়

ঘাটশিলা অথগু মণ্ডলী,

পোঃ ঘাটশিলা সিংভূম,

১১/২/৫৫

প্রতিধ্বনি

(বার্ষিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ { ভাদ্র, ১৩৬৭ { ৫ম সংখ্যা

গান

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর জীজীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব]

(২)

হৃদীন যবে চৌদিকে আসে ঘিরে,

গম অজানিতে লহ যে টানিয়া

অভাগারে ধীরে ধীরে ॥

যাদের ভেবেছি বান্ধব, তারা

কেহ নাহি চাহে ফিরে,

প্রত্যাশাতীত লাঞ্ছনা আর

বঞ্চনা দেয় চিরে

প্রতিধ্বনি

গান

[৯ম বর্ষ, ৫ম দ্ব্যর্থ]

৩৭৮

অতিবিশ্বাসী হৃদয়-খানার
 শোণিত-আধারটীরে
 তখন কেবল তুমিই হে প্রভো
 তোমার স্নেহের নীড়ে
 মম অজ্ঞানিতে লহ যে টানিয়া
 অভাগারে ধীরে ধীরে ॥

শত বরষের একত্র বাসে
 আপন হ'ল না যারা,
 রণ-লুপ্তারে গর্জিয়া আসে
 বন্ধ-পাগল পারা,
 ক্ষুদ্র শিশুর কণ্ঠ চাপিয়া ধরে,
 ভয়াব্ধ কুল-ললনার গায়ে
 নিমেষে বাঁপিয়া পড়ে ।
 হিংস্রতা দেখি' দুঃখে যখন
 ভাসি' নয়নের নীরে,
 চুপি চুপি তুমি আস বুঝি প্রভু
 হৃদয়ের মন্দিরে ?

যার যাহা ছিল দগ্ধ হইল
 আদিম হিংস্রানলে

ভাদ্র, ১৩৬৭]

গান

প্রতিধ্বনি

৩৭৯

নিরীহের দল হইল কোঁতল

বর্বর পশুবলে ।

ছাড়ি' গৃহতল অরণ্যপানে ছোটে,

বেড়াজালে ধরি' তাদেরে হানিতে

দলে দলে কারা জোটে ?

শুধু আতঙ্ক, উৎকট ভয়

ঢাকিল অশ্বিটীরে,

তারি মাঝে তুমি বক্ষে চাপিয়া

ধরিলে বিশ্বাসীরা ?

আর প্রাণে ভয় নাই,

জীবনে মরণে তোমারেই যদি

নিয়ত সঙ্গী পাই ।

সন্দেহ আর সংশয় মাঝে

তোমার কণ্ঠে অভয় বিরাজে,

তোমার দৃষ্টি নূতন সৃষ্টি

করিবে বিশ্বটীরে,

আর ত' তোমারে হারাব না প্রভো

অবিশ্বাসীর ভিড়ে ॥

প্রতিধ্বনি

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৩৮০

সভাপতির অভিভাষণ *

পরম পূজনীয় পিসীমা, †

আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম গ্রহণ করুন। একান্ত অভাবিতরূপে আপন
শ্রীচরণ-দর্শনের সুযোগ লাভ করিতে পারিয়া আমরা আজ
আপনার শুভাগমন অতুল্য সম্মেলনের শুভ সূচনা করিতে
আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন সাফল্য-মণ্ডিত হই।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও শ্রদ্ধেয়া ভগিনীগণ,

আমার আন্তরিক প্রীতি ও সম্ভ্রম অভিবাদন গ্রহণ করুন।

উত্তর-বঙ্গ ও পশ্চিম-আসাম অঞ্চল-প্রতিনিধি-সম্মেলনের এই
অধিবেশনে আমাকে সভাপতি মনোনীত করিয়া আমার প্রতি আপন
যে স্নেহের পরিচয় আপনারা দিয়াছেন এবং যে প্রভূত সম্মান
আমাকে অধিকারী করিয়াছেন, ইহার জন্ত আমি আপনাদের
অশেষ কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অক্ষম-প্রয়াস দ্বারা
আপনাদের এই স্নেহের দানকে খর্ব্ব করিতে চাহি না। এই-ই
একান্ত ভরসা যে, শ্রীশ্রীবাবামণির অপার করুণা এবং আপন
সকলের সহৃদয় এবং সক্রিয় সহযোগিতা আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ
পালনের শক্তি দিবে।

উত্তরবঙ্গে প্রতিনিধি-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বলিয়া
বাস্তব-গুরুত্ব সমধিক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেদিন সুদূর নয়, যেদিন

* বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ৫ই জুন ১৯৬০, আলিপুরদুয়ার ম্যাকউইলিয়াম স্কুলে
উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম আসাম অঞ্চল-প্রতিনিধি-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

† শ্রীশ্রীবাবামণির অতীত কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা কল্যাণী চক্রবর্তী এই সভায়
উপলব্ধ আলিপুর দুয়ার আসিয়াছিলেন এবং সকলকে অশেষ প্রেরণা দিয়াছেন।

ভাদ্র, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৩৮১

মানকেও অতিক্রম করিয়া এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অখণ্ড-জীবনের নবতর জ্যোতির্ষ্ময় অধ্যায়-পরম্পরায় এক কল্যাণ-ভূমিকারূপে অভিনন্দিত হইবে এবং আজ আমরা, যাহারা এখানে সমবেত হইয়াছি, সকলে এই কথা ভাবিয়া অপার আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিব যে, আমরাই রচনা করিয়াছি—এই মঙ্গল-মুখবন্ধ, যেমন করিয়া আজ এই মুহূর্তে অখণ্ড ভ্রাতা ও ভগিনীদের সমবেত-প্রচেষ্টায় রচিত হইতেছে, মঙ্গল-বান্ধ,—নবতর সম্ভাবনার এক বিরাট ভূমিকা এই বিরাট ভূমিকা রচনার ভারও তো নিয়াছি আমরাই। কোন্ অখণ্ড-ভ্রাতা-ভগিনী আনন্দে ও আশ্ব-প্রসাদে আজ ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছেন না এই ভাবিয়া যে, আমরাই রচনা করিতেছি—শ্রীশ্রীবাবামণির ভাষায়,—তঁাহার দেব-জীবনের সুদীর্ঘ “চৌত্রিশটি বৎসরের কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনার সাক্ষী এবং সার্থকতা।”

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—“মঙ্গল-বান্ধ একটা বিরাট পরিকল্পনার আধার, একটা মহৎ ভবিষ্যতের আশ্রয়। অতিবর্ষায় ভাঙ্গিয়া গিয়া মঙ্গল-বান্ধ আপাততঃ আমাদিগকে বিপদে ফেলিলেও ইহা যদি যোগ্যভাবে মেরামত সভাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র সংঘের শক্তি, মর্যাদা, জনসেবার ক্ষমতা এবং দরিদ্র মধ্যবিত্তের পুত্রকন্ঠাগণের সং-শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ভাবী ব্যবস্থা ইহা দ্বারা হইয়া যাইতে পারে।”

তিনি বলিয়াছেন,—“শিক্ষার সহিত জীবিকা ও চরিত্র এই দুই জিনিষেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শিক্ষা-সম্পর্কিত আমার যাবতীয় ধ্যান এই দুইটি জিনিষকে জড়াইয়া ধরিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ সমান গতিতে এক-লক্ষ্যে চলিতেছে। আমার ভ্রমণ-বহুল ব্যস্ত-জীবনের মধ্যে তোমরা দেখিয়াছ ভাষণ-দান-রত এক অসাম্প্রদায়িক সদ্ভাব-প্রচারকের মূর্তি। কিন্তু তোমরা কেহই জানিবার অবকাশ পাও নাই যে, শিক্ষার আমূল

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৩২

সংস্কারের কি প্রয়াস চলিতেছে আমার ধ্যানের জগতে। মঙ্গল-বাণের সহিত সেই ধ্যান বড়ই অঙ্গাজীভাবে জড়িত।”

তিনি আরও বলিয়াছেন,—“চোখে না দেখিলে কেহই কিছু বুঝিতে পারিবে না। আমি চাহি যে, আগামী ১২ই পৌষ তারিখে প্রত্যেক স্থানের প্রতিনিধিরা পুপুনকী আসুক। স্বচক্ষে দেখুক,—কি তাহার গড়িয়াছে, নিজের বুদ্ধি দিয়া বিচার করুক, জাতির জন্ত কি ভবিষ্যৎ তাহারা নির্মাণ করিতেছে।”

তাই আজ এখানে সভাপতিরূপে ভাষণ দিতে দাঁড়াইয়া আমার কেবলই মনে হইতেছে, আমার এই ক্ষুদ্র ভাষণ তবেই সার্থক হইয়া উঠিবে, যদি এই একটি মাত্র ধ্বনি আমি আপনাদের প্রত্যেকের অন্তরে অনুরণিত করিয়া তুলিতে পারি যে, শ্রীশ্রীবাবামণির এই মঙ্গল-সংগীত সিমেন্টকংক্রিটের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার পুণ্য দায়িত্ব আজ আমাদের সর্ব প্রথম ও সর্ব-প্রধান।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—“তোমাদের অকপট ত্যাগ ও অন্ন দান করিয়া দান এক সুমহৎ বস্তুর জন্ম দিতেছে। তোমাদের শ্রদ্ধা ও প্রেম এক অসাধারণ জিনিষ আস্তে আস্তে গড়িয়া তুলিতেছে। একত্রে তোমরা ধন্য।”

কিন্তু, আমি ভাবিতেছি অল্প কথা, যে কথা, আপাত-শ্রুতিতে রূপ বলিয়া প্রতীত হইলেও, না বলিলে হইবে সত্যের অপলাপ। আমরা আত্ম-প্রবঞ্চনা করিতেছি। ফলে, দেখিতে দেখিতে যে, চরম আঘাতের আমরা সন্মুখীন হইতেছি, সে কথা ভাবিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সত্যই কি আমরা শ্রদ্ধাবান? আমরা প্রেমিক? আমরা দাতা? আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের প্রেম আমাদের দান, যত ক্ষুদ্রই হউন,

ভাদ্র, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৩৮৩

যত নগণ্য হউক, আন্তরিক কি না, আমাদিগকে ইহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবামনি লিখিয়াছেন,—“মঙ্গল-বাধ একটি সাময়িক উপলক্ষ্য মাত্র। এই বাধ না ভাঙ্গিলে তোমরা ইহার অস্তিত্বের কথা এত দ্রুত জানিতে পারিতে না। আমার দেহটিও না ভাঙ্গিলে তোমরা কেহই জানিতে পারিবে না—কি শ্রম এই দেহটি কাহাদের উত্তর দিয়া গিয়াছে। তবে দেহ ভাঙ্গিলে আর মেরামত চলিবে না, মঙ্গল-বাধ জড়-পদার্থ বলিয়া ভাঙ্গার পরে মেরামত সম্ভব হইতেছে।”

পুণুনকীর প্রথর রোদ্রে দাঁড়াইয়া প্রাতে আটটা হইতে রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত কাজ করিতে এবং করাইতে গিয়া তাঁহার পা দুইটি ফুগিয়া গিয়াছে। শরীরে ফোঁসা পড়িয়াছে। গায়ের রং কালো হইয়া গিয়াছে। তিনি পীড়িত শরীরে বাধ্য হইয়া মুশোরী গিয়াছেন। এখনও কি আমাদের সুবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার সময় আসে নাই? কি আমাদের করা উচিত ছিল, কি আমরা করিতেছি, কি আমাদিগকে করিতে হইবে, তাহা তলাইয়া বুঝিবার সময় কি আমাদের হয় নাই? হে আমার অখণ্ড ভ্রাতা ও ভগিনীগণ; তোমাদের শ্রদ্ধা, তোমাদের প্রেম আন্তরিক কি না, আজ ইহার কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা।

শ্রীশ্রীবামনি চাহেন না কাহারও একক সামর্থ্য, তিনি চাহেন—প্রতিটি কাজে আমাদের প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী সহযোগ, ধারাবাহিক সহযোগ, অকপট সহযোগ। তুলনা-মূলক লোক-দেখানো সহযোগ নয়। আমরা যদি আন্তরিকতার সহিত অনুধাবন করিতে পারি তাঁহার এই গুঢ় অভিপ্রায়, অনুসরণ করিতে পারি তাঁহার এই নির্দেশিত পথ, অনুশীলন করিতে পারি অকপটতার, সহযোগিতার, ধারাবাহিকতার, তাহা হইলে, এমন কোন্

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৩৮৪

কার্য আছে, আমাদের পক্ষে বাহার সুসম্পাদন অসম্ভব। ইহাই শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-প্রদর্শিত কর্মের কোশল। অথচ এতই আমাদের কাছে প্রার্থী হইতে হইবে না, কাহারও কার্য চাঁদার খাতা নিয়া বিরক্তি উৎপাদন করিতে অথবা অপমান আহবান করিতে হইবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—“সকলে আগ্রহ হইতেছে না বলি তোমরা মনে দুঃখ করিতেছ। কিন্তু বাবা, আগে প্রয়োজন সব মনে প্রেম-ভক্তির সঞ্চার। বর্গী দস্যুর মত গিয়া তোমরা জোর করি চোখ আদায় করিলে ত ইহাদের পুণ্য বা শান্তি কিছুই হইবে না। তোমরা সকলকেই কৃপণ থাকিতে দাও, কিন্তু আগে ইহাদিগকে ভক্তি অধিকারী কর। ভক্তি-ধনে ধনী হইলে কলিকাতার রামকান্তের মত নিজে ছেঁড়া নেকড়া পরিয়া থাকিয়াও সর্বত্র সৎকাজে সমর্পণ করি দেওয়ার মনোবল আসিবে। তোমরা নামের বজায় পৃথিবী প্লাবিত কর। সৎ-সঙ্গ, সদালোচনা, সদনুশীলনে ধরণী স্নিগ্ধ, সরস, সুন্দর কর। তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না, তোমাদের আগ্রহ অপূর্ণ থাকিতে পারে না।”

আমি আজ আপনাদের স্নেহের বলে বলীয়ান। তাই, এ প্রশ্নটি সঙ্গত-ভাবেই আমি আজ আপনাদের কাছে উত্থাপন করিতে পারি যে কোন্ সে অদম্য-আকর্ষণ, বাহার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া আমরা শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-প্রান্তে ছুটিয়া আসিয়াছি? কোন্ সে মহান আশ্রয় যাহা আমরা গৃহীত করিয়াছি, উদ্ধুদ্ধ, করিয়াছি, আমরা ব্যাকুল-আগ্রহে ছুটিয়া আসিয়াছি তাঁহাকে বরণ করিয়া নাই। একটাবারও কি আমরা সে কথা ভাবিয়া দেখিব না? একটাবারও কি আমরা এই আত্ম-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইয়া আত্ম-প্রত্যয়ের আদর্শ বীৰ্য্যে নিজেদিগকে সু-প্রতিষ্ঠিত করিব না?

ভাদ্র, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৩৮৫

আমি নিশ্চিতভাবেই একথা জানি যে, কেহই আমরা অন্যের পেছনে ঘুরিয়া মরিতেছি না। নিশ্চিত-নির্ভর জানিয়াই আমরা এমন এক বিরাট মহীকহের পাদ-ছায়াতলে আশ্রয় পাইতে ছুটিয়া আসিয়াছি, যাহার আর তুলনা নাই, কোনো কালেই ছিল না, কোনো কালেই থাকিবে না। মোহ-গ্রস্ত আমরা, আমাদের মোহ-ঘোর ভাঙ্গিয়া দিতে, পুনরায় আমাদেরকে স্বস্থ করিয়া, আত্মস্থ করিয়া অমিত-বিক্রমে কুরু-রণঙ্গণে বাঁপাইয়া পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্তই হ্রদীকেশের পাঞ্চজন্ত আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া নিনাদিত হইতেছে, প্রতিনিিনাদিত হইতেছে, আর তাহারই রেশ আমাদের কর্ণে পশিয়া আমাদেরকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে, আমাদেরকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, আমরা ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া আসিয়াছি।

আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি—ধর্মযুদ্ধে আমরা কে কোন্ রণক্ষেত্রে, কি ভাবে, জীবন আহতি দিব, তাহারই পরামর্শ করিতে, কর্মপন্থা স্থিরীকৃত করিতে। ইহারই নাম—অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলন।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীরাজেন্দ্র কুমার বক্শী মহাশয় আমাদের শিলচর অধিবেশনে অতি মূল্যবান কথা পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—“অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলনের কর্তব্য অতি ব্যাপক ও বিশাল। শুধুমাত্র মঙ্গল-বোধ সংস্কার বা তাহার তীরে তীরে ভাবী-কালের শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজটুকুতেই প্রতিনিধি-সম্মেলন আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তবে বর্তমানে মঙ্গল-বোধ হইতেছে সর্বোপেক্ষা জরুরী বিষয় এবং এই বিষয়কে উপেক্ষা করিলে পরম-কর্তব্য-সাধনে চরম-অবহেলার পরিচয় দেওয়া হইবে। মঙ্গল-বোধ সম্পর্কিত বিষয়ের এই প্রাথমিক-দাবী থাকা সত্ত্বেও একথা ভুলিলে চলিবে না যে, প্রতিনিধি-সম্মেলনগুলি যেন আমাদের কথার ফানুস উড়াইবার গড়ের

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৩৮৬

মাঠেই পর্যাবসিত না হয়। প্রত্যেকটি সম্মেলনের অনুষ্ঠানের দ্বারা আমরা যেন শক্তিসংগ্রহ করিতে পারি।”

তাঁহারই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমিও আজ আপনাদিগকে বলিতে চাহি যে, প্রতিনিধি-সম্মেলনের এই একটি বিশেষ ব্যাপার অপেক্ষাও অনেক ব্যাপকতর সার্থকতা আছে। একই আদর্শে অনুপ্রাণিত আমরা, আমাদের স্বার্থ-ও অভিন্ন। একরূপ সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা একে অগ্ৰে বন্ধিতে এবং বৃদ্ধিতে পারিব। আমাদের সম্মিলিত শুভেচ্ছা আমাদেরিগকে অনুপ্রাণিত করিবে সেই সকল সুচিন্তিত সংস্কল্প গ্রহণ করিতে, যাহার অনুশীলনে আমরা রচনা করি। আমাদের ত্যাগ-সুন্দর স্মধুর বর্তমান, গড়িয়া তুলিব আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত, গৌরব-দীপ্ত মহান্ ভবিষ্যৎ। আমাদের প্রতিটি সম্মিলিত সংস্কল্পের আমরা হইব ধারক এবং বাহক, তবেই না আমাদের এই প্রতিনিধি-সম্মেলন হইবে সাফল্য-মণ্ডিত। আমরা প্রত্যেকে স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া, আমাদের অগ্রাগ্র ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ, যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া আমরা এখানে যোগদান করিতে আসিয়াছি, তাঁহাদের একত্রে ডাকিয়া আনিয়া আমাদের এই সম্মেলনের মর্ম্ম-বাণী তাঁহাদিগকেও শুনাইব, তাঁহাদিগকেও আমাদের সংস্কল্পে অনুপ্রাণিত করিয়া একত্রে এক বল-দুর্ধ্ব মৈত্রবাহিনীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িব কর্ম্ম-রণাঙ্গনে।

প্রতিনিধি-সম্মেলনের আরও সার্থকতা রহিয়াছে। ইহার নৈতিক-প্রভাব আমাদের চিন্তা-শুদ্ধি করিবে, আমাদেরিগকে ক্রমশঃ উন্নত হইতে উচ্চতর চিন্তার অধিকারী করিবে,—আমাদের একতা-বল বৃদ্ধি পাইবে। একক প্রচেষ্টায় যখনই আমরা কোনও সমস্যার সুসীম সমাধান করিতে অপারগ হইব, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে নিশ্চিতই তাহার

ভাদ্র, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৩৮৭

সমাধান মিলিবে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—“প্রতিনিধি-সম্মেলনে যোগদানকে তোমরা তীর্থ-যাত্রার মত মনে করিও।”

প্রসঙ্গক্রমে আমি আরও একটি কথা বলিতে চাই। একটা সাম্প্রদায়িক জীবনের পক্ষে যত কিছু সমস্তা, তাহার সবগুলিরই সুসীমাংসা শ্রীশ্রীবাবামণিতেই সম্ভব এবং তিনি তাহাই আজ জগতকে দিয়া বাইতেছেন। এখানে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি কি এবং কে, আজও কি তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে? কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তাঁহাকে সম্যকরূপে চিনিতে বা বুঝিতে আমাদের সেই আগ্রহ কোথায়? তাঁহার চিন্তা-সমূহের সঙ্গে যোগ রাখিবার চেষ্টা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। নতুবা বুঝাই আমরা তাঁহার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করি।

ধর্মজীবনের গোড়ার কথাই হইল—গুরুতে অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা। এজ্ঞা এখনও দেখা যায় যে, শিষ্যদের উপর উৎপীড়নের পর্য্যন্ত অস্ত্র নাই। এই উৎপীড়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে শিষ্যের মঙ্গল-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি দিয়াছেন আমাদের অবাধ স্বাধীনতা। আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে কখনও তিনি থর্ক করিয়া দিতে চাহেন নাই, আমাদের বিচার-কমতাকে কখনও তিনি পঙ্গু করিয়া দিতে চাহেন নাই। তিনি চাহিয়াছেন,—মর্কীবাহ্য আমাদের স্বাভাবিক বিকাশ। স্বাধীনতার তিনি কেবলমাত্র উপাসকই নহেন, স্বাধীনতার তিনি এক অদ্বিতীয় দাতা। লক্ষ সাধকের তিনি গুরু কিন্তু একটি নিমেষের জন্যও তিনি স্বৈরাচারী খেচ্ছাতন্ত্রী বিবেকের কর্তরোধকারী শাসক নহেন। তিনি কখনও এমন কোনো কন্ম করিতে আমাদের নিদর্শন দান করেন নাই, যাহা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি-প্রণোদিত অথবা বিচারসহ নহে। ধর্ম-জগতে অথবা কন্ম-

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৩৮৮

জগতে এরূপ অবাধ-স্বাধীনতা দানের দৃষ্টান্ত খ্রীশ্রীবাবামণি প্রথম জগতকে দেখাইয়াছেন। ইহা তাঁহার একক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা যে একমাত্র তাঁহার আদেশ পালনের যোগ্যতা-অর্জনের দ্বারাই আসিবে, একথা আমাদের কাছে নিঃসংশয়ে বোধিত হইবে। এখানে যদি বিচারে আমরা কণামাত্রও ভুল করি, আমাদের সে ভুল হইবে আত্মঘাতী ভুল। স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর নয়। যে প্রাকৃতিক নিয়মে জগৎ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সেই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্যেরই নাম স্বাধীনতা। আনুগত্য-হীনতা স্বাধীনতার হস্তারক। আমরা যদি আমাদের গুরুদত্ত-সাধনে নিষ্ঠাশীল হই, প্রকাশ্য দিবালোকের মত গুরুদেবের যাবতীয় অভিপ্রায় আমাদের কাছে স্বতঃ-পরিব্যক্ত হইবে এবং তখনই আসিবে সত্যিকার আনুগত্য, আমরা ধন্য হইব, সার্থক হইব। আমাদের জন্ম-জীবন।

অখণ্ড-মণ্ডলী একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। বিশ্ব প্রতিটি অনু-পরমাণুর সঙ্গে রহিয়াছে ইহার নিকট-সম্বন্ধ, নাড়ীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। অখণ্ড-পতাকাবাহী তাই বিচ্ছিন্নভাবে একক সামর্থ্য নিয়ে কোনও কাজেই অগ্রসর হইতে পারেন না, তাঁহাদের প্রয়োজন এমন একটি সম্মিলিত শক্তি, যাহার অমোঘ-প্রভাব বিশ্বতোবিস্তার লাভ করিবে। অব্যভিচারিণী গুরু-আনুগত্যই ইহার একমাত্র সমাধান। অনতিবিলম্বে আমাদের কাছে সেই সম্মিলিত-শক্তি আহরণ করিতে হইবে।

আর আমি আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিব না। আপনারা অশেষ মেহ-প্রীতির জন্ত পুনরায় আমি আপনাদিগকে আমার আত্মিক কৃতজ্ঞতা এবং ভূনত-প্রগতি নিবেদন করি।

পরিশেষে আমি খ্রীশ্রীবাবামণির রাতুল-চরণে প্রণতি জানাই।

ভাদ্র, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

No.

৩৮৯

এইটুকুই নিবেদন করিব যে,—হে গুরো, আমরাগকে শক্তি দাও, যে
সং-সংকল্প আমরা এখানে আজ গ্রহণ করিলাম, আমরা যেন তাহার
মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি। জয়গুরু।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(শিলচর)

অখণ্ড-বাণী

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(১১৫)

বৈতবাদ আর অবৈতবাদ নিয়ে লড়াই ত' চলেছে
খাখাখা। বৈতবাদ সত্য না অবৈতবাদ সত্য তার গীমাংসা কি
হবে তলোয়ারের মুখে না অলুভূতির পথে? মাথা ফাটাফাটি ক'রে
কখনো বৈতবাদ আর অবৈতবাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হবে না।
কুরখার বুদ্ধির মুখেই কি এর শেষ নির্ধারণ সম্ভব? নির্ধারণ আসবে
অলুভূতির অতলস্পর্শ সমুদ্রের তলদেশ থেকে।

(১১৬)

দল বেঁধে অলুভূতি হয় না। দল বেঁধে ভোজে
বসা চলে, কিন্তু আশ্বাদন গ্রহণ যার যার জিহ্বায় যার যার
অলুভব-শক্তির স্থূলতা সূক্ষ্মতার উপরে নির্ভর করবে। মতামত-গ্রহণ
দলের ব্যাপার হ'তে পারে, কিন্তু আশ্বাদ-গ্রহণ ব্যক্তির ব্যাপার।

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৩৯০

আস্বাদগ্রহণে যখন মন মজে, তখন উৎসব-কলোরোলের উচ্চারণে কোলাহলও কাণে পৌছে না, সবগুলি ইন্দ্রিয় সমগ্র শক্তি নিয়ে সেই আস্বাদনীয় পরম বস্তুতেই আত্মহারা হ'য়ে যায়। উৎসবের ভোগে অনেকেই খায়, কিন্তু আস্বাদনীয় পরম বস্তুতে আত্মহারা একজন দু'জনই হয়।

(১১৭)

তুমি বলবে, দ্বৈতবাদ সত্য, কারণ, প্রকাশানন্দ সর্বদা মস্ত বড় অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হ'য়েও শ্রীগৌরানন্দের শরণেই দ্বৈতবাদী হ'য়েছিলেন। অমনি আবার ইনি বলবেন, অদ্বৈতবাদই সত্য, কারণ স্বামী রামতীর্থ আজন্ম দ্বৈতবাদী থেকেই পরমজ্ঞান লাভমাত্র কোটি ব্রহ্মাণ্ড খুঁজেও একজনকে ছাড়া দু'জনকে পেলেন না। প্রকাশানন্দ যদি প্রামাণ্য হ'য়ে থাকেন, রামতীর্থ অপ্রামাণ্য নন। সুতরাং তর্কের মরুক্ষেত্র আর যুক্তির যুদ্ধ হারিয়ে হাবে, আস্তে হাবে অনুভূতির সূজলা সূফলা মলয়জশীতলা শস্যপ্রসূ ভূমিতে। ঋষি শ্রীকৃষ্ণ অনুভূতির সমুদ্র মন্থন ক'রেই অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যেমন ক'রে বর্তমান যুগের ঋষি রামকৃষ্ণ অনুভূতির ভাণ্ডার উজার ক'রেই বিবেকানন্দকে উপদেশ দিয়েছিলেন। গীতার উপদেশ বাদ-বিতণ্ডার ফল নয়, অনুভূতিরই ফল। একটা লোকের জীবন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম সময় বিশেষে প্রবলতর হচ্ছে, একে তার অধ্যয়ন ব'লে ব্যাখ্যা করা ভুল। জ্ঞান, ভক্তি বা কর্মের লক্ষ্যবস্তু সেই জ্ঞান স্বরূপ যদি থাকেন ঠিক, তবে জ্ঞান, ভক্তি আর কর্মের ওলট-পালট কি আসে যায়? তোমার জীবন আঁকা-বাঁকা সরু নদীর মতন। এ নদী-পথেই যদি তোমাকে নৌকা চালাতে হয়, তবে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছো

ভাদ্র, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

৩৯১

হ'লে ত' নোকা একবার পূর্বে, একবার পশ্চিমে, একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে এবং বারংবার ভিন্ন ভিন্ন কোণে মুখ ক'রে চালাতে হ'তেই পারে! লক্ষ্যটা ত' সমুদ্রই,—উত্তর পশ্চিমাদি দিকগুলি বা দীপনাগি কোণগুলি ত' আর লক্ষ্য নয়!

(১১৮)

কলহ-প্রবৃত্তি চরিত্র-গঠনের এক প্রবল অন্তরায়। ক্ষমা, সহিষ্ণুতা কালাপেক্ষা এবং ক্ষম-নির্ভর না থাকিলে কেহ সুগঠিত চরিত্রের অধিকারী হইতে পারে না। মতামতের দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজকে হারাইয়া ফেলিও না। অপরের মতের উপরে তোমার মতকে প্রতিষ্ঠিত করা বা না করার মধ্যেই তোমার পৌরুষ নিহিত নহে, তোমার পৌরুষ নির্ভর করে অপরের মতামত নিরপেক্ষ ভাবে নিজের চরিত্রকে সুগঠিত করণে। তাহা তুমি করিও এবং অধুনা-উদ্ভূত নানা কলহ-সঙ্কুল হট্টগোল হইতে দূরে সরিয়া যাইও।

(১১৯)

একবার চেষ্টা বিফল হইলে শতবার তাহা করিবে, শতবার বিফল হইলে সহস্রবার করিবে, সহস্রবার বিফল হইলে লক্ষবার করিবে, লক্ষবার বিফল হইলে কোটিবার করিবে এবং কোটিবার বিফল হইলেও হাল ছাড়িয়া না দিয়া আমৃত্যু তীব্র সঙ্কল্প লইয়া কাজ করিয়া যাইতে থাকিবে। এইরূপ দৃঢ়তা, এইরূপ নিষ্ঠা এবং এইরূপ অধ্যবসায়ই ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠার পন্থা।

(১২০)

তোমাদের যে-কাহারও যে-কোনও কন্দপাশ ছিন্ন করিবার শক্তি আমার আছে। কিন্তু আমি কাহারও রুচি-প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজ প্রভাব

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৩২২

বা প্রভুত্বকে পরিচালিত করিতে ইচ্ছুক নহি। আমি মনে মনে যার সম্বন্ধে যে ইচ্ছা পোষণ করিতেছি, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তোমাদিগকে বাধ্য হইয়া তাহা হইতে হইবে। কিন্তু বতর্কণ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টি ইচ্ছার সহিত তোমাদের প্রকাশ্য কর্মোন্মেষের ঐক্য না দেখিতে পাই। ততদিন আমার ইচ্ছা আমার অন্তরের নিভূতে থাকিয়াই তোমাদের উপর সূক্ষ্ম ক্রিয়া বিস্তার করিতে থাকিবে। প্রকাশ্য ভাবে আমি কোন আদেশ দিয়া তোমাদের লৌকিক স্বাধীনতার সম্মান ক্ষুণ্ণ কিছুতেই করি না।

তোমার পক্ষে তোমার বর্তমান কর্মধারা পরিচ্যাগ অস্বীকার কর। কারণ একদিকে চিন্তা-শক্তির আড়ষ্টতা, অপর দিকে প্রতিষ্ঠালোপের আশঙ্কা, দায়িত্ব-জ্ঞান নামক এক বস্তুও কিছু আছে। কিন্তু তোমার পক্ষে প্রকৃত সঙ্কট যাহাই হইয়া থাকুক না কেন, ইচ্ছা করিলেই তোমাকে সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া আমার কর্মটানিয়া আনিতে পারি। কিন্তু আমি আনিব কিনা, তাহা আমার উপর নির্ভর করিবে না,—করিবে তোমারই উপরে।

(১২১)

অসংযমকে হুঃখের আকর জানিয়াও তুমি স্বেচ্ছায় অসংযম হইতেছ। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তোমার পূর্ব-সংকল্প তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিতেছে। এই কর্তৃত্ব ঘুচাইবার প্রধানতম ভগবৎ-সাধন।

ঈশ্বরীয় চিন্তা ও ঈশ্বরীয় চর্চাকেই সাধন বলে না। তদ্ব্যতীত সাধনে রুচিমাত্র বর্দ্ধিত হইতে পারে, এজন্ত উহাদিগকে সাধন-সহায়

ভাদ্র, ১৩৩৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

৩২৩

চলে। একটা নির্দিষ্ট প্রণালীর মধ্য দিয়া একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে একই সময়ে কোনও নির্দিষ্ট ঈশ্বরীয় কর্তব্য পালনের অধ্যবসায়ের নাম সাধন।

সাধনের দ্বারাই সঙ্কল্পের শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এজন্ত প্রত্যেক আত্ম-রক্ষার্থী ও আত্মোৎকর্ষপ্রার্থীর পক্ষে সাধনই প্রধানতম অবলম্বন।

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ ও নিজের দেহের ক্ষতি-বৃদ্ধির পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রক্ষার দ্বারা সংবম-রক্ষার অনুরাগ-বৃদ্ধি হইতে পারে মতা, কিন্তু সাধন ব্যতীত বিরুদ্ধ সংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিবার পূর্ণ সাহস ও উপযুক্ত শক্তি জাগরিত হয় না। এজন্ত তোমার প্রধান অবলম্বনীয় হইতেছে সাধন।

(১২২)

তোমারই দুই পরমার্থ-ভ্রাতা ও ভগ্নী বিবাহিত হইয়াও এ যৌবনের প্রচণ্ড প্রাবনের মধ্যে যে ভাবে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়া চলিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে ভগবৎ-সাধনার শক্তি যে কিরূপ অব্যর্থ ও কিরূপ আশ্চর্য্য তাহাই অনুভূত হয়। তোমাকে তাহাদের জীবনের এই শিক্ষাকে নিজ জীবনে দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। যৌবনাবস্থায় উপনীত পুরুষের দেহ যুবতী নারীর পক্ষে এক ভীষণ প্রলোভনের বস্তু, আবার যৌবন-বিভায় দীপ্ত রমণীর দেহ পুরুষের পক্ষে এক প্রচণ্ড আকর্ষণের জিনিষ। এ আকর্ষণ কোনও যুক্তি-তর্কের দ্বারা ঠেকাইয়া রাখা যায় না, এ আকর্ষণ জগতে লক্ষ লক্ষ মানব-মানবীর মধ্যে মাত্র একজন দুইজনের পক্ষেই অতি সহজে পরাজেয়। ভাবিয়া দেখ, তথাপি উল্লিখিত দম্পতী সম্পূর্ণরূপে সংযত থাকিতে পারিয়াছে। যদিও ইহার পৃথক্ শয্যা গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি পরস্পরের প্রতি

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

৩৯৪

পরস্পরের প্রীতির গভীরতা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া একই গৃহমধ্যে বাস করিয়াও ইহারা একদিনের জন্ত সংঘম-ভ্রষ্ট হয় নাই।

কাল্পনিক নহে, এই সকল সজীব এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিবার পরে আর তোমাদের পক্ষে ভগবৎ-সাধনের শক্তিকে অস্বীকার বা তাহার অবিশ্বাস করা উচিত নহে। তীব্র সঙ্কল্প লইয়া তোমরা ভগবৎ-সাধনে ব্রতী হও এবং সাধনের প্রভাবে যে দিব্য সংঘম আপনিই চরিত্র-মাংসে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার অধিকারী হও।

(১২৩)

পরিমিত উপবাসে শরীর ও মন উভয়েরই প্রচুর কল্যাণ হয়। রসস্থ শরীর এতে হয় ঝরঝরে, আর পাপাসক্ত মন এতে হয় অনাসক্ত। এজন্তই উপবাসের এত মহিমা। কিন্তু উপবাস দ্বারা উপবাসের পূর্ণ ফলটা যাতে লাভ করা যায়, তার দিকেও লক্ষ্য রেখে চলা উচিত।

একাদশীর উপবাস যিনি কচ্ছেন, তিনি ভয়ঙ্কর সেই দিনটাও যদি মিথ্যা, ছলনা, পরানিষ্ট-চিন্তা, ইন্দ্রিয়প্রসক্তি, গ্রাম্যালাপ প্রভৃতি হ'তে নিজেকে দূরে না রাখেন, তবে উপবাসের দ্বারা তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণ আর কতটুকু হবে? আজ উপবাস কাঁচ কালই যদি আবার অপরিমিত আহার করি, তবে উপবাসের সুফলই আমি নিজের হাতেই নষ্ট ক'রে দিলুম।

উপবাস একপ্রকারের রসনা-সংঘম, মানে খাওয়া-পানির প্রতি যে লোভ, সেই লোভের সংঘম। কিন্তু এই রসনা-সংঘমের সাথে যখন বাচিক সংঘম যুক্ত হয়, তখন রসনা-সংঘমই

ভাদ্র, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

৩৯৫

পূরা। বাক্-সংযম আর লোভ-সংযম এ' দুটির একত্র মিলনে সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-সংযমের শক্তি বদ্ধিত হয়।

কিন্তু শুধু বাক্য বন্ধ করলেই বাক্-সংযম পূরা হ'ল না। বাক্যের সংযমের সাথে সাথে যখন চিন্তাকেও সংযত করার চেষ্টা হচ্ছে, বাক্-সংযম তখনই তার সম্পূর্ণ সফল প্রদান করে।

চিন্তা-সংযমের উপায় বিবিধ। এক উপায় অভিনিবেশ, অপর উপায় প্রত্যাহার। জগতের সব চিন্তাকে বাদ দিয়ে মাত্র একটা তত্ত্বের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে দেবার যে চেষ্টা, সেইটাই হচ্ছে অভিনিবেশ। আর, মনের অবলম্বনরূপে একটা চিন্তাকেও রাখলুম না, পরন্তু যে চিন্তাটাই আসে, তাকেই সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িত করলুম, এর নাম প্রত্যাহার।

উপবাসকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে পূর্ণফল-প্রদ কত্তে হলে তার সঙ্গে বাচিক সংযম ও চিন্তা-সংযমের ব্যবস্থা থাকা দরকার। উপবাসকে শারীরিক ভাবে পূর্ণফলপ্রদ কত্তে হলে তার সঙ্গে শারীরিক গুচিতা, মনের প্রকল্লতা এবং উপবাসের পরবর্তী কালে মিতাচারী থাকার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

(১২৪)

পরমেশ্বরের কৃপা অপার ও অপারিসীম। তিনি তাঁর কৃপার শক্তিতে একটা ক্ষুদ্র ধূলিকণাকে পর্বতশিখরে পরিণত করিতে পারেন, একটা গুঁড় তৃণখণ্ডকে বজ্রের বীৰ্য্য দান করিতে পারেন। তাঁর কৃপায় নির্ভর করিয়া ভুলিয়া যাও তোমার সহস্র সীমাবদ্ধতার কথা এবং তাঁর দ্ব্যানে মন মজাইয়া একেবারে তাঁরই হইয়া যাও এবং তাঁরই কাছে নিজেকে সহস্র-খণ্ডে টুকরা টুকরা করিয়া সমগ্র বিশ্বময় ছড়াইয়া দাও।

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৩৯৬

(২২৫)

সাধন না করিয়া কেহ শান্তি পায় নাই। তপস্বী হও, হৃৎখ তোমার
দেখিয়া দূরে পলাইবে।

(১২৬)

প্রেমিক হও, হৃৎখ দূরে ষাইবে। তপস্তার দ্বারা
মানুষ যে অপার্থিব প্রেমের অধিকারী হয়, তুমি যে
প্রেমের সুরতি হও।

(১২৭)

ভবিষ্যতে যে লাখ লাখ সাধুরা নিজহাতে
কাটবেন, সেই সংবাদটা দেবার জন্তই আমি মাটি কাটছি।

কোদাল মেরেও ধ্যান-ভজন চলে। কথাটা এখনকার
সাধুরাও জানেন, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করেন না।
ভবিষ্যতের সাধুরা তদনুযায়ী কাজ করবেন। আমি কোদাল
মেরে মাত্র তার সংবাদ প্রচার কচ্ছি।

(১২৮)

এক এক কোদাল মাটি কাটি আর দেখতে পা
যেন সর্ব-সংস্কার-বিরহিত, কামনা-কলুষ-বর্জিত, পরমতত্ত্বনির্ভর
এক মহাযোগিরূপে ঐ কুটীরখানাতে ব'সে ব'সে সর্বসংস্কার
আমি কল্যাণ সাধন কচ্ছি। আমার যেন দুটা অস্তিত্ব।
অস্তিত্বে আমি সব-কিছু বহির্শূন্য কর্ত্ত্বের দ্বারা ধ্যান-স্তিমিত-কর্ত্ত্ব
যোগিরাজের যোগ-সাধনার আনুকূল্য সৃষ্টি কচ্ছি, অপর অস্তিত্বে

ভাদ্র, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

৩১৭

যেন নির্বিকার নির্বিকল্প হ'য়ে কর্মরত আমারই সর্বতোভদ্র সেবা গ্রহণ করছি। পুপুন্যকীর্তন দালান গেঁথে চললাম, মোনী হ'য়ে তাতে একটা বছর নিশ্চিন্তে তপস্তা করব বলে,—কর্ম্ম আমার কত উত্তম, শ্রমে আমার কি ক্লান্তিহীন আত্মনিয়োগ, কিন্তু মৌনব্রতের সময় চ'লে এল, অথচ দালানখানা তৈরীই হ'ল না। সব ফেলে ফেলে অগ্র সাধনায় চলে এলাম। কিন্তু যতক্ষণ ইট গেঁথেছিলাম, যতগুলি ইট গেঁথেছিলাম, ততক্ষণ আর ততবার নিজের ধ্যান-মোক্ষ মূর্ত্তিই নিজে অবিরাম ধ্যান করেছি। আজও সেখানে গেলে আমার সেই মূর্ত্তিই স্মরণ হয়। কোদল মারছি, মানে আমারই শান্ত-স্নিগ্ধ-সুন্দর রূপটিকে ঘরের ভিতরে ছুটিয়ে তুলছি।

(১২৯)

মৌনকালে কার্যিক শ্রম, হুশ্চিন্তা, কাম, ক্রোধ, ভয় ও বিদ্বেষকে দূরে সরিয়ে দিতে হয়। এইজন্তই মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে দীর্ঘ তপস্তায় নিরত হবার আগে সকল দিকে আত্মপ্রস্তুতি প্রয়োজন। হ্রস্ব কার্যিক শ্রমের প্রয়োজন কমিয়ে দাও, দারুণ হুশ্চিন্তার কারণগুলি দূর ক'রে দাও, ইন্দ্রিয়-তাড়নার অবাধ্য উচ্ছ্বাসকে আংশিক হলেও দমন করবার ক্ষমতা অর্জন কর, সকলের প্রতি ক্রোধহীন, ঘেবহীন, হিংসাহীন, ঈর্ষ্যাহীন হও, মিত্রের প্রতি হও অনাসক্ত, শত্রুর প্রতি হও উদাসীন, নিন্দাভয়, নির্ঘাতনভয়, মৃত্যুভয় পর্যাণ্ত বিসর্জন দাও। এই-রকম ক'রে এবং এই রকম হ'য়ে যদি কেউ মৌন তপস্তায় ডুবে যায়, তবে তার তপস্তা সমগ্র জগৎকে মঙ্গল বিতরণ করে।

অবিরাম জগতের মঙ্গল চিন্তা করি। সকল প্রাণীর মঙ্গল হোক, সকল জাতির মঙ্গল হোক, সকল দেশবাসীর মঙ্গল হোক,

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৩৯৮

সকল মতাবলম্বীর মঙ্গল হোক। আয় আমরা ধ্যান করি, হিন্দুর মঙ্গল হোক, অহিন্দুর মঙ্গল হোক, ভারতবাণীর মঙ্গল হোক, অভাবভীরে মঙ্গল হোক, উদারচেতার মঙ্গল হোক, ধর্মাক্ষেরও মঙ্গল হোক, নির্ধাতিতের মঙ্গল হোক, অত্যাচারীরও মঙ্গল হোক, দেবতার মঙ্গল হোক, দানবেরও মঙ্গল হোক,—আয় আমরা এই ধ্যান করি। মঙ্গল হোক পুরুষের, মঙ্গল হোক রমণীর, মঙ্গল হোক শিশুর, মঙ্গল হোক বৃদ্ধ, মঙ্গল হোক সবলের, মঙ্গল হোক দুর্বলের,—আয় আমরা এই ধ্যান করি। মঙ্গল হোক পুণ্যবানের, মঙ্গল হোক পাপিষ্ঠের, মঙ্গল হোক সাহসীর, মঙ্গল হোক কাপুরুষের, মঙ্গল হোক স্বার্থত্যাগীর, মঙ্গল হোক আত্মপরায়ণের, মঙ্গল হোক সদাচারীর, মঙ্গল হোক কদুভ্যাসীর, মঙ্গল হোক পবিত্রচেতার, মঙ্গল হোক ব্যভিচারীর, মঙ্গল হোক আত্মদাতার, মঙ্গল হোক পরস্বাপহারীর। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের মঙ্গল হোক, জ্ঞাত অজ্ঞাত অবজ্ঞাত সকলের মঙ্গল হোক, ছোট-মোট বড়-বৃহত্তম সকলের মঙ্গল হোক, মৃত-জীবিত জাত-অজাত সকলের মঙ্গল হোক, দৃষ্ট-অদৃষ্ট শ্রুত-অশ্রুত সকলের মঙ্গল হোক। শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ ছুটে থাকুক, আর আমরা তার তালে তালে বলব থাকি,—ওঁ জগন্মঙ্গলোহং, ওঁ জগন্মঙ্গলোহং।

(১৩০)

অহর্নিশ অবিরাম তাঁকে স্মরণ করাষ্ট হচ্ছে জীবের সর্বপ্রকার তপশ্চা। স্মরণ যাতে অবিচ্ছেদ্যই চলে, তারই পক্ষে সহায়ক হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসে ইষ্টস্মরণ। প্রশ্বাসটা ছাড়বার সময়ে মনে মনে ভাব তোমার ভাণ্ডারের সব কিছু নিয়ে মঙ্গলময়ের আনন্দময় নামের হুঁকার করে এ প্রশ্বাসবায়ু যাচ্ছে তার প্রেমের অভিসারে, ভগবানের দিকে।

ভাদ্র, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

৩২২

আবার খাসটী টানবার সময়ে ভাব, প্রেমময়ের প্রেমমধুর স্পর্শ নিয়ে
সে ফিরে আসছে নামের ঝঙ্কার তুলে তোমার সকল রিক্ততায় পূর্ণতা
বিধান করার জন্ত। এ যেন অবিচ্ছেদ তাঁর আর তোমার প্রেমের
খেলা।

(১৩১.)

হুই প্রেমিকের মিলন-সাধনের ব্যাপারে এ যেন খাস
আর প্রাশাসের দূতিয়ালী। খাস যেন তাঁর দূত, তাঁর
বার্তা নিয়ে আসে তোমার কাছে, তোমাকে আকুল অবীর ক'রে তুলে
তাঁর কাছে যাবার জন্ত ব্যগ্র কতে। প্রাশাস যেন তোমার দূত, তোমার
বার্তা নিয়ে ছুটে যায় তাঁর কাছে, তাঁর হৃদয় গলিয়ে মন গলিয়ে তোমার
দিকে টেনে আন্তে। কিন্তু খাসপ্রাশাসের এই দৌত্য শুধু বিরহের
হারিষের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। বিরহ আছে, দৈত আছে, ভেদ আছে,
দূরত্ব আছে, তাই দূতের প্রয়োজন। দূরত্ব ক'মে এলে, তুমি নিজেই
তোমার দূত, তুমি নিজেই নিজের দূত। প্রাশাস তখন তোমার স্বরূপ, খাস
তখন তাঁর স্বরূপ। তখন খাস আর তোমার কাছে তাঁর বার্তা ব'য়ে
আনে না, তখন প্রাশাসের রূপে তিনিই আসেন; প্রাশাস তখন আর তাঁর
কাছে তোমার বার্তা বহন ক'রে নিয়ে যায় না, তখন প্রাশাসরূপে তুমিই
যাও। এতক্ষণ ছিল নাম আর তুমি দুইটা জিনিষ, নাম আর তিনি
দুইটা জিনিষ। এখন হয়েছে নাম আর তুমি এক, নাম আর তিনি
এক, কিন্তু তিনি আর তুমি ত' এক হতে পারনি!

এই সময়ে খাস আর প্রাশাসের পৃথক অস্তিত্ব
ভগবানের সঙ্গে একেবারে মিশে যাওয়ার পরম বিয়,

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৪০০

মহাশত্রু। “তুমি আমি দুইজন রহিতে নারি, বিরহের ব্যবধানে বেলা
তারী।” এক হওয়া চাই। এক হওয়ার জন্ত যে ব্যাকুলতা, তাই
নাম না ভালবাসা! এক হওয়ার জন্ত যে চেষ্টা, তাই নাম না সাধ-
ভজন! সম্পূর্ণরূপে এক হ’য়ে যাওয়াই না আত্মসমর্পণ! তাই তখন
বিয়রূপী খাস-প্রখাসকে তুমি উপেক্ষা ক’রে তত্ত্বরূপী প্রাণ-দয়িতের সার
মন দিয়ে অবিরাম যোগ-সাধন কত্তে লাগলে। এই অবস্থা খাস-প্রখাস
বিরতির পূর্ব লক্ষণ।

ধৃতং প্রেম্না

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
লিখিত সমসাময়িক পত্রাবলী]

(৫৭৫)

হরি-ওঁ

বারাণসী

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সুখী হইবার দুইটা কারণ
প্রথম কারণ তুমি পুপুন্যকীর সাম্প্রতিক শ্রমসাধ্য কাজগুলি ভোর চাইতি
হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোদে দগ্ধ হইয়াও সানন্দে করিয়া যাইতেছ। দ্বিতীয়
কারণ তুমি সাধন করিয়া করিয়া বিমল দিব্যানন্দ লাভ করিবার সুযোগ
পাইতেছ না বলিয়া মনে মনে অস্বস্তি ভোগ করিতেছ। সাধনে সাধন

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৪০১

অনুরাগ থাকে, সাধন করিবার সুযোগ কমিয়া গেলে সে অন্তরে তীব্র
 জ্বালা অনুভব করে। এই জ্বালা তাহার অন্তরের শুদ্ধতার ও উন্নতি-
 মুখিনী অভীপ্সার প্রত্যক্ষ পরিচয়দাত্রী। সাধন করিবার জন্ত প্রাণে
 ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছ, ইহা যে কত বড় মৌভাগ্যের কথা, তাহা
 বলিবার নহে। তোমার সাধনানুরাগ ও সাধনাগ্রহ উত্তরোত্তর কেবল
 বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, আমি এই আশীর্ব্বাদ করি। পুপুন্যী আশ্রমটিতে
 এই জাতীয় ক্ষোভ আরও অনেক প্রাক্তন কর্মীর দেখা গিয়াছে।
 ঢাকা জেলা হইতে এক সময়ে অতিশয় কঠোরশ্রমী বলিষ্ঠদেহ একটা
 ব্রাহ্মণ যুবক কর্মী রূপে পুপুন্যীতে আসিয়াছিল। তাহাকে গায়ে পায়ে
 এত বিশিষ্ট দেখাইত যে, একবার আমি তাহাকে নিয়া পুরুলিয়া শহরে
 কোনও কার্যোপলক্ষে গেলে সেখানকার একজন বিচক্ষণ উকিল
 তাহাকেই স্বামীজী ভাবিয়া চেয়ার দিয়াছিলেন এবং আমাকে বসিবার
 জন্ত টুল দেখাইয়া দিয়াছিলেন। উকিল বাবুর সরল বিশ্বাসে আবার
 না লাগে বা তিনি শেষে লজ্জা না পান, সেই জন্ত আমি কিছুকালের
 জন্ত সেবক সাজিয়া টুলে বসিয়াছিলাম এবং আমার কর্মী
 সেবকটা স্বামীজী সাজিয়া চেয়ারে বসিয়া কথোপকথন করিয়াছিল।
 হেলেটর শ্রমশীলতা ছিল অসাধারণ এবং পুপুন্যীর শক্ত মাটির দস্ত দূর
 করিয়া গাইত চালাইতে সে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সে একদিন আমাকে
 বলিয়া বলিল,—আর এত শ্রম ভাল লাগে না, আমি হিমালয়ে যাইব
 এবং সেখানে তপস্তা করিয়া ব্রহ্মদর্শন করিব। আমি বলিলাম,—
 হিমালয়েই যাও আর বিক্র্যাচলেই যাও, প্রয়োজন হইতেছে তপস্তার।
 আর তপস্তার মানেই হইতেছে নিয়ত মনকে ইষ্টে লাগাইয়া রাখা।
 হিমালয়ের নীরব গিরি-গুহায় বসিয়াও যদি মনকে ইষ্টে না রাখ, তবে
 আর হিমালয় তোমাকে কিছুই দিতে পারিবে না। সুতরাং হিমালয়ে

বাইবার বুদ্ধি ছাড়িয়া বাবা এখানে বসিয়াই তপস্তা করিবার জ্ঞান হইবে। কাজ কর আর নাম কর, কাজ করিতে করিতে যেহেতু বেপরোয়া নাম চালাও, সর্বকর্মের মাঝে ফাঁকে ফাঁকে অক্ষুণ্ণ নামের সেবা চালাইয়া যাও। তুমি গিয়া বাবা কালীকমলীওয়ালার সঙ্গে ভক্তির ভিক্ষা করিয়া তপস্তা করিবে আর দেশের গৃহস্থেরা নিজেদের কষ্টার্জিত অন্ন বাবার ছত্রে পাঠাইতে থাকিবেন, ইহা এই যুগের নানা-সমস্যা-কটকিত অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত নহে। সংসারের কর্তব্যত্যাগীরাই তপস্তা করিবেন আর সংসারের সহস্র কর্তব্যের প্রতি অবহিত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকগুলি তপস্তা করিবে না, ইহাও একটা জাতি বা সমাজের পক্ষে খুব উৎসাহ-বর্ধক অবস্থা নহে। হাজার কাজের মাঝে এখানেই নিজের সাধনের অনুকূল পরিবেশ দাঁড় করিয়া লও বাবা, দূরে গিয়া কি লাভ হইবে? এখনো আমরা আমাদের জ্ঞান নিরাপদ একখানা কুটির হয় নাই, এমতাবস্থায় এখানকার কাজ ছাড়িয়া দিয়া তপস্তা করিতে কোথায় যাইবে? নিজের ভক্ত-কুটিরখানা নিজে নির্মাণ করিয়া লও, সর্বকর্মের অবসরে সেখানেই দৈনিক দুই একঘণ্টা যাহা পার, ব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিতে থাক, দেখিবে এস্থানই তোমার হিমালয় হইয়া যাইবে।

কথাগুলি ছেলেটির ভাল লাগে নাই। সত্যিই সে একদিন হিমালয়ে চলিয়া গেল। বাংলা ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাসের কথা। পুপুন্যকীতে আমার সঙ্ঘসরব্যাপী মৌনব্রত চলিতেছে। নানা কারণে তখন পুপুন্যকী থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর এবং অসাধ্যসাধ্য। আশ্রমের অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া একটীর পর একটী করিয়া প্রায় সব সহকর্মী চলিয়া গিয়াছে। আমি তবু বেহায়ার মত পুপুন্যকীর মাটি কামড়াইয়া আছি। এমন সময়ে হিমালয়ের জোয়ার

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৪০৩

একটা স্থান হইতে প্রথমোক্ত কর্মীর পত্র আসিল,—“বাবা, আপনি কি হৃদদেহ নিয়া এখানে আসিয়াছিলেন? আপনিই কি আমাকে সমগ্র রজনী জাগিয়া ধর্মোপদেশ দিয়া গেলেন? আমি নিজেকে ঘুমন্ত ভাবিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি মনে করিতেছিলাম। কিন্তু নিজের গায়ে নিজে চিমটা কাটিয়া দেখিলাম, আমি জাগ্রত। রাত কাটিয়া গেল, আপনিও অদৃশ্য হইলেন, অথচ আমি ঘুমাই নাই, আমি জাগিয়া বসিয়া আছি। ইহা কি দেখিলাম? ইহা কি আপনার কোনও অলৌকিক নীলা?” আমি পত্রোত্তরে জানাইলাম,—“আমার কোনও অলৌকিক শক্তি নাই। ইহা তোমারই মনের গভীর অভিনিবেশের ফল। সুদূর হিমালয়ে বসিয়াও হাজার মাইল ব্যবধান হইতে তুমি যেমন করিয়া নিজ আগ্রহ-বলে আমার সঙ্গ ও উপদেশ লাভ করিতে সক্ষম হইলে, ঠিক তেমনি আশ্রমের মধ্যে আশ্রমীয় সহস্র কর্মে বাপৃত থাকিয়াও তুমি স্মৃতি ও ধৃতির বলে নিয়ত ঈশ্বর-সাধন করিয়া সতত তাঁহার সঙ্গস্থ পাইতে পার। উপস্থার জ্ঞাত কর্মক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই হইবে, এমন কোনও মাথার দিব্যি আমাদের পূর্বাচার্যেরা দেন নাই এবং কর্তব্য-কর্ম হইতে অবসর লইয়া একমাত্র সাধনে অভিনিবিষ্ট হইবার দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগের নানা বিপর্যায়কর বিপত্তির মুখে উপযোগীও নহে।”

সেই উপদেশই আমি আজ তোমাকে দিতেছি। কাজ কর আর নাম কর। আজ তোমাদের শ্রম কত কমিয়া গিয়াছে। সেদিন প্রত্যেকটা আশ্রম-কর্মীকে কুলী-মজুরের সমান শ্রম করিতে হইত, কারণ পরমা খরচ করিয়া কুলী-মজুর নিয়োগ সুসাধ্য ব্যাপার ছিল না। আজ তোমরা শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কেবল তাহাদের কর্ম পর্যবেক্ষণ কর। আজ চারিদিক হইতে প্রাপ্ত অর্থ আমি অকাতরে তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি, তোমাদের কাছে সেই শারীরিক শ্রম আমি দাবীই

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৪০৪

করি না, বাহা একদা আমি ঐ মাটিতে স্বয়ং করিয়াছি। কাজের
ভাবাবধানে ক্লেশ আছে কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াই যে সাধন চালাইয়া
যাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত কেন তোমরা প্রতিষ্ঠা করিবে না? প্রায়
সকল লোককে পরিশ্রমে ভয় পাইতে দেখি। অনেক সাধককে ইহাও
বলিতে শুনি যে, পরিশ্রম না ছাড়িলে সাধন করা যায় না। কিন্তু
আমরা অনেক দিকেই নূতনত্বের সূচনা করিয়া আসিতেছি। কেন
আমরা দেখাইব না যে, কঠোর শ্রম করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে কঠোর সাধন
চলে? সাধন করিতে সর্বাপেক্ষা দামী যে জিনিষটির প্রয়োজন, তাহা
হইতেছে, প্রাপ্ত সাধনে বিশ্বাস। আমি তোমাদের বাহা দিয়াছি,
তাহাতে যদি বিশ্বাস থাকে গভীর, তাহা হইলে তোমরা কৃষিক্ষেত্র
রণক্ষেত্রে, লোহা-ঢালাই কারখানার ব্লাষ্ট ফার্নেসে, চলন্ত রেল-ইঞ্জিনের
বয়লারের পাশে বসিয়া কাজ করিতে করিতেও অক্লেশে সাধন চালাইয়া
যাইতে পারিবে। প্রচলিত ধর্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত বহু সাধকদের সহিতই
আমার সন্তানদের এই যে একটা পার্থক্য, তাহা মতা, পার্থক্য
সুগোপযোগী। তোমরা এই কথা ভুলিয়া যাইও না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭৬)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও
আশিস নিও।

ভাদ্র, ১৩৬৭]

যুতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৪০৫

অনেকের ধারণা আছে যে, যেখানে যত আশ্রম আছে, তাহাদের ব্যয়-নির্বাহ হওয়া উচিত ভিক্ষা দ্বারা, সেখানে অর্জনের কোনও চেষ্টা থাকা উচিত নহে। ইহার যুক্তি-স্বরূপ বলা হইয়া থাকে যে, অর্জনের চেষ্টা দ্বারা মন বহিস্থ হইয়া যায় এবং একটা অর্জন পরবর্তী অর্জনের দিকে মনকে প্রলুদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করে। ইহাতে মনের স্বাভাবিক সাহসিকতা হ্রাস পায় এবং তাহার ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্ন ঘটে।

এই যুক্তিটুকুর মধ্যে কিছু সত্য নাই, তাহা নহে। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা আশ্রম চালাইতে হইলেও অর্জনের প্রয়োজন পড়ে। ভিক্ষায় বিখ্যাত ব্যক্তিদেরও প্রতিষ্ঠান বিনা অর্জনে চলে না। ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার জন্ত নিয়ত কত রকমের ফন্দী-ফিকির যে করিতে হয়, তাহা যাহারা ভিক্ষা করিয়া আশ্রমাদি চালাইয়া থাকেন, তাহাদের সহিত কিছুকাল বিখস্ত ভাবে অবস্থান করিতে পারিলে জানিতে পারিবে। ভিক্ষা আদায় সকলে করিতে পারে না, ইহাও একটা উচ্চ স্তরের আর্ট। ইহার অনুশীলন করিয়া ইহাতে কৃতিত্ব অর্জন করিতে হয়। সুতরাং ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আশ্রম চালাইতে হইলেও ইহার ফলে মনের বহিস্থতা আসিবার সম্ভাবনা সুপ্রচুরই আছে। ভিক্ষকের মনের অবস্থা কেমন হইয়া থাকে, তাহার বর্ণনা একটু খানি রহিয়াছে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সেই অংশে, যেখানে দাস রঘুনাথের জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষার সংগ্রহের কাহিনীটুকু বর্ণিত আছে। দাস রঘুনাথ দেখিলেন যে, এভাবে প্রত্যাশায় থাকা সত্যই সাধনের ও উন্নত জীবনের বিঘ্ন, তাই তিনি ভিক্ষার সংগ্রহও ছাড়িয়া দিলেন। এই একটা দৃষ্টান্তই জাজল্যমান হইয়া শিখাইতেছে, ভিক্ষার আশ্রয়ও সদাশ্রয় নহে।

তার পরে আবার সেই সকল আশ্রমের পক্ষে করা ত আরও অসুবিধাজনক, যেই সকল আশ্রম কেবল ধ্যানজপনিয়ত সাধুদেরই

পোষণ করে না, পরন্তু প্রত্যাশা করে অত্র দশ রকমের সামাজিক প্রয়োজনে ও বিবর্তনে শক্তিসামর্থ্য সহকারে সমাজের সেবা করিবার জন্ত স্বাবলম্বী ও কর্মঠ কর্মস্বয়োগীদের গড়িয়া তুলিবার।

হরিদ্বারে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাঁহাদের আয়ুর্বেদীয় ঔষধের কারখানা আছে। ইহার দ্বারা বিপুল আয় সংগৃহীত হয়। এই আর গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ব্যয়িত হয়। ইহাকে কেহ দোষের মনে করেন নাই।

আমাদের বাল্যকালে আমরা লাহোরের বাবা লছমন দাসের চেলাদের দেখিয়াছি। ইঁহারা দেশ হইতে দেশান্তরে গুরুর আশ্রমে ঔষধাবলি নিয়া ভ্রমণ করিতেন এবং তাহা বিক্রয়ের দ্বারা নিজের অন্তর ত সংস্থান করিতেনই, সেই টাকার একটা প্রায় অংশ গুরুর আশ্রমে চলিয়া যাইত। এই সকল চেলারা কেহ সিঙ্গাপুর, কেহ হংকংয়ে, কেহ পারস্তের আবাদানে, কেহবা আফ্রিকার জাঞ্জিবার উপকূলে যাইয়া গুরুর আশ্রমের ঔষধ বেচিতেন। যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য এই ভাবে লাহোরের বাবা লছমনদাসের আশ্রমে পৌছিত, তাহার দ্বারা দৈনিক পাঁচ হাজার সাধু-মহাত্মার ভোজনেব ব্যবস্থা হইত। সেই কালে সংসারের সকল কাজ হইতে বিদায় নিয়া চলাটাই সাধুদের একটি প্রকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইত, আর সেই আদর্শের অনুসরণকারী সাধুদের সেবার জন্ত অর্থ বাবা লছমনদাসের ঔষধাবলির দ্বারা সংগৃহীত হইত। আজ বাবা লছমন দাসও নাই, সেই লাহোরও নাই, বাবা লছমন দাসের সেই চেলারাও নাই, কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্তটা রহিয়া গিয়াছে। আমি এমন এক পরিবারে শরীর গ্রহণ করিয়াছিলাম, যেখানে নিত্য নূতন অতিথি ও সাধু-মহাত্মা দর্শন করিতাম। তাঁহাদের অনেকের কাছেই আমি নিজে বাবা লছমন দাসের আখড়ার কথা

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রোঙ্গা

প্রতিধ্বনি

৪০৭

শুনিয়াছি। আমার স্বর্গত খুল্লতাত মহাশয় ত বাবা লছমন দাসের ভক্তই ছিলেন। সুতরাং এই সকল কথা অলৌক কাহিনী নহে।

বাবা লছমন দাস যেখানে সাধুদের ভোজনের অন্ন সংগ্রহের জন্ত ঔষধের পরিবেশন করিতেন হংকং-সিঙ্গাপুর হইতে আরম্ভ করিয়া আবাদান-এডেন পর্য্যন্ত, সেখানে অযাচক আশ্রম ঔষধ পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা মাত্র ভারতবর্ষটুকুর মধ্যেই করিয়া কেন নিন্দিত হইবেন?

আর একটা কথা ভাবিবার আছে। অযাচক আশ্রমটা কি কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি? আমি ইহা সৃষ্টি করিয়াছি সত্য কিন্তু ইহার আমি মালিক নহি। ট্রাষ্ট ডীড করিয়া পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট রূপে ইহা আমি জনসাধারণের জন্ত দান করিয়াছি। সেই দান এমন নিষ্কাম যে আমি এই ট্রাষ্টের আয় হইতে নিজের গ্রামাচ্ছাদনের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত রাখি নাই। এমতাবস্থায় যাহারা অযাচক আশ্রমের ঔষধের কারখানা করাকে ব্যবসায়ি-মূলভ অর্থগৃহ্যতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে, তাহারা হয় অজ্ঞানতা বশতঃ করিবে, নতুবা বিদ্বেষ বশতঃ। ভারতের ভিক্ষোপজীবী কয়েকটা মঠে অযাচক আশ্রমের ঔষধের কারখানার নিন্দা করিয়া আলোচনা হয় বলিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু তোমরা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবে যে, সেই সকল মঠের শিষ্যরা অনেকে আবার এই অযাচক আশ্রম হইতে বিপদে আপদে নগদ টাকা দান স্বরূপে গ্রহণ করেন এবং অল্পখের সময়ে বিনা পরসায় অযাচক আশ্রমের ঔষধ নিয়া থাকেন। সুতরাং বিরুদ্ধে যেই সকল কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা একান্তই অস্তঃ-সারগীন জানিয়া তোমরা এই বিষয়ে নির্বিকার হইবে।

সকল আশ্রমের কৰ্ম্মপন্থা কখনো এক হইতে পারে না। অযাচক

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেমী

[৯ম বর্ষ, মে-সংখ্যা]

৪০৮

আশ্রমে কম পারক বেনী পারক, জনসেবা করিতে চাহেন, অন্য
থাকিয়াই, স্ততরাং তাঁহাদের হাতে উপার্জনের স্বাভাবিক ও সম্ভব কতক
গুলি উপায় আসা প্রয়োজন। আমি চলিয়া যাইবার আগে তে
কতকগুলি উপায় অযাচক আশ্রমের হাতে ভাল ভাবে তুলিয়া দিয়া যাই
চাহি। ইহাই অযাচক আশ্রমের ব্যবসায়িক অধ্যবসায়ের এক
কারণ। কিন্তু অযাচক আশ্রম ঔষধ বা পুস্তক বিক্রি করে বলিয়া
জন সেবায় কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া থাকে নাই। ভিক্ষা তুলি
বত্তা আর ছুঁভিক্ষের আর্তব্রাণ অযাচক আশ্রম না করিতে পারে
কিন্তু ভিক্ষা না তুলিয়া অল্প অনেক ক্ষেত্রে এমন কাজ করিয়া যাইতে
যাহা তাঁহাদের ঔষধ ও পুস্তকের আয় না থাকিলে করিতে পারিত
না। ইহা অহংকারের কথা নহে, তোমরা জাননা বলিয়া কথা
তোমাদের বলিতে হইল। আর বলিতে হইল, জিজ্ঞাসা করি
বলিয়া। তোমরা লোকনিন্দাকে ভয় কর বলিয়াই লিখিতে হইল।

লোকনিন্দাকে তোমরা ভয় পাইও না। যেখানে তোমাদের উপায়
মহৎ, সেখানে লোকের নিন্দাকে অধিক মূল্য দান করা
যেখানে তোমাদের উপায়ও সৎ, সেখানে লোকনিন্দাকে এক
অগ্রাহ্য করা উচিত। বহু সৎকার্য্য সন্দেহজনক উপায়ে করা
থাকে। তেমন উপায় তোমরা কিছু অবলম্বন কর নাই।
গড়িবার জন্ত স্নকৌশল প্রয়াসে তোমরা কুলললনাগণের গায়ের
খুলিয়া আনিবার ব্যবস্থা ত কর নাই! বাকীকো আশ্রয় দিবে
প্রলোভন দেখাইয়া ধনী বিধবাদের শেষ সম্বল অর্থ-ভাণ্ডার ত
কর নাই! যজ্ঞমানের নামে বিগ্রহের শিরে নিত্য তুলসী-ফল
চাপান হইবে বলিয়া ভাঁওতা দিয়া ত লোকের টাকা সংগ্রহ করা
মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্ত এত হাজার টাকা না দিলে নিরর্থক হইয়া

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেমা

প্রতিধ্বনি

৪০৯

বলিয়া লোককে ভয় দেখাইয়া ত টাকা আদায় কর নাই! এই সকল নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করিয়াও ত কত আশ্রম চলিতেছে। আশ্রমের ব্যবসায় রহিয়াছে বলিয়া কেন তোমরা নিন্দাতঙ্কে জড়সড় হইয়া থাকিবে?

প্রয়োজনীয় অর্থ নিজেদের শ্রম-প্রতাপে সৃষ্টি করিয়া লইয়া অবাচক আশ্রম জনসেবা করিবে। ইহা কোনও নিন্দনীয় কথা নহে। তোমরা লোককে পোক বলিয়া তুচ্ছ না করিলেও নিজেদের কার্য্যকে অনিন্দনীয় বলিয়া ভাবিতে কেন শিথিবে না? স্বাবলম্বনে যতক্ষণ তোমাদের প্রতিষ্ঠা আছে, ততক্ষণ তোমরা কাহাকেও ভয়ও করিতে পার না, কাহার পক্ষে ভয়ের পাত্রও নহ। ভিক্ষা সংগ্রহকারীরা গৃহস্থজন-সাধারণের দৃষ্টিতে বর্গী দম্ভ্যরই ভদ্র সংস্করণ রূপে ভীতির পাত্র হইয়া রহিয়াছেন। তোমরা তাঁহাদের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ না করিয়াও নিঃসঙ্কোচে নিজেদের ব্রতে স্থিতির হও। ইতি—

অশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭৭)

হরিণ

বারাণসী

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সম্বল কর যে, একাকী সমৃদ্ধ হইয়া নহে, সকলকে লইয়া সমৃদ্ধি অর্জন করিতে হইবে। দারিদ্র্যব্রতে মহত্ত্ব আছে কিন্তু যে দারিদ্র্য

আনুক্ষয়িকর, তাহা বরণের কোনও সার্থকতা নাই। অগ্নে, বস্ত্রে, শব্দে, আচরণে সাধারণের মত থাকিব, আর জীবন ভরিয়া সর্বদান্যতম দুঃখবিদূরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখিব,—ইহাই হউক তোমাদের সকলের চরম লক্ষ্য। আজিকার পৃথিবীতে অর্থ ছাড়া কাহারও চলে না, কিন্তু তাহা যদি অর্জিত বা উপাগত হয়, তাহা হইলে তা সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া তাহার সার্থক সদ্ব্যবহার আমাদের করিতে হইবে। এই বণ্টনের রুচি বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের হইতে পারে। কিন্তু নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্ত কিছুই রাখিব না, ইহাই হইবে আমাদের চেষ্টা।

পরার্থে প্রয়োগের জন্ত যে সঞ্চয়, সে সঞ্চয়ে দোষ নাই।

তোমরা-প্রত্যেকে স্নগভীর ভাবে সাধন-পরায়ণ হও এবং তোমাদের সকল সতীর্থকে সাধনানুরাগী করিয়া তোল। হুজুগ কেবল হুজুগ-সৃষ্টি রুচি বাড়ায়, সাধন সাধন-রুচি বর্দ্ধিত করে। জীবন হইতে হুজুগ মাত্রা কমাইয়া তাহাতে সাধনের মাত্রা বাড়াইয়া দিতে থাক। হুজুগ মাত্রকেই সাধন-পরায়ণ হইতে এবং মানব-মাত্রেরই প্রতি প্রতি অল্পশীলন করিতে উদ্বুদ্ধ কর।

ছোট বলিয়া কাহাকেও বাদ দিও না, বড় বলিয়াও কাহাকেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনোনিবেশ করিও না। আমার নিকটে বড়'র বিচার নাই, ভক্ত-অভক্তের হিসাব নাই। আমি তোমাদের করিয়া তোমাদের প্রতিজ্ঞার জন্ত সমভাবে ব্যাকুল থাকি, তোমাদের তেমন করিয়া ছোট-বড়-সকলের মরমের মরমী, দরদের দরদী ভালবাসিতে টাকাকড়ি লাগে না, প্রয়োজন হয় সহানুভূতিশীল ও সরস সুন্দর মনের। অসুবিধা বা দারিদ্র্যকে তোমরা জীবন-বাধা হইতে দিও না।

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেমা

প্রতিধ্বনি

৪১১

অনুবিধা বা দারিদ্র্যকে তোমরা তোমাদের সার্বিক কর্তব্যেরও বাধা বলিয়া মনে করিও না। প্রকৃত বাধা ত মনের মিলনের অভাব। প্রেমের তোমরা অনুশীলন কর। প্রেমের বলে স্বার্থের পরাক্রম কমাও। প্রেম দিয়া নিখিল বিশ্বকে বেড়িয়া ধর। বিশ্বের প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি জীব, প্রতিটি সমাজ ও প্রতিটি গোষ্ঠীর সংশ্রবের মধ্য দিয়া অনাসক্ত, নির্বিকার, নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ প্রেমের পরিচর্যা কর। প্রেম তোমাদের জীবন হউক, প্রেম তোমাদের গতি হউক, প্রেম তোমাদের গন্তব্য ও জীবনের চরম চরিতার্থতা হউক। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭৮)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি খুবই একটা দারুণ আর্থিক সঙ্কটে পড়িয়াছ জানিয়া ব্যথিত হইলাম। নিতান্ত প্রয়োজনে না পড়িলে যে আমার কাছে টাকা চাহিয়া পত্র দেও নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। সম্ভব হইলে আমি কিছু দিন মধ্যেই তোমাকে যাহা পারি, পাঠাইব। কিন্তু আমার জানা আবশ্যক যে, কি প্রয়োজনে পড়িয়া তুমি আমার কাছে টাকার জ্ঞা লিখিলে। প্রয়োজনের ধারাটা বুঝিতে পারিলে হয়ত বিনা টাকাত্তেও বিপদ উদ্ধারের ব্যবস্থা হইয়া যাইতে পারে। দ্রুত পত্র দিয়া আমাকে সকল বিষয় জানাও।

অনেক ক্ষেত্রেই আমি টাকাকড়ি দিয়া লোককে বিপদে উপকৃত
করিতে পারি না। কিন্তু টাকাকড়ি ছাড়াও অল্প ভাবে বিপদ
তাহার কাটিয়া যায়, এমন ঘটিয়াছে। তুমি অকপটে তোমার বিপদকে
রূপটী আমার কাছে প্রকাশ করিয়া ধর। অনেক সময়ে মানুষ লোক
বিপদকে অসামান্য ভাবিয়া বিহ্বল হয়, অনেক সময়ে অসামান্য
বিপদকেও সামান্য মনে করিয়া উপেক্ষা করে এবং জয় করে। দুই
অবস্থারই ভাল-মন্দ আছে। আমি তোমাকে এখনই কোনও উপদেশ
দিতে চাহি না। আমি আগে তোমার বিপদের প্রকৃত কারণ
অবস্থাটী জানিতে চাহি। অনেক বিপদ তোমরা তোমাদের অভ্যাসের
দোষ হইতে সৃষ্টি করিয়া থাক। অনেক বিপদ তোমাদের জন্ত সম্পদ
সম্ভাবনা সমূহ লইয়া আসে। বিপদকে তাহার স্বরূপে চিনিতে পারিয়া
তাহার প্রতীকার সহজ হয় কিম্বা তাহা হইতে লাভ উঠান দ্রুত
হয়।

তুমি যে ভাবে পত্র লিখিয়াছ, তাহাতে মনে হয় যে এখনি উপকৃত
না পাইলে তোমার অশেষ অনিষ্ট হইবে। এমনতাহ্য তুমি অবিলম্বে
স্থানীয় অথও-মণ্ডলীর কাছে তোমার বিপদের বার্তা জ্ঞাপন কর
সঙ্কোচ করিবার কারণ কিছু নাই। সম্প্রতি ডিক্রগড়ে তোমার
একটি ভাই অগ্নিদাহে সর্বস্ব হারাইয়াছে। আমার নিকট খবর আসিয়া
আগেই স্থানীয় ভ্রাতারা তাহার জন্ত যে যাহা পারিয়াছে, সহায়
করিয়াছে। মানুষের বিপদে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সহায়
করিতে আসিবে না, ইহা এক অসম্ভাবনীয় ব্যাপার। তুমি তোমার
ভ্রাতাদের কাছে বিপদের বার্তাটা জানাও।

সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কল্পটীও করিও যে, তোমার অল্প ভ্রাতা কেহ বিপদে
বিপদে পড়িবে, তখন তোমাকে অস্বাচিত ভাবে যাইয়া তাহার বিপদ

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম।

প্রতিধ্বনি

৪১৩

মুখে বুক পাতিয়া দিতে হইবে। যে অপরের বিপদে সহায়তা করিবার মতন মনের গঠন রাখিবে না, তাহার পক্ষে নিজের বিপদে অপরের সহায়তা পাওয়ার প্রত্যাশা করা পাপ। নিজের বিপদের সময়ে অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে অসাধারণ সহায়তা পাইয়া উপকারীর বিপদের সময়ে এক চুলও আগাইয়া আসে নাই, এমন অকৃতজ্ঞ বহু নরনারী আমি দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাদের চাইতেও জগতে সংখ্যায় তাহারাই বেশী, যাহাদের মধ্যে দেবতা লুকাইয়া থাকিয়া নিয়ত আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজিতেছেন এবং অবসর মাত্রেই পরার্থে ত্যাগের অনুশীলনের দ্বারা নিজেকে বিকাশ করিয়া ধরিতেছেন। কত মানুষ কত মানুষকে কত কিছুই দান করিতেছেন, তাহার দ্বারা সাময়িক অসুখ-অশান্তি দমন করিয়া লোককে উপকৃতও করিতেছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা মানব-সমাজের স্থায়ী কুশল কিছুই হইতেছে না। কারণ, ইহার সঙ্গে সঙ্গে লব্ধদান নরনারীদের মধ্যে পরার্থে ত্যাগের প্রেরণা কিছুই জাগিতেছে না। রাস্তায় বসিয়া ভিখারী একটি একটি পয়সা সংগ্রহ করিয়া হয়ত দালান, কোঠা তুলিতেছে কিন্তু অন্তরের জঘন্য দীনতা বশতঃ অথ এক জনের অগম্যে তাহাকে সামান্য ঋণ দান করিয়াও সহায়তা করিতে পারিতেছে না। জীবনের সকল সময়ে সে হীনবুদ্ধি নীচমনা একজন ভিক্ষুকই থাকিয়া যাইতেছে, দাতা কখনও হইতেছে না। এই ভাবে সে তাহার প্রতি হাজার হাজার দাতার দানকে মিথ্যা ও অসফল করিয়া দিতেছে। যে এক দিন পাইবে, সে অথ দিন কেন দিবে না? দাতাকে সকল সময়ে পাওয়া যায় না, কিন্তু দাতার প্রতিনিধি রূপে ধরিয়া লইয়া জনসাধারণকে কেন সে সেই স্নেহ ফিরাইয়া দিবে না, যাহা সে একদিন অকাতরে সম্ভোগ করিয়াছে? মানুষের দানশীলতা দানপ্রাপ্ত-

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৪১৪

দের মধ্যে দানশীলতা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেছে না, ইহাই বর্তমান যুগের দানশীলতার এক স্মহৎ অসামান্য।

যাহা হউক, কথায় ত চিঁড়া ভিজিবে না। তোমার বিপদের সময়ে তাহা হইতে উদ্ধারের পন্থাই আগে দেখিতে হইবে। তবু কতকগুলি কথা মনে পড়িয়া গেল বলিয়া লিখিলাম।

যে কোনও বিপদেই পড় না কেন, যাহাদের সঙ্গে তোমার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, তাহাদের সহিত স্বার্থের সম্পর্ক সৃষ্টি করিতে সর্বদাই বিরত রহিও। কে জানে, হয়ত এমনি একটা লোকের সহিত মিলিয়া ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে এবং তাহারই পরিণামে নিজের আর্থিক বিপদে জড়াইয়া ফেলিয়াছ। আর্থিক ব্যাপারে মানুষ মাত্রেই সহিত তোমাদের কত যে সন্তর্কতার দরকার, তাহা অনেক সময়ে তোমরা ধারণাই করিতে পার না। সৎ ভাবে চলিয়া মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারিলে চিরকালই বিপদের সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে সহায়তা মিলিয়া থাকে। টাকাকড়ির ব্যাপার হইলেই তোমরা অনেকে ইচ্ছায় আর অনিচ্ছায় এমন বিসদৃশ অবস্থা সমূহের সহিত জড়াইয়া পড় যে, চিরবিশ্বাসপরায়ণ হিতৈষীরাও বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া যায়। আপাততঃ তোমার আপদুদ্বার অবশ্যই আমরা সকলে মিলিয়া যে যেভাবে পারি করিব, কিন্তু এই দিকটা হইতে জীবন কখনও দৃষ্টি ফিরাইয়া চলিতে চেষ্টা করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদ
স্বরূপানন্দ

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম

প্রতিধ্বনি

৪১৫

(৫৭৯)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অরণ্যই ত সাধনা। তাঁহাকে নিয়ত মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখাই ত সাধনের নিগম নিগূঢ় মর্থ-কথা।

সর্বদা ভগবানের নামে লাগিয়া থাকিও। নামই তাঁহার স্মৃতির উদ্দীপক। এই জগৎই নাম পরমশান্তির আগার। অত্ন কিছুতে নির্ভর না দিয়া নামে নির্ভর দাও। তোমার সমস্ত অশান্তি নামের সেবার মধ্য দিয়া দূর হইয়া যাইবে।

নামে যাহাদের নিষ্ঠা, কেবল তাহাদেরই সঙ্গ করিবে। যাহাদের ইষ্টনিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি, অদোষদশিতা, সাধন-ভজনে রুচি ও জীবে প্রেম আছে, তাহাদের সঙ্গকেই সংসঙ্গ বলিয়া মনে করিও। অकारণে যার তার সঙ্গ করিয়া কুসংস্কার আর পরনিন্দার প্রবৃত্তি আহরণ করার মতন মূর্থতা আর কিছু নাই।

তোমার চারি দিকে এমন শত শত সরল-প্রাণ নরনারী রহিয়াছেন, যাহারা জীবনে সংকাজ করিবার বা সংকথা শুনিবার অবসর বা সুযোগ পান নাই বলিয়াই সং বা সাধু হইতে পারেন নাই। কিন্তু এখনও তাঁহারা সেই আদিম কালের সরলতা হইতে বঞ্চিত হন নাই। এমন সকল লোকদের মধ্যে গিয়া ভাল কথা কহিয়া, ভাল কাজের প্রবর্তন করিয়া তাঁহাদিগকে আদর্শ সংপুরুষে পরিণত করিবার চেষ্টা বিশেষ লাভজনক বলিয়া মনে করিবে। ইহারা তোমার সঙ্গ পাইয়া সংসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৪১৬

পাইলেন বলিয়া মনে করিবেন, ইহাতে গর্বিত না হইয়া ইহাদের ভিতরের দেবতাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য অধিকতর আগ্রহী হইবে। ইহাদিগকে প্রাণপণে পরনিন্দা রূপ পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখিবে। পর-প্রচার করিতে যাইয়া বাহ্যার। পরনিন্দা-প্রবৃত্তির প্রসার ঘটায়, তাহার সমাজের শত্রু।

ভগবানে ভক্তি আর জীবের কুশল-কামনা, ইহাই তোমার সকল কাজের প্রেরণার উৎস হউক। যে কাজে এই দুইটি জিনিষ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, তাহাকে পুণ্য ভ্রম করিয়া অনুশীলন করা অজ্ঞানতা যার তোমরা সর্বোৎকর্ষ পরমেশ্বরকে নিজেদের জীবন বলিয়া মনে প্রাণ জানিয়া লও এবং তাঁহার সেবাকে লক্ষ্য করিয়া ভিতর ও বাহিরে সকল কাজকে নিয়ন্ত্রিত কর। ইহাই তোমারও কুশলের পথ। জগতেরও কুশলের পথ। ইতি—

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

(১৮০)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবার সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিতে থাকিলে কি করিয়া সাধনে বসাইবে, ইহা বর্তমান যুগের প্রধান প্রশ্ন। অনেকেরই মনে সাধ জন্মে। যে সাধন ভজন করে, কিন্তু কাজের চাপে তাহাদের সাধ-আকাঙ্ক্ষা লয় পাইয়া যায়। তোমার অবস্থাও কতকটা তাহাই হইয়াছে।

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্য

প্রতিধ্বনি

৪১৭

দিন তোমাকেও তোমার অত্যাশ্রয় সহকর্মীকে এখন আশ্রমের মাঠে মাটি কাটার কাজ তদ্ব্যবধান করিতে এবং সময়ে সময়ে কোদাল লইয়া সেই মাটি সরাইতে হইতেছে। এই অবস্থার সাধন করিবে কখন? সন্ধ্যার পরে যখন আসিয়া উপাসনা-মন্দিরে বস, তখন ত ক্লান্তিতে শ্রান্তিতে শরীর সহজেই এলাইয়া পড়ে। কাজ কমাইবার উপায় নাই, কারণ এখন চলিতেছে আশ্রমের গঠন-পর্ব। যেই গঠনের কাজ আমি তেরিশটি বৎসর আগে শুরু করিয়াছিলাম এবং বাহাতে আমি আমার জীবনের পরমাধুর সব চাইতে দামী অংশ দান করিয়া আজ শুভ্রকেশ পুরুষ হইয়াছি, সেই কাজ ত এখনও শেষ হয় নাই। তোমাদের শ্রম না করিয়া উপায় কি? অত্যাশ্রয় আশ্রমে বা মাঠে সামান্য কাজের জন্য অসামান্য সংখ্যায় কর্মী থাকে, তোমাদের অসামান্য কাজ করিবার জন্য সামান্য সংখ্যায় কর্মী আছে। আমি যদি অবাচক না হইতাম, তাহা হইলে আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মীকে আনিয়া আশ্রমে রাখিতে পারিতাম। কিন্তু ইহা ত অবাচকের আশ্রম। সামান্য অনগ্রসাদের নূতন নূতন ভাগীদার সংগ্রহ করিয়া তোমাদের কষ্ট কি করিয়া বাড়াইতে সাহস পাই? তাই তোমাদিগকে এখনও আরও কিছু কাল অশেষ পরিশ্রম করিয়াই আশ্রমে বাস করিতে হইবে। এই পরিশ্রমের মধ্য দিয়াই তোমাদিগকে সাধন-ভজন চালাইয়া যাইতে হইবে। মনে করিও না যে, কাজ করিতে করিতে সাধন করা যায় না। আমি এই আশ্রমটারই পাথর-কাঁকর কাটিতে কাটিতে গাইত চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ বার ভগবানের নাম নিয়মিত জপ করিয়া এই আশ্রমের মাটিতে একটা রহস্যময় প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা সেই কথাটুকু বিশ্বাস করিয়া কাজ করিবার সাথে সাথে

প্রতিধ্বনি

দ্বিতীয় প্রেরণা

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৩১৮

নাম-সাধন করিয়া তাহার ফলাফল প্রত্যক্ষ কর। হতাশ হইয়া যাইও না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮১)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—,তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্বাদ জানিও।

আশাকরি, আমার আগেকার পত্রখানা পাইয়াছ। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম যে, হাতজোড়া কাজ লইয়াও তোমাদিগকে মনঃপ্রাণ ছুড়ি নামের সাধনা করিবার অনুশীলন চালাইয়া যাইতে হইবে। জলহীন মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া তাহার রক্ত আকাশে বাতাসে পিপাসার পানীয় প্রত্যাশা করা যেমন অসাধারণ, অবিরাম কাজ করিতে করিতে তাহারই মধ্য দিয়া নামের রণাস্বাদন করিয়া যাওয়ার প্রত্যাশাও তেমনই অসাধারণ। তবে পার্থক্য এই যে, মরুভূমিতে অনেক সময়ে প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকিয়া যায়, আর কর্মরণাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নামের মধুর আশ্বাদন করিবার প্রত্যাশা সামান্য অনুশীলনের ফলেই পূরণ হয়। ইহা যদি পরীক্ষিত সত্য হইত, তাহা হইলে আমি অত জোর দিয়া কথাটা তোমাদের কহিতাম না। আমি জীবন ভরিয়া অনেক কথাই কহিয়াছি, কিন্তু বাহা নিজ জীবনে আশ্বাদন করি নাই, এমন কথা কমই কহিয়াছি, জানিও।

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৪১৯

পুপুনকীর মাটিকে আমি এত দিনেও বশ মানাইতে পারি নাই। একতাল পাথর কাটিয়া ফেলিয়াছি ত আর একতাল পাথর তাহার নীচ হইতে মাথা উচাইয়া উঠিয়াছে। কত বার কত ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে অল্প লোকে হয়ত পুপুনকীটা ছাড়িয়াই চলিয়া যাইতেন,—আমি বেহারার মতন লাগিয়াই রহিয়াছি। তেত্রিশ বৎসর আগে যে কঠোর শ্রম আমি সুরু করিয়াছিলাম, আজও তাহার বিরাম হইল না। অতীত আমার চলিয়া গিয়াছে, বর্তমান আমার চলিয়া যাইতেছে, ভবিষ্যৎ কালের প্রতীক স্বরূপে তোমরা এক এক জন করিয়া আসিতেছ এবং ক্ষণে ক্ষণে আমার পরিত্যক্ত কোদাল ও গাইতি হাতে লইতেছ। তোমাদের এমন বিশ্রাম বাবা কেমন করিয়া দিব যে, তোমরা হাতের কাজ ফেলিয়া দিয়া ঠাকুর-ঘরে নিরিবিলি বসিয়া বসিয়া ধ্যান-জপে সময় কাটাও? কত স্থানের কত মহানুভব ব্যক্তি অশেষ অর্থব্যয় করিয়া প্রকৃত সাধকদের ধ্যানজপাদি করিবার মৌকার্য্য সাধনার্থে কত কোঠাবাড়ী, কত গুহা তৈরী করিয়া আহালাদিরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ভাগ্যবানেরা তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু তপস্বীদের জন্ত করা সেই সকল পবিত্র আশ্রয়ে অনেক অতপস্বীও কি বুধা আলস্তে দিন কাটাইতেছে না? স্থান ও পরিবেশের এমন আনুকূল্য লব্ধেও সেখানে তাহার অপব্যবহার হইতেছে। ইহা হইতেই ধরিয়া লও যে আমি যদি পুপুনকী আশ্রমে তোমাদিগকে ধ্যান-জপ করিবার জন্ত অশেষ সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিতে পারিতামও, তবু তাহারা আলস্য করিয়াই কাল কাটাইয়া দিত, যাহাদের প্রাণে ভগবৎপ্রেমের অনল জ্বলিয়া ওঠে নাই। সেই অনলটাই সব চাইতে বড় কথা। তোমরা সেই প্রেমানল অন্তরে জাগাও, প্রাণ-মন ভরিয়া জ্বালাও। সে অনল একবার জ্বলিয়া উঠিলে দেখিতে পাইবে যে, হাজার কাজের মাঝেও তোমার মন তাহার

কাছ হইতে দূরে বাইতেছে না। নিত্য-স্মরণই ত সাধনা, সাধনার অত
কোনও ক্ষুটতর লক্ষণ নাই। যে তাঁহাকে স্মরণে রাখিতে পারে, সেই
সাধন করিতেছে। দিবারাত্রি সর্বদা সর্ব অবস্থায় তাঁহাকে স্মরণ
রাখাই জীবনের সব চেয়ে বড় কাজ। তাহা তোমাদিগকে বাস্তব
করিতে করিতেই করিতে হইবে। যেখানে ঘন বন ছিল, আজ সেখানে
আবাদ হইতেছে, কিন্তু ভগবান্কে না পাইলে আবাদ আর অনাবাদ
সবই মিথ্যা। যেখানে অন্ধকার ছিল, আজ সেখানে আলোর রেখা
ছুটিয়া উঠিয়াছে, চোখে চোখে বিস্ময় এবং গাত্রে গাত্রে রোমাঞ্চ
জাগিয়া উঠিতেছে, হর্ষে আনন্দে কত জন পরিপূরিত হইতেছে, এই
সকলই নিত্যান্ত ক্ষণস্থায়ী। তাঁহাকে যদি না জীবনের প্রতিটি অন্তর্ভাগে
পাওয়া যায়, তাহা হইলে জীবনের অপর সকল সাফল্যই মরীচিকা
মাত্র। কিন্তু তাহার জন্ত কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া অগ্র পলাইবার চেষ্টা
করিয়া লাভ নাই।

এবার আশ্রমে হঠাৎ কয়েক জন কন্মী অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পড়ি
য়াছে। তোমরা যদি কন্মবিভাগ করিয়া লও, তাহা হইলে অনেক কাজ
তোমরা বহুগুণ বেশী করিতে পারিবে কিন্তু তোমাদের নামের সাধনাও
বাহত হইবে না। নামসাধনের জন্ত কাজ ফেলিয়া সরিয়া বাইব, ইহা
হওয়া বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে, কোনও-কোনও অবস্থায় তাহা
আবার আপত্তিজনকও। কিন্তু তোমরা যদি কন্ম-বিভাগ করিয়া কাজ
করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে যে আগের চাইতে অনেক
অধিক সূচাকৃতার সহিত অনেক অধিক কাজ অনেক কম সময়েই হওয়া
হইয়া গিয়াছে। খাওয়া, শোওয়া, রান্না করা, কাজ দেখা, কোণার
চালান, সম্ভব হইলে হাল-বলদ চালান আদি সকল কাজেই যেরকম
আগেরদিন পরদিনকার পরিকল্পনাটী ঠিক করিয়া লইও। সকাল বেলা

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৪২১

বাহারা বুদ্ধি-পরামর্শ ও জোগাড়-যত্ন করিতে সময় নষ্ট করে, তাহারা
 সমস্ত দিনটার কাজই মাটি করিয়া দেয়। তোমরা আগের দিন রাতে
 শুইতে যাইবার আগে সকলে একত্র মিলিয়া বসিয়া পরামর্শ করিয়া
 পরের দিনের কাজ ঠিক করিয়া ফেলিও। ভগবান্ দয়া করিয়া আজ
 তোমাদের প্রতি জনের মুখে এক মুঠি করিয়া অন্ন দিতেছেন। আমাকে
 ইহার জন্ত যতই শ্রম সমস্তটা বৎসর ধরিয়া করিয়া যাইতে হউক, আজ
 তোমাদের আশ্রমটাতে বসিয়া একটা বেলাও উপবাসের ক্লেশ সহিতে
 হয় না। একদা এই পুপুনকী আশ্রমটাতেই আমি দিনের পর দিন
 উপবাসে কাটাইয়াছি, আজিকার কোনও স্রুবিধা সেই দিন ছিল না।
 শুধু পুপুনকীতে কেন, আমাকে এই অসাধারণ জঠর-জ্বালা রহিমপুর
 আদি অনেক আশ্রম করিবার কালেই সহিতে হইয়াছে। কিন্তু সেই
 সকল আশ্রম পূর্ববঙ্গে বিধায় সেখানকার পরিবেশ অগুরুপ ছিল,
 বাহাতে আমি কষ্ট সহিবার কালেও ইষ্টকে ভালবাসিতে বিরত হই
 নাই। তাঁহার অশেষ রূপণতা তাঁহারই অশেষ দাক্ষিণ্য বহন করিয়া
 নিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পুপুনকীর কথা আলাদা। এখানে মাটির
 তলাতেও পাথর, আকাশের বুকেও পাথর। তাই এখানকার ক্লেশ
 অনেক সময়ে সহের সীমাও পার হইয়া গিয়াছে। তবুও কাজই
 করিয়া গিয়াছি। আমার সেইদিনকার স্বেচ্ছাবৃত ক্লেশগুলির কথা স্মরণ
 করিয়া তোমরা নিজেদের হৃদয়ে বলসঞ্চার কর বাবা। যাহা আমি অনেক
 অধিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে করিতে পারিয়াছি, তাহা তোমরা
 অনেক অধিক অনুকূল অবস্থার মধ্যে পারিবে না কেন? একথা
 বলিলে আমি শুনিব না যে আমি অসাধারণ পুরুষ আর তোমরা সব
 সাধারণ। সাধারণে আর অসাধারণে পার্থক্য মাত্র একটা অক্ষরের।

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেক্ষা

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৪২২

এই অ অক্ষরটীকে বাদ দিয়া দাঁও, দেখিবে, যাহা আমি পারিয়াছি, তাহা তুমিও পারিবে।

কাজ বেশী দেখিয়া পুপুনকী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার বুদ্ধি করিও না। তোমরা আমার সহকারী রূপে যখন যে যত পরিমাণ শ্রম দিয়াছ, তাহা তোমাদের চরিত্র-বলের মধ্যে সম্পদ রূপে সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। কেহ হয়ত তোমাদের যশ ঘোষিবে না, কেহ হয়ত তোমাদের প্রতিজনকে পরিচয় পাইবে না, কেহ হয়ত অনন্তকাল ধরিয়া তোমাদের এই শ্রম বন্দনা গাহিবে না, কিন্তু তোমাদের কৃতিত্ব ইহাতে কমিয়া যাইতে পারেনা। তোমরা স্বমহিমায় স্নপ্রতিষ্ঠিত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

(৫৮২)

হরিণ্ড

বারাণসী

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকল আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানিও।

তোমার বিস্তারিত পত্রখানা পাইলাম। তুমি নিয়ন্তাই সজ্জিত করিয়া থাক। ইহার ফলে তোমার চিঠি-পত্রে অনেক সময়ে অসাধারণ রকমের সুন্দর ও উচ্চভাবের প্রকাশ পাইতেছে। তোমার রচিত গল্প ও কবিতাগুলির মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। একটী সাধারণ লেখককে জানা মেয়ের মধ্যে এই সকল দেখিতে পাঠলে সকলেই আশ্চর্য্যাবিত হইত। মুগ্ধ হইবে। কিন্তু মা তুমি নিজের ভাবকে অন্তরে রাখিতে পারিবে।

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৪২৩

না। অসুখ বিনুখ হইয়া তোমার শরীর মন আগের চাইতে অনেক দুর্বল হইয়া গিয়াছে। তাই আমি তোমাকে ঔষধ সেবন করিতে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাদের জেদ যে ঔষধ থাইবে না। এমতাবস্থায় অত্যধিক চিন্তা তোমাকে কমাইতে হইবে। তোমার ভিতরে যে শক্তি আছে, তাহা অপরিমিত কিন্তু তাহার সদ্যবহার সম্ভব হইবে একমাত্র ভাবপ্রকাশের সংঘমের দ্বারা। নিয়ত নিজের মনের ভাবকে যে কেবল প্রকাশ করিয়াই চলে, কিছু কাল পরে তাহার অন্তরের ভাবের গভীরতা কমিয়া যায়।

তুমি লিখিয়াছ যে, আমাকে তুমি অবতার বলিয়া প্রচার করিবে। ইহা করিতে তোমার ভাল লাগে। ইহার স্বপক্ষে তোমার অনেক সদ্ব্যুক্তি আছে। তুমি নিজের সাধনার দ্বারাই উপলব্ধি করিয়াছ যে, আমি অবতার ব্যতীত আর কিছুই নহি। তোমার মতন ভক্তিমন্তী মেয়ের মুখে এই সকল কথা শুনিতে নিশ্চয়ই আমার ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু আমাকে অবতার বলিয়া প্রমাণ বা প্রচার করিলে তোমার, আমার বা জগতের লাভ কি হইবে? আরও ত' কত শিষ্য কত গুরুদেব বা গুরুদেবীকে অবতার বলিয়া প্রমাণ ও প্রচার করিয়াছেন। যেখানে প্রচারের মধ্যে ব্যাপকতা আছে এবং প্রচারশৈলী খুব স্বাভাবিকতার সুরে বাধা, সেখানে কাহাকেও কাহাকেও লোকে অবতার বলিয়া পূজাও করিতেছে। কিন্তু ইহার দ্বারা জগতের কি লাভ হইয়াছে, তাহা কি বিচার করিবে না? জগতে নূতন নূতন অবতার বাড়িলে দেশের লাভ কি হইবে, তাহা হিসাবে আনিবে না? জমাখরচ ছাড়া কি কোথাও কোনও কারবার হয়? যাহারা অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন, তাঁহাদের পূজা কোথায়

কতখানি লাভ বিলাইয়াছে, তাহাও হিসাব করিয়া দেখ। হুজুর চলিও না মা। হুজুর জিনিষটা সকল সময়েই ভাল নহে।

আমি নিজেকে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের সহিত অভেদ বলিয়া কবৎসর আগেই ত' জানিয়াছি। আমি কদাচিত্ প্রকাশ করি না কহিলেও স্বাভাবিক ভাবে ইহা আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মধ্যে প্রচারশীলতা ছিল না। আমার সেই সরল সহজ উক্তির মূলধন করিয়া তোমরা যদি ঐ সকলকে আমার অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে এক দল লোক ইহাতে ভুলিলেও ভুলি পারেন কিন্তু জগতের তাহাতে কি লাভ হইবে? আমি ত' ঐ বার্তাই জগৎকে শুনাইতে আসিয়াছি যে, তোমরা প্রতিজ্ঞাই ভগবানের অবতার। তোমাদের প্রতিজ্ঞার ভিতরে তিনিই আছেন, বিনি কে কোটি দেবগণকে সৃজন-বিলয়ের লীলায় খেলাইতেছেন। তোমাদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে অবতারত্ব তোমাদের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। আমি নিজে অবতার হইয়া পূজা পাওয়াকে অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া কবরি।

তোমাদের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার ভাব খুব পরিপুষ্ট নাহি তোমাদের পক্ষে আমাকে অবতার বলিয়া চালাইবার চেষ্টা দানাও দি না, ইহা আমি আগেই জানাইয়া দিতেছি। অত্যাচারী নিজ নিজ প্রচার করিতে গিয়া হঠাৎ অবতারবাদের কবলে পড়িয়া গিয়া অনেক উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত আছে। জীব জীব জাগরণ করিতে যাইয়া হঠাৎ কোন্ ফাঁকে নিজ গুরুদেবকে বলিয়া প্রচার করিবার দিকে সমগ্র শক্তি চলিয়া গেল। উচ্চতর বাহারা বুঝিবে না, তাহারা হঠাৎ দেশপ্রচলিত একটা জিনিষ পাইয়া সামান্য প্রচারের ফলেই ইহাকে লুফিয়া

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৪২৫

ভারতের অনেক ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রচার-ব্যাপারের ইতিহাস। আমি কোনও সম্প্রদায়কে হেয় করিবার জন্ত এই কথা লিখিতেছি না। আমি শুধু বলিতে চাহিতেছি যে, ইহা ইতিহাস। কিন্তু কাহাকেও অবতার বনিয়া প্রচার করিবার পুণ্যের চাইতে একটা মানুষকে ভালবাসিবার পুণ্য অনেক অধিক। ইহাই আমার মত।

তোমার পত্রে আরও অনেক কথা আছে, যাহা নিয়া আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু আমার সময়ের বড়ই অভাব মা। তাই আর লিখিতে পারিলাম না। আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ পুনরপি গ্রহণ করিও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮৩)

ইরি-ও

বারাণসী

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্বদা ভগবানের নামে মন রাখিও। নামের মধ্যে প্রেম রহিয়াছে। নামের সেবা করিতে করিতে প্রেম উপজিবে, প্রেমময় স্বভাব তোমার লাভ হইবে। নামের গুণে প্রেমময় স্বভাবটী লাভ করিয়া নিখিল জগতের পানে স্নেহভরে তাকাইও। সমগ্র জগৎ পিপাসিত, প্রেমপিপাসা তাহাকে উদ্ভাস্ত করিতেছে। তোমাদের স্নেহের দৃষ্টি তাহাদের সেই পিপাসা মিটাইতে সমর্থ হউক। নিজেকে

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম।

[১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

৪২৬

লালসা ও বাসনার উর্দ্ধে রাখিয়া প্রতিটি কাজ করিও। সংসার হাড়িয়াও তোমরা সংসারাতীত মহাপুরুষ হও।

সচ্চিন্তার শক্তিতে জগৎ পরিণামিত করিয়া দিবার মধ্যে কি আছে, তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানী জগৎকে জাগাইতে হইলে ইহাই উপায়। ভাব বা সচ্চিন্তা এক পদ শক্তি। ইহা একবার মনের মধ্যে প্রবেশ করিলে মানুষ অসাধারণ হইয়া যায়। বনে যেমন আগুন জ্বলিলে দেখিতে না দেখিতে তাহা দাবানলে পরিণত হয়, মনে তেমন ভাবের প্রবেশ ঘটিলে ঠিক তদ্রূপ হয়। জ্ঞানই ভাব উৎস। ভাব হইতেই জ্ঞান আসে। একটা ভাব অন্তরে দখল পোষণ করিতে করিতে তাহা অনন্ত কর্মের হয় প্রণোদক। তাহা হইতে উদ্ভূত আসে, তাহা হইতেই সিদ্ধি আসে। সচ্চিন্তা পরিণত হইলে একটা অতি প্রধান কাজ বলিয়া জানিবে।

নিজেদের মধ্যে অবিচল ঐক্য রক্ষা করিয়া চলিও। ঐক্যের বল নাই, যদি তাহা সঙ্কল্পেই হয়। তোমাদের পারস্পরিক ঐক্য থাকিলে তোমরা অপরকে ঐক্যবদ্ধ হইতে উপদেশ দিবে কেন অধিকারে? ঐক্য হইলেই সামান্য বিপদে পৃথক হইবে। ঐক্যবানেরা বিষম বিপত্তিকে অবহেলে হঠাইয়া দেয়। ঐক্যের উৎস, বল বিশ্বাসের উৎস, বিশ্বাস বিজয়ের উৎস। সকলে সম্মিলিত হইয়া সদ্ভাব প্রচারে লাগিয়া যাইবে। ইহার দ্বারা যে কোনও অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির পরিবর্তন সহজ হইয়া যাইবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষের সততা ও সাধুতা বিনাশ পাইতেছে। তোমরা সততা ও সাধুতার অহুকুলে ভাবনা করিও না। কার্যে অসাধারণ উদ্ভূত প্রয়োগ কর। সেই উদ্ভূতের সাহায্যে

ভাদ্র, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেরা

প্রাঃ পূর্বদি

৪২৭

ব্যাপক, যদি তাহাতে তোমাদের সম্মিলিত শক্তির থাকে সহযোগ আর তাহাতে পরিকল্পিত সছপায় হয় অবলম্বিত।

যদি এমন কারণ ঘটয়া যায় যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিতেছ না, তাহা হইলে সকলের জ্ঞাত বসিয়া না থাকিয়া নিজেই একাকী কাজ শুরু করিয়া দিবে। যেখানে সকলের সহযোগ ও পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করিবার সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নাই, মাত্র সেখানেই কার্য্যারম্ভে সামান্য বিলম্ব অনিচ্ছায় হইলেও অনুমোদনযোগ্য। এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে সম্ভ্যতার অগ্রগতি হইলেও মানুষের মন এখনো আদিম যুগের অজ্ঞানতাতেই ডুবিয়া আছে। জামা কাপড় পরিতে বাহারা শিখিয়াছে, তাহারাই সভ্য নহে। সভ্য হইতে হইলে মনকেও সভ্য করিতে হয়। তাহা সম্ভব হয় অত্যাচ্ছ অভ্যাসতঃ মহৎ চিন্তাকে মানুষের মনে প্রবেশিত করিয়া দিয়া। কোনও প্রকারেই মানুষকে তাহার আদিম কালের বর্বরতার মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দিতে পার না।

তোমরা নিজ নিজ উপাসনা প্রাণভরা আবেগ লইয়া করিও। কখনও ভগবানের নামে অবিশ্বাস করিও না। নামের ভিতরে যে জীবনের পরমা শান্তি নিহিত, এই কথা নিমেষের তরেও ভুলিও না। তোমাদের সাধনানুরাগ যেন তোমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্তির অমিয়-রসে নিমজ্জমান করে, তোমাদের শান্ত সুন্দর সাধনোজ্জ্বল মুখচ্ছবি দেখিয়া বেন দশজনের মনে সাধন করিয়া শান্তি লাভ করিতে আগ্রহ আসে। ধর্মকে কখনও লোকদেখান জিনিষে পরিণত করিও না, কিন্তু সমবেত উপাসনায় যোগ দিবার সুযোগ সর্বদাই গ্রহণ করিবে। সমবেত উপাসনা যখন দশজনকে লইয়া, তখন তাহাতে কতকগুলি বাহ্যিক আংশিক ভাবে আবশ্যক হইতে পারে। যতটুকু তাহা

প্রতিবন্ধি

ধ্বংস প্রেরণ

[৯ম বর্ষ, ৫ম নং]

৪২৮

প্রয়োজন, তাহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া ইহাকে অবধা হট্টগোলে পরি-
 হইতে দিও না।

তোমাদের প্রায় প্রতি জনের ভিতরেই আমি বিপুল প্রাণের লক্ষ্য
 দেখিয়াছি। তোমরা অনেক কিছু জগতে করিতে পার, বাহার বি-
 এখন কেহ কল্পনাই করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু কেহ আশ্রয় করি-
 তোমাদের ডাকিয়া কখনো বলে নাই যে, তোমাদের শক্তি কত অল্প
 তোমাদের সামর্থ্য কি অপরিমিত। আমি তোমাদের আত্মবিস্তৃতি
 করিতে চাহি।

কেহ কেহ আগেকার দিনের অর্থহীন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করি-
 পারিতেছে না বলিয়া তাহাদের উপরে বিরক্ত হইও না। তাহাদিগকে ন-
 জীবনের বাণী বারংবার শুনাইতে থাক। শুনিতে শুনিতে তাহাদের মন-
 স্থবিরতা দূর হইবে, জীবন নূতন তাক্রণ্যে হাসিতে মুগ্ধ করি-
 কাহাকেও বর্জ্যনীয় বলিয়া মনে করিও না।

আমি যাহা তোমাকে একখানা বক্তৃগত পত্রে লিখিতেছি, তাহা
 তোমাদের সকলেরই জন্ত লিখিতেছি। ইহা হইতে তোমরা দর-
 নিজ নিজ প্রয়োজনীয় হিতবাণী বাছিয়া লও। ইতি—

আদিত্য

ধর্মপাল

भा.प्र., १७७१]

अभिव्यक्ति

429

हमारी भाषा समस्या

हमारे लोकसभा के नेताओं ने बहुमत के द्वारा हिन्दी को सरकारी भाषा रूप से स्वीकार किया है और उनकी उस स्वीकृति को संविधानिक मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है। किन्तु उसी दिन से विरोध का बीज अनेकों के हृदय में सुप्त रह गया और जब उस समय संसदीय कांग्रेस दल की सभा में इस विषय का वाद-विवाद होने लगा तो उस दल के प्रतिनिधि समान दो भागों में बँट गये। देश के सभी प्रान्तों के प्रसिद्ध विद्वान, वैज्ञानिक, भाषाविद्, साहित्यिक तथा राजनीतिविद् व्यक्तियों ने जातीय एकता के भंग होने तथा जातीय उन्नति के बाधक होने के भय से इस विभेद-मूलक विधान के विरुद्ध आवाज उठायी।

नव-लब्ध स्वतन्त्रता के विजयोत्सास ने बहुतों को इस विषय में मौन रहने के लिए प्रेरित किया यद्यपि उनके मन में इस विषय के भय की कुछ बेचैनी हलचल मचा रही थी।

इस सम्बन्ध में विशेष निवेदन यह है कि अभी हाल में डा० सुनीति कुमार चैटर्जी महोदय ने पत्रकारों के सामने वक्तव्य दिया है कि अहिन्दी प्रदेशों में जबर्दस्ती हिन्दी को लादने से देश की सांस्कृतिक तथा राजनैतिक एकता भंग हो जायगी, फलस्वरूप भारत की स्वतन्त्रता विपन्न होगी।

अतिश्वनि

हमारी भाषा समस्या

[७७ वर्ष, १५ मार्च]

430

डा० चैटर्जी संस्कृत आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति द्वारा गठित सरकारी भाषा आयोग के सदस्य नियुक्त हुए थे। जनता को अच्छी तरह मालूम है कि संस्कृत आयोग ने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि संस्कृत को भारत की अन्यतम राष्ट्रभाषा रूप से ग्रहण करना चाहिए। अपि तु डा० चैटर्जी ने संस्कृत आयोग के एक दूसरे सदस्य के साथ हिन्दी को ही एकमात्र राष्ट्र-भाषा रूप से स्वीकार करने का विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसका कारण यह है कि उन्होंने संस्कृत आयोग के सदस्य के रूप से सारे भारत में भ्रमण करके अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी का भारी विरोध पाया था।

डा० चैटर्जी उक्त दोनों आयोगों के सदस्य थे। इस कारण केवल उन्हीं को देश भर के विशिष्ट शिक्षित वर्ग से मिलने का सबसे अधिक मौका मिला था। अतः उनके मन्तव्य को विशेष गुरुत्व देना चाहिए। और भी कारण है कि डा० चैटर्जी दोनों आयोगों के सदस्य थे और बहु-भाषाविद् भाषाशास्त्री रूप से सारी पृथ्वी में उनका यश फैला हुआ है। उक्त दोनों ही तब सरकारी भाषा आयोग के दूसरे सदस्यों की सम्मति की अपेक्षा अधिक गुरुत्वपूर्ण हैं। तिस पर भी राजनेताओं ने उनपर भी प्रभाव डाल दिया। फलस्वरूप देश के कोने-कोने में भारी असन्तोष फैल गया और इस बहु-भाषी देश में कुछ अन्य भाषाओं के हिन्दी से अधिक समुन्नत होते हुए भी हिन्दी को ही राष्ट्र-भाषा रूप में

ज. १७७१]

हमारी भाषा समस्या

अतिश्वनि

431

स्वीकार कर लेने का विरोध करने के लिए देश के विभिन्न प्रान्तों में सभाएँ होने लगीं ।

उसी तरह की एक सभा पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के धुबुलिया ग्राम में १९५७ ई० में हुई थी जिसमें देश के विभिन्न भागों से लगभग ३५००० नरनारी उपस्थित हुए थे और जिसमें महान सन्त तथा समाज-संस्कारक श्री स्वामी स्वरूपानन्द परम-हंस सभापति हुए थे जो संस्कृत को भारतीय संघ की राष्ट्र-भाषा बनाने के आन्दोलन के जन्मदाता माने जाते हैं । धर्मप्रचारक होने पर भी उनका प्रचारकार्य गुरुओं की तरह नहीं, बल्कि देशभक्ति-मूलक है । आगे चलकर उन्होंने निःसन्दिग्ध भाव से घोषणा की थी कि भाषा को धर्म से पृथक् नहीं किया जा सकता । भाषा मनोभावों के प्रकाश का माध्यम है, चाहे धर्म हो, शिक्षा हो, शासन हो या और कुछ भी हो ।

संस्कृत पर हिन्दुओं का एकाधिकार नहीं है । इसका साहित्य तथा चिन्ता का सुविस्तृत क्षेत्र सभी भारतीयों के चिन्ता पर पूर्ण प्रभाव डालता है । यह सत्य है कि सनातन पन्थी अपने मत के समर्थन में संस्कृत पुस्तकों से श्लोक उद्धृत करते हैं परन्तु यह संस्कृत का ही विशेषत्व नहीं है । उसी तरह अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी भाषाओं से आधुनिक प्रगति के पक्ष के समर्थन के लिए प्रमाण उद्धृत किया जा सकता है । दूसरी ओर यह भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि संस्कृत में भी प्रगति के पक्ष में यथेष्ट

प्रतिश्वनि

हमारी भाषा समस्या

[७३ वर्ष, ६३ मंथन]

432

प्रमाण मिलते हैं। अतः रक्षणशीलता का भय भित्तिहीन है।

उक्त समाज-संस्कारक महान् सन्त के द्वारा इस सम्बन्ध का जो आन्दोलन चलाया गया उसके अनन्तर सारे देश में हल-चल मच गयी। संस्कृत आयोग के समर्थन तथा सरकारी भाषा आयोग के सदस्यों के मतभेद ने अग्नि में घृत-संयोगका काम किया। ठीक एक साल बाद जनता की आवाज उठाने के लिए एक अखिल भारतीय संस्था—“अखिल भारतीय संस्कृत राष्ट्र-भाषा सम्मेलन” नाम से स्थापित हुई। दूसरी ओर अनेक स्वदेश-भक्तों ने गंभीरता के साथ सोचना शुरू किया जिससे भाषा समस्या को लेकर उत्पन्न विभेद-मूलक प्रवृत्ति का सामना करने का उपाय निकाला जा सके। यहाँ तक कि लोकसभा के कांग्रेसी सदस्यों में से भी कुछ लोगों ने स्थिति पर पुनर्विचार करना उचित समझा और अन्त में हम देखते हैं कि कांग्रेस दल के ही एक संसद-सदस्य श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य ने संविधान की धारा ३४३ के अनुच्छेद (१) में “हिन्दी” शब्द के आगे “तथा संस्कृत” शब्द जोड़ देने का विधेयक लोकसभा में उपस्थित किया है। यदि यह संशोधन स्वीकृत हो गया तो हिन्दी और संस्कृत दोनों ही सरकारी भाषाएँ बन जायेंगी।

इस विधेयक के लोकसभा में पेश होने का समाचार प्रकाशित होने के बाद सभी प्रान्तों से दिन पर दिन अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त हो रहे हैं। इस अल्प समय में समाचार-

पत्रों में इसके समर्थन में जो वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं उनमें से एक की कुछ पंक्तियाँ यहाँ मैं उद्धृत किये बिना नहीं रह सकता, जिसे डा० श्री सुनीतिकुमार चैटर्जी, श्री देवप्रसाद घोष, श्री पी० एन० बनर्जी तथा और भी कई विशेष प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने वक्तव्य में कहा था। उसमें संस्कृत के पक्ष में अकाट्य युक्तियाँ संक्षेप में दी गयी हैं—

“इस सुसामयिक प्रस्ताव के पक्ष में देश के कोने-कोने से समर्थन आना चाहिए। संस्कृत सर्व-भारतीय भाषा है और यह अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता पा चुकी है। संस्कृत को सरकारी भाषा रूप से स्वीकार करने से वह किसी विशेष दल या प्रान्त को कोई खास लाभ नहीं देगी।

“यह विधेयक संस्कृत आयोग की सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव के अनुरूप है। अर्थात् संस्कृत को अन्यतम राष्ट्र-भाषा रूप से स्वीकार करना चाहिए।

“संस्कृत में महान् मिलन-शक्ति है और यह प्रस्तावित संशोधन विभेद-जनक प्रवृत्ति और भाषा सम्बन्धी ग्रामीणता को, जो इस समय भारत की एकता की जड़ को हिला रही है, निश्चित रूप से समूल नष्ट कर देगा। साथ-साथ यह भारत की प्रान्तिक भाषाओं को भी समृद्ध करेगी।”

ऐसे तथ्यों के रहते हुए भी जिन राजनेताओं के हाथ में शासन की बागडोर है उनमें संस्कृत के पक्ष में कोई समर्थन नहीं दिखाई

पड़ता। परन्तु ऐसी उदासीनता किसी खास कारण से नहीं, बल्कि इस भाषा को न जानने के कारण ही है। हम इसका स्पष्ट प्रमाण दे सकते हैं कि आज तक कोई भी राज्य सरकारी काम में उस राज्य की भाषा को प्रयोग में नहीं लाया है। यह भी एक स्पष्ट प्रमाण है कि नेताओं की एक बड़ी संख्या अंग्रेजी को सरकारी भाषा रूप से रखने का समर्थन करती है। वे केवल अपने ही वारे में, करोड़ों भारतवासियों के स्वार्थ पर उपेक्षा दिखाकर अपने ही स्वार्थ के वारे में तथा वर्तमान परिस्थिति के सम्बन्ध में ही सोचते हैं। वे हमारे देश के ६५ प्रतिशत अशिक्षित व्यक्तियों तथा भविष्य सन्ततियों के वारे में नहीं सोच सकते।

संस्कृत बहुत कठिन भाषा है—ऐसा आक्षेप उस भाषा को न जानने के कारण ही किया जाता है। मैं यहाँ पण्डित विष्णु शर्मा का वह साहसिक भाषण उद्धृत नहीं करना चाहता जिन्होंने राजा के मूर्ख पुत्रों को ६ महीने के अन्दर सुशिक्षित कर दिया था; परन्तु मैं यहाँ एक घटना का वर्णन दिये बिना रह नहीं सकता कि कलकत्ते के संस्कृत कालेज के स्कूल विभाग के दर्जा २ का एक सात वर्षीय बालक संस्कृत में अच्छी तरह बातचीत कर सकता है। उसका वह भाषण अनेक सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शित भी किया गया है। संस्कृत में विद्वान होना बहुत ही कठिन है क्योंकि इस भाषा के साहित्य बहुत ही विशाल हैं, इसे हम मानते हैं और साथ-साथ यह भी सत्य है कि किसी भी भाषा को अच्छी तरह जानना कठिन काम है।

प्राचीन स्वर्ण-युग में भारत ने संस्कृत भाषा में बीजगणित, रसायन, ज्योतिष, चिकित्सा, शल्य-शास्त्र, विमान-विद्या आदि में जो अपूर्व दान दिया था उसमें आजकल के शिक्षित वर्ग प्रायः अनजान ही है। तथापि इसे भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि संस्कृत शब्दों का भण्डार अन्य सभी भाषाओं से समृद्ध है जो शासन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए पर्याप्त है।

संस्कृत 'मृत' भाषा है—ऐसा मत अब नहीं चल सकता। संस्कृत आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अनन्तर यह तथ्य अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि अनादि काल से आज तक सारे भारत में व्यापक रूप से संस्कृत का पठन-पाठन हो रहा है। भाषा सम्बन्धी वाद-विवाद के इन वर्षों में जो हजारों वक्ताओं ने उन आयोगों के समक्ष संस्कृत में धाराप्रवाह भाषण दिये हैं उससे प्रमाणित हो गया है कि दूसरी भाषाओं की तरह संस्कृत भी सरलता से तथा द्रुत बोली जा सकती है। वे भाषण अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के भाषणों से किसी अंश में निम्नकोटि के नहीं हैं। १९५१ की जन-गणना के प्रतिवेदन से प्रमाणित हो गया है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में अनेक परिवारों के लोग संस्कृत मातृ-भाषा की तरह बोलते हैं। यदि 'मृत' शब्द किसी भाषा पर प्रयोग करना हो तो वह ग्रीक या लैटिन की अपेक्षा हीन भाषा पर ही प्रयुक्त होना चाहिये। संस्कृत के साथ उन भाषाओं की तुलना ही नहीं हो सकती। तथापि इसरायल निवासी अपनी

संस्कृति और धर्ममत पर प्रेम के कारण तथा अपनी जातीय प्रतिष्ठा में अनुरक्ति के कारण, वर्तमान समय की अनेक असुविधाओं की उपेक्षा करके भी अपनी बहु प्राचीन भाषा को ही अपना रहे हैं। तथापि बहुत ही अल्प समय में वे सारी प्रारम्भिक असुविधाओं पर विजय प्राप्त करके दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। क्या भारतीय राजनेता इसराइल निवासियों से शिक्षा प्राप्त करके संस्कृत जैसी अत्यधिक समुन्नत भाषा को स्वीकार करने की दूरदर्शिता नहीं दिखायेंगे जिससे इस गणतन्त्र की एकता के भङ्ग होने की संभावना को दूर करके भविष्य भारत की सर्व विषयक समृद्धि सुनिश्चित की जा सके ?

इन दिनों भाषा सम्बन्धी ग्रामीणता से हमारे देश की एकता के एकाधिक बार भंग होने का भय उत्पन्न हो चुका है और अभी-अभी आसाम में जो घटनाएँ हुई हैं वे हमें स्मरण दिलाती हैं कि भाषा समस्या का समाधान तुरन्त कर देने की आवश्यकता है। हिन्दी, अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषाओं का कोई समूह इस जटिल समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हिन्दी कितनी ही व्यापक क्यों न हो, है वह एक प्रान्तीय भाषा ही और अन्य भाषा-भाषियों की श्रद्धा को वह, अपनी समृद्धि की न्यूनता के कारण, आकर्षित भी नहीं कर सकती। अंग्रेजी को बनाये रखने से हमारी जातीय प्रतिष्ठा में बढ़ा लगता है। इसे प्रगतिशील प्रधान मंत्री

नेहरू जी ने भी स्वीकार किया है ; परन्तु जहाँ हमारे देश के ६५ प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित हैं वहाँ इस देश की सब प्रकार की उन्नति में वह बाधक होगा । दूसरी बात यह है कि हमारी प्रांतीय भाषाओं से अंग्रेजी का कोई सम्बन्ध भी नहीं है । बहुत सी भाषाओं के समूह को स्वीकार करना दुष्कर है, क्योंकि किन्-किन् भाषाओं को लिया जाय इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकेगी और जिन भाषाओं को स्वीकार नहीं किया जायगा उन भाषा-भाषी लोगों में असन्तोष फैला ही रहेगा ।

हरएक पहलूसे विचार करने पर संस्कृत को एक सरकारी भाषा स्वीकार करना ही इस जटिल समस्या का एकमात्र समाधान है; क्योंकि भारत की यही एकमात्र साधारण जातीय पैतृक सम्पत्ति है । जब हम अपनी जातीय प्रतिभा के विषय में वार्तालाप करते हैं, जो भिन्नता में अभिन्न है और जिसमें भारतीयों के मन की मौलिक एकता है तो हमारे सामने संस्कृत का प्रभाव ही प्रधान रूप से आता है जो प्रान्तिक विभेद और भाषा सम्बन्धी भिन्नता को कुचल देती है और हमारी चिन्ता तथा मनोभावों में सच्चा जातीय चरित्र प्रगट हो जाता है । यहाँ तक कि हमारे देश की सभी भाषाओं को रूप और गठन देने वाली एक संस्कृत ही है । यदि संस्कृत और उसकी परम्परा से हम पृथक हो जाते हैं तो भारत की एकता समाप्त हो जायगी और यथार्थ में वह ध्वंस के होने के कगार पर आ भी गयी है ।

प्रतिनिधि

हमारी भाषा समस्या [७३ वर्ष, ६३ मई १९५०]

438

जनता के प्रतिनिधि लोकसभा - सदस्यों के सामने श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य ने समर्थन के लिए इस विधेयक को पेश किया है। न्याय और विचार के नाम से हम विशेष रूप से लोकसभा के उन सदस्यों के समीप इस विधेयक का समर्थन करने की प्रार्थना करते हैं जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी है। हम धार्मिक जनता से भी इस विधेयक का समर्थन करने की प्रार्थना करते हैं।

उपसंहार करने के पहले, इस देश के अस्तित्व के साथ इस भाषा का किस प्रकार अविच्छिन्न सम्बन्ध है उसे दिखाने के लिए हम यहाँ एक विदेशी नामी विद्वान प्रोफेसर विल्सन का एक अमर श्लोक उद्धृत करते हैं—

यावद् भारतवर्षं स्यात् यावद् विन्ध्यहिमाचलम् ।

यावद् गङ्गा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम् ॥

अर्थात् जबतक भारत का अस्तित्व रहेगा, जबतक विन्ध्याचल और हिमाचल विद्यमान रहेंगे, जबतक गंगा और गोदावरी नदियाँ प्रवाहित होती रहेंगी तबतक संस्कृत भाषा भी रहेगी।

What should be the national language of India ? ❀

Dr. SAMBHU NATH BANERJEE, LL. D.

(Ex-Justice, Calcutta High Court,

Ex-Vice-chancellor, Calcutta University).

(Abridged)

Friends,

I consider it a matter of unique honour to be called upon to preside over this Conference.

You, have ignored all personal discomforts and have come to take part in the deliberation. The deliberation vitally affects the interest of the present generation of Indians. It also affects the interest of the generations yet to come. We are inhabitants of different parts of this great sub-continent. But there is community of sentiments, community of feelings and community of ideals on the question under consideration. So any one of us is able to speak on behalf of the others.

* PRESIDENTIAL ADDRESS DELIVERED AT SUBODH MULLIC SQUARE, CALCUTTA ON
MARCH 21, 1900.

প্রতিধ্বনি National language of India ? [৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

440

The question—a question of life and death

The question before us is : What should be the national language of India ? What should be her Lingua Franca ? Up till now English has been our Lingua Franca. For good or for evil, about two hundred years ago, the English people came to India. And whether by right of conquest, or otherwise, they ruled India for about two centuries. Whatever be the reason, English education was given to the people of this land. This education roused the people of India from the torpor of ages. It has brought about religious, social and political regeneration which the country badly needed.

In our school days, great English writers were our classics. English history was taught in our schools. It described the details of all forms of English life. We read English newspapers, English journals and English magazines. They changed our modes of thought and forms of feelings. English education has had a great influence on our social and religious practices. The rigours of the old caste system are gone. Knowledge has become accessible to all. The Vedas and other holy books have become common property. British rule has been, to a certain extent, of benefit to us in these matters ; but I say, with regret, it has left a legacy of poverty and distress which will take years to liquidate. Even so, we cannot but admire the education we received

under the British regime. English people have left India. So it is said that it would be displaying an inferiority complex of mind if we stuck to the English language. Therefore it is only proper that India should have a language of her own from one of the languages of the land. What should be that language ?

In the Eighth Schedule to the Constitution of India, fourteen languages have been recognised as the languages of India. Among others are Bengali, Hindi and Sanskrit, English has not been recognised as one of the Indian languages. It has been said by a great scholar, in an article recently published in 'The Amrita Bazar Patrika', that English must be given a place in the Schedule as one of the Indian languages, in all justice and equity. He has also said that some other languages should also be recognised as Indian languages, for example, 'Maithili', 'Santhali', 'Bhojpuri' etc. Though fourteen languages have been recognised as Indian languages, the Constitution provides in article 343 that the official language of the Union (Bharat) shall be Hindi.

It is also provided that the English language shall continue to be used for a period of fifteen years for all official purposes of the Union for which it was being used immediately before the commencement of the Constitution. Under power vested in the President by the Constitution, he was pleased

প্রতিধ্বনি National language of India ? [ভাষা বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

442

to constitute a Commission to make recommendations to the President as to, inter alia :

- (a) the progressive use of the Hindi language for official purposes of the Union ; and
- (b) restriction on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union.

The Commission has made its recommendations. It is said in some quarters that the recommendations—at least some of them—are beyond the scope of the reference and are irrelevant. There are two dissident notes to the Report of the Commission. Nobody has so far adequately met the arguments advanced in the dissident notes. The Commission, in the main, recommends Hindi. In the South, as also in Bengal, there is strong opposition to Hindi being made the official language of India. This question is so important that it had to be brought up in the 63rd Session of the Congress held at Pragjyotishpur. A number of eminent public men spoke in favour of Hindi. But the Prime Minister's very reasonable attitude carried the day. It has been said that English may be continued after 1965. This was the view taken by our Prime Minister. But there would be no satisfaction in the minds of the people concerned until suitable amendments are made in the Constitution giving effect to this view.

It is said that for the unity of India, it is necessary to have a common language. Admitting the

proposition to be correct, it must be remembered that the unity of a country like this which has practically innumerable languages, can only be achieved through diversity. The attempt of those who are in favour of making Hindi the national language of India has caused great irritation in the minds of the people. Indeed, about sixty per cent are against Hindi being made national language of India. If, however, against their wishes Hindi is forced on non-Hindi speaking people, it will create disruption ; the object of the Government of India to create unity would be in danger. It is already being felt that Hindi is being encouraged to the prejudice of other languages.

It is also urged by some eminent public men that Hindi should be the common language of India, otherwise we will not be able to keep contact with the masses. Is that a correct theory? How did the leaders of the Congress, who won freedom for the country, keep contact with the masses before? Was Hindi then the Lingua Franca of India? Obviously not. Yet the mass was behind the Congress Organisation. Therefore, the argument that unless Hindi is introduced, contact with the masses can not be maintained, is not correct.

It has been further said that administration

প্রতিধ্বনি National language of India ? [৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]
444

could not be run efficiently in any language other than the language of the masses, and that unless the administration is strong, we would lose the independence of the country. But was British administration run in Hindi? True, the greed of England has reduced Indian masses to extreme poverty, the drain on India was too much for her to bear. Even so, can anybody deny that British administration was efficient? Was that administration carried on in the language of the masses?

Therefore, the three grounds on which it is urged that Hindi should be the national language of India fail :

- (i) preservation of India's unity ;
- (ii) contact with the masses ; and
- (iii) efficiency of administration.

Our Prime Minister has repeatedly called upon Indian people to pay more attention to scientific and technical studies. I wish to add legal studies to the list. English Jurisprudence is one of the best, if not the best, in the world. The excellence of Indian legal system is mostly due to the fact that it has assimilated the principles of English Jurisprudence. It is a truism to

say that the basis of all democracy is proper administration of law, and existence of a proper legal system. In a democracy, Justice and Equity above all ! If we discard English and lose contact with the magnificent judgments of the English Courts and of the American Courts shall we be able to maintain the excellence in our legal system which we are so proud of ?

Further, if greater emphasis is to be placed on scientific and technical studies, it is obvious it cannot be done through the medium of Hindi. In this connection, I refer to the views of educationists like Dr. Deshmukh and Dr. Srimali.

Hindi—a language still in its adolescence

Hindi has not yet got the richness of vocabulary which is necessary to perform, in the expanding exigencies of our national life, the varied and vast functions which the common language for India will be called upon to perform. It has not the power and content to meet all our requirements. It is true that Government of India has given directive to promote the spread of Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its en-

প্রতিধ্বনি National language of India ? [৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

446

richment. But even so it will take time. It cannot be done in two or three decades. Languages have their own laws of growth. The process of development cannot be accelerated by extraneous circumstances. Social and economic conditions may accelerate the growth. It may record remarkable progress within a short period, if men of genius are born and use a particular language to express their views. The best illustration is afforded by the Bengali language. The writings of Iswar Chandra Vidyasagar, Bankim Chandra Chatterjee and Rabindranath Tagore have vastly changed Bengali language and literature. The richness of Rabindranath's poetry the depth of his thought, the colour of his language, its rhythm, its melody, and symphony have enriched Bengali language and literature. It is very difficult to estimate the extent of his influence just at present. The history of Bengali literature has to be written anew, and in that context the influence of Rabindranath's writings will have to be considered before any final verdict can be passed. Rabindranath, a great genius, used Bengali language as vehicle for expression of his thought. That is why Bengali language has

achieved its present position. But if the essential condition is not fulfilled, the appointment of a Committee or the establishment of a Directorate for the spread and development of a particular language would not be of much help. A committee of philologists and critics may lay down rules for the simplification of spellings and grammar. They may invent and standardise technical terms. But they cannot give any fruitful impetus to literary development. The springs of literature lie hidden in human hearts. The deepest emotions of man cannot be stirred by formal resolution or official bulletins. Perhaps, these essential conditions for the growth of a language were overlooked by the framers of the Constitution, when they fixed the time-limit for replacement of English by Hindi. The present situation would not have arisen, if these aspects of the question had been carefully considered.

I am not opposed to Hindi being made the national language of India. But it cannot be made the national language at this stage. It is too early yet. Hindi has yet to grow and reach its height before it can claim to be the national language of India.

প্রতিধ্বনি National language of India ? [৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]
448

Indeed, any of the languages mentioned in the Eighth Schedule may be the national language of India provided it has got the requisite qualification. My observation is proved from the history of English language. The present status of that language is due to its development in the course of the last thousand years, if not more. It has become an international language not by imposition, but by its own merit. There is scarcely a language ever spoken among men that has not some representative in English speech. English has an almost unexampled variety of words, kindred in meaning but distinct in usage, for expressing almost every shade of human thought. Scarcely any two of such words commonly known as synonyms, are identical at once in significance and in use. Within a limit they are alike and are interchangeable. Outside it they are different, Change one for the other and the beauty and effectiveness of the expression are lost. I quote what Macaulay wrote of Milton's diction to explain what I want to say. Macaulay writes :

"His poetry acts like an incantation. Its merit lies less in its obvious meaning than in its occult power. There would seem at first

sight to be no more in his words than in other words. But they are words of enchantment. No sooner are they pronounced, than the past is present and the distant near. New forms of beauty start at once into existence and all the burial places of the memory give up their dead. Change the structure of the sentence ; substitute one synonym for another, and the whole effect is destroyed. The spell loses its power".

Hindi has not the wealth of words of a grown up and great language. For some time yet to come Hindi will continue to remain incapable of supplying us with synonyms or suitable words for technical and scientific education or words which provoke new thoughts.

Sanskrit,—a language of beauty and culture

It may be asked if Hindi is ruled out, what then should be the national language of India ? This question admits of a simple answer. The answer is—Sanskrit. The importance of Sanskrit in Indian history and culture is not in doubt. It is one of the greatest languages of humanity, and according to some, the most perfect language. It is a language of grace and beauty. It is a language in which the civilization of India ever since its formation in the Vedic period has found its expression for over

প্রতিধ্বনি National language of India ? [৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

450

thousands of years. By its dynamic force during its long course of evolution, it has absorbed and assimilated numerous elements attaining a classical character. Its influence on Indian civilization is inestimable. As a language it is unsurpassed and of unsurpassable intellectual value. Study of Sanskrit promotes intellectual discipline, and has great effect on the formation of national character. It is so much a part of the civilization and heritage of India, that it would indeed be a great loss to the country, to its culture and heritage, if this language is lost. And certainly, it would be lost if it is ignored in the way it has been ignored in recent years. Our Prime Minister has said, "If I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her finest heritage, I would answer unhesitatingly—it is the Sanskrit language and literature, and all that it contains. This is a magnificent inheritance, and so long as this endures and influences the life of our people, so long the basic genius of India will continue".

On a fateful day, when the Sun was revitalising our life, a great Saint Poet said, "O Nishada (hunter), you will not, for eternal years achieve (good) position (in life) as you have killed a (male) **krauncha** bird, infatuated with love, out of the pair". Slokas started at once into existence. Valmiki composed in Slokas the tender life-story of Sita and Rama, and gave India the great Epic of Ramayana.

What Valmiki, the Father of Poets, wrote has influenced the life of Indians ever since this epic was written. Our great epics—the Ramayana and the Mahabharata—are incomparable in beauty and purity as literary compositions. They have helped others to understand Indian civilization. Said the Prime Minister. "I do not think any person can understand India or her people fully without possessing a knowledge of the two magnificent epics which are India's pride and treasure".

Sanskrit has practically an infinite variety of synonyms and antonyms, and is capable of expressing every shade of thought.

If any language has the greatest claim to be the national language of India, it is Sanskrit. It is from Sanskrit that words relating to higher culture could be obtained. In the new set-up, India needs new technical words for the purpose of science. Those words can be supplied by Sanskrit. It has got abundance of roots like Latin and Greek, which have enriched modern European languages. This is why intellectuals like Sir C. V. Raman. Sri Sriprakash, Dr. Kailash Nath Katju and others did not hesitate to express their views that Sanskrit should be the Lingua Franca of India. I would like to refer you to the Report of the Sanskrit Commission (1956-57).

প্রতিধ্বনি National language of India ? [৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

452

in which the matter has been extensively and exhaustively dealt with.

As a foreign language, Latin has not influenced modern English life as much as Sanskrit has done Indian life. When it was contended that Latin should be excluded from the curriculum of Secondary Schools in England, a Committee was appointed called the Norwood Committee. I desire to quote here a few words of that Committee. They are applicable *mutatis mutandis* to Sanskrit.

"We are not prepared to follow the lead of those reformers of the curriculum who would eject the study of Classics from the Secondary Grammar School on the ground that their study is irrelevant to the purposes of modern society. We do not take the view that modern society purposes to turn its back upon its own English culture and to deny to succeeding generations one of the means of understanding themselves and their inherited traditions.

*

*

*

*

"Unless a culture attains to and preserves self-knowledge, its continuity is not assured ; failure in self-knowledge is a symptom of threatening decay.

* * * *

"We regard the study of Latin as of fundamental importance for University work in English. Modern Languages and cognate subjects, in History, Law, Philosophy and Theology".

Among those who have never cared to learn Sanskrit, there is an unfounded fear that Sanskrit is difficult to learn. It is said its grammar, its form, its structure of sentences are complicated. But there is not much substance in these apprehensions. Once a student of Sanskrit commits to memory certain rules of grammar and composition, study of Sanskrit becomes comparatively easy and is very pleasing. Every language has its peculiar grammar and rules for composition. In Sanskrit such rules are more scientific, more precise than in any other language. And once Sanskrit Sutras stick in the memory, they can hardly be forgotten.

Conclusion

We would respectfully urge on the Government of India to keep this point in view and meet the demand of the majority.

Friends, I have expressed my views on this great question, which is a question of life and death. It is for considering this vital question

প্রতিপত্তি National language of India ? [৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]
454

that we have met today. But mere meeting once is not enough. We must be sincere in our desire, effective in our demand, persistent in our effort and prepared for sacrifice. We must go on agitating this matter. "To agitate, means to inform," said Dadabhay Nowrojee, as Congress President in 1906, immediately after the partition of Bengal. "Agitation," he continued "is the life and soul of the whole political, social and industrial history of England. It is by agitation that the English have accomplished their most glorious achievements, their prosperity, their liberties, and in short, their first place among the nations of the world," He quoted a passage from one of Lord Macaulay's speeches : "I hold that we have owed to agitation a long series of beneficent reforms which would have been effected in no other way.....the truth is that agitation is inseparable from popular Government."

If we move in the right direction, the amendment of the Constitution will follow.

Jai Hind

ভাদ্র, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

৪৫৫

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবাবামণির স্বাস্থ্য :—অনেকেই আমাদের পত্র লিখিতেছেন, শ্রীশ্রীবাবামণির স্বাস্থ্য সংবাদ জানিবার জন্য। তজ্জ্ঞ জানাইতেছি যে, তাঁহার পায়ের নিদারুণ ফুলা কমিয়াছে, হৃৎপিণ্ডের গোলমাল আগের চেয়ে কম। মুহুরীর ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আস্তে আস্তে শরীর ভালই হইতেছিল। কিন্তু নানা কারণে আর সেখানে থাকা সম্ভব হইতেছে না বিধায়, তিনি পাহাড় হইতে ১০ই আগষ্ট নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা এখন আসামে গিয়া বিপন্ন ভক্ত ও সন্তানদের দেখিয়া আসেন। স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া তাহা সম্ভব হইবে কিনা, জানি না। শ্রীশ্রীবাবামণির নিদ্রা এবং আহারীয়ের পরিমাণ এখনও স্বাভাবিক হয় নাই।

মঙ্গল-বঁধের খবর :—মঙ্গল-বঁধের কাণায় কাণায় জল পূর্ণ হইয়াছে এবং পৈন (জল বাহির হইবার নির্দিষ্ট জানু) দিয়া জল বাহির হইতেছে। বর্ষা এখনো পূর্ণ ভাবে আসে নাই বলিয়া অতিবৃষ্টিজনিত কোনও ক্ষতির আশঙ্কা এখনো দেখা যাইতেছে না। গত বর্ষায় জলের বতখানি উচ্চতার দরুণ বঁধ ভাঙ্গিয়া বিপর্যায় সৃষ্ট হইয়াছিল, এইবার তাহার প্রায় তিন চারি ফুট নীচে জল রহিয়াছে এবং পৈন (জানু) দিয়া অতিরিক্ত জল আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাইতেছে। যদি ধারাবাহিক অবিরাম বৃষ্টি চারিপাঁচ দিন ধরিয়। হয়, তাহা হইলে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা তিন ফুট বাড়িতে পারে এবং তদবস্থায় মঙ্গল-বঁধে পুনরায় হঠাৎ বিপর্যায় ঘটয়া বাওয়া আশ্চর্য্য নহে। বাহাতে হঠাৎ কোনও অনিষ্ট না হইয়া বরং, তাহার জন্ত দিবানাত্রি প্রাণসংরক্ষণ করা হইয়াছে।

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

১৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

৪৫৬

কংক্রিটের কাজ বর্ষার পূর্বে হইয়া গেলে বিশেষ ভাবে নিশ্চিত হওয়া যাইত, হঠাৎ কতকগুলি ঘটনা ঘটতে ততটা কাজ করান যায় নাই। এই বর্ষার মধ্যেও অল্প অল্প করিয়া কাজ টুকটাক চালান হইতেছে। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভাবনীয় পরিস্থিতির দরুণ সেই অঞ্চলের ভ্রাতা-ভগিনীরা এখন বিশেষ ভাবে বিপন্ন। এমতাবস্থায় ঈশ্বরের বিধান বখন যাহা হইবার, তাহারই জ্ঞাত প্রস্তুত হইয়া সাধ্যমত কর্তব্য করিয়া যাইতেছেন, পুপুন্যী আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ব্রহ্মচারী শ্রীনিত্যানন্দর জল যেখান দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহার দ্বারপথ সুরক্ষিত হইয়াছে এবং যেই রাস্তাটার উপর দিয়া জলটা বহিয়া যাইতেছে, তাহা বেশ কতকটা দৈর্ঘ্যে একেবারে পাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাধের পার ছাড়াও বাধের মাটি কাটিয়া যে যে স্থানে ফেলা হইয়াছে, সেখানে প্রায় চারি পাঁচ শত কলার চারা রোপণ করা হইয়াছে। এই সকল কলার চারা পাঠাইয়াছেন, প্রধানতঃ (১) শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাশ, পুকুরিয়া (মেদিনীপুর), (২) শ্রীজগদীশ চন্দ্র মজুমদার, খড়গপুর, (৩) শ্রীসত্যভূষণ রায়, কোলাঘাট, (৪) শ্রীমুকুল সেনগুপ্ত, খাতড়া, এই কার্যে স্থানীয় অথও-মণ্ডলী ইহাদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। মাল ডেলিভারী নিতে সাহায্য করিয়াছেন মহদার পোষ্টমাস্টার শ্রীশ্রামাধর বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বৎসর প্রয়োজন হইবে সহস্রাধিক বাঁশের গুঁড় (Thump) পাঠাইবার। কিন্তু কলার চারা সংগ্রহ-কালে ভক্ত ভ্রাতারা যে পরিমাণ অসহযোগ পাইয়াছেন, তাহাতে সেই কার্য আগামী বৎসর কতটা সম্ভব হইবে, ধারণা করা যায় না। মঙ্গল-বাঁধের কাজ এখনো নিরাপদ অবস্থায় পৌছিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতেছে না বিধায়, এবার মঙ্গল সাগরে মাছ ফেলার ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই বিবরণ শ্রাবণের বারো তারিখে লিখিত হইতেছে। মনে করা যাইতেছে যে, দারুণ বর্ষা

ভাদ্র, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৪৫৭

ভাদ্রের ১৫।২০ তারিখের মধ্যে অতিক্রান্ত হইয়া যাইবে। তাহার পরেই মঙ্গল-বাধের কাজ পূর্ণ বিক্রমে সুরু করিয়া দিতে হইবে।

অশান্ত আসাম :- আসামে যে অশান্তির অনল জলিয়াছে, তাহার বাস্তব বিবরণ আমরা কিছুই জানি না। সংবাদ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রত্যেক ভাবে আসাম হইতে পরিস্থিতি সম্পর্কিত কোনও সংবাদ পাঠাইতে পারিতেছেন না বলিয়া সংবাদপত্রে দেখিয়াছি। নিপীড়িত জন-সাধারণ, যাহারা অতি কষ্টে এবং ঔণহাতে করিয়া রাজ্য-সীমান্ত পার হইয়া নিরাপদ অঞ্চলে আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে বাহা জানা যাইতেছে, তাহা অসম্পূর্ণ। পণ্ডিত শ্রীজ ওহরলাল নেহেরু বলিতেছেন, সংবাদপত্রে অতিরঞ্জিত খবর বাহির হইয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী বলিতেছেন, প্রাণহানি দশজনের অধিক লোকের হয় নাই, ধনক্ষয়ও অল্পই হইয়াছে, কারণ কতকগুলি গরীব লোকেরই মাত্র ঘর গোড়া গিয়াছে। দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়া যাহারা একবস্ত্রে কাছাড়, ত্রিপুরা বা পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা যে বর্ণনা দেন, তাহার সহিত ভারতের এই দুই ধুরন্ধর নেতার কথার সহিত মিল খুঁজিয়া পাই না। আসামের নানা স্থান হইতে যে সকল পত্র আসিতেছে, তাহাতে জানিতেছি যে, সংবাদপত্রে যাহা বাহির হইয়াছে এবং পণ্ডিত নেহেরু বাহাকে অতিরঞ্জিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত ঘটনার শতাংশের একাংশও নাই। সংবাদ সংগ্রহের বা প্রচারের অবাধ যাদৌতার উপরে, যখন হস্তক্ষেপ হয়, তখন গুজব মহারাজ শতশীর্ষ বাহুর মত মাথা দোলাইতে থাকেন, ফলে অনেক অসত্য, অর্ধসত্য এবং অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচারিত হইয়া থাকে। সংবাদপত্রসমূহ ত্রায় ও প্রধাসঙ্গত সংবাদসংগ্রহে বাধা পাইলে নিজেদের সাংবাদিক কর্তব্য পালনের জন্ত কতক গুজব বিশ্বাস না করিয়া পারেন না। কিন্তু আমরা

যাহারা প্রকৃত সংবাদ জানিতে চাহি, তাহারা কি করিব? “বিলকুল শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, স্থানত্যাগীরা নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারেন”,—ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই আশ্বাস-বাণী শুধু কেন লোকেরা ফিরিতে সাহস পাইতেছে না, তাহার খবর জানা প্রয়োজন। উৎপীড়কেরা অন্তরের ভাব পরিবর্তন করিয়া উৎপীড়িতদিগকে দ্বার তুলিয়া ফিরিয়া আসিবার জগু ডাকিতেছেন, এমন সংবাদও শোনা যায় নাই। যাহারা দেশজননী বা ভাষা-জননীর প্রতি কর্তব্যবোধে হয় কোনও সংপহার আশ্রয় না নিয়া লুণ্ঠন, দাঙ্গা, রাহাজানি, গৃহদাহ এবং আনুষঙ্গিক অগ্রাগ্র উপায়ে গরীব বেচারীদের তাড়াইয়াছেন, তাহারা আর একবার অনুকূল সুযোগে অনুরূপ ব্যাপার করিবেন না, তাহার কি কোনও বাবস্থা হইয়াছে? হইয়া থাকিলে তাহার সংবাদই কেন পণ্ডিত জগদ্বরলাল পরিবেশন করিতেছেন না? দিল্লীর সিংহাসনে বাসিয়া তিনি মতিচঞ্চল মোহম্মদ তোপালকের ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন, না, অতি-বার্দ্ধক্য-কাতর জরাজীর্ণ বুদ্ধি-পন্থ ধৃতরাষ্ট্রের অভিনয় করিতেছেন, ইহা জনসাধারণে বুঝিতে পারিতেছে না। ভারতের জনসাধারণ অপরিমিত শ্রদ্ধায় তাঁহাকে কর্তৃত্বের আসনে বসাইয়াছেন কিন্তু তিনি ভারতীয় জাতির ঐক্য রক্ষার জগু আগ্রহী না নিজ রাজনৈতিক দলগত স্বার্থরক্ষার জগু অধিকতর সচেতন, এই বিষয়ে বহু বিচারশীল মনে নিদারুণ ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। সহস্র সহস্র বাঙ্গালীর মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে,—“আমরা কি আসাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইব? গেরে কোথায় যাইব? চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট বৎসর ধরিয়া ঘরের টাকা চালিয়া এবং শরীরের রক্ত জল করিয়া যে সম্বল বা সম্পদ আসামে সঞ্চিত করিয়াছি, তাহা কি আমরা ফেলিয়া শূন্য হস্তে যাইতে হইবে?” গেরে,

ভাদ্র, ১৩৬৭]

৪৫৩

কোথায় বাইব? ” পূর্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া যাঁহারা আসামের
 জঙ্গলে ঢুকিয়া জোঁক, শূকর, গঁড়ার, ও অত্যাচারি হিংস্র পশুর সহিত লড়াই
 করিয়া পরিত্যক্ত মূল্যহীন ভূখণ্ডগুলিকে সোণার ফসলে পূর্ণ
 করিতেছিলেন, তাঁহারা আজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “ যদি চলিয়াই বাইতে
 হইবে, তবে তখনই কেন বলিলে না? দশ বৎসরের পরমাণু ক্ষয় করিয়া
 কি জয় করিলাম চিরজীবনের জন্ত যাযাবর ভিক্ষুর দশা। ”

এই প্রশ্নের জবাব একমাত্র পণ্ডিত নেহেরুই দিতে পারেন। আর,
 জবাব দিতে হইলে হেলায়, খেলায়, অবজ্ঞায়, তাচ্ছল্যে বৃথা সময় কর্তন
 না করিয়া এখনই তাঁহার স্পষ্ট-ভাষণ প্রয়োজন।

খবর চাই :—আসামের সর্বস্থানে আমাদের সহস্র সহস্র হিতৈষী,
 বন্ধু, আত্মীয়, গুরুভাই, গুরুভগিনী এবং পরিচিত ব্যক্তি রহিয়াছেন।
 আমরা তাঁহাদের শত শত জনকে পত্রের পর পত্র দিয়া কোনও জবাব
 পাইতেছি না। আশা করি, অনেকেই নিরাপদে আছেন, হয়ত ডাকের
 গোলযোগে এবং স্থানান্তরে থাকার দরুণ কেহ কেহ আমাদেরকে কোনও
 সংবাদ দিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা বৎসরান্তে একখানাও পত্র লেখেন,
 তাঁহাদের নিকটেও এই সময়ে একান্ত অনুরোধ, যে পত্র দ্বারা নিজ নিজ
 কুশল জানাইবেন। আমরা আপনাদের প্রতিজ্ঞার কুশল জানিবার
 জন্য ব্যগ্র। শ্রীশ্রীবাবামণি শিষ্য-অশিষ্য নির্বিশেষে প্রত্যেকের কুশলের
 জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছেন যে, বলিতে গেলে তাঁহার আহা-নিদ্রা লোপ
 পাইয়াছে। আমরা এখন হইতে প্রত্যন্তর দিতে পারি আর না পারি,
 আপনারা অবশ্যই পুপুন্যকী আশ্রম, পোঃ চাশ, জিলা ধানবাদ ঠিকানায়
 শ্রীশ্রীবাবামণিকে কুশল জানাইয়া নিশ্চিত করিবেন। মুসুরী হইতে তিনি
 ৩৭শে শ্রাবণ বারাগমী, ৬ই ভাদ্র পুপুন্যকী, ৮ই ভাদ্র অণ্ডাল, ৯ ভাদ্র বর্জমান,
 ১০ই ভাদ্র কলিকাতা হইয়া পুনঃ ১৮ই ভাদ্র পুপুন্যকী আসিতেছেন।

অনেকেই তাঁহার নিকট লিখিতেছেন, “ভূম্পত্তি অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইব কিনা।” কেহ কেহ প্রভূত অর্থে দালান-কোঠা নিৰ্ম্মাণ শুরু করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতেছেন যে, বিপদের সময়ে মনোবল হারাইলে চলিবে না, তবে অরাজক অবস্থার পরিশ্রেক্ষিতে ভূম্পত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা কিছুকাল স্থগিত রাখাই ভাল। তিনি বলিতেছেন,—“ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, মানব-জাতির প্রতি অন্তরকে অধিকতর প্রেমময় কর, সর্বপ্রকার বিপদের জন্ত প্রস্তুত হইয়া আপৎকালীন অবস্থায় যে সকল সতর্কতার প্রয়োজন, তাহা অবলম্বন কর, বাক্য, কার্য ও চিন্তা হইতে হিংসাকে নির্বাসিত করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া সসম্মানে চলিবার চেষ্টা কর। জাতিবিদ্বেষ, ভাষাবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ,—সকল বিদ্বেষই একদিন লোপ পাইবে,—ঐর্ষ্যা, সহিষ্ণুতা এবং সাহস সহকারে সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা কর।”

বেতনের হারঃ—গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য অধ্যাপক ভাঁসানী সরকারী কর্মচারীদের উচ্চবেতনের প্রতিবাদে গত ৪ঠা জুলাই হইতে ওয়াধায় অনির্দিষ্ট কালের জন্ত অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। দেশবাসী তাঁহার এই সংস্কল্পের সফল পরিণতি দেখিবার জন্ত বাগ্র।

ইহার ছয় দিন পরের নয়াদিল্লীর খবরে প্রকাশ,—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রধানমন্ত্রীকে জানাইয়াছেন যে, আগামী ১লা আগষ্ট (১৯৬০) হইতে তিনি মাসে মাত্র ২,৫০০ টাকা বেতন স্বরূপ লইবেন। ইহা একজন মন্ত্রীর মাসিক বেতন অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি মাসে দশ হাজার টাকা বেতন নিতে পারেন। গত ১৯৫২ সালে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই টাকা হইতে মাসে চার হাজার টাকা কম লইবার সিদ্ধান্ত করেন। পরে ১৯৫৫ সালে প্রতি মাসে আরও এক হাজার টাকা করিয়া কম বেতন গ্রহণ করেন। এখন তিনি মাসে

আরও আড়াই হাজার টাকা ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিলেন।
ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তাঁহার এই ত্যাগের জন্ত অভিনন্দিত
করিতেছি।

আমাদের মনে পড়ে, ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের
রাজ্যপাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার বেতনের বৃহত্তম অংশ ছাড়িয়া দিয়া
প্রকৃত সেবাব্রতীর আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আমাদের আরও মনে পড়ে, প্রাক-স্বাধীনতা-যুগে ভারতের সকল
রাজনৈতিক নেতারা সুযোগ পাইলেই বক্তৃতা দিতেন যে, দেশ স্বাধীন
হইলে কোনও সরকারী কর্মচারীর বেতন মাসে পাঁচশত টাকার
বেশী হইবে না।

আসাম-পরিস্থিতিতে অখণ্ড-মণ্ডলীর কর্তব্য :-—মানব মাত্রেয়ই
বিপদে আপদে মণ্ডলী সমূহের কর্তব্য। তাঁহাদের দুঃখ-বিদুরণে সহায়তা
করা। একান্ত এ দেশে অতি ব্যাপক ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, প্রবর্তক
আশ্রম, ভারত-সেবাশ্রম সজ্জ প্রভৃতি পুণ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ বহুকাল যাবৎ
করিয়া আসিতেছেন। অখণ্ড-মণ্ডলী সমূহও নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের
পরিধির মধ্যে থাকিয়া তাহা করিয়াছেন এবং করিবেন। চাঁদা-সংগ্রহ
করিবার জন্ত জন-সাধারণের নিকটে উপস্থিত হওয়া তাঁহাদের রীতি-
বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহাদের সেবার ক্ষেত্র খুবই সীমিত থাকে, তবু অখণ্ড-
মণ্ডলী সমূহ বসিয়া থাকেন না, কাজ কিছু না কিছু করেনই।
আসামের পরিস্থিতিতে বহু নরনারী বিপন্ন, সর্বস্বান্ত, হীনমূল ও
আশ্রয়হীন হইয়াছেন। আমরা যতটা সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে
দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে, আলিপুরজয়ার, তিনসুকিয়া লামডিং,
যদিপুর রোড, বদরপুর, করিমগঞ্জ, শিলচর, আগরতলা এবং কলিকাতার
অখণ্ড-মণ্ডলী সমূহ কোথাও নিজেদের দায়িত্বে, কোথাও অগ্রাগ্র সেবা-

প্রতিষ্ঠানের সহযোগে নিজ নিজ কর্তব্যে অবহিত হইয়াছেন। ইহা আমাদের মানবীয় কর্তব্য, সাম্প্রদায়িক নহে। মানুষ মাত্রেই বিগ্ন মানুষকে সহায়তা করিতে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু যে সকল অথগু নানা স্থানে নিরাশ্রয় হইয়া আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের একটি বিশেষ কর্তব্যের দায়ও রহিয়াছে। তাঁহারা যদি পূর্ব বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক হন এবং সহায়তা প্রয়োজন বোধ করেন, আমাদিগকে সেই সহায়তা করিতে হইবে। তাঁহারা যদি নিরাপদ নূতন স্থানে স্থায়ী ভাবে বসিয়া পড়ার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া জীবন-সংগ্রামে ব্রতী হইতে আমাদের সাহায্য করিতে হইবে। এই প্রয়োজনে আমাদের আবশ্যক, অবিলম্বে জানিতে পারা যে, আসাম হইতে ছিটকাইয়া আসিয়া কে কোথায় পড়িয়াছেন। যিনি পশ্চিমবাংলার যে অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছেন, সেই অঞ্চলের অথগু-মণ্ডলী নিজেদের ক্ষুদ্র সাধ্যমত যাহার বহুটুকু সহায়তা দিতে পারেন, দিতে চেষ্টা করিবেন। চিরকাল ভিক্ষা দিয়া কেহ কাহাকেও বাঁচাইতে পারে না, দিতে হইবে জীবিকার্জনের সুযোগ এবং সুবিধা।

অথগু-মণ্ডলী সমূহের আর একটি কর্তব্যও রহিয়াছে। তাহা হইতেছে এই যে, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ এবং মানুষে মানুষে বৈর-সৃষ্টির সর্ববিধ আন্দোলন হইতে তাঁহাদের, দূরে থাকিতে হইবে। আসামের বর্তমান পরিস্থিতি কি একটা রাজনৈতিক আন্দোলন, না, একদেশবাসী ভিন্ন-ভাষা-ভাষীদের ভিতরে মত-পার্থক্য বা মনোমালিন্যের সুযোগ লইয়া কোনও সুযোগ-সন্ধানী বিদেশী শত্রুর প্ররোচকেরা (Agent Provocators) গোপনে কতকগুলি আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাহীন লোককে তাহাদের একান্ত অজ্ঞাতসারে

শিশুজালা ও নারকীয় ঘটনা-বলি সৃষ্টির দ্বারা জাতিতে জাতিতে বন্ধমূল
 শত্রুতার প্রতিষ্ঠা করিয়া অদূর ভবিষ্যতে প্রস্তুত ভারতের উপরে নেকড়ে
 বাঘের ধাবা প্রসারিত করিবার আয়োজন করিতেছে, ইহা এখনো
 নৃশংস বৃথা যায় নাই। বিদেশী শত্রুর কাছ হইতে গোপনে অর্থ গ্রহণ
 করিয়া স্বদেশকে বিকাইয়া দিবার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক
 গদগ্ধ ব্যক্তির মধ্যে দেখা গিয়াছে। আর, আমাদের দেশের হিন্দু
 নেতারা অধিকাংশেই বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বারংবার রাজনৈতিক
 নাবালকত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিরাট বিরাট নেতার হিমালয়-প্রমাণ
 ভুলের ফলে প্রকৃত নেতাকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন বাছিয়া লইয়া বিদেশে
 গিয়া সৈন্তদল সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছে,
 অথবা কাশ্মীরের কারাগারে বন্দীদশায়, (কে জানে বিষ-প্রয়োগে কিনা,
 কে জানে গুপ্ত হত্যার ফলে কি না,) প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। হিন্দু
 নেতাদের ভিতরে রাজনৈতিক প্রতিভার একান্ত অভাব বলিয়াই এমন
 অনেক ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে, যাহা কোনও স্বাধীন দেশেই ঘটিতে
 পারে না। এমতাবস্থায় হঠাৎ করিয়া কোনও অখণ্ড-মণ্ডলী দ্বৈষ-
 সৃষ্টির আন্দোলনে সক্রিয় হইয়া উঠিবেন, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।
 অখণ্ড-মণ্ডলী সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু ইহা দ্বারা কাহারও
 বক্তৃগত রাজনীতির সহিত বিরোধ আসে না। ভারতবর্ষের কোন
 রাজনৈতিক দলের লোক আছেন, যাহারা কেহ না কেহ অখণ্ড-
 মণ্ডলীর সভ্য নহেন? স্বাধীন বিচার-বিবেক অনুযায়ী প্রত্যেকেই
 নিজ নিজ রাজনৈতিক কার্য্য করিতে অধিকারী কিন্তু অখণ্ড-মণ্ডলীকে
 রাজনীতির সহিত জড়ান সম্ভব কার্য্য নহে।

আর একটি বিষয়ে অখণ্ড-মণ্ডলী সমূহের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।
 তাহা হইতেছে অনুচিত, অসঙ্গত, উদ্ভেজক ও উগ্র বাক্যের প্রয়োগ

সম্পর্কে। আসাম নামে যেই বিশাল ভূখণ্ডের পরিচয়, তাহাতে
 অসমিয়া-ভাষাভাষী যত নরনারী আছেন, তাঁহারা প্রতি জনেই
 দুর্ভিক্ষ বা দুর্ভিক্ষদিগকে- দুর্কার্যো প্রবৃত্ত করিবার প্ররোচনা-দাতা এমন
 ভ্রান্তি আমাদের মনে থাকা উচিত নহে। যাহারা সদাশ্রু, শান্তিকামী,
 সুবিচার-পরায়ণ, এমন অসমিয়া-ভাষীদের এতদিনেও যে বঙ্গভাষীরা
 খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। সেই কারণেই এই-
 বারকার নরমেধযজ্ঞ এমন ফলাও হইতে পারিয়াছে। ইহাই আসামে
 শেষবারের মতন অনাচার, এমন কথা হৃদয় করিয়া কেহ বলিতে
 পারে না। তথাপি বঙ্গভাষীদিগকে বুঝি নিতে হইবে। ঘুষ দিয়া নহে,
 সদিচ্ছার দ্বারা প্রকৃত সজ্জনদের খুঁজিয়া বাহির করিবার একটা প্রাণান্ত
 চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। কিছু অসমিয়া সজ্জন নিজেদের নিরা-
 পত্তা ক্ষুণ্ণ করিয়াও বিপন্নদের সহায়তা না করিলে আসামে এবার কি
 যে হইত, তাহা কল্পনা করিতেও হৃৎকম্প হয়। এই সকল সজ্জনের
 ভিতরে দেবতা-মূলভ মহানুভবতার প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়াছে।
 সংখ্যায় তাঁহারা অল্প হইলেও এইরূপ মহদব্যক্তি যখন ঐ দেশটীতে
 কতক আছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তখন সহস্র লাঞ্ছনাও
 অসম্মানের পরেও একথা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আসাম প্রদেশে
 অসমিয়া-ভাষীদের মধ্যে আরও দেবতা সুনিশ্চিতই আছেন। তাঁহারা
 যদি এতদিন আত্মপ্রকাশে অক্ষম হইয়া থাকেন, তবু অদূর ভবিষ্যতে
 আত্মপ্রকাশ করিবেন না, এমন অন্ধ ধারণা করিয়া বসিবার প্রয়োজন
 নাই। সাময়িক উদ্গাদনায় অনেক সদাশ্রু-পুরুষও বিভ্রান্ত হইয়া থাকিতে
 পারেন, কিন্তু তেমন ব্যক্তিদের বিবেক তাঁহাদিগকে সজ্জনতার পথে
 টানিয়া আনিতে কখনই পারিবে না, আগে হইতেই তেমন রায় দিয়া
 বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। তাই আমরা চাহি যে, কোনও

স্থানে কোনও অথবা যেন এই উত্তেজনার সময়ে কোনও অসতর্ক উক্তি
দ্বারা বৃথা বিবেচন বুদ্ধি না করেন।

বাক-সংঘম সম্পর্কে এদেশে উপদেশ আছে, দৃষ্টান্ত নাই। দেশের
যে নেতার উপরে রাজকীয় কাজের চাপ যত বেশী, তিনিই তত
বেশী বক্তৃতা দিয়া থাকেন। রাজ্যপালের পদটাই ত মনে হয়
কুটিল হইয়াছে কেবল পার্টি দিবার জন্ত, বক্তৃতা বাড়িবার
জন্ত। এ দেশের প্রধান মন্ত্রী এদেশে সব চেয়ে বেশী
বক্তৃতা দেন। বেশী কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিজেদের কথা-
মত কাজ করিতে সমর্থ হন কিনা, এই বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে
কিন্তু বেশী বক্তৃতা যাঁহারা শোনে, তাঁহারা বক্তাদের বড় বড় কথা-
গুলির বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করে না, এই বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নাই।
ইংল্যান্ডের উইনষ্টন চার্চিল বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী বা Orator
বলিয়া স্বীকৃত। তিনি ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী থাকা কালে অতি
অল্পই বক্তৃতা দিয়াছেন। ফলে, তাঁহার দুই একটি বিরল বক্তৃতায়
সমগ্র ইংরেজ জাতির হৃদয়-রক্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে টগবগ্ করিয়া
কুটিয়া উঠিয়াছে। নিশ্চয়োজনে কথা বলা বা নিশ্চয়োজনীয় কথা বলা
আপেক্ষাকালে একান্তই অসম্ভব। অসমিয়া ও অনসমিয়া নির্বিশেষে
আসাম-রাজ্য-বাসী প্রত্যেকটি নাগরিকের কল্যাণের দিকে তাকাইয়া
প্রত্যেককে সংযতবাক হইতে হইবে। সাধারণ সময়ে যাহাকে ঠাট্টা
বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া মনুষ্য-স্বভাব, উত্তেজনার সময়ে তাহাই
অনাচারের ইন্ধন যোগায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—“ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়া এখন শক্ত হইয়া
থাকিতে হইবে। ধন, জন, গৃহ, শস্ত্র, তৈজস-পত্র সব কিছু হারাইয়াও
তোমরা কিছুই হারাও নাই, যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না হারাইয়া থাক।”

গৌহাটিতে সমবেত উপাসনা :—গৌহাটি অখণ্ডমণ্ডলীর সভাপতি শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত জানাইতেছেন যে, তাঁহারা বিগত নয়লা শ্রাবণ হইতে সর্বজীবের শান্তি কামনায় প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া সমবেত উপাসনা করিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্কল্পবাক্যটি নিম্নরূপ,—

“বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ কিন্তু বুদ্ধিভ্রমে হীন প্রবৃত্তির তাড়নায় এক মানুষ অপর মানুষের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছে ও করিতেছে। ইহাদের প্রতিজনের প্রাণে শুভবুদ্ধির উদয় হউক এবং জাগরিত হউক প্রেম। এই অরাজকতায় বাঁহারা প্রাণ হারাইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মার হউক শান্তি। বাঁহারা সম্পদচ্যুত হইয়াছেন, গৃহহীন হ্রিম্মূণ হইয়াছেন, তাঁহাদের হউক মনোবলের বুদ্ধি ও সর্বক্ষতির পূরণ। শান্তি ফিরিয়া আসুক সর্বত্র সামগ্রিক ভাবে।”

ভ্রাতা নিরুক্ত শূর :—পলাশবাড়ী (কামরূপ) নিবাসী ভ্রাতা নিরুক্ত কুমার শূরের কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ননীগোপাল শূর প্রামুখ ঐ পরিবারের কেহ কেহ আততায়ীদের হস্তে নিহত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া আমরা গভীর বেদনায় অভিভূত হইয়াছি। আসামের নারকীয় বীভৎসতায় আমরা হতবাক হইয়াছি। কেহ ভ্রাতা নিরুক্তের এবং তাহার পরিজনবর্গের খবর জানিলে অবশুই আমাদিগকে জানাইবেন।

স্বাধীনতার বলি :—আসাম হইতে জনৈক ভ্রাতা সুদীর্ঘ পত্রে নানা সংবাদ দিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন,—“স্বাধীনতার বেদীমূলে সমৃদ্ধ বাংলার বৃহদংশ বিনামূল্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়া বাহারা উদ্বাস্ত সাজিল, স্বাধীন ভারতে সর্বত্র তাঁহারা অবাঞ্ছিত, এক ইঞ্চি ভূমিও তাহাদের প্রাপ্য নহে। তাহাদের কষ্টোপার্জিত সম্পত্তির উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া, কষ্টরচিত গৃহ দগ্ধ করিয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার

ভাদ্র, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৪৬৭

প্রদর্শিত হইতেছে। মহামুদ্রের বৃকে আন্দামানে তাহাদিগকে আজ নির্দাসন দেওয়া হইতেছে। এমনতর স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে হিন্দু হিসাবে থাকার কি মার্থকতা, ভাবিয়া পাই না। এই ত বাপুজীর রামরাজ্য।”

শুধু ইহাই নহে, রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারীদিগের আচরণের বিশ্লেষণ করিয়া অনেক লোকে আজ ভাবিতে সুরু করিয়াছে,—“তবে ইংরাজ কি দোষ করিয়াছিল? কেন তাহাদের তাড়াইবার জন্ত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম করিলাম, কত জনে দ্বীপান্তরে গেলাম, কত জনে দাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিলাম?”

পণ্ডিত নেহরুর স্বাধীন ভারতে আজ ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা উৎসব-বর্জ্জনের প্রস্তাব হয় আর সেই প্রস্তাবের কথা শুনিয়া সহস্র সহস্র শোকাক্ত হৃদয় ক্ষণকালের জন্ত মহর্ষ হইয়া উঠে,—ইহাই কি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সম্মান?

আজ দিকে দিকে রব উঠিয়াছে,—“প্রতিকার দিল্লীতে পাইবে না, কলিকাতায়ও না, শিলংএর কথা তোলাই বুথা।” প্রতিকারযোগ্য গুরুতর অবস্থায় নিরাশ্রয় নিরুপায় মানুষ প্রতিকার-বিধাতাকে দিল্লী কলিকাতা কোথাও পাইতেছে না। ইহা কি নবলব্ধ স্বাধীনতার পক্ষে কোনও নিরাপদ লক্ষণ? জন-সাধারণ যদি প্রতিকার নিজ হস্তে লয়, তখন সেই বিপ্লব থামান যাইবে কি? কোটি আত্মার দাবী কি কামান-বন্দুক দিয়া বন্ধ করা যায়?

কিন্তু সেই বিপ্লব আমরা চাহি না। ভারতের স্বাধীনতা ইংরেজের পরম দয়ায় আসিয়াছে। আমরা দেশে শান্তি দেখিতে চাই। ক্ষমতার অপকারীরা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিজেদের যোগ্যতাবলে ভারতে শান্তি স্থাপন করুন। ভারতাত্মা আর্তকণ্ঠে শান্তির দাবী করিতেছে, চূর্ণকামের নহে।

সংস্কৃত রাষ্ট্র-ভাষা সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ

ভাষা নইয়া দেশব্যাপী কত সমস্তা ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতেছে। নেতৃবর্গ এই ভবিষ্যৎ হয়ত ভাবেন নাই। কিন্তু মহাকাল কোনও ফাঁকিই সহ্য করেন না। এই জন্তই সময় থাকিতে আমাদের সাবধান হওয়া আবশ্যক। আমাদের আজ সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া প্রতিটি কার্য করিতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেন সুদীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং হীন দলাদলির উর্দ্ধে আমাদের উঠিতে হইবে।

ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ঐক্যবোধ ও প্রেমসংস্থাপন নব-লব্ধ স্বাধীনতাকে দীর্ঘকাল রক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। দূরদৃষ্টির অভাবে অকারণে ভাষা-সমস্তা নিয়া কলহ-সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে আমিই সর্বপ্রথম ধুবুলিয়ার পঁয়ত্রিশ হাজার জনতার সমক্ষে এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলাম যে, সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা রূপে স্বীকার করিতে হইবে। ভারতের প্রায় সর্বভাষা এই ভাষা হইতেই উৎপন্ন, এখনও খাদি লাভের জন্ত প্রত্যেক ভাষাকে এই ভাষা হইতেই খণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাষার জন্তই ভারত বিদেশের নিকট পূজাহীনীয় ও গৌরবান্বিত। আমিই ধুবুলিয়াতে নবদ্বীপের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যাতীর্থ মহাশয়কে প্রেরণা দিয়াছিলাম, “অবিলম্বে পণ্ডিতগণের মধ্যে কাজ আরম্ভ করুন।” তৎপ্রেরণায় তিনি পুণ্যধাম নবদ্বীপে নিখিলবঙ্গের বিবুধমণ্ডলীকে নিয়া সম্মেলন করেন। তাহার ফলে বর্তমানে নিখিল ভারতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সংস্থা গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। সম্প্রতি শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এম, পি, ভারতীয় লোকসভায় একটা বিল আনয়ন করিয়া হিন্দীর সঙ্গে সংস্কৃতকেও বিকল্প রাষ্ট্রভাষা করিয়া-ভারতের ঐক্যবোধ রক্ষার স্থায়ী মীমাংসা করিতে অগ্রণী হইয়াছেন। এই সময়ে আমাদের সকলের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন। নিউ দিল্লীতে কম পক্ষে দশ

ভাদ্র, ১৩৬৭]

বিশেষ নির্দেশ

প্রতিধ্বনি

৪৬৯

লক্ষ পত্র স্বরাষ্ট্র-কর্মসচিবের নামে যাওয়া প্রয়োজন। তোমরা অবিলম্বে কাজে লাগ। নিম্নরূপ পত্র অবিলম্বে হিন্দী, বাংলা, ইংরাজি, উড়িয়া অসমিয়া বা সংস্কৃত ভাষায় যাওয়া প্রয়োজন। যাঁহারা যাঁহারা এইরূপ পত্র দিলেন, তাঁহাদের নাম-ঠিকানাগুলি তোমরা মনে করিয়া ত্রিপ্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, ৩২, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা (৯) ঠিকানায় অবশ্য পাঠাইবে। ইহা দ্বারা কার্য্যের সুবিধা হইবে।

To

**The Secretary,
Ministry of Home Affairs,
Government of India,
New Delhi.**

Dear Sir,

The Bill introduced in the Lok-Sabha by Sri Chapala Kanta Bhattacharya, M. P., on 16-4-60 to amend Article 343 of the Constitution has our fullest support for two potent reasons, Firstly it will splendidly serve the purpose of removing bitterness engendered by the official-language controversy. Secondly, it will ensure the enrichment of all the regional languages equally and thus will create the safest and a permanent common platform for all the citizens of the new Union of India.

Thanking you,

Yours truly,

Signature

Address

প্রতিধ্বনি

৪৭০

বিশেষ নির্দেশ

[৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্বরাষ্ট্র-কর্মসচিব সমীপেষু :— ভারত সরকার, নিউ দিল্লী

তারিখ.....

মাগুবরেম্ :—

সবিনয় নিবেদন এই যে, শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, এম. পি, লোকসভাতে বিগত ১৬।৪।৬০ তারিখে ভারত-সংবিধানের ৩৪৩ অমুচ্ছেদ সংশোধন করিবার জন্ত যে বিল উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত দুইটি অতি প্রবল যুক্তিতে আমি/আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। প্রথমতঃ, সরকারী ভাষার ব্যাপার লইয়া যে প্রান্তীয় তীব্র তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে, এই বিল গৃহীত হইলে তাহার সুনিশ্চিত অবসান হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই বিল গৃহীত হইলে সকল প্রান্তীয় সাহিত্যই সমভাবে সমৃদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবে এবং নবীন ভারতকে একতা-বন্ধনে বদ্ধ করিবার উপায় স্থায়ী এবং নিশ্চিত করা হইবে। ইতি নিবেদক—

(স্বাক্ষর)

(ঠিকানা)

হিন্দী ও সংস্কৃত অনুবাদ স্থানাভাবে এবং ওড়িয়া বা অসমিয়া অনুবাদ তাড়াতাড়িতে দিতে সমর্থ হইলাম না। দরকার মত অনুবাদ করাইয়া লইও।

এই কার্য্যটি তোমরা দ্রুত করিবে। একই পত্রের নীচে অনেকে সহি করিলেও চলিবে। আমি মন্থরীতে পীড়িত না থাকিলে অশেষ কাজই হইত, জানি। আমি আগামী ২৬শে আগষ্ট, ১০ই ভাদ্র ডাক্তার দেখাইতে কলিকাতা যাইব। তখন গিয়া জানিতে চাহি, প্রিয়কান্তের নিকটে কোথা হইতে কি সংবাদ গেল। ২৮শে আগষ্ট, ১২ই ভাদ্র, রবিবারের উপাসনা সারিয়া কলিকাতা হইতে সম্ভবতঃ দুই তিন দিন পরে পনের দিনের জন্ত উত্তরবঙ্গে যাইব। ইতি—

আশীর্বাদক

প্রতিধ্বনি

(মাসিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৬৭ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

গান

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব]

(৩)

যারা এল দিতে হরষিত চিতে
তোম হাতে হাতিয়ার
মানুষ মারিতে নারীকে হরিতে,
বন্ধু তাহারা কার ?

মানুষের বুকে মানুষ বসাবে ছুরি,
এর মাঝে কেন এত উল্লাস,
কি আছে রে বাহাদুরী ?

কি মহাপুণ্য করিল ধন্য

তোদের এ অনাচার ?

কি লাভ হইল কুড়াইয়া শুধু

ইতিহাসে ধিকার ?

আজিকে আগুন লাগালি যাদের ঘরে,

রহিবে না তারা এই দুনিয়ায়

হয়ত দু'দিন পরে ;

নিবানো আগুন হ'য়ে দশগুণ

করিবে রে ছারখার

যুগ-যুগ-জোড়া শান্তির নীড়

তোরই গৃহ আপনার ।

প্ররোচনা দেয় মহাপাতকের,

বন্ধু নহে রে তারা ;

আজি বুঝিবি না, বুঝিবি যেদিন

হবি রে সর্ববহারী ।

পাপের সঙ্গী হিংস্র মূর্তি ধ'রে

তোর সম্ভ্রম, তোর সম্পদ

যেদিন নিবে রে কেড়ে,

পশুবল হ'য়ে পশুর অধম

—পরম নিবিবকার—

সাত পুরুষের ভিটেমাটি হ'তে

করিবে বহিকার ॥

অখণ্ড-বাণী

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(১৩২)

গুরু বলে জান্বে একমাত্র ভগবানকে। শিষ্য গুরুর
বীৰ্য্য পায়। ভগবানকে গুরু বলে মান্লে তোমরা ভগবানের বীৰ্য্য
পাবে, তেজ পাবে, মহিমা পাবে। যে বাকে মানে, সে তার মত হ'য়ে
বায়। ভগবানকে মেনে তোমরা ভগবানের মত হ'য়ে যাও। আমি যে
তোমাদের উপদেশ দেই, তার কারণ, আমি চাই, তোমাদের মধ্যে
ভগবানের শক্তি ফুটুক, তোমরা ভগবান হও। তোমরা ভগবান হবে,
এই আশাতেই আমি তোমাদের পূজা করি। বল,—ভগবানই তোমাদের
গুরু। ধ্যান কর,—ভগবানই তোমাদের গুরু। অহুভব কর,—ভগবানই
তোমাদের গুরু। ভগবানকে গুরুর আসনে বসিয়ে ভগবানের যে-
কোনও ভক্তের উপদেশ নিয়ে সাধন-ভজন কর, তাতেই মুক্তি হবে,
তাতেই শান্তি হবে। ভগবানকে গুরুর আসনে বসিয়ে তারপর যদি

প্রাথমিক

অথও-বাণী

[১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৪৭৪

পূরাপুরি নিজের সাধারণ জ্ঞানের উপরে নির্ভর ক'রে কারো কাছে দাঁকা না নিয়েও সাধন-ভজন ক'রে যাও, তাতেও তোমার কল্যাণই হবে এবং কালক্রমে তিনি নিজেই তোমার সাধন-নিষ্ঠা বর্দ্ধনের বা সাধন-কৌশল শিক্ষণের উপযুক্ত আনুকূল্য সৃষ্টি ক'রে দেবেন।

(১৩৩)

যিনি অভয়স্বরূপ, তাঁকে আত্মসমর্পণ করলে আর ভা থাকে না। চোর-ভয়, নিন্দা-ভয়, অপমান-ভয়, রোগ-ভয় বা মৃত্যু-ভয় কিছুই থাকে না। সর্বতোভাবে নিজেকে একেবারে তাঁর ক'রে দাও, তখন তোমার সাথে সাথে তোমার ভয়ভাবনাগুলিও তিনিই নিয়ে নেবেন।

(১৩৪)

বিপদ যে হবে, এই অনুমান করার নাম ভা। ভয় মানুষের অতি-সাহসিকতাকে দমিয়ে দেয়, হঠ ক'রে একটা কাজ ক'রে ফেলতে নিবৃত্ত করে, অনিষ্ট নিবারণের জন্ত যত্নবান ও উৎসাহ করে। এই হিসাবে ভয়ের প্রয়োজনীয়তাও আছে। কিন্তু ভয় বলা তোমাকে আড়ষ্ট করে, দুহুমান করে, কর্তব্যপালনে অক্ষম করে, এটা কি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ক'রে দেয়, বুদ্ধিলোপ ঘটায়, ভয় তখন তোমার সর্বস্বাপহারী কৃতান্তস্বরূপ। ভগবানে আত্মসমর্পণ তোমার সেই কৃতান্ত নিবারণ কর্কে।

(১৩৫)

অথবা তাঁকে অভয়-স্বরূপই বা বলি কেন? তিনিই ভয়-স্বরূপ, তিনিই ভয়-স্বরূপ! যিনি অমৃতস্বরূপ, তিনিই ভয়-স্বরূপ।

মৃত্যুরূপ ! যিনি প্রকাশস্বরূপ, তিনিই ত' প্রলয়-স্বরূপ ! তবে আবার অপ্রার্থনীয় কে ? ভয় যখন আসে, তিনিই ত' ভয়ের রূপ ধ'রে আসেন ! রোগ যখন হয়, তিনিই ত' রোগের মূর্তিতে প্রকাশ পান ! মৃত্যু যখন ঘটে, তিনিই ত' মৃত্যুর বেশ পরিধান করেন ! একবার আসেন তিনি প্রিয়জন-বিচ্ছেদের সুগভীর শোকরূপে, আবার তিনিই আসেন শোকের মূলতল সাহসনারূপে । বহুরূপী ভগবান বহুরূপে নিজেকে প্রকটিত করেন,—এই ধ্যান জমাতে পাল্লেও ভয় দূরে যায় ।

(১৩৬)

ভয় করবে কাকে ? এক ছাড়া কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও কি দুই বস্তু আছে ? একং সং । যা বহু, তা নেই । নাস্তি নানেহকিঞ্চন । শোক নেই, শোকের কারণও নেই । ভয় নেই, ভয়ের কারণও নেই । আছেন যিনি, তিনি এক । আছেন যিনি, তাঁর সাথে তোমার কোনও ভেদ নেই । চিদানন্দরূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্ ।

(১৩৭)

গীতার উপদেশ হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম । নৈষ্কর্য্য সহজ কথা নয় । কিন্তু নিষ্কাম কর্মই কি সহজ কথা ? কোনো কামনাই কর্ক না, অথচ কাজ কর্ক, একি সামান্য কথা ? কামনাই যদি কর্ক না, তবে কাজ কর্কই বা কেন ? কুপার নিবারণ কামনা করে, তাই লোকে ভাত রাঁধে । তুষানিবারণ কামনা করে, তাই লোকে জল আনে । আমার যদি কোনও কামনাই না থাকে, ভাতই বা রাঁধবে কেন, জলই বা তুলবে কেন ? ফলে, কর্মমাত্রেরই সাথে কামনা একটা না একটা এসে যায় । সুতরাং এই দ্বিলের আসানের জন্তু সহপায় হচ্ছে, তপঃকাম হ'য়ে কর্ম করা । মেয়ে

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৪৭৬

বিয়ে দিচ্ছ, মনে মনে কামনা কর, মেয়ে বিয়ে দিয়ে সংসারীতে পাভ্লা হুয়ে ভগবানের নাম-সাধনা কর্কে বলে। এর ফলে কখনো না কখনো সত্যি তুমি নাম-সাধনার সুযোগ এবং প্রবল রুচি পাবে।

(১৩৮)

সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং,—ঋগ্বেদের কথা। এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে বল। কিন্তু এক সঙ্গে বলবে কোন্ কথা? ব্রহ্মবাণী। এক সঙ্গে চলবে কোন্ পথে? ভগবানের পথে।

(১৩৯)

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পার্কে যে, স্বামী এবং জীর সম্বন্ধ দেহের সম্বন্ধ নয়, সম্বন্ধটা আত্মার। তোমার ঐ স্বামীটির ভিতরে মনকে এককেন্দ্রক ক'রে- তুমি তোমার জীবনারাধ্যের স্বরূপ অন্বেষণ করবে, তোমার ভিতরে মনকে কেন্দ্রীভূত ক'রে তোমার স্বামী তাঁর জীবনারাধ্যের স্বরূপ খুঁজে বের কর্কেন— এরই জন্ত বিবাহ।

(১৪০)

এমন দেবীত্বের সুধমা নিজ নিজ চরিত্রের মধ্যে প্রকাশিত কর, যেন তোমার স্বামী তোমাকে সার্থক মানবী বলে জ্ঞান কতে অক্ষম হন। ত্যাগে, সৎপ্রবৃত্তিতে অতুলনীয় হও। তোমাদের সর্বাচারে, সৎপ্রবৃত্তিতে অতুলনীয় হও। তোমাদের আটপোরে রূপ দেখতে দেখতে তোমাদের প্রতি হৃদয় প্রকাহীন হয়েছেন, আজ তোমাদের অপূর্ব মহিমশালিনী দীপ্তিময়ী

মূর্তি দেখে দেবীজ্ঞানে ভক্তিনয়ন হউন। তোমাদের দেবী-প্রতিভার বিকাশ ঘটান, দেখবে স্বামীরা আর পশুর মত জীবন যাপন কতে পাচ্ছেন না, পশুত্ব তারা লজ্জা বোধ কচ্ছেন এবং দেবত্ব অর্জনে চেষ্টা কচ্ছেন।

(১৪১)

মানুষটীর ভিতরে যে দেবতা, তিনিই তোমার স্বামী। ঐ দেবতার দেবত্বকে রক্ষা ক'রে চলাই জীবন একমাত্র কর্তব্য। তাঁর দেবত্বকে প্রবর্তিত করা, পরিপুষ্ট করা, প্রসারিত হবার আবহুল্য দেওয়াই হচ্ছে প্রকৃত স্বামিসেবা। সেই স্বামিসেবা তোমরা ক'রো। পার্শ্বতী স্বামিসেবা কতেন, কিন্তু শিবের শিবত্বকে তিনি নষ্ট করেন নি, বর্দ্ধিত করেছেন। সীতা স্বামিসেবা কতেন, কিন্তু রামের রামত্ব তিনি নষ্ট করেন নি, বর্দ্ধিত করেছেন। এই জগত্ই পার্শ্বতীর স্বামী জগদগুরু, সীতার স্বামী ঈশ্বরবাবু। তোমাদের স্বামীদের তোমরা এমন ক'রে সেবা ক'রো। তাঁদের দেবত্বের বিকাশকে থর্ক ক'রে নয়, তাঁদের সহস্র চপলতাকে উত্তেজিত ক'রে নয়, তাঁদের ভিতরের ব্রহ্মকে সিংহগর্জনে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়ে তোমরা তাঁদের সেবা ক'রো।

(১৪২)

পবিত্রতা-স্বরূপের ভিতরে নিজেকে এমন ভাবে নিমজ্জিত ক'রে দাঁড়, যেন তোমার ভিতরে আর অপবিত্র কিছু না থাকতে পারে। প্রেমস্বরূপকে তুমি এমন ক'রে আত্মদান কর, যেন আশ্রম,—তা ঘেঁষই হোক, আর কামই হোক,—তোমার মধ্যে আর না রইতে পারে। আনন্দস্বরূপকে আলিঙ্গন দাঁড়, তাঁতে আর

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৪৭৮

তোমাতে মিলে এক হ'য়ে যাও, নিরানন্দ অন্ধকার চিরতরে দূর হয়ে
যাক, আনন্দের লহরী এসে তোমার গায়ে লাগুক, প্রাণে লাগুক,
সর্বাপ্ন মিথ্য করুক, সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে শীতল করুক। ডোব তাঁর
মহাভাবে, যাতে তোমার প্রভাব আবার জগৎকে প্রেমরসে ডুবাতে
পারে।

(১৪৩)

প্রকৃত যার ভাব, তাঁরই ভিতরে প্রভাবের সৃষ্টি হয়।
সেই প্রভাব দিকে দিকে বিস্তার পায়। সেই প্রভাব দিকে
দিকে অগণিত নরনারীকে আনন্দের স্বরূপাশ্বাদনে প্রেরণা দেয়, সাহস
দেয়। সেই প্রভাব জড়ের জাড্য, অবিশ্বাসীর অনাহা দূর করে। সেই
প্রভাব কামুককে প্রেমিক করে, কপটকে সরল করে, নীচবুদ্ধিকে
উচ্চচেতা করে। ডুব দাও জগতের প্রকৃষ্টতম মহাভাবে, তোমার
ভিতরে প্রভাবের জন্ম হবে, অজ্ঞাতবাসে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণ
মত সকলের অগোচরে সে বুদ্ধি পাবে এবং সকলের প্রত্যাশার অতীতে
থেকে অমঙ্গলরূপী কংসকে ধ্বংস কতে অভিযান করবে।

(১৪৪)

ব্রহ্মানন্দ আশ্বাদন ক'রে তাতেই অনন্ত অনাদি কাল
ডুবে থাক। এক কথা আর ব্রহ্মানন্দ লাভ ক'রে জীব-
কল্যাণৈকলক্ষ্য হ'য়ে তাকে জগন্ময় বিতরণ ক'রে বেড়ান আর এক
কথা। যারা নিজেরা ডুবে যান, জীব তাঁদের খোঁজও রাখে না। যারা
বিতরণ করেন, জীব তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নিত্যকাল নতকন্থ হ'য়ে
থাকে। যেমন বুদ্ধ, শুক্লর, চৈতন্য, যীশু, নানক, রামকৃষ্ণ। কেউ এঁদের

ভুলবে না, ভুলতে কখনো পারে না, কারণ, পরমামৃতকে আশ্বাদন ক'রে
এঁরা একাই তা' নিয়ে মজে থাকেন নি, জগৎকে ডেকেছেন, এস এস
বলে অভয় দিয়ে কাছে টেনে এনেছেন, অমৃতের মধুরাশ্বাদের বর্ণনা ক'রে
সকলের রস-লিপ্সুতা সৃষ্টি করেছেন, সবাইকে অমৃত বিতরণ ক'রে
পান করিয়ে অমর ক'রে ছেড়েছেন। এঁদের কথা ভোলবার উপায়
আছে?

(১৪৫)

তোমার আগার বছর মধুর আবির্ভাব এই বুদ্ধ-
শব্দের প্রভাব থেকে। আবার বুদ্ধ শব্দের বীণা নানকের
আবির্ভাব তাঁদের প্রভাব থেকে, যারা অমৃতের সাগরে নেমে গিয়েছেন,
জীবের কল্যাণের বুদ্ধি নিয়েও আর উপরে উঠে আসেন নি। সুতরাং
হিমালয়-গুহাবাসী বহুনিন্দিত তপস্বীর দল আমাদের নমস্কেত্রও নমস্তা।
সমতলে নেমে তাঁরা কিছু করেন নি ব'লে কিছু যায় আসে না, স্বল্প-
প্রভাব ছড়িয়ে তাঁরা অনেককে দিয়ে স্থূল কাজ করিয়ে নিয়েছেন।
সুতরাং কৃতজ্ঞ হও সেই সব ব্রহ্মানন্দী আশ্রমভোলাদের প্রতি। তাঁরা
যে ছিলেন এবং আছেন, এইটুকুই জগতের পক্ষে অপারিসীম উপকার
বলে মেনো।

(১৪৬)

তোমরা এঁদের আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা চিন্তা কর
আর পথ খোঁজ, কি ক'রে ভাবকে জমাট বাধিয়ে তোমরাও
এক একটা প্রভাবের খনি হবে। কয়লা যেমন জমাট বেঁধে হীরকে
পরিণত হয়, তোমাদের ভাবও তেমন জমাট বেঁধে প্রভাব সৃষ্টি করুক।

প্রতিনিধি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৪৮০

সেই প্রভাব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোটিকল্পকাল-
বাণী অবর্ণনীয় উপকার সাধন করুক।

(১৪৭)

উপদেশ দানের ব্যাপারে শ্রোতাই আসল, বক্তা
শ্রোতার সেবক মাত্র। যে কথা বললে শ্রোতার বেশী
লাভ হবে, তোমাকে সেই কথাই বলতে হবে। নিজের মজি
চালাবার তোমার অধিকার নেই। জগদ্ধিতার্থে যিনি উপদেষ্টা, তাঁর
উপদেশ-দানের ভিতরে স্বার্থপরতা বা প্রভুত্বলিপ্সার স্থান থাকতে পারে
না। নিজের জিদ নয়, উপদিষ্ট ব্যক্তির মঙ্গল-ই তোমার একমাত্র লক্ষ্য
হোক।

(১৪৮)

উপদিষ্ট ব্যক্তির উপরে নিজের মত চালাতে চেষ্টা
ক'রো না। তারও যে বোঝবার একটা শক্তি রয়েছে,
এইটো তুমি আগে বিশ্বাস কর এবং বোধশক্তি তার যত অল্পই হোক,
সেই বোধশক্তির কাছেই বারবার তোমার বক্তব্যকে নিয়ে ধর। সে
তার নিজের বোধশক্তি দিয়েই তোমার বক্তব্যের যেটুকু গ্রহণ করবার
করুক। যেটুকু সে নিজ বুদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পাচ্ছেনা, সেইটুকু
তুমি জোর ক'রে গলাধঃকরণ করাবার চেষ্টা ক'রো না। সেইটুকু বরং
এখন সে নাই গ্রহণ করুক। সে কি গ্রহণ কচ্ছে না কচ্ছে, সে বিষয়ের
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার উপরেই অর্পণ কর। বন্ধুর মত প্রেম নিয়ে কথা
বল, বুঝা তর্ক-বিতর্ক বাদ নিয়ে সহজ সরল আপোষের পথে কথা
শুনাতো। তার যদি মঙ্গল কত্তে চাও, তবে এইটো হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

(১৪৯)

নিজের মত প্রচার করবার কালে লক্ষ্য রে'খ যেন অণবের প্রতি বিদ্যে-প্রচার ক'রে ব'সনা। তোমার মতটা তাকে সুন্দর রূপে আগাগোড়া ধৈর্যের সহিত ধীরে ধীরে জানিয়ে দেওয়াই তোমার প্রধান কর্তব্য। তুমি যখন সংঘম প্রচার কচ্ছ, তখন সংঘমের প্রতি তার প্রেম সৃষ্টি করাই হবে তোমার প্রধান লক্ষ্য,— অসংঘমের প্রতি বিদ্যে সৃষ্টির চেষ্টা যেমন নিস্প্রয়োজন, তেমনি নিরর্থক। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সমর্থকও অনেক মত আছে। সেই সব মত যে ভ্রান্ত, তা' যেন উপদিষ্ট ব্যক্তি নিজের বিচারশক্তির দ্বারাই বুঝে নিতে পারে। সংঘমের শ্রেষ্ঠতা তুমি দেখিয়ে যাও, অসংঘমের নিকৃষ্টতা আপনি সে বুঝতে পারবে।

(১৫০)

তোমার কোনও কথা সে বুঝতে পারেনি ব'লে তাকে ধমকি দিও না। ধমক দিয়ে কাউকে স্বমতে আনার প্রকৃত মানে হ'ল নিজের সদ্ব্যক্তির অভাবকে হতাশ ভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়া। তাকে সংপদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তুলতে দেবী হ'তে পারে, কিন্তু হতাশ হবার দরকার নেই। আস্তে আস্তে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে এমন ভাবে বিকশিত ক'রে তোলা যেন তোমার আদেশ বা অনুরোধ ছাড়া সে নিজেই নিজের মঙ্গল বুঝতে পারে। উপদেষ্টাকে অসম্ভব রকমের প্রেমিক হ'তে হয়, কারণ প্রেম ছাড়া কেউ কারো হৃদয় জয় করতে পারে না। আর, হৃদয়-জয় যে করেনি, তার কথা ধৈর্য্য ধ'রে ছেলেকা বা মেয়েরা শুনবে কেন?

(১৫১)

একটা গ্রামেই অনেকগুলি পরিবার বাস করে। প্রত্যেকের হাঁড়িও ভিন্ন, বাড়ীও ভিন্ন। কিন্তু যে বস্ত্রই যার খাত্ত হোক, তারা এক হাটেই বাজার ক'রে আহাৰ্য্য সংগ্রহ করে, এক নদীতেই স্নান ক'রে তাপদগ্ধ শরীরকে শীতল করে। জগতে শত শত সম্প্রদায়গুলির অবস্থাও ঠিক তাই। একই জগতে শত শত সম্প্রদায় আছে, কিন্তু যে যে-ভাবেই ভজন ক'রে সুখ পাক, উপাস্ত্র তাদের ঐ একই পরমেশ্বর। এই জ্ঞানটা যদি থাকে, তবে আর সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হ'তে পারে না। শুধু মুখে বললেই হবে না, বিশ্বাস করা চাই যে, আমি যেই পরমেশ্বরের ভজনা কচ্ছি, অপরেও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরেরই ভজনা কচ্ছে; শুধু অনুষ্ঠানেরই পার্থক্য, কিন্তু মূল লক্ষ্যে পার্থক্য নেই। তা' হলেই জগৎ থেকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর হ'য়ে যেতে পারে।

(১৫২)

ঈশ্বরবিশ্বাস আর আত্মবিশ্বাস এই দুইটিকে জানবে যমজ ভ্রাতা। তুমি তাঁর, তিনি তোমার। সুতরাং আত্মবিশ্বাস বাড়লে ঈশ্বরবিশ্বাস বাড়বে, ঈশ্বরবিশ্বাস বাড়লে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তুমিই তিনি, তিনিই তুমি। তুমি, সুতরাং তাঁতে বিশ্বাস করা আর নিজেতে বিশ্বাস করা একই কথা। শরীরের বলও বল নয়, বাগিতার বলও বল নয়, বিশ্বাসই মানবের বলাবল। বিশ্বাসের শক্তিতেই মানুষ বিশ্ববির পদাহত করে। বিশ্বাসের বলেই ধ্রুব বনে বাঁসে নির্ভয়ে তপস্তা কল্লোঁন, প্রহ্লাদ হস্তিপদতলেও নির্বিকল্প রইলেন, কত দেশে কত যুগে কত মহাত্মারা অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে মরণকে আত্মদান কত্তে কত্তেও ধর্মের মহিমাকে প্রচার ক'রে গেলেন। বিশ্বাসই শক্তি কারণ, বিশ্বাসীর পরাজয় নেই।

সভাপতির অভিভাষণ ❀

শ্রদ্ধেয় অতিথিগণ, সমবেত প্রতিনিধি-বর্গ এবং প্রাণপ্রিয়
ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ,

পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-বিহার অঞ্চল-প্রতিনিধি সম্মেলনের
এই প্রথম অধিবেশনে আমার হ্রায় একটা নিতান্ত অযোগ্য ভ্রাতাকে যে
আপনারা দক্ষিণ বিহার থেকে ডেকে এনে সভাপতির সম্মানিত পদে
আরোপিত করেছেন, তাতে আমি আমার জীবন সার্থক জ্ঞান করছি।
কিন্তু আজকের এই সুমহৎ সভাস্থলেই এমন অনেক জ্ঞানী, গুণী, ভক্ত
এবং ত্যাগ-শক্তিদর ভ্রাতা ও ভগিনী উপস্থিত আছেন, যাদের মধ্যে
কাউকে এই শ্লাঘা অধিকার প্রদান করলে সভাপতি-পদের সম্মান শত
গুণে বর্ধিত হ'ত। দৈবক্রমে আমাকে পুপুন্যকী আশ্রমের মঙ্গল-বান্ধ-
সংক্রান্ত এমন সব জরুরী কাজের ভার মাঝে মাঝে নিতে হয়েছে, এবং
হচ্ছে, যাতে ক'রে আপনাদিগকে চাক্ষুষ ভাবে দর্শনের অনেক আগেই
আমি আপনাদের অনেকের অসামান্য ভক্তি ও ত্যাগের পরিচয় পেয়ে
এলেছি। সুললিত ভাষণে সভাস্থল মাৎ করে দিয়ে যারা সাময়িক
ধর্মযুগের করতালির অভিনন্দন প্রাপ্ত হন, তাঁদের চেয়েও প্রকৃত ত্যাগী
ও প্রকৃত ভক্তের মূল্য ও মর্যাদা বস্তুতঃ সহস্রগুণ বেশী। ত্যাগই মনুষ্য-
জীবনের প্রকৃত অলঙ্কার, ভক্তিই মনুষ্য-প্রতিভার প্রকৃত জ্যোতিঃ।
সেই অমূল্য অলঙ্কারে যারা সমলঙ্কৃত, সেই সুহৃৎ প্রকৃত ভাষায় যারা
জ্যোতির্ময়, তাঁদের মধ্যে কাউকে আজকের সভার পরিচালন-ভার

* ২৬শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, বাটশিলা (সিংভূম) অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও
দক্ষিণ-বিহার অঞ্চল-প্রতিনিধি-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

না দিয়ে আমার ছায় এক দীন ভ্রাতাকে যে আপনারা এত বড় সম্মানে ভূষিত করেছেন, তার জন্ত আপনাদের সহজাত মেহ ও প্রেমকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই। পূর্ব-জন্মের যে স্মৃতি-ফলে শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আপনাদের এই অকৃত্রিম ও অবাচিত স্নেহের অধিকারী হয়েছি, আমার অজ্ঞাত সেই স্মৃতিকেও ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। পরমকরুণাধার সৎগুরুর আপনারা যোগ্যাতিযোগ্য শিষ্য, তাই আপনাদের পক্ষে এমন কাজ সম্ভব হয়েছে। আপনাদের মধ্যে আমার জীবনৈকলক্ষ্য শ্রীমদগুরুদেব নিয়ত স্মৃদ্ধভাবে অবস্থান করেন, একথা আমি বিশ্বাস করি। আপনাদের মধ্য দিয়ে আমি তাঁরই রাতুল চরণাবিন্দে আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করছি। আপনারা দয়্য করে তা গ্রহণ করুন।

আজকের এই মিলন-মহোৎসবে যোগদান ক'রে আমাদের সকলের চিত্তেই এক অভাবনীয় হর্ষ জাগ্রত হয়েছে, একথা অস্বীকার করা চলে না। শ্রীশ্রীবাবামণি বলেছেন,—“সত্বেদ্রেষ্ঠে যেখানে তোরা বহুজনে মিলিত হবি, জানুবি, সেখানে আমি তোদের মধ্যে বসে আমি।” আজ আমরা পরস্পর অপরিচিত ভ্রাতা-ভগিনীর দল এইখানে এসে এক জন আর একজনকে নিজ রক্ত, নিজ মাংস, নিজ অস্থি, নিজ মজ্জা, নিজ প্রাণ নিজ আত্মা, ব'লে যেন অনুভব করছি। এ শুধু আপনার প্রীতি জনের ভিতরে পুণ্যপুরুষ শ্রীশ্রীবাবামণির নিত্য এবং সত্তা উপস্থিতির ফল এবং প্রমাণ। কিন্তু বন্ধুগণ, অত্র একটা বিষাদের রেখা মাঝে মাঝে আমাদের হৃদয়ের চিত্র-পটে অবাস্তিত এক কালিমার দাগ বুলিয়ে যাচ্ছে যার জন্ত আমাদের চিত্তের পরিপূর্ণ স্বচ্ছন্দতা যেন প্রকাশ হতে চাচ্ছে না। সেই কালো মসীরেখা হচ্ছে আসামের অনাচার। বাঙ্গালী বলেই কোনও কথা নয়, আজ আমরা এখানে কেবল বাঙ্গালীরাই আছি, তাও

নয়, অখণ্ড-সম্মেলন কেবল বাঙ্গালীদেরই সম্মেলন নয়, আজ আমরা এখানে বাঙ্গালী, উড়িয়া, বিহারী, তেলেগু আদি বহুদেশবাসী বহু-ভাষা-ভাষী অখণ্ডেরাই মিলিত হয়েছি, আমাদের পরিচয় বাঙ্গালী বা উড়িয়া হিসাবে নয়, আমাদের পরিচয় মানুষ হিসাবে। মানুষ হিসাবে আমরা মর্মান্বিত হয়ে বাচ্ছি যে, ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে যে অত্যাচার যে বিভীষিকা, যে কদর্য অরাজকতা কল্লনার বাইরে ছিল, আজ স্বাধীন ভারতের তথাকথিত স্বাধীন নাগরিকেরা তাতেই উপদ্রুত হচ্ছে এবং নুত্তিত, আহত ও বিতাড়িত হয়ে “কোথায় যাই”, “কোথায় যাই” বলতে বলতে দলে দলে নিকরদেশের পথে যাত্রী হয়েছে। একটি মিস এলিসকে পশ্চিম সীমান্তে আফ্রিদি দস্যুরা অপহরণ ক’রে নিয়ে গিয়েছিল, আর তাঁকে উদ্ধার করার জন্ত ইংরাজ সরকার সীমান্তের পার্শ্বত্যা গ্রামসমূহে বোমা নিক্ষেপ ক’রে পর্যন্ত কুন্তিত হন নি। আর আজ ভারতের পূর্বাঞ্চলে কত নরনারী নিহত হ’ল, কত নারীর পরম ধন সত্যীদ্র দুর্ভুক্ত-কবলে লাঞ্চিত হ’ল, দিল্লীশ্বরেরা বিমান-ভ্রমণ ক’রে রাজকোষের অর্থব্যয় ব্যতীত আর কিছুই ক’তে পারেন নি। নির্যাতিত পুরুষ-রমণী হাহাকার ক’রে কেঁদে কেঁদে বলছে “আমাদের কি কেউ নেই? দলগত রাজনীতি আর ব্যক্তিগত লাভ-প্রতিষ্ঠার বলি রূপে আমরা কি জীবন জুড়ে কেবল লাঞ্চিতই হ’ব, কেবল-যাযাবর জীবনই বাপন করব? ঈশ্বর, তুমি কি ঘুমিয়ে আছ? হে বিধাতা, কতকগুলি রাজনীতিকের কুচক্র পড়ে তুমিও কি শক্তিহীন হয়ে কংস-কারাগারে বন্দি-দশায় কাল কাটাচ্ছ?”—এই সকল বিপন্ন, সর্বস্বান্ত, হীনমূল, নিরাশ্রয় মানুষগুলির জন্ত সহজেই আমাদের চোখে জল নেমে আসে। আমরা বন্ধুগণ, আমরা যখন দুর্বল, আমরা যখন রাজনীতি আলোচনা করব না, আমরা যখন অত্র কোনও যোগ্য প্রতি-

কায় কন্তে একান্ত অক্ষম, তখন আমরা এই সকল দুর্ভাগা নরনারীদের জন্ত দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু বিসর্জন দিয়ে হ'লেও প্রমাণ করি যে, আমরাও মানুষ, মানুষের জন্ত আমাদেরও প্রাণ কঁাদে, আমরা নিঃশ্রম নিঃশ্রু নিক্ষেপণ নররূপী কতকগুলি পশু নই। আসুন আমরা নির্যাতিত, লাঞ্চিত, অবমানিত, আহত, নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানব-কুলের জন্ত দুইট মিনিটের জন্তও অন্তরের বেদনা প্রকাশ করি, ভগবানের নিকটে তাঁহাদের শান্তি প্রার্থনা করি।

আমরা যতটুকু সংবাদ পেয়েছি, তাতে পলাশবাড়ী নিবাসী ভ্রাতা-নিরুক্ত কুমার শূরের সম্পর্ক ছাড়া আসামস্থ অপর সকল গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদের মোটামুটি সংবাদ ভাল। অনেকের গৃহ গিয়েছে, কারো বা ব্যবসায় গিয়েছে, কিন্তু কারো প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নি। একমাত্র পরিজনবর্গ-সহ ভ্রাতা নিরুক্তকুমার শূরেই কোনও সংবাদ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এক ভ্রাতৃপুত্র যে ইহলোকে নেই, সে সংবাদ সংবাদপত্র পাঠে সবাই জেনেছেন কিন্তু ভ্রাতা নিরুক্ত কুমার, তাঁর স্ত্রী ও শিশুগণ কোথায়, তা আমরা জানি না। তাঁরা আজ যেখানেই থাকুন, আসুন আমরা সমবেত প্রাণে সম্মিলিত মনে তাঁদের কুশল চিন্তা করি, তাঁদের জন্ত ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাই। সঙ্গে সঙ্গে আসুন আমরা সমস্ত জগতের জন্তও কুশল প্রার্থনা করি।

[দুই মিনিট কাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা।]

বন্ধুগণ, আসামে এবং বঙ্গদেশে আমাদের অনেক গুরুভ্রাতা এবং ভগিনী আছেন, যাদের জন্ম অসমিয়া পিতামাতার ঘরে, যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়—অসমিয়া, যারা অসমিয়া সংস্কৃতির প্রতি প্রাণ

সম্পন্ন ও অসমিয়া ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও অখণ্ড-
আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান, অখণ্ডমন্ত্রের নিকটে সমর্পিতপ্রাণ এবং প্রকৃত
অখণ্ডেরই জ্ঞায় সর্বজাতি, সর্ববর্ণ ও সর্বভাষার প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন।
আজ আসামের অকল্পনীয় অরাজকতার নিদাকরণ আতঙ্ক ও বিভীষিকার
অন্ধকারের মধ্যে এঁদেরকে নক্ষত্রপুঞ্জের মত উজ্জল দেখা যাচ্ছে।
তারা এবং যারা অখণ্ড-মন্ত্রে দীক্ষিত নন, অথচ উদার সমদর্শিতার
অধিকারী, এমন অসমিয়া সজ্জনেরা এই বিরাট-কলঙ্কময় অধ্যায়ের
মাঝেও হুই একটি প্রশংসনীয় মহত্বের রেখাপাত করে গেছেন।
আজকের প্রসঙ্গে তাঁদেরও কল্যাণ কামনা করি এবং তাঁদিগকে সন্তুষ্টি
ধন্যবাদ জানাই।

“অখণ্ড” শব্দটি একটি অসাধারণ ভাবের চোতক। “অভিধ্বা”
শব্দটি যেমন আচার্য্য স্বরূপানন্দের এক অভাবিত সৃষ্টি, “অখণ্ড” শব্দটিও
তেমনি তাঁর এক অভিনব অবদান। “অখণ্ড” এই একটি শব্দের মধ্যে
বিশ্বের সমস্ত দর্শন-শাস্ত্রের একটি অকল্পনীয় সামঞ্জস্য বিহিত হয়েছে
এবং নিহিত রয়েছে। এই স্নগভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার পক্ষে আমি
যোগ্য ব্যক্তি নই কিন্তু ইম্যানুয়েল ক্যান্টের “ক্রিটিক অব পিওর রীজেন”
যেমন ক’রে পাশ্চাত্য দেশের সমগ্র দার্শনিক মতের উপরে স্বকীয়
অসামান্য প্রভাব প্রয়োগ ক’রে অনন্য দর্শন-গ্রন্থ রূপে সমগ্র পশ্চিমে
গৃহীত হয়েছে, ভারতীয় চিন্তাধারার উপরে “অখণ্ড” এই একটি শব্দ
তার চেয়ে বহুগুণ প্রভাব একদা বিস্তার করবে এবং ধীমান, মতিমান,
মহামনসী পুরুষগণের আশ্রিত্য আলোচনার বিষয় হবে। সেই দিব্য
দিনের দীর্ঘ দেবী নেই, যেদিন অবিসম্বাদিত ভাবে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ
পরমহংস দেবকে চিন্তাজগতের এক যুগস্রষ্টারূপে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়
রূপপুঞ্জেরা অভিবাদন দেবে, পূজা করবে।

শব্দ মাত্রেরই ভিতরে যাহ আছে, একথা শব্দযোগী আপনার প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। “অথগু” শব্দটি শুনতে যতটুকু বা প্রথম দৃষ্টিতে দেখতে যতটুকু, এর ভাবার্থ বা সারমর্ম তার কোটিগুণ অধিক যাহুর আধার। বিবদমান বিশ্বকে এক ক’রে দেবার সামর্থ্য নিয়ে এই মহাহান্ শব্দটির আবির্ভাব হয়েছে। “অথগু” শুধু মাত্র একটা শব্দই নয়, এটা সকল শব্দের পরমাধার প্রণবমন্ত্রের স্মারক। প্রণবের স্বর হ্যাঁ, সমাহার, সমবয়। “অথগু” শব্দটিও সমাহারের, সমবয়ের, ইতিবাচক মহামিলনের অর্থ। জগৎকে এই একটা অভিনব দার্শনিক ইঙ্গিত প্রদান ক’রে ভাবীকালের লক্ষ লক্ষ মহাদার্শনিকদের পূর্বদৃষ্টি হ’য়ে রয়েছেন আচার্য্যবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

কিন্তু এই মহান্ চিন্তানায়কের চিন্তাই একমাত্র বিশেষত্ব নয়। বিগত ২৫শে শ্রাবণ তারিখে দেৱাদুন থেকে শ্রীশ্রীবাবামণি একজন ভক্তকে লিখেছেন,—“তোমার ভিতরে ভাব আছে, কবিত্ব আছে। কর্মোপায়ের মধ্য দিয়া তাহার সার্থকতা চাই। তোমার সৃজনী প্রতিভা কেবল অক্ষর আশ্রয় করিয়াই থাকিবে, বর্ণমালার বর্ণাঢ্যতা বাড়াইবে, আর কাজে তুমি কিছুই করিবে না, ইহা অশ্রায়।”—অর্থাৎ কেবল কবি বা দার্শনিকরূপে তিনি নিজেও থাকতে চান না, তিনি অত্র দিক্ দিগন্ত নিজের সার্থক চিন্তার অলোপ্য স্বাক্ষর মানব-সভ্যতার বুকের উপর রেখে যেতে চান,—তিনি ভাবুক, সাধক, দার্শনিক মাত্রই নন,—তিনি কর্মবীর। কর্মযোগ-সাধনার উপদেশ দিয়ে লক্ষ লক্ষ মতিভ্রান্ত জড়বীর চेतনাই মাত্র তিনি জাগিয়ে দেন নি, নিজ হাতে কাজ ক’রে তিনি কর্মযোগের অভাবনীয় দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সের তিনি হাতুড়ি নিয়ে পাথর ভাঙ্গেন, কুড়াল দিয়ে গাছ কাটেন, গাইকি দিয়ে মাটি খোঁড়েন, লাঙ্গল দিয়ে জমি চষেন। অথচ তিনি আমানত

মত লক্ষ্যাদিক শিষ্যের গুরু। কর্মযোগ-সাধনার এমন অনাবিল দৃষ্টান্ত
জগতে আর কয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে?

মুন্সুরী থেকে নেমে আসবার পথে দেৱাদুন থেকে তিনি ২৫শে
শ্রাবণ তারিখে আরও লিখেছেন,—“সচ্চিন্তা কর, সংকল্প কর, আর
নিরভিমান হইবার জন্ত কর্মের ফল ভগবানে অর্পণ কর। তুমি
নিজে কেও একেবারে ভগবানের পায়ে মাঁপিয়া দাও। আত্মসমর্পণের
মধ্য দিয়া তোমার সাধনসত্তা ফুটিয়া উঠুক। কেবল আবুক হইলেই
চলিবে না, সাধকও হইতে হইবে,—কেবল সাধক হইলেই চলিবে না,
কর্মীও হইতে হইবে। নিজে কর্মী হইবে, সহস্র জনকে সেই দৃষ্টান্তের
প্রত্যয়ে কর্মী রূপে গড়িয়া তুলিবে।.....মানুষের চিন্তাই মানুষকে
বড় করে। কারণ, চিন্তাই কর্মের নিয়ামক। কিন্তু কেবল চিন্তাই
করিবে, চিন্তাকে কাজে রূপ দিবে না, এমন চিন্তা বন্ধা রমণীর শ্রায়
প্রায় নিরর্থক।”

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখেছেন,—“কথা জীবনে অনেক
কহিয়াছ। যতগুলি কথা কহিয়াছ, তার চেয়ে বেশী কাজ করিয়াছ বা
করিতে চেষ্টা পাইয়াছ, ইহাই হওয়া চাই তোমার জীবনের ইতিহাস।
পৃথিবীর লোক তোমাকে না চিনিতে পারে, যশ চিরস্থায়ীও নহে,—
তোমার নিজের কাছে যেন তোমার পরিচয় গোপন না থাকে। যাহা
কহিয়াছ, তার দশগুণ কাজ করিবার জন্ত তোমাকে প্রাণপাত করিতে
হইবে।”—আর আচার্য্য স্বরূপানন্দ নিজেও তাই করছেন।

আচার্য্য স্বরূপানন্দ তাঁর বিগত চৌত্রিশ-বৎসর-ব্যাপী আভ্যন্তরীণ সাধন-
ক্ষেত্র পুণ্ড্রীতে নিত্য আয়ুঃক্ষয়কর কঠোর পরিশ্রম ক’রে জন-কল্যাণ
মানসে এক অসাধারণ ঐতিহ্য সৃষ্টি ক’রে রেখেছেন। যার ক্ষুদ্র অংশ

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[২ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

৪২০

তিনি সেখানে গিয়ে এই অতুল কীর্তির পশ্চাতে তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম লক্ষ্য করে আসুন। খুব সম্ভবতঃ আগামী ১০।১১।১২ পৌষ এই তিন দিন ভারতের সকল প্রান্ত থেকেই আপনারা ও আপনাদের প্রতিনিধিরা পুণ্ড্রকী আশ্রমে শুভাগমন করবেন। এ কেবল দৃষ্টদর্শনই হবে না, হবে আপনাদের তীর্থদর্শন, হবে আপনাদের আত্মপ্রত্যয়ের উদ্বোধন। আপনাদের এই নগণ্য সেবক গত কয়েকটা বৎসর ধরে পুণ্ড্রকী আশ্রমস্থ মঙ্গলবাঁধের নানা কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত থাকায়, আশ্রমাদীপ আচার্য স্বরূপানন্দের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কঠোর শ্রমশীলতা এবং বেপরোয়া দুঃসাহসের যে পরিচয় পেয়েছে, তাতে একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে, বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের ধর্ম্মযোগ ও কর্ম্মযোগের ইতিহাসের ভিতরে এমন উদ্দীপনাময় জীবনের দ্বিতীয় আর একটা দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের এক একজন অসাধারণ প্রতীক নানা সময়ে নিশ্চিতই আবির্ভূত হয়েছেন কিন্তু এই মার্গত্রয়ের পূর্ণ সমন্বয়ী মূর্তিরূপে একটা বিগ্রহ এই প্রথম দেখা গেল।

আমরা সেই অসামান্য মহামানব শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের মানস সন্তান। আজ আমাদের কর্তব্য-নির্ণয়ের সময়ে যেন আমরা নিজেদের ভাবী সম্ভাবনাগুলি ভুলে না যাই। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, কি কতে আমরা সমর্থ আর কি কতে আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। আচার্য্যপাদের আসাম-প্রদেশ বানী অগণিত বঙ্গভাষী পুত্রকন্যা আজ মহাবিপন্ন। মঙ্গলবাঁধের ধরু তাঁরা যে যা কতে পাতেন, তাও আজ আমাদেরই কতে হবে। আমরা আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে যেন নীচ ধারণা না করি। আমরা যেন আমাদের কর্তব্যের বিশালতা দেখে আত্মবিশ্বাস না হারাই

যেন আমাদের প্রতি জনের শক্তিসামর্থ্যকে কাজে লাগাতে চেষ্টার, বৃদ্ধির ও উত্তমের কোনও কৃপণতা না করি। কর্তব্যের ডাক শুনেও পিছিয়ে থাকার কাপুরুষত্বকে যেন আমরা আশ্রয় না করি।

মভার উদ্বোধক মহাশয় এই মাত্র আপনাদিগকে অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি মূল্যবান কথা শুনালেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি মহোদয়দ্বয়ও তাঁদের কার্য্যকর উপদেশ আপনাদের এখনি দেবেন। আপনাদের মধ্যেও যারা প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও গুণী আছেন, সকলেই নিজ নিজ উপলব্ধি অনুযায়ী অমূল্য সংপরামর্শ আপনাদের দেবেন। প্রত্যাশা করি, এঁদের আলোচনা থেকেই আমরা আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ পাব। কিন্তু বন্ধুগণ, তার পরেও একটা জরুরী বিষয় থেকে যায়। তা হচ্ছে এই যে, কথা যেন কথামাত্রেরই পর্য্যাবসিত না হয়, কথামত কাজ যেন আমরা করি। কথা-মত কাজ করবার জন্ত আমরা যেন আমাদের স্বগণবর্গকে বাধ্য করি। কথা-মত কাজ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা যেন আমাদের নিত্যাবশ্যকীয় আহাৰ-নিদ্রা-বিশ্রাম ব্যাপারেও কতকটা কৃপণ হই। কেবলি কথা বলা আর কথা শোনার জন্ত আমরা এখানে আসিনি। আসতে আমাদের শ্রমও হয়েছে, ব্যয়ও হয়েছে। শুধু কথা বলে আর শুধু কথা শুনেই যদি আমরা যার যার ঘরে চলে যাই আর সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রার কাল কাটাই, তা'হলে এত বড় একটা আত্মপ্রবঞ্চনা করা হবে যে, বলবার নয়। বড় বড় কথা বলে আমরা যেন নিজেদের জন্ত কতকগুলি দিক্কার সংগ্রহই না করি। কথা বলছি কাজের জন্ত, কথা শুনছিও কাজের জন্ত, একথা যেন আমরা না ভুলি। সংকথা বলা খুব ভালো, সংকথা শোনাও খুব ভালো, কিন্তু আসল ভালো হচ্ছে সেই কথা অনুযায়ী কাজ করার। প্রকৃত কাজে ত্যাগ প্রয়োজন হয়, আর

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৪৯২

প্রয়োজন হয় শ্রমের। আমরা যেন ত্যাগে কুণ্ঠিত না হই, আমরা যেন শ্রম কতে ভয় না পাই। পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে নূতন নূতন অখণ্ডমণ্ডলী আমাদের স্থাপন কতে হবে, পুরাতন অখণ্ডমণ্ডলীগুলিকে ঝালিয়ে নিয়ে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক অখণ্ডকে আজ একটা মাত্র স্তম্ভহীন কাজের পিছনে সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়াতে প্রেরণা দিতে হবে। কাজ কতে হবে আমাদেরকে মৃত্যুপণ ক'রে। তা' হ'লেই আমাদের কথা বলা আর কথা শোনা সার্থক হবে।

নানাস্থানে আজকাল প্রতিনিধি-সম্মেলন হচ্ছে। প্রত্যেকটা সম্মেলন অনেক অবিখ্যাতের ভিতরে বিশ্বাস, অনেক চিত্তহীনতার প্রাণে আস্থা, অনেক কিস্তিবিমূঢ়ের হৃদয়ে একনিষ্ঠা ও কর্মোত্তম সৃষ্টি ক'রেছে। প্রতিনিধি-সম্মেলনগুলি অপরিচিত গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের মধ্যে এক অনির্বচনীয় ও অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধন সৃষ্টি কতে সক্ষম হচ্ছে। আমাদের আজকের এই সম্মেলনও যেন তাতে সমর্থ হয়। এতদিন আমরা ছিলাম পরস্পর পরস্পরের সহিত অপরিচিত। আজ হয়েছে চখের দেখা। এই থেকে যেন আমাদের প্রাণের দেখাও হয়ে যায়। আমরা যেন একের জন্ত অপরে অনায়াসে জীবন দিতে পারি। আমরা যেন একের মজলকে অপরের মজল ব'লে ধারণা কতে সক্ষম হই। আমরা যেন প্রতিজনকে ক্ষুদ্রতর স্বার্থে অন্যের ক'রে সকলের সর্বজনীন স্বার্থের দিকে আগ্রহবান কতে পারি। অনেক স্থানেই প্রতিনিধি-সম্মেলন করার আগে স্থানীয় ভ্রাতাদের প্রভাবশালী একটা অংশের ভিতরে একটা সংশয়, সাফল্য সম্পর্কে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর সন্দেহ, সম্মেলনের উপযোগিতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা গিয়ে থাকে। কিন্তু সম্মেলনটা হয়ে যাবার পরে দেখা যায়, সব

সন্দেহই অমূলক, সকল সংশয়ই ভিত্তিহীন। এক এক স্থানে এক একটা ক'রে প্রতিনিধি-সম্মেলন হয়ে যাবার পরে সেই সেই স্থানে একটা উদ্দীপনার প্রবাহ বইতে শুরু করে। শ্রীগুরুদেব করুন, আমাদের এখানেও যেন সেই শুভফল দেখতে পাই। আরও প্রার্থনা করি, এখানে আমরা যে মশালে অগ্নিসংযোগ করলাম, সেই মশাল যেন আমাদের প্রত্যেকের দূরতম-প্রান্তবর্তী নিঃস্পন্দ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম-গুলিতেও প্রতি গৃহের দীর্ঘকালের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতে পারে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে হ'লেও যেন একই উদ্দেশ্যে চারিদিকে আরও বহু সম্মেলনের অনুষ্ঠান অচিরে সুসম্ভব কতে পারে।

সকল কথাই পরে আর একটা কথাও বলতে হচ্ছে। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে যে, যাই হয়ে থাকি না কেন, আমাদের শক্তির প্রকৃত ক্ষরণ হবে সদগুরুর কৃপাশক্তিতে। আমাদের গুরুদেব আমাদেরকে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছেন; এমন কি, বিবেক বললে গুরুদ্রোহ কতে পর্যন্ত তিনি অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। এমন উদার, অসাধারণ বৃকের পাটা নিয়ে জগতে কোনও দেশে কোনও গুরুর আজ পর্যন্ত আবির্ভাব হয় নি। ভবিষ্যতে যে হবে, এমন কথা হঠাৎ ক'রে মনে করার মত সম্ভাবনাও এখানে কুত্রাপি দেখা যায় নি। কারণ, প্রায় সর্বত্র দেখা যাচ্ছে, গুরুদেবেরা নিজ নিজ শিষ্যকে আমৃত্যু এবং সবংশে ক্রীতদাস ক'রে রাখতেই সচেষ্ট। আচার্য্য স্বরূপানন্দ শিষ্য খোঁজেন না, শিষ্য বাড়াবার জন্ত চেষ্টাও করেন না, আকাজক্ষাও রাখেন না, শিষ্য করার পরে তাকে চিরকাল নিজ বশীভূত করে রাখার জন্ত কোনও প্রয়াস পান না, তিনি শিষ্যকে দিয়েছেন অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু এই স্বাধীনতার যেন আমরা অপব্যবহার না করি। আমাদের শক্তির বিকাশ শ্রীমদগুরুদেবের অপার কৃপার মধ্য দিয়েই সুষ্টরূপে হবে। আমরা যেন এই কথাটি

ভুলে না যাই। পুপুন্যকীর মরুভূমিকে যিনি নিজের ইচ্ছাবলে পরম-
রমণীয় দর্শনীয় নন্দন-কাননে পরিণত কতে পারেন, তাঁরই রূপা-বলে
আমাদের হৃদয়ের মরুভূমিও অকল্পনীয় রূপান্তর পাবে। শ্রীশ্রীবাবামণি
গেয়েছেন,

—“শুষ্ক তরু মঞ্জুরিবে

নামের রূপাশুণে,

ওরে তুই,

ভয়-ভাবনায় হসনে অধীর

অবিশ্বাসীর হৃদে শুনে।”

আজুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, অবিশ্বাসীর, অনাস্থাকারীর অব্যবহিত-
চিত্তের বিকারগ্রস্ত কুযুক্তি শুনে আমরা আমাদের শ্রীগুরুদেবের রাতুল
চরণ-কমল থেকে নিমেষের জগুও পরিলুপ্ত হব না। একটা
কথা আমরা যেন আজ কেউ ভুলে না যাই। সে কথাটা
হচ্ছে এই যে, আচার্য স্বরূপানন্দ আমাদের এক জনকেও ডেকে এনে
দীক্ষা দেন নি। চারদিকে ফাঁদ পেতে তিনি একটা শিষ্যকেও শিবার
ধরেন নি। তিনি কখনো বলেন নি, “আমার কাছেই মন্ত্র নে, অস্ত্র
মন্ত্রদাতারা ভণ্ড বা ছোট।” তিনি কখনো বলেন নি,—“আমার মন্ত্রই
সেরা মন্ত্র, অস্ত্র সব মন্ত্র মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ।” কোনো মত বা পথের
নিন্দা ক’রে তিনি আমাদেরকে তাঁর চরণে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন
নি। পৃথিবীতে তাঁর নিয়োজিত এমন একটা প্রচারক বা এজেন্ট নেই
যার প্রতি নির্দেশ আছে “আমার শিষ্যসংখ্যা বাড়াও।” কোনও
কল-কৌশল বা ফন্দি-চাতুরীর প্রভাবাধীন হ’য়ে আমরা আচার্য
স্বরূপানন্দের শিষ্যত্ব স্বীকার করিনি। আমরা যদি হজুগ ক’রে গিয়ে

আধুনিক, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৪২৫

তার শিষ্য হ'য়ে থাকি, তবে সেটা তাঁর দোষ নয়, আমাদেরই দোষ। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে। আমরা শিষ্য হব কিন্তু গুরুদেবের চিন্তাধারার সঙ্গে কোনও পরিচয় রক্ষার চেষ্টা করব না,—এটা আমাদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। আমরা শিষ্য ব'লে নিজেদিগকে নানা স্থানে পরিচিত করব কিন্তু গুরুদেবের বিরাট কর্মমহাযজ্ঞে ক্ষুদ্র তুচ্ছ সমিধ সরবরাহ কতে কুণ্ঠিত থাকব,—এটা আমাদের পক্ষে অনুচিত সঙ্গীত। আমাদের অসঙ্গত ব্যবহার দেখেই না বাবামণি বারংবার জানাচ্ছেন,—“দীক্ষাগৃহে দলে দলে লোককে প্রবেশ করিতে দিও না, নির্বিচারে শিষ্যবৃদ্ধি কল্যাণের হেতু না হইয়া জঞ্জাল-সংগ্রহের নামান্তর হইবে।” আত্মন, আমরা প্রতি জনে প্রতিজ্ঞা করি, আমরা নামে যাত্রই শিষ্য থাকব না, প্রকৃত শিষ্যের যা সদগুণ, তা আয়ত্ত কতেও অগ্রাণ চেষ্টা করব। আচার্য্য স্বরূপানন্দের প্রত্যেকটি চিন্তা ও কার্য্য নিখিল বিশ্বের কুশলকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রদায় বাড়বার বুদ্ধি নিয়ে জীবনে তিনি একটি কাজও করেন নি, একটি কথাও বলেন নি। যাতে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সর্বমানবের কুশল, আচার্য্য-বরিষ্ঠ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের তাই হচ্ছে জাগরণের ধ্যান, নিদ্রার স্বপ্ন। এজতাই তাঁর সাহিত্য সর্বজনীন সাহিত্য, এজতাই তাঁর সঙ্গীত বিশ্বজনীন সঙ্গীত, তাঁর রচনা সার্বভৌমিক সমাদরের বস্তু। সাহিত্য-রচনার জন্ত তিনি বই লেখেন নি, তাঁর রচনার উৎপত্তি হয়েছে জীবনের ধর্ম্মে, কর্ম্মযোগের দাবীতে। সত্য কথা বলতে কি, স্বরূপানন্দ-সাহিত্য তার নিজস্ব বিশিষ্টতায় উজ্জল, এ সাহিত্য অপর কারো অনুকরণ নয়; তাঁর চিন্তা ও মনন-ধারা কারো অনুসরণ নয়। এই কথাটি সম্যক্ রূপে বুঝতে হ'লে আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন তাঁর রচিত সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়

প্রতিধ্বনি

প্রধান অতিথির ভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৪৯৬

স্থাপন করা, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য তাঁর রচনার মধ্যে একেবারে ডুবে যাওয়া। তারপরে প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের নিজেদের এই অমৃতাস্বাদনকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া। মন্ত্র নিলুম, শিষ্য নায়ে পরিচয় দিলুম কিন্তু তাঁকে নিজেরাও জানবার বা বুঝবার চেষ্টা করলুম না, অথু হাজার হাজার নরনারীদের নিকটেও এই দিব্য চিহ্ন-সমূহকে উপস্থাপিত ক'রে ধরলুম না,—এ'কে যদি অকৃতজ্ঞতা না বলে, তবে অকৃতজ্ঞতা কাকে বলে জানি না। আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি, আমরা কেউ অকৃতজ্ঞ হব না।

আমার বক্তব্য আমি এই খানেই শেষ করব। আপনারা পুনরপি আমার সহস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

বন্দে সদা সুন্দরং শ্রীসদগুরুম্।

লালবাজার, ঝরিয়া }

কবিরাজ—

শ্রীনবকিশোর সেনগুপ্ত

— — —

প্রধান অতিথির ভাষণ ❀

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয়! পরম শ্রদ্ধেয় উপস্থিত প্রতিনিধি-বর্গ, ধর্ম্মাঙ্গা অখণ্ড-ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, সমবেত সুধী অতিথিবৃন্দ,—

আমরা প্রত্যেকেই একই পরমপিতা স্বরূপানন্দ-বৃন্তে ফোটাছুলা তাই আপনাদের প্রত্যেকের শিরায় উপশিরায় অখণ্ড-প্রেম-প্রবাহ প্রবহমান, প্রতি ভ্রাতা-ভগিনীর অন্তরে আমার প্রেমময় প্রভুর উপস্থিতি

* আলিপুর দুয়ারে পশ্চিম আসাম ও উত্তরবঙ্গ অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলন প্রত
প্রধান অতিথির বক্তৃতা। তারিখ ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭, ৫ই জুন ১৯৬০

আশ্বিন, ১৩৬৭]

প্রধান অতিথির ভাষণ

প্রতিধ্বনি

৪৯৭

জানিয়া এবং উপলব্ধি করিয়া সকলকেই আমার সম্বন্ধে প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

অতঃপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহাদের, যাহারা ত্রিতাপ-জর্জরিত, দূরাগত অযোগ্য ভ্রাতাকে পুনরায় প্রেমের স্পর্শ প্রদানের জন্ত, আপন তথা আপনতর হইতে আপনভ্রম করিবার অভিপ্রায়ে, প্রভুর “দূরে থাকা আর চলিবে না”—বাণীকে সার্থক করিবার মানসে এ মহতী সভায় প্রধান অতিথির পদে দীনাধম আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

নিজেকে অযোগ্য জানিয়াও, নিজের ক্রটি, বিচ্যুতি স্বরণ করিয়াও আজ আপনাদের মধ্যে আসিতে পারিয়া, বহুদিন পরে অখণ্ড-ভ্রাতাদের মেহের পরশ পাইয়া নিজেকে ধন্যবাদাই মনে করিতেছি, কৃতার্থ হইয়াছি।

আপনাদের মহত্বের মধ্যে আমি তাঁহারই প্রাণের অকৃত্রিম আকর্ষণ অনুভব করিতেছি, যিনি বহুবার পথচ্যুতকে পথে আনিবার জন্ত আহ্বান জানাইয়াছেন, স্বপ্নে জাগরণে যিনি আমাদের হৃৎ, ক্রটি ক্ষমা করিয়া আপনার বুকের মাঝে টানিয়া আনিতে কান্দিয়া আকুল হইয়াছেন, ‘পথভোলাকে আনতে পথে’ যিনি অরূপণ প্রেমের হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। সেই মহত্বের কথা ভাবিয়া, অনাবিল প্রেমরস-সুধানির্ঝরের আশ্বাদন করিয়া, আপনাদের মধ্যদিয়া আমার সেই পরমপ্রেমময় প্রভুর রাতুল চরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রগতি জানাইতেছি। বহু বলিতেছি এই জন্ত যে—এ সংসার-খেলাঘরে মোহমুগ্ধ জীবের উদ্বোধন, পতন, ক্রটি, বিচ্যুতি, সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তি নিত্যনৈমিত্তিক অবগতাবী নিত্যসহচর। আর “পাপীকে নহে, পরন্তু পাপকে” ঘৃণা করিবার উপদেশ লইয়া, অশান্তির মাঝে সান্ত্বনার বারিসিঞ্চন করিয়া,

প্রতিধ্বনি

প্রধান অতিথির ভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৪৯৮

নিরানন্দে আনন্দের স্পর্শ দিয়া, “জীবে জীবে হো’ক প্রেমবন্ধন, হৃৎ হো’ক আনন্দলোক”—এই মহিমময়ী গীতি গাহিয়া ভক্ত, অভক্ত, ধনী, নির্ধন, ছোট, বড়, পাপী, নিষ্পাপী, স্বসম্প্রদায়, পর-সম্প্রদায়, সকল সম্প্রদায়কে এক করিয়া লইয়া আজ ছুটিয়া চলিয়াছেন মহত্বের পথে আমারই প্রেমময়, মঙ্গলময় প্রভু। অতএব তাঁহার মহত্ব প্রচার এবং প্রসার হইতেছে দিকে দিকে।

আমরা লক্ষাধিক গুরুভ্রাতা ও ভগিনী সেই মহান্ গুরুর আদর্শ এবং উপদেশের ধারক এবং বাহক। আমাদের সেই মহৎ কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া আমরা প্রত্যেকে পবিত্র হইব, টানিয়া তুলিব সংসার-দাবদগ্ধ পরস্পরকে—ত্যাগের পথে, আনন্দের-পথে, সত্যের পথে, প্রেমের পথে, একে অন্বে গলাগলি করিয়া অগ্রসর হইব ধীরে ধীরে। নিজেরা মানুষ হইব, সেবক হইব, কৃতার্থ হইব; আর অপরাধ, দুঃখীকে, আর্তকে মহত্তর পথে টানিয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইব।

আজ আমার জীবনের মধ্যভাগে, ‘পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেন’ এর উপযোগী সময়ে অতীত নবযৌবনের দিনগুলির কথা স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইতেছে। আমি অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রামে, এক প্রখ্যাত সাধক ব্রাহ্ম-বংশে জন্মিয়াও যখন নগণ্য গ্রাম্য বালকদের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলাম, যখন হিতাহিত-জ্ঞান আমার ছিল না, যখন কুসঙ্গের মোহে মুগ্ধ হইয়া কর্তব্য বিষয়ে হতাদর ছিলাম; হয়ত আর কিছুদিন গেলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পাপপুলে ডুবাইয়া দিতে বিধাবোধ করিতাম না একটুও। আর সেই দুঃসময়ে অভিজ্ঞার উদগাতা, কঠোর তপশ্চারী, মহাঋষি আমারই প্রাণের প্রভু হতাশায় ভরসার বাণী নইয়া,

আবিন, ১৩৬৭]

প্রধান অতিথির ভাষণ

প্রতিধ্বনি

৪৯৯

জীবনের অমানিশার ঘন অন্ধকারে আশার আলোকবর্তিকা হাতে
উৎস্থিত হইলেন আমারই সমক্ষে লাকসাম নসরৎপুরে।

১৯২৮ সালের পূণ্যময় মাঘমাসের সে একটি রাত্রি আজ আমার
জীবনে অরণীয় ও বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ঐ রাত্রিটিতেই “ভীতঃ
ভীতঃ” শ্রবণ করিলাম কঙ্কুর্গে অভয়বাণী শুনাইতেছেন প্রভু
আমাকে :—

“ভয় কিরে তোর, আমিই আছি সাথে—

আমিই তোরে তুল্ব টেনে আমার আপন হাতে।”

সেইদিন হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত এই মহাপুরুষকে একদিনের জন্তুও স্থির
হইয়া, নিশ্চল রহিয়া, আত্মসাক্ষাৎকারার্থে নিভূতে বনে-জঙ্গলে
বসিয়া সাধন করিতে দেখি নাই; পরন্তু দেখিয়াছি অসহায়
দিশাহারা যুবকদের ব্রহ্মচর্য্যের বাণী শুনাইয়া, সাহস-ভরসা দিয়া, আর্তের
অশ্রু মুছাইয়া, কখনও অন্ধাহারে, কখনও অনাহারে কেবল জন-সেবা-
ব্রত গ্রহণে দিনপাত করিতেছেন। ইনিই হয়ত প্রথম ছন্দের স্বাক্ষরে
হবার দিয়া বলিয়াছেন,—

‘একলা আমি মুক্ত হ’তে চাই না প্রাণনাথ!

আমায় তুমি বৃত্ত কর বিশ্বজন্য সাধ।”

ইনিই প্রথম বক্তৃনির্বোধে জানাইয়াছেন—

সবার কাছে হও হে প্রকাশ, হও হে।

সবার তুমি না হও যদি, আমার তুমি নও হে॥”

এই মহাপুরুষই স্বয়ং কুলীনের সম্ভান হইয়াও কৌলীনায়ে উপেক্ষা
করতঃ—“জী-শূদ্র-বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা”র তথাকথিত কদর্থের
নিরসন করিয়া সর্বপ্রথম উচ্চৈঃস্বরে আদিজগন্মূলে সাবিত্রী মহামন্ত্রের
আদিকার দিলেন, আর গাহিয়া বেড়াইলেন,—

“আচণ্ডাল ব্রাহ্মণেরে ঔ-কারের মহামন্ত্র গানে,
জাগাও জাগাও আজি ব্রহ্মগায়ত্রীর মহাতানে।”

অভিষ্কার পথে অগ্রসর হইয়া কতদুঃখ ইনি বরণ করিয়াছেন, কত
কত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহিয়াছেন, কত বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি
করিয়াছেন—তাহার বর্ণনা দিবার ভাষা আমার নাই; যেহেতু লেখার
শক্তি আমার সীমাবদ্ধ।

কত শত্রু তাঁহাকে আঘাত হানিতে ছুটিয়া গিয়াছে, বন্ধুর বেশে কেহ
বা অবন্ধুর কাজ করিয়াছে, এমন কি তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেও
কুণ্ঠাবোধ করে নাই এতটুকু! এই অমিত-তেজস্বী মহাপুরুষ তখনই
নির্ভীক চিত্তে গাহিয়াছেন—

“যখনই নেমেছি পথে তখনই জানি,

চরণে ফুটিবে কাঁটা, ভয় করিনি।

তখনই জেনেছে মন, বাথা পাব অগণন,

শিরে দংশিবে আমি ক্রুদ্ধ ফণী।

তথাপি চলেছি পথ নিয়ে ব্রত স্মহৎ,

শ্রবণে পশিছে আমি' তোমারি বাণী।”

এমন করিয়া দিনের পর দিন পথ বাহিয়া চলিয়াছেন—ভিক্ষার
খাতা খোলেন নাই, আত্ম-প্রচার করেন নাই; পরন্তু নিজের পায়ে
দাঁড়াইবার জন্ত কলিকাতায় রাস্তার ফুটপাথে “কন্মের পথে” ঘোঁষা
করিয়া দিন যাপন করিয়াছেন।

পুপুনকীর পাথর-কাঁকর-সমন্বিত উষরক্ষেত্রে আজ স্বর্গের নবন-
মনোহর দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—এই তপস্বী দধীচির অস্থি একে
একে পুপুনকী আশ্রমের উন্নতি-কল্পেই নিঃশেষ হইতেছে। ঘন অরণ্যে
সপের সঞ্জে বাস করিয়া, অনাহারে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া

এই কর্তব্যবীর “কর্ম্মই যৈ ধর্ম্ম” তাহার সত্যতা প্রমাণ করিতেছেন।

নিজেকে জগৎ-সেবায় বলি দিবার ব্রত তিনি লইয়াছেন; কঠোর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, আদর্শ স্থাপন করিতেছেন ধৃত-বীর্য সন্ন্যাসীর, ত্যাগবীরের। মহত্বে মহীয়ান্, মহাপুরুষ কর্ম্মীর উদ্দেশে মানবের প্রতি বাণী দিয়াছেন—

“আমি তেমন মানুষ চাই,

মান অপমান পত্তন মৃত্যু গ্রাহ্য যাহার নাই।

বিভীষিকা দেখি হয়না আর্ন্ত, পায়ে দ’লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন হুখীরে বুকে চেপে ধরে, পতিতেরে ডাকে ভাই।

আমি তেমন মানুষ চাই।

তাদের লাগিয়া পিয়াসী নয়ন যৌবন-ছবি করিছে চয়ন

একবার শুধু দেখিলে যাদেরে পাগল হইয়া যাই,

আমি তেমন মানুষ চাই।”

আজও আমাদের পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিটি মুহূর্ত্ত জীব-সেবায় ব্যয়িত হইতেছে, আজও লেখনী বন্ধ হয় নাই; পরন্তু দ্রুত-গতিতে ভক্তের দুঃখে শাস্তনার বাণীর স্বাক্ষর স্বাক্ষৃত হইতেছে লেখনীর মধ্য দিয়া। এই ত সেই দিনও দেখিলাম পুপুন্যকীর মঙ্গলবাধের কাজে নিদাঘের খরতাপকে উপেক্ষা করতঃ একপায়ে দাঁড়াইয়া থাকায় হাঁটু হইতে নীচের দিকে ফুলিয়া গিয়াছে, চোখের ব্যাথায় চিকিৎসক ডাকিতে হইয়াছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন দিনও তাঁহার মুখে ঐ শ্রানির কথা শুনি নাই, তাঁহাকে পিছপা হইতে দেখি নাই। এ বিষয়ে আমি প্রত্যক্ষদর্শী। ইহা আমাকে যার পর নাই ব্যথা দিয়াছে, উপলব্ধি করিয়াছি তাঁহার বেদনা, তাই ছুটিয়া আসিয়াছি আপনাদের সকাশে

আমার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিবার জন্ত, আপনজনের কাছে ঘরের কথা বলিবার প্রয়াসে।

জীবন-সাম্রাজ্যেও শ্রীশ্রীবাবামণি কাহার জন্ত এই প্রাণপাত কর্তার পরিশ্রম করিতেছেন? তিলে তিলে শরীর-ক্ষয় করিয়া কাহার জন্ত, কিসের জন্ত এই আদর্শ স্থাপন করিতেছেন? আমরাই যে লক্ষাধিক লাভা-ভগিনী তাঁহার উত্তরাধিকারী—এই কথা আজও আমাদের ভাবিয়া দেখিবার দিন আসে নাই? তিনি স্বয়ং কিছুই বলেন নাই বা বলিবেনও না; কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা তাঁহার যোগ্য সন্তানের পরিচয় দিব না? পুপুন্যী আমাদের ধ্যানের ধন, প্রাণের প্রাণ, ভবিষ্যৎ অখণ্ড-সমাজের তথা জনগণের আশা-ভরসার স্থল, “বার্দ্ধক্যের বারাগসী।” ইহাকে যে-কোন মূল্যে আমাদের উচিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণির আদর্শকে রূপ দেওয়া এবং ভবিষ্যৎ জন-জাগরণের প্রাণকেন্দ্র করিয়া তোলা। ইহাই আমাদের পথ, ধর্মের পথ, মহত্বের পথ আদর্শের সন্ধান দিবে, জীবনকে মহিমাম্বিত করিয়া তুলিবে, আশার বাণী শুনাইবে হতাশায়। এখানেই আমরা পথ পাইব যদি আমরা সৃষ্টি করিতে পারি আমাদের স্বর্গীয় নন্দন-কানন পুপুন্যী।

বক্তৃতা দিবার যোগ্যতা আমার নাই, সামর্থ্যও নাই। আজ আর বক্তৃতার প্রয়োজনও নাই। আমরা অকাজে কত কথা বলি কিন্তু কাজের কাজ একটি কথায়ই হয়। সুতরাং আর বাগাড়ম্বরের কাজ নাই, আসল কাজে বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

অতীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাদের এক অসহায় দীন-মরিচ গুরুভ্রাতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মগোরবে আমি আপনাদের পরিবেশন করিতেছি। তিনি দুবেলা আহাৰ যোগাইতে পারিতেন না; কিন্তু

আমাদের উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার সামর্থ্যানুসারে কেবল

একটি পয়সা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার তেজোদীপ্ত মুখখানি দেখিয়া, তাঁহার দৈন্ত লক্ষ্য করিয়া, ভক্তির অতিশয্যে মুগ্ধ হইয়া আমরা সাদরে “বিভূবের খুদ্” বলিয়া গ্রহণ করিলাম ঐ একটি পয়সা। বাস্তবিক শ্রীরামচন্দ্রের মহান্ সাগর-বন্ধনে কাঠবিড়ালীর তুচ্ছ দেহঝাড়া ধূলি অগণিত বানরসৈন্তের প্রেরণা যোগাইয়াছিল, আর স্বয়ং পরমব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র এ দৃশ্যে মুগ্ধ হইলেন, নাস্ত্যনা পাইলেন, কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তাই দীনাধর্মের প্রার্থনা, আশ্রন আমরা হই কর্মের প্রতীক, ধৈর্য্য ও আদর্শ তাগে বীর, মহত্ব মহীরান্। সকলের ত্যাগে দেখিতে দেখিতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, পুণ্যনুকী ইতিহাস রচনা করিবে—নিত্য মত্য মুন্দরের।

মঙ্গলবাধ ভাঙ্গিয়া একটি বিপর্যায় ঘটা আজ হঠাৎ-সমুত একটি ঘটনা। তাই প্রতি সম্মেলনেই এই বিষয়ে আমাদের বক্তৃত্তে হইতেছে, শ্রবণ করাইয়া দিতে হইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি পুণ্যনুকীকে কর্মক্ষেত্রে করতঃ মহত্তর প্রতিষ্ঠান গড়িবার ব্রত নিতে আমাদের আনু-বঙ্গিক বিশেষ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। সুতরাং মঙ্গলবাধের গুরুত্ব অপরিমীম। এ বিষয়ে আমি প্রকৃষ্টরূপে অবহিত আছি। আপনাদের অনুগ্রহদৃষ্টিও আমি সেদিকে আকর্ষণ করিতেছি। ঐ মঙ্গলবাধকে সুদূত করিয়া তুলিতে পারিলে ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি সুষ্ঠু ভাবে অগ্রসর হইতে পারিবে। ফলে আমরা উপকৃত হইব, আমাদের সম্মানসম্মতিরূপে একটা মহত্তম অথচ আদর্শ প্রতিষ্ঠান পাইবে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে।

কিন্তু ইহা ছাড়াও প্রতিনিধি-সম্মেলনের ব্যাপকতর উপযোগিতা এবং তাৎপর্য্য আছে। কেবল অথবা একটা স্থানে সম্মেলন আহ্বান

করা, স্থানীয় প্রাণাভাগিনীদের উদ্দেশ্যের সৃষ্টি করা, বৃথা অর্থব্যয়, বাগাড়ম্বর প্রদর্শন করতঃ নিজেদের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা আমাদের সম্বন্ধ হইবে না। কাজের কাজ ছুঁচা'রটা করিতে পারিলে সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে, ব্যর্থ হইবে না। অর্থব্যয়, আনন্দ পাইবে, পথ অনুসরণ করিবে ভবিষ্যৎশতাব্দীর।

অতএব সম্মেলনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের সাধন-জীবনের প্রতিও লক্ষ্য দিতে হইবে, আমাদের পারলৌকিক কর্মোন্নতির দিকটার প্রতি একটু সতর্ক দৃষ্টি পড়িলে হয়ত আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারিব, নিজেদের তথা সম্ভব উন্নতি সম্ভব হইবে, নিঃসীম আনন্দরসে মাতোয়ারা হইয়া উন্মুক্ত করিতে পারিব নিত্যশান্তির পথ।

এই কারণে অখণ্ড-সংহিতার বাণী ঘরে ঘরে পৌছান, হরি-ও কীর্তনে ত্রিভুবন ভরিয়া ফেলা, সমবেত উপাসনা প্রচলনের দ্বারা দিগ্বিদিকে নবীন প্রেরণার সঞ্চারণা প্রত্যেকটি সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যুবকদের ব্রহ্মচর্যের বাণী শুনাইয়া, অনাগত শুভ দিনের পথ পরিষ্কার করিতে হইবে; ব্যায়াম, যোগ, আসন, প্রাণায়ামের প্রসার করিয়া নানা উপায়ে জনসেবার বৃহত্তর ব্যবস্থা অখণ্ড-মণ্ডলী গুলিতে রাখা যাইতে পারিবে। ইহাতে সমাজ-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে, জনগণহিতায়, বহুজনসুখায় প্রেরণা জাগিবে, জন-সাধারণের ঔৎসুক্য বাড়িবে আমাদের কাজে।

বিচার ও কর্মের বিপুল স্বাধীনতা শ্রীশ্রীবাবামণি আমাদের দিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার অসামান্য মহত্ত্ব প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু শ্রীগুরুর অভিপ্রায় পূরণকেই যেন আমরা প্রদত্ত স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। জগতের কোন জ্ঞান

আধুনিক, ১৩৬৭]

প্রধান অতিথির ভাষণ

প্রতিধ্বনি

৫০৫

এত স্বাধীনতা কখনো দেন নাই বলিয়াই জগতের অত্যাচার শিষ্যদল অপেক্ষা 'আজ্ঞাবহতা' আমাদের বেশী হওয়া প্রয়োজন। কারণ শ্রীমদ্ভাগবদ্ভাষ্যের 'প্রণিপাতেন পরিপ্রণেয় সেবয়া' কথাগুলিকে রূপ দিতে প্রয়োজন হয় ঐ একটি পদ 'আজ্ঞাবহতা'র। তাহার মধ্য দিয়াই 'শিষ্যস্তেহং শাধি মাং হ্যাং প্রপন্নম্'—কথাগুলি রূপ পায়, ভক্ত শিষ্য কৃতকৃত্য হয় জীবনে।

আর তখনই প্রেমের টানে বান ডাকে, শ্রীশ্রীপ্রেমময়, রসময় ভগবান্ ভয়ে অভয়-বাণী শুনাইয়া বলেন—“কৌন্তেয়! প্রতিজনাই-হি, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি।” ভক্ত ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে আসিয়াছে দীনতা, একনিষ্ঠতা, ভক্তির পরাকাষ্ঠা; আর তখনই শ্রীভগবান্ বলিয়া উঠিলেন—নিশ্চিত জানিও আমার ভক্তের বিনাশ নাই, আর এমনি সময় অর্থাৎ ভক্তি-গদগদ চিত্তে ভক্ত তখন আত্মবিসর্জন করেন ভগবচ্চরণে, নামরসের ছোঁয়াছে হৃদয় যখন ভরিয়া যায়, তখনই প্রাণের প্রভু ভক্তের সঙ্গে খেলেন লুকোচুরি। ইষ্টচরণে সমর্পিত-সর্বস্ব ভক্ত 'যথা যথা হেরে, তথা ইষ্টমুত্তি যুগে' আর কি তাঁহার ভগবানে ভুল হয়?

তখনই সাধক বিব্রমঙ্গলের কথায় ভক্ত বলিয়া উঠেন—

হস্তাবুক্ৰিপ্য যদি নির্যাসি অহো কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্?

হৃদয়াৎ যদি নির্যাসি পৌরষং গণয়ামি তে।

অর্থাৎ

হাত ছেড়ে যাও প্রভু! নহে চমৎকার,

হৃদয় ছাড়িলে বুঝি পৌরষ তোমার।

বারেক পরশে যদি করিছ অভয়

আবার আসিতে হ'বে জানিও নিশ্চয়।

প্রতিধ্বনি

প্রধান অতিথির ভাষণ

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫০৬

বাস্তবিক সে রাজ্যে ভক্তভগবানে সৃষ্ট হয় অভেদ্য বন্ধন, অচ্ছেদ্য প্রাণের টান। কেহ তখন কাহাকেও ছাড়িতে পারেন না, এদেহ সে-দেহ একই দেহ হয়।

অতএব পুনরায় আপনাদের সমক্ষে ঐ আশ্রাবহতার কথাই নিবেদন করিতেছি। আশুন আমরা হই তেমন ভক্ত। আমাদের গুরুগত-প্রাণ হইতে হইবে, আত্মকলহ ভুলিতে হইবে, স্বার্থের মোহ, বড় হইবার অভিমান, আত্ম-অহঙ্কার ত্যাগ করিতে হইবে। তবেই ত শ্রীপ্রভু দয়া হইবে। নিশ্চল-আনন্দপিবুষধারায় হৃদয় যদি ভরপুর না হয়, তবে শ্রীপ্রভু আসন পাতিবেন কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—‘আগে জাগা নিজের প্রাণ, তবে ত ভাই উঠবে জেগে বিশ্বজ-গংখান।’ সুতরাং নিজেকে প্রথমতঃ করিতে গঠন করিতে হইবে দিব্যভাব দিয়া, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে টানিয়া তুলিতে হইবে অমিত অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়া। তাই আমাদের অখণ্ড-মণ্ডলীগুলিকে প্রকৃত সাধনার স্থান করিয়া গঠন করিতে হইবে, তাপদগ্নহৃদয় জুড়াইতে হইবে ঐ মণ্ডলীর আশ্রয়ে, ভাই ভাইয়ের প্রেমে তথায় মাতোয়ারা হইতে হইবে মণ্ডলীগুলির মধ্যে একটা পারমাধিক মিল রাখিতে হইবে, করিতে হইবে তাহাকে দৈনন্দিন ঝগড়া কলহের অতি উর্দ্ধে।

উপসংহারে আমার দোষ ত্রুটির জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমার ভাষার দীনতার, কর্মক্ষীনতার; সাধনার অপরিপক্বতার জন্ত মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। সর্বশেষে এই মহতী সভার উদ্বোধনকার স্বপরিচালনার সেবাবৃত্তির নিপুণতার জন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি তাঁহাদের যাহারা প্রাত্যহিক স্বকীয় সাংসারিক কর্ম উপেক্ষা করতঃ এই মহত্তর কর্মে সাড়া দিয়াছেন, ছুটনা

আসিয়াছেন এই মিলন-ক্ষেত্রে আমাদের বৃহত্তর কর্মকে জয়যুক্ত করিবার
 চেষ্টা। আমার শ্রীপ্রভুর রাতুল চরণে পুনরায় প্রগতি নিবেদন করতঃ
 আপনাদের সকলকে জানাইতেছি আমার 'জয়গুরু'। ও শান্তি !
 ও শান্তি ! ও শান্তি !

দীনানন্দ—

শ্রীকৃষ্ণবল্লু গোস্বামী

(ওঙ্কারধাম, কুতুবপুর; পোঃ মালদহ)

আমাদের ভাষা-সমস্যা

লোকসভায় আমাদের নেতৃবৃন্দ ভোটাধিক্যের জোরে হিন্দীকে
 আমাদের সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের
 সেই সিদ্ধান্ত সাংবিধানিক ধারার পবিত্র মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু
 বিষয়টি যখন কংগ্রেস পরিষদ দলের সভায় প্রথম আলোচিত হয়, তখন
 হইতেই এ বিষয়ে মতানৈক্যের বীজ স্তূপ্ত ছিল এবং দলীয় প্রতিনিধিগণ
 এই বিষয়ে সমভাবে বিধাবিভক্ত ছিলেন। দেশের সর্বপ্রান্তের
 খ্যাতনামা পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও রাজনীতিকগণ
 জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে বলিয়া এবং হইলে তাহা জাতীয়
 অগ্রগতির পরিপন্থী হইবে মনে করিয়া এই স্বৈরাচার-মূলক বিধানের
 বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছিলেন। মনে মনে ইহার
 কুফল সম্বন্ধে আশঙ্কিত থাকা সত্ত্বেও নবলব্ধ স্বাধীনতার খাতিরে
 অনেকেই এ সম্পর্কে মতামত প্রকাশে বিরত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে

সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণের নিকট প্রদত্ত ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি সাম্প্রতিক বিবৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, জোর করিয়া হিন্দীভাষা চাপাইবার চেষ্টা করিলে দেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য ক্ষুণ্ণ হইবেই অধিকন্তু তাহার ফলে দেশের স্বাধীনতাও বিপন্ন হইবে।

ডাঃ চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত ভাষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও সরকারী ভাষা কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং জনসাধারণের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, সংস্কৃত ভাষা কমিশন তাহার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও সংস্কৃত ভাষাকে অগ্রতম সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য সর্বসম্মতভাবে সুপারিশ করিয়াছিলেন। সরকারী ভাষা কমিশনের সদস্য হিসাবেও তিনি এবং অপর একজন সদস্য কমিশনের অপরায়িত সদস্যগণের সহিত ভিন্নমত হইয়া বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের বিরুদ্ধে সুচিন্তিত অভিমত দিয়া দেশব্যাপী সেই জনমত্তেরই অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন—যে জনমত্তের সংস্পর্শে তাঁহার কমিশনের সদস্যরূপে দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণকালে আসিয়াছিলেন। একমাত্র ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ই এই উভয় কমিশনের সদস্য ছিলেন বলিয়া বিশেষভাবে ভাষা সম্পর্কিত সমস্ত জনগণের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ অত্যাশ্রয় সদস্যগণ অপেক্ষা তাঁহারই সর্বাধিক ছিল। সুতরাং তাঁহার মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যিক কারণ উভয় কমিশনেই ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ই একমাত্র সদস্য ছিলেন, ভাষাবিদ হিসাবে তাঁহার বিশ্বজোড়া খ্যাতি আছে। এই উভয় কারণেই কমিশনের অত্যাশ্রয় সদস্য অপেক্ষা তাঁহার মতামতের গুরুত্ব অধিক। তথাপি ভাষার প্রশ্নে বর্তমান যুগের প্রাক্ততম ভাষাবিদের অভিন্ন রাজনীতিকদের নিকট উপেক্ষিত হয়। ফলে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়

আগ্নিন, ১৩৬৭]

আমাদের ভাষা-সমস্যা

প্রতিধ্বনি

৫০৯

এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা-সম্মেলন করিয়া এই বহুভাষিক দেশে হিন্দী অপেক্ষা উন্নত একাধিক ভাষা থাকা সত্ত্বেও হিন্দীকেই একমাত্র সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে নানাভাবে জনমতের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়।

এমনই একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ধুবুলিয়াতে। প্রায় ৩৫,০০০ নরনারী এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সভাপতিত্ব করেন—সংস্কৃতকে ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ আন্দোলনের স্রষ্টা, প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও সাধক শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস। তিনি মুখ্যতঃ ধর্মপ্রবক্তা হইলেও তাঁহার এ আন্দোলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে উদ্ভূত হয় নাই। পরন্তু তাঁহার এই আন্দোলন জাতীয়তাবোধপ্রসূত। তিনি পরবর্তীকালেও বিভিন্ন সময়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে ভাষা ধর্ম হইতে অবিচ্ছেদ্য হইতে পারে না। ভাষা ভাবপ্রকাশের বাহন, তাহা সে ধর্মেরই হউক, শিকারেরই হউক, শাসনকার্যেরই হউক বা যাহা কিছুতেই হউক। সংস্কৃত কেবলমাত্র হিন্দুদের ভাষা একথাও সত্য নহে। যে সমৃদ্ধ সাহিত্য-সম্ভার ও সুগভীর চিন্তাধারা ইহার মাধ্যমে ব্যক্ত হইয়াছে, সমগ্র ভারতের মানসলোক তাহাতে প্রতিভাত। একথা অবশ্য সত্য যে কোন কোন লোক সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ধৃতির দ্বারা তাঁহাদের গোঁড়া মতবাদকে সমর্থন করেন। কিন্তু ইহা একমাত্র সংস্কৃত ভাষারই বৈশিষ্ট্য নহে। ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্য হইতেও এ ধরনের উদ্ধৃতির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে প্রগতিশীল মনোভাবের সমর্থনও সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট আছে। কাজেই গোঁড়ামীর দোহাই সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আন্দোলন প্রথমে একজন মহান ধর্ম প্রচারকের দ্বারা প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনরূপে দেশময় ছড়াইয়া পড়ে এবং সংস্কৃত কমিশনের সুপারিশ তথা সরকারী-ভাষা কমিশনের ভিন্নমত-সম্বলিত মন্তব্য এ ব্যাপারে অগ্নিতে স্ফুটাহতির ত্রায় কাজ করে। ইহার এক বৎসর পরে জনমত জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে অখিলভারত রাষ্ট্রভাষা-সম্মেলন নামে একটি সর্বভারতীয় সংস্থা জন্মলাভ করে। অতঃপর ভাষা-সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া দেশের অভ্যন্তরে যে বিভেদের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহা রোধ করিবার জন্ত দেশপ্রোমিকরা এ বিষয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি লোকসভায় কংগ্রেস সদস্যগণের একাদেশ এই ব্যাপারটির পুনর্বিবেচনা-বিজ্ঞোচিত হইবে বলিয়া অনুভব করেন এবং শেষপর্যন্ত দেখিতে পাই যে সংবিধানের ৩৪৩ ধারার ১ম অনুচ্ছেদে “হিন্দী” শব্দটির পরে “এবং সংস্কৃত” শব্দ দুইটি যুক্ত করার জন্ত লোকসভার কংগ্রেসী সদস্য লীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এক সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করেন। এই সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইলে হিন্দী ও সংস্কৃত উভয়ই ভারতের সরকারী ভাষারূপে গণ্য হইবে।

এই সমঝোচিত প্রস্তাবের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর ইহাতেই দেশের সকল স্থান হইতে দিন দিন অধিকতর সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। স্বল্পকালের মধ্যে এই প্রস্তাবের সমর্থনে বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে সকল বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমি ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ বোষ, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষিবৃন্দ সংস্কৃতের স্বপক্ষে অকাটা যুক্তি প্রয়োগে যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না। “এই প্রস্তাব একান্ত সঙ্গত ও সমঝোচিত হইয়াছে

আধুনিক, ১৩৬৭]

আমাদের ভাষা-সমস্যা

প্রতিধ্বনি

৫১১

এবং দলমত নির্বিশেষে সকলের সমর্থন লাভের যোগ্য। সংস্কৃত একটি সর্বভারতীয় ভাষা এবং ইহা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। সরকারী ভাষা হিসাবে সংস্কৃতকে গ্রহণ করিলে কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা অঞ্চলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান হইবে না। 'সংস্কৃতকে দেশের দ্ব্যতম সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা উচিত। সংস্কৃত কমিশনের এই অত্যন্ত মূল্যবান সুপারিশের ভিত্তিতে এই বিল আনয়ন করা হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার ঐক্যরসম্পাদন ক্ষমতা যথেষ্ট থাকায় যে ভেদবুদ্ধিমূলক মনোভাব ও ভাষাগত সংকীর্ণতা ভারতের জাতীয় ঐক্যকে বিপন্ন করিবার উপক্রম করিয়াছে, প্রস্তাবিত সংশোধনটি নিঃসন্দেহে তাহা রোধ করিতে পারিবে। উপরন্তু উহা দ্বারা ভারতের সকল আঞ্চলিক ভাষাও সমৃদ্ধতর হইবে।”

সংস্কৃতের স্বপক্ষে এতগুলি যুক্তি থাকা সত্ত্বেও ইহা সত্য যে, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আমাদের নেতৃবর্গের সমর্থনলাভে ইহা বঞ্চিত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ইঁহাদের নিজেদের অজ্ঞতা ছাড়া এইরূপ মনোভাবের অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, আজ পর্য্যন্ত কোন রাজ্যেই সরকারী কার্যে সেই রাজ্যের ভাষা প্রযুক্ত হয় নাই। ঠিক এই কারণেই নেতৃবৃন্দের এক বৃহৎ অংশ ইংরাজীকেই সরকারী ভাষা হিসাবে রাখিবার পক্ষপাতী। ইঁহারা শুধু নিজেদের কথাই ভাবেন, কোটি কোটি দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের স্বার্থ চিন্তাই করেন এবং তাঁহারা শুধু বর্তমান অবস্থার কথাই ভাবিতে পারেন। দেশের যে শতকরা ৯৫ জন লোক অশিক্ষিত তাহাদের কথা ইঁহারা চিন্তা করেন না, ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা চিন্তা করিবার মত দূরদৃষ্টিও ইঁহাদের নাই।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কষ্টসাধ্য বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, তাহাও সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত। যে পণ্ডিত বিদ্বৎশ্রী রাজপুত্রদের ছয় মাসের মধ্যে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহার সেই সদন্ত উক্তির কথা এখানে উল্লেখ নাই বা করিলাম। কিন্তু একথা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি যে, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের বিত্তীয় শ্রেণীর একটি সাত বছরের বালকও সংস্কৃতে কথোপকথন করিতে সমর্থ। এ সত্য প্রকাণ্ডেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। অথচ ইহা অনস্বীকার্য যে অফুরন্ত ভাণ্ডারের জন্ত সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হওয়া সত্যই শূন্যকঠিন। কিন্তু ইহাও সমভাবে সত্য যে, যে-কোনও ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ সহজসাধ্য নহে।

এ তথ্যও কেহ কেহ সুবিধামত ভুলিয়া থাকিতে পারেন যে, ভারতের স্বর্ণযুগে বিজ্ঞানের যে অত্যাশ্চর্য বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল, সংস্কৃত ভাষায় বীজগণিত, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা, শল্যবিদ্যা, ব্যোমযান বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের অবদান হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্ভার অফুরন্ত এবং তাহা শাসনকার্য পরিচালনা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যানুশীলন কার্যাদির পক্ষে পর্যাপ্ত।

সংস্কৃতকে আজ আর 'মৃত ভাষা' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সংস্কৃত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর একথা আর অস্বীকার করা যায় না যে, স্বরণাতীত কাল হইতে অধুনাকাল পর্যন্ত আনন্দ্র হিমাচল ভারতে সংস্কৃতির ব্যাপক অনুশীলন চলিয়া আসিতেছে। এই ভাষাতে যে স্বচ্ছন্দে ও দ্রুত কথা বলা যায় তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে, ভাষাগত বিতর্কে পদতু হাজার হাজার বক্তার বক্তৃত্য। সেই সকল বক্তৃতা ইংরাজী অথবা অথ কোন ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা

অপেক্ষা নিকট ছিল না। ১৯৫১ সালের আদমশুমারীতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এখনও সংস্কৃত বহু পরিবারে মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। যদি মৃতভাষা বলিয়া কোন ভাষাকে গণ্য করিতে হয়, তবে বলা যায় যে হিব্রুভাষা, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাগুলি অধিকতর 'মৃত' এবং সংস্কৃতির সহিতও ইহাদের তুলনাই হইতে পারে না। তথাপি ইস্রায়েলবাসীরা তাহাদের স্বকীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগবশতঃ এবং জাতীয় মর্যাদার প্রতি নিষ্ঠাপ্রযুক্ত, সকল প্রকার সম্ভাব্য অনুবিধা উপেক্ষা করিয়া স্বরণাতীতকালে প্রচলিত তাহাদের নিজস্ব ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে স্বল্পকাল মধ্যে তাহারা সকল প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করিয়া সমৃদ্ধির পথে ধাপে ধাপে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ভারতের নেতৃবৃন্দ কি সংস্কৃতির ত্রায় সুসমৃদ্ধ ভাষা থাকাসত্ত্বেও ইস্রায়েলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া প্রজাতান্ত্রিক ভারতে সকল প্রকার অনৈক্যের সম্ভাবনাকে পরিহার করিবেন না?

ইদানীংকালে ভাষাগত সংকীর্ণতা দেশের ঐক্যকে একাধিকবার বিপন্ন করিয়াছে এবং আমাদের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভাষা সমস্যার আশু সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের আর একবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে। হিন্দী, ইংরাজী বা কতকগুলি আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে এই জটিল সমস্যার সমাধান হইবে না। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্ত বড় অঞ্চলেরই হোক না কেন, হিন্দী কেবল যে মাত্র একটি আঞ্চলিক ভাষা তাহা নহে, অত্যাশ্র ভাষা-ভাষীদের আকৃষ্ট করিবার মত কোন সম্পদই ইহার নাই। ইংরাজীকে সরকারী ভাষারূপে রাখা যে আমাদের জাতীয় সম্মানের পরিপন্থী তাহা আমাদের অগতিবাদী প্রধানমন্ত্রীও স্বীকার করেন। উপরন্তু যেখানে দেশের শতকরা ২৫ জন লোকই নিরক্ষর ও ইংরাজীর সহিত যেখানে কোন আঞ্চলিক

ভাষারই কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই—সেক্ষেত্রে ইহা সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলিত
অন্তরায় হইবে। কতকগুলি আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করাও বাস্তবায়ন
হইবে না, কেননা একরূপ আঞ্চলিক ভাষার সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতে
থাকিবে এবং ফলে অসন্তোষও ধুমায়িত হইয়া উঠিবে।

সকল দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে এই জটিল সমস্যা
একমাত্র সমাধান সংস্কৃতকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা, যেহেতু
সংস্কৃতই সর্বভারতীয় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একমাত্র সাধারণ ভাষা।
আমরা যখন ভারতবাসীগণের বৈচিত্র্যের মধ্যে একতাকে এবং তাহাদের
চিন্তাধারার সমতাকে ভারতের জাতীয় প্রতিভা বলিয়া গর্ববোধ করি,
তখন এইটুকুও বুঝিতে পারি যে, সংস্কৃতের প্রভাবই আমাদের আঞ্চলিক
বিভিন্নতা ভাষাগত বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া আম-
দিগের চিন্তায় ও ভাবে প্রকৃত জাতীয়তাবোধের স্রোতক হয়, এমন
কি বিভিন্ন ভাষা গঠনেও সহায়তা করে। ভারতের জাতীয় ঐক্য দ্বারা
প্রকৃতপক্ষে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং যদি আমরা সংস্কৃত
ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাই, তাহা হইলে এই
ঐক্য একেবারেই ধ্বসিয়া পড়িবে।

সেই কারণে, জনগণের প্রতিনিধি—লোকসভার সদস্যদের নিকট
আবেদন এই যে, তাঁহারা যেন শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের দ্বারা
উত্থাপিত এই বিলটিকে সমর্থন করেন। বিশেষ ভাবে হিন্দীভাষী
সদস্যগণের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ তাঁহারা যেন ঐক্য ও
শ্রায়েণ খাতিরে এই বিলটিকে সমর্থন করেন। তারপর আমরা আবেদন
করি বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণের নিকট, তাঁহারা যেন এই বিলটির প্রতি
তাঁহাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

উপসংহারে ভারতবর্ষের অস্তিত্বের সহিত সংস্কৃতের সংলগ্ন বিধান

অবিচ্ছেদ্য তাহা দেখাইবার জন্ত আমরা সুবিখ্যাত বিদেশী শিক্ষাবিদ
অধ্যাপক উইলসনের সেই অমর শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

যাবদ্ ভারতবর্ষ শ্রাদ্ যাবদ্ বিক্র্য-হিমালয়ম্।

যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ ভাবদেব হি সংস্কৃতম্॥

যতদিন ভারতবর্ষ থাকিবে, বিক্র্য ও হিমালয় পর্বতশ্রেণী থাকিবে,
যতদিন গঙ্গা ও গোদাবরী প্রবাহিত থাকিবে, ততদিন সংস্কৃত ভাষাও
থাকিবে।

বিবৃতি :—

বিগত ১৬-৪-৬০ তারিখে লোকসভা-সদস্য শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
সংবিধানের ৩৪৩ ধারার ১ম অনুচ্ছেদে “হিন্দী” এই কথাটির পরে
“এবং সংস্কৃত” এই কথা দুইটি যোগ করিয়া ধারাটি সংশোধনের
জন্ত লোকসভায় একটি বিল আনয়ন করিয়াছেন। বিলটি গৃহীত হইলে
হিন্দী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাই ভারতের সরকারী ভাষারূপে পরিগণিত
হইবে।

এই অতি সঙ্গত ও সময়োচিত প্রচেষ্টাটি সকলেরই সমর্থন পাইবার
যোগ্য। সংস্কৃত একটি সর্বভারতীয় ভাষা এবং ইহা আন্তর্জাতিক
বীজ্জি লাভ করিয়াছে। সংস্কৃতকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ
করিলে কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা অঞ্চলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান
হইবে না।

সংস্কৃতকে অন্ততম সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত—
সংস্কৃত কমিশনের এই অত্যন্ত মূল্যবান সুপারিশের ভিত্তিতে এই বিল
আনয়ন করা হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার ঐক্য সম্পাদন ক্ষমতা যথেষ্ট থাকায়, যে ভেদবুদ্ধি-মূলক মনোভাব ও ভাষাগত সঙ্কীর্ণতা ভারতের জাতীয় ঐক্যকে বিপর্যয় করিবার উপক্রম করিয়াছে, প্রস্তাবিত সংশোধনটি নিঃসন্দেহে তাহারোধ করিতে পারিবে। উপরন্তু উহা দ্বারা ভারতের সকল আঞ্চলিক ভাষাও সমৃদ্ধতর হইবে।

স্বাঃ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

স্বাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত

স্বাঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ

স্বাঃ ঋষীন্দ্র নাথ সরকার

স্বাঃ প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাঃ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

National Language of India

[Prof. Ahi Bhushan Bhattacharya M. A.,
Varanasi]

Ever since the achievement of independence of India, the question of a National Language or Languages has been exercising the minds not only of those in charge of the administration, but

also of all the thinking people. It was rightly decided after mature deliberation and discussions in the Constituent Assembly that English should be replaced by an Indian Language, but the change should be effected progressively. After much discussion of the merits of the different Indian Languages, it was decided that Hindi in Devanagari script should be the Lingua Indica in Independent India. Claims of various other Indian languages were also put forward very ably by some of the members, e g. that of Bengali by no less a scholar than Mahamahopadhyaya Dr. P. V. Kane, the then Vice-Chancellor of the Bombay University, and Sri Naziruddin Ahmed, and Sri S. C. Samanta who waxed eloquent on the richness of that language while they spoke before the Constituent Assembly which listened to their brilliant and cogent pleading with rapt attention. Practical considerations, however, urged the powers that be to adopt a language which in some form or other is generally understood or used by a majority of the population, specially of the northern States of India, the stronghold of the ruling party.

It has been meet and proper to adopt some Indian language as the National Language of the land, since by no canons of justice can English be retained as the National Language, though it will still play a very important role in the domain of cultural progress and inter-state communication for a longer time than visualised. But the question

now vitally affects the growth of resurgent Bharat whether she should have only one National language or more. This vast sub-continent of ours has ever been a land of diverse languages, diverse cultures and customs fused into one indivisible whole. It has always been a multi-lingual country, with centrifugal forces tending to tear the compactness of its culture to tatters, foiled only by the cohesion and unity effected by the one and self-same culture, tradition and language among the people far removed from one another on the physical plane. It has been the Sanskrit language which has been the bridge and plank between the people of the different and distant provinces of India from time immemorial, and it is that language which has lent them solace in their grief and joy in their happiness.

The Constitution of India has adopted Hindi as the only one Indian language as the National Language, but concrete facts have shown that it may give rise to unnecessary bitterness among people and States where Hindi is not the regional language. For that matter, any other regional language also will meet the same opposition and repugnance to a very large population of other regions, and the adoption of one regional language to the exclusion of others will strike at the very root of the fundamental unity of the land which requires the greatest care for its preservation and strengthening, particularly at the present time.

when foreign aggression is battering at the very gates of India.

It will appear therefore, that, as necessity would have it, India must have either a large number of National Languages or one which is universally acclaimed to embody the spirit of India, her culture, her heritage and her noble traditions. The first is not feasible as a practical proposition, as it will entail a great deal of inconvenience in various directions. The second is not only feasible but is a practical solution of the language question. If any one has to be told in one word, what the glory of India is, the choice is certain to fall on the Sanskrit Language and Literature. It is not only understood throughout the length and breadth of this vast sub-continent but, is also universally held in very high esteem by those who know it, and even by those who have not had any opportunity of mastering it. It has a strong unifying tie which has long knit together the different communities of India, throughout the ages, successfully surviving the onslaughts of various external forces. It is not without any reason that foreign scholars, such as, Weber and Windisch, Max Muller and Winternitz, Macdonell and Keith, Sylvain Levi and Burrow, T. S. Eliot and Emerson—to name only a few—had been enraptured by the wealth and diction of the Sanskrit language, the exuberance of imagination and the ennobling thoughts which mark it out

unquestionably as one of the greatest languages of the world.

That the claim of Sanskrit to be the national language of India stands on unrefutable grounds is admitted on all hands, but the question may be mooted out whether it can be used as a spoken language anew in the present day. Surely it is not spoken these days by any large population. But it is equally true that it is understood by a larger number of people in the land. People who have to utter and listen to the Sanskrit mantras throughout their lives in various religious ceremonies, have to recite Sanskrit stotras in congregational prayers in schools and colleges, and have to learn their own regional languages based very largely on Sanskrit, can very well understand Sanskrit, much better than the other regional languages. That Sanskrit can be very easy and lucid is borne out by numerous beautiful examples in Sanskrit Literature, e.g. the advice of Sukanasa in Kadambari, the advice of the preceptor to the students in the Upanishads etc., which are couched in the easiest of Sanskrit language within the grasp of the common man. The adoption of a single Indian language, Sanskrit, therefore, is sure to do away with the exigency of adopting a multitude of languages as national languages, creating confusion and difficulties. How dignified and proper it would be, when we have adopted

सत्यमेव जयते, a quotation from the Upanishad, as our national motto, to have all the ceremonial addresses and proclamations made in lucid Sanskrit, to have our pleni-potentiaries in different foreign countries to present their credentials in majestic Sanskrit, to confer the national awards with Sanads couched in beautiful Sanskrit, and to have a large volume of national work done in Sanskrit which is the veritable emblem of the glory that was India. It will be perfectly in Keeping with the prestige and position of India in the community of nations, if Sanskrit is made, along with Hindi, one of the national languages, of India.

আপনি কি জানেন ? *

ভাষা-অল্পসংখ্যক

- ১। ভারতীয় গণতন্ত্রের সংবিধান অনুসারে ভারতবাসীদের ভারতের যে-কোন ভাগে থাকিবার, বাস করিবার এবং স্বাধীনভাবে ঘাইবার অধিকারও আছে।
- ২। সংবিধানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, দেশের ঐ সকল নাগরিকদের নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি দেশের যে-কোন স্থানে থাকিয়া রক্ষা করিবার পূর্ণ অধিকার আছে।

* ভারত-সরকারের পত্র-সূচনা কার্যালয় দ্বারা প্রচারিত মূল হিন্দী হইতে বঙ্গানুবাদ।

- ৩। সরকারী বা সরকারী-সহায়তাপ্রাপ্ত কোন বিদ্যালয়ে কোনও নাগরিককে কেবল মাত্র ভাষার (বা ধর্ম, জাতি, বর্ণ প্রভৃতির) ভিত্তিতে ভর্তি করিতে অস্বীকার করা যাইবে না।
- ৪। ভাষায় (বা ধর্মে) অল্পসংখ্যকদিগের নিজেদের ইচ্ছানুসারে আপন বিদ্যালয় খুলিবার ও পরিচালনার অধিকার আছে।
- ৫। সেইরূপ, সরকারও কোন শিক্ষা-সংস্থাকে ভাষায় বা ধর্মে অল্পসংখ্যক দ্বারা পরিচালিত বলিয়া সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না।
- ৬। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি ভাষা-অল্পসংখ্যকদিগের চতুর্বিংশ অফিসার অর্থাৎ ভাষা-অল্পসংখ্যক কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন।
- ৭। এই কমিশনার ভাষা-অল্পসংখ্যকদিগের হিত-সম্বন্ধীয় সর্ব বিষয় অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।
- ৮। যাহাদের মাতৃভাষা সেই রাজ্যের বা জিলা বা তালুকের মুখ্য ভাষা হইতে ভিন্ন সেই জনসমূহকে ভাষা-অল্পসংখ্যক বোলে। (এই অল্পসংখ্যক ভাষা, সংবিধানে বর্ণিত ১৪টি ভাষার মধ্যে একটি হইতে হইবে এমন কোন আবশ্যকতা নাই)।
- ৯। সংবিধানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, প্রত্যেক রাজ্য বা রাজ্যের প্রত্যেক অধিকরণ ভাষা-অল্পসংখ্যকদিগের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই দিবেন।

আধুন, ১৩৬৭]

আপনি কি জানেন ?

প্রতিধ্বনি

৫২৩

- ১০। প্রত্যেক রাজ্য-সরকার ইহাও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, যদি কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণীতে অল্পসংখ্যক ভাষাভাষী ১০ জন ছাত্র ও সমস্ত বিদ্যালয়ে ৪০ জন ছাত্র থাকে, তাহা হইলে সেই বিদ্যালয়ে অল্পসংখ্যক ভাষা পড়ান হইবে।
- ১১। মাধ্যমিক শ্রেণীতে মাতৃভাষার শিক্ষার আরও অধিক গুরুত্ব আছে এবং অল্পসংখ্যক ভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রী তিনটি ভাষার মধ্যে একটি নিজের মাতৃভাষা লইতে পারিবে।
- ১২। ইহাও নিশ্চয় করা হইয়াছে যে, যদি কোন রাজ্য বা জিলার ৩০ প্রতি শত বা অধিক জনসংখ্যা দ্বিতীয় ভাষা বলে তাহা হইলে শাসনের দৃষ্টিতে সেই রাজ্য বা জিলাকে দ্বিভাষী মানা হইবে।
- ১৩। ভাষা-অল্পসংখ্যকদিগকে আরোও একটি অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের কোনও (আদালত ছাড়া) অধিকারীকে দেশের বা রাজ্যের যে-কোনও ভাষায় আবেদনপত্র দিতে পারিবেন, এবং সেই ভাষাটি সংবিধানে স্বীকৃত ভাষাগুলির মধ্যের একটি না হইলেও চলিবে।
- ১৪। রাজ্য-সরকারের চাকুরীতে ভর্তির জন্ত প্রার্থীকে সেই রাজ্যের নিবাসী হইবার আবশ্যকতা নাই।

প্রতিধ্বনি

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫২৪

ধৃতঃ প্রেমা

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
লিখিত সমসাময়িক পত্রাবলী]

(৫৮৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৯ই বৈশাখ, ১৩৩৩

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। আজই প্রাতে আটটায় বারাণসী হইতে কলিকাতা পৌছিয়াছি। সমস্ত দিন ছুটাহুটীর বিরাম নাই। আজই সন্ধ্যার পরেই ধানবাদ রওনা হইব। পুণ্ডরীক আশ্রমে অফুরন্ত কাজ। মঙ্গল-বাধের জল-নিকাশের পৈন ভৈরী করিতে হইবে। গাধিতে হইবে ইটেরপর ইট, মিশাইতে হইবে চুণ বালির মশলা, টানিতে হইবে বালতি-বোঝাই জল, ভিজাইতে হইবে স্তূপেরপর স্তূপ ইট। মজুর খাটিবে আর কাজ করিবে কথাটাই অকুলীন। টাকায় কুলাইলে মজুর খাটাইব, কুলাউক আর না কুলাউক, নিজে আবশ্যই খাটিব,—ইহাই সদ্ভাস্ত প্রস্তাব। পয়সার বিনিময়ে বাহারা শ্রম করে, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কাজ করিলে তাহাদের সহিত একটা একাত্মতা, এক প্রকারের আত্মীয়তা সৃষ্টি হইয়া যায়। ঋণভঙ্গুর এই মনুষ্য-জীবনে ইহা এক পরম গৌরবের বস্তু। এক কাজ বাহারা থাকে, তাহাদের মধ্যে সমমগ্নিতা, সমধর্মিতাও আসিয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে লইয়া এক হইয়া যাওয়ার ভিতরে অশেষ মুখ। লুপাই পাহাড়ের শীর্ষান মিশনারীদের দেখিয়া তুমি যেন একই ভ

আধিন, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৫২৫

পাইয়া গিয়াছ, মনে হইল। ভয় বিদ্বেষ হইতে আসে, বিদ্বেষও ভয় হইতে আসে। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা কেহ কেহ পরম প্রেমের প্রেরণায় জনসমাজে কাজ করেন। কেহ কেহ ইহার ব্যতিক্রমস্থল। তোমরা খ্রীষ্টদেবকে ভক্তি করিও, খ্রীষ্টানদেরও আপন জ্ঞান করিও, পাদ্রীদিগকে সহকর্মী মনে করিও। স্থানীয় অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছ, তাহা সত্ত্বেও ভগবান্ যীশুকে আমরা নিশ্চয়ই ভালবাসিতে পারি। ভালবাসিতে আমরা অবতার ও ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি সাধারণ লোক, সকলকেই পারি। ভালবাসিতে না পারাটা এক প্রকারের মানসিক গন্ধাঘাত। অপক্ষপাতে আমরা সকলকে ভালবাসিব, ইহাই আমাদের পণ হউক।

রিয়াং বেচারীরা লুসাই পাদ্রীদের প্ররোচনায় ভুলিয়া দলে দলে খ্রীষ্টান হইতেছে। কথাটা বড় দুঃখের সহিত লিখিয়াছ। কিন্তু রিয়াংরা সভ্যতার যে স্তরে বাস করিতেছে, তাহাতে প্ররোচনা ব্যতীত অন্য কোন আকর্ষণ ইহাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করিতে সমর্থ? ইহারা কি আদর্শের বাণী বোঝে? ইহারা কি উন্নত চিন্তার প্রভাব গ্রহণে সক্ষম? ভয় বা প্রলোভন, এই দুইটির একটি উত্তেজনা ছাড়া ইহাদের ধর্ম্মচেতনার প্রকাশ বা প্রকট কারণ আর কি থাকে সম্ভব? তোমাদের স্বধর্ম্মীদের সংস্পর্শে ইহারা কিছু কিছু আসিয়াছে কিন্তু মনসা, শীতলা আর কালীপূজা ছাড়া ইহারা আর কি বিশেষ কিছু গ্রহণ করিতে পারিয়াছে? কলেরার ভয়ে কালীপূজা করা, বসন্তের ভয়ে শীতলার আরাধনা করা আর সর্পাঘাতের ভয়ে মনসার পূজা করা কি প্রকৃত ধর্ম্মভাব বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য? তোমাদের স্বধর্ম্মীদের সংস্পর্শে যে রিয়াংরা আসিয়াছে, তাহারা তোমাদের ছুংমার্গ আর তচিবানু দেখিয়া দেখিয়া হয় দূরে সরিয়া গিয়াছে, নয় ত তোমাদের

ধর্মের উচ্চাদর্শের সহিত একেবারেই অপরিচিত রহিয়া গিয়া গুরু উপধর্ম বা অপধর্মগুলিকেই আশ্রয় করিয়াছে। হিন্দু হইয়াও ইহারা সত্য সত্য মানবরূপী দেবতা হইতে চাহিয়াছে কয় জনে ?

সুতরাং পাদ্রিদিগের দিকে দোষদৃষ্টিতে তাকাইও না। তাঁহারা দোষণীয় উপায় কিছু অবলম্বন করিয়া থাকিলেও তাহা তোমাদের অনুকরণীয় হইবে না, ইহা মনে রাখিতে হইবে। পরের দোষ দেখিয়া কি লাভ হইবে বাবা, তোমার আমার মধ্যেই ত দোষের অন্ত নাই। এই রিয়াং, কাইফং, লালং, মিকিরের ভিত্তরে তোমাকে আমাকে অবশ্যই প্রবেশ করিতে হইবে,—তবে তাহা খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রতিধ্বনী রূপে নহে। অর্থবলে বলীয়ান এই পাদ্রীরা সংঘবলেও অভুলন। তোমাদের অর্থ নাই, তবু তাদের অগ্র সম্পদের অনুসন্ধান করিতে পার, অগ্র সদৃশ্যের অনুকরণ করিতে পার। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্যের মত 'ভগবান যীশুও সমগ্র জগতের এবং অনাগত অখণ্ড কালের। যীশুর সহিত তোমাদের কোনও কলহ নাই।

তোমার ভিতরে যে পার্শ্বত্যাগ চেতনা জাগিয়াছে, তাহা তুমি সকলের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দাও। তোমার সনাতন জীর্ণ সমাজ যে সময়ে নিজের ঘরের ছেলে-মেয়েকে বহিষ্কার করিয়া দূর্বল হইয়াছে, সেই সময়ে উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে, বাহা দ্বারা শত শত অজ্ঞাত দেশের অপরিচিত নরনারী বংশানুক্রমে তোমাদের পরম আত্মীয় হইয়া তোমাদের বুকে আসিয়া মাথা রাখিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়। ইতি—

আশীর্বাদ
স্বরূপানন্দ

আধিন, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৫২৭

হরিও

পুপুনকী আশ্রম,
১১ই আষাঢ়, ১৩৬৬

(৫৮৫)

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ জানিও।

আজ সারাদিন মঙ্গলবাঁধের পৈন গাঁথিবার কাজে খাটিয়াছি, মাত্র একটার সময়ে আশ্রমে একবার খাইতে আসিয়াছিলাম। রাত্রি এগারটা পর্যন্ত পেট্রোম্যাক্স জ্বালাইয়া কাজ চলিয়াছে। কয়েক মাইল দূরে ভারত সরকারের এক নূতন লোহার কারখানা তৈরী হইতেছে, নূতন লৌহনগরী নির্মাণের কাজে দেশের সকল শ্রমজীবী আর সকল রাজমিস্ত্রী গিয়াছে চলিয়া। আমাদের ক্ষুদ্র আশ্রমটুকুর কাজ কি করিয়া হইবে, যদি নিজেরা না খাটি, ? পুপুনকীর মাটিতে প্রত্যেকটা ধূলিকণায় আমার পরিশ্রমের সাক্ষর রহিয়াছে, মঙ্গল-বাঁধে থাকিবে না ?

হাকিম মহাত্মা কয়েক জন আলকুশা হইতে আসিয়াছিল গুরুদেবের চরণ দর্শন করিতে। তাহারা আমাকে শ্রমরত দেখিয়া নিজেরাও কাজে হাত লাগাইল। রাত্রি এগারটার সময় পেট্রোম্যাক্স বাতি বিগড়াইল, কাজও বন্ধ হইল। তাহাদের অনেক বলিলাম, রাত্রে আশ্রমে থাকিয়া যাইতে। তাহারা রাজি হইল না। বলিলাম, তবে আহার করিয়া যা। বলিল, ঘরেও ত বাবা আপনারই প্রসাদ তৈরী হইয়া আছে। ছেলেগুলির শ্রম, বিনয় ও বিবেচনা আমাকে মুগ্ধ করিল। ঠিক এই জিনিষটা এদেশে এখনো দেখা যায় নাই। আজকাল অখণ্ড-নামের প্রতাপে একটু একটু করিয়া মানুষের রূপান্তর হইতেছে। বত্রিশটা বৎসর ধরিয়া এই দেশটাতে ধীরে ধীরে যে একটা

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম

[১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫২৮

অন্তঃসলিলা বিপ্লবধারা বহিয়া চলিতেছে, তাহার ইতিহাস হয়ত কখনই লিখিত হইবে না। শাকসজ্জি, তরিতরকারী উৎপাদন হইতে শুরু করিয়া ব্রহ্ম-নামের সাধন করিবার দিব্য প্রেরণা আমি ইহাদিগকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, কেবল দৃষ্টান্তের দ্বারা দিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অনেক জ্ঞানগর্ভ কথ্য কহি নাই, অনেক সভা-সমিতি করি নাই। আড়ম্বর জাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে গোটা চারি পাঁচ চিত্র-প্রদর্শনী করিয়াছি আর বিনা শুক্রে চিত্রগুলি দেখিয়া যাইবার জন্ত হাজার হাজার প্রচারপত্র দেশের আনাচে কানাচে বিতরণ করিয়াছি। আসল কাজ আমি করিয়াছি ত' গাইত চালাইয়া, কোদাল মারিয়া, শাবল ধরিয়া শক্ত মৃত্তিকার দস্ত ঘুচাইতে ঘুচাইতে। অনগ্রসর অবহেলিত এই অঞ্চলে শুধু বাগ্-বাহল্যে কাজ হইবেই বা কেন?

এতকাল ইহাদের মধ্যে দরদ দেখি নাই। আজ হাকিম মাহাতোদের মতন ছেলেদের মধ্যে দরদের উন্মেষ হইয়াছে। এই জিনিষটা তোমাদের মধ্যে কেন আসিতেছে না? প্রতিস্থানে কেন তোমাদের মধ্যে এই প্রেরণা জাগিতেছে না যে, প্রত্যেককে সপ্তাহে একটা দিন করিয়া ইহাদের আদর্শের প্রচারে, ভগবানের সেবায়, প্রভুর কাজে লাগাইতে ইহা? তোমরা দলে দলে সংখ্যায় বাড়িতেছ,—স্নেহে, প্রেমে, দরদে, ভালবাসায় তোমাদের বৃদ্ধি কেন দেখিতে পাইতেছি না? বিষয়টা চিন্তা করিয়াছ কি বাবা?

রত্নি সাড়ে বারোটায় বসিয়া চিঠিখানা লিখিতেছি কারণ বার প্রাতে ধানবাদে জীবন চিঠি ডাকে দিতে যাইবে, আর যাইবে কলিকাতার কিছু টাকা দিয়া আসিতে। ভোরে উঠিয়াই আমাকে আবার কবি ধরিতে হইবে। চণ-মশলা ভিজাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। ঘুম হইতে

আশ্বিন, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম।

প্রতিধ্বনি

৫২৯

উঠিয়া অল্প কাজে সময় নষ্ট করিতে পারিব না। তোমার নানা কথা লেখা পত্রখানাও পাইলাম আজই।

ভাবিয়া দেখ বাবা, দীক্ষা নিয়াছ, তবু অন্তরে প্রেম আসে না কেন? দীক্ষা ত নবজন্ম! দীক্ষা ত জীবন-ধারণার রূপান্তর! দীক্ষা ত অন্তরের চিরপুরাতন সকল সংস্কারের নব রূপায়ন! দীক্ষা হইল, তবু প্রেমিক হইলে না। বল, কেন ইহা হইল?

প্রেমস্বরূপের নাম-সাধনা ছাড়া কেবল intellectual horse-race (বুদ্ধির ঘোরদৌড়) এ প্রেম আসে না। সদগ্রন্থ পড় কিন্তু নাম-সাধন কর না, তাই গ্রন্থনিচয়ের অন্তর্নিহিত সত্য তোমাদের জীবনে অপরূপ মাধুর্য্যে বিকশিত, রূপায়িত, প্রতিফলিত হইয়া উঠে না। তাই বলি, বাবা, যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিতণ্ডা কমাইয়া দিয়া এক মনে এক প্রাণে কিছু দিন সাধন কর। সাধন করিতে করিতে প্রেম-পারাবারের অতল তলে নামিয়া যাও। সাধনের বলে ব্যক্তিত্বের অহমিকাকে ঈশ্বর-প্রীতিমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগের বেদীমূলে বলি দিতে সমর্থ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮৬)

হরি-ও

পুপুন্য আশ্রম

১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি ও সংহিতা নানাহার সারিয়া বসিয়া আছি। জরুরী

প্রতিধ্বনি

ধ্বং প্রেরণা

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫৩০

প্রয়োজনে কলিকাতা যাইতে হইবে। ধানবাদ হইতে এখনও ট্যাক্সিটো আসিয়া পৌছে নাই। এই ফাঁকে বসিয়া পত্রখানা লিখিলাম। আশা করি, সময় মত পাইয়া যাইবে।

মঙ্গলবাধ আমাদের আর্থিক সামর্থের তুলনায় অতি বিরাট জলাশয় হইয়াছে। এবার তাহার জলধারণের স্থান এতটা বাড়িল যে, ইহার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমার মনে আশঙ্কা আসিয়াছে। তাই জল বিপুল ভাবে নিকাশ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থায় এই কয়টা দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া পরিশ্রম করিলাম। বলা যায় না, কলিকাতা পৌছিতে না পৌছিতে হয়ত সংবাদ পাইব, বিল্ডাট একটা কিছু ঘটয়া গিয়াছে। বড় সাফল্যের বড় বিপত্তি। একটা কিছু হুঃসংবাদের জ্ঞাত তৈরী হইয়াই আশ্রমটা ছাড়িতে হইল। কলিকাতায় এমনই কাজের গুরুত্ব যে, থাকা গেল না। অথচ আবার দুদিন পরেই এখানে আসিতে হইবে।

এমন বাস্তবতার মধ্যে তোমাদের প্রতি জনের প্রত্যেকখানা পত্রের কেন জবাব দেই না, ইহা নিয়া কি বাবা এত অভিমান করিতে আছে? আমিও ত সঙ্গত ভাবেই অভিমান করিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে ব্যক্তি-চেতনার খর্ব্বতাসাধন হইতেছে না, তোমরা নিজেকেই লইয়া প্রতি জনে ব্যস্ত-বিব্রত রহিয়াছ, জগতের দশ জনের কথা তোমাদের মনে জাগিতেছে না। সাময়িক প্রয়োজনকেই তোমরা পরম ও চরম জ্ঞান করিয়া শাস্ত্র প্রয়োজনের দাবীর প্রতি অন্ধ হইয়া রহিয়াছ। বল, আমি ইহার জ্ঞাত তোমাদের প্রতি অভিমান করিতে পারি কিনা?

আরও এক কথা। প্রতিটি মুহূর্ত্ত সময়কে কাজে লাগাইতে হইবে, এই পণ তোমাদের মধ্যে আসিতেছে না। যতটুকু করিতেছ কাজ, বিশ্রাম বা আরাম তাহার চাইতে তোমরা অনেক অধিক দাবী

করিতেছ। যতটুকু করিতেছ সাধনা, তাহার দশগুণ বিশগুণ সিদ্ধি তোমরা পাইতে চাহ। এই যে সহজেই সব কিছু হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা, তাহা তোমাদের কোনও কালেই কোন হিত-সাধন করিবে না। তাই বলি, তোমরা কঠিন দুঃখের জন্ত, কঠোর সাধনার জন্ত, দুর্দান্ত তপস্যার জন্ত প্রস্তুত হও। ফাঁকতালে কাজ সাধিয়া নিবার বুদ্ধি কি তোমাদের সাজে, বাহাদের উপরে আশা করিয়া আছে জগতের অগণিত অনাগত মানবকুল?

সর্বত্র তোমরা সহজে কেলা ফতে করিতে চাহ, এই জন্তই সর্বত্র তোমরা সহজেই পরাভূত হও। দ্রুগম অরণ্যে প্রবেশের চেষ্টা নাই, নরমাংসাশী মানবকুলের সমাজে গিয়া আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা নাই, যেখানে সহজে কাজ করিবার সুযোগ মিলিল, সেখানেই গিয়া ঘর বাঁধিলে, জমি তৈরী করিলে। যত সহজে কিস্তিমাৎ করিয়াছ, মানুষের জীব্যা জন্মিবে তত সহজে, দলবদ্ধ বিরুদ্ধতার মুখে তোমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে দুইটি দিনে। পৃথিবী খুঁজিয়া বাহির কর, সব চেয়ে দুর্ভাগ্যস্থান কোথায়। একবার গিয়া যেন ইচ্ছা করিলেও ফিরিয়া আশা না যায়। জুলিয়াস সীজার ইংলণ্ডের উপকূলে নামিয়া সঙ্গে সঙ্গে সবগুলি জাহাজ দগ্ধ করিলেন, উদ্দেশ্য তার সৈন্তদল যেন বিষ দেখিয়া আবার রোমে ফিরিয়া যাইবার উপায় না পায়। এইরূপ পৌরুষকে তোমরা আশ্রয় কর। ছল-চাতুরী-কৌশল নহে, দৃষ্ট পুরুষকারকে তোমরা আশ্রয় কর। পলায়ন নহে, যুদ্ধদিয়া নিশ্চিহ্ন হইবার সঙ্কল্প কর। ইতিহাস কাপুরুষকে ক্ষমা করে না, চিত্ত-বর্জিত অস্থির-মতি নিত্যচঞ্চলকেও নহে। সঙ্কল্পে দৃঢ় হও, মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়া জয়োল্লাসের আনন্দ লও।

প্রেমবলে বলীয়ান হইয়া তোমরা জীবনের উন্নতিবাধক রিপুগুলিকে
বিনাশ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাক

অরুণানন্দ

(৫৮৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩১৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ
জানিও।

গোটা পৃথিবীটা জুড়িয়াই কলির প্রতাপ চলিয়াছে। রাজা প্রজা
সকলেই চুরি করিয়া ধরা না পড়াকে বাহাদুরী এবং চুরির ফলে লব
বস্তুকে অপাথব সার বলিয়া মনে করিতেছে। যে যত অধিক প্রবঞ্চনা
করিতে সমর্থ, সে নিজেকে তত বিজ্ঞ মনে করিতেছে। এমন অবস্থার
সততা রাখিয়া কাজ করা সত্যই শক্ত। কিন্তু তৎসঙ্গেও তোমাকে
সততাই অনুশীলন করিতে হইবে, অপরকে প্রবঞ্চনা করিয়া চলিবার
অভ্যাস বর্জন করিতে হইতে।

আমরা নিজের লোককে কি কখনও প্রতারণা করি? করি না
নিজের লোককে প্রতারণা করা আর নিজেকে প্রতারণা করা এক
কথা। তাই করি না। আমরা যদি দেশ-জোড়া সকল লোককে
আপনার জন বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে এক জনকেও প্রতারণা
করা আমাদের সাধ্য হয় না। তাই এস, চারিদিকের প্রেতভাঙের
মধ্যেও সকলকে ভালবাসিবারই সাধনা আমরা করি। ভালবাসিবার

না বলিয়াই ত আমরা চাউলের মধ্যে কাঁকর মিশাইলাম, ঘূতের মধ্যে চর্বি ভেজাল দিলাম, আটার মধ্যে তেঁতুল বীজের গুঁড়া ঢালিলাম। ভালবাসিলাম না বলিয়াই আমরা দলের স্বার্থের কাছে দেশের কল্যাণকে বলি দেই, ক্রণস্থায়ী বশের লোভে চিরস্থায়ী কলঙ্কে ঘাচিয়া নই, মুখে বড় বড় বুলি আঙড়াইয়া চরিত্রের দুর্বলতাকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করি, নিজেদের কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব শৈশবশাসনকে মূর্থ ও অন্ধ জনগণের উপরে চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলি যে, আমরা তাহাদের শোষণ করিতে আসি নাই, আসিয়াছি উদ্ধার করিতে। ভালবাসিলাম না বলিয়াই উৎপীড়িতকে আমরা স্তোকবাক্যে বিগলিত করিতে চাহি, উৎপীড়ককে প্রশ্রয় দিয়া তাহার অত্মায়কে লোকচক্ষের অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করি, সত্য প্রকাশ পাইবে আশঙ্কার দরিদ্রের আর্তনাদকে আত্ম-প্রচারের ঢঙ্কানিনাদে ডুবাইয়া দেই, সুধাস্তকে আমরা সুর্বোদয় বলিয়া অভিনন্দন করি, স্বদেশের স্বজাতির প্রকৃত ইতিহাসকে আমরা বিকৃত করিয়া নিজেদিগকে দিকৃত করি। যত কিছু হৃদৈষ্ঠ আমাদের চরিত্রকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে, সব কিছুর মূল ঐ প্রেমের অভাব।

তোমরা জীবে জীবে প্রেমের অনুশীলন বাড়াইবার জন্ত আগ্রহী হইয়াছ জানিয়া আমার আনন্দের অবধি নাই। আশীর্বাদ করি জয়ী হও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮৮)

হরি-ও

কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেযু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশির জানিও।

দীক্ষা নিবার পরেও সাধনে অমনোযোগী থাকা খুব লাভজনক ব্যাপার নহে। সাধন না করার দরুণ তোমাদের মধ্যে অনেক সম্ভাব্য সদগুণ প্রকাশ পাইতে চাহিয়াও প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। তুমি যে কতখানি সদগুণের আধার, তাহা সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নাই বলিয়াই নিজেকে একান্তই আস্তাকুড়ের জিনিষ বলিয়া ভ্রম করিতে পারিতেছ এবং তাহারই জন্ত তোমার সাধনে অগ্রগতি বর্ধিত হইতেছে না। সাধন কর এবং ভিতরের শক্তিকে প্রকটিত, বিকশিত, বিস্তারিত করিয়া তোল। তোমার অতিশয় সহজ-সম্ভাব্য সদগুণগুলিও তোমার আশে পাশে উকিঝুঁকি মারিয়াই চলিয়া যাইতেছে, স্থায়ী হইতেছে না, কেবল তোমার সাধনে অগ্রগতি নাই বলিয়া। বিনা সাধনে কাহারও ভিতরে শক্তি জাগে না। ভাল করিয়া শুছাইয়া দশজনের মনোস্তর করিয়া কথা বলিতে পারাকেই তোমরা সাধারণতঃ শক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া থাক। কথার পাশোয়ান জগতে কতই আছে, কিন্তু আসল শক্তিধরই বিরল। বাগ্জাল বিস্তারকেই তোমরা শক্তির পরিচয় বলিয়া মনে কর, কিন্তু প্রাকৃত শক্তির প্রকৃতি

আখিন, ১৩৬৭]

ধৃতং ধেন্না

প্রতিধ্বনি

৫৩৫

অরুণ। সেই শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার কাজে তোমাদের অবহিত হইতে হইবে। সাধনই সেই পরমবলাবহ কাজ। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮০)

হরি-ও

কলিকাতা

১২শে আষাঢ়, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাঠিয়া সুখী হইয়াছি। আশীর্বাদ করি, তোমার অন্তরের সকল শুদ্ধ কামনা মঙ্গলময় পূরণ করুন।

হরিনাম করিয়া ভুবনময় আনন্দ পরিবেশন করা মতাই পুণ্য কাজ। আমার প্রেরিত কর্ম্মাটীর সহিত মৃদঙ্গবাদন করিয়া তুমি সেই পুণ্যকে বিস্তার সহযোগ। তোমারও পুণ্য কম নহে। শুদ্ধ ভাবে নাম-কীর্তনের ওসমবেত উপাসনার স্বর শিখিয়া অত্ৰকে তাহা শিখান বড়ই মহৎ কাজ। ইহার মধ্যে যদি না থাকে কোন গুপ্ত স্বার্থসাধনের লিপ্সা, তবে জানিত্ত, ইহার মতন ভাল কাজ আর কিছু হইতে পারে না। কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্ত কেহ কিছু নিয়া যদি এই পুণ্য কাজ করে, তবে আমি তাহাকেও নিন্দা করি না। তবে এই গ্রহণটা কোনও সংপ্রতিষ্ঠানের কাছে হওয়াই ভাল, সকলের কাছে নহে। জনৈক জনৈক কাছে হাত পাতিতে গেলে মন ছোট হইয়া যায়, লোভ বাড়ে, ধন-পিপাসা মনকে বেড়িয়া ধরে। তোমাকে আমি কখনও দেখিয়াছি বলিয়া

মনে হয় না কিন্তু তুমি আমার প্রেরিত কর্মীটির সহিত কাজ করিয়া আমার আপন হইয়াছ। তাই তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে ভগবানের নামপ্রচারকার্য হইতে সকল প্রকার আর্থিক সংশ্রবকে দূরে রাখিতে চেষ্টা পাইও। তাহা হইলে লোকের ভিতরে কাজ বেশী করিতে পারিবে। যাক্সার মতন হীনতা আর কিছুতে নাই।

আর্থিক সংশ্রব মনকে অনেক সময়েই মলিন করে বলিয়া পূর্বা-
চাৰ্য্যেরা তারশ্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, অর্থমনর্থম্। জগতে অর্থের
প্রয়োজন নাই, তাহা নহে। অর্থের সদ্যবহার করিতে যে পারে, তাহার
অর্থের দ্বারা জগতের হিত হয়, আধ্যাত্মিক কুশলও হওয়া সম্ভব নহে
কিন্তু অর্থাগম আস্তে আস্তে মানুষকে পিশাচ করিয়া ছাড়ে। সামান্য
পাইয়া আরও একটু বেশী পাইবার লোভ যায়, বেশী পাইয়া আরও
বেশী পাইবার জন্ত প্রাণে আকৃতি জন্মে। এইভাবে বাড়িতে বাড়িতে
অর্থলোভ সীমা ছাড়াইয়া যায়। সঞ্চয় করিয়া রাখা যায় বলিয়াই
অর্থের জন্ত এত দুর্নিবার লোভ। এই কারণেই সাধুরা সঞ্চয়কেও পাপ
বলিয়াছেন। বর্তমান যুগে সঞ্চয়কে তেমন করিয়া নিন্দা করা হয় না,
কারণ অনেক সংকাজই আজকাল প্রভূত অর্থ-সাপেক্ষ ব্যাপার। সঞ্চয়
না করিতে শিখিলে সংকাজ করিবার জন্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ
অনেকের পক্ষেই সংগ্রহ করা কঠিন। এই কারণে অনেক নিষ্কর
সাধুও সহদেহে সঞ্চয় করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সঞ্চয়ের স্বাভাবিক
দোষগুলির দ্বারা অভিভূতও হইয়া যান। আমার মতে, ভিক্ষার দ্বারা
যিনি জীবিকা সংস্থান করেন না, তিনি দরকার হইলে সঞ্চয় করিয়া
তাহা দোষাবহ নাও হইতে পারে। কিন্তু ভিক্ষাই ধার্য জীবিকা
তাঁহার পক্ষে সঞ্চয় নিশ্চয়ই অপরাধ। জীবন ধারণের জন্ত ভিক্ষার

আখিন, ১৩৬৭]

ধ্বং প্রেম।

প্রতিধ্বনি

৫৩৭

বে আধ্যাত্মিক কোলীন্দ্ৰ দেওয়া হইয়াছে, তাহার দক্ষণই ভিক্ষাজীবীর
স্বল্প দোষাবহ ব্যাপার।

তুমি এতদিন স্থানে স্থানে যাইয়া ভগবানের নামপ্রচার করিয়াছ।
ইহাতে অনেক লোকের মনে ভগবদভক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা নিশ্চিত।
কিন্তু তোমার নিজের ভক্তি বাড়িয়াছে কিনা, তাহা তোমাকে হিসাব
করিয়া বাহির করিতে হইবে। ভক্তি যখন বাড়ে, তখন অহমিকা
কমে, লোভ, লালসা ও পাপপ্রবৃত্তি কমে, অস্ত্রের অহিতাকাঙ্ক্ষা দমিত
হয়, পরের উপকারের মধ্য দিয়া নিজের জীবনকে সার্থক করিবার জ্ঞান
নিঃস্বার্থ প্রেরণা জাগে। এই সকল লক্ষণ দিয়া নিজেকে মিলাইয়া লও।
বহিঃদেখিতে পাও যে, এই সকল অবস্থা তোমাতে আসিয়াছে, তাহা
হইলে মনে মনে জানিয়া নিও যে, লোকের মধ্যে ভগবানের নামপ্রচার
করিতে যাওয়া তোমার সার্থকই হইয়াছে। নতুবা ইহা একপ্রকার পণ্ড-
শমে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নিজের ভিতরে অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাইলে
হমিয়া বাইও না; ভগবানের শরণাপন্ন হইও, যেন তিনি তোমার
অসম্পূর্ণতা দূর করেন।

তোমার পত্রের বিনয়ে আমি অভিভূত হইয়াছি। তবে ইহা
তোমার যেন আন্তরিক বিনয় হয়। অনেক সময়ে আমরা মুখের ভাষায়
খুব সুন্দর সুন্দর বচন বলিয়া থাকি, যাহার সহিত নিজেদের চিন্তাবস্থার
কোনও যোগাযোগই নাই। ভাল ভাল কথা বলিবার ও শুনিবার
অভ্যাস হইতে এই জাতীয় বচনচাতুরী আমাদের আসিয়া থাকে।
অস্ত্রের বিনয় দর্শনে যেন আমরা তাহার অন্তরের বিনয়কেই অনুসরণ
করিতে চেষ্টা করি, তাহার মুখের ভাষাটুকুকেই নহে।

এস আমরা নিয়ত ভগবানের চরণে প্রার্থনা প্রেরণ করি—“হে
ভগবান, জগতের প্রতিটি প্রাণীর সহিত আমাদের আপনাতত্ত্ব সম্বন্ধ

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫৩৮

উপলব্ধ হউক, আমরা যেন কাহারও কাছ হইতে দূরে না থাকি, কাহারও যেন পর হইয়া না রহি। পর হইয়া থাকার মধ্যে যে কত দুঃখ, তাহা তুমি আমাদের বুঝাইয়া দাও আর পাওয়াইয়া দাও সেই অনির্বচনীয় দিব্য স্মৃতির আশ্বাদন, যাহা সকলকে আপন করিবার মধ্য দিয়াই আসে।” ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৫৫

পরমকল্যাণভাজিনীষু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশির্বাদ জানিও।

স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা সংসারে কাহাকেও না কাহাকে দিতেই হয়। ইহা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। যাহাকেই যাহা দাও, তাহাই যদি তাহারই মধ্য দিয়া ভগবানে প্রসারিত ও প্রবাহিত হইয়া যায়, তবে এই স্নেহ-ভালবাসা আদি আর মনোবর্ধনের অপবাদ পায় না, জীবনকে সৌম্যবদ্ধতায় আটক করিয়া ধরে না। নামে মনোগ্রাণ ডুবাঁইয়া রাখিয়া সংসারের স্বাভাবিক কর্তব্যগুলি অকুণ্ঠিত ভাবে পালন করিয়া যাও আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাই খেয়ালে রাখ যে, এই দুই সংসার বৃহত্তর সংসারেরই ভূমিকা মাত্র। ক্ষুদ্র সংসারটুকুই তোমার জীবনের শেষ কথা নহে। সংসারের প্রতিজনকে ভালবাসিয়াও, প্রতি

আখিন, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম।

প্রতিধ্বনি

৫৩৯

জনকে তাহাদের যথাযোগ্য প্রাপ্য দিয়াও তোমাকে ভগবানের দিকেই
 অগ্রসর হইতে হইবে। সন্তান-স্নেহের মধ্য দিয়াও ভগবানেই গিয়া
 পৌছিতে হইবে, পতি-প্রেমের মধ্য দিয়াও ঐ একটী মাত্রই গন্তব্য
 স্থানে যাইতে হইবে। দয়া-মায়া-মমতার অনুশীলনের মধ্য দিয়া, এমন
 কি ভিখারীকে এক মুষ্টি চাউল দিবার কালেও, ইহাই ভাবিতে হইবে
 যে, তোমার সকল সমর্পণ ঐ একটী স্থানেই যাইয়া পৌছিতেছে।
 গুরুজনদের দাবী সেবা আর আনুগত্য, স্বামীর দাবী সর্বতোভাবে আত্ম-
 সমর্পণ,—এ সবার ভিতর দিয়াও সেই পরমপ্রেমাধার শ্রীভগবানেই
 তোমার অভিধান। একথা নিমেষের তরেও ভুলিও না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯১)

ইতি-ও

কলিকাতা

পরমকল্যাণীয়েষু :—

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৬

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস
 জানিও।

যতই সঙ্কটে পড়িয়া থাক না কেন, ভগবানকে ভুলিও না। বরং
 মনে রাখিও যে, সঙ্কটকালে ভগবানের নামই পরমাশ্রয়। সর্বদা মনে
 রাখিও যে, তোমার জীবন ভগবানেরই সেবার জন্ত। সুতরাং সঙ্কটে
 আর সম্পদে সর্বদা সর্বাবস্থায় তোমার সর্বপ্রধান কর্তব্যই হইল
 ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া যাওয়া। সংসারের সহস্র ছাঃ

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্য

[১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫৪০

ভগবানের তৃপ্তি-তৃষ্টির জন্তু করিয়া যাইতেছ বলিয়া মনে রাখিও।
 ভক্তিযোগে ভগবানের নামসেবন করিও আর কর্মযোগে তাঁহার সেবার
 উদ্দেশ্যে সর্ববিধ অধ্যবসায়কে পরিচালিত করিও। চতুর্দিকে বিঘ্ন
 ও উন্মনা যাহাদের দেখিতেছ, ইহারা অনেকেই ভগবানকে ডাকিতে
 জানে না বলিয়া নিজেদের জীবনের অতি সাধারণ সমস্তকে
 অসাধারণত্ব দিয়া দুঃখে ধুকিয়া মরিতেছে। ইহাদের পরিত্রাণের জন্ত
 ইহাদের মনকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টাও তোমার পথ
 কর্তব্য। তোমার চেষ্টায় যদি একটি অসাধকও সাধনে রুচিদম্পন্ন
 হয়, তবে জানিবে, ইহা তোমার জীবনের এক মহতী কীর্তি। অবশ্য,
 মানুষকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করিবার নাম করিয়া তাহাদিগকে
 নিত্য নূতন অন্ধ কুসংস্কারের দাসত্বে আনিয়া বাঁধার আয়োজন বৈ
 তোমার দ্বারা না হয়। ইতি—

আশীর্বাদ

স্বরূপানন্দ

(৫১২)

হরি-ও

পুপুনী আশ্রম

২৩শে ভাদ্র, ১৩৩৬

পরমকল্যাণভাজনেষুঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাহারও বাড়ীতে বা ব্যবসায়ে চাকুরী করিতে গিয়া ইহা কখনো

আশা করিও না যে তুমি সদ্যবহার পাইবেই পাইবে। হয়ত অনেক

স্থানে সদ্যবহার পাইবারই সম্ভাবনা শত-করা আশি ভাগ, ৭৫

সেখানে বিপরীত ব্যাপারের জন্তই তৈরী হইয়া থাকিও এবং নিজে

আগ্নি, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৫৪১

মহুয়াত্বকে খর্ব না করিয়া যতটা উৎপীড়ন সহ করা যায়, তাহা অকুণ্ঠিত
 প্রাণে সহ করিও। তাহা না হইলে তোমার যাহা আয়ত্ত করিবার
 দরকার, তাহা অধিগত করিতে পারিবে না। কচ দৈত্যগুরুর গৃহে
 মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিতে গিয়া বারংবার প্রাণহানিকর অবস্থায় উপনীত
 হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি কাহারও উপরে ক্রুদ্ধ হন নাই, নীরবে
 সকল অত্যাচার সহ করিয়াও আসল কাজটা হাসিল করিবার জন্ত
 শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন। ফল হইল এই যে, তিনি যাহা চাহিতে-
 ছিলেন, পরম দুর্লভ হইলেও তাহা পাইলেন। ইহা হইতে তোমরা
 শিক্ষা গ্রহণ করিও। তোমাকে যে অশেষ উৎপীড়ন ও অত্যাচার বাবহার
 সহ করিয়া চাকুরীর স্থানাটী ত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহাতে
 আমি দুঃখিত। কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াইতে পারিবার
 মতন যোগ্যতা অর্জন করিবার আগ পর্য্যন্ত তোমাদের মতন বেকারদের
 দুঃখ সহ করা ব্যতীত গতান্তর কি? মনিবশ্রেণীর অত্যাচারকে দমন
 করিবার জন্ত আধুনিক সভ্যতা যে অস্ত্র নিষ্কাণ করিয়াছে, তাহা কেবল
 সেই স্থানেই ফলপ্রসূ, যেখানে বহু কর্মচারী খাটে এবং তাহারা
 নিজেদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন গড়িয়া তুলিয়াছে। একক একটা লোক
 যেখানে মনিবের কাজে খাটে, সেখানে তাহার সেই সামর্থ্য কোথায়?
 তাই যেখানেই তোমাকে চাকুরী করিতে যখনই যাইতে হউক, সর্বদা
 লক্ষ্য রাখিবে যেন অশেষ অস্ত্রবিধার মধ্য দিয়াও তুমি তোমার
 যোগ্যতাকে বাড়াইয়া তুলিতে পার। একটা কথা খুব বিশ্বাস করিও
 যে, যোগ্যতা যাহার আছে, তাহার পক্ষে কেবলই অনাহারে দিন
 কাটাইতে হয় না। যোগ্যতা সঞ্চয় না করিয়া চাকুরি করিতে গেলে বা
 চাকুরি করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের যোগ্যতা ক্ষমশঃ বাড়াইতে না
 পারিলে কে কবে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? দেশের শাসন-

ব্যবস্থায় শত ক্রটি থাকিতে পারে, মনিবদের অশেষ দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার যদি যোগ্যতা না থাকে, তবে এই সকল সংশোধিত হইলেও তোমার কি লাভ হইবে? বাধা আছে বলিয়াই ত তোমার তাহা ভাঙ্গিবার জ্ঞান চেষ্টা করা উচিত। তোমার যোগ্যতা থাকিলে তাহা তুমি পারিবে।

তোমার পত্রে তুমি উঃখ করিয়াছ যে, চাকুরি ছাড়িয়া দেশে আসিয়া সমাজের মঙ্গল-কাজে আত্মদান করিতে গিয়া দেখিলে যে এখানেও শান্তি নাই, তোমার নির্বিরোধ সমাজ-মিত্রতার শত্রু হইল কিনা তোমারই আপনার-জনদেরই কাহারও কাহারও মনের তীব্র ভাব ও চিন্তের তীর্থক গতি। তোমার কথা আমি বুঝিয়াছি। জগৎ ভরিয়াই ইহা হইতেছে। ইহা দেখিয়া বিচলিত হইলে চলিবে না। এই সকল সত্ত্বেও তোমাকে কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। মনে রাখিও, সাফল্যই কর্মযোগীর কাছে বড় কথা নহে, অবিরাম অবিশ্রাম অনবস্র প্রযত্নে নিরুদ্বেগ চিন্তে সকল বিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া সকল আত্ম-অনাচারের বিরুদ্ধতা, হাসি-ঠাট্টা-টিটিকারী অগ্রাহ করিয়া কাজ করিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে বড় কথা। তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিয়া যাও। তোমার আপনার জনদের মধ্যে যদি দেখ কপটতা, তাহা হইলে 'বাহিরের লোকদের মধ্যে গিয়া কাজ কর। কপটতা আসে বশোলোভ হইতে। বাহারা এতই দীন যে নামমশের লোভ করিতে সাহসও পায় না, কাজ করিবার জ্ঞান তাহাদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়। বাহারা দেশে ও সমাজে অবজ্ঞাত, তাহাদের মধ্যে কাজ শুরু কর। কাহারও উপরে ক্রোধ, অভিমান, অনুযোগ, বিদ্বেষ না রাখিয়া নিজের মনে একাকীই কাজ করিয়া যাও। তোমার কাজই তোমার জীবী কর্মক্ষেত্রে তৈরী করিয়া দিবে।

আধুনিক, ১৩৬৭]

দ্বিতীয় প্রেরণা

প্রতিধ্বনি

৫৪৩

পুণ্যকালে মঙ্গলবাধের মেরামতের জন্ত কি কি ব্যবস্থা করা দরকার, তাহার আয়োজনে বড়ই ব্যস্ত আছি। কিন্তু কয়টা দিন ধরিয়া এমনই বৃষ্টি চলিতেছে যে, কি বলিব। বৃষ্টির দরুণ বাহিরের শ্রমিকদের আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সকল কাজ স্থগিতপ্রায় হইয়া আছে। সবাই পরিষ্কার আকাশের আশায় দিন গণিতেছে। তবে বৃষ্টিতে ভিজিয়া যেটুকু কাজ করা যায়, তাহাতে আমাদের নিজেদের বিরাম নাই। তাই বেশী ব্যস্ত। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২৩)

হরি-ও

পুণ্যকৌ আশ্রম,

২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।
 জীবনটাকে প্রেমের সাধন করিয়া লও। জীবনটা না থাকিলে
 কিসের সহায়তায় প্রেমালুশীলন করিবে? প্রেমই নিত্য, সত্য ও শাস্ত
 মন্দের বস্তু। তাহাকে অনুশীলন করিয়া যাইবার মধ্যেই জীবনের
 মার্গতা। যে জীবন প্রেমহীন, তাহা মরণেরই নামান্তর। ভাল-
 বাসাই বাচিয়া থাকা, না ভালবাসিতে পারাই মরিয়া যাওয়া। ভাল-
 বাগঠি ভগবানকে পাওয়া, ভালবাসিতে না পারাই ভগবান হইতে দূরে
 সরিয়া যাওয়া। এক হ্রগম হ্রস্বগম্য অঞ্চলে তোমাকে ভগবান
 পাঠাইয়াছিলেন প্রেমেরই অনুশীলন ও বিস্তারের জন্ত, তাহা অপেক্ষাও
 হ্রস্বতর স্থানে তিনি এখন একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই তোমাকে

আনিয়াছেন। ধর্ম্মনগরে অখিল বাবু বিভাগীয় শাসক এবং তোমার গুরুভ্রাতা প্রকুল্ল থানা-অফিসার থাকাকালে আমি এই দুর্গম স্থানটাতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমি সকল রকমে প্রায় প্রস্তুত হইয়াছিলাম। তখন সেখানে পালে পালে হাতী বিচরণ করিত মহম্মদ হইয়া, বাঘ ও বহু শূকর পথে পড়িত, আর সভাবর্জিত আদিম অধিবাসীরা হিংস্রতার চূড়ান্ত সীমায় ছিল। আজ তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাস্তাঘাট হইতেছে, মানুষের যাতায়াত বাড়িয়াছে, অসভ্যরা আগের চেয়ে কতকটা সুসভ্য হইয়াছে, রাজ্যের শাসনক্ষমতা সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিস্তারিত হইয়াছে।

আদিম বর্করতায় যাহারা নিমজ্জিত ছিল, তাহাদের আংশিক পরিবর্তনের জন্য আমরা খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক মিশনারীদের নিশ্চয়ই প্রশংসা করিব। কিন্তু ইহাদের প্রচার সকল সময়েই সাধুপথে চলে নাই, কখনো কখনো ইহারা আশ্রয় লইয়াছেন ছল-চাতুরী ও অন্তর কৌশলের। মাত্র এইটুকু ছাড়া অথ কিছুতে সেই অঞ্চলের খ্রীষ্টান মিশনারীদের সহিত আমাদের কোনও মতবৈধের কারণ নাই। তাহারা যাহাদিগকে সভ্যতা ও ধর্ম্ম দিয়াছেন, তাহাদিগকে প্রভু বীজ চরণ হইতে ছিনাইয়া আনার চেষ্টায় আমি কোনও সার্বকর্তা দেখিতেছি না।

কিন্তু সম্প্রতি যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে দৈব-দুর্বিপাকে একটা অজন্মা হইলে তাহারই জন্য যেন এই সামান্য ভদ্রলোকেরা ওং পাতিয়া বসিয়া থাকেন। সামান্য কিছু টাকা ধার দিয়া বা দান করিয়া দলে দলে লোককে খ্রীষ্টান করিয়া লন। এই জাতীয় অত্যায়ে ধর্ম্মপ্রচার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহা

দস্তুর মতন একটা চাতুরীপূর্ণ অবৈধ প্রয়াস। ইহাকে বাধা দিতে হইবে।

কিন্তু কলহ বা সংঘর্ষের মধ্যে যাইয়া বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহা আমাদের ধাতের সহিত বনিবেও না। যেই সকল পাহাড়ী-দিগকে কেবল সাময়িক সামান্য নুন ও কয়েক কুড়ি টাকা দিয়া খ্রীষ্টান করিয়া লওয়া হইতেছে, তাহাদের মধ্যে তোমাদের যাইতে হইবে। খ্রীষ্টকে নিন্দা করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমরা খ্রীষ্টকেও জগতের অন্যান্য মহামানবের সঙ্গে সমান শ্রদ্ধায় মানি। হরিণাম-কীর্তনের বন্যা-প্রবাহ বহাইয়া বনপর্বত কাঁপাইয়া আমাদের, একবার নয়, দুই বার নয়, শতবার সহস্র বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইবে। নামের শক্তিতে আপনা আপনি যাহা হইবার, হইবে। অতুর ধর্মকে নিন্দা করিয়া নিজের ধর্মের মান বাড়ে না, নিজের ধর্মকে অপ্রতিম সাহসে ধরিয়া রাখিয়াই তাহার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এ কাজ করিবার জন্য তোমাদের সাহসের দরকার হইবে। কাহাকেও আঘাত না করিয়া, কাহারও সহিত বিরোধ-সৃষ্টিতে না যাইয়া, কেবল নামের অমৃত বিলাইয়া বিলাইয়া বিলীয়মান ক্ষীয়মাণ অপস্রয়মান প্রাচীন ধর্মকে তোমাদের জাগাইতে হইবে।

যদিও প্রধানত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত লোকদেরই ঐ অঞ্চলে বাস, তবু তাহারা ঐ অঞ্চলের অবশিষ্ট লোকদের ত নিজেদের ধর্মে স্থির থাকিতে দিতেছেন না। কেবল সুযোগের তন্মসে রহিয়াছেন যে, কে কখন কোন্ অভাবে পড়ে! টাকা দাও, ঋণে বা দানে আটক করিয়া তাহাকে খ্রীষ্টান কর, তার পরে টাকার দাবী তুলিয়া নাও। ইহা ত ধর্মপ্রচার নহে! ইহা অপরাধ। ইহা অত্যাচার। তোমরা ভয় পাইয়া যাইও না। সাহসের সহিত প্রতীক্ষা কর এবং

যেখানে যতটুকু আবশ্যক, সত্য প্রচার কর। কিন্তু নাম-প্রচারই সব চাইতে ফলোপধায়ক উপায়। নাম-প্রবাহের জোয়ার ভাটায় ইহা-দিগকে তোমরা যে নিশ্চয়ই জগৎ ভুলাইয়া দিতে পারিবে, ইহা বিশ্বাস কর। আমরা খ্রীষ্টানের গীর্জায় কত ভক্তি-সহকারে বাই, মুসলমানের মসজিদের কাছ দিয়া যাইবার কালে কত বিনয় মনে চলি। কারণ সেখানে কেহ না কেহ ভগবানেরই উপাসনা করেন। আমাদের অধিকার আছে সকল দেশে ভগবানের নামকীর্তনের বন্যা প্রবাহিত করিবার। কত প্রকারে মধুর এবং প্রাণস্পর্শী করিয়া নাম-কীর্তন করা যায়, তাহা দেখ।

আজ বাহা অসম্ভব মনে হইতেছে, কাল তাহা কেন সুসম্ভব হইবে না? তোমরা এক কথায়ই হতাশ হইয়া যাইও না। সকলকে অন্ধ ভরিয়া প্রেম দিয়া যাও। অন্য কিছুই উপরে নির্ভর করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২৪)

ইরি-ও

পুপুনী আশ্রম

২৭শে ভাদ্র, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীষেষু:—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা মেহ ও আশিস নিও।

পাহাড়ে বাহারা জুম ফসল করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিত, সরকারী নীতির পরিবর্তনে এখন তাহাদের সকল জেলাতেই আন্তে জ্বা

আধুন, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্য

প্রতিধ্বনি

৫৪৭

কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর কাছাড় জেলায় অনেক রিয়াং এই ভাবে জীবিকাচ্যুত হইয়াছে। দেখিতেছি যে, তোমাদেরও ওখানে তাহাই হইতেছে। এমতাবস্থার নিরীহ ভাবে কেবল দুঃখ সহ না করিয়া তোমাদের সকলের সংঘবদ্ধ ভাবে সরকারের দরবারে জমির দ্রষ্টা আবেদন করা উচিত। এই সকল ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আন্দোলন না করিতে পারিলে সরকারী অফিসের লোকদের মনে ধারণা আসে না যে গরীবেরা কত কষ্টে আছে। ভারত স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু ভারতে স্বাধীনতা আসে নাই। এই জন্তই অতি সামান্য অভাবও বিনা আন্দোলনে দূর হয় না। কিন্তু এই সকল আন্দোলনে কোনও প্রকার হিংসার আশ্রয় লওয়া মারাত্মক রকমের ভুল। আরও একটা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যে, এই সকল আন্দোলনে যেই সকল লোক নেতৃত্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনেক সময়ে অন্য কোনও গুপ্ত উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া চলেন এবং গরীব লোকগুলিকে নিজদের কাজে ব্যবহার করেন। ইহার ফলে গরীব লোকগুলি লত্যাগ্রহের নাম করিয়া হিংসার আশ্রয় লয়, অকারণে অশেষ অসুবিধা জনক অবস্থার সৃষ্টি করে এবং পরিণামে নিজেরাই দুঃখ পায় এবং উন্নতির দিকে না গিয়া অবনতির দিকে ধাবিত হয়। তাই তোমাদের মধ্যে বাহাতে বাজে লোকেরা নেতৃত্ব করিবার সুযোগ না পায়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। আমার মনে হয়, সকল রিয়াংরা যদি লিখিত ভাবে দিৱীতে ও আগরতলায় পুনঃ পুনঃ হাজার হাজার রিয়াংয়ের সহি লইয়া আবেদন জানাইতে থাকে যে, তাহাদের গ্রামগুলি সংরক্ষিত থাকল হইয়া গেলে তাহাদের হাতে-ভাতে মারা হইবে, তাহা হইলে ইহার সুফল কিছু-না-কিছু ফলিবেই। তোমরা প্রতি পনের দিনে একটা

করিয়া আবেদন-পত্র পাঠাইতে থাক। ইহার ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

তবে যাহারা যাহারা সংরক্ষিত অঞ্চল হইতে বাহিরে গিয়া বাসস্থান নির্ণয় করিতে পার, তাহারা তাহার চেষ্টাও দেখিতে পার। কিন্তু সকলের আবেদনের সাথে প্রতি জনকেই থাকিতে হইবে। এই ভাবে ছয় সাত মাসে কম পক্ষে বারো তেরটা আবেদন দিল্লীতে ও আগরতলার পাঠাইতে পারিলে এক বৎসরের মধ্যেই তোমাদের জন্য একটা ব্যবস্থা সরকারী দিক হইতে অবশ্যই হইবে। সরকার মনে করিতেছেন যে, জুম ফসল করিয়া নিত্য নূতন স্থানে বাইবার প্রযুক্তিটা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সহায়ক নহে। তাই তাহারা জুমিয়ার জমিগুলিকে সংরক্ষণ করিয়া বন করিতে চাহিতেছেন। সকল দেশেই ইহা করে। তবে সকল দেশে আমাদের ভারতের মতন এত অধিক লোক জুমের উপরে নির্ভর করে না। অন্যান্য দেশে অতি অল্প পরিমাণ জমির উপরেও সার-ব্যবহার, বহু-প্রয়োগ আদি করিয়া তাহারা অধিক ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। - তোমরাও যদি সকলে এক এক স্থানে গিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিয়া, সেই সকল জমির পরিমাণ যতই কম হউক না কেন, তাহাতে সারগোবর ব্যবহার করিয়া ও বহু করিয়া ফসল বাড়াইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে ইহার ফলে তোমরা অনেকেই জমিতেও নিজেদের অবস্থা ভাল রাখিতে পারিবে। সরকার হয়ত ইহাই ভাবিয়া বনগুলিকে সংরক্ষিত করিয়া দিতেছেন। তবে সরকারের দিক দিয়া হয়ত এই ক্রটি রহিয়াছে যে, তাহারা তোমাদের ঘরে ঘরে যাইয়া এই শুভাশুভ পরিবেশন করিবার যোগ্য ব্যবস্থা করেন নাই।

পূর্ববঙ্গ হইতে উদাস্তরা ভারতের নানা প্রান্তে গিয়া অনেকেই সামান্য সামান্য জমির উপরে অতি অসাধারণ যত্ন করিয়া প্রত্যাশার অধিক শস্ত উৎপাদন করিয়া নিজেদের অবস্থা পরিবর্তিত করিয়াছে।

তোমাদের রিয়াং সম্প্রদায়ের অসাধারণ দারিদ্র্যের আর একটা প্রধান কারণ হইল তোমাদের মধ্যে মদ্যপানের প্রাবল্য। শুধু রিয়াং নহে, পাহাড়ী প্রায় সকল জাতি সম্পর্কেই এই কথা খাটে। বাহার ক্ষেতে বা জমিতে হাজার মণ ধান হয়, সে যদি সাত শত মণ ধান মত্ত-প্রস্বতেই ব্যয় করিয়া দেয়, সে সুখে সংসার চালাইবে কি করিয়া? ইহাতে কেবল যে সংসারে দারিদ্র্য আসে, তাহাই নহে, ইহাতে তোমাদের প্রতিজ্ঞনের পরমাণুও কমিতেছে। মত্তপানের ফলে তোমাদের অনেকের নানা প্রকার মতিভ্রম হইতেছে। ইহার ফলে তোমাদের অনেকের সন্তান-সন্ততি কম জন্মিতেছে। তাই তোমাদের সমাজের প্রতি স্তরে ভ্রমণ করিয়া করিয়া মত্তপানের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া যাওয়া উচিত। যে পরিমাণ ধাতু তোমরা মদ্য তৈরীতে অপব্যয় কর, তাহা ঘরে থাকিলে তোমরা অনেক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অপেক্ষা সুখে থাকিতে পারিতে। তোমাদের শ্রাদ্ধ, বিবাহ আদি প্রতিটি কার্যে মত্তেরই মহোৎসব চলিতে থাকে। যে যে স্থানে অথওমতে শ্রাদ্ধের প্রচলন হইয়াছে, মাত্র সেই সেই স্থানেই দেখিতে পাই যে, মত্তপান রহিত হইয়াছে। আমি পাহাড়ীদের যে সকল গ্রামে একবার গুরিয়া আসিয়াছি, সেই সকল গ্রামে অনেক লোকে মত্তপান ছাড়িয়া দিবার ফলে মত্তপায়ীরা আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পাহাড়ের কার্যে রত ব্রহ্মচারীদের উপরে কতবার অত্যাচারে উত্তত হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তাহারা যখন দেখিল যে, বাহারা আমাদের প্রভাবে আসিয়া মত্তপান পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ইহার ফলে

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরণা

[১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫৫০

আর্থিক দিক দিয়া সকলের চাইতে অধিক স্বচ্ছল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তখন ইহাদের দ্রোহ-ভাব কতকটা প্রশমিত হয়। তথাপি এই সকল পাহাড়ী গ্রামে আমি যখন আমার আগামী ভ্রমণে যাইব, অনেক স্থানে এই আশঙ্কার কারণ আছে যে, মৃত্যুপানের সমর্থনকারীরা আমাকে আক্রমণও করিতে আসিতে পারে। ইহাই তোমাদের অনেকের সামাজিক অবস্থা। তাই তোমাদের নিজেদেরই উত্তম করিয়া সমস্ত সমাজ হইতে মৃত্যুপান বিদূরনের চেষ্টা পাইতে হইবে। কেহই নিজ বিপদকে একা এক জনের বিপদ বলিয়া মনে করিও না। এক জনের বিপদ প্রকৃত প্রস্তাবে সকল লোকের বিপদ, সমস্ত সমাজের বিপদ। তাই এর জন যেখানে দারিদ্র্য পীড়িত হইয়াছে, সেখানে তাহার দারিদ্র্যকে সমস্ত সমাজের প্রতীক দারিদ্র্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া সমস্ত সমাজের দারিদ্র্য দূর করিবার উপায় নির্ণয়ে ও পন্থা অবলম্বনে নিয়োগ করিতে হইবে।

ইতি—

আশীর্বাদ

স্বরূপানন্দ

(৫৯৫)

হরি-ওঁ

পুপুন্যী আশ্রম

২৭শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমরা তোমাদের ভক্তি-বিশ্বাসের বলে সমস্ত অঞ্চল ব্যাপিয়া একটা নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া ফেল। ধনবলে, জনবলে, বিভাবলে যাহা সম্ভব হয় না, তাহাও ভক্তিবলে হয়। যেখানে যে অবস্থায় যাহাকে

আখিন, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৫৫১

পাইবে, সেখানেই সেই অবস্থাতেই তাহার মধ্যে তোমরা তোমাদের
অন্তরের ভগবদ্ভক্তি ও জনসেবার অনুরাগকে সংক্রামিত, জাগরিত ও
বিবর্ণিত করিয়া তুলিতে প্রযত্নপরায়ণ হও। রেল-স্টেশান, বাস-ষ্ট্যাণ্ড,
হাট-বাজার, কারখানা, বিদ্যালয়, বিচারালয় ইত্যাদি কোন স্থানই
তোমাদের মহান প্রয়াসের পক্ষে অযোগ্য হইবে বলিয়া মনে করিও না।
মনে রাখিও যে, তোমরা যে একদা আমার কাছে দীক্ষিত
হইয়াছিলে, তাহা কেবলই নিজের সাধন নিজে করিয়া একাকী মুক্ত
হইবার জ্ঞান নহে। জনসেবা ও আত্মমোক্ষকে, আত্মমোক্ষ ও বিশ্ব-
মুক্তিকে, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও সর্বজনীন আত্যাত্মিক
উন্নতিকে পরস্পরের সহিত অভিন্ন সত্তায় বাঁধিয়া রাখিয়া চলিবে
তোমাদের সাধনা। উভয়ের মধ্যে বিধান করিতে হইবে পরিপূর্ণ
সামঞ্জস্যের।

যে জাগিয়া ঘুমায়, তাহার ঘুম ভাঙে। যে ঘুমাইয়া জাগে,
তাহাকেও চির-বিনিদ্র রাখ। আদর্শের পতাকা হাতে লইয়া তোমাদের
অবিরাম মার্চ করিতে হইবে। কাজ করিতে করিতেই করিতে হইবে
বিশ্রাম, বিশ্রাম করিবার জ্ঞান কাজে বিরাম দিবার তোমাদের অধিকার
গাই! কাজ হইতে কার্য্যান্তরে মন দিয়া বিশ্রামের সুখ আন্বাদন
করিয়া লইবে। অভ্যাসের ফলে ইহা করা যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯৬)

হরি-ওঁ

গুপুনকী আশ্রম

২৮শে ভাদ্র, ১৩৬১

পরমকল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমরা বুলন উপলক্ষে শ্রীশ্রীওঙ্কারবিগ্রহকে নিয়া আন্দোৎসব করিয়াছ, ইহাতে কে না সুখী হইবে? অত্যাগ্র স্থানে ছেলেমেয়েরা ওঙ্কারবিগ্রহকে নিয়া রথোৎসব করিয়া থাকে। কোথাও কোথাও ওঙ্কারবিগ্রহ নাই। দিবস-ত্রয়-ব্যাপী শারদীয়া উপাসনাও হইয়া থাকে। তোমাদের ওখানে যে অনুষ্ঠানটা করিয়াছ, তাহাতে দুই চারিজন একটু আপত্তি করিয়াছে, লিখিয়াছ। ইহা ত বাবা স্বাভাবিক। কারণ একটা নির্দিষ্ট দিন একটা নির্দিষ্ট দেবতারই পূজা হইবে, ইহাই সেই সেই দেবতার পূজাকে চাহেন ও প্রত্যাশা করেন। তাই তাঁহারা মনে করেন যে, অত্র অগ্ৰভাবে ঐ ঐ বিশেষ দিনে ভগবানের উপাসনা করিবে কেন। এই মনোভাব তাঁহাদের ইষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃই আসিয়া থাকে। স্মতরাং তাঁহাদের আপত্তিকে তোমরা কোনও বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিও না। তবে তাঁহারা বাধা দিয়াছেন বলিয়াই তোমরা তোমাদের বিবেকানুমোদিত পথ হইতে সরিয়া যাইবে, ইহা হইতে পারে না।

মনে রাখিও, আমরা কোনও ধর্মমতকে গৃহণ করিতে বা নির্বাসন দিতে আসি নাই। কিন্তু আমরা যে মত বা পথকে সত্য বলিয়া জ্ঞানিয়াছি তাহাকে অত্রের বাধা বা বিরোধের ভয়ে পরিহারও করিব না। যত ইহাই রাখিতে হইবে যে, আপাততঃ সংঘাত দেখা গেলেও প্রত্যেকটি বিভিন্ন মতপন্থাপ্রিত ব্যক্তির প্রতি আমাদের অন্তরের প্রীতি এবং

সুগভীর ও অকপট হওয়া চাই, যেন ইহারই বলে আমরা সকলের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারি।

একজন খ্যাতনামা গোস্বামী গুরুদেব আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমরা কেন হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ পর্কদিনে আমাদের সমবেত উপাসনার তারিখ রাখিয়াছি! তাহার জবাবে অগ্রাগ্র কথার সহিত আমি ইহাও বলিয়াছিলাম, “যাঁহারা আপনাদের আরাধিত দেবতাকে সেইদিন পূজা করিবেন না, তাঁহারা কি বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইবেন? তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের প্রাণের তাগিদ অনুযায়ী উপাসনাই কেন সেইদিন করিবেন না? ইহাকে আপনারা কেন আপনাদের মতের প্রতি বিদ্বেষ বলিয়া মনে করিতেছেন?”

প্রকৃত প্রস্তাবে যত সময়ে যত সম্প্রদায়ে আচার্য্যেরা যত পূজা-পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার কতটা তাহারা তাঁহাদের আগেকার, অথচ অধুনা-বিলুপ্ত, ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহ হইতে নিয়াছেন, তাহার হিসাব করিবে কে? আজ যেই সকল পূজা সাড়ম্বরে দেশের অনেক স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই যে ইহার পূর্ববর্তী অগ্র অনেক বিলুপ্ত সম্প্রদায়ের কাছ হইতে পাওয়া, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিরা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। মোট কথা, যে-কোনও বর্তমান তাহার বিলুপ্ত অতীতের কাছে কত যে ঋণী, তাহা বলিবার নহে। আমরাও যদি প্রচলিত দেবদেবী-বিশ্বাসীদের বিশেষ উপাসনার তিথিগুলিকে আমাদের বিশেষ উপাসনার তারিখ রূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাতে দোষ কি হইবে?

কোনও মতই চিরকাল এক ভাবে থাকে না থাকিবেও না। রূপান্তর ভাবান্তর অবিরাম হইতেছে এবং হইবেই। তাহা লইয়া কলহের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা ভুল হইবে। যাহাতে কোনও সম্প্রদায়ের

লোকের সহিতই তোমাদের কোনও প্রকার কলহে না বাইতে হয়, তাহা দেখিয়া চলিও। কলহে শান্তি নাই, মিলনেই শান্তি। বেধানে অস্ত্রের উপাসনাতে তাহাদের মতন হইয়া যোগ দিতে পার না, সেখানে তাহাদের অন্ততঃ কোন বাধা সৃষ্টি করিও না। ইহা এক চমৎকার বিধি বলিয়া জানিবে। অবশু কোনও স্থানে ধর্ম্মের নাম করিয়া যদি এমন কিছু হইতে থাকে, যাহা নীতির বিচারে অগ্রায়, সদাচারের বিরোধী, নারীর সতীত্ব-সম্মানের হানিকর, পুরুষের সংযম-সামর্থ্যের অপচয়কার, তবে তাহা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইলেও তাহাতে বাধা দিয়া সমাজের পাপপঙ্ক হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার, আমার, জগতের সকলের। কিন্তু এই জাতীয় চেষ্টাতেও সর্ব্বদা অন্তরের প্রেমভাবকে রাখিতে হইবে সূত্রসন্ন ও প্রস্ফুটিত। বিদ্বেষ থাকিলে চলিবে না। বিদ্বেষকে আমল্জন করে, প্রেম প্রেমকে আবাহন করে। আমাদিগকে মনে প্রাণে প্রেমিক হইতে হইবে। ইতি—

আদীত্ম্য
ধরুপানন্দ

(৫৯৭)

হরি-ওঁ

পুপুনী আশ্রম
৩০শে ভাদ্র ১৩৩৮

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্রে তোমার ষোড়শবর্ষ বয়স্ক পুত্রের অকালে পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইলাম। অধিকতর ব্যথিত হইলাম এই সংবাদ জানিয়া যে, সে উদ্বুদ্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। তোমাদের

আগ্নি, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্ন।

প্রতিধ্বনি

৫৫৫

গ্রামে ঠিক এই বয়সেরই আর একটা ছেলে প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই ভাবেই প্রাণ দিয়াছিল। ছেলেটা ছিল তোমারই গুরুভাই। তোমার বাড়ীর উৎসবাদিতে সে আসিত কত আনন্দ লইয়া। কত ছিল তার সংগ্রসঙ্গ কুচি। কত ছিল জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সে যেই দিন প্রাণত্যাগ করিল, সেই দিন তাহার জ্ঞাত আমার মনে গভীর শোক উৎপন্ন হইয়াছিল। আমি কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলাম যে, কেন এমন সুন্দর স্বভাবের একটা ছেলে এভাবে প্রাণত্যাগ করিল। সেই ব্যাথাটা এখনো আমার মনের মধ্যে খোঁচা মারে। এখনো আমি সেই একটা হতভাগ্য ছেলের জ্ঞাত প্রাণে বেদনা অনুভব করি। মরিয়া তাহার কিছুই লাভ হইল না। নিজ কর্মফলহেতু যে দুঃখ বা অশান্তি সে জগতে ভুগিতেছিল, তাহা মৃত্যুর পরেও তাহা তাহাকে ছাড়ে নাই। মরিয়াও সে কর্মফলেরই অধীন হইয়া রহিয়াছে। কর্মের ফল ভুগিয়া তাহাকে নিঃশেষ করিবার জ্ঞাত আবার তাহাকে মানবতনুই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যেই মানব-জীবনের অবশ্রুতাবী অশেষ-দুঃখ তাহাকে করিয়াছিল পীড়িত ও নিগৃহীত, সেই মানবজীবনের মধ্য দিয়াই তাহাকে আবার বাকী ভোগ পুরাইতে হইবে। তবে তাহার প্রাণত্যাগ করিয়া লাভ হইল কি? ধারের টাকা বৈশাখ মাসে দিতে পারি নাই বলিয়া পলাইয়া গেলাম, কিন্তু কাবুলীওয়াল ভাদ্র মাসে আবার ধরিল, আবার নিপীড়ন করিল, যতদিন না টাকা আদায় হইল, ততদিন পিছু ধাওয়া করিয়া করিয়া প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল,—এই অবস্থা হইতে ত কাহারওই পরিত্রাণ নাই! তবে লাভটা কি হইল, কোথায় হইল? কেহ মারা গিয়াছে, এই সংবাদে আমি দুঃখিত হই মাত্র ইহা ভাবিয়া যে, অজ্ঞান দায়ী-স্বজন তাহার জ্ঞাত কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। কিন্তু কেহ নিজেকে এই ভাবে কাঁকি দিয়া দেহ ছাড়িলে তাহার জ্ঞাত আমার সুগভীর শোক

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেরা

[১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫৫৬

উপস্থিত হয়। তোমার পুত্রের জন্মও সেই শোক আমার হইয়াছে। আমিও তোমার সহিত সমান শোকাচ্ছন, আমিও তোমার সঙ্গে দাড়াই কঁাদিতেছি, আমি তোমার দুঃখে সমদুঃখী হইতেছি, তোমাকে আমি একাই কঁাদিতে দিব না, তোমার শোকভার আমি ভাগ করিয়া নিজে জন্মও যতটা পারি নিব। তুমি তোমার শোক কমাও বাবা, তুমি অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হও।

কেন এই যুবক ছেলে এমন কুপথে পাদচারণা করিল, তাহা জানিবার জন্ম আমি ব্যগ্র হইয়াছি। সমস্ত অবস্থা আমাকে বিস্তারিত জানাইও।

তোমার পরলোকগত পুত্রের আত্মার শান্তির জন্ম যত শীঘ্র সম্ভব একটা সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান কর। ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী সংস্কারজ্ঞ মন আত্মহত্যাকারীর জন্ম শ্রাদ্ধের বিধান দেয় নাই। আবার, এই ভাবে অন্যায় মরণ যাহারা বরণ করে, তাহাদের শ্রাদ্ধাদি বিধান করিলে বর্ষ দলে দলে লোক শ্রাদ্ধের দ্বারা স্বর্গ হইবেই, এই ধারণার বশবর্তী হইলে কেবলই গলায় দড়ী দিতে বা বিষপানাদি করিতে থাকে, তাহার ভয়ে ইহাদিগকে স্মার্তশ্রাদ্ধের তৃপ্তি ও সুখটুকু হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কিন্তু আমি মনে করি, ইহাদের প্রতি একরূপ আচরণ নির্ভরতা মাত্র। যে ছেলে টাইফয়েডে মরিলে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ করা সম্ভব হইত, সেই ছেলে বুদ্ধির ক্রটিতে অসম্ভব উপায়ে দেহ ছাড়িয়া বলিয়াই তাহার শ্রাদ্ধ হইবে না? তুমি অনতিবিলম্বে একটা দিন বাছিয়া লইয়া সেই দিনে সকলকে লইয়া তাহার আত্মার শান্তির জন্ম সমবেত উপাসনা কর। ইহাতে তোমার পুত্রের আত্মার শান্তি হইবে। তোমাদেরও শোক অপনোদিত হইবে।

ভগবান্ যখন যাহার মৃত্যুর জন্ম যে সময় নির্ধারণ করিয়া থাকেন, তখনই তাহার মৃত্যু হয়, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসকে

বৈজ্ঞানিকেরা আসিয়া অসির আঘাত করিতে চাহিলেও ইহা আমরা ছাড়ি নাই। কারণ ইহা আমাদের অন্তরে শান্তি দেয়। তবে কেহ নিজের ইচ্ছায় অত্যাচারে শরীর-পাত করিলে তাহার জন্য অবশ্যই দুঃখ স্বাভাবিক। কিন্তু যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার জন্ত চিরকালই শোক করা চলে না, উচিতও নহে। সেই শোক অপনোদনের পক্ষে শ্রাদ্ধ একটি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ভেষজ। অবিলম্বে সমবেত উপাসনার দ্বারা অখণ্ডমতে তাহার শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবার ব্যবস্থা কর।

তোমার সতী সাধবী পত্নী বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া দিনযাপন করিতেছে, আর তুমি একটি পুত্রের বিনিময়ে ছয়টি বলবিক্রান্ত দীর্ঘজীবী পুত্র প্রার্থনা করিতেছ। আমার কাছে ইহা অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হইল। তুমি পুত্র-শোকে কাতর হইয়া এই সকল অবাস্তব প্রার্থনা করিতেছ। ভগবান্ সকলেরই সকল প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন, কিন্তু তোমার প্রথম ছেলেটি যে গলায় ফাঁসী লাগাইয়া সংসার ছাড়িল, তাহার সহিত তাহার মাতার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোনও স্বস্বন্ধ নাই বলিয়াই কি তোমার মনে হয়? সাময়িক মস্তিষ্কবিকার ছাড়া কি কেহ কখনও আত্মহত্যা করিতে পারে? তোমার এই পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাবী পুত্রেরা যে মস্তিষ্ক-বিকারের সম্ভাবনা লইয়া আসিবে না, ইহার নিশ্চয়তা কি? যে কয়টি ছেলেমেয়ে জীবিত আছে, তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিবার জন্যই ব্যাকুল হও, আর পুত্র পাইয়া কি লাভ হইবে? পুত্রশোক পাইয়া লোকে বিহ্বল হইয়া কাঁদিয়া বলে যে, কেহ যেন জগতে পুত্রমুখ দর্শন না করে, কেননা, তাহা হইলে পুত্রশোক তাহাদিগকে পাইতে হইবে না। সেই অবস্থায় তুমি ছয়টি পুত্র প্রার্থনা করিতেছ। ইহা যে তোমার মনের বিষম ভুল, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিও। যেই পুত্রের জন্ম কাঁদিতেছ, সে তোমার কেহই নহে। তোমার রাস্তা তোমাকে

করিয়া লইতে হইবে, পুত্র-কলত্র কাহারও কিছুই করিয়া দিতে পারে না।
অমার সংসারের এই অত্যদভূত সত্যটির পানে তাকাইয়া নিজের মনের
অবাস্তব কল্পনা ও কামনা সমূহকে উপশমিত কর বাবা!

তুমি সাধন-রাজ্যে উন্নতিরও প্রার্থনা করিয়াছ। হাঁ বাবা, এই
আশীর্বাদ আমি প্রাণ খুলিয়া করিতেছি। তোমার সকল শোকতাপ
তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান-স্বরূপ হউক। বাগ্নিকৌ একই
ক্রোধ পাত্থীর মৃত্যু দর্শনে মহাকবি হইয়াছিলেন, তুমি তোমার জ্যেষ্ঠ
পুত্রের মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া অমৃতের মহামহর্ষি হও, মৃত্যুজয়ী মহান সাধক
হও। তাহার জন্ত তোমাকে সংসার ছাড়িয়া আশ্রমেই ছুটিয়া আসিতে
হইবে না, অরণ্যেও যাইতে হইবে না। ওখানে থাকিয়াই তুমি তপস্বী
হও। আমি অফুরন্ত আশীর্বাদ তোমাকে করিতেছি।

অপরিসীম ব্যস্ততায় আমি সময় মতন পত্র দিতে পারি নাই বলিয়া
অভিমান করিও না বাবা। এই কয়দিন আমি জলে ভিজিয়া কাপ
করিয়াছি ও করাইয়াছি, কাল হইতে স্নান হইয়াছে ছোটনাগপুরের
কাঠফাঠা রোডে ছুটাছুটি করিয়া কাজ করা ও কাজের তদারক করা
সমস্ত দিন খাটিয়া আসিয়া রাত্রে ষেটুকু অবসর পাই, তাহা অতি
সামান্য। হাজার চিঠি জমিয়া গিয়াছে। তার মধ্যে তোমার চিঠি
মাত্র কালই আমার হাতে পড়িয়াছে। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

আদিন, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রোম্না

প্রতিধ্বনি

৫৫২

(৫৯৮)

হরিও

পুপুনকী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেযুঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা সংখ্যায় স্বল্প, আয়ে দরিদ্র, অবস্থান করিতেছ সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন এক পার্শ্বত্যাগ রেল-ষ্টেশানে। তোমরা সমাজ কল্যাণ-কাজে যে-টুকু সহায়তা ও সহযোগ করিয়া বাইতেছ, তাহা তোমাদের প্রশংসাই বহন করিতেছে। কেহ ধনী নহে বলিয়া সে ধনীদেব অপেক্ষা সংকল্পে কম আগ্রহবান হইবে, ইহার কোনও কথা নাই। ধনীর অনেক ধন আছে এবং তিনি তাহার সামান্য অংশ মাত্র পরার্থে দেন। দরিদ্রের অল্পই ধন আছে, কিন্তু সে যতটুকু দেয়, তাহা তাহার সাধারণ সীমার প্রান্তে আসিয়া। প্রতি সংকারণে ইহাই দেখা গিয়া থাকে। তাই আমি দারিদ্র্য-পীড়িত জনসাধারণকে ধনবান দাতাদের চেয়ে অনেক সময়ে বেশী মহত্বমণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়া থাকি। তোমরা তোমাদের গীমাবদ্ধ আয়ে সংসার চালাইয়া কিছুই বাঁচাইতে পার না, অনেকেরই পারিপার্শ্বিকের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে বেগ পাইতে হয়, কেহ কেহ অত্যধিক ক্রোশে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ পোষণ করিয়া থাক। সেই তোমাদের মধ্যে যখন দেখিতে পাই সংকারণে ত্যাগের স্বাভাবিক পুণ্য তোমাদের অবস্থার সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া চলিতে পিছুপা হয় না, তখন বুঝি যে, তোমাদের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ ঘটিতেছে। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগ যে একদা এক মহৎ ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করিতে পারে, তাহার উপরে আমার গভীর বিশ্বাস আছে, তোমরা নিজেরাও ইহা বিশ্বাস করিও।

চারিদিকে খোলা চোখে তাকাইয়া দেখ, কত কাজ পড়িয়া আছে। কেহ করে না বলিয়াই কাজগুলি হয় না, কেহ হাত দেয় নাই বলিয়াই কাজগুলি সুরু হয় নাই, কেহ সুরু করে নাই বলিয়াই কাজগুলি শেষও হয় নাই। একটু খোলা চোখে দেখিবার অভ্যাস দাখিলে তোমাদের দৃষ্টিতে অনেক কাজ পড়িয়া যাইবে। যে কাজের মধ্যে নিজের প্রত্যক্ষ স্বার্থ কিছু নাই, মানুষ তাহার দিকে নজর দেয় না বলিয়াই এক একটা জাতি জাতি-হিসাবে হেয় হইয়া পড়িয়া আছে। তোমরা তেমন কাজে নিজেদের নিয়ত নিরত রাখিবার অনুশীলন ও অভ্যাস কর, যে কাজে তোমাদের প্রত্যক্ষ কোনও হিত নাই কিন্তু জগতের কাহারও না কাহারও নিব্বিরোধ হিতের সম্ভাবনা আছে। বাড়ীর খি-চাকরাণীকে বর্ণমালা শিখাইলে তোমার কোনও প্রত্যক্ষ লাভ নাই, কিন্তু তাহা জগতের হিতে কখনো না কখনো আসিবে। রোগের অশিক্ষিত কুলীটাকে ধর্ম্যকথা শুনাইলে তোমার প্রত্যক্ষ লাভ কিছুই নাই, কিন্তু ইহার দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তোমার ধর্ম্যরূচি বাড়িবে এবং জগতের কুশল হইবে। পাহাড়ী পুরুষ ও মেয়ে-মানুষেরা যখন দলে দলে রেলগাড়ী দেখিতে উপর হইতে পরম কৌতুহল বশে নীচে নামিয়া আসে, তখন যদি রেলগাড়ীর সম্পর্কে তাহাদের উদ্দীপিত কৌতুহল চরিতার্থতার সুযোগে তাহাদিগকে উন্নত জীবন, উন্নত আদর্শ, উন্নত ভাবধারার সহিত পরিচিত করিয়া তুলিবার জন্য একটু একটু করিয়া শ্রম স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার ইহাতে প্রত্যক্ষ লাভ কিছুই নাই, কিন্তু এই চেষ্টা ধারাবাহিক ভাবে চলিতে থাকার পরে ইষ্টাৎ এক দিন দেখিতে পাইবে যে, জগতের একটা অংশের ছবি কেমন করিয়া অপর বর্ণাঢ্য হইয়া উঠিয়াছে, জগৎ সুন্দরতর হইয়াছে।

তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামর্থ্যকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে

আশ্বিন, ১৩৬৭]

ধুতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৫৬১

করিও না। তোমরা ঐক্যবদ্ধ হইলে এমন অনেক কিছু করিতে পার, বাহা এখনও কবিকল্পনার অগোচর রহিয়াছে। তোমাদের ভিতরের বিরল-প্রকাশ অপরিমেয় সামর্থ্যের সহিত তোমাদের পরিচয় হউক, এই আশীর্বাদ করি! ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯৯)

হরি-ওঁ

পুপুনকী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—,তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংঘের শক্তি নির্ভর করে সংঘচেতনার প্রখরতার উপরে। আমার সংঘ জগতের কল্যাণের জন্ত স্থাপিত, এই বোধ না আসিলে সেই সংঘের প্রতি অন্তরের অকপট অনুরাগ আসে না। তাই সংঘের আদর্শবাদ অতি উচ্চাঙ্গের হওয়া প্রয়োজন। হীন, সঙ্কীর্ণ, সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন মতবাদ দিয়া যেই সংঘের সৃষ্টি, সে অতুলনত স্বভাবের নবনারীকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সংঘের আদর্শবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা না থাকিলে কাহারও সংঘ-চেতনা প্রখর হয় না।

তোমরা এই কয়টা কথা মনে রাখিয়া, তোমাদের আপনার জন বলিয়া বাহাদের মনে কর, তাহাদিগকে তোমাদের আদর্শবাদের সহিত অতি উত্তমরূপে পরিচিত করিয়া লও। ইহার আবশ্যকতা সকলের চেয়ে বেশী। নিজের মত-পথের সহিত কোনও পরিচয়ই স্থাপন হইল না

অথচ শোভাযাত্রার সময়ে খুব করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া করিয়া রাস্তার লোকের প্লীহা চমকিত করিলাম, ইহা কোনও লাভজনক অধ্যবসায় নহে। তোমরা তোমাদের পরিচিত মণ্ডলে অবিরাম জ্ঞান পরিবেশন করিতে থাক। তোমাদের পরিবেশন-পদ্ধতির মধ্যে যদি কোনও অজ্ঞাতসারে-প্রবিষ্ট ক্রটিও থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেও অবিরাম পরিবেশন করিতে করিতে তোমরা তাহার সম্পর্কে অবহিত হইবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, এই কাজটিতে এখনও অধিকাংশ স্থানেই অনাগ্রহ রহিয়াছে। তোমরা এই আগ্রহ সকলের মনে জাগাইয়া তোলা।

আর একটি জিনিষ জাগাইতে হইবে। সাধন করিবার পন্থা সকলের অন্তরের অন্তরে প্রবল ভাবে জাগান চাই। অসাধকের সাধ কুসংস্কারের পঙ্কিল আবর্তে অথবা আত্মকলহের ঘূর্ণিবায়ুতে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। তোমরা তোমাদের প্রতিটি সতীর্থকে সাধনপারায়ণ হইতে উদ্দীপনা দাও। তোমরা তোমাদের অন্তরের প্রেম দিয়া প্রকৃত সাধকের সাধনাকে সম্বর্ধনা কর। তোমরা তোমাদের প্রাপ্য আত্মীয়তা দ্বারা প্রতিজনকে বাধ্য কর, সাধন ভঙ্গনের প্রতি মনোযোগী হইতে। তোমরা নিজেরা প্রতিজ্ঞনে সাধন করিয়া মনে প্রাণে বলশালী ও পরমেশ্বরে আস্থাবান হও, আর তোমাদের সেই বল ও আস্থা চারি দিকে বিকীরিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদ
স্বরূপানন্দ

(৬০০)

হরিওঁ

পুপুনকী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের মধ্যে যাহারা আছে ছোট বা নগণ্য, তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দাও যে, তাহারা ইচ্ছা করিলেই বড় বা গণ্য হইতে পারে। অগণ্য নগণ্য একদা সুগণ্য হইবে যেই সাধনার বলে, তাহাই আমি অকাতরে দ্বিজ-চণ্ডাল ভেদ না করিয়া দেশে দেশে বিলাইয়া বাইতেছি। আমি তোমাদের যাহা দিয়াছি, তাহা যে কত বড় বিপ্লবসাধক সাধনা, একনিষ্ঠ প্রযত্নে সাধন করিলেই তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে! তোমাদের যে অনেকের একনিষ্ঠা আসে না, তাহার কারণ শুধু তোমাদের সাধনের অভাব। তোমাদের কেহ কেহ যে সকলের কাছ হইতে আলগোছ হইয়া আলাদাটি হইয়া থাকিতে আজও ভালবাসিতেছে, তাহারও কারণ ঐ সাধন করিবার রুচির অভাব। তোমরা প্রতি জনে সাধক হও, সকলকে সাধন করিতে উদ্দীপনা বিতরণ কর। তোমাদেরই মধ্যে দুই চারি জন আবার সাধন করিতে করিতে এমন উন্নত স্তরে গিয়া পৌছিয়াছে যে, তাহাদের দেহবুদ্ধির পর্য্যন্ত বিলোপ হইয়া গিয়াছে। সংসারে পাকাল মাছের মতন তাহারা বিরাজ করিতেছে। তাহারা জলে থাকে, অথচ জল বা কাদা তাহাদের গায়েই লাগে না। তোমরা জনে জনে তাহা হও। ইতি—

অশীর্বাদক

ধ্বনুপানন্দ

(৬০১)

পুণ্ড্রনকী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

হরি-ওঁ

পরমকল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম কিন্তু তুমি নানা বিপদে পড়িয়াছ জানিয়া ব্যথিতও হইলাম। আলীকাদ করি, তুমি বিপন্ন হও। তুমি বুধা ভয় করিও না। তোমার সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে।

তোমাদের গ্রামে যে কতকজন অখণ্ড আছ, তাহারা সকলেসকলের সহিত প্রেমরক্ষা করিয়া চলিও। ইহার দ্বারা অতের উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার একটা উপায় হইবে। অতকে শাসন করিয়া যে জয় লাভ করা যায় না, নিজেদের মধ্যে ঐক্য আছে, অতের মনে এই প্রতিষ্ঠা জন্মাইয়া—তাহা করা যায়। তোমরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন কর এবং অনবচ্ছিন্ন প্রয়াসে নিজেদের সাধনকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনে উন্নতি লাভ কর।

আদর্শের ডাকে, কর্তব্যের আহ্বানে তোমরা সাড়া দিতে জান, তাহা প্রমাণ করিবার সুযোগ ত তোমাদের শত শত আসিতেছে। সেই সুযোগকে গ্রহণ করিলেই দেখিবে তোমাদের প্রত্যাশার অতীত তোমাদের অন্তরের বিমল প্রতিভা নূতন আলোক সৃষ্টি করিয়া তোমাদিগকে নিত্যনূতন উন্নতির সোপান অতিক্রম করাইয়া দিতেছে। ইতি—

আলীকাদ
স্বরূপানন্দ

আশ্বিন, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেমা

প্রতিধ্বনি

৫৬৫

(৬০২)

হরি-ও

পুপুন্যী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা মধুপুর আশ্রমে অনেকেই গিয়া সেদিন শ্রমদান করিয়াছ। ইহার মধ্যে যে কত বড় একটা সার্থকতা আছে, তাহা তোমরা আস্তে আস্তে বুঝিবে। তোমাদের কাজে আমি অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তোমরা তোমাদের আগামী ১৫ই আশ্বিনের প্রতিনিধি সম্মেলনকে যদি সফল করিতে পার, তাহা হইলে আরও খুশী হইব।

আজ তোমরা যে যে কাজ করিতেছ, তাহা যে আজই শেষ হইয়া গেল, ইহা মনে করিও না। তোমাদের ছোট ছোট সংকল্পের ফল ভাবী কালের জন্ত জমিয়া থাকিতেছে। অসহিস্রু ব্যক্তির যে সেই অনাগত কালের জন্ত অপেক্ষা করিতে রাজী হয় না, ইহা তাহাদের দুর্বলতা মাত্র। আজিকার ছোট একটা সংকাজ আগামী কালের জন্ত তোমার নোভাগ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিল। ইহা কালক্রমে তোমার নিকটে গহিষ্ফুট হইবে। আজ বীজ পুতিয়া কালই যদি অঙ্কুর দেখিতে চাহ, তবে যেমন বোকামী হয়, আজই কাজ করিয়া কালই তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলে অনেক ক্ষেত্রেই তাহাই হয়। তোমাদের শুভ-চেষ্টনা যে সংকল্পের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে আমার আনন্দের অবধি নাই। তোমরা তোমাদের অন্তরের বিমল স্বচ্ছতাকে অন্তঃপ্রাণের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিয়া চারিদিকে নিঃশূল পরিবেশ সৃষ্টিতে লাগিয়া

যাও। একাকী কোনও অতিবলমাধ্য কাজ করিবার মধ্যে বীর্য থাকিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় নাই। সহস্র জনের বরশ্রমে একটি মাত্র বিরাট কাজ সাধিত হইলে অনায়াসে কল্পকালব্যাপী সুকল আহরণ করা যায়। নিখিল জগতের কুশলের দিকে তাকাইয়া তোমরা সংঘশক্তির অনুশীলন কর, ইহা আমি চাহি। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০৩)

হরি-ওঁ

পুপুনকী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একটি সংকাজ একদিন করিলে যতটুকু পুণ্য অর্জিত হইল, তই দিন করিলে তাহার দ্বিগুণ পুণ্য অর্জিত হইবে, ইহা অতি ছোট একটি শিশুও বুঝিতে পারে। কিন্তু একদিন পুণ্য করিয়া যে সুখ, তাহা আরও অধিক পরিমাণে বারংবার অর্জন করিবার রুচি সকলের হয় না। হয় না, সঙ্গদোষে চিন্তের বিভ্রান্তি বশতঃই। এইজন্তই পুণ্যলাভেজুক অসংসঙ্গ বর্জিত করিতে ও সংসঙ্গ করিতে বারংবার বলা হইয়াছে।

পুণ্য কি? যাহা দ্বারা নিজের অন্তরে আসে আত্মপ্রসাদ আর অগ্রের জন্যে সুখ। অত্মকে সুখ দিয়া নিজেকে আত্মপ্রসাদের অধিকারী হইতে হইলে অনেক সময়েই কিছু না কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হয়।

আশ্বিন, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৫৬৭

তাই স্বার্থত্যাগকে পুণ্য বলা হইয়াছে। যাহা তোমাকে পবিত্র করে, তাহাই পুণ্য। অপরের সুখের জন্ত নিজের স্বার্থকে হ্রাস করিলে বা তুচ্ছ করিলে মন পবিত্র হয়। এইজন্যই তপস্তার প্রথম কথা ত্যাগ। এই ত্যাগ শারীর, আর্থিক এবং বাচিক হইতে পারে। যে ভাবেই অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার কর না কেন, তাহাতেই তোমার আধ্যাত্মিক কুশল হইবে। যাহাতে আধ্যাত্মিক কুশল, তাহাতে দেহমনপ্রাণেরও কুশল অবশ্যস্বাভাবী।

ছোট ছোট পরহিত দ্বারা বড় বড় পরহিতের জন্ত নিজেকে তৈরী করা হয়। তোমরা তোমাদের জীবনের ছোট ছোট সংকাজগুলিকে তুচ্ছ করিয়া দেখিও না। যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে এই সকল কাজে নিজেদের নিরত করিতে পার, তাহার দিকে লক্ষ্য দিয়া চলিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০৪)

ইবি-ও

পুপুনকী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চারিদিকে কেবল অবসাদ দেখিয়া তোমার মনও অবসন্ন হইয়াছে মনে হয়। কেন তুমি মনে করিতেছ যে তোমাদের অঞ্চলেও প্রত্যেকেই বুঝাইতেছে? ইহাদের মধ্যে নিজেদের অজ্ঞাতসারে অনেকে কাজ

প্রতিধ্বনি

ধ্বং প্রেমা

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫৬৮

করিয়া যাইতেছে। তোমরা তাহাদের আত্মপ্রকাশের উপযোগী আবহাওয়া পুষ্ট করিয়া তুলিতে পারিতেছ না বলিয়া তাহাদের চিন্তে পারিতেছ না। তোমরা হাল ছাড়িয়া দিও না।

কোনও কোনও স্থানে আত্মাভিমান কর্মীদের আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহারা নিজেদের মারাত্মক ক্রটিগুলি দেখিতে পাইতেছে না। ইহার ফলে কর্মী রূপে তাহাদের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। ইহা ব্যক্তিগত ভাবে একটি দুইটি লোকেরই মাত্র ব্যাপার। ইহাকেই সর্বজনীন ভাবে সত্য বলিয়া মনে করিয়া কেন বৃথা দুর্জনরা আহরণ করিতেছে? আমি ত জানি, আজ যাহারা নিতান্তই অশ্রদ্ধে, কাল তাহারা সকলের অপেক্ষা গণনীয় হইতে পারে। ইহা যে পারে, তাহাই আমার সমস্ত জীবনের কর্মসাধনার মূলধন জানিও। আমি বড় বড় নামজাদা লোকদের সহায়তা পাই নাই, প্রত্যাশাও করি না। কিন্তু যাহাদিগকে সকলে ছোট বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমার অপরিমিত আস্থার বলে আমি যে দিক দিয়া যতটুকু কাজ করিবার, করিয়া যাইতেছি। দুশ্চরিত্রের ভিতরেও সং হইবার উপায় আছে, মিথ্যাচারীর ভিতরেও সংপথে চলিবার উপকরণ সংগৃহীত হইয়া আছে, অবিবেকী প্রমত্ত অমানুষের ভিতরেও দেবদুলভ স্থিতপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে। যাহার যাহা নাই, তাহা নিয়া ভাবনা করিয়া কি হইবে? কিন্তু যাহার যাহা আছে, তাহার প্রতি কেন আশারূপ নেত্রে চাহিব না? তোমার চারিদিকের সকল কর্মী ও অকর্মীর প্রতি অবিশ্বাসটা তুমি তোমার মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। জোর করিয়া তাহাদের ভিতরকার সম্ভাবনা সমূহের প্রতি দৃষ্টি দাও। কে কি করে নাই বা করিতে পারে না, তাহা তোমার বিচার্য্য হইবে কেন? কে কি করিতে পারে, তাহাই বিচার্য্য হউক।

আশ্বিন, ১৩৬৭]

বৃত্তং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৫৬৯

যে বাহা করিতে পারে, তাহাকে দিয়া তাহা করাইবার জন্ত বদ্ধপরিকর হও।

যে রূপ পরিস্থিতির মধ্যে তুমি পড়িয়াছ, তাহাতে তোমার মনে হতাশা অতি সম্ভবভাবেই আসিতে পারে। আশা থাকিলেই হতাশাও থাকে। আশাভঙ্গ হইতে হইতে যখন দেখা যায় যে, আশাপূরণের সম্ভব কারণ আর কিছুই পাওয়া বাইতেছে না, হতাশা তখন আসে। কিন্তু হতাশ হইলে কি তোমার চলিবে? টানিয়া তোমাকে লোকের ভিতরের সদৃশগুলি বাহির করিতে হইবে। তবে না তুমি কর্মী! হতাশা পাপ, বিশ্বাসই পুণ্য। বিশ্বাস প্রত্যাশা করে না কিন্তু প্রতীক্ষা করিবার সামর্থ্য দেয়। আশা প্রত্যাশা করে, তাই প্রার্থিত-পূরণ না হইলে হতাশার জন্ম দেয়। তুমি আশা পরিহার কর, প্রত্যাশা ছাড়িয়া দাও কিন্তু অসম্ভবও যে সম্ভব হইতে পারে, সেই বিশ্বাসটী পোষণ কর। তোমার কর্মযোগের ইহাই চরম কৌশল ও পরম পথ।

পুনর্নূতনে অন্তরের মতন খাটিতেছি। কেনই বা খাটিব না? এখনো দেহ রহিয়াছে। এখনো শরীরে শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হয়। এখনো ক্ষুধা-নিদ্রা স্বাভাবিক ভাবেই আসে। তবে কাজ করিব না কেন? কাজ করিতে যে কি আনন্দ, তাহা আমি কি করিয়া বুঝাইব? তোমরা সকলে আমার আনন্দের অংশভাক্ হও, ইহাই চাহি। আমার হাতে তোমাদের হাত মিলুক, আমার প্রাণে তোমাদের প্রাণ মিশুক। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিবনি

ধৃতং প্রেম্য

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫৭০

(৬০৫)

হরি-ও

পুপুনী আশ্রম

১লা আগ্নিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্র পাইয়া সকল বিষয় অবগত হইলাম। আজকাল প্রায় সকল লোকেরই পূর্বকালীন সঙ্কীর্ণতা কাটিয়া যাইতেছে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লোক ক্রমশঃ উদার হইতেছে। এমতাবস্থায় একজন ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত একটি ব্রাহ্মণ-কুমারীর বিবাহে পিতামাতারা আপত্তি করিবেন শুধু এই যুক্তিতে যে, দুইটি ব্রাহ্মণ-পরিবার দুই সমাজের লোক, ইহা বিসদৃশ মনে হয়। তথাপি পিতামাতার অমতে কোনও কথাকে তোমার বিবাহ করা সম্ভবত নহে। কারণ, বিবাহের পরে তাঁহারা যদি বধূকে ঘরে না নেন কিম্বা সংস্কার বা ক্রোধের বশে কন্যার হাতে না খান, তাহা হইলে একটা মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। ইহা পাশ্চাত্য পদ্ধতির নহে যে, পুত্রটি বিবাহ করিবার পরেই ডানা-ওঠা পক্ষি-শাবকের তায় উড়িয়া গিয়া নিজের নীড় আলাদা করিয়া রচনা করিবে। হিন্দুপরিবারে মাতা-পিতা যাবজ্জীবন অচ্ছেদ্য অংশে জুড়িয়া থাকেন। সারা জীবন তাঁহাদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার দায়িত্ব স্বক্কে নিও না। কারণ, এই দৃষ্টান্ত আবার তোমার পুত্রকন্যারা অনুসরণ করিবে। তাহা তোমাদের নিকটে আনন্দজনক হইবে না। বিবাহ করিবে আর পুত্রকন্যা জন্মিবে না, ইহা মিথ্যা ভ্রম। বিবাহ করিবে আর পুত্রকন্যাদের দায়িত্ব স্বীকার করিবে না, ইহা মৃত পুত্র। বিবাহ

আশ্বিন, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৫৭১

করিবে আর সমাজের সহিত প্রীতি ও মৈত্রীর সম্বন্ধ অটুট রাখিবে না, ইহা আত্মনাশা কুবুদ্ধি।

অনুভব করিতেছ যে, প্রেমের দায়ে মন টলিতেছে। কিন্তু সত্যই কি ইহা প্রেম? যাহাকে বুকে ধরিবার ব্যাকুল আগ্রহে পিতামাতার বুক হইতে ছুটিয়া দূরে সরিয়া যাইতে চাইতেছ, তাহাকে বুকে ধরিবার পরেও হয়ত দেখিবে, দূরত্ব ঘোচে নাই, পূরাপূরি আপন রূপে তাহাকে পাও নাই, তাহার হয়ত কত দৈহিক অযোগ্যতা, কত মানসিক দৈহ্য, কত রুচির পার্থক্য, কত প্রকৃতির গরমিল তখন তোমার কাছে ধরা পড়িবে। মন বিরক্ত হইবে, চিত্ত বিমর্ষ হইবে, অন্তর ক্ষোভে ভরিয়া উঠিবে। অনেক ক্ষেত্রেই ইহা হইতেছে। উদ্ধাম যৌবন বেহিসাবী আবেগে অনেককেই ভাসাইয়া নিয়া গিয়াছে এবং পরে পচা গলা মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন পুত্তিগন্ধময় এক বদ্ধ জলার ধারে নিশ্চয় নিষ্ঠুর তৃণ-গুল্মহীন শুষ্ক বালুকার নিষ্ফল চরায় আটক করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। চখের নেশায় বা মনের ঘোরে এতটা আত্মস্থতাহীন হইও না, যাহাতে নিজ সমাজ, সংসার, পরিজন ও বান্ধবদের নিকট হইতে শত যোজন দূরে চলিয়া যাইতে হয়। প্রেম লইয়া কোটি কোটি কবিতা লেখা হইয়াছে কিন্তু প্রেম যে কি বস্তু, হয়ত কেহই জানে নাই। প্রেমিক বলিয়া পৃথিবীতে যাহারা অনেক তারিফ পাইয়াছে, তাহাদের অনেকেরই ভিতরের ইতিহাস কেহ বিন্দুমাত্রও জানে না। রক্তমাংসের স্পর্শে আসিলে বিমল মধুর প্রেম ক্রমশঃ সমল স্মৃতিভক্ত হইয়া যায়। তারপরে চলে জীবন-ব্যাপী অভিনয়, যাহাকে আর ভালবাসিতে পারা যায় না, প্রতি পদে তাহার প্রতি ভালবাসার প্রমাণ দিয়া চলিবার দুঃস্বপ্ন প্রতিযোগিতা।

মৃতরাং যে ভাবে পার, আগে পিতামাতার সন্মতি আদায় কর।

প্রতিধ্বনি

গ্রন্থ-সমালোচনা

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫৭২

সম্মতিটি পাইলে জীবন হইতে পথ-বাধা অনেকটাই অপসারিত হইবে। একটা মেয়েকে বিবাহ করাই তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় কথা নহে, তাকে সঙ্গে লইয়া একটা অমৃতমধুর শাশ্বত পথে পাদচারণা করিয়া সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিরাম অগ্রসর হওয়াই তোমার প্রয়োজন। এই বিরাট, বিশাল, মহৎ প্রয়োজনের কথা বিদ্রুত হইও না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপামল

গ্রন্থ-সমালোচনা

উপনিষদে সাধন-রহস্য :—শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ বি, ই, তত্ত্ববিশারদ, মিমোছা রিজ, নংখিমাই, শিলং কর্তৃক প্রণীত এবং উক্ত ঠিকানা হইতে “শ্রীনাথ শাস্ত্রালোচনী সভা” দ্বারা প্রকাশিত। সুন্দর বোর্ড-বাইন্ডিং, মূল্য ৩০০ টাকা।

বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য বিজ্ঞানসে সমালোচনা-মূলক ভাবে উপনিষদীয় বিষয়বস্তু সমূহ আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞানের ও দার্শনিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানা বাংলাভাষী সুদীক্ষণের সমালোচনা লাভ করিবে, আমরা আশা করি।

এ ফিউ থট্‌স্ অন চাইল্ড-গাইড্যান্স (A Few thoughts on Child-guidance) :—লেখক—ডাঃ এস, বি, পাল চৌধুরী, এম-এস-সি, এম-বি, বি-এস, ডি ফিল, ডি, পি, এইচ, ডি, টি, এম-ডি, সি, এইচ, ডি, জি, ও (কলিঃ) প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীমতী সুভাষিনী

আখিন, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৫৭৩

পাল চৌধুরী, পি-৫৫, বি, কে, পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫। লেখক
 ডাঃ পাল চৌধুরী শিশুর স্বভাব ও স্বাস্থ্য সংগঠনে পিতামাতার বোধ ও
 বুদ্ধি কিভাবে অনুশীলন করতে হবে, আলোচ্য বইখানিতে বিশেষ ভাবে
 মর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে দেখিয়েছেন। শিশুপালন-পদ্ধতির অদ্বিতীয়
 পুস্তক। পুস্তকখানি পড়িয়া সকলেই লাভবান হইবেন, একথা
 নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বইখানি সাবলীল ইংরাজি ভাষায়
 লেখা। মূল্য ২২ দুই টাকা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

দাতার মৃত্যু নাইঃ—সিংভূম-ঘাটশিলার উৎসাহী কৰ্ম্ম-ব্রাতা
 শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় পিতা ফণিভূষণ সিংহ মহাশয় বিগত
 ২২শে আষাঢ় অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। ঘাটশিলাতে আশ্রম
 স্থাপনের জন্ত তিনি মূল্যবান কয়েক কাঠা জমি দান করিয়াছেন। এই
 ভূমিখণ্ড যতদিন থাকিবে, ততদিন পুণ্যলোক ফণিভূষণ সিংহ মহাশয়কে
 কেহ ভুলিবে না।

নিষ্ঠাশীলা মাতাঃ—কলিকাতার নিষ্ঠাবতী ভগিনী শ্রীমতী আশালতা
 সরকারের একমাত্র এবং উপার্জক পুত্র রবীন্দ্র নীলরতন সরকার
 হাসপাতালে জড়িস্ রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নিষ্ঠাবতী অথও
 শ্রীমতী আশালতা একবিন্দু অশ্রু মোচন না করিয়া পুত্রের শ্মশান-সংস্কার
 হইতে মুক করিয়া শ্রদ্ধা পর্য্যন্ত সব কাজ অথও-মতে করিয়াছেন।

কলিকাতা অখণ্ড-মণ্ডলী পূর্ণ সহযোগ দান করিয়া অনুষ্ঠান সম্বল করেন।

অখণ্ডমতে শ্রীদ্ধঃ—কাছাড়ের সংবাদে প্রকাশ, মণিয়ারখাল আদর্শ-ঘাট নিবাসী ভ্রাতা শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাসের মাতৃশ্রদ্ধ অখণ্ডমতে সন্মান হইয়াছে।

বিশেষ অতিথির ভাষণঃ—ঘাটশিলাতে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও দক্ষিণবিহার অখণ্ড-প্রতিনিধি সম্মেলনের বিশেষ অতিথিরূপে খাত্তার (বাকুড়া) অখণ্ডমণ্ডলীর সভাপতি শ্রীমুকুল গুপ্ত মহাশয় যে ভাষণ দেয়, তাহাতে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা ছিল। যথা,—

“এই সম্মেলন বিভিন্ন প্রদেশবাসী, বিভিন্ন ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণের আত্মায় আত্মায় মিলনের সূচনা করিবে, ভারতের বুক হইতে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বিদূরণ পূর্বক ঐক্য-বিধান করিবে।

“আমরা নিতান্ত ছোট হইলেও সর্বশক্তিমান্ সমুদায় আমাদের দ্বারাই এই জগতে অসম্ভবকে সম্ভব করিবেন।

“ব্যক্তিগত ও সমবেত ভাবে অখণ্ড-মণ্ডলীর মাধ্যমে স্ব স্ব এলাকার লোক-সমাজে অখণ্ড-আদর্শ প্রচার করা আমাদের প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া শুধু ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক স্বার্থপূরণ অখণ্ড আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ”

ভ্রাতা শ্রীমুকুল গুপ্তের ভাষণে প্রণিধানযোগ্য আরও শত শত কথা আছে। স্থানাভাবে আমরা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রধান অতিথির ভাষণঃ—কোলাঘাট (মেদিনীপুর) অখণ্ডমণ্ডলীর

সভাপতি শ্রীমতী ভূষণ রায় ঘাটশিলাতে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও

আগ্নি, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৫৭৫

দক্ষিণ-বিহার অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলনের প্রধান অতিথি রূপে বলেন,—

“প্রত্যেক স্থানের অখণ্ড-মণ্ডলীকে সক্রিয় অবস্থায় রাখতে হবে এবং নিয়মিত ভাবে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা ও ঘরে ঘরে অখণ্ড-সংহিতা পাঠের ব্যবস্থা অতি অবশ্য কত্তে হবে। এ বিষয়ে সকল অখণ্ডকে সক্রিয়, তৎপর ও যত্নশীল হ’তে হবে। ‘ওঙ্কারের জয়বাত্রা’ ছায়াছবিখানা সর্বত্র দেখাবার ব্যবস্থা কত্তে হবে। পুপুন্যী আশ্রমের মঙ্গলবাঁধটির অবিলম্বে পুনর্নির্মাণের কাজে প্রত্যেককে জগন্নাথের রথের দড়ি ধরতে হবে। যেই প্রতিধ্বনি মাসিক পত্রিকাখানা বাইরের ভক্তদের কাছে পরমসমাদৃত, তাকে প্রত্যেক অখণ্ডের ঘরে রাখবার ব্যবস্থা কত্তে হবে। এই প্রসঙ্গে আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই যে’ শিলং অখণ্ড-মণ্ডলী আসামের নিকৃদ্দিষ্ট আত্মীয়দের খোঁজ-খবর দিবার জন্ত যে ব্যবস্থা করেছেন, তার জন্ত অশেষ ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য। আমরা সকলেই বাবামণির যাতে বাহু হ’তে পারি, সে চেষ্টা আমাদের কত্তে হবে। ”

শৌর্য্যোই যৌবনের পরিচয় :—বিমানবাহিনীর সার্জেন্ট আণ্ডতোষ বোষ হুঃসাহসিক শৌর্য্যোর জন্ত বিশেষ পদক পাইয়াছেন। নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন জহরকান্তি দেব হুঃসাহসিক শৌর্য্যোর জন্ত অপর একটি বিশেষ পদকে পুরস্কৃত হইয়াছেন। ভারতীয় বাহিনীর দৈনিকদের শৌর্য্য ও হুঃসাহসের কৃতিত্বকে সম্মানিত করিবার জন্ত এই বিশেষ শ্রেণীর পদক এই প্রথম প্রদত্ত হইয়াছে।

নেফার একটি দুর্গম স্থানে বিমান-সেনার অবতরণের প্রয়োজন ছিল কিন্তু অবতরণের যোগ্য ভূমি নিতান্ত অপরিসর; একদিকে এক হাজার ফুট উচ্চ একটি পাহাড়ের খাড়াই, অপরদিকে গভীর অরণ্য, মাঝখানে খরস্রোতা একটি গিরিনদী এবং বায়ুমণ্ডলের পরিবেশ এলোমেলো ঝড়ের বাতাসে বিক্ষুব্ধ। নির্ভীক সার্জেন্ট ঘোষ কিছু সেই নিদারুণ বিরুদ্ধ পরিবেশ তুচ্ছ করিয়া স্বৈচ্ছায় এবং নিজেই উৎসাহের প্রেরণায় বিমান হইতে ঝাপ্স প্রদান করিলেন।

পাঠানকোর্টে অর্ডার্স রেলওয়ে সাইডিং-এ গোলা-বোঝাই ওয়াগানে আগুন লাগিয়াছিল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বহুলোক নিহত ও আহত হইয়াছিল। অগ্নিশিখা প্রসারিত হইয়া সমগ্র এলাকার বহু সরকারী গুদাম ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। ক্যাপ্টেন দেব এই ভয়ঙ্কর প্রলয়ধ্বনি চক্রের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বহু আহত ও নিহতের দেহ অপসারিত করিলেন এবং বহু অবিস্ফারিত গোলাও সরাইয়া ফেলিতে সক্ষম হইলেন। ফলে বহুজনের প্রাণ এবং বিপুল সাময়িক উপকরণ অবশুস্তাবী ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল।

এই দুইটা ঘটনা কি শুধু কর্তব্য-নিষ্ঠারই প্রমাণ, না, আরও কিছু মহত্তর বস্তুর দিকে ইহারা অঙ্গুলী-নির্দেশ করিতেছে? যে দুঃসাহসিক মহত্ব সার্জেন্ট আগুতোষ ঘোষকে এবং ক্যাপ্টেন জহরকান্তি দেবকে জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিবার যোগ্যতা দিল, তাহাকে সম জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা আমাদের কবে হইবে? জাতির ভিতরে এই দুর্লভ সদৃশের অস্তিত্ব না থাকিলে সার্জেন্ট ঘোষ ও ক্যাপ্টেন দেবের ভিতরে ইহার ইচ্ছাৎ প্রকাশ ঘটিতে পারে না। এই দুর্লভ সম্পদ জাতির ভিতরে আছে, কিন্তু তাহার ব্যাপক প্রকাশকে সম্ভব ও সহজ করিবার দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। তরল আমোদ-প্রমোদ

আখ্যন, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৫৭৭

ও অসার্থক ভাগোচ্ছ্র জালতার প্রশ্রয়-দানের দ্বারা আমরা জাতির যুবক-শক্তিকে সম্বোহিত করিয়া রাখিয়াছি। সাহিত্যোৎসব, যুব-উৎসব, মর্কজ্ঞানীন কালী-দুর্গা-সরস্বতীর পূজা—সব কিছুতেই আমরা যুবকদের ঔসাহসিক কর্তব্যপূর্ণ জীবন-গঠনের বিপরীত আয়োজনগুলিকে প্রাধান্য দিতে স্বেচ্ছাশ্রদ্ধা প্রদান করিয়া চলিয়াছি। আজ যে জাতির ভিতরে শত শত মার্জেন্ট ঘোষ আর শত শত ক্যাপ্টেন দেবের আবির্ভাব প্রয়োজন ছিল, সেই জাতি এই কারণেই দলাদলিপ্রিয় কর্তব্যে কুণ্ঠিত ফেরুপালকে যুবক বলিয়া আখ্যা দিতে বাধ্য হইতেছে।

শ্রীমহেন্দ্র চৌধুরীর ভাষণ :—টি, পি, আই'র ১৫ই আগষ্টের ধুবড়ীর খবরে জানিতেছি,—

“শ্রীমতী স্মৃচেনা কুপালনী অত্র ধুবড়ী পরিদর্শন করেন। আসাম বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীমহেন্দ্র চৌধুরী তাঁহার সহিত ছিলেন। শ্রীমতী কুপালনী কংগ্রেস কর্মিগণ ও সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের এক সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি একটি জনসভায়ও বক্তৃতা করেন।

“শ্রীমহেন্দ্র চৌধুরী জনসভায় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, ‘এক শ্রেণীর ছাত্র ও কিছু সংখ্যক লোকের দুর্কার্যের ফলে আমাদের সুনাম কলঙ্কিত হইয়াছে।’ তিনি বলেন, ‘একটি কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। তাহা হইতেছে এই যে, আসাম কেবল অসমীয়াদের জন্ত নহে, আসাম ভারতের সমস্ত নাগরিকের জন্ত। ভাষার প্রশ্নে কোনরূপ কলহ হওয়া উচিত নহে। কারণ, বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের এখানে বাস করিবার অধিকার এবং তাহাদের স্ব স্ব ভাষায় কথা বলিবার স্বাধীনতা আছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কর্তব্য।’ তিনি বলেন, ‘আমাদের ছাত্রদের জন্ত আমি লজ্জিত।’

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[২ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫৭৮

তিনি আরও বলেন, 'এরূপ সক্ষীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।'

"শ্রীমতী কৃপালনী সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠিবার জন্ত সকলের নিকট আবেদন জানান।"

সব ভাল, যার শেষ ভাল। প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার কাহান্নো লাভ নাই, পরিণামে এই কথা সকলের বোধগম্য হইবে। ভারতবর্ষ তাহার বাঞ্ছিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে।

খুবড়ীতে শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ :—খুবড়ীর ১২শ আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ,—

"আসামের স্বরাষ্ট্র ও অর্থমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ আজ এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, 'যেমন তেন প্রকারে' প্রয়োজন হইলে গুলীবর্ষণ করিয়াও হাঙ্গামা দমনের জন্ত সকলকে নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রীআমেদ আরও বলেন, যেসব সরকারী কর্মচারী কর্তব্য সম্পাদনে 'পক্ষপাতিত্ব' প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও সরকার ব্যবস্থা অবলম্বনের সক্ষম করিয়াছেন।

"গতকাল পুনরায় হাঙ্গামার সংবাদ পাইয়া শ্রীআমেদ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য শ্রীমতী সূচেতা কৃপালনী এম, পি ও আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসিদ্ধিনাথ শর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া আজ এখানে আসিয়া পৌঁছান।

"শ্রীআলি আমেদ বলেন, 'আমাদের ধর্ম্ম ও ভাষা লইয়া গুরুত্বপূর্ণ মধ্যো ব্যগড়াবিবাদ করা উচিত নয়। এই রাজ্যের প্রত্যেকেই তাহা নিজস্ব ধর্ম্ম ও ভাষা ব্যবহারের অধিকার রহিয়াছে।' তিনি আরও বলেন যে সরকার দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্ত প্রারম্ভ

আশ্বিন, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রমঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৫৭২

কোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীআমেদ শান্তি বজায় রাখার জন্ত সকলের নিকট আবেদন জানান। তিনি বলেন, 'আমাদের হাত-সমাজের অপকার্যের জন্ত আমরা অনুতপ্ত এবং এখানে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটয়া গিয়াছে, সেজন্ত সত্যিই আমরা লজ্জিত।'

শ্রীমতী স্মৃতি রূপালনী বলেন,—“বাঙ্গালীদের নিজস্ব ভাষায় কথাবার্তা বলিবার অধিকার আছে। কিন্তু শান্তি বিঘ্নিত হয় এমন কোন কাজ তাহাদের করা উচিত নয়। সম্প্রতি শোভাযাত্রা ও সভানুষ্ঠানের আয়োজন না করিলেই ভাল হইত।”

উপরিলিখিত সংবাদ খবরের কাগজে পাঠ করিলাম। খবরের কাগজে প্রকাশিত সব সংবাদ সকল সময়ে সত্য হয় না। এই কারণে উপরিলিখিত সংবাদ সম্পর্কে আমরা কোনও মন্তব্য দিলাম না। তবে, ভারতের সংবিধান রচনার কালে এই ধারণাই মানুষের মনে সৃষ্টি করিবার জন্ত সংবিধান-রচনাকারীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, ভাষা, জাতি বা ধর্মের জন্ত ভারতের ঐক্যবোধ ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া হইবে না, এমন ব্যবস্থাই করা হইতেছে।

কলিকাতায় মহালয়ার সমবেত উপাসনা :—অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীশ্রী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব আগামী ৪ঠা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর ৩-এ, ক্লার্ক ষ্ট্রীট (ল্যান্সডাউন রোডের নিকট) শ্রীমনোমোহন গাঙ্গুলী, ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল'র গৃহে প্রাতে ৮টায় সমবেত উপাসনা করিবেন। উপাসনান্তে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইবে। এই আশ্বিন তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিবেন।

৪ঠা আশ্বিনের মহালয়ার উপাসনাটি যাহাতে স্মৃতিতা ও শ্রদ্ধার সহিত উদ্ঘাপিত হয়, তজ্জন্ত ২রা আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, রবিবার একটা বিশেষ পরামর্শ-সভার অনুষ্ঠান হইবে, কলিকাতা অঘাচক আশ্রমের মাণিকতলা কেন্দ্রে ১২২।১বি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে প্রাতের সময়ে উপাসনার ঠিক পরে। তাহাতে কলিকাতা ও উপকণ্ঠের সকল অধ্যক্ষ যোগদান করিতে বিশেষ ভাবে আহ্বান করা যাইতেছে। ২রা আশ্বিন রবিবার, এই দিনও উপাসনার পরে আশ্রমে দীক্ষা হইবে।

উদ্বাস্ত-সমস্যার একটি দিক্ :—ভারত বিভক্ত হইবার ফলে পূর্ব-বঙ্গ হইতে যাহারা ছুটিয়া আসিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গে এবং এখানে যাহাদের যোগ্য পুনর্বাসন হয় নাই, আসামের ঘটনাবলির ফলে তাঁহাদের মনে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। সংবাদে প্রকাশ,—

“যে সকল উদ্বাস্ত পরিবার পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বিভিন্ন রাজ্যে পুনর্বাসনের জন্ত স্বেচ্ছায় আবেদন জানাইয়াছিলেন, সেই সকল পরিবার বর্তমানে বাংলার বাহিরে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন আসামে যখন বাঙ্গালীদের উপর নৃশংস আক্রমণ চলিয়াছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে আরও শত শত মাইল দূরে অবস্থিত অত্র রাজ্যে যদি অনুরূপ আকস্মিক আক্রমণ ও নির্যাতন হয়, কে তাহা রোধ করিবে? একটি রাজ্যে বসবাসকারী পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের নিকট হইতে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে যে, সেখানে বৈষম্য-মূলক আচরণ আরম্ভ হইয়াছে। রাজ্য পুনর্বাসন দপ্তর উক্ত প্রদেশের একটা জেলায় ছোট ছোট দলে উদ্বাস্ত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যাইতে রাজী না হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আখিন, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৫৮১

কুশাল ক্যাম্প, ধুবুলিয়া, বনগাঁ, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুরের কতক-
গুলি পরিবার স্বৈচ্ছায় পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে পুনর্বাসনের জন্ত আবেদন
জানাইয়াছিলেন। সরকারী মঞ্জুরী পাওয়ার পরেও শেষ পর্যন্ত তাঁহারা
পূর্ব সিদ্ধান্ত পালনে অক্ষমতা জানাইয়াছেন। তবে উদাস্তগণ
জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত না করিয়া অনেক
লোককে একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে পাঠাইলে তাঁহারা যাইতে রাজী আছেন।
সরকার ইহার সমীচীনতা উপলব্ধি করিয়া পরবর্তী কর্মসূচী অনুযায়ী
দুইটি স্পেশাল ট্রেনে তাঁহাদিগকে দলবদ্ধভাবে উত্তরপ্রদেশে পাঠাইবার
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।”

পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। সমস্ত বাঙ্গালীকে যদি এই
ক্ষুদ্র রাজ্যটুকুর মধ্যেই ধরিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে এই রাজ্যের
মাতৃস্ব নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মরিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং বাঁচিবার
প্রয়োজনেই বাঙ্গালীকে বাংলার বাহিরে যাইতে হইবে। বাংলায় যেমন
সকল রাজ্যের লোকের আগমনের প্রয়োজন আছে, সকল রাজ্যেই
তের্ধন বাঙ্গালীর যাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের
দায়িত্ব হইতেছে, প্রত্যেকের ধন-প্রাণ-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা
করা। সকলকে উদ্বেগমুক্ত করিয়া স্বাধীন দেশের নাগরিকের মত
চলিবার উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে না পারিলে, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের
অপবন ইতিহাসের বুকে অলোপ্য অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবে।
আমরা প্রত্যাশায় রহিয়াছি যে, ঝুড়ি-ঝুড়ি হিতবচন বর্ষণে বিরত হইয়া
ক্ষমতাধিকারীরা নিজেদের শক্তির যোগ্য সদ্ব্যবহার করিয়া ক্ষমতার
প্রকৃত পরিচয় প্রদান করুন। লম্বা-লম্বা কথায় চিঁড়া ভিজে না।
চিঁড়া ভিজিতে জলের প্রয়োজন হয়। মানুষের মনে আশ্বাস আনিবার

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

৫৮২

জগৎ বড় বড় দার্শনিক তিরস্কারের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন হইতেছে বাস্তব ক্ষেত্রে নিরাপত্তাকে প্রতিষ্ঠা।

আরও একটা জিনিষের প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহা হইতেছে, সর্ববিধ বিপদে অনধীৰ থাকিয়া দৃঢ়চিত্ততা সহকারে বিপদকে অতিক্রম করিবার জগৎ হুঃসাহস। বিপদের দিনে হুঃসাহসের মত প্রয়োজন, এমন আর অত্ন কিছুই নহে।

শরতের আগমনে,
ঋতু পরিবর্তনের সময়ে
সর্দি, কাশি, কফ

ও

তজ্জনিত অস্বাস্থ্য ও দুর্বলতার

অঘাচক আশ্রমের অকৃত্রিম

চ্যবনপ্রাশ

এখনই ব্যবহার আরম্ভ করুন,
ব্যবহারে নিশ্চিত উপকার পাইবেন
কারণ, ইহা খাঁটি।

অঘাচক আশ্রম,
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

No.

MAHARAJA

(মাসিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ } কাৰ্ত্তিক, ১৩৬৭ { ৭ম সংখ্যা

सुष्ठुवा *

[অথ গুণমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব]

(8)

(ষা'পতাল)

প্রভাত বিহগকুল কূজনে করে আকুল,
আমি তার ক্ষীণ অনুধ্বনি ;
গগন জুড়িয়া গান কাড়িয়া লইল প্রাণ,
উথলিল গুপ্ত সুরধনী ॥

* ত্রিশ্রীযামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব রচিত গানের বহি “মন্দির”
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তীকালের গানসমূহ
অবিচ্ছিন্নে “মূর্ছনা” নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রঃ সঃ

লোহা ও পারদরাশি

হরষে উঠিল হাসি',

নাচিল উদ্দাম তালে মাটি ও পাথর,

বাসুকীর শতফণা

আরম্ভি' ছুরন্তপণা

এক ক'রে দিল গিরি, দরি ও সাগর;

বজ্রময় বাঞ্ছামাখা সাঁঝে

দুর্গতি ও দুর্যোগের মাঝে

জাগিয়া উঠিল মহা-আনন্দের খনি।

আমি তার ক্ষীণ অনুধ্বনি ॥

মৃত্যুমাখা আনন্দের গন্ধকের ধোয়া

কোথা হ'তে নিয়ে এল অমৃতের ছোঁয়া,

ধ্বংস-ত্রাসে আতঙ্কিত

সর্পিল-ভ্রুকুটি-ভীত

দুর্বল জানিয়া গেল আপনা-আপনি

সহস্র দুঃখের মাঝে কে পরশমণি।

আমি তার ক্ষীণ অনুধ্বনি ॥

(৫)

(গড়খেমটা)

আগে যারা গেছে চলে,
 আমার কুড়ান কুসুমের মালা
 দিলাম তাদের গলে ॥

আমার বকুল রজনীগন্ধা
 হয়ত গন্ধে দীন,
 তথাপি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়
 নহে কভু প্রেমহীন ;
 কুঞ্জে কোকিল হয়ত গাহে না গান,
 তথাপি নীরবে গুঞ্জরে মোর প্রাণ ;—
 সকল অভাব করিব পূরণ
 দু'-ফোঁটা চ'খের জলে ॥

মহাকবি ব'লে যশো লভিবার
 কামনা নাই,
 কেবল যদি গো নিজের মাঝারে
 সবারে পাই ।

এক কণা ভালবাসা
 পুরাইবে মোর আশা,
 গোপ্পাদে আমি গড়িব সাগর
 অশান্ত কুতূহলে ॥

(৬)

(বাঁপতাল)

যে পথে চলিয়া তারা হইল অমর,
 ওরে মন, সেই পথ ধর ॥

কথার কুহেলী নহে,—প্রেমের প্রসার
 সবার খুলিয়া দিল হৃদয়-দুয়ার,
 রহিল না ত্রিভুবনে কেহ কারো পর ॥

সবারে ডাকিয়া আনু প্রাণের পাশে,
 সেই ত আপন জন, যে ভালবাসে ।
 নিজেই ভুলিয়া গিয়া
 হৃদয়ে হৃদয় দিয়া
 জগতের সকলেরে আপনার কর,
 ওরে মন, সেই পথ ধর ॥

কার্তিক, ১৩৬৭]

মূর্ছনা

প্রতিধ্বনি

৫৮৭

(৭)

জননী, জনম-ভূমি, বিশ্ব—এ' তিন্,
এক ওরে এক, নহে তিন্, নহে ভিন্ ॥

একের মাঝারে তিন, তিনেতেই এক,
প্রেমের নয়ন খুলি' প্রাণ ভ'রে দেখ্,
ধাকিস্ না হিংসার চির-পরাদীন ॥

বন্ধ জুড়িয়া যার প্রেম ও আশা,
সকল ভাষাই তার মাতৃভাষা,
ভাবটুকু কর্ সার,
ভেদ-বোধ পরিহার,
“জগৎ জুড়িয়া তোর রহিয়াছে ঋণ”,—
এই মহাভাবে ডুবে থাক্ অনুদিন ॥

সবারে মিলায়ে এক মহাবিশ্ব
সৃজন করাই তোর যোগ্য যে হয়,
মানুষ হইয়া ভবে
পশুর মতন রবে,
মানব-জীবনে এই পরিণাম নয় ।
পশুরে মানুষ কর্, স্ব-ভাবে আত্মীন
মানুষের মন হোক্ দেবতায় লীন ॥

প্রতিধ্বনি

মূর্ছনা

[৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৫৮৮

(৮)

(গড়খেমটা)

জগতের ভিন্ন ভাষা
কত যে ছিন্ন আশা,
সকলি হোক মিলিত

তোরই ঐ বিরাট প্রাণে ;

যে ভাষায় গাস্ না রে গান,
বিভেদের হোক অবসান
সান্দ্বনা-শান্তি-মাথা

মধুময় প্রেমের দানে ॥

হিংসায় উচ্ছলিত
বিদ্বেষে উচ্চকিত
সকলের ভ্রান্ত চিত

জেগে এক মহান্ গানে

ভুলে যাক বিভিন্নতা,
ভুলে যাক অতীত কথা,
ভুলে যাক প্রাণের ব্যথা,
মিলে যাক ঐক্য-তানে ॥

কাণ্ডিক, ১৩৬৭]

মূর্ছনা

প্রতিধ্বনি

৫৮৯

“অমিলন সত্ত্ব মরণ,
মিলনেই সত্য জীবন”,
অমৃতের পুত্র তোরা

শুনা রে সবার কাণে ;

মননের সকল ক্রটি,
কুকাঙ্ক্ষের সকল জুটি
ঘুচে যাক্, যাক্ রে মুছে

প্রেমিকের প্রেমের বানে ॥

(৯)

বিদ্বেষ আর হিংসা দিয়ে
করবি কি বা লাভ ?
ওতে, বাড়বে শুধু পাপ ॥

করবি কারে ঘৃণা, ওরে
করবি কারে ঘৃণা,
ঘৃণাঘৃণি বেশারেশি—
মূর্থতা অশেষ ।
আপন জনে পর ভেবে তুই
ভুগবি মনস্তাপ ?

আজকে যাদের শত্রু ভাবিস্,
 আপন তারা তোর,—
 এক নিমেষে বুঝতে পাবি
 ঘুরলে মনের মোড় ;
 বুদ্ধিরে ভাই ঠিক পথে নে,
 বন্ধুতা কর বিবেক সনে,
 প্রাণ থেকে তুই দূর করে দে
 প্রতিহিংসার ছাপ ॥

পশুর মত খাওয়া-খাওয়ি
 নয় রে পেশা তোর,
 তুই যে মানুষ, জীবের শ্রেষ্ঠ,
 প্রেমেই যে তোর জোর ;
 দেবতা যারা, তাদের যে তুই
 যোগ্য পরিমাপ ॥

পাপের মাঝেই পাপীর নিধন,
 এই কথা নয় ভুল ;
 পাপ থেকে যে রইল দূরে,
 কে তার সমতুল ?
 প্রাণ গেলেও কর্বি না তুই
 প্রেমের অপলাপ ॥

কৃত্তিক, ১৩৬৭]

মূর্চ্ছনা

প্রতিধ্বনি

৫৯১

(১০)

বাস্তে ভাল পারলি না তুই,

বুথাই যে তোর মানুষ নাম ।

হিংসা, ঘৃণা, মিথ্যা কেবল

দেয় রে ঘৃণ্য পরিণাম ॥

মানুষ ব'লে করিস গর্ব ?

পশুর স্বভাব কর' রে খর্ব ।

দে, দিয়ে দে সব-কিছু তোর

সর্ব্বজনের সুখ-কাম,

আত্মদানে বাড়বে রে তোর

সত্য মানুষ নামের দাম ॥

মানুষ শুধুই নয়রে মানুষ,

সৃষ্টিতে সে সব-সেরা,

দেবতা আর ঈশ্বরত্ব

চৌদিকেতে রয় ঘেরা ;

ইচ্ছা হ'লে পারে রে সে

দেবতা-ঈশ্বরের বেশে

লক্ষ কোটি আর্ন্তজনের

প্রাণ করিতে পূর্ণকাম ;

রক্তমাংস নয় রে মানুষ,

মানুষ প্রেমের পূণ্যধাম ॥

মানুষ মানবতার বেদী,
 নাই রে তাতে হিংসা-ধ্বংস;
 দেবতারও পূজ্য মানুষ,
 পূণ্যকীর্তি তার অশেষ;
 সর্বজনের সুখের লাগি'
 নিত্য নয়ন রয় রে জাগি',
 বিশ্বজনার দুঃখ-দূষণ
 ধ্যান যে তাহার অবিরাম,
 তাই ত মানুষ সবার শ্রেষ্ঠ,
 তাই ত মানুষ অভিরাম ॥

(১১)

আপন জনেরে সবাই বাসে রে ভালো,
 পরেরে বাসিতে প্রয়োজন হৃদয়ের,
 যার মাঝে আছে বিশ্বপ্রেমের আলো,
 যার মাঝে আছে উদারতা সাগরের ॥
 হিমাদ্রি হ'তে আরো বেশী উচু হোক
 ভালবাসিবার বিচিত্র সুখ-লোক,
 অতিক্রমিয়া কোটি বিশ্বের সীমা
 ছড়াইয়া যাক্ তোর হৃদয়ের বেড় ॥
 ছোট, বড়, উচু, নীচু যে যেখানে আছে,
 কবে প্রেমভরে টানিয়া আনিবি কাছে?
 চেনা কি অচেনা না করি' কোনো বিচার
 ভুলাইয়া দিবি দুখরাশি জীবনের?

কার্তিক, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

৫২৩

বিজয়ার আশীর্বাদ

ঐ-শ্রী গুরু

বারাণসী

১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েধু :—

স্নেহের বাবা—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিজয়ার স্নেহাশিস-ধারায় তোমরা সিন্ধু হও, তোমাদের অন্তরের সকল ভয় দূর হউক, তোমরা সর্বশক্তি নিয়ে ভগবানের সেবার যাগ্য হইবার চেষ্টা কর। এই যোগ্যতা-সঞ্চয়ের পথে তোমরা গৃহদাহ, লুণ্ঠন, হত্যা বা উৎপীড়ন কোনও কিছুকেই এক কণা মূল্য দিওনা। অপার্থিব মহত্ত্ব অর্জনের জন্ত সকল পার্থিব দ্রব্যকে তোমাদের জয় করিতে হইবে।

অমৃতের তোমরা সন্তান, ভয়কে জয় করাই তোমাদের স্বভাব, সর্ব আতঙ্কের উদ্ভে থাকিয়া তোমরা বিশ্বজনের সঙ্কট-মোচন কর।

গুণ বিজয়া তোমাদের সকল পরাজয়ের গ্রানি মুছিয়া নিক। সরলতা ও সাহস, সততা ও শৌর্য্য অবলম্বন করিয়া তোমরা চল। হিংসার পথে নহে, প্রেমের পথেই হইবে তোমাদের পাদচারণা। বিশ্ব-বিজয়ের শক্তি তোমাদের আছে, ইহা এক নিমেষের জন্তও হুলিও না।

চতুর্দিকের বিভীষিকা দেখিয়া ভাবিও না যে, ইহাই জগতের শান্ত রূপ বা ইহাই বিধাতার চিরন্তন বিধান। এই অমা-রজনীর অবদান আছে, গভীরতম অন্ধকারের বুক চিরিয়াই শান্তি-সুখ-মাখা স্বা-কিরণ নিজেকে বিস্তারিত বিচ্ছুরিত করিবে। কেবল বিশ্বাস রাখ, সাহস হারাইও না।

অধিকাংশ হত্যা ত ভয়ের হাতে হইয়াছে। ভয়কে ভয় কর, সর্বাবস্থাতে মৃত্যুঞ্জয় সাহসকে অবলম্বন কর।

কাপুরুষেরাই অপরকে ভয় দেখাইতে চাহে। সে ভীত হইয়া পড়িলে কাপুরুষদের মনে আরও ভয় জন্মে যে, এই ভয় যদি কখনো দুইয়া যায়, তখন ত বুঝি সে প্রতিশোধ নিবে। তাই কাপুরুষের হিংস্র হয়, নির্মম হয়, নিষ্ঠুর হয়। তোমরা কোনও অবস্থাতেই কাপুরুষ হইওনা। কাহাকেও ভয় দেখাইও না, কাহাকেও ভয়ও করিও না।

সাহসিকতার সাধনা আর ঈশ্বর-সাধনাকে পাশাপাশি রাখিবে। কাপুরুষের ঈশ্বর-সাধনা অতি দুর্বল এবং অনেক সময়েই অবাধ্য। তোমরা সাহসীও হও, সাধকও হও।

সত্য হইতে তোমরা কোনও অবস্থায়ই চ্যুত হইবে না, এই গণ্য কর। প্রাণভয়েও নহে, মানভয়েও নহে, বিষম বিপত্তি আসিলেও নহে, কখনো সত্যকে পরিত্যাগ করা হইবে না। তোমরা অমৃতের সন্তান, অতীত তোমাদের সাধনা, তোমাদের অমৃত অভয়ামৃত। যে অমৃতের দর নাহি, তাহাই অনৃত।

পত্রের আমি উত্তর চাহি না। পত্রের ছত্রে ছত্রে যে সকল উপদেশ ও অনুজ্ঞা যাইতেছে, তাহা পালন করিয়া প্রতি মুহূর্তে তোমরা তোমাদের জীবনকে মূল্যবান হইতে মূল্যবত্তর কর, আমি ইহা চাহি। ভয় দূর কর, আতঙ্ক পরিহার কর, জীব ও জগত্তের প্রাতি বিরাট বিশাল ব্যাপক কর্তব্যকে জীবনের সর্বস্বার্থের উপরে স্থাপন কর।

নিদারুণ ভয় তোমাদের সকল উত্তম হরণ করিয়াছে। তুমি তোমাদের নেত্র-যুগলের আশারূপ জ্যোতি কাড়িয়া নিয়াছে। কার ভয় কি করিবে, কেন জীবন বিপন্ন করিয়া এমন দেশে বাস করিবে, এই

কার্তিক, ১৩৬৭]

বিজয়ার আশীর্বাদ

প্রতিধ্বনি

৫৫

প্রশ্নের দ্বারা তোমরা নিপীড়িত নিষ্পেষিত হইতেছ। আমি বলি, অবস্থা বাহাই হইয়া থাকুক, ভয় তোমরা পরিহার কর।

জীবনে যতটুকু বিপদ, ভয় মানুষের তার চেয়ে কোটিগুণ বেশী। ভয়কে জয় করিলেই দেখিবে, বিপদ লঘু হইয়া গিয়াছে। কাপুরুষেরাই নির্ভীক পুরুষকে ভয় পায়, এই জন্তই গুপ্ত পথে তাহার জীবনাবসান করিবার চেষ্টা করে। মৃত্যু যখন একবারই আছে, মরণ যখন কাহাকেও ছই। তিন, চারি বার করিয়া চুশ্বন করে না, তখন মৃত্যু-ভয় পরিহার করিয়া সৎ, সরল ও সাধু-জীবন বাপন করাই প্রত্যেকের কর্তব্য।

মরণের ভয় করিয়া জীবনকে অপমানিত হইতে দিবার মতন পাপ আর কি আছে? প্রত্যেকে মরণ-ভয়-রহিত হইয়া যাও। কি নারী, কি পুরুষ, প্রত্যেকে তোমরা মরণকে সন্মুখে আলিঙ্গন করিবার জন্ত প্রস্তুত হও। মৃত্যুকে সমাদর করিয়াই অমৃতত্ব আসে। মৃত্যুকে ভয় করিয়া পর করিয়া দিওনা। মৃত্যু প্রতি জীবনের অস্তিত্বের আশ্রয়, শেষ শয়নের সঙ্গী। তার মত প্রিয় কে আর আছে? তার মত শ্রেয়ঃই বা আর কে থাকিতে পারে?

প্রতিটি দিন একটী করিয়া নূতন ভয় তোমাদের জন্ত সৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে তোমরা উদ্বিগ্ন হইতে উদ্বিগ্নতর হইতেছ। কিন্তু বাবা, নিত্য নূতন ভয়ের মাঝে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে করিতেই জগতের শ্রেষ্ঠ বীরেরা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। 'হুঁ নাই ত' কিসের দিগ্বিজয়? বিপত্তি নাই ত কিসের বলার্জুন? 'আঘাত নাই ত কিসের দৃঢ়তা? বিপদ দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যাইও না। বিপদের মধ্যেই যোগ্যতার সম্পদ লুকাইয়া রহিয়াছে। দুর্যোগের দ্বিতরেই শক্তি আহরণের শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

বিপদ দেখিয়া মনকে দুর্বল করিও না। বিপদ-বিপত্তির মধ্য দিয়াই পৃথিবীর সকল মানুষের পথ। বিপদ যতই বাড়িবে, তোমাদের সাহস ততই বাড়ুক। তোমাদের সাহস তোমাদিগকে সংকর্মে পূর্ণাঙ্গের অধিকতর আগ্রহী করুক, অসং কর্মে রুচিহীন করুক। অপর তোমাদিগকে মূর্থ মনে করিতে পারে কিন্তু তোমাদের সাধুতা তোমাদের সাহসের এবং তোমাদের সাহস তোমাদের সাধুতার রক্ষক হউক।

যত ভয়ানক অবস্থাই আসুক, তাহাকে ক্ষীত বক্ষে পাঞ্জা বাড়াই দাও। কোনও অবস্থায়ই পলায়নপর হইও না। বিদ্রোহ রাখিও না, কাহারও উপরে, মমতাও রাখিও না। নিজের উপরে নিজের মন বুদ্ধিসঙ্গত মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে তাহাই অগ্র জনের প্রতি বিদ্বেষের রূপ গ্রহণ করে। বিদ্বেষে বল নাই, আছে দুর্বলতার বীজাণু—বিদ্বেষে বিজয় নাই, আছে পরাজয়ের গুপ্ত পথ। বিশ্বের সকলকে প্রেম দিয়া নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য করা যায়, এবং জানিও, তাহাই বীর্য ধর্ম।

আতঙ্ক যদি ঘরের ছাদ অতিক্রম করিয়া থাকে, তোমার সাহস আকাশের নক্ষত্রকে গিয়া স্পর্শ করুক। ভয়-ভীতিকে আমল দিও। জীবন তাহার মাধুর্য হারায়। উন্নত বায়ু আর উত্তাল সাগর-তরঙ্গ দুইটিকে দুই করতলে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া তোমাদের পথ চরিত হইবে। বাড় থামুক, সমুদ্র শান্ত হউক, ইহাই তোমাদের প্রথম প্রার্থনা হইবে না। প্রথম প্রার্থনা হইবে এই যে, খাণ্ডবদাহনের বিশাল অগ্নি কুণ্ডকে হিমালয়ের তুষার-স্থূপ বলিয়া অক্লেশে মনে করিবার ক্ষমতা চাই।

নির্বোধেরা বিপদ দেখিয়া পলায়, বুদ্ধিমানেরা বিপদকে জয় করিয়া জয় হংসাহসী সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। সিদ্ধি আসে সাধনা হইতে, শিখা আসে বিশ্বাস হইতে, বিশ্বাস আসে ভগবৎ-করণ হইতে। তোমাদের

কাঠিক, ১৩৬৭]

বিজয়ার আশীর্বাদ

প্রতিধ্বনি

৫২৭

প্রতিজ্ঞনে ঈশ্বরের নিকটে করুণা-ভিখারী হও। তিনি দয়া করিয়া বিশ্বাস দিলে,

“থর তরবারি

দেখি শিরোপরি

চিত্তে নাহিক ভয়”

অবস্থাটা হয়।

কবিতা রচনা আর দার্শনিক তত্ত্বের গবেষণা করিতেই প্রতিভা লাগে, সাহস সঞ্চয় করিতে প্রতিভা লাগে না, তাহা মনে করিও না। একটা দুইটা লোককে হাজার লোকে বেড়িয়া ধরিল আর ঘেরিয়া মারিল। ইহা সাহস ও নহে, শৌর্য ও নহে। হাজার লোকের শস্ত্র আক্রমণের মধ্যেও নিরস্ত্র একজন কোনও অবস্থাতেই অত্যায়ে মানিয়া লইল না, ইহাই সাহস। সাহস চরিত্রের বিমলতম প্রতিভা, উজ্জলতম ভূষণ। তোমরা সাহসী হও।

অকপটে প্রার্থনা করি, তোমাদের সকল বিপদ বিদূরিত হউক। তার চেয়েও বেশী প্রার্থনা করি, তোমরা যেন বৃহত্তম বিপদেও মোহমান না হও। বিপদ দেখিয়া যেন তোমাদের অন্তরাত্মা দ্রুত ক্রিয়া কাপিয়া না উঠে। তোমাদের দেখিয়া বিপদ বিপন্ন হউক।

নিদারুণ ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া কেহই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইও না। ভয়ের কারণ সত্ত্বেও অভয়েরই সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। পৃথিবীর সকল স্থানই আজকাল ভয়াবহ হইয়াছে। কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানকে নিরাপত্তার মনে করিবে? দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতৃত্ব কত সরল-প্রাণ নিরীহ লোককে দিয়া কত অকার্য্য করাইতেছে। রক্তাক্ত নর-যুগের উপরে পদক্ষেপ করিয়া নেতৃত্বাভিলাষী ব্যক্তিরা উচ্চ হইতে উচ্চতর ক্ষমতায় আসীন হইতে চেষ্টা করিয়া থাকে, ইহা পৃথিবীর

ইতিহাসে নূতন কথা নহে। কিন্তু ইহা সন্দেহ, বাঁচিবার বাহ্যিক
অধিকার, তাহারা বাঁচিয়াই থাকে, মরে না। তোমরা সজাগ দৃষ্টি
চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিও। পাপের মধ্যেই পাপীর নিধন নিহিত
থাকে। বীণ্ডুথ্রীষ্টের অমর উপদেশ ভুলিও না,—পাপকে ঘৃণা করিবে,
পাপীকে নহে। আজিকার পাপী কাল পুণ্যবান হইতে পারে। আজিকার
বিভ্রান্ত মানব কাল জ্ঞানার্জন করিতে পারে, আজিকার অনিষ্টকারী কাল
তোমার পরম বান্ধব হইতে পারে। কিন্তু সবই নির্ভর করে, তোমার
স্থিতপ্রজ্ঞতার উপর, তোমার অমানব দেবস্বভাবের উপর, তোমার ঐশ্বর্য
শক্তি ও অধ্যাত্ম-মহত্ত্বের উপর, তোমার সবলতা ও যোগ্যতার উপর।

বিপদ দেখিয়া চিন্তিত হওয়া কোনও অসাধারণ রকমের পাপ নহে।
বিপদ-আপদে সতর্কতা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। সতর্কতার বোধ বাহ্যিক
আছে, তাহারা প্রথমেই বিপদের কারণ অনুসন্ধান করে, তার পরে
তাহারা সেই কারণ নাশ করিবার চেষ্টা করে। যেখানে সেই কারণ
কারণকে স্বল্প সময়ে উৎখাত করিবার মতন সুযোগ না থাকে, সেখানে
তাহারাও সহস্রবাহু হইয়া বিপদকে লড়াই দিয়া তাড়াইতে চেষ্টা করে।
কাপুরুষদের মনে এই পৌরুষ কখনো জাগরিত হয় না, তাহারা পলায়ন
করা কেই সকলের চেয়ে নিরাপদ পন্থা বলিয়া ভ্রম করে। পলায়ন সর্ব
সময়েই যে অশ্রাব্য, তাহা নহে। আশু উৎপাত হইতে বাঁচিবার জন্য
পলায়ন করা একটা কৌশল-বিশেষ, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু
প্রাণের ভয়ে মানুষ মানুষকে চিরকালই দৈত্য-দানবের মতন ভীতি
বলিয়া ভ্রম করিবে এবং মানুষের সহিত মানুষের সৌহার্দ্যকে অঙ্গভ্রম
করিবে, ইহা কোনও আদর্শ অবস্থা নহে। বাহারা তোমাদের আত্মার
কারণ হইয়াছিল, তাহাদিগকে বান্ধবে পরিণত করিতে হইবে। প্রেম ও
সাহস এই দুই মহাশক্তির বলে তাহা তোমরা করিবে। সেই শক্তি

তোমাদের আছে, ইহা তোমরা বিশ্বাস করিও। এই বিশ্বাস সকলের মনে তোমরা সংক্রামিত করিও। এই বিশ্বাসের আবহাওয়া তোমরা দিগ্দেশ ব্যাপিয়া সৃষ্টি কর। ইহা আজ তোমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

যেই সময়ে তোমরা নিজেরা নিজেদের কর্তব্য নির্দ্ধারণে একান্তই দশক হইয়া পড়িয়াছ, নেতৃসাধারণের কূটনীতি-পরিচালিত বাক্যামৃতে অন্তের ছোয়াচ পাইতেছ বলিয়া বিশ্বাসে অঙ্কম হইতেছ, সেই সময়ে আমি তোমাদিগকে পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিতেই বারংবার বলিতে চাহিতেছি। পরমেশ্বর বিশ্বপ্রভু, তাঁহাতে বিশ্বাস হস্ত করিলে বিশ্বের সকলকে আপন বলিয়া ভাবিতে মনে সাধ যায়। সকলেই ত' তাঁহারই কাছ হইতে আসিয়াছে, তাই তাঁহাতে ভালবাসা অর্পণ করিলে বিশ্বের সকলের প্রতি ভালবাসা প্রধাবিত হয়। যাহাকে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাকেও একান্ত প্রিয়জন রূপে ভাবিবার, জানিবার বা পাইবার ইহাই কৌশল। জগতের কোনও রণনীতির পুস্তকে এত বড় আর কোনও কৌশলের কথা উল্লিখিত হয় নাই। বিশ্বের সর্বজাতির প্রতি তোমাকে প্রেম-বিস্তার করিতে হইবে, তোমার প্রেমের বাহুযুগল সকল সমাজের সকল লোকের জন্ত প্রসারিত হইবে, এই অসাধ্য-সাধন তোমার পক্ষেই সম্ভব। তাই তোমাকে আজ নিজেকে সর্বপ্রযত্নে বিশ্বপতির সহিত প্রেমের নিগড়ে বাধিতে হইবে।

ভয়ের কেন ক্রীতদাস রহিবে? আদর্শের দাস হও। ভয়ের হাতে গীবন ন'শিয়া না দিয়া আদর্শের হাতে দাও। আদর্শের দাস হও, আদর্শের জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত হও। অধীনতা স্বীকার কর আদর্শের। গীবনের বিনিময়েও আদর্শকে অমলিন রাখিতে হইবে। আদর্শকে

প্রতিধ্বনি

বিজয়ার আশীর্বাদ

[১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬০০

কোনও অবস্থাতেই ছোট করা হইবে না। তোমাদের আদর্শ সর্বলিঙ্গনকারী, তোমাদের আদর্শ বিশ্বগ্রাসী, তোমাদের কাছে কেহ পর, কেহ শত্রু, কেহ প্রতিপক্ষ থাকিতে পারে না। আপনার জন্ম জন্ম এবং পরের জন্ম সমভাবে তোমাঙ্গিকে আত্মবিসর্জন দিবার জ্ঞ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। চোখের সমক্ষে মনুষ্যত্বের অসম্মান হইবে নারীর মর্যাদা লাঞ্চিত হইবে, শিশুর উপরে উৎপীড়ন হইবে, নীরবে তাহা দেখিবে, ইহা আদর্শবাদীর আচরণ নহে। অত্যাচার প্রতিবাদ করিলে প্রাণ বাইবে বাঁ জেল হইবে, এই ভয়ে পলায়ন করি নিরাপদ থাকিবার চেষ্টা করিও না। জীবনকে কখনও এত মূল্য মনে করিও না যে, যে-কোনও মূল্যে ইহাকে রাখি হইবে। যে জীবনে সংসাহস নাই, তাহার ধাক্কারও কোন সার্থকতা নাই। সংসাহস, সমর্থন, মিথ্যার প্রতিবাদ এবং সর্বজনে প্রেম একাধারে সুসম্ভব। তবে ইহার জন্ম সাধনার প্রয়োজন। গ্রাম্য রীতিতে বোকা প্রচলিত পথে হীন স্বার্থপরতার সহিত কুটুম্বিতা করিয়া এমন দি জীবন লাভ করা যায় না। জীবন কখন দামী হয়? কখন ইহা বিনিময়ে অনেক দামী জিনিষকে রক্ষা করা হয়। সাময়িক নিরাপত্তার জন্ম জীবনকে কাপুরুষত্বের হাতে সঁপিয়া দেওয়া মহাপাপ।

ভীতির দৃষ্টিতে নহে, আশার দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের পানে তাকান তোমাদের একেবারে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে, এমন ধারণার দ্বারা তোমাদের কোনও অবস্থাতেই পরিচালিত হইও না। বাহা ঘটিয়াছে, তাহা মন্থাস্তিক কিন্তু তাহাই ইতিহাসের শেষ কথা নহে। বাহা হইয়াছে, তাহা করিয়াছে, তাহারা একদা ভাল করিতে পারে। তোমাদের দল

কার্তিক, ১৩৬৭]

বিজয়ার আশীর্বাদ

প্রতিধ্বনি

৬০১

ক্ষতি পরম লাভের রূপই যে পরিগ্রহ করিবে না, তাহার কি কোনও চূড়ান্ত নির্ধারণ হইয়া গিয়াছে? ইতিহাসের লিখন কি এক দিনে বা এক নিঃশ্বাসে শেষ হইয়া যায়? বাহা ঘটিয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সম্মুখে আসিতে পারে, কিন্তু সকল অবস্থাতেই ভীতি-বিহ্বলতা পরিহার করিয়া আশারূপ নয়নে জগতের প্রতি তাকাইতে হইবে। ভবিষ্যৎকে আতঙ্ক নিয়া দেখিলে, ক্লীব ভবিষ্যৎও মহত আতঙ্কের জনক হইয়া বসে। ভবিষ্যতের নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই, তুমি তাহাকে যেমন করিয়া গড়িবে, সে তেমন হইয়াই উঠিবে। আশঙ্কা, আতঙ্ক, বিষম ভয় ও খিভীষিকা দেখিবার কদভ্যাস পরিহার কর। অন্ধকার রজনীর পরেই অরুণোদয় হয়, নিশার কবন্ধেরা তখন বাতাসে মিলায়।

তোমরা কোনও সুখের রাজশয্যায় শায়িত নহ। হয়ত, বিনিদ্র চলিয়াছে তোমাদের রজনী। উদ্বেগে বহিতেছে তোমাদের দিনের গতি। তবু বলি, বিপদ অতিক্রান্ত হইবেই, এই বিশ্বাস যাহার আছে, তাহার বিপদ থাকে না। প্রতিদিন একটা করিয়া পর্বতচূড়া স্বজনকে দাবনের কন্মতালিকা কর। আঘাতে মানুষ সবল হয়, বিপদে মানুষ সাহসী হয়, ইহাই আঘাত ও বিপদের স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক পরিণতি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইও না, বিপদের মধ্য দিয়া কতটুকু সবলতা, সংসাহসিকতা, ক্রীড়ামূল্য শৃঙ্খলা ও মানসিক উদারতা সংগ্রহ করিতে পার, তাহার সন্ধান দেখ। বিপদ কেবল বিপদই নহে; তাহা সম্পদের বার্তাবাহিকাও বটে। যে সহিয়া থাকিতে পারে, সে রহিয়া যায় এবং ভাগ্যলক্ষ্মীকে অক্ষশায়িনী করে।

জনে জনে প্রেমের প্রসার সাধন কর। জগতের প্রতিজনকে

আপন বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্ত আগ্রহী হও। তোমার উল্লস
আপনত্ব সকলের মনের মালিঞ্চ দূর করিয়া দিতে সমর্থ হউক।

ভয় করিবার কদভ্যাস ত্যাগ করিয়া সাহস করিবার সদভ্যাস
তোমরা অর্জন কর। আকাশে মেঘ দেখিলেই কেন ভাবিতে বসি
যে বজ্রপাত হইবেই? শতবার মেঘ আসে আর যায়, বজ্রপাত একবার
ছুইবারই হয়। যেবার বজ্রপাত হইবে, সেবার তাহা যে তোমারই শির
পড়িবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? বনের বাঘে কয়টা মানুষ নিহত
হয়? মনের বাঘেই ত' সকলকে সাবাড় করিয়া দিয়া যাইতেছে
তোমরা মনের বাঘকে দূর করিয়া দাও, বনের বাঘকে সামনা-সামনি
দেখিয়া তার প্রতি প্রেম-বিস্তার কর। প্রেমই তোমার জীবনের সার
সত্য,—ভীতি বা দুর্বলতা নহে। কনুইয়ের গুঁতা খাইবার ভয়ে রথের
নারিকেল ছিনাইয়া আনিবার আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া
কেন? রথের নারিকেল ভাঙ্গিয়া খাইবার দিনে ত' শত্রু-মিত্র-বিক-
শেষে সকলকে লইয়া এক পাতে বসিয়া যাইতে হইবে। তাহার আনন্দ
যে জগতের এক সেরা আনন্দ। তোমরা সাময়িক মানসিক দুর্বলতায়
দুঃখ জীবনের বিপুল সাফল্যকে অন্ধকূপে ডুবাইয়া দিও না।

সংশয়, সন্দেহ আর দ্বিধা, এই তিনটি আত্মঘাতী বৃত্তিকে তোমাদের
উপরে কখনো প্রভুত্ব করিতে দিও না। সংশয়কারী নিজের বলকে
বিভক্ত করে, সন্দেহকারী উত্তমকে শিথিল করে, দ্বিধাগ্রস্ত মন চঞ্চল
শৃঙ্খলে বাঁধে। ভয় সত্য চেষ্টা হইতে বিরত করে, মিথ্যার সহিত
আপোষ করিতে বাধ্য করে। সংশয়, সন্দেহ, দ্বিধা আর ভয়, ইহাদের
কখনো পরিচায়ক হইও না।

সর্বজীবে প্রেমের মধ্য দিয়া তোমরা সর্বজীবের প্রেমিকতায়
প্রকটিত করিয়া তোল। সকলকে আপন কর, সকলকে বন্ধ

সকলকে প্রতি সংকার্যে সহযোগী কর। কাহারও প্রতি অপ্রীতির
কটাক্ষ নিক্ষেপ করিও না।

মনের সাহস আর শরীরের বল যদি যুক্ত হয় মহান্ আদর্শের সহিত,
তাহা হইলে কোন্ অসাধ্য তোমরা না সাধিতে পার? এই জগত্ই
আমি সাহস, শক্তি ও আদর্শবাদের কথা তোমাদের অত করিয়া বারং-
বার বলি! কোনও নীচ বুদ্ধি বা হীন চেষ্টা দ্বারা যেন তোমাদের আদর্শ-
বাদ কখনো মলিন না হয়।

জীবনকে শুলভ করিও না। নীচ কর্ম হইতে প্রতি জনে নিবৃত্ত
হও। শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ বাক্যের সহিত নিজেদের নিয়ত যুক্ত
রাখ। জীবন থাকা বা যাওয়া যেন মহৎ প্রয়োজনের মুখ তাকাইয়া
ঘটে।

মহৎ আদর্শের রূপায়ণে যাহারা জীবন দেয়, তাহাদের কি মৃত্যু
আছে? মৃত্যুভয়কে অন্তর হইতে একেবারে বিদূরিত করিয়া দিতে
হইবে। মৃত্যুটা যে কিছুই নহে, এ কথার প্রমাণ অতীতে অনেক
মহাজন দিয়াছেন। তাহাদের পুণ্য চরিত তোমরা নিয়ত আলোচনা
কর। মৃত্যু তোমাদের নিকটে পরম-প্রিয়তমের প্রণয়ম্পর্শে পরিণত
হইক। মৃত্যু-ভয়কে যাহারা জয় করিতে পারে নাই, তাহারা জীবন
ভরিয়া খাটিয়াই গেল, কোনও সত্যই লাভ করিতে পারে নাই,
কোনও সম্পদই অর্জন করে নাই, ইহাই জানিও।

উচ্চ কোনও আদর্শের প্রেরণায় যদি পরিচালিত না হও, তাহা হইলে
মানুষ হইয়া, সমাজ গড়িয়া, রাষ্ট্র-পরিচালনা করিয়া, সাহিত্য রচিয়া,
নিত্য নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া তোমরা কিছুই কর নাই
জানিবে। প্রতিটি মানুষের জীবনকে মহান্ আদর্শের অন্তর্গত হইয়া

চালাইবার আয়োজনে তোমরা মন দাও। হৃদিনের দুর্গতিকে দুর্গতি বলিয়া ধরিয়া লইও না, এই দুর্গতির মোড় ফিরিতে বেশী দি লাগিবে না। আদর্শবাদকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর। আস্তে আস্তে অনেক অকল্পনীয়, অভাবনীয়, অসাধারণ ব্যাপার সব আশু-প্রকাশ করিয়া তোমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিবে যে, সত্য পক্ষে পৃথিক কখনো পরাজয়ের গ্লানি বহন করে না।

সত্য, ধর্ম ও ঋয়ের মর্যাদা রক্ষার জন্ত তোমাদের জীবন ব্যরি হউক। তোমাদের জীবন পাপ-মুক্ত, ত্রাসমুক্ত হউক।

নীচতার জবাব নীচতা দিয়া দিওনা। অসত্যের জবাব সত্য দি। হিংসার জবাব প্রেম দিয়া দিতে হইবে। কি করিতে পার, কহু তোমার ক্ষমতা, ইহা বড় কথা নহে। কি করিতে চাহ, কি তোমার লক্ষ্য, ইহাই বড় কথা। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি কখনো হেঁট করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

সংস্কৃত-ভাষা

২৭শে ভাদ্র, ১৩৫৭

ঔ-শ্রীগুরু

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে-কোনও বিষয়ে একটা নির্দেশ পাইবামাত্র হাজার লোক সব বিতর্ক ত্যাগ করিয়া এক মনে এক প্রাণে কাজ শুরু করিবে, এই

উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে, দেশে দেশে সভ্যসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থান্ধাভাব, সময়ান্ধাভাব বা স্মরণের অভাব আদি কোনও ওজুহাতকেই আমল দেওয়া হইবে না, তেমনটি চাহি। সংস্কৃতকে সর্বভারতীয় ভাষা করিবার জন্ত আমার যে আন্দোলন, তাহা সম্পর্কে তোমাদের এইরূপ আগ্রহের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

কোনও আন্দোলনই একদিনে সফল হয় না, তার জন্ত ধারাবাহিক উত্তম চাহি। এই জিনিষটী তোমাদের মধ্যে আমি চাহি। ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা চেষ্টা করিয়া ইংরাজীকে সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষায় উন্নীত করিয়াছিলেন। আজও ভারতের সর্বপ্রান্তে যুগপৎ কাজ করিতে হইলে ইংরাজি অবশ্যই শিখিতে হয়। হিন্দী ভাষাকে সেই যোগ্যতা দিবার জন্ত বর্তমান হিন্দী-প্রেমিক রাজপুরুষেরা চেষ্টা করিতেছেন। তোমরা মনে রাখিও যে, হিন্দীর সেই ভাবী কৌলীন্যের প্রতি আমাদের জীর্ণা, বিরাগ বা বিদ্বেষ নাই। হিন্দী যদি সর্বভারতীয় ভাষা হয়, তাহা হইলেও ভারতীয় বিপুল জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ লোককে একেবারে নূতন করিয়া হিন্দী শিখাইতে হইবে। আসাম, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরল, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, আদি রাজ্যের মাতৃভাষা হিন্দী নহে। কিন্তু চেষ্টা দ্বারা ইহাদের সকলকে হিন্দী শিখান নিশ্চয়ই সম্ভব। নৃতরাং সমগ্র ভারতের সর্বত্র সংস্কৃতকে প্রচলিত করার চেষ্টাকে অসাধ্য বা বাতুলতা বলিয়া কেন মনে করিতে হইবে? হিন্দী প্রচারের চেষ্টাকে আমরা ব্যাহত করিতে চাহি না, তাহা সম্ভবও নহে, সম্ভবও নহে। হিন্দীকে সংবিধান স্বীকার করিয়া রাখিয়াছে, আমরা সংবিধানের বিরুদ্ধে কেন বাইব? কিন্তু সংস্কৃতকে অস্বীকার করাও সংবিধানের কর্তব্য নহে, কারণ সংবিধানের লক্ষ্য ভারতীয় ঐক্য। এই ঐক্য কেবল

আজিকার জন্ম নহে, অনাগত কালের অফুরন্ত গতি-প্রবাহেও বাহ্যিক
এই ঐক্য ধ্বসিতে না পারে, সংবিধানের লক্ষ্য সেই সুমহান হৃদয়
ঐক্য। চেষ্টা চলিতে থাকিলে একদা সংস্কৃতই সমগ্র ভারতের সর্বজন
মিলনের ভাষা হইবে এবং তাহার ফলে ভারতীয় ঐক্য চিরস্থায়ী
রহিবে। ভাব-সম্পদের জন্মই সংস্কৃত মহান, কেবল প্রাচীন বলিয়া
আমরা ইহার পক্ষপাতী নহি। মিশরের “মমি”ও প্রাচীন, কিন্তু সংস্কৃত
ভাষা আজও জীবন্ত, ইহা অরণ্যভীত অতীতের মৃত কঙ্কাল নহে। যে
কারণে আফগানিস্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে
আজও সংস্কৃত ভাষা অবশ্য-পাঠ্য, সেই কারণেই ভারতের সকল রাষ্ট্র
সংস্কৃত ভাষা প্রত্যেক ছাত্রের অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত।

যাঁহারা বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত বলহ করিও না।
যাঁহারা সমর্থক, তাঁহাদের দ্বারা তোমাদের কর্মের ক্ষেত্রে দিনের পর
দিন প্রসারিত কর। আমি এই আন্দোলনের জনক হইয়াছি কেন
হজুগে নহে। অতীত ভারতবর্ষকে যতটা ভালবাসি, ভবিষ্যৎ
ভারতবর্ষকে ততোধিক বাসি বলিয়াই এই আন্দোলন জনপ্রিয়
করিয়াছে। এই আন্দোলন আরও বিশ বৎসর পূর্বে আরম্ভ কর
আমাদের উচিত ছিল। “অথগু-সংহিতায়” বিধৃত আমার বহু বৎসর
পূর্বোক্ত উপদেশ সমূহ দেখ। প্রমাণ পাইবে যে কত আগে আমি
সংস্কৃতের সম্ভাবনা এবং সংস্কৃতের শ্রীবৃদ্ধির সহিত ভারতীয় ঐক্যের
চিরস্থায়ী সম্পর্কের কথা জানিয়াছিলাম ও জানাইয়াছিলাম। বিহ
ইংরাজ-রাজত্ব-কালে নিয়ত বিনা বিচারে বন্দী হইবার সম্ভাবনার সহিত
লড়াই করিয়া আমাকে কাজ করিতে হইয়াছে, আন্দোলন হিসাবে এই
কাজটাকে ধরিবার অবসরই পাই নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ আমি
দেখিয়াছিলাম। আজও ইংরাজের কষাঘাতের চিহ্ন আমার পূর্বে

হইতে লুপ্ত হয় নাই, আমি যশঃপ্রার্থী হুজুগবাগীশ নহি। দেশের সেবায় বাহারা লাঞ্চিত হইয়াছিলেন, নিভাত্ত নিকৃষ্ট হইলেও, তাঁহাদের মধ্যেই আমার স্থানটুকু স্মৃতিস্থিত রহিয়াছে।

সংস্কৃতকে সর্বভারতীয় ভারতীতে পরিণত করার এই আন্দোলন বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ বা শত বৎসরেই মরিয়া যাইবে বলিয়া মনে করিও না। ইতি—

আশীর্বাদক

অরুণানন্দ

পুপুনকার পত্র

(১)

ও শ্রী গুরু .

২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেযুঃ—

স্নেহের বাবা স্নেহময়—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দুঃস্থ কফের আক্রমণে বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। কলিকাতায় থাকিতেই ইহা ছিল। হঠাৎ ইহার সৃষ্টি। মঙ্গল-সাগরে নৌচালন-কালে ইহা কম থাকে। কিন্তু দুপুর রৌদ্রে মঙ্গল-বাঁধের কাজ দেখিবার কালে ইহা বাড়ে। এমন নিদারুণ কফ সম্ভবতঃ বাল্যকালে ছাড়া আর কখনও দেখা যায় নাই। সংবাদ জানাইবার জন্তই লিখিলাম, এই সংবাদে উদ্বিগ্ন হইও না। ভগবান্ মঙ্গলময়। মঙ্গল-উদ্দেশ্য ছাড়া তিনি কখনো কিছু করেন না।

মঙ্গল-বাঁধের কাজ পুনরায় আরম্ভ হইয়ছে। আমি ও সাধনা ছই

জনেই ছাতা মাথায় দিয়া প্রায় সারাদিন কাজ দেখিতেছি। মঙ্গল-সাগরের জলোচ্ছাস আমাদের মনে ব্যস্ততা আনিয়াছে। এদিক এই কয়দিনের শ্রমেই এবং নিদারুণ রৌদ্রতাপে শরীর পুনরায় মগীর্ণ হইয়াছে। সাধনাকে দেখিলে এখন আর চিনিতে পারিবে না। তবে পা-ফুলা আদি গত বারের উপসর্গ এবার এখনো দেখা দেয় নাই। ভাবী কালের দিকে তাকাইয়া এই কঠোর শ্রম করিতে হইতেছে। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া বিচারজন করিবে, এমন বিচার কেশরিগণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। গতানুগতিক শিক্ষা গতানুগতিক জীবনই সৃষ্টি করে, শৃঙ্খলমোচনের ক্ষমতা দেয় না।

আমি বেলা একটায় পুরাতন আশ্রমটীতে চলিয়া আসি, সাত তিনটা পর্য্যন্ত প্রফ দেখি, পত্রাদি লিখি। সাধনা আর আসেনা। সে ঐ সময়টুকু মঙ্গল-কুটারে বসিয়া বিশ্রাম করে। এত বড় জলাশয় হওয়াতে ঐখানে বাতাসটা খুবই তৃপ্তিকর। সাত তিনটায় দুই তিন খানা রুটি খাইয়া পুনঃ কাজের দিকে যাই। চারিটায় কাজ শুরু।

চমৎকার এ জীবন। তবে দুঃখ এই যে, এত খাটুনির পর লেখনী ধরিবার সময় মিলেনা। কার্যিক শ্রম ছাড়িয়া দিয়া এখন যদি সমস্ত দিন লিখিতাম, হয়ত জগতের অল্প দিক দিয়া যে অকপটেই করিতে পারিতাম। কিন্তু কার্যিক শ্রমের কঠোরতা মাত্রা কিছুতেই কমাইতে পারিতেছি না।

সাধনার দাঁতের যন্ত্রণা কমিয়াছে। হয়ত কলিকাতা গিয়া সে পর্য্যন্ত দাঁত নাও ফেলিতে হইতে পারে। কিন্তু অল্প একটা ফাটা বাড়িয়াছে। তাহা এই যে, তুমি, আমি ও সাধনা এই তিন জন একজন যদি এত সব বিরাট কর্ম ফেলিয়া রাখিয়া ইহলোক ছাড়ি

কার্তিক, ১৩৬৭]

পুপুন্যকীর পত্র

প্রতিধ্বনি

৬০৯

বাই, তবে কি উপায় হইবে, এই চিন্তা তাহাকে উৎপীড়ন করিতেছে। ধর্ম করিতেই মৃত্যু চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু জনসেবামূলক কর্ম্মানুশীলন করিতেও যদি মৃত্যু-চিন্তা আসে, তাহা হইলে কাজে অত্যন্ত ব্যস্ততা বাড়িয়া যায়। অথচ ব্যস্ততা ও উদ্বেগ এই দুইটাই সর্বাপেক্ষা দ্রুত আয়ু হরণ করে।

একদা সাধনা পুপুন্যকীর আশ্রমটিতে নিজের মাথায় শত শত টুকরী মাটি ও পাথর অবহেলে বহিয়াছে। কখনো কখনো সারারাত জাগিয়া গাছের গোড়ায় জল-সিঞ্চন করিয়াছে। আধুনিক কর্ম্মীদের ভিতরে একরূপ আগ্রহ বা উদ্দীপনা কমই লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ হইতে দুইটা কর্ম্মী আসিয়াছিল, তাহাদের একজন ত একবেলা শ্রম করিলে অল্প বেলা কোনও কাজেই হাত দিত না। কর্ম্মীদ্বয় আসিবার পরে হুমাস না বাইতে ঘরে ফিরিবার জন্ত ব্যগ্র হইল। পঞ্চাশ-ষাটটা টাকা খরচ করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ দেশে ফেরৎ পাঠাইতে হইয়াছে। আশ্রমটির কর্ম্মি-ভাগ্য এই রকম। এই অবস্থায়, দুদিনের জন্ত বেড়াইতে আসিয়াও সাধনার শ্রমের অবধি নাই। ভবিষ্যতের মেয়েরা সাধনার কথা মনে রাখিলে উপকৃত হইবে।

একমাত্র পরিশ্রমের কঠোরতার দিক ছাড়া অস্ত্রান্ত্র সংবাদ এইখানে শুভই বলিব। অন্তত কিছু দেখিলেও আমি বিচলিত হই না। তবে আমাদের ঘটনাবলিতে মনে আমার বিপুল বেদনা। অতি-ব্যস্ততা ও অত্যধিক বেদনা-বোধ, এই দুইটা জিনিষই কর্ম্মের গतिकে পিছন-টান দেয়। নোয়াখালীর দুর্ঘটনার সময়ে মনের অবস্থা যাহা ছিল, বর্তমান সময়ে আমার মনের অবস্থা প্রায় তাহাই। একেবারে অনু-

প্রতিধ্বনি

পুপুন্যকীর পত্র

[৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬১০

রূপ, এমন বলিতে পারি না। ঘটনাগুলির প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য আছে। আমি এখানে নিশ্চিত মনে দুই বার পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছি, কিন্তু কত অসহায় বৃদ্ধ, নারী ও শিশু ভবিষ্যৎ না জানিয়া অনিশ্চিত উদ্বেগে কাল কাটাইতেছে, কাহারও কাহারও আশ্রয়-শিবিরে দয়াদত্ত খেচরান মাত্র দুই একদিন বাদে মিলিতেছে। আহা ও মিত্র আমার নিকটে বিষ হইয়া গিয়াছে।

তবু আশা করিব, মঙ্গলময় ইহার মধ্য দিয়া মঙ্গলই সাধিবেন। দুর্ভোগের সুযোগগুলি যদি প্রত্যেকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিত, তবেই দুর্গতি দূরীভূত হইত। এমন মেঘ নাই, যাহার কিনারে রূপালী আভা থাকে না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

পরমেন্দ্রের বাবা ও মায়েরা,

চতুর্দিকে যেখানে যে আছে আমার সন্তান, সকল অন্তরায় ও হৃদ্যবেশ হইতে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রতিজনকে জানাও যে, আমার সন্তানকে আমার সন্তানত্ব অস্বীকার করিয়া চলিত দেওয়া হইবে না। প্রত্যেককে সাহস, শৌর্য ও ধীরতার সহিত জগৎকল্যাণ-কর্মের অগ্রসর হইতে হইবে। কেবল নিজের স্বার্থ লইয়াই নিজের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া নিজেকে জড়াইয়াই থাকিতে চাহে, তাহার পক্ষে আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ অত্যাশ্চর্য হইয়াছে। ভবিষ্যতে এমন লোককে দীক্ষার ঘরে তোমরা ঢুকিতে দিওনা :

এই আশীর্বাদ তোমাদের জানাইতেছি যে, যে-কোনও বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সঙ্গত সংগ্রাম ও ধর্মোপেত প্রতিরোধ দিয়া তোমরা জগতে মানুষের মত মাথা উঁচু করিয়া ক্ষীণ বক্ষে সকলের কল্যাণ-সাধনের জ্ঞা বাঁচিয়া থাক। হীনতা ও হীন স্বার্থপরতা, ভীকৃত্য ও ভীকৃত্য আত্মপরাণতা তোমাদের চরিত্রকে যেন স্পর্শ মাত্র করিতে না পারে।

এই আশীর্বাদ তোমাদের জানাইতেছি যে, নিখিল বিশ্বের ছোট-বড়, অনুকূল-প্রতিকূল প্রত্যেকটা ব্যক্তি ও জাতির প্রতি মৈত্রী-পরায়ণ হও, সকলকে প্রসারিত বাহুতে বক্ষে টানিয়া আনিয়া আপন করিবার যোগ্যতা অর্জন কর। পৃথিবীতে কোনও কারণেই কেহ তোমাদের পর থাকিবে না, এমন শক্তি, এমন উদারতা, এমন মহত্ব অর্জন কর।

মঙ্গলবাধের কাজ একটা আকস্মিক আশাভঙ্গের সন্মুখে ধমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। আসামের নিদারুণ পরিস্থিতির পরে আর এই প্রত্যাশা করা চলে না যে, পূর্বের মত দ্রুত গতিতে এই কাজ আর চলিতে পারে। কারণ, আসামের অখণ্ডেরাই ছিল মঙ্গলবাধের অগ্রণী ও প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক। তথাপি কাজ একদিন না একদিন শেষ হইবেই, এই ভরসা করি।

মঙ্গলবাধ একটা অতি বিরাট ব্যাপার। ইহাকে সম্পূর্ণ করাও যেমন দুরূহ, তেমন আবার ইহা সম্পূর্ণ হইয়া গেলে এক অভাবনীয় প্রতিষ্ঠানের জন্মও সুসম্ভব হইবে। এই বিষয়ে তোমরা এতদিনে নিজেরাই বথেষ্ট চিন্তা করিয়াছ। তোমাদের চিন্তাশীল ভ্রাতারা নানা প্রতিনিধি-সম্মেলনে তাহাদের গভীর চিন্তাপ্রসূত দিগদর্শন তোমাদিগকে যোগ্যভাবেই উপঢৌকন দিয়াছে। এখন প্রয়োজন একাগ্র ও ঐকান্তিক সহযোগিতার। তোমরা কেহ কেহ তাহা করিতেছ।

তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে, অল্প অল্প সহযোগিতায়, আস্তে আস্তে আমার বহুদিনের শ্রমে সৃষ্ট একটা কীর্তি স্থায়ী ভাবে রক্ষার ব্যবস্থা হইতে চলিয়াছে। ইহা আমার পক্ষে যেমন আনন্দের, তোমাদের পক্ষেও তেমন গৌরবের। সংখ্যায় তোমরা লক্ষাধিক ব্যক্তি আমার শিষ্ঠশ্রেণীভুক্ত হইয়াছ। কিন্তু সাম্প্রতিক এই সাজিবক কর্তব্যে তোমরা মুষ্টিমেব কতক জনেই অবহিত হইয়াছ। অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিরও যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে চিরস্মরণীয় কার্য করিতে পারে; তোমরা তাহার দৃষ্টান্ত হইয়াছ।

আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম যে, আগামী ১০।১১।১২ই পৌষ, রবি, সোম, মঙ্গলবার তোমরা তিনটা দিন তোমাদের পুপুনকীর গুরুদেব বাস করিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, হইল শাকানের অধিক হয়ত তোমাদের প্রসাদরূপে দিতে পারিব না, ও তোমরা তোমাদের নিজেদের চেষ্টায়, জনসাধারণের কাছে চাঁদা না তুলিয়া, ভিক্ষা না করিয়া কি জিনিষ গড়িয়া তুলিতে যাইতেছ, তাহা একবার অবশ্যই স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবে। ইহা দর্শনে তোমাদের একদিকে যেমন তীর্থ-দর্শনের পুণ্য হইত, অন্য দিকে তেমন ভাবী জীবনের কর্ম-সাধনার ইঙ্গিতও এখানে পাইতে। ঐ সময়ে তোমরা আসিলে তোমাদের নিজ নিজ স্থানীয় জন্মোৎসব ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া একটা আশঙ্কা আছে সত্য এবং সেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া চারিদিক হইতে বহু অথগু-মণ্ডলী পত্র দিয়াছেন সত্য। কিন্তু সেই সকল স্থানীয় জন্মোৎসবের দিক সাধারণ ভাবে রক্ষা করিয়া পুপুনকীর পরিকল্পিত অনুষ্ঠানের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া কোনও অসাধ্য ব্যাপার নহে। আমি সাধন-বল-সম্পন্ন মহা-তেজস্বী একটা

কালিক, ১৩৬৭]

পুপুনকীর পত্র

প্রতিধ্বনি

৬১৩

বীর্যবান জাতির জন্মদানের উদ্দেশ্যেই তরুণ কৈশোরে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলাম। বিনা উদ্দেশ্যে শুধু খিচুড়ী-পর্ক করিবার জন্ত কোনও উৎসব বা সম্মেলন আমি ঘোষণা করি না। পূর্বে আমার মুসৃষ্ট করনা ছিল যে, পুপুনকী আসিবার কালে পথে তিনসুকিয়া মরিয়ানি, মণিপুর রোড, লামডিং, গোহাটী, পাণ্ডু, বঙ্গাইগাঁও, আলিপুর-দুয়ার ও শিলিগুড়িতে পুপুনকী-যাত্রীদের সেভাবে আহারীয় দানের ব্যবস্থা হইবে, যেমন ভাবে উল্লিখিত স্থানগুলিতে সমগ্র ট্রেনের যাত্রীদের জন্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল ডিব্রুগড়ে আমার মোনোদ্যাপনের উৎসব-সময়ে আসাম যাইবার কালে। কিন্তু আসামের মস্মাস্তিক দুর্ঘটনাবলীর পরে আমি উক্ত করনা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া ফেলিয়াছি। আসামের সাম্প্রতিক ঘটনা-বলির পরে দিকে দিকে দেশে দেশে আমার বহু সন্তান গৃহহীন ও নিরাশ্রয় হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন বেদনাদায়ক ঘটনার মুখে উৎসবযোজন সাজে না। সুতরাং আগামী পৌষ মাসে মঙ্গলবারের উদ্বোধন-উৎসব করিব না। ষতদিন বিপন্ন নরনারীদের গৃহ পুনর্কাসন না হয়, ততদিন পুপুনকীর উৎসব বন্ধ রাখিব। সুতরাং পূর্বে বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা কেহ ১০।১১।১২ই পৌষ পুপুনকীতে আসিও না। তবে যাহারা ব্যক্তিগত ভাবে (উৎসবগত ভাবে নহে) যচকে মঙ্গলবার দেখিয়া যাইতে চাহে, তাহারা যেন নিজ নিজ হৃদয়ামতন পুপুনকী আসিয়া নিজেদের ত্যাগ ও শ্রমে গড়া এই পবিত্র দৃশ্য অবশ্যই দেখিয়া যায়। কালিক মাসের ৩০শে হইতে অগ্রহায়ণ মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আসিলে পুপুনকীর বিশাল মরসুমী ফুলের বিচিত্র ও মনোরম দৃশ্যদেখিতে পাইবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানীয় অথও-মণ্ডলীর পরিচর্যপত্র সঙ্গে নিয়া আসিবে। বিছানা ও মশারি অবশ্য আনিবে। বস্ত্রাভরণ জনতা সঙ্গে আনিবে না।

প্রতিবন্ধি

পুপুনর্কীর পত্র

[১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬১৪

তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধন-ভঞ্জে বিশেষ ভাবে মনোযোগ
 হইও। গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্ত চেষ্টা না করিয়া
 আমার সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমার ভাব ও চিন্তাধারা জনসমাজের
 মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিও, আর “প্রতিবন্ধি”
 গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করিও। তোমরা ব্যক্তিগত সাধনা দিনে অন্তত
 দুইবার করিওই এবং সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটিতে প্রত্যেকে
 যোগদান করিতে চেষ্টা করিও। ইহা তোমাদের মুমহৎ কর্তব্য
 একজনের নিকটে আমি একখানা পত্র লিখিলে, বিশেষ গোপনীয়
 কারণ না থাকিলে, তাহা তোমরা অপর দশ বিশ জন গুরুভ্রাতাকে অবগত
 দেখাইও। চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া তোমাদের যত ভাইবে
 আছে, তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিও এবং সাপ্তাহিক সমবেত
 উপাসনায় যোগ দিতে বাধ্য করিও। গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী বহিঃ
 কাহাকেও জানিলে, যত প্রকারে পার, তাহাকে জীবনের উন্নতি-প্রা
 সহায়তা করিতে চেষ্টা পাইও। তাহার সহিত প্রাণান্তেও কোন ধর্ম
 বা প্রতারণা করা হইবে না, এই জিদ করিও। সর্বজীবের প্রতি
 নিব্বিদ্বেষ প্রেমভাব পোষণ করিও এবং কর্তব্য কার্যে স্বর্ণা-নিদা-ভ্রম
 বর্জন করিও।

আপীকৃত

অরুণাচল

পুনঃ—এই পত্র পুপুনর্কীতে বসিয়া লিখিয়াছিলাম। তাহার
 পরে আমি বারাণসী চলিয়া আসি। ত্রয়োদশী দিনে পুপুনর্কী
 সংবাদ পাই যে, মঙ্গলবাঁধের অবস্থা অতীব গুরুতর। বিজয়া দশমী
 দিন প্রাতে কল্লনাভীত বৃষ্টি হইয়া একটি ঘণ্টার মধ্যে উচ্চতম সীমা
 অতিক্রম করিয়াও প্রায় ছয় ফুট জল বৃদ্ধি হয় এবং জল চলিয়া বাইবে

কার্তিক, ১৩৬৭]

ঘাটশিলা সম্মেলনে আশীর্বাণী

প্রতিধ্বনি

৬১৫

পাকা চল্লিশ ফুট প্রশস্ত রাস্তা (জান্) এবং তাহার পার্শ্বরক্ষী পাকা দেওয়াল ডুবাওয়া দিয়া সংরক্ষিত অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং এক মিনিটের মধ্যে প্রায় পাঁচশত টাকা মূল্যের নিৰ্ম্মাণ-সরঞ্জাম, যথা ইট, বালি, পাথর নিশ্চয় করিয়া চলিয়া যায়। বাঁধের সামান্য কিছু মাটিও ধ্বসিয়াছে। তবে মূল ইমারতের তলদেশে সাত আট দশ ফুট গভীর এবং আঠারো ফুট প্রশস্ত কংক্রিট থাকায়, তাহার কোনও অনিষ্টই করিতে পারে নাই। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আশ্রমবাসীরা উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়াছে। আগামী দুইটা মাস যদি সজোরে কাজ চালান যায়, তবে হয়ত এইরূপ আকস্মিক উৎপাতের ভয় আর থাকিবে না। নিত্যশুদ্ধরের পরবর্ত্তী পত্র বা তারের প্রতীক্ষায় থাকা কালে এই পত্র মুদ্রিত হইতেছে, এমন সময়ে নিত্যানন্দর বারাগসী আসিয়া সংবাদ দেয় যে, আপাততঃ অবস্থা আয়ত্তে আছে কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকা সঙ্গত নহে।—স্বরূপানন্দ

ঘাটশিলা সম্মেলনে আশীর্বাণী

তোমাদের সম্মেলনের পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার উদ্ধে থাকিয়া, সকল প্রাদেশিকতা হইতে মুক্ত থাকিয়া তোমরা তোমাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্যকে পরিচালিত করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩শে ভাদ্র, ১৩৬৭)

উদ্বোধনীয় ভাষণ ❀

শ্রীমোহিত কুমার রায়চৌধুরী

ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ, পরম সুখের আকর,—সর্বজ্ঞানের প্রতিধ্বনি
যিনি হৃদ্যাতীত, ত্রিগুণাতীত—আমাদের সকলের প্রাণের প্রাণ—
সেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণযুগল আমি সর্বপ্রাণে বন্দনা করি।

সমবেত জননীগণ, ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরা পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা
ও দক্ষিণ-বিহারের অখণ্ড-প্রতিনিধিগণ এখানে সমবেত হ'য়ে পরস্পরে
সঙ্গে পরিচিত হবার যে অমূল্য সুযোগ আজ পেয়েছি, তাতে নিজের
বড়ই কৃতার্থ বোধ করছি। আপনারা নানা জনে নানাতর
শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েছেন, তাঁকে আপনারা প্রাণত্যাগ
সেবা দিয়ে অশেষ পুণ্যভাগী হয়েছেন—আজ সেই আপনারা পুণ্য
সান্নিধ্যে এসে আমি নিজেকে বড়ই ভাগ্যবান মনে করছি। এই পুণ্য
সম্মেলনে যোগ দিতে পেরে আরও আনন্দ পাচ্ছি এই কারণে যে, আমার
বহুদিনের অভিলাষ ছিল এদিকে এই রকম একটা সম্মেলন হোক
আমার সেই আন্তরিক আশা পূর্ণ হওয়াতেই আমি একান্ত পরিতুষ্ট
করছি। এই রকম একটা সম্মেলনের প্রয়োজন সত্যিই ছিল। অখণ্ড
হিসাবে আমাদের করণীয় কি, লক্ষ্য কি, সেই লক্ষ্যপথে কতটুকু অগ্রগতি
হতে পেরেছি, এ সম্পর্কে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফল
বিনিময়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে। অখণ্ডমণ্ডলী নানান
গড়ে উঠেছে শ্রীশ্রীবাবামণির আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার উদ্দেশ্যে
কিন্তু সেই উদ্দেশ্য, সেই লক্ষ্য একাভিমুখী হচ্ছে কিনা সেটা ফল

* ২৬শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, ঘাটশিলা (সিংভূম) অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা

দক্ষিণ-বিহার অখণ্ড-প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রদত্ত উদ্বোধকের অভিভাষণ।

বার্তিক, ১৩৬৭]

উদ্বোধনীয় ভাষণ

প্রতিধ্বনি

৬১৭

যথোপযথ্যে করা দরকার। সেজন্য এ রকম একটা সম্মেলনের আবশ্যিকতা আছে। সেই কারণেই এই সম্মেলনকে স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি এই সম্মেলনের উদ্বোধনকারীদের।

কিন্তু আজকের এই পুণ্যমিলনের ক্ষণটিও বেদনা-বিধুর হয়ে উঠেছে আমাদেরই দেশের পূর্বাঞ্চলে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে। আমাদেরই স্বদেশবাসীর হাতে, আমাদের স্বধর্মাবলম্বী ভায়েদের হাতে আমাদের হাজার হাজার ভাই-বোন ও ভায়েদের অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের কলঙ্কমলিন অধ্যায়টি এই বিংশ শতাব্দীতে একটি অচিস্তনীয় ঘটনা। সত্যতার নামে, সংস্কৃতির নামে মানুষ যে সম্ভবতঃ বর্বরতায় বর্বরগণকেও অতিক্রম করে যেতে পারে, তার এ ধরনের নজীর সম্ভবতঃ বিগত কয়েকটা শতাব্দীতে অতি অল্পই পাওয়া যাবে। যারা অত্যাচারিত হ'ল, তাদের ক্ষয়ক্ষতিতে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের সকলের মন ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু যারা অত্যাচার করল, তারা শুধু নিজেদেরই নয়, তারা নিজেদের দেশকে সমাজকে যে ভাবে কলঙ্ক-মসীলিত করেছে, সে কালিমাও সহজে মুছবার নয়। আর তার চেয়েও বিপদ ও লজ্জার কথা হ'ল এই যে, গণতন্ত্রসম্মতভাবে গঠিত গভর্নমেন্ট নামে একটি শাসনযন্ত্র সেখানে রয়েছে এবং সেই গভর্নমেন্টের চোখের সামনেই দিনের পর দিন ব্যাপকভাবে জঘন্যতম অপরাধ সমূহ অনুষ্ঠিত হতে পেরেছে—বা হতে দেওয়া হয়েছে। মানুষের নিরপত্তাবোধের অভাব বেড়েছে আরও সেই কারণে। এই অপরাধের প্রতিকারের একমাত্র উপায় কোন রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, এর উপায় খ্রীষ্টীয়রূপানন্দের যা' জীবনাদর্শ, সেই আদর্শের ব্যাপক প্রচার। মানুষে মানুষে সম্ভাববোধ, সর্বশ্রেণীর সকল অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে একই মহৎ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলার যে-সাধনা,

সেই সাধনাই এই সব ক্ষুদ্র সফীর্ণতায় উর্দ্ধে আমাদের নিয়ে বসে।
এই সকল ঘটনার অনুষ্ঠান আজকের এই সম্মেলনের গুরুত্ব শূন্য
বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ও সংকল্প সম্পর্কে একান্ত চেতনা
হবার নির্দেশ আমাদের এনে দিয়েছে এই সব দুঃখ-কষ্ট
অগ্নিশলাকা।

এখন কথা হচ্ছে, অখণ্ড-জীবনের লক্ষ্য কি? অখণ্ড-মুখ
উদ্দেশ্য কি? এক কথায় বলতে গেলে, শ্রীশ্রীবাবামণি যে আদর্শ
আমাদের সামনে ধরেছেন, সেই আদর্শে জীবন গঠন করাই অখণ্ড-
লক্ষ্য, সেই আদর্শে সকলকে গ'ড়ে তোলা এবং সেই আদর্শকে
জীবনে সম্প্রসারিত করাই অখণ্ডমণ্ডলীর উদ্দেশ্য। সেই সাধনের
যে সব পন্থা, তাহাই আমাদের অনুসরণীয়। আমাদের জীবন উন্নয়ন
সফল ও সার্থক, যতটুকু আমরা শ্রীশ্রীবাবামণির আদর্শকে গ্রহণ করে
জীবনে কুটিয়ে তুলতে পেরেছি। শ্রীশ্রীবাবামণি আকৈশোর থেকে
মাত্র লক্ষ্য সামনে রেখে প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন, যে
'মানুষ' গড়া। তিনি গড়তে চেয়েছেন এমন মানুষ, যে মানুষ
মহান্ হবে, কর্মেও মহান হবে, যে মানুষ অশনি-আঘাতেও
হয়ে পড়বে না, বিভীষিকা যাকে ভয়-মলিন করতে পারবে না;
শ্রায় দেহ, অপরিমেয় বীৰ্য্য এবং অভ্রভেদী মনুষ্যত্বের অধিকারী
সে রকম মানুষ-ই তিনি চেয়েছেন। কিন্তু, কোথায় বাবামণির
সেই দেব-মানুষের দল, যাদের সাধনায়, যাদের তপস্যায়,
আত্মোৎসর্গে দেশের অনন্ত দুর্ভাগ্য ঘুচবে?

শ্রীশ্রীবাবামণির উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়েছি আমরা
হাজারে হাজারে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছি। কিন্তু তাঁর
পায়ের ব্যথাই বেড়েছে মাত্র, আমরা নিজেরা কতটা

পেরেছি, সে সম্বন্ধে আমার কিছুটা সংশয় আছে, হয়ত আপনাদেরও থাকতে পারে। অন্ততঃ এ সম্পর্কে একটু আত্মবিশ্লেষণের সময় এসেছে ; এ বিষয়ে বোধ হয় আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন। খ্রীশ্রীবাবামণির স্বপ্নের মানুষ, কল্পনার মানুষ যদি কয়েকজন মাত্রও বাস্তবে রূপ নিতে পারত, তা'হলে শুধু অখণ্ড-সমাজের কেন, সমগ্র দেশের চেহারাটাই ফিরে যেত ; দেশের এই তমসচ্ছন্ন আকাশে অরুণোদয়ের একটু রক্তিমভা আমরা দেখতে পেতাম।

খ্রীশ্রীবাবামণির আমরা প্রিয় সন্তান। কাজেই তাঁর প্রিয় কার্যগুলি আমরা করব, এ প্রত্যাশা তিনি অতি সঙ্গত ভাবেই করতে পারেন। তিনি আমাদের কাছ থেকে একটি কপর্দকেরও প্রত্যাশী কোনদিন নন, কিন্তু আমাদের কর্মের তিনি প্রত্যাশী। তাঁর সে প্রত্যাশার আংশিক পূরণও কি আমরা করেছি? তিনি প্রত্যাশা করেন, আমরা নিয়মিত সাধন-ভজনের দ্বারা নিজেরা পবিত্র হই, আমাদের চিন্তাকে পবিত্র করি, আমাদের পরিবেশ পবিত্র হয়ে উঠুক। তাঁর সে প্রত্যাশার পূরণ আমাদের মধ্যে শতকরা দশজনও কি সঠিক-ভাবে করি? বস্তুতঃ লক্ষ্য করেছি, আমাদের মধ্যে সাধন-ভজনে নিষ্ঠার দৈন্ত্য তাঁকে যতখানি পীড়িত করে, এমন আর কিছুতেই করে না। যদি আমরা সাধন-ভজনে যথেষ্ট নিষ্ঠাপরায়ণ হ'তে পারতাম, তা হ'লে চিন্তার জগতে আমাদের অবদান যথেষ্ট মূল্যবান হ'ত।

তবে কি খ্রীশ্রীবাবামণির তপশ্চ—তাঁর জীবনব্যাপী জীবকল্যাণ-সাধনার কঠোর শ্রম সমস্ত বুথাই গিয়েছে? সে কথাও আমি মনে করি না। বরং এ কথা আমি বিশ্বাস করি, দৃঢ় ভাবেই বিশ্বাস করি যে, খ্রীশ্রীবাবামণির ধ্যানের মানুষ একদিন রূপ পরিগ্রহ করবেই, তা' সে, আগামী কালই হোক বা আগামী শতাব্দীতেই হোক

এবং সেই ঋতুসের আবির্ভাবই গোটা দেশটার আজকের
হুর্ভাগ্যের অপনোদন সম্ভব করবে।

চরম অগৌরবের হলেও একথা অকপটে স্বীকার করতে আমাদের
নেই যে, শ্রীশ্রীবাবামণিকে আমাদের যতখানি বুঝতে পারা বা
করা উচিত ছিল, তা' আমরা করি নি বা করতে পারি নি।
এ কথাটা আজ চিন্তা করবার সময় এসেছে যে, আমরা বারা শ্রীহরি
মণির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে তাঁর কৃপালাভের সুযোগ পেয়েছি, তা
বুঝতে হবে যে, স্বরূপানন্দ-সন্তান বলে নিজেকে পরিচয় দিতে পারি
আমাদের জীবনের চরম সার্থকতা নয়। প্রকৃত স্বরূপানন্দ-সন্তান
পরিচয় বহন করতে হ'লে, স্বরূপানন্দকে জানতে হবে, চিন্তে
বুঝতে হবে, তাঁর আদর্শের মর্ম্ম আমাদের অন্তর দিয়ে গ্রহণ
হবে। তা' না ক'রে শুধু তাঁর ধর্ম্মের অনুসরণ—তা' সে মর্মে
উপাসনাই হোক আর হরি-ওঁ নাম কীর্ত্তনই হোক—আমাদের জীবন
সার্থকতায় মগ্নিত করবে না। সমবেত উপাসনা ও হরি-ওঁ নাম-কীর্ত্তন
শ্রীশ্রীবাবামণির প্রাণ-স্বরূপ। এঁদের আমরা প্রাণ ভরে জীবন-
অনুশীলন করব। কিন্তু স্বরূপানন্দ হচ্ছেন আমাদের প্রাণ—প্রাণ
তাকে না চিনতে পারলে, তাকে না বুঝতে পারলে, আমাদের মর্মে
সাধনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আমাদের বুঝতে হবে স্বরূপানন্দের স্বরূপকে, অনুধ্যান করতে হবে
আবির্ভাবের তাৎপর্যকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায়। ভারতবর্ষ
বাদের দেশ। এ দেশের রসে, মাটিতে মিশে আছে আধ্যাত্মিকতা
ভাব। আধ্যাত্মিকতার রসে জারিত না হলে এ দেশের রস
পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। সেই আধ্যাত্মিকতার, সেই ধর্ম্মভাবের
যখন নানাপ্রকার গ্লানির অনুপ্রবেশ ঘটে, জনগণের জীবনে

একল হয়ে উঠে, সেই সময় আবির্ভাব ঘটে মহামানবের—দেশকে, সমাজকে গ্লানিমুক্ত করার প্রয়োজনে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর চার শ' বছরের মধ্যেই আবার বাঙ্গলার সমাজ-জীবনে অধ্যর্থের প্রাবল্য ঘটে; নানা অনাচার, কুসংস্কার দেশটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই সময় সমাজের নানাবিধ কুসংস্কার বিদূরণের দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখা দিলেন রাজা রামমোহন রায়। ভারতের নব-জাগরণ-যুগের সূচনা হয় বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে। কিন্তু রাজা রামমোহনের সর্বাত্মক সংস্কার-প্রচেষ্টার মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসে তার বা-কিছু ভাল, বা কিছু শ্রেয়ঃ, তার সমস্তই গ্রহণ ক'রে ভারতের সমাজকে নূতনভাবে গড়ে তুলতে তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। হার্বিনের পরাধীনতার ফলে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির উপর যে আঘাতের পড়েছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতের ধারায় তা' অপসারিত ক'রে নূতন প্রাণস্পন্দন আনাই ছিল রাজা রামমোহনের উদ্দেশ্য। এবং তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হওয়াতে নবযুগের উদয় বলে অভিনন্দনও তিনি পেয়েছিলেন। দেশের তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজা রামমোহনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সার্থক হয়েছিল। কিন্তু সেদিনকার সেই পাশ্চাত্য ভাবধারার লবণাষু স্রোতে যে কয়েকটি কুস্তীর-শিশু অলক্ষ্যে আমাদের সংস্কৃতি-সায়রে প্রবেশ করেছিল, তাদের উত্তর-পুরুষেরা ভারতের সমাজ-জীবনে কম উপদ্রব সৃষ্টি করেনি। অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে রাজা রামমোহন বাংলা দেশের যে নবযুগের সূচনা করেন, তাঁর তিরোধানের পর বাংলার মনীষামণ্ডল তরুণেরা পাশ্চাত্যাহুকরণের উগ্র নেশায় ভারতের বা কিছু

সনাতন—সে সমস্তকেই উপেক্ষা করতে আরম্ভ করেন এবং হিন্দু সমাজে একটা বিরাট ভাঙ্গনের আশঙ্কা দেখা দেয়। ঠিক সেই সময় দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-সন্তান অলোকসাহায্য তপস্শার-বলে সেই উন্মার্গ-গমনের খরস্রোতের গতিরোধ করে আত্ম-প্রকাশ করেন। বাংলার আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটা নূতন স্রোতোধারা দেখা দিল শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাবে। তাঁর বাণী ধ্বনিত হ'ল স্বামী বিবেকানন্দের কন্ঠকণ্ঠে। সাগরপারে গিয়ে তিনি শুনিতে এলেন বিশ্বজগৎকে ভারতীয় ধর্মের বাণী। সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ আবার শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনল সনাতন ধর্মের মর্মকথা। বিদ্যারামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তিরোধানের পর তাঁদের মূল শিক্ষাকে দেশের লোক আবার যখন ভুলে যেতে বসেছে, সেই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আচার্য্য স্বরূপানন্দ নূতন করে আমাদের সামনে ধরলেন পথের নিশানা। রাজা রামমোহন শাস্ত্র-সমুদ্র মহন করে যে একেশ্বরবাদ-তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তার পরিণতিতে এক স্বতন্ত্র ধর্মমতের উদ্ভব হয়—যা ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের “ষত মত তত পথ” এই শিক্ষা সে ভাঙ্গন রোধ করল কিন্তু সাধারণ লোকের পথের বিভ্রান্তি একেবারে ঘুচল না। এই সময় আচার্য্য স্বরূপানন্দ আবির্ভাব ঐতিহাসিক প্রয়োজনে অনিবার্য্য হয়ে পড়েছিল। তিনি বললেন ‘ষত মত তত পথ’ ঠিকই; তবে চলতে হবে একটা পথেই সে যে পথেই হোক। একলক্ষ্য হ'য়ে একপথে চলার শিক্ষাই আচার্য্য স্বরূপানন্দের শিক্ষা, একনিষ্ঠাই তাঁর সাধনার মূলকথা। অনেক ভুলবশতঃ মনে করেন, আচার্য্য স্বরূপানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্ট বাদের একটা Contradiction বা বিরুদ্ধবাদিতা কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একজন আর একজনের পরিপূরক। এক কথায় রাজা রামমোহন

কালিক, ১৩৬৭]

উদ্বোধনীয় ভাষণ

প্রতিধ্বনি

৬২৩

যে নবযুগের সূচনা করেছিলেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে তা' বিকাশ পায় এবং স্বরূপানন্দে তা' পরিণতি লাভ করে। একে শুধু বাংলার বা বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ব'লে মনে কল্পে' ভুল করা হবে,—ভারত-প্রগতির ইহা ইতিহাস।

আপনারা সকলেই লক্ষ্য করেছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ভারতের সমাজ-জীবন একটা নিদারুণ পঙ্কিলতায় আবিল হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক দিনের একান্ত প্রয়োজন স্বরূপানন্দের আদর্শ ও জীবন-দর্শনকে অনুধ্যান করা ও ব্যাপকভাবে তা' প্রচার করা, তাঁর ভাব-ধারাকে জন-জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে তাদের কল্যাণ-পথের নির্দেশ দেওয়া। আচার্য্য স্বরূপানন্দ আজ যা বলছেন বা করছেন, সে শুধু স্বাভাবিক প্রয়োজনের চাহিদায় নয়—, আগামী কয়েক শতাব্দীর মানুষ খ্রীষ্টীয়রূপানন্দের কর্মের ফলভাগী হবে। তিনি নিজেই বলেছেন—
আমি তোমাদের মধ্যে যে সব ভাবধারা উদ্ভূত করতে চাই, তার প্রভাব যেন অনন্ত ভবিষ্যতেও বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে একং চির অনাগত-কালের তরুণ-সজ্জের মধ্যে তা' সঞ্চারিত হয় “The ideas I want to implant in you are to be rediated throughout the eternal future and to be infused in the ever-coming younger generations.”

খ্রীষ্টীয়রূপানন্দের আদর্শকে যেমন মর্ম দিয়ে গ্রহণ করতে হবে, তেমনি কর্মের মধ্যেও তা' সঞ্চারিত করতে হবে। এমন কর্ম-পন্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবে, যাতে দেশের সর্বস্তরে স্বরূপানন্দের আদর্শের অনু-প্রবেশ ঘটে, গোটা দেশটার মানুষ যাতে স্বরূপানন্দের ধ্যানের মানুষে উন্নীত হয়। এজন্ত প্রয়োজন প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে অথও-মণ্ডলী স্থাপন ক'রে তার মধ্য দিয়ে শুধু সমবেত উপাসনার দ্বারা নয়, তার সঙ্গে

প্রতিধ্বনি

উদ্বোধনীয় ভাষণ

[১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬২৪

স্বরূপানন্দ-দর্শনের চর্চা, অনুশীলন ও জনসমাজে তা' প্রচারের ব্যবস্থা করা। সত্যিকারের অখণ্ড-মণ্ডলী, বাবামণির আদর্শে অনুপ্রাণিত অখণ্ড-মণ্ডলী, আজও আমরা অধিক সংখ্যায় গড়ে তুলতে পারি নি। এ কাজে আমাদের অবহেলা যথেষ্ট হয়েছে, আর করা চলবে না। শ্রীশ্রীবাবামণিকে জানবার ও বুঝবার আগ্রহ আমাদের যদি বর্ধিত থাকত, তা হ'লে মঙ্গলবাঁধের মত একটি পবিত্র ও প্রয়োজনীয় কাজ লক্ষ-সন্তানের পিতার কাছে প্রাণপাত প্রয়াস হয়ে উঠত না। আমরা তাঁকে বুঝি নি বলেই বারংবার আহ্বান সত্ত্বেও আমরা তাঁর বাহ হয়ে উঠতে পারি নি। আমরা লক্ষ-সন্তান মিলে যদি তাঁকে লক্ষবাহ করে তুলতে পারতাম, তা'হলে কোন কাজই তাঁর অসম্পূর্ণ থাকত না।

পরিশেষে একটা কথা উল্লেখ বিশেষ আবশ্যক মনে করছি। আসামের হ্রদ্বিপাক আমাদের কাছে এক নূতন কর্তব্যের ইঙ্গিত দ্বারা করে এনেছে। আসামের ভ্রাতাভগিনীরা অত্যন্ত স্থানের অখণ্ডগণের তুলনায় অধিকতর সুসংগঠিত ছিলেন এবং শ্রীশ্রীবাবামণির কাছে নানা ভাবে স্নেহুতম, যোগ্যতম, উদারতম সহযোগিতা দিচ্ছিলেন। সে তুলনায় আমরা যা করেছি, তাকে নগণ্য বা গোপন বললেও অত্যাঙ্গী হবে না। আজ আসামের ভাইবোনেরা অবস্থা বিপর্যয়ে কঠিন সমস্যার সন্মুখীন। স্বাভাবিক কারণেই শ্রীশ্রীবাবামণি কাজে তাঁদের সহযোগিতা সঙ্কুচিত হবে। এই অবস্থার পরিপন্থী আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আজকের এই সম্মেলনের বিশেষ চিন্তা প্রয়োজন রয়েছে।

উপসংহারে আপনাদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, আমরা এই সম্মেলনে এমন কর্ম-পন্থা গ্রহণ করুন, যার অনুসরণ আমাদের , তাঁহার নির্দেশ নির্বিচারিত চিত্তে

কালিক, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্য

প্রতিধ্বনি

৬২৫

তারই প্রদর্শিত পথে চলার সামর্থ্য ও পাথের যোগায়। শুধু প্রাণের টানেই এখানে ছুটে এসেছি—ছুটো বড় কথা বলে প্রশংসা পাবার আশায় নয়। আপনাদের মধ্যে অনেকে শ্রীশ্রীবাবামণির সেবায় ও আদর্শানু-
সরণে আমার চেয়ে অনেক অগ্রগামী। তাঁদের কাছ থেকে কিছুটা শিক্ষা, কিছুটা প্রেরণা যদি নিয়ে যেতে পারি, তবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। এই কয়েকটা কথা বলেই আজকের এই সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। জয় গুরু!

ধৃতং প্রেম্য

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
লিখিত সমসাময়িক পত্রাবলী]

(৬০৬)

ইতি-ও

পুপুন্যী আশ্রম

১লা আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াস্তু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংসারের বিচিত্র অবস্থার মধ্যে নিমেষের জ্ঞাত ও আত্মহারা হইও না। অনেক অপ্রিয় ব্যাপার চখের উপরে ষটিয়া যাইবে, ষটিবে অনেক সময় চকিতে এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে, তবু অধীর হইয়া যাইও না। নিজেকে আত্মস্থ রাখিতে হইবে। নিজেকে স্থস্থির রাখিতে পারিলে বটাকের ইঙ্গিতে তুমি সকলকে অনুগত রাখিতে পারিবে। চতুর্দিকের

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম।

[৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬২৬

যে জটিল অবস্থা লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহাতে তোমার জন্ত আমার উপদেশ এই যে, শাসন করিবে স্নেহ-সহকারে, স্নেহ করিবে শাসন-দণ্ড হাতে লইয়া। প্রেমময়ী নারী কেবল কুসুম-কোমলাই হইবে কুলিশ-কঠিন হইবে না, তাহা নহে। স্বামীকে, পুত্রকে, কন্যাকে পরিজনদিগকে সংযত প্রেম ও সংযত শাসনের মধ্য দিয়া কল্যাণের পথ পরিচালিত করিতে হইবে। ভালবাস বলিয়াই স্বামীর দুর্বলতাগুলি মানিয়া লইবে, ইহা স্বামি-হিতৈষণা নহে। পুত্রকন্যা সম্পর্কেও তাহা। তাহারা বিপথে না যাইতে পারে, সেই দায়িত্ব তোমার। তাহাদের জীবনে অন্ত্রায়, দুর্নীতি, পাপ বা অধর্ম কোনও আক্রমণ করিতে পারে, সেই দায়িত্ব তোমার। নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া চলিও কিন্তু হইও না। প্রেমে শাসন আছে, রুঢ়তা নাই, সংযম আছে, তিরস্কা নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদ

স্বপ্নপাল

(৬০৭)

হরি-ওঁ

পুণ্ড্রকী অঙ্গ

১লা আশ্বিন, ১৩৫৭

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানিও।

সংসারের নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্যেও নিজেকে সর্বদা রাখিও। আকাশের প্রভাতারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবন-চালাইও। ভগবানের নামের বৈঠা নিয়ত টানিও, ক্ষণকালের

কাঠিক, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেয়া

প্রতিপদান

৬২৭

বিরাম দিও না। কখনো নিজেকে নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় বলিয়া মনে করিও না। আমার স্ননিবিড় প্রেম নিয়ত তোমাকে আবরিয়া রাখিয়াছে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০৮)

হরি-ওঁ

পুপুন্যী আশ্রম

১লা আগ্নিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি কেবল ডাক্তারিই কর না, সমাজের মঙ্গলের কথাও ভাব-
দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। সম্প্রতি সংবাদপত্রে তোমার
লিখিত একখানা পত্র দেখিলাম। * * * কিন্তু কেবল
ববরের স্বাগজে লিখিলেই কিছু হইবে না। প্রস্তাবটীর রূপায়ণ
পর্যন্ত তোমার পৌরুষ জাগ্রত থাকুক, ইহা আমি চাহি।

The children of Swarupananda are almost every-
where known by a stamp of tenacity. (স্বরূপানন্দ-
সন্তানেরা প্রায় সর্বত্র নিষ্ঠার ছাপ দ্বারা পরিচিত।) তুমি তাহার
পরিচয় দাও। Register public sympathy to the cause by
earnest endeavour and active steps. (কন্ঠ্য উপায়
ও একান্ত অধ্যবসায়ের দ্বারা জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জন কর।)
ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম

[১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬২৮

(৬০৯)

হরি-ওঁ

পুপুনী আশ্রম

১লা আশ্বিন, ১৩৫৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। মিলি পাহাড়ের প্রান্তে অবস্থিত একটি জনবিরল উদাস্ত-উপনিবেশে তোমরা মাত্র তিনজন সমসাধক আছ। আর এই তিনজনেই এমন একটা বিরাট অনুষ্ঠান সমাপন করিলে, যাহা যে-কোনও সহরের গৌরব বর্ধন করিত। ইহাতে আনন্দিত হইয়াছি। তোমরা সংখ্যার মাত্র তিনজন বলিয়া মনে কোনও কুণ্ঠা বা ভয় রাখিবার প্রয়োজন নাই। বেদী-শ্রীষ্টের ধর্ম আজ সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত, তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা কত ছিল! তাঁহার অনুবর্তীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল বলিয়া তাঁহার ধর্মের প্রচার হইয়া থাকে নাই। নিষ্ঠা এবং জলন্ত বিশ্বাসই প্রসারের মূল, সংখ্যাক নহে।

তোমরা যে অঞ্চলে আছ, রাজরোষে বা গণ-বিক্ষোভে তোমাদের সেখানে বাস করা হঠাৎ একদিন বিপজ্জনক হইয়া ষাইতে পারে ইহা ভবিষ্যদ্বাণী নহে। সতর্কতা মাত্র। সকল বিপদে জগরে বিশ্বাস রাখিও। ইতি—

আদীশ্বর
ধরপাল

কালিক, ১০৬৭]

ধ্বতং প্রেমায়

প্রতিধ্বনি

৬২৯

(৬১০)

হরি-ওঁ

পুণুনকী আশ্রম

২রা আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

সর্বদা সর্বাবস্থায় নামে মন লাগাইয়া রাখ । সংসারে আসিয়া
 সংসারের সুখদুঃখ ত অনেক কালই ভাবিলে । এখন নামে মন বসাও ।
 সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতে মন তুলিয়া আনিবার অনুশীলন কর ।
 চিরকালই কেহ এই জগৎটাতে থাকিতে পারে না । আত্মের
 সঞ্চয় কিছু কর বাবা । এতকাল ত এত জনকে ভালবাসিয়া জীবনের
 কেবল উদ্বেগ আর অশান্তিই বাড়াইলে, প্রেম উপজিল কৈ ? এক
 কথা প্রেম হইলে কোটি ব্রহ্মাণ্ড কিনিয়া রাখা যায়, কিন্তু তোমার দারিদ্র্য
 যুটিল কৈ ? প্রেম দরিদ্রতা দূর করে, তোমার সংসারের ভালবাসা
 তোমার দরিদ্রতা বাড়াইল কেন ? একবার ভাবিয়া দেখ বাবা, এক-
 বার হিমাব করিয়া দেখ । কেবলই অসার সংসারের পিছে পিছে
 ছুটিয়াছ, ইহা হইতে সারটুকু সংগ্রহ করিলে কি ? এবার সারসংগ্রহে
 লাগিতে হইবে । ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরা

[২ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৩০

(৬১১)

হরি-ওঁ

পুপুনকী আশ্রম

৩রা আশ্বিন, ১৩৩১

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশি
জানিও।

এবার তুমি তোমাদের স্থানীয় অথগুণ্ডলীর কার্যনির্বাহক
সমিতির সদস্যগণের মধ্যে এক জন নহ জানিয়া নিশ্চিত হইয়াছিল।
কিন্তু তোমার সতীর্থরা কেহ কেহ জানাইয়াছে যে, নামে তুমি
থাকিলেও কাজে থাকিবে। আশা করি, ইহা যথার্থ। কাজ
থাকিলেই থাকা হইল, নামে থাকার কোনও মানে হয় না। অনেক
নামের কাজাল, কাজের কাজাল কম লোককেই দেখা যায়। বাস্তব
কাজের কাজাল, তাহারা নাম হইল কি না হইল, ইহার দিকে লক্ষ্য
দেয় না। কাজ হইল কি না হইল, তাহাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য
থাকে। কি তোমাদের কাজ, কি তোমাদের করণীয়, কি তোমাদের
বর্জনীয়, কে তোমাদের কাজের প্রকৃত সহকারী, কাহার কাহার
কাজের তোমাদের যথার্থ সহায়ক, কাহাদের সহিত মিশিলে কাজ
হইবে ক্ষতি, কতটা সময় কোন্ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখিবে
মহত্তর কাজগুলি সমাপনের ফলে অমহত্তর অল্প-প্রয়োজনীয় কাজগুলি
আপনা আপনিই হইয়া যাইবে সুসমাপ্ত, সেই দিকে লক্ষ্য
রাখিও। ইতি—

আশ্বিন
স্বরূপানন্দ

(৬১২)

হরিও

পুপুন্যী আশ্রম,
৬ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকলাগভাজনেষু :—

মেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা মেহ ও আশিস
জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। কিন্তু তোমরা
আমাকে নিজ নিজ সাধনের ফলে যাহাই বলিয়া অনুভব করিয়া থাক না
কেন, তোমাদের অনুভবকে তোমাদের নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিও,
তাহাকে প্রচার করিতে যাইও না। দেবতা বা ঈশ্বর বলিয়া প্রচার
করিলে অনেক খাঁটি মহাপুরুষকেও কেন জানি একটু প্রসন্ন হইতে
দেখা যায়। হয়ত ভগবান্ বলিয়া মনে করিয়াছে বলিয়াই এই সন্তোষ-
টুকু নয়, এই অনুভবটুকুর মধ্যে যে অপরিমেয় প্রেম রহিয়াছে, তাহার
প্রমাণ পাইয়াই হয়ত তাঁহাদের এই সন্তোষ। তথাপি, ইহা সত্য যে,
নিজেকে ভগবানের অবতার বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রচারিত হইতে
দেখিলে অনেক খাঁটি সাধু মহাপুরুষেরও মনে একটা তৃপ্তি বা আনন্দের
টেউ খেলিয়া যায়। আমার কিন্তু তাহা হয় না। আমি কিন্তু
আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া পরিপূজিত দেখিতে চাহি না। আমি কিন্তু
আমার পূজা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিলে সুখী হইব না।

অনেকে আছেন, যাহারা নিজেদিগকে পরমেশ্বরের অবতার
বা পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচারিত দেখিতে চাহেন না,
এমন কি তাহাতে বিষম আপত্তিও করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা যে
পরমেশ্বরের প্রেরিত একমাত্র দূত, এই কথা প্রচারে দোষ মনে করেন

না। পরমেশ্বরের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করিবার অবস্থা, সাহস বা সেই অনুভূতিকে প্রচার করিবার কঠিন অঙ্গ। বশতঃও ইহা হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আমি নিজেকে পরমেশ্বরের একমাত্র প্রেরিত পুরুষ বলিয়া প্রচারিত হইতেও দেখিতে চাহি না। তোমরা জানিও, আমি আমাকে তোমাদের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচারিত হইতে দেখিলেই সকলের চেয়ে অধিক তৃপ্ত পাইব।

পরমেশ্বরের সহিত আমার অভেদ-অভিন্নতা আমি সুস্পষ্ট ভাবে আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে পাইয়াছি। আমি জানিয়াছি, আমা হইতে কিছু নাই এবং আমাতেই নিখিল বিশ্ব ও তাহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমাহিত। আমি জানিয়াছি, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদি নামে বা জ্ঞানে আমাকেই অনন্ত কাল অনন্ত জীবন অনন্ত দেশে অনন্ত ভাবে পূজা করিয়া আসিয়াছে এবং এই সকল ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদি দেবগণও আমাকেই ভজনা করিয়াছেন। আমি ইহাও জানি যে, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদিকে আমি ভাবিয়া রাখিয়া পূজা করিয়াছেন, তাহারাও আমি ছাড়া আর কেহ নহেন। আমি ইহাও জানি, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদি রূপে আমিই আমাকে ভজনা করিয়া ইন্দ্রাপেক্ষা চন্দ্রাপেক্ষা বরুণাপেক্ষা মহত্তর বৃহত্তর হইয়াছি। আমাকে লইয়াই আমি করিয়াছি অনন্তকাল লীলা, আমাকে লইয়াই আমি চালাইয়া যাইব আমার অপরূপ মায়া খেলা। ইহা আমি সত্যতঃ জানিয়াছি, সুস্পষ্ট জানিয়াছি, অলান্ত ভাবে জানিয়াছি। আমি জানিয়াছি, আমাকে লইয়াই বিশ্বের সকল বিচিত্রতা। আমাকে কখনো অবতার হইয়া কখনো অবতারের ভজনাকারী হইয়া ব্যবহার করিতে হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। তথাপি আমি তোমাদের কাছে অবতার বা ঈশ্বররূপে পূজা পাইতে চাহি না।

অবশ্য কেহ যদি বল, ইহাই করা তোমার ব্যক্তিগত অন্তরের
অভিলাষ এবং তাহা দমাইয়া রাখিতে গেলে তোমার স্বাভাবিক বিকাশ
হইয়া যাইবে রুদ্ধ, তবে বলিব, তোমার কাজ লইয়া তুমি গোপনে
থাক। আমাকে তুমি যাহা বুঝিয়াছ, দশজনকে ডাকিয়া আনিয়া তাহা
প্রচার করিয়া বেড়াইবার তোমার প্রয়োজন নাই। যেখানে দশ
জনকে লইয়া কাজ, সেখানে আমি তোমাদের দশজনের
মধ্যে এক জন সমোপাসক মাত্র। এই জগত্বে তোমাদের
সমবেত উপাসনাতে আমি সকলের অগ্রে একথানা আসন
অধিকার করিয়া বসিয়া থাকি। আমি আমাকেই বন্দনা করিতেছি,
ইহা আমি বুঝি, তোমরাও যে নিজেদিগেরই বন্দনা করিতেছ,
তাহা তোমরা বোঝ না। তোমাদের সহিত আমার পার্থক্য ত এত-
দূরই। তাই তোমাদের বলিতেছি, তোমরা তোমাদের সহিত আমার
অভিন্নতা অভেদত্ব এককসত্তা একাত্মতা অনুভব করিবার চেষ্টা কর।
ইহাই তোমাদের সকলের চেয়ে বড় সাধনা।

আমি ওঙ্কার-মন্ত্রে তোমাদের দীক্ষা দিয়াছি। এই মন্ত্রের মানে
হইতেছে, হাঁ, ইয়েস, মঞ্জুর, সম্মতি, স্বীকৃতি, স্বীকরণ, নিজের কারয়া
লওয়া। আমি ওঙ্কারমন্ত্র দিয়া তোমাদিগকে আমার করিয়া লইয়াছি,
অর্থাৎ আমার সহিত অভিন্ন করিয়া লইয়াছি। ইহাই তোমাদের
সাধনের সকলের চাইতে চমৎকারী ঘটনা। যত মত যত পথ আবিস্কৃত
হইয়াছে, তাহাদের সকলের চাইতে ইহা নূতন, অভিনবত্বে ইহা
অসাধারণ, অনন্যতায় ইহা অদ্বিতীয়, অথচ ইহাই ভারতের আদি ও
শাশ্বত সাধন, আদি ও শাশ্বত সত্য। সকলেই জানে, বেদ কি ভাবে
প্রকটিত হইলেন, কিন্তু ওঙ্কার কি করিয়া আসিয়া মানুষের মনে যে ধরা
দিলেন, ইহা কি কেহ জানে? কোনও শাস্ত্রে ইহা লিখিত আছে? কোনও

পুরাণে ইহা বর্ণিত হইয়াছে? কোনও ঐতিহাসিক ইহার ইতিহাস লিখিয়াছেন? বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়, ইহা নিয়া কতই বর্ক হইয়া থাকে। মানুষের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান তাহাকে বেদের মতক পৌরুষেয় বলিয়া ভাবিতে প্রলুদ্ধ করে, পাণ্ডিত্য বেদের মন্ত্র সমূহকে অপৌরুষেয় বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য একটা অক্ষরের কত রকমের কূট অর্থ করিয়া করিয়া নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু ওঙ্কার নিয়া গভীরতম পাণ্ডিত্যও কি কখনো আর জলে বিন্দু মাত্র থই পাইয়াছে? ওঙ্কার না থাকিলে তোমার ঋক-সাম-যজু-অথর্বের সৃষ্টিই হইত না। ওঙ্কার পরমেশ্বরেরই আদি নামস্মরণ যাহা হইতে কোটি কোটি বিশ্বের, কোটি কোটি সৌর জগতের, অনন্ত কোটি আকাশের, কোটি কোটি কল্পের আর কোটি কোটি তরুর হইয়াছে প্রকাশ। সেই মন্ত্রে তোমরা আমার নিকটে দীক্ষা পাইবার কালে আমার সহিত অভেদ অভিন্ন হইয়াছ। ইহাই তোমাদের পক্ষে অতি আশ্চর্যজনক এক দিব্য ঘটনা। পৃথিবীর কোনও ধর্মসাধন ইতিহাসে ইহা হয় নাই। তোমরা চির-পুরাতনের মধ্য দিয়া চিরনূতনের এক অসাধারণ ভাবে পাইয়াছ। তোমরা আমাকে ভগবান বা অবতার আদি বলিয়া প্রচার করিয়া সময়ের অপব্যবহার করিও না।

তবে, তোমার ভক্তিতে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার আরও নবতর সুন্দরতর স্বচ্ছতর উপলব্ধি সমূহ আসিতেছে। নিজের অন্ত-ভূতির কথা গোপন রাখাই এখন প্রয়োজন। মনের নিগূঢ় অনুভবের প্রচার করিলে অনেক সময়ে অনুভবের মধ্যে ফাঁকি আসিয়া যায়, উত্তর স্রোতোধারা হঠাৎ থামিয়া যায়।

তোমাদের মণ্ডলীর কাজে সকলকেই সাদরে ডাকিবে। কেহ আসিল না বলিয়া তাহার উপরে অভিমান করিবে না। কেহ আর

কাটিক, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৬৩৫

আসে নাই বলিয়াই কালও আসিবেনা, এমন ধারণা আগে হইতেই করিয়া রাখিও না। যে আজ আসিয়াছে, সে বাহাতে কালও আসে, তাহার জ্ঞাত চেষ্টিত থাকিও। যে আজ আসে নাই, সে বাহাতে কালনা আসিয়া না পারে, তাহার জ্ঞাত বদ্ধ নিও। যে আসে নাই, তাহাকে আকর্ষণ কর; যে আসিয়াছে তাহাকে ধরিয়া রাখ।

তোমার দীক্ষা যেমন আশ্চর্য্যজনক ভাবে হইয়াছে, এমন আরও শত শত লোকের হইয়াছে। আমার যখন নখর কায়া থাকিবে না, তখন তোমরা সেই সকল কাহিনী মানুষকে শুনাইও। এখন শুনাইতে যাইও না। কেন না, তাহার দ্বারা অকারণে কতকগুলি হুজুগাক্ষুণ্ট লোকের ভিড় জমানই সার হইবে, আসল কাজ কাহারও কিছু হইবে না। তোমরা যদি তোমাদের গুরুদেব সম্পর্কে নানা সংবাদ এমন ভাবে প্রচার করিতে সুরু কর, বাহাতে ভুল করিয়াও কেহ মনে মনে আশা করিতে পারে যে এখানে আসিলে দৈববলেই তাহার সব হইয়া যাইবে, সাধন করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে দেখিবে, সমস্ত দেশটা ইহার ফলে একটা কর্ম্মকুণ্ড, অলস ও কল্লনা-বিলাসী নেশাখোরের মূল্যে পরিণত হইয়া যাইবে। বুজুকি সমস্ত দেশটাকে ছাইয়া রাখিয়াছে। ম্যাজিকওয়ালারা পর্য্যন্ত হাতের সাফাই দেখাইয়া গুরুদেবের পবিত্র আসন অধিকার করিয়া তাহা প্রথম সূযোগেই কলঙ্কিত করিতেছে। সেই দেশে তোমরা পরমুখাপেক্ষীদের সংখ্যা বাড়াইবে? আমি আমার এই পক্ষকেশ শরীর লইয়াও আজ পর্য্যন্ত পুপুনকীর মাঠে কোদাল মারিতেছি, আগামী মঙ্গলবার একটা কূপ খনন স্বহস্তে আরম্ভ করিব স্থির করিয়াছি। আর সেই অবস্থায় তোমরা তোমাদের প্রচারের ফলে অলৌকিক উপায়ে উন্নতি-লিপ্সু দৈবনির্ভর হাজার হাজার নরনারীর ভিড় জন্মাইবে বাবা তাহারই দ্বারা, বাহার সমস্ত

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেমা

[৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৩৬

দিন খাটিয়া খাটিয়া শরীর ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত হইতেছে, বাহার বাজে কদ
কহিবার বা বাজে। কাজে নিয়োগ করিবার এক বিন্দু সময় নাই।
তোমরা সাবধান হও বাবা, সাবধান হও। আমি তোমাদিগকে যে
জিনিষ দিতে আসিয়াছি, তাহা মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শ ও মন
জীবনে দিব্য সাধনার দৃষ্টান্ত। আমি কেবল উপদেশ-বাণী করি
চলিয়া যাইবারই জন্ত আসি নাই।

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

(৬১৩)

হরিওঁ

পুপুন্যী আশ্রম

৭ই আশ্বিন, ১৩৬১

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি কাজের চাপে উপাসনা ঠিক মতন করিতে পারিতেছ
লিখিয়াছ। কাজ ত বাবা জীবন ভরিয়াই থাকিবে। তাই বলিয়া কি
জীবন ভরিয়াই উপাসনায় অবহেলা করিতে হইবে? হঠাৎ বিদ্যে
ঠেকায় কেহ এক দিন উপাসনায় বসিতে পারিল না ত সে মনে মনে
কতক ক্রণ ভগবানের নাম করিয়া অপরাধের ক্ষালন চাহিবে। কি
তোমার জীবন ভরিয়াই কাজের থাকিবে অকথনীয় চাপ, আর জীবন
ভরিয়াই উপাসনায় পড়িবে বাদ, ইহা কোনও কাজের কথা নহে বাবা।
হাজার কাজের মধ্যেও উপাসনার জন্ত একটু সময় বাহির করি
লইতেই হইবে। মুসলমানদের দেখ না কেন? তাঁহারাও হাজার

কার্তিক, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৬৩৭

কাজের মধ্যেও নমাজ ঠিক ঠিক পড়েনই পড়েন। তোমরা তাঁহাদের চাইতে বেশী কাজের লোক কেন হইবে? ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্যী আশ্রম

৭ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্বদা চেষ্টা রাখিবে, তোমাদের সকলের দৃষ্টি যেন এক দিকে থাকে। সকলের লক্ষ্য যেন এক হয়। পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ অতি গভীর হইলে একলক্ষ্যতা কিছু অসম্ভব জিনিষ নহে। সকলের যদি মন এক দিকে থাকে, তাহা হইলে তুচ্ছ ব্যক্তির ও অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারে। সকলের মনকে একমুখ করাই হইল সব চেয়ে বড় কথা। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১৫)

হরি-ওঁ

পুপুন্যী আশ্রম

৭ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংঘ বড় হয় সহযোগিতার মধ্য দিয়া। এক জনে যে কাজে হাত

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং শ্রেয়ঃ

[১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

৬৩৮

দিয়াছে, দশ জনে সেই কাজে হাত দিবার জন্ত স্বেচ্ছায় সাগ্রহে আগাই আসিলেই বুঝিতে হইবে যে সংঘের ভিতরে প্রাণশক্তি আছে। তোমার নিরন্তর এই প্রাণশক্তির অনুশীলন কর। শরীরই বল আর মনই বল। কি প্রাণই বল, অনুশীলনের দ্বারা সকলের শক্তিই বাড়ে। অনুশীলনের অভাবে মরিচা ধরিয়া তাহা অকেজো হইয়া যায়। ইহা—

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

(৬১৬)

হরিওঁ

পুপুন্যী আশ্রম

৭ই আশ্বিন, ১৩৩৮

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—,তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্বাদ জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কিন্তু সময় মতন জবাব দিয়া পারিলাম না। আশ্রমে কাজের এত চোট পড়িয়াছে যে আশ্রমের কাহারও বিশ্রামের এক কণা অবসর নাই। মঙ্গল-বাধ ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার মেরামত সম্পর্কে অনেকগুলি ব্যাপারে ঘাড়ের উপরে দায়িত্ব চাপিয়া গিয়াছে, এদিকে আশ্রমের ফুলের চাষের স্বত্ব প্রায় চলিয়া যায়, অথচ যতটা প্রয়োজন, ততটা চারা এখনও বীজতলা হইতে বের হইতে পারেনা, ইত্যাদি কত রকমের কাজ যে এখন গতিমত বলিবার নহে। এত কাজের তাড়ার মধ্যেও দুই চারি খানি চিঠি লিখিতে পারি না? পারি এবং লিখিও, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বৈশেষ্য চল্লিশ হইতে আশি, কোনও কোন দিন এক শত। এক শত চিঠির

বার্ষিক, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেম

প্রতিধ্বনি

৬৩৯

লিখিতে কতটা সময় লাগিতে পারে, ধারণা কর। আমি ঠিকানাও
 লিখি, পত্রখানাও লিখি। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সেক্রেটারী কেন
 নিয়োজিত করি না। তাহার প্রথম জবাব এই যে, সেক্রেটারীর হাতের
 পত্র কেহ পাইতে চাহে না। দ্বিতীয়তঃ যে টাকা দিয়া সেক্রেটারী রাখিব,
 সেই টাকাতে দশটা কুলী-কাগিন আশ্রমে সারা মাস মাটি কাটার কাজ
 করিবে। তাহাতে লাভ বেশী হইবে। পত্র ত জীবন ভরিয়াই
 লিখিলাম। বলিতে গেলে আমার জীবনই পত্রময়। আমার সমস্ত
 সাহিত্য পত্রের সাহিত্য। পত্র লিখিয়া ছিলাম বলিয়াই একটার পর
 একটা করিয়া পুস্তক ছাপার হরফে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আরও যে
 বিপুল পরিমাণ পাণ্ডুলিপি তৈরী হইয়া আছে, তাহাও পত্র হইতেই
 লিখিলি মাত্র। পত্র লিখিতে আমি ভালবাসি, কারণ বাহার কাছে
 লিখি, তাহাকে অতি কাছে পাই, তাহার প্রাণের সাথে প্রাণ, হৃদয়ের
 সহিত হৃদয় মিলাইতে পাই। এজন্তই সেক্রেটারী রাখি না। তবে
 মাঝে মাঝে কেহ কেহ আমার হইয়া পত্র লিখিতে বসিয়া যায়। আমি
 অবিরাম বলিয়া যাই। ইহাতেও পত্র আমারই লেখা হয়। ইহার
 জন্য আমারই অবসর পাওয়া প্রয়োজন। এই সকল কারণেই তোমার
 পত্রের উত্তর সময় মতন দিতে পারি নাই। তোমার পত্রে
 পূর্ণিমায় সমবেত উপাসনা লইয়া কি একটা গোলযোগ হইয়াছে বলিয়া
 জানিলাম এবং সেই সংবাদে দুঃখিত হইলাম। আমি সময় মতন পত্র
 দিতে পারিলে হয়ত তোমাদের কাহারও মনেই কোন কষ্ট হইবার কারণ
 পড়িত না। তোমরা নিজেদের মধ্যে ভুল-বুঝাবুঝি করিয়াছ, মনে
 হইল।

তুমি বহুকাল যাবৎ তোমার গৃহে প্রতি পূর্ণিমায় হরির লুট দিয়া
 আসিতেছিলে। অখণ্ডদীক্ষায় দীক্ষিত হইবার পরে তুমি ইচ্ছা করিলে

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেমা

[৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৪০

যে দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া প্রতি পূর্ণিমাতে তুমি সন্ধ্যায় তোমার গৃহে সমবেত উপাসনা দিবে। তোমার এই প্রস্তাব অতি আদরের সহিত তুমি প্রশংসা করিয়াছি কিন্তু একবারে বারো বছরের জন্য একটা সঙ্কল্প করিয়া নিষেধ করি। সেই অনুসারে তুমি এক বৎসরের জন্য এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিলে। সেই এক বৎসর পার হইবার পরে তুমি চাহিতেছো তোমার গৃহে আরও বছরের পর বছর, পারিলে আরও এগার বৎসর এই ভাবে প্রতি পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে সমবেত উপাসনা হইতে থাকুক।

ইতোমধ্যে তোমাদের পল্লীর অগ্রাগ্রহ কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়া লাগিলেন যে, তাঁহাদেরও গৃহে কোনও কোনও পূর্ণিমায় সমবেত উপাসনা হউক। কেহ যদি এইরূপ পবিত্র কাজে অভিনবরূপে তব ত তাহাকে দোষ দিবার কিছু নাই। ফলে তোমাদেরই প্রায় একটা মহিলা এক পূর্ণিমায় তাঁহার গৃহে সমবেত উপাসনা ব্যবস্থা করেন।

আমি মনে করি, ইহাতে তোমার বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। তোমার যেমন নিজ গৃহে পূর্ণিমায় সন্ধ্যায় সমবেত উপাসনা করিয়া ইচ্ছা করে, অশ্রেরও তাহা করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে তোমার গৃহেই সকলকে যাইতে হইলে অনেকের আশাভঙ্গ অনিবার্য। বৎসর জুড়িয়া পূর্ণিমায় সমবেত উপাসনাগুলি সব একই গৃহে হইতে পারে না। যাহারা মাঝে মাঝে কোনও কোনও পূর্ণিমায় নিজ নিজ সমবেত উপাসনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের অনুবিধা হয়। তোমারই গৃহে প্রতি পূর্ণিমায়ই সমবেত উপাসনা করানো কখনো সম্ভব নাও হইতে পারে। তোমরা জাতকাক্ষোচ ও মৃত্যুশোচ মান। এমতাবস্থায় বা কাহারও কোনও সংক্রামক পীড়া হইলে

কাটিক, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেয়া

প্রতিধ্বনি

৬৪১

গৃহের উপাসনা তোমার কোনও প্রতিবেশীর গৃহে নিতে হইতে পারে।
 তুমি যাছ, ইতোমধ্যে এমন একটা ব্যাপার হইয়াও ছিল। তাই আমি
 তোমার এক গুরুভগিনীকে লিখিয়াছিলাম যে, যেদিন পূর্ণিমায় অত্র
 সমবেত উপাসনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সে দিন গ্রামবাসীরা
 অত্র সমবেত উপাসনার জন্ত মিলিত হইতে পারিবেন। একমাত্র
 তোমার গৃহ ছাড়া অত্র কোনও পূর্ণিমাতেই স্থানীয় অথগুণ
 মিলিত হইতে পারিবেন না, এইরূপ নিয়ম করিতে গেলে সকলের
 উপরে অবিচার করা হয়। যেদিন পূর্ণিমায় অত্র কাহারও গৃহে
 সমবেত উপাসনা হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মণ্ডলী মনে করিবেন,
 সেই দিন তোমার গৃহে অনেক উপাসকের সমাগম না হইলেও তুমি
 তোমার সঙ্কল্পিত উপাসনা কিছু লোককে লইয়া অবশ্যই করিবে। আবার
 অত্রগুরা অত্র গৃহে যাইয়া সমবেত উপাসনা করিলে তাহাতে তুমি
 ক্রোধিত হইবে না বা বিরোধও করিবে না। আমার মতে ইহাই
 ব্যবস্থা। অত্র অত্র কেহ পূর্ণিমার উপাসনা চাহিতেছে বলিয়া তোমার
 উপাসনা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে না। তোমার গৃহের সঙ্কল্পিত
 উপাসনা নিশ্চয়ই করিতে হইবে। কিন্তু হয় তুমি সেই দিনটি নিজ
 পরিবারস্থ লোকদের নিয়াই কাজটা সমাপ্ত করিবে, নয় ত অত্র স্থানের
 দূরব বৈশী না হইলে সেখানকার সমবেত উপাসনা শেষ হইবার পরে
 সেখানকার লোকজনদের আনাইয়া তোমার গৃহের উপাসনা করাইবে।
 ডিব্রুগড় সহরে একই দিনে সমবেত উপাসনা করিয়া কয়েক জম
 নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীর হালখাতা হইয়া থাকে। তাঁহারা এই রীতিই
 অবলম্বন করিয়াছেন। এক এক জনের গদিতে সমবেত উপাসনা
 হইয়া যাইবার পরে যে যে পারেন, সকলকে লইয়া অত্র গদিতে যাইয়া

প্রতিধ্বনি

ধুতং প্রেম

[৯ম বর্ষ, ৭ম দশক]

৬৪২

আবার সমবেত উপাসনা শুরু করিয়া দেন। ইহার পরে বার বার গদি-সাইত হয়। ইহাতে সেখানে পয়লা বৈশাখ তারিখে একটো বিরাট আনন্দের মেলা বসিয়া যায়। অগ্র যাহারা পূর্ণিমার সন্ধ্যার নিঃশব্দে গৃহে সমবেত উপাসনা চাহেন, তাঁহাদের সহিত এবং মণ্ডলীর কৰ্ত্তাদের সহিত যদি তোমার অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা থাকে ও ভাষণ জন্মিয়া যায়, তবে কখনও কখনও ইহাও তোমার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে।

এই সকল আধ্যাত্মিক লাভজনক ব্যাপারে সংসারী মনোভা কাহারও না রাখাই ভাল। তুমি দীর্ঘ কালের জন্ত একটা ফল করিয়া বসিয়াছ, তোমার সংস্কল্প-নিষ্কির জন্ত সহায়তা কর সকলেরই কর্তব্য। আবার, অগ্রাগ্রাও পূর্ণিমা তিথিটার নিঃশব্দে গৃহে মাঝে মাঝে সমবেত উপাসনা চাহেন, তাঁহাদেরও দিকে তেমন তাকান দরকার। এই সকল ব্যাপারে অতি সহজ মীমাংসা একবার প্রেম-ভালবাসার দ্বারাই হইতে পারে। তোমরা বিচার, ত্রাণ, আদি কানুন বা জোর-জবরদস্তির উপরে নির্ভর না করিয়া প্রেম-ভালবাসা উপরে নির্ভর কর। প্রেমের বলে সব অসম্ভব সম্ভব হয়। তোমরা বেলায় তাহা একেবারে নিষ্কল হইয়া যাইবে? আমার আরও কয়টি লিখিবার ছিল, কিন্তু আমাকে এখনি মাঠে যাইতে হইবে তোমাদের গুরুভ্রাতা শ্রমিকদের সহিত কাজ করিবার জন্ত। তাই এখনে সাজ হইল। রাত্রি আটটায় মাঠ হইতে ফিরিব। ইতি—

আদিকার
ধরপাল

কার্তিক, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৬৪৩

(৬১৭)

হরি-ও

পুপুনকী আশ্রম

৭ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। মঙ্গলবাধ ভাঙ্গিয়া
 বাওয়াতে তোমাদের মনে কষ্ট হইয়াছে, আর তোমরা সব
 কাঁচড়াপাড়া হাঁসপাতালের ধনজনহীনা দুর্বল-টি-বি রোগিণীরা মিলিয়া
 বাধ মেয়ামতের জগু ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ টাকা পাঠাইয়াছ, ইহা জানিয়া
 তোমাদের অন্তরের মহত্বে বিস্ময়াবিত না হইয়া পারিলাম না। ধনবান্
 দিগকেই লোকে ধনী মনে করিয়া থাকে, কিন্তু তোমাদের মতন দরিদ্ররা
 যে কত ধনী, তাহা জানে না। তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আর একটি
 ক্ষুদ্র দল লোকের কথা মনে পড়িতেছে। তাহারা পাহাড়ী রিয়াং,
 অশিক্ষিত অল্পমত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এবার কেন, প্রায় তিন কি চারি
 বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে তাহাদের অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, আর তাহার
 সুবোগে খ্রীষ্টান মিশনারীরা তাহাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করিয়া লইতেছেন।
 পেটের দায়ে অনেকেই ধর্ম্মত্যাগ করিতেছে। সেই রিয়াং জাতির মধ্যে
 কয়েকটা পুরুষ ও নারী দিনে এক বেলায় আহারীয়ের পরিমাণ
 কমাইয়া, এবং অল্প বেলায় আহারীয় একেবারে বাদ দিয়া, যাহা সঞ্চয়
 হইয়াছে, তাহাই একটি ভক্তের মারফৎ আমাকে পুপুনকীতে মঙ্গল-
 বাধের কাজের জগু পাঠাইয়াছে। এমন মহত্ব ধনীতে সম্ভবে না।
 তাই বলি, কে বলে তোমরা দরিদ্র? কেবল ধনীরাই ধনী নহে,
 দরিদ্রেরাও ধনী। দরিদ্রেরা প্রাণের ধনে ধনী। ভালবাসাই মানুষকে

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেয়া

[৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৪৪

ধনী করে, টাকা নহে। যে ভালবাসে, তাহাকেই জীবিত বলিয়া গণ্য করিতে হয়। যাহারা ভালবাসিতে জানে না, তাহাদিগকে জীবিত বলিয়া মনে করিয়া লাভ কি? তোমরা তোমাদের অপার ভালবাসার পরিচয় দিয়াছ মা। আমি তোমাদের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি।

তবু তোমাদের পত্র খানা পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে বলিয়া পারি নাই। শ্রীমান্ প্রেমাঙ্গন বেলা দুইটায় কলিকাতা হইতে এক যোগ পত্র নিয়া আসিয়াছে। তোমার পত্র তাহার মধ্যে ছিল। আনন্দ পড়িবার অবকাশ কোথায়? সারাদিন আশ্রমের মাঠে মাঠে কাটা করিতেছি। তোমরা এত ত্যাগ স্বীকার করিয়া কেহ কেহ নিজেদের বৃকের রক্ত দিয়া টাকা পাঠাইতেছ, আমি কি তাহার অপব্যয় হইতে দিতে পারি? মজুরদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও খাটি। আমার সঙ্গে হয় আমার ব্রহ্মচারীরাও অমানুষিক শ্রম করিতেছে। নিত্যমুন্দর, পরিষ্কার যত্ন, কেহই বসিয়া নাই। আজ যদি কল্যাণীয়া সাধনা স্থগিত হইত, তখন বেনারসে অমুস্থ অবস্থায় না থাকিত, তবে সেও শ্রম করিত। মজুর খাটাইলেও কাজ করিতে হয়, নতুবা কেবল ছাড়া দিয়া কাজ দেখিলেই কাজ হয় না।

সারাদিন খাটিয়া খাটিয়া মাতালের মতন নেশায় অবশ হইয়া আশ্রমটাতে ঢুকি। তখন পত্র লিখিতে আর চোখ ছটাকে খোঁচা রাখিতে পারি না। অধিকাংশ পত্রই চোখ বুজিয়া বুজিয়া লিখিয়া দিয়া টাইপের ভুল হয়, সংশোধন করিবার অবকাশ পাই না। এই ভাবে আমি প্রত্যহ তোমাদের কাছে চল্লিশ পঞ্চাশ বাটখানা করিয়া পত্র বোঝাই। তোমরা আমার জন্য অত ভাব, আমি তোমাদের জন্য ভাবি না। আমি কি করিয়া তোমাদের অবহেলা করিতে পারি? আর কতগুলি পত্র লিখিতে হইবে জানি না। খামখানা খোলার

সব সময় ত বুঝিতে পারি না যে কে কি লিখিয়াছেন। এক একখানা পত্র পাঠ করিয়া মানুষের হৃৎথে হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়। কত রকমের যে হৃৎথ জীবের আছে, তাহার তালিকা করা অসম্ভব। হৃৎথের ইয়ত্তা নাই। শরীরের হৃৎথ, মনের হৃৎথ, সংস্কারের হৃৎথ, সমাজের হৃৎথ, রাষ্ট্রের হৃৎথ,—হৃৎথের অবধিই বা কোথায়, অন্তই বা কোথায়? এই সেই দিন পেটের হৃৎথে কলিকাতার লোকেরা খাত্ত-আন্দোলন করিল, আর নিজেদের মেকী সম্মানের হৃৎথে মহাত্মা গান্ধীর নাম-করা সব শিখ্য হইয়াও সরকারী শাসকেরা কত নিরীহ লোকের, কত অনাথার মণল, কত অন্ধের নড়ি ছাত্রগুলিকে গুলি করিয়া মারিবার হুকুম দিলেন। হৃৎথের আজ পারকূল কোথায়? এত হৃৎথ দূরই বা করিবে কে? হৃৎথ লোকের হৃৎথ দেখিলে কাঁদি। তোমরাও হৃৎথে পড়িয়াছ, তোমাদের জন্ত আমার এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু আমি উপঢৌকন দিতেছি।

অনুখে পড়িয়াছ বলিয়া ঘাবড়াইয়া যাইও না। ইহারই মধ্য দিয়া ভগবানকে স্মরণ করিতে থাক। তিনি মঙ্গলময়, এই বিশ্বাসের চেয়ে বড় শাস্তি জগতে আর কিছু নাই। তাঁহাকে বিশ্বাস কর মা। তাঁহাতে নির্ভর কর। তোমার অনুখ সারিয়া যাউক, তুমি নীরোগ হইয়া ঘরে ঘেন ফিরিতে পার, তোমার দ্বারা সমাজ ও সংসারের ঘেন আনন্দ বাড়ে, কল্যাণ বাড়ে, সেই প্রার্থনা, সেই আশীর্ব্বাদ আমি নিয়ন্ত করিতেছি।

তোমার প্রাণের ভক্তি তোমাকে এক বিচিত্রমুন্দের পরমকল্যাণকর পথের দিকে টানিয়া নিতেছে। পর পর-কয়েক দিনই তুমি আমাকে যথেষ্ট দেখিয়াছ এবং একটু একটু করিয়া দীক্ষা লাভের পথে আগাইয়া গিয়াছ, ইহা এক অপূর্ব সংবাদ। প্রথম হইলে নিকট, তার পরে পাইলে আশ্বাস, সর্ব্বশেষে একেবারে মন্ত্রলাভ তোমার হইল। ইহা

প্রতিবনি

ধ্বং প্রেয়া

[৯ম বর্ষ, ৭ম দশক]

৬৪৬

সত্যই অদ্ভুত । কিন্তু ইহা মিথ্যা নহে । তোমার স্বপ্ন-প্রাপ্ত ঐ ময়
আমি সকলকে দিয়া থাকি । সেই মন্ত্রই তুমি দীক্ষায় পাইয়াছ।
স্বপ্ন হইলেও ইহা পরমসত্য । এই নামে নির্ভর রাখিও । জগৎ
নামই একমাত্র সত্য, আর সকলকে অসত্য বলিয়া জানিও । তবে
যখন অত্র সকল বস্তুকে নামের সহিত অভিন্ন জানিবে, তখনই সমস্ত
ও তাহার সমস্ত বস্তু তোমার নিকটে যেন সত্য বলিয়া গৃহীত
হয় । ইতি—

আশীর্বাদ

স্বরূপানন্দ

(৬১৮)

হরি-ওঁ

পুণ্ডরীক আশ্রম

৮ই আশ্বিন, ১৩৩৩

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

আজ এখানে আশ্রমের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হইল । তেত্রিশ বৎসর ঐ
জেলাটায়, এই উষর মরুভূমিতে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছি
এবং নিজ জীবনের উপর দিয়া কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনার দ্বারা
স্বাবলম্বনেরই কেবল মহিমা ঘোষণা করিয়াছি, কিন্তু এততেও আশ্রম
প্রতিষ্ঠা হয় নাই । কেন হয় নাই, তাহা তুমি জানো । আজ সত্য সত্য
আশ্রম-প্রতিষ্ঠা হইল । ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া আমি প্রেরণ
নিত্যসুন্দর, পরিমল, প্রেমজীবন, যত্ন আর ভৃত্য বতিয়া বিগ্রহে গুল্মার্জিত
দিয়া হরি-ওঁ কীর্তন করিতে করিতে প্রথম আশ্রম-ভবন খানার ভিত্তি
খননের চিহ্ন প্রদান করিলাম । অসম্পূর্ণতা রহিল এই যে, তুমি

সাধনা উপস্থিত ছিলে না। তুমি থাকিলে কতই আনন্দ হইত। সাধনা থাকিলে ব্যাপার হইত সত্য সত্য পরিপূর্ণতায় উচ্ছল। এই সাধনা আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের প্রায় প্রতিটি ভয়ঙ্কর কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া বীর রমণীয় ত্রায় তিনটি পুরুষের চাইতেও অধিক শ্রম করিয়াছে এবং জনসমাজকে অতুলনীয় সেবা দিয়াছে। সে আজ বেনারসে অসুস্থ হইয়া আছে শয্যায় পড়িয়া। ইহা আজিকার অনুষ্ঠানের একটা অসাধারণ রকমের অপূর্ণতা। তবে তাহার অনুপস্থিতিতে পূরণ করিবার জন্ত স্থির করিয়াছি যে এই প্রথম ভবনখানার নাম হইবে সাধনা-কুঞ্জ। এখানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। আশা করি, তুমি ইহা পছন্দ করিবে।

গুণ্ডা একটা দালানের সহিত সাধনার নামকে সংযুক্ত করিলেই সাধনার সেবার সম্মান পূরাপূরি দেওয়া হয় না। এমন এক সঙ্কট দেশের গিয়াছে, যখন যে-কোনও সংসাহসী কর্মীকেই গুণ্ডা ঘাতকের ছুরিকার নীচে অবস্থান করিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। সেই সময়ে অনেক নামজাদা কর্মীদেরই কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। অনেক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমূহই অন্ধকারে গাঢ়াকা দিয়াছিলেন। সাধনা সেই সময়ের এক অসাধারণ যশস্বিনী কর্মিণী। আমার সহকারিণী রূপেই তাহার নাম বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইলেও সে নিজেও পূর্ণ দায়িত্বে দেখানে যে-বে অধ্যবসায়ে মন দিয়াছে, তাহাতেও তাহার প্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে। তাই আমি তাহার প্রতি আনন্দ স্বরূপে ভবনখানার নাম সাধনাকুঞ্জই রাখিলাম। আমার এই পত্রখানা প্রকাশে সাধনার আপত্তি হইবে জানিয়াও ইহা নির্দেশ দিয়া রাখিলাম যে, ধৃতং প্রেম্নাতে যখন আমার অত্যাশ্রিত পত্র ছাপা হইবে, তখন ইহাও ছাপাইতে হইবে। এ দেশে অনেক কর্মীর পরিশ্রমের ফল নেতারা ইহার

করিয়া থাকেন। আমি জীবন ভরিয়া যত কাজ করিয়াছি, তার মত আমার একার শ্রমে সম্ভবপর হয় নাই। তাহাতে আরও শত শত উল্লেখযোগ্য ও অনুল্লেখ্য কর্মীদের অকাতর পরিশ্রম রহিয়াছে। তাহাদের কত জনকে পৃথিবী চিনিবেই না, আমারই হইবে কেবল বশোদেব ইহা অবিচার। কিন্তু হাজার ছেলেমেয়েদের প্রতি জনকে ত সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া ধরা যায় না; কারণ তাহা অসম্ভব। এক কত জন আছে, যাহাদের সেবা আমার প্রতি বা আমার আনন্দ প্রতি অতুলনীয় কিন্তু আমি হয়ত তাহাদের এই সেবার সংবাদই দি না। অত্রে শ্রম করে, আমরা তাহার ফল ভোগ করি। এই সমাজে, অজ্ঞাত কর্মীদেরই সকলের সম্মানার্থ এই ভবনের নাম দিয়া সাধনাকুঞ্জ।

তুমি প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ আশ্রমের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখিয়া আসিতেছ। প্রায় আঠারো বিশ বৎসর যাবৎ সর্বক্ষণ আশ্রমে কোনও না কোনও কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া সর্বক্ষণ আশ্রমেরই ব্যাপারে নিজেকে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছ। তুমি আমার ব্যক্তি-জীবনকে অনেক কথাই জান, আমার ব্যক্তি-জীবনের কোনও কথাই তোমার অজানা নাই। তুমি জান যে আমি আমার সহকর্মীদের সঙ্গে কেবল একজন রুদ্র শাসকই নহি, আমি তাহাদের ভক্তিবিনয় পূজক, তাহাদিগকে দেবতার মত দেখি। আমার এই দেব-দর্শনে পূজ্যতার কোন স্থান নাই। প্রতি জনের প্রতি আমার সমান সম্মান-বোধ প্রতি জন সম্পর্কে আমার সমান আশা ও সাধ। কিন্তু কর্ম-পন্থায় তাহা বাস্তব্য পরিবেশ ইহাদের প্রতিজনকেই পৃথক ভাবে গড়িয়া রাখিয়া তাই ইহারা কেহ এক মাস, কেহ এক বৎসর, কেহ পাঁচ মাস, কেহ পাঁচ বৎসর প্রতিষ্ঠান ও আদর্শকে সেবা দিয়া নিজ নিজ পথে চলে

কার্তিক, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৬৪৯

গিয়াছে। আমি ইহাদের সেবা দ্বারা নিজেকে লাভবান্ করিবার চেষ্টা
কখনো করি নাই, অথচ ইহাদের প্রতিজনের স্মৃতি অবিস্মরণীয় করিয়া
রাখিবার জন্ত মনে মনে কত আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছি। ইহাদের
জন্মভূমির খোঁজে ছুটিয়া গিয়াছি অথ্যাত পল্লীর অন্ধকার কোণে, আর
প্রত্যেকটি গ্রামে একটি একটি করিয়া পাঠাগার, ব্যায়ামশালা ও
উপাসনা-মন্দির স্থাপন করিয়া সেই প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহাদের এক এক
জনের নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার ধ্যানে ও কল্পনায়
লাগিয়া গিয়াছি। “স্বরূপানন্দ” নাম ক্ষোদিত হউক, এই কামনায়
নহে, ইহাদেরই এক এক জনের নাম প্রাকার-গাত্রে লিখিত থাকিয়া
জন্ম জন-সেবকদের কথা ভাবী মানবকুলকে কতক কালের জন্ত
হইলেও স্মরণ করাইয়া দেউক, ইহাই আমার অন্তরে ছিল নিরন্তর
কামনা। নিজ-বশ নহে, ইহাদেরই বশ আমার কামা ছিল, আজও
আছে। কিন্তু বাহারা চলিয়া যাইবার জন্তই আসিয়াছিল, আজ আর
তাহাদের কথা ভাবিবার অবসর কৈ? বাহারা সর্বাবস্থাতে লাগিয়াই
বহিল, তাহাদের স্মৃতি আমি মুছিয়া যাইতে দিব না। তাই স্থির
করিয়াছি যে, এই আশ্রমের প্রতিটি অংশে একটি একটি করিয়া সেই
সকল সহকর্মীর নির্মল বশ ঘোষণার জন্তই কুটীর, প্রাসাদ, সেতু বা
বর্ষা নির্মিত হইবে, বাহারা নীরবে আত্মদান করিয়া নিয়ত আমার
বলবর্দ্ধন করিয়াছে এবং প্রকারান্তরে আমার যশোবর্দ্ধনও করিয়াছে।
নিজবশে নহে, ইহাদের বশেই আমার আত্মপ্রসাদ।

আমার অভিপ্রায় এই যে, সাধনাকুঞ্জ সকলের সাধন করিবার কৃতি
বেদ বর্ধন করে। দালানের পর দালান গাঁথিয়া আশ্রম হয় না, প্রাণের
পর প্রাণ জাগাইতে পারিলে আশ্রম হয়। আশ্রম হইবার অন্ত রাস্তা
নাই। বাহাতে সকলের প্রাণ জাগে, তাহারই জন্ত সাধনা-কুঞ্জের

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরা

[১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৫০

প্রয়োজন— এখানে যে বিদ্যা-ভবন হইবে, তাহা বিদ্যার্থীদের জীবন সাধনার উদ্দীপন করিবে। ইতি—

আদর্শ

স্বরূপ

(৬১২)

হরি-ওঁ

পুণ্ড্রী আশ্রম

২৬শে আশ্বিন, ১৩৫৩

পরমকল্যাণীয়াসু—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পর পর কয়েকজনের পত্রেই এই অভিযোগ আসিতেছে যে, তোমার কর্তাগিরিতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা তোমার সহ সহ্য করিতে চাহে না। ইহা নিতান্তই ব্যক্তিগত অপছন্দের কারণ। তুমি যদি ভাল বিষয়ে সকলকে নেতৃত্ব দাও, তবে তাহা মানিয়া লইয়া সকলের কর্তব্য। বিশেষ করিয়া তুমি ওড়িয়া মেয়েদের ভিতরে কাজটুকু করিয়া বাইতেছ, তাহার ফল ভবিষ্যতে খুবই ভাল হইয়া বলিয়া আমি মনে করি। আমি যখন প্রায় আটত্রিশ বৎসর বয়সে উড়িষ্যা সুখিন্দার বনে আশ্রম করিতে যাই, তখন আমার মনে ওড়িয়া ভাষায় পারদর্শিনী যেমন একটি মহিলা কর্মীর প্রয়োজন-বোধ জাগিয়াছিল, তাহার অনেকটা অভাব তোমাকে দিয়া পূরণ হইতে পারে। তুমি গ্রাম্য ব্যাপারের মধ্যে না থাকিয়া মণ্ডলীর উপরেই স্থানীয় সমস্যা সমূহ সমাধানের ভার দিয়া নিজেকে বিপুল ব্যাপক প্রচারের জন্য লগাইয়া দাও। যে ব্যাপারে গ্রামের কথা আছে, তাহা হইবে

তুমি আলাদা হইয়া যাও, তাহাকে তুমি উদাসীনতার দৃষ্টিতে দেখ। তোমার গ্রামে কাহার ঘরে সমবেত্ত উপাসনা হইল বা না হইল, তাহার নেতাগিরিটা তুমি একেবারেই ছাড়িয়া দাও। ছুটিয়া যাও গ্রামের পর গ্রামে অখণ্ড-সংহিতার বাণী লইয়া, তুমি গিয়া নূতন নূতন লোকের মোহ-দ্রুম-বোর ভাঙ্গাইতে লাগিয়া যাও। এই যোগাতা অপরের নাই, তোমার আছে। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ও শঙ্করের শিষ্যগণ যেমন করিয়া নির্ভীক প্রাণে দেশে বিদেশে গিয়া আত্মার বাণী প্রচার করিয়াছেন, যেমন করিয়া খ্রীষ্টোত্তরের অনুবর্তীরা দুর্গম নাগা-পর্বত অতিক্রম করিয়া সাপ, বাঘ, হাতী ও গণ্ডারের ভয় পদতলে চাপিয়া রাখিয়া মণিপুরে গিয়া পীতবর্ণ জাতিকে আধ্য-বংশধরদের সাধনায় দীক্ষিত করিয়াছেন, তোমাকে তেমন সাহস লইয়া বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। তুমি গ্রাম্য ছোট খোট ব্যাপারের মধ্যে মাথা গুঁজিও না মা। তোমার সাহস আছে, সামর্থ্যও আছে, তত্পরি তুমি নিজে ওড়িয়াভাষী, তোমার পক্ষে ত মা অসাধ্য-সাধন সহজ। তুমি অত্র দিক হইতে মন তুলিয়া নিয়া বিপুল প্রেমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অখণ্ডসংহিতার বাণী নিয়া প্রবেশ কর মা। তোমার গ্রাম তাহার নিজের মনে পড়িয়া থাকুক। তুমি বিশ্বের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়। একটা গ্রামের নেতৃত্ব-কামনায় জলাঞ্জলি দিয়া তুমি বিশ্বের কল্যাণে সকল গ্রামের সেবিকা হও, সকলের প্রাণে মানুষ হইবার প্রদীপ্ত আকাজক্ষা জাগাইয়া তোল।

মাগো, একটা কথা সর্বদা মনে রাখিও। বৃহৎ ও মহৎ কার্যের ভার বাহারা নিবে, লোকের ছোট-খোট দোষত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিবার নেশা তাহাদের ছাড়িতে হইবে। বড় কাজ করিতে হইলে মন ও চোখ

ছুটিকেই বড় করিতে হয়। সহকর্মী ও অনুপস্থিতদের দোষ-ত্রুটিতে
 দিতে গেলে নিজের দোষ-ত্রুটিগুলি চোখে পড়ে না। ইহাতে নিজ
 ব্যক্তিত্বের মূল্য ও কর্মিত্বের মান কমিয়া যায়। নিজেকে অবিরত
 করিয়া কেহ নিরন্তর বড় কাজে লিপ্ত থাকিতে পারে না, কারণ
 দুইটি অবস্থা পরস্পর-বিরোধী। বৃহৎ জগতের দিকে তাকা
 নিজের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে গ্রাম্য কলহ-কচায়নের বাহিরে রাখিতে
 কর। নাই বা হইল গ্রামের মধ্যে তোমার নেত্রীত্ব-প্রতিষ্ঠা, নাই
 তোমার গ্রামে তোমাকে কেহ সর্বাধিনায়িকা বলিয়া মানিল, নাই
 তোমার খ্যাতিতে তোমার গ্রাম মুখরিত হইল, তুমি প্রকৃত ফেরি
 হইয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে ছুটিয়া যাও জ্ঞানের মশাল হাতে লইয়া, হে
 সুরভি ধূপকাটি জ্বালাইয়া, যশোলোভবর্জিত বিনীত বিনয় সরল
 সদয় সুন্দর মন লইয়া। এই বলকে ব্রহ্মবল বলিয়া জানিবে।
 দ্বারা তুমি যাহা করিতে পারিবে, তাহার শতাংশ কখনো কেহ বি
 রণ-বাহিনীর সমাবেশ করিয়াও করিতে পারিবে না। তুমি হ
 কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার বাক্যকে ক্রব সত্য বলিয়া জান।
 বাক্যে অটল অচল বিশ্বাস না থাকিলে শিষ্যের মধ্যে গুরু শক্তি
 কখনো জাগিতে পারে? ইতি—

আদিকার
 স্বরূপ

(৬২০)

হরি-ও

পুপুনকী ভাষা
 ৮ই আশ্বিন, ১৩৩৩

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও
 জানিও।

কার্তিক, ১৩৬৭]

বৃত্তং প্রেম্য

প্রতিধ্বনি

৬৫৩

যে বিশ্বাস করে, তাহার লয় নাই, ক্ষয় নাই। বিশ্বাসই জীবনের মধু।
আমি আশীর্বাদ করি, তোমাদের বিশ্বাস তোমাদের জীবনকে অমৃতায়-
মান করুক। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২১)

হরি-ওঁ

পুপুন্যী আশ্রম

৮ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস
হানিও।

সম্ভব ভালবাসার বলেই বাঁচিয়া থাকে, অর্থবলেও নহে, জনবলেও
নহে। একটি মানুষকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসিতে শিখিয়াছ কি
নিখিল বিশ্বকে ভালবাসিবার তোমার সোপান-নির্মাণ হইল। এক
জনের প্রতি অনাবিল প্রেম জগতে সহস্র সহস্র জনের সহিত মিলনের
পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। তোমরা একে অতুল্য ভালবাসিও, তোমাদের
সম্মতিতে সেই ভালবাসারই উদ্বোধক, উত্তেজক ও উৎসাহ-প্রদায়ক
হউক। তোমরা একজনের জন্ত অপর জনে প্রাণ দিতে শিখ।

সকল ভালবাসার মূল উৎস শ্রীভগবান্ স্বয়ং, এই কথাটি স্মরণে
রাখিয়া সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখ এবং মনে মনে বারংবার প্রণতি
কর। তোমাদের এই প্রণতি তোমাদের আত্মাহ্বার নাশের সহায়ক ও
সর্বতোভাবে পরহিতার্থে আত্মদানের প্রণোদক হউক, সর্বত্র

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরা

[২ম বর্ষ, ১ম পত্র]

৬৫৪

পরমেশ্বরানুভূতি তোমাদের সর্বজনের প্রতি অনন্ত অনুরাগের নিয়ম
হউক। সম্বোধন কেবল তোমাদের ঐক্যবোধই যেন না বাতায়
তোমাদের বিশ্ববোধকেও যেন উহা উদ্দীপিত করে। ইতি—

আদিত্য

স্বরূপানন্দ

(৬২২)

হরি-ও

পুণ্ডরীক

২ই আশ্বিন, ১৩৩৩

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্বাদ
জানিও।

তোমরা ১৫ই তারিখে যে সম্মেলন ডাকিয়াছ, তাহা বাহাতে সফল
লাভ করিতে পারে, তাহার দিকে তোমাদের প্রতি জনের সমান মন
যেন থাকে। যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত এই সম্মেলন, সেই
উদ্দেশ্যের দিকে যেন তোমাদের প্রত্যেকের মন উন্মুখ হইয়া থাকে
ছোটবড় সকলেরই মন যখন এক দিকে যায়, তখন সেই ব্যাপারে
সফলতা কেহ রোধ করিতে পারে না। ইহা এক পরম সত্য।
তোমাদের সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। ইতি—

আদিত্য

স্বরূপানন্দ

বার্তিক, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৬৫৫

(৬২৩)

হরি-ওঁ

পুপুনকী আশ্রম
২ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা,—আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার আশিস তোমাদের জন্ত জল, বায়ু বা সূর্য্য-কিরণের ত্রায় নিয়ত অহেতুক ভাবে বর্ষিত হইতেছে। ইহা সত্য। আমি একটা নিমেষও তোমাদের বিষয় ছাড়া ভাবি না। আমার সকল সম্মান যেদিন বুঝিবে যে আমি কেমন করিয়া এবং কত স্নেহভর ভাবে তাহাদের ভালবাসিয়াছি, সেদিন তাহারা আপনিই ছুটিয়া যাইবে জগতের সেবার জন্ত আত্মবিসর্জন দিতে।

তোমরা তোমাদের ঐক্য ও সংহিতিকে বাড়াইয়া তোল। দুঃখোগকে সুখোগ করিয়া লও। বিপদকে সম্পদের কারণ কর। বিয়কে সহায়তাকারক মহাবল বলিয়া জানিয়া লও। আঘাত যে করিয়াছে, সে তোমাকে দৃঢ় হইতে সাহায্য করিয়াছে, ইহা মনে রাখিয়া তাহার আঘাতকে আশীর্বাদের সম্মান দাও। তোমরা কোনও কিছুকেই তোমাদের ক্ষতির কারণ হইতে দিও না, সব-কিছু তোমাদের কুশলেরই হেতু হউক।

ঈশ্বরে বিশ্বাস লইয়া পথ চল। ইহাতে আত্মবিশ্বাস জাগিবে, মানুষের প্রতি বৃথা সন্দেহপরায়ণতা নাশ পাইবে, মানুষ মাত্রেরই সহিত তোমার সম্বন্ধ সহজ, সরল ও সাবলীল হইবে। সম্বন্ধের অসরলতা ও আত্মীয়তার অস্বচ্ছতা হইতেই ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ ও মানব-বিদ্বেষের জন্ম। ঈশ্বরে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস গ্রস্ত করিয়া জগতের সকল বিচ্ছেদের মূল উৎপাটনের যোগ্যতা আহরণ কর। লম্বা লম্বা কথা

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৫৬

কহিয়া নহে, অবাস্তব পরিকল্পনা ফাঁদিয়া নহে, সর্বজীবে প্রেমের বাস্তব অনুশীলনের দ্বারাই তোমরা সকল বিষয়ে জয় করিবে। জগতের নৃত্য-মলিন কুটিল পথকে সরল, সোজা, প্রশস্ত করিয়া দিয়া প্রেম-বর্ষের তোমার ভগবদ্বিধাসের অমৃত-রথ চলুক। ইতি—

আশীর্বাদ

স্বরূপানন্দ

(৬২৪)

হরি-ওঁ

পুপুনকী আশ্রম

১ই আশ্বিন, ১৩৯৯

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণ ভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্বত্রই মিথ্যার রাজত্ব চলিয়াছে, ইহার মধ্যে নিজের সত্য বলা করিয়া চলাও এক বিপজ্জনক ব্যাপার। সত্য থাকে ত ত্রাঘ্য থাকে না, স্বার্থ থাকে ত সত্য অতলে তলাইয়া যায়। ছোট মন ও ছোট চরিত্র লইয়া বড় বড় গদি দখল করার ফলে কতকগুলি নানান গুণাবিত্ত প্রসিদ্ধ পুরুষ মনে ও চরিত্রে কল্পনাতীত ভাবে অধঃপতিত হইয়াছেন এবং তাহারই এই কুফল সমগ্র জাতিতে গিয়া বর্ধাইতেছে। ইহার প্রতিকার তোমাদের বাহির করিতে হইবে। দীর্ঘরে প্রেমাবিত্ত হও, তবেই তাহা সম্ভব হইবে।

যতটা পার, সত্যের পথে থাকিতে চেষ্টা করিও। পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিদারুণ প্রতিকূল থাকার দারুণ যদি স্থলন কোথাও ঘটে, তবে অনুতাপে অনুতাপে নিজেকে জর্জরিত করিয়া শক্তিকর করা যেন

বার্তিক, ১৩৬৭]

স্বতঃ প্রেরা

প্রাতিধ্বান

৬৫৭

ভুল, তেমন আবার মিথ্যার গড্ডলিকা-প্রবাহে নিজেকে ভাসাইয়া দেওয়াও মারাত্মক দোষ। ভুল করিলে, যতটা দ্রুত সম্ভব, দ্বন্দ্বসংশোধন করিবে,—এক ভুলের পুনরাবৃত্তি জীবনে যেন বহুবার না ঘটে। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের চরিত্রের নীচতা গুলির আলোচনা হইতে বচা সম্ভব দূরে থাকিবে, কেননা এই সব আলোচনার দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির অনুচিত কার্যের প্রতি অতি গোপনে চিত্তে আকর্ষণ ও মনে প্রবণতার সৃষ্টি হয়। নিকৃষ্ট লোকেরও মহত্বটুকুর অনুসরণ করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২৫)

বি-৬

পুপুনকী আশ্রম

১০ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পর্যবল্যাপ্তিঃ—

মেহের বাবা—, তোমাদের প্রতিনিধি-সম্মেলনের আমি সাফল্য বাদনা করিতেছি। তোমরা মনে রাখিও, সজ্জ, সম্মেলন, মণ্ডলী যদি একমাত্র উদ্দেশ্যই হইল সকলের মনকে একমুখ করা। তোমাদের কোনও আলোচনায় বাহাতে সমবেত প্রতিনিধিদের মন বহুমুখ না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য দিও। অন্তরের প্রেম নিয়া কাজ করিলে, তাহা তোমরা পারিবে। প্রেম বাহাদের অন্তরে নাই, তাহারা যেন এই মনের কান্তর প্রাণে ভগবানের নিকটে প্রেমভিক্ষা করে। অত্র অনেক দিনবই তোমরা ভগবানের কাছে কত সময়ে চাহিয়া থাক, প্রেমরূপ মনুষ্য বস্তুটাই কেহ চাহ না। এখন যেন ইহারই জন্ত তোমাদের প্রাণের প্রার্থনা উত্থিত হইয়া ভগবানের আসন টলাইয়া দেয়।

প্রতিধ্বনি

ভাইফোঁটা

[১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৫৮

উদ্দেশ্যের একতানতা অনেক সময়ে বাক্যের বহুয় ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়, ইহা তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? ঠিক প্রয়োজনীয় কথাটুকু বাহিরে পদক্ষেপ করিতে গেলেই তর্কের তোড়ে অনেক সময়ে মনের জোর কমিয়া যায়। তর্ক তর্ককে সৃষ্টি করে, একাগ্রতা নষ্ট করে, অবাস্তব বিষয়ে মনোনিবেশ ঘটাইয়া লক্ষ্যভ্রমের বিঘ্ন উৎপাদন করে। এমন একটা শব্দও উচ্চারণ করিও না, বাহা ভুলাইয়া দেয় যে, তোমরা কোন্ উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছ। বহু মন্ত্র যেমন সিদ্ধির অন্তরায়, হু লক্ষ্য তেমন কার্যোদ্ধারের বিপুল বাধা। কাব্য আর কল্পনার নহে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং যথার্থ কন্ঠ্যের দ্বারাই তোমরা উদ্দেশ্য-সাধনে সফলকাম হইবে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

ভাই-ফোঁটা

[ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী]

বছর বছর ভাই-ফোঁটা দেই যমের ছায়ায় কাঁটা দিবার জন্য প্রার্থনা করি, ভাইরা আমার দীর্ঘজীবী হউক, যমজয়ী হউক।

এবার দিকে দিকে অশান্তি চলিয়াছে। মানুষের মন অস্থির, পূজায় আনন্দ নাই, মেলায় উৎসাহ নাই, দীপাবিত্যের উল্লাসের প্রদীপমালা কাহারো অন্তরে জাগিল না। এইবার ভাইফোঁটা দিবার কালে প্রার্থনা করি, ভাইরা আমার মানুষ হউক, নির্ভীক হউক, সর্ব-ভয় জয় করিয়া দুর্ব্বার সাহসে সত্যের পন্থা অনুসরণ করুক, নারীর মর্যাদা রক্ষা করুক, মায়ের জাতির সম্মানকে জগতের সকল সম্পদের উর্দ্ধে স্থান দেউক।

প্রাণভরা প্রেম লইয়া ভাইফোঁটা দিতেছি, ভাইরা আমার, সাগরে তোমাদের পরমস্নেহের দিদির এ ফোঁটা গ্রহণ কর,—জয়ী হও ধর্ম্মে, জয়ী হও জীবনের প্রতি পদক্ষেপে।

অখণ্ড-বার্ণী

[অখণ্ডমণ্ডলেখর ত্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(১৫৩)

দবই ভগবানের বিভূতি, কিন্তু যে বিভূতির যে ভাবে
প্রকাশ, তার প্রতি তদুচিত অর্চনার ব্যবস্থা হবে।
বিভূতি বখন আবর্জনারূপে প্রকাশ পায়, তখন দূরে নিক্ষেপ কল্লে ই তার
পূজা হ'ল। কিন্তু দূরে নিক্ষেপ করার সময়ে মনে রে'খ, যাকে নিক্ষেপ
কল্লে, সেও ব্রহ্ম।

(১৫৪)

দীক্ষার মানে কি ছেলেখেলা? দীক্ষার মানে নবজন্ম লাভ।
দীক্ষা নিয়েও যদি কারো শোক না যায়, তবে বুঝতে হবে দীক্ষাই হয়নি,
কেনা ভ্রাম্যমাই মাত্র হ'য়েছে।

(১৫৫)

হুলে যাও তোমাদের অতীত শোক। জানো, ও-সব
পূর্বজন্মের স্বপ্ন-কাহিনী। অখণ্ড-মহামন্ত্রে আত্মনিমজ্জন কর,
যে ভিতর দিয়ে জগতের সকল আশ্রয় আত্মীয় হও,
সকল প্রাণের প্রাণাধিক হও, সকল পুত্রকন্যার পিতামাতা হও, সকল
পিতামাতার পুত্রকন্যা হও, সকলের সর্বস্বকে লাভ কর, সকলের তোমরা
স্বর্গ হও।

(১৫৬)

বিশ্বাস কর, অমৃতময় অথও-নামে, আর বিশ্বাস কর
 পরম-প্রভুর পরমমঙ্গল স্নেহাশিসে। বিশ্বাস তোমাকে পরি-
 নির্মল করবে, সুন্দর করবে। বিশ্বাস তোমার হৃদয়কে পরিশোধিত
 করবে, তোমার জটিল প্রকৃতিকে সরল করবে, তোমার পাপবুদ্ধির
 ধর্মবুদ্ধিতে পরিণত করবে, তোমার বাসনা-কামনাকে প্রেমে রূপান্তরিত
 করবে। বিশ্বাস কর, আর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ভগবানকে দর্শন কর,
 বিশ্বাসের বলে তাঁকে অনুভব কর, বিশ্বাসের বলে তাঁকে আপন
 আপন রূপে লাভ কর। বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে তোমার কর্মের
 তেজ, সাধনের উদ্দীপনা, জ্ঞানের প্রভা, উপলব্ধির গভীরতা বর্ধিত কর।
 বিশ্বাস করার মানেই হ'ল নিঃশঙ্ক হওয়া, নির্ভীক হওয়া, বলবান হওয়া।

(১৫৭)

শান্তিলাভ যার কাম্য হবে, তাকে ভগবৎ-বিশ্বাসী
 হ'তেই হবে। তাঁকে বিশ্বাস ছাড়া প্রাণে কখনো শান্তি আসতে
 পারে না। বিশ্বাসীই যথার্থ সুখী। কিন্তু ভগবৎবিশ্বাস কি গানের জোরে
 আসে? ভালবাসা আর বিশ্বাস, দুটি জিনিষ আপন
 থেকেই আসে, যদি মনটাকে নির্মল রাখবার চেষ্টা
 কর। জোর ক'রে বিশ্বাস আনা যায় না, কিন্তু
 জোর ক'রে চিত্তকে নির্মল করা যায়। সুতরাং অনুক্ষণ মনকে পাপ
 থেকে, কদর্যতা থেকে, লালসা থেকে পঙ্কিলতা থেকে প্রাণপণে দূর
 রাখ। এর ফলে-সময় মত বিশ্বাসের জোয়ার আপনি আসবে।

(১৫৮)

ঈশ্বরবিশ্বাস আর আত্মবিশ্বাস এই দুইটিকে জান্বে যমজ ভাতা।
তুমি তাঁর, তিনি তোমার। স্মরণে আত্মবিশ্বাস বাড়লে ঈশ্বরবিশ্বাস
বড়বে, ঈশ্বরবিশ্বাস বাড়লে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তুমিই তিনি, তিনিই
তুমি, স্মরণে তাঁতে বিশ্বাস করা আর নিজেকে বিশ্বাস করা একই কথা।

(১৫৯)

বিশ্বাসীর সঙ্গ ক'রো, তাতে বিশ্বাস বাড়বে। স্বার্থ
বিশ্বাসীকে দর্শন কল্লেও অন্তরের সকল কু-বৃত্তি কু-তর্ক
পাশন করে। বিশ্বাসীর নিষ্কলুষ চিত্ত সকলের মনে নিষ্কলুষ অনুরাগ
দেয়। বিশ্বাসীর স্নেহসিক্ত মন সমগ্র বিশ্বকে দিয়ে মঙ্গলকর্ষ করিয়ে
নেয়। বিশ্বাসীর সাহচর্যে হৃদয়ের কঠোরতা কমে, স্বার্থপরতা কমে,
নিষ্ঠুরতা কমে, পরহিতবুদ্ধি জাগে, সর্বজীবে ঈশ্বরবুদ্ধি ক'রে জনসেবা
বন্ধে কুচি আসে, নিরহঙ্কার নিরভিমান নির্যৎসর নির্যল জীবন যাপনের
দিক লোভ জন্মে। স্মরণে বিশ্বাসীর সঙ্গকেই প্রকৃত তীর্থবাস ব'লে
জান ক'রো।

(১৬০)

বিশ্বাস কখনও প্রত্যক্ষের বিরোধী হ'তে পারে না।
বিশ্বাস প্রত্যক্ষকে দৃঢ় করে, প্রত্যক্ষ বিশ্বাসকে দৃঢ় করে।
প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, বিশ্বাসের ক্ষেত্র অসীম। সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষের
উপরে দাঁড়িয়ে অসীম বিশ্বাস নিজেকে বিস্তারিত করে। তোমার
জীবনের প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষকে হিসাব কর, আর বিচার কর যে, এর
চিত্ত দিয়ে ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছা কি ভাবে নিজেকে পূর্ণ করেছে।

এই অনুসন্ধানের পথেই তোমার বিশ্বাস ত্রিকালকে ত্রিলোককে নিজের বৃক্ষের ভিতর টেনে আনবে।

(১৬১)

অবিশ্বাসীর শান্তি কোথায় ? দুইটা অবিশ্বাস মানব-জীবনের পরম দুঃখের মূল। ভগবানে অবিশ্বাস আর জীলোকে অবিশ্বাস। জীলোকের চরিত্রে অবিশ্বাস ক'রে জগতে যত লোক আত্মহত্যা করেছে, এত বোধ হয় আর কোনও কারণে করেনি। ভগবানের উপরে অবিশ্বাস ক'রে যত লোক জীবনে অসফল হ'য়েছে, এত বোধ হয় আর কোনও কারণে হয়নি। অবিশ্বাসকে দূরে ক'রে দাও, বিশ্বাস আসবার পথ প্রশস্ত হবে। যেমন, অপ্রেমকে দূরে ক'রে দিলে চিত্তে প্রেম-সঞ্চারের পথ খুলে যায়।

(১৬২)

সবাই বলছে 'ঈশ্বর নাই',—কিন্তু তাতে তোমার ক্ষতি কি ? তারা যা বলবার বলুক, কিন্তু তুমি জানো, তিনি আছেন। সত্যি সত্যি তিনি নাও যদি থাকেন, তবু জানো তিনি আছেন। তিনি আছেন জেনে তুমি নির্ভয় হও, নিশ্চিত হও। সবাই বলে—'ঈশ্বর মঙ্গলময় নন',—তা সবাইকে বলতে দাও। কিন্তু তুমি জানো, তিনি নিশ্চিতই মঙ্গলময়, এবং একথা জেনে বৃক্ষের বল বাড়াও, জীবন-ব্রত আত্মদান কর্কার সাহস বাড়াও, উৎসাহ বাড়াও, ধৈর্য বাড়াও, শেঁচা বাড়াও। সবাই বলে, 'তার কখনো দেখা পাওয়া যায় না',—সবাইকে তা' বলতে দাও। কিন্তু তুমি জানো, তাকে দেখতে পাওয়া যায়, তাঁর

বাণী শুনতে পাওয়া যায়, তাঁকে স্পর্শ করা যায়, তাঁকে ভালবাসা যায়, তাঁর ভালবাসা অনুভব করা যায়,—স্রীলোকের ভালবাসার চেয়ে সে ভালবাসা অধিকতর, মধুরতর, গভীরতর। একথা জে'নে তুমি নিজের হৃৎ হৃৎ হও, নিজের লক্ষ্যে একাগ্র হও।

(১৬৩)

জগতের হিতের দিকেও যদি তাকাও, তবু তোমাকে ঈশ্বর-বিশ্বাসের জয়-গানই কতে হবে। ঈশ্বর-বিশ্বাস-হীনতা স্বার্থপরতার সৃষ্টি করে, নিজের উদর, নিজের স্বার্থ, নিজের দাবী, নিজের অধিকার, নিজের প্রতিষ্ঠা, নিজের দুঃখবিদূরণকে উপলক্ষ্য ক'রে বহু রূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে সজ্বপত্তন করায়। আর, স্বার্থ ঈশ্বর-বিশ্বাস নিজের স্বার্থকে ছোট ক'রে পরের স্বার্থকে বড় করে, নিজের সুখের স্টোর চেয়ে পরের সুখের চেষ্টাকে প্রবলতর করে, নিজের স্বার্থকে কেন্দ্র ক'রে সজ্বকে গঠন না করিয়ে পরের স্বার্থকে কেন্দ্র ক'রে সজ্ব গঠন করায়। জগৎ-কল্যাণের গোড়াড় কথা ঈশ্বর-বিশ্বাস।

(১৬৪)

দরিদ্রের মধ্যে যখন আতিথেয়তা দেখ'বি তখন জান'বি, তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী; ধনীর মধ্যে যখন দেখ'বি, তখন জান'বি, তিনি মহানুভব। অতিথি-সেবার আন্তরিকতা দিয়ে মানুষের কল্যাণের ওজন করা সহজ হয়। নগণ্য মানুষকেও যারা দেবতাজ্ঞানে দেখা করেন, তাঁরাই প্রকৃত আতিথেয় ব্যক্তি।

(১৬৫)

পরিশ্রমকে ভয় পেয়ো না। পরিশ্রম কর, আর

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৬৪

মনে মনে ধ্যান চালাও যে, এই পরিশ্রম তোমার
ভবিষ্যৎ তপস্যার সুযোগ সৃষ্টি করবে। একদিন যে গভীর
তপস্যায় তোমাকে ডুবে যেতে হবে, তারই আনুকূল্য হিসাবে প্রত্যেকটা
শ্রম করা উচিত। ফলে, শ্রম বিফলে গেলেও মনের উপরে তপস্যা
করবার একটা পুণ্য আকাজক্ষা চিরস্থায়ী রূপে থেকে যায়। এটাই
জীবনের সকল পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

(১৬৬)

কাল ব'সেছিলে মাটির প্রতিমা পূজা কতে, ফলে
এসে গেল জীবন্ত প্রতিমা। আজ আবার জীবন্ত
প্রতিমা পূজা কতে এসেছ, এর ফলে যদি এসে যান
নিরাকার নির্বিকার অসীম অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ আনন্দপ্রতিমা, তবে
তোমার পূজা সার্থক। অসংখ্য লোকে সমামেই আটক প'ড়ে থাকে,
আর এগিয়ে যেতে পারে না, তাই প্রতীকোপাসনার এত নিন্দা।

(১৬৭)

ডুবিয়ে দাও নিজের সকল সত্তাকে ভগবানের
অমৃতমধুর অখণ্ড-নামের ভিতরে। নিজের নিজস্ববোধ
ভুলে যাও। নামই সত্য, নামই অমৃত, নামই পূর্ণ,
এই জানো। আর এই অখণ্ডসত্যরূপ নামের ভিতরে নিজের
নিমজ্জিত ক'রে দাও।

(১৬৮)

সমাজের দুর্গতি দূর করিবার জন্ত আত্মাহুতি দিবার

দিন আসিতেছে। সেই সময়ে তোমাকে, আমাকে এবং
 প্রত্যেক সত্যব্রতীকে নিজ সর্বস্ব দিয়া আদর্শের পূজা
 করিতে হইবে। আশীর্বাদ করি, তপস্তার দ্বারা তাহার
 যোগ্য হও। সমগ্র জীবনের উৎসর্গ দিয়া দেশের জড় প্রাণে তারুণ্যের
 তরঙ্গ সৃষ্টি করিবার জন্তই তোমার জন্ম।

(১৬৯)

শত বাধা শত বিঘ্ন করুক গর্জন,
 সিংহ ব্যাঘ্র করুক না তীব্র আক্রমণ,
 তথাপি নির্ভীক প্রাণে
 আপন লক্ষ্যের পানে
 উদ্ধার মত্তন বেগে করহ গমন,
 ভয়ে ভুলিও না চির-সাধনার ধন।

লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর শত অপমান,
 নির্ঘাতন অত্যাচার পর্বত-প্রমাণ,
 সব দলি' পদতলে
 আত্মবিখাসের বলে
 আপন অভীষ্ট পথে হও আগুয়ান,
 —তিমির-নিবিড় নিশা হোক অবসান।

সম্মুখে চাহিয়া দেখ, তব ভবিষ্যৎ
 কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল, কেমন বৃহৎ,

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৬৬

ধ্যানমগ্ন বিধাতার

অপরূপ সৃষ্টি কার

রচিছে বৈচিত্র্যময় সুরতি মহৎ !

অগ্রনর হও পুত্র, এ তোমারি পথ ।

(১৭০)

যে দেশে মৃতবৎসা নিবারণের জন্ত, প্রমেহ-উপদংশ রোগ সারাইবার জন্ত, পুত্রসন্তান লাভের জন্ত, পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্ত, মোকদ্দমার জিতিবার জন্ত, লটারীর টাকা পাইবার জন্ত এবং প্রণয়িনী বশ করিবার জন্ত লোকে মত্তগ্রহণ করিয়া থাকে, সেই দেশে গুরুর পদবী লাভ করা কি বিড়ম্বনাজনক ! এই দেশে কাজ করিতে হইলে তোমাদিগকে একদিকে যেমন এসব ভণ্ড গুরুর শক্তির বিরুদ্ধে তপোলব্ধ ব্রহ্মবীর্ষ পরিচালনা করিতে হইবে, তেমনি আবার যার তার কাছে মাথা নোয়াইবার দাসস্থলভ হীনতা হইতে এদেশের নরনারীকে রক্ষা করিবার জন্ত বেদান্তের রুদ্রগন্তীর বজ্রগর্জনে বসুন্ধরা কাঁপাইতে হইবে।

(৩৭১)

সংসারটা কেবলই সং নয়, এর মধ্যে সারও আছে, এই বিশ্বাসটা আগে কর। শুধু ফক্কিকারী নয়, কেবলই কপট ধাঁধা নয়, এর ভিতরে মাল আছে, এই কথাটা আগে মানো। তারপরে সেই মালের, সেই সারের খোঁজ কর। পাথর-কাঁকরের মধ্যেই মাথব হীরা-জহরতের অনুসন্ধান করে, ফাঁকা আস্‌মানের মধ্যে নয়।

(১৭২)

শুধু সং নিয়ে ম'জে থেকে না, সারটুকুর জন্ত

কার্তিক, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

৬৬৭

উদ্গ্রীব হও। দুধ খায় লোকে কি তার জলটুকুর জন্ত,
না, যে সারটুকু শরীরে গিয়ে তাকে পোষণ কর্বে, সেই সারটুকুর জন্ত ?
তোমরাও সংসারী ক'রো, সং টুকুর জন্ত নয়, পরন্তু সার-টুকুরই জন্ত।
অবিরাম অব্বেষণ কর, সার কোথায়, সার কতটুকু। এই পুত্র, এই কন্যা,
এই পতি, এই পরিজন, এই আহার, এই বিহার, এই ভ্রমণ, এই শয়ন,
এই রন্ধন, এই-পরিবেশন,—এ সকলের মধ্যে সার কি, তার খোঁজ
কর। খোঁজ কত্তে কত্তে ক্লান্ত হ'য়ে যাও, তবু খোঁজ ছেড় না। এই ত
ছেলেকে হেঁতে দিচ্ছ, মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছ, খোঁজ কর, এর ভিতর দিয়ে
হায়ী কাজ কি করা হচ্ছে। এই ত পরিজনের সেবা কচ্ছ, স্বামীর
সম্ভাষণ-সাধন কচ্ছ, রান্না কচ্ছ, আহার কচ্ছ, ভ্রমণ কচ্ছ, শয়ন কচ্ছ,
খুচ্ছ বা রাত্রি জাগছ, অগ্নির সঙ্গে বাস কচ্ছ বা একাকী থাকছ, শেষ
লগ্নে নিতলাভ তোমার কি হচ্ছে? অবিরাম এই খেয়াল রাখ, এই
হিসাব খোঁজ।

(১৭৩)

কতবার হতাশ হ'য়ে পড়বে, কতবার বুদ্ধিবিভ্রম
হ'বে, কতবার সার-অসারের পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষম হ'য়ে
পড়বে, তবু অধ্যবসায় ছাড়বে না। কেবল খোঁজ, এই যে পুত্রকে বুকে
ধরে তৃপ্তি পাও, তার মধ্যে নিত্য জিনিষ কতখানি, সেই তৃপ্তি
নিত্যহারী কি ক'রে হ'তে পারে? কেবল খোঁজ, এই যে স্বামীকে
নিরে সোহাগ কচ্ছ, তার ভিতরে নিত্য জিনিষ কতখানি, সেই সোহাগকে
নিত্যহারী করবার উপায়ই বা কি? অনিত্যকে নিত্য করা যায়,
অসারীকে চিরস্থায়ী করা যায়, যিনি নিত্য, যিনি শাশ্বত, তাঁকে যদি

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৬৮

অনিত্যের ভিতরেও দর্শন করা যায়। যে ভাবে পার মা, প্রাণপণে
চেষ্টায় অনিত্যকে নিত্য কর।

(১৭৪)

ভগবানই একমাত্র নিত্যবস্তু। ভগবানই সত্যিকারের
‘তুমি’, সত্যিকারের ‘আমি’ সত্যিকারের ‘সে’। ‘আমি’,
‘তুমি’ ‘সে’ এদের কোনও পৃথক তাত্ত্বিক সত্যতা নেই, এ সবই সত্যরূপ
সারাংশের ভগবানের বিচিত্র প্রকাশ। নিত্যসত্য ভগবানকে সকলের
ভিতরে দর্শন কর। পুত্রকে কোলে নাও, দোষ কি? পুত্রের মধ্যে
ভগবান্ যে আছেন, দেখে নাও। স্বামীকে সোহাগ কত্তে দোষ কি?
স্বামীর ভিতরে যে ভগবান্ আছেন, তা’ দেখে নাও। সকল কাজে
সকল ব্যাপারে যখন যার যেটুকু সংশ্রবে আস্ছ, তার সম্পর্কে যোগ্য
কর্তব্য পালন কর, কিন্তু তার ভিতরে যে ভগবান্ আছেন, তা দেখে
নাও। যখন একাকিনী থাক্বে, তখনও তোমার নিজের ভিতরে যে
ভগবান্ আছেন, তা’ দেখে নাও। জেনে নাও, ভগবান্ই একমাত্র
নিত্যবস্তু এবং একমাত্র সত্য। ‘আমি’ ‘আমি’ ব’লে যখন পড়পীর
সঙ্গে কলহ কর, তখনও জানো যে ‘আমি’ ব’লে কেউ নেই, আছেন
একমাত্র ভগবান্। ‘তুমি’ ‘তুমি’ ব’লে যখন প্রিয়জনের সঙ্গে প্রেম
কর, তখনও জানো যে, ‘তুমি’ ব’লে কেউ নেই, আছেন একমাত্র
ভগবান্।

(১৭৫)

প্রকৃত অনুতাপ আসা চাই। মদ খেয়ে মাতাল হ’য়ে বুদ্ধিভ্রংশের
সময়ে কি অত্যাচার হঠাৎ ক’রে ফেলেছ, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে
চাই না। কিন্তু আর যে মদ খাবে না, এই শুভবুদ্ধি আসা চাই।

কাহিনী, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

৬৬৯

(১৭৬)

ভগবানের চেয়ে প্রিয়তর কিছু নেই, থাকতে পারে না, কখনো ছিল না, কখনো হবে না। কিন্তু অন্ধ ব'লেই তোমরা ভগবানের পাওয়া ভালবাসা যা' তা' জায়গায় বিলিয়ে দিচ্ছ। আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকো আর প্রার্থনা কর যে, তিনিই যে তোমাদের প্রত্যেকের প্রিয়তম, তাঁর চেয়ে বেশী ভালবাসার যে আর কেউ নেই বা কিছু নেই, সেই কথাটা যেন তিনি তোমাদের বুঝিয়ে দেন।

(১৭৭)

নামজপই বল, আর পূজার্চনাই বল, ভগবানের চেয়ে প্রিয় যে আর কেউ নেই, এই কথাটা জানবার জন্তেই সব।

(১৭৮)

সেই দিনটাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন, যেদিন তোমাদের উপলব্ধ হবে যে, জগতের সকল আপন জনের চেয়েও ঐ ভগবানই বেশী আপন, জগতের সকল অন্তরঙ্গের চেয়েও ভগবানই অন্তরঙ্গতম। সেই দিনটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন, যেদিন ভগবানের চেয়ে প্রিয়তর ব'লে আর কেউ অনুভূত হবে না, ভগবৎ-প্রাপ্তির সুখই একমাত্র সত্যসুখ ব'লে প্রত্যক্ষ অনুভূত হবে এবং জগতের অগ্র সকল প্রকারের যাব তার তুলনায় তুচ্ছ, আলুনি ও নিতান্ত নিকৃষ্ট ব'লে জ্ঞান হবে।

(১৭৯)

অনুকণ নাম ক'রে যাও। কোদালের তালে তালে,

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৭০

বোঝা নিয়ে চলবার সময় পায়ের তালে তালে, বুড়ি থেকে মাটি ফেলবার শব্দের সাথে, নামই কর। এ'কেই বলে অজপা-সাধন। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসে জপলেই অজপা-সাধন হয় তা নয়, অনুক্ষণ অবিরাম যে ভাবেই নাম জপ, তাই ছেনো অজপা-সাধন। নাম জপতে জপতেই যাতে ম'রে যেতে পার, তার জুজীবৎকালের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত নামের সেবায় কাটাবার চেষ্টা কর।

(১৮০)

নিদ্রাজয়ের উপায় জানিস্? বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মতন বিনিদ্র পুরুষদের কথা ভাব। মোহজয়ের উপায় জানিস্? মোহজয়ী কামজয়ী নিঃস্পৃহ নির্লিপ্ত সিন্ধুতপা পুরুষদের চরিত্র চিত্রা করা।

(১৮১)

ব্রত গ্রহণ ক'রে তার পরে ব্রতভঙ্গ করা অতি ভয়ঙ্কর কাজ। কারণ, একটি ক্ষেত্রে ব্রতভঙ্গ হ'লে পরে আরও দশটি স্থলে ব্রতভঙ্গ অতি সহজ হ'য়ে পড়ে। এজন্য ব্রত যদি নাও, তবে এমন কঠোর-সঙ্কল্প হ'য়ে নেবে, যেন প্রাণত্যাগ কত্তে হলেও ব্রতত্যাগ না কত্তে চাও। জীবনে যাঁরা কখনও ব্রতত্যাগ করেন না, সব জায়গায় যাঁরা কোমল কিন্তু ব্রতনিষ্ঠায় যাঁরা কঠোরভাবে একনিষ্ঠ, তাঁদের সঙ্গ করবে, তাঁদের কথা ভাববে। সংসর্গের ফলেই মানুষ দৃঢ় হয় আর শিথিল হয়। যাঁদের উপদেশ তোমার ব্রতচ্যুতির প্ররোচক, তাঁরা সংলোক হ'লেও তাঁদের সংসর্গ ত্যাগ করো, এমনকি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতার কারণ থাকলেও এই বিষয়ে অনমনীয় হবে।

বার্ষিক ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

৬৭১

যাকে হয়ত স্পষ্ট কথায় তোমাকে ব্রতত্যাগ কত্তে উপদেশ দিতে না পারেন, কিন্তু যে হিতোপদেশ তাঁরা দেন বা যে জীবনাদর্শ তাঁরা প্রদর্শন করেন, তারই পরোক্ষ ফলে তোমার ভিতরে যদি ব্রতনিষ্ঠায় হানি দানবার সম্ভাবনা দেখ, তবে সংলোকের সংসর্গও তোমার পক্ষে হিতকর নয়, একথা জেনো। যেমন মনে কর, সতীত্বই যার ব্রত, এমন একটি ঘরের কাছে কোনো ভাললোকও যদি অসতী রমণীদের সমৃদ্ধি ও প্রতাপের প্রশংসায় রত হন, তবে তার পরোক্ষ ফল নিজ ব্রতের প্রতি নিরাকার কটিকে কখনও হয়ত দুর্বল কত্তে পারে জে'নে, সতী রমণীর পক্ষ সংলোক হ'লেও এমন লোকের সংসর্গ ত্যাগ করা উচিত। সদশসেবাই যার ব্রত, এমন একটি লোকের কাছে কোনো ভাললোকও যদি বিদেশীর পদলেহনকারী স্বদেশদ্রোহীদের ঐহিক উন্নতি ও প্রতিপত্তির প্রশংসায় রত হন, তবে তার পরোক্ষ ফলে নিজ স্বদেশিকতার প্রতি শ্রদ্ধা স্থলিত হ'তে পারে জেনে, এ সংসর্গ বর্জন করাই সঙ্গত। কিন্তু ব্রতকার সচেতন থাকবে ব'লেই যে লোকের প্রতি বিবেচনা করে হবে, তা নয়। তুমি স্বদেশ-সেবা করবে ব'লেই যে বিদেশীকে বিবেচনা করবে, তা নয়। তুমি স্বধর্ম লেগে থাকবে ব'লেই যে পরধর্মীর অনিষ্ট সাধনে চেষ্টা করবে, তা নয়। তুমি নিজ পরিবারকে করবে ব'লেই যে দুশ্চরিত্র লোকদের প্রতি হিংসা পোষণ করবে, তা নয়। অন্তরকে করবে বিবেচনা-বর্জিত আর ব্রতপালনের জন্য প্রাণ দিত সর্বদা থাকবে প্রস্তুত। এ দুইটি গুণ তোমার মধ্যে থাকা চাই-ই গাই।

(১৮২)

ব্রত গ্রহণের কালে তোমাকে দেখতে হবে, কেমন

ব্রত নিছ। নরহত্যার ব্রত, পরনারী হরণের ব্রত, লোকের ঘরে আগুন লাগাবার ব্রত, মিথ্যা অপবাদ প্রচারের ব্রত, এসব তুমি গ্রহণ করতে পার না। বর্বর যুগের লোকে ভাবত যে, জোর করে পরের মেয়ে ধরে আনলে পুণ্য হয়। কিন্তু সে যুগ এখন নেই। জোর করে বা প্রলোভন দেখিয়ে কাউকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করলে এ যুগে আর কোনো পুণ্যই হবে না। কি ব্রত গ্রহণ কর, সেই ব্রতের সঙ্গে তোমার নিজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল কতটা জড়িত, এ ব্রত গ্রহণে গৌণফল সমাজের ও মানবজাতির উপরে শুভময় হচ্ছে কিনা, তা বিচার করে দেখো। পুণ্যব্রতই হও, পাপব্রত হ'য়ো না।

(১৮৩)

কাউকে কোন একটা নির্দিষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী করলেই যে সে সত্যি সত্যি ধার্ম্মিক হবে, তার ত' স্থিরতা নেই। গায়ত্রী মন্ত্র দীক্ষিত হ'য়ে অহিন্দুও হিন্দু হ'তে পারে, কিন্তু ধার্ম্মিক যে সে হবেই, তার স্থিরতা কি? জর্ডন নদীর জল মাথায় দিয়ে হিদেরও খ্রীষ্টান হ'তে পারে, কিন্তু ধার্ম্মিক যে সে হবেই, তার স্থিরতা কি? কলমা পড়লে কাফেরও মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হ'তে পারে, ধার্ম্মিক যে সে হবেই, তার স্থিরতা কি? ধার্ম্মিক হওয়াই বড় কথা, ধর্ম্ম গ্রহণ বড় কথা নয়। ধার্ম্মিক যে হবে না, সে হিন্দু হোক, খ্রীষ্টান হোক, মুসলমান হোক, জগতের অহিত করবেই, জগতের অশান্তির বর্দ্ধন করবেই, পরকে দুঃখদান থেকে তাকে বিরত রাখা যাবে না। হিন্দু হোক, খ্রীষ্টান হোক, মুসলমান হোক, অধার্ম্মিক যে থাকবে, সে পরপীড়ন করবেই, পরস্বাপহরণ করবেই, পরের প্রাণে ব্যথা দেবেই,

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

৬৭৩

পরের আধা অধিকারে হস্তক্ষেপ কর্কেই। অতএব কাউকে হিন্দু বা মুসলমান করার ভিতরে জগতের শান্তি-প্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনা নেই, লোককে ধার্মিক করার উপরেই সব নির্ভর করে। ধার্মিক হতে হলে হিন্দুই হ'তে হবে, তাও নয়, খৃষ্টানই হ'তে হবে, তাও নয়, কিম্বা মুসলমানই হ'তে হবে, তাও নয়। হিন্দু, খ্রীষ্টান বা মুসলমান প্রভৃতি কোনও ধর্মাবলম্বী হ'য়ে মানুষ ধার্মিক হ'তে পারে, অথবা এই সকল ধর্মের বাইরে অথ কোনও ধর্মাবলম্বী হ'য়েও ধার্মিক হ'তে পারে। যে ধার্মিক যদি প্রকৃতই হয়, তবেই তার দ্বারা জগতের শান্তি বর্ধিত হ'তে পারে, নইলে নয়।

(১৮৪)

ধার্মিকের লক্ষণ কি? লক্ষণ অবশ্য অনেকই হ'তে পারে, কিন্তু ধার্মিকের প্রধান লক্ষণ তার সকলের প্রতি প্রতিভাব আর সকলের জন্ত সেবাবুদ্ধি। কাউকে আমি হিংসা করব না, কারো প্রতি বিবেচনা রাখব না, এই তত্ত্বে যে স্থিতি, আর কোন্ দিক দিয়ে কার কি উপকার কতে পারি, এই যে সন্ধান, তা যিনি রাখেন, তিনিই ধার্মিক।

(১৮৫)

এস আমরা দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করবার সঙ্কল্প নিয়ে, ক্রোধের রোগ-নিবারণে আমরা বদ্ধ-পরিকর হই, গৃহহীনকে গৃহ, অজ্ঞানকে জ্ঞান, দুর্বলকে বলমত্তা, কাপুরুষকে সাহস, স্বার্থপরকে নিঃস্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরকে কলমসতা, অন্ধকে দৃষ্টি, অনাথকে আশ্রয় দান কতে আমরা অগ্রসর হই

এস আমরা হিন্দু বা মুসলমানের ভেদবুদ্ধি সম্পূর্ণ বিমূর্ত হ'য়ে, ভগবান্ হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন, সেই ভগবানের প্রত্যেক সন্তানের দরদের দরদী হই, মরমের মরমী হই এবং প্রয়োজন হ'লে নিজের সকল প্রিয় বস্তু সমর্পণ ক'রেও তাঁদের দুঃখ দূর করি। ম্যালেরিয়া আর কলেরা যেমন হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য বিচার করে না, যাকে পায়, তাকেই ধরে এবং শমন-সদনে প্রেরণ করে আমাদের সেবা, আমাদের গুণগ্রাণী, আমাদের ঔষধ যেন তেমনই হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অন্বেষণ কতে অক্ষম হয় এবং যাকে পায় তারই কাজে লাগতে চেষ্টা করে। সূর্যের রশ্মি ও চন্দ্ৰের আলো কোন হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য বিচার করে না, সকলের আঙ্গিনায় গিয়ে পড়ে এবং সকলকেই লাভবান্ করবার চেষ্টা করে, ঠিক তেমনি আমাদের সেবাসিদ্ধ বাহুবুগল ও সেবাপরায়ণ মন যেন সম্প্রদায়বুদ্ধি বিমূর্ত হ'য়ে সকলের কল্যাণের জ্ঞান সমভাবে প্রসারিত হয়। নদীর জল আর মল-বায়ু যেমন হিন্দু-মুসলমানের ভেদ খোঁজে না, আমাদের সেবাবুদ্ধি ও সেবাপরায়ণতা যেন তেমন কোনও ভেদ ও বিচ্ছেদের ধার না ধারে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শুভ বিজয়ার নমস্কার :—আমরা আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক, পাঠিকা এবং পৃষ্ঠপোষকবর্গকে শুভ বিজয়ার প্রীতিনমস্কার জানাইতেছি। আমাদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, প্রদেশ আর লইয়া যত কলহ ও মনান্তর আছে, জগন্মাতার কৃপায় তাহা বিদূরিত হউক। আমরা যে ভাই ভাই, আমরা যে এক, আমরা যে এক

বার্তিক, ১৩৬৭]

জননীই সন্তান, এই বোধ আমাদের অন্তরে জাগ্রত হউক। হিংসা, ঘৃণা ও সর্ববিধ আবিলতা আমাদের সকলের মন হইতে চিরতরে দূর হউক।

সরকারের ক্ষমতা :—১০ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী কোর্টায়ুমে এক জনসভায় বলেন,—সরকারের হাতে যদি অধিক ক্ষমতা আসে, তাহা হইলে বিভিন্ন দলের মধ্যে, এমন কি, ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের সদস্যদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। সুতরাং স্বতন্ত্র দল এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, সরকারের ক্ষমতা সর্বনিম্নে নামাইয়া আনিতে হইবে। সরকার সর্বাপেক্ষা কম ক্ষমতা গ্রহণ করিবেন এবং অবশিষ্ট কাজের ভার জনসাধারণের উপর হস্ত থাকিবে।

কথাগুলি আমাদের নিকটে মূল্যবান বলিয়া মনে হইল। চোরা-কারবারীদিগকে নিকটতম আলোকসুস্তে বুলাইয়া ফাঁসী দিবার প্রতিজ্ঞা বিহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরবর্তী আচরণ সম্পর্কে জনমত খুব দৃঢ়কূল নহে। শ্রীরাজাগোপালাচারী যে কথা কয়টি বলিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি।

উড়িষ্যার বত্মা :—একটীর পর একটা করিয়া দুঃসংবাদ আমাদের গোপনে চঞ্চল করিতেছে। উড়িষ্যার যে ভয়াবহ বত্মার সংবাদ খবরের কাগজে পড়িতেছি এবং আমাদের সংবাদদাতাদের পত্রে জানিতেছি, তাহাতে মানুষ উদ্ভিগ্ন না হইয়া পারে না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, বত্মার ভাণ্ড ভ্রুত প্রশমিত হউক।

বত্মা কি ভারতে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে? ইহার কি কোনও প্রতিকার নাই। আসামেও উত্তরবঙ্গে ত প্রায় প্রতিবৎসর বত্মা হইয়া হাজার হাজার নরনারীর সর্বনাশ হইতেছে। এবার হইতেছে উড়িষ্যার নদীগুলিতে। বত্মার কারণ কি আকাশে না নদীগুলির গর্ভে, এই কথা কেহ চিন্তা করিতেছেন কি না জানি না। আমরা প্রায়শই প্রায়শই চীৎকার করিতেছি,—“নদীগুলির বক্ষ হইতে জমা ধূলা-বালি-

কাঁকর দূর কর, জল চলিয়া যাইবার সহজ পথ পাইবে।” কে তাহা শুনিতেছে ?

ডাকঘর ও প্রাথমিক শিক্ষক :—১৯শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ২৪-পরগণার কুল্লী ও মথুরাপুর থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ একটি ডাকঘর ঘেরাও করেন। ডাকঘরে বেশ কিছু মণি অর্ডার পড়িয়া ছিল কিন্তু বিলি না হওয়াতে প্রাথমিক শিক্ষকগণের কষ্ট হইতেছিল। বেতন না পাইলে পৃজার মাসটী বেচারীদের চলিবে কি করিয়া ? সত্তর বাহাতে মণিঅর্ডার বিলি হয়, তাহার জন্ত আন্দোলন করিতে গিয়া নাকি ইঁহারা গ্রেফতার হইয়াছেন। শুনা যায়, অনিশ্চিত বেতন দানের ফলে একজন শিক্ষক অনাহারে এবং আর একজন আত্মহত্যা করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার দায় এড়াইয়াছেন।

এ সকল সংবাদ সত্য হইলে বড়ই ব্যথার কথা। পৃথিবীর নরক দেশেই শিক্ষকদের স্মৃতে রাখিবার চেষ্টা প্রবল। কারণ, তাঁহাদের হাতেই জাতির ভবিষ্যৎ প্রগতি নির্ভরশীল।

সংস্কৃতকে অবশ্য-পাঠ্য করা উচিত :—পুণার ২৫শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন-উৎসবে সংস্কৃতের জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ পি, ভি, কাণে শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা যেন ছাত্রজীবনের কোনও এক জন্মে সংস্কৃতকে ভারতীয় মাত্রেই জন্ত অবশ্য-পাঠ্য করেন।

ডঃ কানে বলেন যে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যেখানে সংস্কৃতের উচ্চস্থান পাওয়া উচিত, সেখানে তাহার প্রতি বিমাতৃমূলভ ব্যবহার করা হইতেছে। ভারতের দাসত্বের মধ্যেও এই সংস্কৃত সাহিত্য এবং ধর্মই জাতীয় গর্ব ও ঐক্যের ধ্বজা বহন করিয়াছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

মাদ্রাজী শাড়ী ও বাঙ্গালী :—কলিকাতার একখানা প্রভাবশালী সংবাদপত্রের মাদ্রাজের প্রতিনিধি লিখিয়াছেন,—“মাদ্রাজে বীরা আগবের

কার্তিক, ১৩৬৭]

৬৭৭

না, তাঁরাও মাদ্রাজকে পূজায় মনে করতে বাধ্য। প্রতি বছর পূজায় বাঙালীদের ঘরে ঘরে মাদ্রাজী শাড়ী, না হয় মেকী সিল্কের শাড়ী ও ছক অবশ্যই চাই। মাদ্রাজের তাঁতবস্ত্র না গেলে কলকাতার পূজার রাজ্যের জোলুস কমে যায়। মাদ্রাজী তাঁতবস্ত্রের রঙ যেমন উজ্জ্বল, তেমন রকমারী রঙের প্রচুর যোগানদার হিসাবে মাদ্রাজ বিখ্যাত। স্ত্রীবস্ত্রের ক্ষেত্রেও মাদ্রাজের কদর বাঙালীদের কাছে দিন দিন ক্রম-বর্ধমান। কোলকাতার বড়বাজারের মারোয়াড়ী সম্প্রদায় সারা বছর ধরে মাদ্রাজের পল্লীতে দাঁদন-প্রথায় যে তাঁত-বস্ত্র ক্রয় করে, সেই বস্ত্র পূজায় কোলকাতায় বহুগুণ বেশী দরে বিক্রী হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল দাঁদন-ব্যবসায়ে বাঙালীকে কর্মচারী হিসাবে দেখা গেলেও প্রকৃত ব্যবসায়িকরূপে দেখা যায় না। অথচ এই সমস্ত তাঁত-বস্ত্রের ক্রেতা শতকরা ৯৫ জনই বাঙালী।”

আগল কথা এই যে, বাঙ্গালীর বুঁকি নিবার সাহস কমিয়া গিয়াছে। বেখানে সহজে কার্যোদ্ধার বা জীবিকার্জন সম্ভব, তাহারা সেখানেই ভিড় করিবে। বিপদ, আপদ, বাঁকি, বাধা, বিঘ্ন ও আশঙ্কা-আতঙ্কের মধ্যে থাকিয়াও জীবনে উন্নতি বিধানের দুর্জয় জেদ ও সাহস আজ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

আলোয়ার আলো :—কলিকাতার সংবাদে প্রকাশ, পূজার প্রাকালে পুলিশের তৎপরতায় চব্বিশটি অবিবাহিতা তরুণী ধৃত হইয়া নতিভাবকদের হস্তে অর্পিতা হইয়াছে। ইহারা কেহ সিনেমা-ষ্টার হইবার আশায়, কেহ অপর কোনও প্রলোভনে পড়িয়া চিরতরে সমাজের স্বাভাবিক হইতে চলিয়াছিল। ক্ষণিক মোহে অস্থস্থ মনোবৃত্তির যত্নহীন বর্তমানে ভারতের তরুণীরা প্রায় সকল প্রদেশেই পিতামাতার প্রেরণা হইতে পলায়ন করিয়া আলোয়ার আলোতে ভাত রাঁধিবার

আশা করিতেছে। দেশের এই নৈতিক দুর্গতির প্রতীকারের জন্য চতুর্দিক হইতে সকলের বন্ধপরিষদ হইয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। বোম্বে, মাদ্রাজ, পাটনা, দিল্লী প্রভৃতি সকল সহরেই কোনও না কোনও রাজ্যের তরুণীরা প্রায়ই পুলিশের হাতে আটক পড়িয়া গৃহে কিম্বা বাধ্য হইতেছে কিন্তু ইহা যে এক সর্বনাশকর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, তাহা আমাদের চিন্তা করা উচিত।

বিজ্ঞোচিত উপদেশ :—শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী মহাশয় কংগ্রেস হইতে আলাদা হইয়া গিয়া স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করিয়াছেন, ইহা সকলেই জানেন। সম্প্রতি তিনি ত্রিবাঙ্গম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায় বলেন যে, যতদিন তাহারা ছাত্র থাকিবে, ততদিন একান্ত ভাবে নিজেদের চরিত্রগঠন ও বিদ্যার্জনের কাজেই তাহাদের আয়-নিয়োগ করা উচিত। অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনই ছাত্রজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। রাজাজী আরও বলেন যে, ছাত্রদিগকে তিনি তাঁহার রাজনৈতিক দলের সদস্য হইতে দিবেন না।

রাজাজী ছাত্রসমাজকে রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজের দলের সভ্য হইতেও দেওয়া হইবে না বলিয়া সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। রাজাজী একটা নুতন দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, যাহা অত্যাশ্চর্য রাজনৈতিক দলের নেতারা অনুকরণ করিলে দেশের কল্যাণ হইবে। এতকাল নেতারা সরলমতি ছাত্রদের মাধ্যমে কাঁঠ ল ভাঙ্গিয়া খাইয়াছেন। ইহা বন্ধ হইলে দেশের ভবিষ্যতের আশা-ভরসার স্থল যুবকেরা নিজেদের জীবন গড়িয়া তোলার সুযোগ ও রুচি পাইবে।

অখণ্ডমতে শ্রদ্ধা :—সম্প্রতি নানাস্থানেই অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধার্চন

হইতেছে এবং সামাজিক অনুমোদনও মিলিতেছে। বিনা বিরোধে যে বিগ্রহ চলিতেছে, ইহাই সুখের বিষয়। অথগুণ্ডলেখর শ্রীশ্রীস্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেব কখনো বলেন নাই, “অথগু মতে শ্রাদ্ধ কর।” তিনি বলিয়াছিলেন,—“একদা সমবেত উপাসনা দ্বারাই বিবাহ, দ্বন্দ্বপ্রাশন, শ্রাদ্ধ আদি কার্য্য হইবে।” আজ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী আশা-আপনি ফলিতেছে মাত্র।

শ্রদ্ধেয় অথগু-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বতীন্দ্র মোহন সরকার মালদহ আসিয়া-ছিলেন রোগ-চিকিৎসার জন্ত। বিগত ২৫শে ভাদ্র রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে তিনি মহাপ্রাণ করিয়াছেন। তিনি অতিশয় ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন। বৃদ্ধ-সময়ে হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণবন্ধু কাব্যাতীর্থ সহ এগারজন শ্রমিকবন্ধু সাহস্রাশ্রয় গঙ্গাতীরে তাঁহার শেষ সংস্কার করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ অথগু-মতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মালদহের অথগু-ভ্রাতা-ভগিনীগণ ইহাতে সহযোগ করেন।

বিগত ২৪শে ভাদ্র আসামের নগুগাঁ জেলার লক্ষা নিবাসী শ্রীযুক্ত বারিকা মোহন দত্তের সহধর্ম্মিণী গুরুগতপ্রাণা ৬৭বাসিনী শ্রীমতী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অথগু-বিধিমাতে সুসম্পন্ন হয়। এই ভক্তিমতী মহিলার সদগতি কামনায় বহু অথগুর এবং ভদ্র-সুজনগণের সমাগম হইয়াছিল।

বেকার সমস্যা সমাধান :—জামশেদপুরের সংবাদে প্রকাশ, বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে বিহার-কল্যাণ-সমিতি টেলকোর প্রধান ফটকের সম্মুখস্থ ময়দানে এক জনসভার অনুষ্ঠান করেন এবং তাহাতে বিভিন্ন বক্তা, বিহারের বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্ত বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী সম্প্রদায়কে অবিলম্বে জামশেদপুর ত্যাগ করিয়া যাইতে বলেন। তাঁহারা নাকি বলেন যে, বিহারে বেকার-সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দিয়াছে, ইহার সমাধানের জন্ত অবিলম্বেই জামশেদপুরের সমুদয় শ্রমিক-কারখানাগুলিতে নিযুক্ত বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী শ্রমিক ও কর্ম্মিগণকে

এখনই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহারা যদি খেজার এই স্থানত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিতাড়নের জন্ত সমুচিত ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া নাকি ভয় প্রদর্শন করা হয়।

সংবাদ সত্য হইলে বলিতে হইবে, বেকার-সমস্তার সমাধানের খুঁজালাও দাওয়াই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ঔষধে বাঁহাদের আস্থা আছে, একদিন তাঁহারা নয়্যা দিল্লীর মন্ত্রী ও মহামন্ত্রীদিগকে নিজ নিজ জন্মভূমিতে চলিয়া গিয়া দিল্লীওয়ালাদের বেকার-সমস্তার সমাধান সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতে পারেন। তামিলরা অন্ধ্রদিগকে, গুজরাটেরা মারাঠিদিগকে, বাঙ্গালীরা মাড়োয়ারীদিগকে, উত্তরপ্রদেশ-বাসীরা সিন্ধিদিগকে ছুরি দেখাইয়া তাড়াইতে আরম্ভ করিলে মহারাজগাঙ্গীর রামরাজ্য দেখিতে না দেখিতে কায়েম হইয়া যাইবে।

বাঙ্গালী বনাম দক্ষিণ ভারতীয় :—বাঙ্গালীদের পরিবর্তনশীলতা এবং দক্ষিণ ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক দৃঢ়তার তুলনা দিয়া সম্প্রতি বোম্বে একজন লেখক কলিকাতার দৈনিকে লিখিয়াছেন,—

“ভারতের অত্রাণ রাজ্যে দক্ষিণ ভারতীয়দের সংখ্যা প্রচুর, বম্বে শহরেই পাঁচ লক্ষাধিক দক্ষিণ-ভারতীয়ের বাস। এদের অনেকেই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে কয়েকপুরুষ ধরে এবং কোন ক্ষেত্রেই তাঁরা স্থানীয় সংস্কৃতি, কোন-প্রকার আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেনি বা নিজস্ব সভ্য ভুলে বসেওয়ালা হয়নি। উপরন্তু, এরা সকলেই গুরুপুত্রি ১০০% দক্ষিণ-ভারতীয়ই আছে, সর্বক্ষেত্রে বহু বছর এখানে বাস করেও দক্ষিণ-ভারতীয়দিগের বসবাসের এলাকাগুলিকে এরা ছোটখাটো মাদ্রাজ বা কেরালা করে তুলেছে সর্ব প্রকারে; নিজস্ব মন্দির, দোকান-পাট, ক্লাব, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সমবায়-সমিতি, সাংস্কৃতিক সঙ্গ ইত্যাদি কত কি নিয়ে। বম্বের মটুঙ্গা, সায়ুন এলাকাকে এই জন্ত হাসির হলে

“নৃসিংপুরম্” আখ্যা দিতে শুনেছি অনেককে । যে যার নিজের মত আছে, নিজের ভাষা, আচার-ব্যবহার সংস্কৃতি নিয়ে । কলকাতায়ও এরকমই অবস্থা । তাদের কোনদিনও কেউ বলেনি যে, স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যেতে হবে । এরকমই হওয়া উচিত । প্রত্যক্ষক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, বাঙ্গালীরাই বহুক্ষেত্রে নিজের ভাষা পর্যন্ত ভুলে গেছে, আচার-ব্যবহার ত ছেড়েই দিলাম । বোম্বে ও উত্তর ভারতে বহুকাল বসবাস করছে এরকম বহু বাঙ্গালী দেখা যাবে, যাদের কোনই বাঙ্গালীত্ব নেই, অনেকে মাতৃভাষাও ভুলে গেছে, ঠিকমত বলতে বা পড়তে পারে না । অনেকক্ষেত্রে, পোষাক-আষাক, আচার-ব্যবহারেও বাঙ্গালী বলে ধরার কোন সাধ্য নেই । ঠিক এরকম আত্মবিলোপ কখনও দক্ষিণ-ভারতীয়, পাঞ্জাবী, পার্শী, মারাঠী, গুজরাটী, শিখ এদের মধ্যে হয় না ।”

আসামে শারদীয় অখণ্ডোৎসব :—আসামের অশান্ত অবস্থার দরুন সেই রাজ্যের অনেক স্থানেই শারদীয় অখণ্ডোৎসব তেমন ভাবে হইতে পারে নাই । কিন্তু আসামের প্রধান সহর, গৌহাটীতে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে । গৌহাটী-অখণ্ডমণ্ডলীর সুযোগ্য কন্বী ভ্রাতা শ্রীধনীরাম দাশের একথানা পত্র আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি । তাহাতেই ইহা প্রতীয়মান হইবে । যথা—

“পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি, সর্বপ্রথমে আমাদের গৌহাটী অখণ্ডমণ্ডলীর সমস্ত ভ্রাতা-ভগিনীদের বিজয়াদশমীর শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম গ্রহণ করিবেন । শ্রীচরণের আলীকর্মে আমাদের শারদীয় অখণ্ড উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল । গৌহাটী মণ্ডলীতে শারদীয় উৎসব এই প্রথম হইলেও এখানকার ভ্রাতাভগ্নীদের সাড়া পাওয়া গেল । উৎসবের নির্দ্বারিত অনুষ্ঠান-সুচীর বাহিরেও আমরা নবমী তিথিতে

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৮২

মধ্যাহ্নে ১১টা হইতে ১টা পর্যন্ত মাইকযোগে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়াছি এবং এই মহানবমীর সাক্ষ্য অনুষ্ঠানটী বিশেষ ভাবে চিত্ত-কর্ষক হইয়াছিল। বিকাল ৫টা হইতে ৬টা পর্যন্ত হরি-ও কীর্তনস্বরাজ ৮টা পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীতারারচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনাধীনে স্বরূপানন্দ-সংগীতানুষ্ঠান হয়। সর্বপ্রথমে সমবেতভাবে অখণ্ড-সঙ্গীতটী পরিবেশিত হয়। অতঃপর শিশু শ্রী সর্ব-কুমারী বন্দনা ঘোষ, রত্না চক্রবর্তী, বীণা চক্রবর্তী, রমা দাশগুপ্ত, শিপ্রা দে, মঞ্জুরী দাশগুপ্ত, রত্না দাশগুপ্ত ও হরিপ্রিয়া বর্মাণ প্রত্যেক এক একটা করিয়া স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলকে আনন্দ দান করে। অতঃপর শ্রীতারারচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ১০ খানা স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত সহযোগে আপনার প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড আদর্শের উৎপত্তি, প্রচার, এবং ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে একটা মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। তাহার ভাষণের সংক্ষিপ্ত সারকর্ম নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

“অখণ্ড আদর্শ হঠাৎ একদিন আকাশ হইতেও পড়ে নাই অথবা মাটি ফুঁড়িয়াও উঠে নাই। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের আবালা সাধনালব্ধ এক সনাতন সত্যের উপলব্ধিই অখণ্ড আদর্শের উৎস। একটু গোড়ার কথা বলি, শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রথম জীবনে তাঁহারই কণ্ঠে শুনিয়াছি “এস এস, সখা, এস এস আজি, হুগুর বনমালে, শিখী পাখে সাজি....”। আবার ইহাও শুনিয়াছি— “এস মা আঁধার বরণী।” তৎপর তাঁহার আরাধনার দেবী হইলেন— “জগতবন্দ্য চির-অনিন্দ্যা জয়তু ভারত-মাতা।” আবার মুক্তকণ্ঠে তিনি গাহিলেন,—“এ যে আমার সোণার দেশ।” আমাদের বাল্যে শ্রীশ্রী-স্বামীজীকে আমরা দেখিয়াছি দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ পূজারী রূপে। কিন্তু সহসা একদিন তাঁহার উদত্তকণ্ঠে বাজিয়া উঠিল এক বেদনাময়

কাটিক, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৬৮৩

করুন স্বয়ং। যেই গানে ফুটিয়া উঠিগে তাঁহার অবিলম্বিত কর্ম-পন্থার
 ব্যর্থতার ক্ষুরণ “মা’কে পূজা করতে এসে মায়ের পূজা হল না আর,
 মায়ের পূজা হ’ল নারে। ঠিক পথ পাইনে যে রে...ভুল হয় বারে
 বারে—কোথা গেল পূজার অর্থ্য ফুল? সব ফেলে দিলাম....কার
 মোহিনী আবেশ জোড়ে টান্ছে মোরে।” সেই মোহিনী শক্তির
 আকর্ষণে সবকিছু ছাড়িয়া তিনি কোথায় যেন চলিয়া গেলেন। বহুদিন
 তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় সমস্তার সমুদ্র মন্থন করিতে
 চলিয়া গেলেন এবং মন্থনের ফলস্বরূপ-সমাধানের সুধা লইয়া আসিলেন।
 আবার বহুদিন পরে শুনিলাম তাঁহার প্রাণোন্মাদী কণ্ঠে “অনল নিভিয়া
 যাবে, আসা-যাওয়া শেষ হ’বে, জীব-নদ মিলাইবে ব্রহ্মসাগর-
 গিলে।” তিনি বহু সাধনায় উপলব্ধি করিলেন দেশ-জননীর সেবার
 অর্থ জনগণের সেবা। দেশজোড়া অবস্থান করিতেছে এক মৃতজাতি।
 ধর্ম ভারতের জাতীয় প্রতিভা। স্মরণ্য এই মৃতজাতির জাগরণের
 ক্ষমতা এবং তাহার চরিত্রের আমূল সংস্কার করিতে হইবে ধর্মের মাধ্যমেই।
 অনেক আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রধানতম দোষ। ইহা দূর করিতে
 গিয়া দেখিলেন, আমাদের ভগবানের মধ্যেই বিরাট এক জাতিভেদ
 বিদ্যমান। এই ভগবানের জাতিভেদ দূর করিবার জন্ত বেদ, বেদান্ত
 ও উপনিষদোক্ত ওঙ্কারকেই তিনি অখণ্ড মন্ত্র বলিয়া প্রচার করিলেন।
 তারপর ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের উদাহরণ দিয়া তিনি প্রমাণ
 করিলেন, অত্রাক্ষণেরও ওঙ্কারমন্ত্রে অধিকার আছে এবং এই অখণ্ড-
 মন্ত্র সাধনেই বিভিন্ন জাতির সমস্ত মানুষ জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-জাতিতে
 পরিণত হইবে। এইভাবে এক জাতি গঠিত হইলে সমবেত উপাসনার
 প্রভাবে এক প্রাণ সৃষ্ট হইবে। কজাতি, একপ্রাণ এবং একতা সৃষ্টির
 শ্রেষ্ঠ উপায় সমবেত উপাসনা। এই সমবেত-উপাসনা-পদ্ধতিই মানুষে

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

৬৮৪

মানুষে প্রেমের বন্ধন সৃষ্টি করিবে। কিন্তু একদিনে নহে। ক্রমাগত কয়েক পুরুষ ধরিয়া এই সমবেত উপাসনা প্রচলিত থাকিলে ভবিষ্যতে শুদ্ধচিত্ত, নির্ভীক, শক্তিমান, বীৰ্য্যবান, এবং প্রেমিক মানব সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করিবে ভারতের প্রতি ঘরে এবং তাহারাই আনিবে সত্যিকারের স্বাধীনতা, শান্তি এবং ঐশ্বর্য্য। কিন্তু আজই তাহা সম্ভব নহে। “I am working for three centuries ahead”—তাই তিনি গাহিলেন “আমি তেমন মানুষ চাই, মান-অপমান পতন-মৃত্যু গ্রাহ্য বাহার নাই....” তাই আজ তিনি “তেমন মানুষ” তৈরী করিবার জন্তই মানুষের হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া আদর্শ প্রচার করিতেছেন। উহাই অখণ্ড আদর্শ। এই আদর্শই আমাদের জাতিকে লইয়া যাইবে অভীষ্ট লক্ষ্যের পানে। সেই নব-সৃষ্ট ভারতই জগতকে দেখাইবে পথের সন্ধান। ইহাই অখণ্ড-আদর্শের পরিণতি।”

অতঃপর দশমীতে ভোর ৪।০টায় অখণ্ড-বিগ্রহ একখানা টেনা গাড়িতে স্নসজ্জিতভাবে সাজাইয়া মাইকযোগে হরি-ও কীর্তন সহযোগে নগর-কীর্তনে বাহির হইলাম। আমাদের এই শোভাযাত্রা বিশেষভাবে অসমীয়া-অধ্যুষিত পাড়াগুলির ভিতর দিয়া অতিক্রম করে এবং আপনার প্রিয় ভক্ত শ্রীযুক্ত হর্গেশ্বর শর্মা মহাশয়ের বাড়ীর সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কীর্তন করিয়াছে।

তৎপরে ৭।১৫টায় শোভাযাত্রা শেষ করিয়া উৎসব সমাপন করিয়া উপস্থিত ভ্রাতাভগ্নিদের মধ্যে প্রীতি বিনিময় হয়। নিবেদন ইতি—

গৌহাটীর এই পত্র আমাদিগকে উৎসাহিত ও আশাবিত্ত করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে তিনমুখিয়ার কন্ঠী ভ্রাতা শ্রীব্রজনাথ মল্লমহারের

বার্তিক, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৬৮৫

লিখিত পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধার করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—“শ্রীশ্রীবাবামণির লিখিত পত্রগুলি বিজয়ার দিন সন্ধ্যায় শ্রীতি-সম্মেলনে পাঠ করিয়া তৎপরে নামে নামে বিতরণ করিয়া দিয়াছি। পত্রের উপদেশগুলি শুনিয়া সকলেই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছেন। সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গালীরা এবার এখানে সাড়ম্বরে প্রতিমা পূজা করেন নাই। ঘট-পূজা করিয়া সংকল্প রক্ষা করিয়াছেন। সকলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে হইল বলিয়া আমাদের শারদীয় অখণ্ড উৎসব নূতন প্যাণ্ডেলে না করিয়া খগের রোডের অখণ্ড-মন্দিরে যথারীতি স্মস্পন্ন করা হইয়াছে। আমাদের অনুষ্ঠান অত্যন্ত বারের সাফল্যকে অতিক্রম করিয়া এবার অসাধারণত্ব নিয়াছে। প্রতিদিনের উপাসনায় এবং প্রতিসন্ধ্যায় কীর্তন-স্মরণে এত বেশী লোক ইতঃপূর্বে যোগদান করে নাই। বহু লোকও প্রতিদিন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। রাস্তা জনবিরল, কিন্তু আমাদের উৎসব-মন্দির রাত্রি ১০টা পর্যন্ত পরিপূর্ণ। সকলেই উপাসনা এবং কীর্তনের মধ্য-দিয়া মনের আবেগে শ্রীভগবানের নিকট প্রাণের নিকৃতি নিবেদন করিয়াছি। ইতি—প্রণত শ্রীব্রজনাথ মজুমদার।”

আসামের রাজধানী শিলং হইতেও আমরা উৎসাহবর্দ্ধক সংবাদ পাইয়াছি। ভ্রাতা শ্রীশচীন্দ্র কুমার দেব লিখিয়াছেন,—“শিলং জেইল রোড হাইস্কুল প্রাঙ্গণে পাঁচদিন-ব্যাপী শারদীয় অখণ্ড উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। সহস্র সহস্র লোকের মনে অখণ্ড-আদর্শ ও হরি-ও মহানামের আলোড়ন জাগিয়াছে। অখণ্ডোৎসবের অংগব্যবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া ভাষণ দেন শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রীঅমিয় কান্তি দত্ত ও শ্রীঅনঙ্গমোহন চৌধুরী। আনুষ্ঠানিক ভাবে পঞ্চদিবস-ব্যাপী শারদীয় অখণ্ডোৎসব শিলং এ এই বারই প্রথম হইল।”

প্রতিধ্বনি
৬৮৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

ভ্রাতা নিরুক্ত শূর :—কামরূপ পলাশবাড়ী হইতে ভ্রাতা নিরুক্ত কুমার শূরের পত্র পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, ১০ই জুলাই তিনি কলিকাতা বান, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ননীগোপাল ও তৎপুত্র অরাজকতার প্রাণ হারাইয়াছেন, ভ্রাতা নিরুক্ত নিজ পরিজনবর্গ সহ বিপদের আগেই কলিকাতা পৌছিয়াছিলেন। বাঙ্গালী কর্মচারীরা সব চলিয়া গিয়াছিল, কেবল অসমিয়া কর্মচারীরা ভ্রাতা নিরুক্তের কারবার চালাইয়া রাখিয়াছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণির দুর্গাপুর শুভাগমন :—আগামী ১লা নবেম্বর, ১৫ই কার্তিক মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে বেনারস একস্প্রেসে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব দুর্গাপুর পৌছিবেন। অবস্থান করিবেন, খয়রামোল জি, টি, রোডের উপরে জাতীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ভট্টাচার্য্যের আতিথেয়। ১৬ই কার্তিক, বুধবার প্রাতে ৮ টায় উপাসনা হইবে। এবার কোনও ভাষণ দিবেন না। বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিম্নঠিকানায় পত্রালাপ করিবেন। শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, C/o জাতীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পোঃ দুর্গাপুর, বর্ধমান।

শ্রীশ্রীবাবামণির চিত্তরঞ্জন শুভাগমন :—আগামী ৩রা নবেম্বর, ১৭ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব অপরায় ১৬-৫১ তে বেনারস একস্প্রেসে দুর্গাপুর ত্যাগ করিবেন এবং অপরায় ১৮-৪২ এ চিত্তরঞ্জন পৌছিবেন। চিত্তরঞ্জনে তিনি কোথায় উঠিবেন, তাহা এখনো স্থির হয় নাই। তিনি চিত্তরঞ্জনে শুক্র ও শনিবার ভাষণ দিবেন। সম্ভবতঃ রবিবার তিনি চিত্তরঞ্জন ত্যাগ করিবেন। ভাষণদানের স্থান এবং দীক্ষার সময় সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের খবর জানিতে বাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীমুশীলকুমার সরকার, ষ্ট্রিট নং ২৪, কোয়ার্টার্স নং ৬২-বি, আমলাদহি পোঃ চিত্তরঞ্জন (বর্ধমান) ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সহিত প্রতিধ্বনি-সম্পাদিকা ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীও থাকিবেন এবং ভাষণ দিবেন।

প্রতিধ্বনি

(মাসিক পত্রিকা)

৪ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ { ৮ম সংখ্যা

মুর্ছনা

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব]

(১২)

বনফুলের কুঁড়ি রে তুই
ফুটলি বুঝি বনে,
ফুটলি রে ঐ নীল আকাশে,
ফুটলি আমার মনে ॥

ফুটলি রে তুই কি আনন্দে,
নিজেই ব্যাকুল নিজের গন্ধে,
তাই কি শুরু প্রেমের খেলা

করলি আমার মনে?

প্রতিধ্বনি

মৃচ্ছনা

[১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৬৮৮

চখ বুজে তাই তোরেই দেখি,
 আমার চোখে তোরই আঁখি,
 অশ্রু হয়ে মুক্তা ঝরে
 তাই কি ছ' নয়নে?

কার চরণের আশা ক'রে
 মাটির বুকে পড়িস ঝরে?
 কার লাগি' তুই বাসিস ভাল
 সবার প্রিয় জনে?

(১০)

গাহে পাখী ললিত কূজন,
 জানো কি কাহার আবাহন?

উদার আকাশ জুড়ি'
 অবাধে চলিছে উড়ি'
 প্রেমহীন ভয়হীন মন;
 সূধার কণিকা খসি'
 গোপনে হৃদয়ে পশি'
 প্রাণমন করে উচাটন।

এমন সরল আর এমন মধুর,—
 তার মাঝে বিরহের বেদনা-বিধুর,
 কবে রে, কবে রে হবে হৃদয়-চকোর
 অনুদিন অধীর এমন।

পুণ্য, ১৩৬৭]

মুর্ছনা

প্রতিধ্বনি

৬৮৯

(১৪)

প্রভাতের পাখী গাহে জাগরণি-গান,
 আমি কি কেবল ঘুমেই রহিব পড়ি?
 জাগিবে না মোর স্মৃতি নিখর-প্রাণ,
 দিবারাতি দিব শয্যায় গড়াগড়ি?

বেলা থাকিতেই নিদ্রায় পড়ি' চলি'
 স্বপ্নে ঘুরিতু মিথ্যার অলিগলি,
 সবারে ভুলাতু কেবল নিজেই ছলি'
 নিজ কল্যাণ একেবারে বিন্মরি'।

ঘুম, শুধু ঘুম, ঘুমেরই চলিছে খেলা,
 রাত চলে গেল, বাড়িতেছে শুধু বেলা,
 বুঝিতেছি সব, তবু তবু অবহেলা,
 চিরটা জনম থাকিব জীবনে মরি?

কোথা দয়াময়, রুদ্র তোমার রূপে
 মম অন্তরে এস নাথ চুপে চুপে,
 জ্বালাও অনল হৃদয়-অন্ধ-কূপে,
 শিরে হানো বাজ অবসাদ অপসরি' ॥

(১৫)

জাগরণী গীতি, সে ত মিলনের গান,
 যে গানে বিশ্ববাসী
 ছলি' শত হৃথরাপি
 হবে একমন একপ্রাণ ॥

প্রতিধ্বনি

মূর্ছনা

[১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৬৯০

যে গানে ভুলিবে সবে হিংসা ও ক্রোধ,
 যে গানে ভুলিবে যত হীন প্রতিশোধ,
 যে গানে সবাই মিলি হবে আশুয়ান্
 ইতিহাস বিরচিত্তে মধুর মহান্ ॥

সেই গান গাব আজি, গাব সেই গান
 ভুলি' অভিমান আর ভুলি' অপমান,
 হৃদয়ে টানিয়া জোরে
 বাঁধিয়া প্রেমের ডোরে
 করিব বিরোধী জনে জীবন-সমান;
 আমার প্রেমের হবে বিজয়াভিযান ॥

ভ্রান্তির বশে জীব কুকাঙ্গ করে,
 জ্ঞানের বিকাশে তাপে জলিয়া মরে,
 প্রেমবলে প্রেমোদয়
 দূরিতে সকল ভয়,
 সমতা মমতা দিবে সাগর-প্রমাণ
 জগতে লিখিত হবে নব-অভিধান ॥

(১৬)

আমি—গাইব শুধু গান,
 যাতে—জাগবে আমার প্রাণ ॥

আমি—গাইব তেমন গান

যাতে—জাগবে সবার প্রাণ,

যাতে—করবে আত্মদান

অতি—ক্ষুদ্র ও মহান্ ॥

আমি—গাইব প্রাণের গান,
 ভুলে—সকল অভিমান,
 ভুলে—মিথ্যা বত ভান,
 ভুলে—অসত্য অজ্ঞান ॥

আমি—গাইব মধুর গান,
 আমার—কোমল প্রাণের তান,
 যাতে—স্নিগ্ধতা অন্তান,
 যাতে—বইবে প্রেমের বান ॥

১৭)

মনের মাধে গাইব রে গান
 সন্ধ্যা-সকাল দিন-রজনী,
 মিথ্যা ত নয় চিন্তে শয়ান
 সঙ্গোপনে পরশমণি ॥

একটুখানি পরশ তাহার
 ছড়িয়ে দেবে রূপের বাহার,
 মরচে-ধরা লোহার পাহাড়
 হবে রে ভাই সোনার খনি ॥

তুচ্ছ আমার গানের তানে
 আনুব ডেকে প্রেমের বানে;
 হৃৎখেতে কর মাধায় হানে,
 তাদের আমি করব, ধনী ॥

উচ্চ-নীচের নাইক বিচার,
যেথায় যে থাকে সবাই আমার,
আমি আপন বিশ্বজন্য—

হোক না পুরুষ হোক রমণী।

অধম অনাথ দুঃখী জনে
বক্ষে ধ'রে ধৃত গণি ॥

সভাপতির অভিভাষণ ❀

মুকং করোতি বাচাণং, পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিम्।
যৎকৃপা তমহং বন্দে স্বরূপানন্দ-মাধবম্ ॥

পরমশ্রদ্ধাভাজন সমাগত প্রতিনিধি ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

আপনারা আমার অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রাণময় জয়গুরু-সংবর্দ্ধনা গ্রহণ
করুন।

পরমমঙ্গলনিলয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া
তাঁহারই মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপ অখণ্ড-প্রতিনিধি-মণ্ডলীর নির্দেশ প্রতিপালনের
জন্তু নিজের শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আজ এই সভা পরিচালনার গুরু-
দায়িত্ব বহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই প্রাণের ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন
করি পরমপ্রভুর শ্রীচরণে, যাঁহার কৃপাকণালাভে ক্ষুদ্র পিপীলিকাও মহত
হস্তীর কার্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। অহৈতুকী তাঁহার কৃপা, তাই কোন

* ত্রিপুরা-রাজ্য অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলনের উদয়পুর (রাধাকিশোরপুর) অধিবেশন
২৭শে কার্তিক, ১৩ই নবেম্বর, রবিবার দিবসে। শ্রীপ্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, এম-এ, এল-এল-বি
মহাশয়ের সভাপতির অভিভাষণ।

দুহিত্র অধিকারী না হইয়াও তাঁহার শ্রীচরণে নির্ভর করিয়াই আমি নির্ভর। যে অসীম স্নেহবশতঃ আপনারা এই গুণহীন বয়ঃকনিষ্ঠকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া গৌরবান্বিত করিলেন, নিজের অপরিসীম যোগ্যতাবশতঃ তাহার মর্যাদা রক্ষায় অক্ষমতাজনিত ত্রুটি নিজগুণে আপনারা ক্ষমা করিবেন, ইহাও আমার ভরসা।

আজ মনে পড়ে, পাঁচ বৎসর পূর্বের সেই অবিশ্মরণীয় দিনটির কথা, যেদিন পরমপিতা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের ত্রিপুরা-রাজ্যে শুভাগমন উপলক্ষে শুধু ভারতেরই নহে, পরন্তু জগতের ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসকে স্মান করিয়া আগরতলা সহর তথা ত্রিপুরা-রাজ্য এক অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপন করিয়াছিল। যে সম্মান, যে অভ্যর্থনা মহারাজ-চক্রবর্তীরও প্রত্যাশার অতীত, সর্বভাগী নিকিঞ্চন সন্ন্যাসীকে আপনারা ততোধিক মর্যাদা ও সমারোহ সহকারে সংবর্দ্ধনা জানাইয়া নিজেদিগকে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী করিলেন। আপনাদের সুপরিকল্পিত সংগঠনের ফলে লোক-সমাগমে আগরতলা সহর পরিপ্লাবিত হইল, যাহার ব্যাপকতা দিশাহারা রাজপুরুষকে তৎকালীন রাজ্যব্যাপী দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া ভ্রান্ত প্রচারে নিজদের অযোগ্যতাকে ঢাকিতে প্ররোচিত করিল। এই ভ্রান্ত প্রচারের মধ্যেও যেটুকু সত্য ছিল, তাহা এই বিশাল জনসমাগমের বীজিত। কিন্তু বিশ্বয়ের শেষ এইখানেই নহে। যে ঘটনা জগতের কোথাও কখনও ঘটে নাই—এক সঙ্গে চারি সহস্রাধিক মুক্তিকামী বনবীর দীক্ষা গ্রহণ, তাহাও সংঘটিত হইল আগরতলায়। শ্রীশ্রীগুরুদেবের আধ্যাত্মিক প্রেরণা নিঃসন্দেহে এই অঘটনঘটনের মূলীভূত কারণ হইলেও এই রাজ্যের অধিবাসী অথও-ভ্রাতা-ভগিনী আপনারা নিজদের শ্রীগুরু-নির্ভরতার বলে যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া

অখণ্ড-সমাজের সুখোজ্জল করিয়াছেন, আপনারা আমার নমস্কার
এহেন ঐতিহ্য-মণ্ডিত ত্রিপুরা-রাজ্যের অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলনে
আপনাদের ত্রায় সুযোগ্য অগ্রজদের উপস্থিতিতে সভাপতির মর্যাদা ও
দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণে আমি স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত। আপনাদের সাধন-
সজ্জাত উদারতা, জ্যেষ্ঠের স্বভাবস্থলভ স্নেহপরায়ণতা এই দুইই কর্তব্য-
পালনে আমার সহায় হউক।

এই পুণ্য সম্মেলনে যোগদানের জন্ত সুদূর কলিকাতা হইতে ছুটিয়া
আসিয়াছি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্তই নহে। আমার আকাঙ্ক্ষা
আপনাদের ত্রায় শ্রীগুরুতে সমর্পিত-প্রাণ, সাধনে অগ্রসর, ত্যাগবশিষ্ট
অগ্রজদের সান্নিধ্যলাভে জীবন-পথের পাথের সংগ্রহের এই ক্ষুদ্র
সুযোগের সদ্যবহার, আমার আগ্রহ অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী
এই রাজ্যের পুণ্যভূমির পরশলাভে নিজেকে ধন্য করা, আমার উদ্দেশ্য
আপনাদের অগ্রসর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়-স্থাপন।

বিগত বৎসরাধিক কাল যাবৎ বিভিন্ন স্থানে অখণ্ড-প্রতিনিধি-
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে, বাহার বিবরণ সংক্ষেপে আমরা প্রতিধ্বনি
মারফতে পাইয়া থাকি। এই ধরনের সম্মেলনের সার্থকতা সম্বন্ধে
অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে। অনেকে এর সার্থকতার স্ব-
অভিমতানুযায়ী ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। আজ আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া
আমার মনেও সর্বপ্রথমে এই প্রশ্নই জাগিতেছে—কি ইহার সার্থকতা?
ইতিপূর্বে এই ত্রিপুরা-রাজ্যেই আপনারা একাধিক প্রতিনিধি-সম্মেলন
করিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে এ ধরনের প্রতিনিধি-
সম্মেলনে যোগদান এই প্রথম। কাজেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে
তুলনামূলক সমালোচনা করা আমার পক্ষে সুকঠিন। কিন্তু আপনারা

অন্যাসেই বর্তমান অবস্থার সঙ্গে অতীত পরিস্থিতিকে বিচার করিয়া
 ইহার সার্থকতার বাস্তব চিত্র উপস্থিত করিতে পারেন। আমার
 বিবেচনায় অতীতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে বর্তমানকে বাচাই
 করিয়া ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ণয়েই এ ধরনের সম্মেলনের সার্থকতা।
 তাই এই প্রত্যাশা নিয়াই এখানে উপস্থিত হইয়াছি যে, আপনাদের
 অতীত অভিজ্ঞতা দ্বারা বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়া
 ভবিষ্যতের জন্য যে কর্মপন্থা আজ গ্রহণ করিবেন, তাহা হইতে সুদূর-
 প্রসারী অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগলাভে যত্ন হইব।

প্রতিনিধি-সম্মেলন অনুষ্ঠানের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ প্রেরণা
 অসিয়াছে মঙ্গলবাদের প্রয়োজন হইতে। আশু কর্তব্য হিসাবে মঙ্গল-
 বাদের গুরুত্ব আজ সর্বাধিক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে
 না। কিন্তু প্রতিনিধি-সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য আরও সুদূরপ্রসারী।
 আমার বিবেচনায় সম্মেলন-অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য সংগঠন। সংগঠনের
 বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদ আলোচনান্তে কর্মপন্থা নির্ধারণের দায়িত্ব
 সহজলনের। প্রতিনিধিদের কর্তব্য, সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত স্ব-স্ব
 দলে পরিবেশন এবং আঞ্চলিক মণ্ডলীর মাধ্যমে তাহার বাস্তব
 রূপায়ণ। কর্মপন্থার বাস্তব রূপায়ণের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা
 দেখা দেয়, তাহার প্রতিকার-পন্থা নির্ণয় করিয়া নূতন কর্ম-
 প্রণালী স্থির করিবার জন্যই সাধারণতঃ পরবর্তী প্রতিনিধি-
 সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। সেইদিক হইতে সম্মেলনে
 যোগ্যত বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের আলোচনার মধ্যে
 সমুদ্রতীরেই আমরা সেই সকল সমস্তা অবতারণারই
 প্রত্যাশা করিব, বিগত সম্মেলনে গৃহীত কর্মপন্থা রূপায়ণে যে সকল
 যত্ন অববিধার সম্মুখীন তাঁহার। হইয়াছেন। আরও প্রত্যাশা

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৬৯৬

করিব সেই সকল প্রস্তাব, যাহা নূতনতর পথে সংগঠনের ইঙ্গিত দিবে।

এখানে সংগঠন সম্বন্ধে ছ' একটি কথা আমি বলিতে চাই। বিভিন্ন সংঘের সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় হইয়া থাকে। কিন্তু সংগঠনের উদ্দেশ্য সকলেরই এক—আদর্শের স্ফূর্ত প্রচার ও তাহার সফল রূপায়ণ। আমাদের সংগঠনের লক্ষ্য, অথও আদর্শের প্রচার ও প্রসার। সেজন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন নিজ নিজ জীবনে অথও আদর্শের সফল রূপায়ণ। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—

“যে মে পুত্রসুতাঃ সন্তি ভবন্ত্যথওসংজ্ঞকাঃ।

যস্মাদথওদাদর্শাং সর্বৈ তে মম জীবিতম্॥”

এই অতি তাৎপর্যপূর্ণ বেদবাণীর একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন, অথও আদর্শ গ্রহণ হেতু আমরা তাঁহার জীবনস্বরূপ এবং সেজন্যই আমরা অথও সংজ্ঞায় সংজ্ঞাত। “অথও” শব্দটি এমনই তাৎপর্যপূর্ণ যে, শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, যাহাতে সামান্য অভিনিবেশ করিলেই আত্মপর-বিচারের প্রবৃত্তি দূর হইয়া যায়। আত্মস্বার্থ তখন জগজ্জনের স্বার্থের পায়ে আত্মবিলোপ করে। তাই তিনি অথওের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

“ব্যক্তিকেন্দ্রিক-সুখাচ্চ প্রত্যাহারকৃতং মনঃ।

প্রেন্নাহি বিনিষোজ্যেত সর্বেষাং কুশলায় চ॥”

অর্থাৎ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া যে সুখলোভ, নিজের স্বার্থকে লইয়া যে উন্নত্ত আয়োজন, তাহা হইতে মনকে সবলে টানিয়া আনিয়া সর্বজনের কুশলের জন্ত বিশ্বমানবের হিতের জন্ত পরম প্রেম-সহকারে নিয়োজিত করিতে হইবে। নিজের সুখের, নিজের তৃপ্তির, নিজের প্রয়োজনের উর্ধ্বে

যান দিতে হইবে সর্বজনের কল্যাণকে, বিশ্বজনের মঙ্গলকে। এবং সেই কার্যটি করিতে হইবে প্রেমের বলে, প্রেমের হেতুতে, প্রেমের প্রেরণায়, অহেতুক আত্মনিপীড়নের দুর্বল ছলনা বশতঃ নহে। সর্বজনের প্রতি প্রীতিই হইবে আমাদের জীবনের পরমনিয়ামিকা শক্তি। কাজেই অখণ্ড-সাধকের উপাস্তুর প্রতীক—

“নির্মূলং নিষ্কলং পূর্ণং ভেদবুদ্ধের্বিমর্দকম্।

স্বরূপং সর্বভূতানাম্ অখণ্ডং নাদ-রূপকম্॥”

অর্থাৎ যিনি সর্বভূতের স্বরূপ, সেই ভেদবুদ্ধির বিনাশকারী নাদস্বরূপ পরব্রহ্মই আমাদের উপাস্তু আর এরই মধ্যে নিহিত আছে অখণ্ড দর্শনের সারভূত।

জগতের সমস্ত দার্শনিক মতবাদ প্রচারের ধারা অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে-কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে সর্বপ্রথমেই পূর্বাচলিত মতবাদের খণ্ডন, প্রস্তাবিত মতবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রত্যুত্তর এবং সর্বশেষে নিজ মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া উহাকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিতে হয়। কিন্তু অখণ্ড-মতবাদ প্রচারের ধারা দূর্ণ অভিনব। জগতের সমস্ত প্রচলিত মতবাদকে স্বীকার করিয়া নিয়াই তাহার প্রতিষ্ঠা। কাহাকেও অস্বীকার করিয়া নহে, কাহাকেও হয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দ্বারা নহে পরন্তু সকল মতবাদের শুধু নতিহই নহে, উপযোগিতাকেও স্বীকার করিয়াই অখণ্ড মতবাদের প্রচার তাহার ‘ভেদবুদ্ধের্বিমর্দকম্’ স্বরূপেরই নিদর্শন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-বিধানের ভারত-অন্তরাত্মার শাস্ত্রত বাণীর মূর্ত প্রতীক তাই অখণ্ডবাদ। এহেন মতবাদের অনুগামী আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্ম, চিন্তা ও বাক্যে অখণ্ড সত্তার প্রতিফলনের দ্বারাই অখণ্ড-বহুলত্বের জীবনস্বরূপ হইতে পারি। এই অবস্থাটিকে স্বীকার করিয়া

আমরা যখন আদর্শপ্রচারে ব্রতী হইব, তখন আমাদের সংগঠনের দ্বারাও প্রচলিত অপর সকল ধারা হইতে পৃথক হইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এইজন্যই শ্রীশ্রীবাবামণি সকল সময় আমাদের গুরুভ্রাতার সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া আদর্শ প্রচারের নির্দেশ দিয়াছেন। যিনি বলিয়াছেন, ‘জগতের সকল সম্প্রদায় আমার, আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের’ তিনি নিঃসন্দেহে জগৎ হইতে সকল সম্প্রদায়ের অবলুপ্তির কথা চিন্তাও করেন না। পরন্তু যে বাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের আনুগত্য স্বীকার করিয়াও তাঁহার আপন এবং স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিবে, এই নিশ্চয়তাই সকলকে দিয়াছেন।

এহেন সর্বব্যাপক আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের সংগঠনের দ্বারা কি হইবে? শ্রীশ্রীবাবামণি তাহারও সুস্পষ্ট নির্দেশ আমাদের দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “আমি যখন তোমাদিগকে প্রচার ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিতে বলি, তখন আমি নিশ্চিতই একথা বলি না যে, তোমরা আমাকে প্রচার কর। পরন্তু আমাদের আদর্শ ও ভাবধারাকে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার করার কথাই বলিয়া থাকি।” আদর্শ-প্রচারের নির্দেশ হইতে আচার্য্য স্বরূপানন্দ তাঁর ব্যক্তিগত, জীবনের মহিমা প্রচারকে একেবারে আলাদা করিয়া ধরিয়াছেন। বারংবার তিনি বলিয়াছেন,—“আমাকে জনসমক্ষে বড় করিয়া ধরিবার তোমাদের কোনও প্রয়োজন নাই, আদর্শই জগৎসমক্ষে বড় হইয়া ফুটিয়া উঠুক।” তিনি বলিয়াছেন,—“আমাকে যদি পৃথিবীর লোকে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে কাহারও কোনও ক্ষতি হইবে না। কিন্তু আদর্শ যদি ভুলিয়া যায়, তবেই বাহা ক্ষতি হইবার হইবে।” তিনি বলিয়াছেন,—“যোগ-বিভূতি জগতে লক্ষ লক্ষ সাধকের জীবনে

বঙ্গহাস্য, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৬১৯

দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহার বর্ণনা দ্বারাই মানুষের মনকে পাপমুক্ত, ক্লেশমুক্ত, পাশমুক্ত করা যায় না। আমার জীবনেও যদি যোগ-বিভূতি কেহ কিছু দেখিয়া থাক, তবে তাহাকে চাপিয়া ধাও। আমি যেই য়ান্ আদর্শের প্রতিনিধি, তাহার প্রচারেই তোমরা কর আত্মনিয়োগ।” তিনি আত্মপ্রচার চাহেন নাই, দিয়াছেন আদর্শের সন্ধান। আর সেই আদর্শ-প্রচারের সুস্পষ্ট পন্থাও তিনিই প্রদর্শন করিয়াছেন।—

“আকৃষ্য কীর্তনেন বা স্বাধ্যায়েন স্তবেন বা।

খণ্ডে খণ্ডে বিভক্তান্ চ কুর্যাদেকমথঙ্কম॥”

বাহার বিশ্লেষণে তিনি বলিয়াছিলেন,—গৃহে গৃহে তোমরা অথঙ-সংহিতার বাণী প্রচার কর, পাড়ায় পাড়ায় কর সমবেত উপাসনার যত্ন, পথে প্রান্তরে নগরে গ্রামে স্তম্ভল হরি-ওঁ কীর্তনের স্তম্ভুর দ্বারা আকাশ বাতাস কর মুখরিত। এক কথায় অথঙ-সংহিতা, সমবেত উপাসনা ও হরি-ওঁ কীর্তনরূপী তিনটি ব্রহ্মাজ্ঞ আমাদের হাতে তিনি তুলিয়া দিয়াছেন অথঙ-আদর্শ প্রচার তথা প্রতিষ্ঠার জন্ত। এই ব্রহ্মাজ্ঞ তিনটির বিশ্লেষণেও আমরা সেই ভেদবুদ্ধি-বিরহিত সর্বভূতের বরপটিকে উপলব্ধি করিতে পারি।

যে অথঙ-সংহিতার বাণী প্রচারের নির্দেশ তিনি দিয়াছেন, সেই পুণ্যগ্রন্থের অগ্ৰাবধি প্রকাশিত চারি সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় কোথাও এমন একটি কথাও নাই, যাহা কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদের নিন্দা বা অপকৃষ্টতা প্রদর্শনে প্রযুক্ত। এমন কথাও নাই, যেখানে কাহাকেও অথঙ-মতবাদ গ্রহণের জন্ত প্ররোচিত করা হইয়াছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন কথাটি পর্য্যন্ত তিনি বলেন নাই যে, তিনি কোন নূতন মতবাদ প্রচার করিতেছেন। সনাতন আধ্যাত্ম্যের কথাই তিনি

নিজস্ব ভঙ্গীতে বলিয়াছেন। ভারতের সমস্ত গুরুবাদ যেখানে সনাতন আৰ্য্যধর্মের খণ্ড খণ্ড বিকাশরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেখানে অখণ্ডমণ্ডলেখর শ্রীশ্রীবামণী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব তাঁহার অখণ্ড-সত্তাবোধ-সজ্ঞাত অকল্পনীয় প্রজ্ঞাবলে সনাতন আৰ্য্যধর্মের অখণ্ড-সত্তাকেই করিয়াছেন বিকশিত। এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তাই শ্রীশ্রীবামণির শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমিয়-নির্ঝরির দিব্য সঙ্কলন অখণ্ড-সংহিতার পুণ্যবাণী প্রচার কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদের প্রচার নহে, নিজ সংঘ-পুষ্টির পরিপোষক হিসাবেও নহে, পরন্তু সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের তথা সমগ্র মানব-সমাজের নির্বিরোধে গ্রহণযোগ্য কল্যাণ-বাণীরই প্রচার। অখণ্ড-সংহিতার বাণী-প্রচার তাই ঘোষিত অখণ্ড আদর্শের সঙ্গে একান্ত সুসমঞ্জস। তেমনই সর্বমস্ত্রের প্রাণ, সর্বতত্ত্বের সার, সর্বরূপের অপরূপ মিলন, সর্বসম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য প্রতীক ও তত্ত্বিত সর্বজনগ্রাহ্য সমবেত উপাসনা-পদ্ধতির প্রচলন সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উর্দ্ধে এক পরম মিলনবেদী রচনা করিয়াছে। সর্বস্বীকৃতির আরক হিসাবে হরি-ওঁ নামসঙ্কীৰ্ত্তনও তাই সমস্ত সাম্প্রদায়িক কদ-কোলাহলের উর্দ্ধে এক অখণ্ড পরমসত্তার দিকেই মানব-সমাজকে আকর্ষণ করে।

আজ এই স্মরণ সম্মেলনে আমার একান্ত আবেদন, আপনারা প্রতিটি আঞ্চলিক মণ্ডলীর গ্রহণযোগ্য এমন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করুন, যাহাতে শ্রীশ্রীবামণি-প্রদত্ত অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র তিনটীর সম্যক ব্যবহারের দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণে অখণ্ড-মতবাদের সুষ্ঠু প্রচার সুসাধ্য হয়। এই সম্মেলনে যোগদান তখনই সার্থক হইবে, যখন সন্মেলনে সমাগত প্রতিটি প্রতিনিধি এমন প্রেরণা নিয়া স্ব-স্ব স্থানে যাইবেন,

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৭০১

বে প্রেরণা অপর সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া গৃহীত কর্মপন্থার সম্যক রূপদানে আপনাদিগকে শক্তি ও সাহস প্রদান করিবে। সম্মেলন দ্বারা অনেক করিয়াছি কিন্তু সম্মেলনের সফল আমরা খুব বেশী আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছি, একথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে আমরা সক্ষম হইয়াছি কি? যদি না হইয়া থাকি, তবে আজ তাহার কারণ অনুগতান করিয়া প্রতিকার-নির্ণয় করিতে হইবে। প্রতিনিধি-সম্মেলনের গুরু উপেক্ষণীয় নহে, ইহার উপযোগিতাও অনস্বীকার্য। যদি আমরা দ্বিতীয় সম্মেলনের সফল আহরণে আংশিকভাবেও ব্যর্থ হইয়া থাকি, তবে তাহা আগাদের আত্মগঠনের ত্রুটি-হিসাবেই স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন—আত্মগঠনই জাতিগঠন, আত্মোন্নতিই জাতীয় উন্নতি তথা সমগ্র জগতের উন্নতির সোপান। কাজেই জগতের, দেশের বা সংঘের উন্নতিই যদি আমাদের কাম্য হইয়া থাকে, তবে সর্বাঙ্গে আমাদের আত্মগঠনের মাধ্যমে আত্মোন্নতি-বিধান করিতে হইবে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন—অগঠিত-চরিত্র ব্যক্তির পক্ষে, দেশের বা জাতির উন্নতি দূরের কথা, নিজের ব্যক্তিগত উন্নতিও কল্পনা করা যায় না। তাই তিনি আমাদের আত্মগঠনের উপর এত জোর দিয়াছেন। আত্মগঠনের প্রকৃষ্ট পন্থার নির্দেশও তিনি আমাদের দিয়াছেন। পরমমঙ্গলনিলয় শ্রীভগবানের অমৃতময় নামের পায়ে আত্মসমর্পণই আত্মগঠনের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া তিনি আমাদের প্রতি বাক্যে, চিন্তায় ও কার্যে নামের অস্তিত্বকে উপলব্ধির ইঙ্গিত দিয়াছেন। তাই তিনি আমাদের সাধন-ভজনের উপর এত গুরুত্ব দিয়াছেন। আমাদের উপর তাঁহার আর্থিক দাবী নাই এক কপর্দক, যেহেতু তিনি অবাচক। উদ্বুদ্ধ হিমায়েও যে তিনি আমাদের একনিষ্ঠ সাধনটুকুই মাত্র দাবী

করেন, তাহারও পশ্চাতে আছে আমাদের আত্মগঠনেরই প্রেরণা-পান। সেই সাধন-রুচি বৃদ্ধির তথা সামর্থ্য অর্জনের জন্তই তিনি সংঘ ও ব্রহ্মচর্য-পালনের উপদেশ দিয়াছেন। 'ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র' তাঁহার এই অভয়-বাণী আমাদের আত্মগঠনের প্রেরণা-সঞ্চারক। সংঘ ও ব্রহ্মচর্য্য আমাদের সাধনশক্তি বৃদ্ধি করিবে, আবার সাধন আমাদের সংঘ ও ব্রহ্মচর্য্য-পালনের রুচিবৃদ্ধি করিবে। ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ সাধনপুষ্ঠ দেহমন লইয়া আমরা যখন সংগঠনে প্রবৃত্ত হইব, তখন, আজ যে কাজ অসাধ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা সুসাধ্য হইবে, আজ যাঁহারা আমাদের বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া না পাইত আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না, তাঁহারাও তখন আমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবেন। এইভাবেই আমরা আত্মোন্নতির মাধ্যমে জগতের উন্নতি সাধনে সক্ষম হইব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন—'ব্রহ্মচর্য্যই জাতির মেরুদণ্ড'। আজ দিকে দিকে অসংঘম অনাচার জাতিকে শোচনীয় অধঃপতনের দিকে টানিয়া নিতেছে। ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাসের অভাবে আবালবৃদ্ধবনিতা আজ দুর্গতির চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। আজ একদিকে অকালমৃত্যু, রোগ-শোক-অকালবার্দ্ধক্য এবং অপরদিকে অতিজনন রাষ্ট্রনায়কদের চিত্তিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা অস্বাভাবিক পন্থায় পরিবার-নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জাতিকে রক্ষার ব্যর্থ প্রয়াসে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। একদিকে উহা যেমন ক্রটিহীন ব্যবস্থা নহে, তেমনই এই পরিকল্পনা, কি নৈতিক, কি শারীরিক, কোন দিক দিয়াই কল্যাণকর হইতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘদিন পূর্বে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার বিবাহিত শিষ্যদের গাহস্থ্য জীবনকে পবিত্রতামণ্ডিত করিয়া

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৭০৩

এর বলদুর্দ্ধি জাতি সৃষ্টির যে পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহার 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য' শীঘ্রক গ্রন্থে, সেই গ্রন্থোপদিষ্ট পন্থায় যদি সমাজকে পরিচালিত করা যায়, তাহা হইলে এই একটি মাত্র পন্থাই দেশের সকল সমস্ত সমাধানে যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে। গার্হস্থ্য জীবন যদি পঙ্কিলতামুক্ত হয়, তবে সেই সকল গৃহে যে শিশুরা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা কখনও অসংযমী হইতে পারে না। আর দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যদি সংযমী হয়, তবে দেশের কোন্ সমস্তার না সমাধান হইতে পারে? তাই আজ বিবাহিত অথও-ভ্রাতাভগিনীদের এ বিষয়ে সজাগ হইতে হইবে। তাঁহারা আদর্শ দাম্পত্য-জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া সমাজের সর্ব্বস্তরে দাম্পত্যজীবন হইতে অসংযমকে নির্দাসন দিবার ব্রত গ্রহণ করুন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—

“তিনশত বছরের পরে, মানুষের প্রতি ঘরে ঘরে বাণী হ'য়ে করিব নিবাস, এই মোর হৃদয়ের আশ।”

তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বিবাহিত অথও-ভ্রাতাভগিনীদের। আজ যদি তাঁহারা নিজ নিজ দাম্পত্য-জীবনে বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য গ্রন্থোপদিষ্ট সংযম প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেন, তবে ও বংশানুক্রমিক অনুশীলনের ফলে কালে কালে প্রতি ঘরে ঘরে মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হইবেন। সেজন্ত নিজেরা সংযমব্রত পালনের লক্ষে সাধে পরিবারের ছোট-বড় সকলের মধ্যে সংযত জীবনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে। আজিকার শিশুই ত আগামী কল্যের পুরুষ। কাজেই শিশুকাল হইতেই সন্তানদের এমন পরিবেশের মধ্যে রাখিতে হইবে, যাহাতে স্বভাবতঃই তাহারা সংযম পালনের আগ্রহ নিত্য বর্দ্ধিত হয়। তাহা সম্ভব দাম্পত্য-জীবনে সংযম প্রতিষ্ঠার দ্বারা। প্রতিটি আঞ্চলিক মণ্ডলীকে স্ব-স্ব অঞ্চলে আগে অথওদের মধ্যে

দাম্পত্য-জীবনে সংযম প্রতিষ্ঠার জন্ত চেষ্টিত হইতে হইবে। অশুভগুণ নিজেদের সংযমস্বরভিমণ্ডিত দাম্পত্য-জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা অপরকে দাম্পত্য-জীবনে সংযম-পালনে প্রেরণা দান করিবেন। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত শত শত হিতোপদেশের চাইতে অধিকতর কার্যকরী হয়। আজ নিজেদের জীবনে ব্রহ্মচর্যাভ্যাসের দ্বারা 'সংযমকে' প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজের সন্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে। তাই ত শ্রীশ্রীবাবামণি আমাদেরকে ভগবৎ-সাধনের মাধ্যমে আত্মগঠনের উপদেশ দিয়াছেন। আবাল্য-সাধনহীন জীবনে তেমন দাম্পত্য-সংযম প্রতিপালন সম্ভব হয় না। তাই এই উপদেশ শুধু বিবাহিতদের জন্তই নহে। সকল বয়সের সকল অবস্থার লোকের পক্ষেই এই উপদেশ প্রযোজ্য। আমরা আজ আমরা নুতন করিয়া সাধন-ভজনের মাধ্যমে আত্মগঠনের সঙ্গ গ্রহণ করি।

সাধন মানুষকে ত্যাগের শক্তি প্রদান করে। সাধন-পরায়ণ ব্যক্তি কখনও স্বার্থপর হইতে পারেন না। যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দিয়াও সাধকের ত্যাগের পিপাসা মিটে না। আমরা কে কতটুকু সাধন-পরায়ণ, তাহা আমাদের ত্যাগানুশীলনের দ্বারা আমরা অনায়াসে বিচার করিতে পারি। সাধন যদি একনিষ্ঠ হয়, ত্যাগেচ্ছা আমাদের বদ্ধিত হইবেই। কাজেই আমরা যদি একনিষ্ঠ প্রযত্নে সাধন করিয়া যাই, তবে আমাদের পক্ষে জগতে কোনও কল্যাণ-কর্মই অসাধ্য থাকিতে পারে না। তাই ত শ্রীশ্রীবাবামণি আমাদের নিকট একমাত্র সাধন বাতীত আর কিছুই প্রত্যাশা করেন না। তিনি জানেন যে একমাত্র সাধনপরায়ণ ব্যক্তিই সম্যকরূপে ত্যাগী হইতে পারে। সমাজে ত্যাগীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, সমাজ-কল্যাণ কর্ম ততই সুসাধ্য হইবে। তাই তিনি চান, সাধকের সংখ্যা বদ্ধিত হউক। যে সাধন মানুষকে জগৎ-কল্যাণে আত্মত্যাগের

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রাতিষ্ঠান

৭০৫

কমতা প্রদান করে, সেই সাধনের অনুশীলন করিলে সমাজ-কল্যাণ
কর্মে আমরা সর্বস্ব-ত্যাগের প্রেরণা পাইব। তখন যে-কোনও কল্যাণ-
কর্মে ত্যাগ-স্বীকারের জন্ত আমাদের প্রচার-প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে
না। তাই আমি বলিয়াছিলাম, মঙ্গলবোধই প্রতিনিধি-সম্মেলন
দলটানের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য সংগঠন। আর
সংগঠন সম্যকরূপে পরিচালনের জন্ত আমাদের প্রয়োজন সাধন-ভজনের
মাধ্যমে আত্মগঠন। সাধনের অপরিহার্য ফলস্বরূপ যে ত্যাগের প্রেরণা
আমরা লাভ করিব, তাহার ফলে শুধু মঙ্গলবোধ বা অখণ্ড-বিশ্ববিশ্বালয়ই
নহে, শ্রীগুরু-আদিষ্ট যে কোনও মহৎ-কার্য আমরা কটাক্ষে সম্পন্ন করিতে
ক্ষম হইব।

সাধন-ভজন যেমন ত্যাগের রুচি বৃদ্ধি করে, ত্যাগের অনুশীলন
তেমনই সাধনে অনুরাগ বৃদ্ধি করে। তাই আমাদের আরাধ্য দেবতা
নিজে অনন্ত শক্তির আধার হইয়াও আশু কর্তব্যের মূর্তি ধারণ করিয়া
আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। যে কাজ অঙ্গুলী-হেলনে নিজেই
সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা সম্পাদনের জন্তই কখনও প্রাকৃতিক
দুর্যোগের বেশে, কখনও সমাজ-কল্যাণের প্রয়োজন রূপে আমাদের ত্যাগ-
শক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে সাধনে রুচিবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করেন।
বিবার বহুরূপে তাঁর প্রকাশ আমরা দেখিয়াছি। বর্তমানে মঙ্গলবোধকে
প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলি করিয়া আবার নবরূপে তিনি আমাদের সম্মুখে
ত্যাগের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট এই দুর্যোগকে আমরা
বরণ করিয়া নিব আমাদের আত্মগঠনের অঙ্গে শাণ দিবার সুযোগরূপে।
তাই সম্মেলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই মঙ্গলবোধের প্রতি আমাদের
কর্তব্য-নির্ণয় ও তাহা সম্পাদনের কার্যকর পন্থা আমাদের গ্রহণ
করিতে হইবে এবং মঙ্গলবোধের কাজ সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত একান্ত

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[২ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭০৬

নিষ্ঠার সহিত আমাদিগকে প্রতিটি অঞ্চলে গৃহীত কর্মপন্থানুযায়ী কর্তব্য পালনের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে।

মঙ্গলবাধ কি, কি তাহার প্রয়োজন, অথও-সংঘে ইহার স্থান কোথায়, এ সব আলোচনার অবতারণা আমি এখানে করিতে চাহি না। আসাম, উত্তরবঙ্গ, বিহার, এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে অসংখ্য অথও-সম্মেলনগুলির সে সমস্ত ভাষণ ও বিবরণাদি প্রতিধ্বনিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পর এই সম্মেলনে উপস্থিত কোন প্রতিনিধির মনে এ ধরনের প্রশ্ন কল্পনার অতীত। শ্রীশ্রীবামণির মুস্থরী গমনের কারণ বাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে, এই মঙ্গলবাধ তাঁহার কাছে এত প্রিয় যে ইহাকে বিপন্নুক্ত করিবার জন্য তিনি তাঁহার শ্রীশরীর পাত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। সীমাবদ্ধ আমাদের দৃষ্টি সূদূরপ্রসারী পরিকল্পনার কতটুকু বুঝিতে সক্ষম? কি শ্রীশ্রীবামণি জানেন, অযাচকত্ব বাদ দিলে অযাচক আশ্রমের অস্তিত্ব যেমন নিরর্থক, মঙ্গলবাধ-হীন পুণ্যনকী আশ্রম তথা অথও-সংঘের জগন্মঙ্গল-পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ তেমনই অসম্ভব। তাই তিনি আজ দেহপাতের বিনিময়েও মঙ্গলবাধের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমাদের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প। জীবনমৃত্যু বাঁহার পারের ভূত্যা, ক্ষুদ্র বৃহৎ যে-কোনও সংকল্প-সাধন কিম্বা শরীর-পাতন তাঁহার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। জীবন ও মৃত্যু বাঁহাকে প্রতি খাসে ও প্রশ্বাসে করে নিত্য আলিঙ্গন, নিজেরই প্রয়োজনে এই নর্থর দেহ ধারণ তাঁহার পক্ষে নিরর্থক। কিন্তু একটা মঙ্গলবাধ কেন, সমগ্র আশ্রমের অস্তিত্বের চেয়েও অসংখ্য গুণে মূল্যবান যে জীবন, তাহা কোন্ প্রাণে আমরা বারংবার বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিতোছি? লক্ষ সন্তানের পিতা আর সামান্য কুলী-মজুরের মজুরী সাশ্রয় করিবার জন্য নিজ হাতে হুঁট

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

১১/১২

৭০৭

রাখিতেছেন, কর্ণী চালাইতেছেন, চালাইয়ের কাজ করিতেছেন।
 তৎসঙ্গেও অর্থাভাবে মাসাধিক কাল বাবৎ কাজ বন্ধ। অভিজ্ঞ
 ইঞ্জিনিয়ারের মতে যেখানে আড়াই লক্ষ টাকার কমে কাজ সম্পূর্ণ হইতে
 পারে না, অপূর্ব স্থপতি-প্রজ্ঞা-বলে তাহা ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার
 মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। তথাপি ধারাবাহিক ভাবে কাজ চালু
 রাখিবার মত সহযোগ আমরা দিতে পারিলাম না। এর পরেও
 আমরা কি করিয়া দাবী করিব যে, নিয়মিত সাধন আমরা করি—
 গুরুবাক্য পালন করি? যদি গুরুবাক্য পালন করিতাম, যদি সাধন
 করিতাম, তবে সাধন-সজ্জাত ত্যাগ-শক্তি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত হইত,
 তবে আজ সম্মেলন করিয়া মঙ্গলবাধের গুরুত্ব আলোচনার প্রয়োজন
 হইত না। তাই আমি বলিয়াছিলাম যে, আমাদের সম্মেলনের মুখ্য
 উদ্দেশ্য সংগঠন, যে সংগঠনের অঙ্গহিসাবে আত্মগঠনের জন্ত আমরা
 সাধন-পরায়ণ জীবন অবলম্বন করিব এবং এই সাধনই আমাদের ত্যাগ-
 শক্তির উন্মেষ ঘটাইবে, যে ত্যাগশক্তির বলে মঙ্গলবাধের চেয়েও বৃহত্তর
 কর্তব্যসম্পাদন আমরা শ্রীগুরুর ইচ্ছিতে অবহেলায় করিতে সক্ষম হইব।
 আত্মন, আত্মগঠনে সাধন-রুচি-বুদ্ধির জন্ত মঙ্গলবাধকে উপলক্ষ্য করিয়া
 অধিকতর ত্যাগের অনুশীলনে আমরা প্রবৃত্ত হই। ইতিপূর্বে কাছাড়
 জেলা একবেলা আহার বন্ধের সফল কার্যো পরিণত করিয়া যে সদ্‌দৃষ্টান্ত
 স্থাপন করিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া আত্মন আমরা প্রতিজ্ঞা-
 বদ্ধ হই, যে পর্য্যন্ত মঙ্গলবাধের কাজ সম্পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রতিমাসে
 আমাদের একদিনের উপার্জন মঙ্গলবাধের সেবায় নিয়োজিত করিব।
 নকপট চিত্তে আজ আমরা এই সফল গ্রহণ করিলে পরমপ্রভু আমাদের
 সকল-সাধনের সামর্থ্য সুনিশ্চিত দান করিবেন।

অসীম ধৈর্য্যের সহিত আপনারা আমার মনের আবেগ প্রকাশের

৭০৮

যে স্বেচ্ছা দিয়াছেন, তাহা আমার প্রতি আপনাদের অকুরন্ত স্বেচ্ছা-
রাগেরই বাস্তব নিদর্শন। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভাবাবেগে কত
অবান্তর কথা বলিয়া আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিলাম, তাহা ভাবিয়া
আমি ত্রিগমান। তাই আর অধিক সময় নষ্ট না করিয়া সংক্ষেপে
দুই একটি বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াই আমার
বক্তব্যের উপসংহার করিব।

শ্রীশ্রীবাবামণির ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই আজ আমরা এখানে
সমবেত। বাঁহার জীবনের যে-কোন একটি ঘটনা, বাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত
যে-কোন একটি বাণী, বাঁহার পরিকল্পিত যে-কোন একটি কর্মপন্থাকে
রূপ দিতে পারিলে নিখিল জগতের সকল অকুশল দূর হইয়া যায়, তিনি
আমাদের অক্ষমতার দিকে তাকাইয়া কত বিভিন্ন কর্মপন্থা কত বিচিত্র
উপায় আমাদের জন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন যে-কেহ নিজ যোগ্যতানুযায়ী
কর্মপন্থা ও বিবেক-সম্মত উপায় অবলম্বন করিয়াই জগতের হিত-সাধনে
আত্মনিয়োগ করিতে পারি। এরই একটি নিদর্শন 'ওঙ্কারের জয়যাত্রা'।
অথগু-আদর্শ প্রচারের এমন নিখুঁত যুগোপযোগী হাতিয়ারের আশ
পর্যন্ত আমরা কতটুকু সদ্যবহার করিয়াছি? অথচ স্বল্প আয়াসেই
আমরা আসাম ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি চিত্রগৃহে 'ওঙ্কারের জয়যাত্রা'
প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে আদর্শ-প্রচার
সক্ষম হইতাম। আসুন, আজ এই সম্মেলনে আমরা কর্তব্য স্থির করিয়া
কর্মপন্থা গ্রহণ করি, বাহাতে এক বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি
চিত্রগৃহে অন্ততঃ একবারের জন্ত হইলেও "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" প্রদর্শনের
ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হই।

তারপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, সংঘের মুখপত্র মাসিক
পত্রিকাটির প্রতি। "প্রতিধ্বনি"র সৃষ্টি-রহস্য আপনাদের কাহা হও ও জ্ঞাত

নহে। আজ হইতে নয় বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীবাবামণির মৌনব্রত গ্রহণের প্রাণ্ণালে দীর্ঘ আড়াই বৎসর কাল তাঁহার শ্রীকণ্ঠস্বর মৌনস্তব্ধতায় নিমগ্ন থাক-কালীন তাঁহার আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ লাভে বাহাতে আমরা বঞ্চিত না হই, সেইজন্ত তাঁহারই আশীর্বাণীকে প্রতিধ্বনিত করিয় আমাদের সমস্ত সমস্তার নিরসনের জন্ত আবির্ভূত হয় “প্রতিধ্বনি”।

দে পত্রিকা প্রকাশের প্রথম বৎসরেই ছয় সহস্রাধিক গ্রাহককে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আট-বৎসরের ঐতিহ্য বৃদ্ধি ধারণ করিয়াও নবম বৎসরে তাঁহার গ্রাহক সংখ্যা এক হাজার অতিক্রম করিল না। সংঘের সংগঠনের প্রতি অধিকতর মনো-যোগ দিবার জন্ত গল্প উপাখ্যান প্রবন্ধাদি প্রকাশ বন্ধ করাতে বাহিরের গ্রাহক-সংখ্যা হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু অখণ্ড-গ্রাহকদের সংখ্যা হ্রাসের কোনও যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাই না। প্রতি মাসে কমপক্ষে আড়াই হাজার পত্রিকা অতিরিক্ত ছাপাইতে হয়। ফলে আশ্রমের ক্রমকীয়মাণ-অর্থ-ভাণ্ডারের উপর চক্রবৃদ্ধিহারে প্রতিধ্বনির ঋণের বোঝা তাঁহার অর্থ-নৈতিক কাঠামোকে বিপর্যাস্ত করিয়া দিতেছে। অত্যন্ত লজা ও দুঃখের কথা এই যে, এত বড় বিশাল অখণ্ড-সমাজের মুখপত্রের সহস্রাধিক গ্রাহক জুটে না। তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় এই, এক সহস্র গ্রাহকের মধ্যেও অধিকাংশই অনথও। এ হেন পরিস্থিতিতে আমাদের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে। প্রতিনিয়ত অসংখ্য পত্রে অবাস্তর সব প্রশ্ন পড়িতে পড়িতে শ্রীশ্রীবাবামণির চক্ষু পীড়িত, উত্তর দিতে দিতে শ্রীহস্তের অঙ্গুলী অবসন্ন। অথচ “প্রতিধ্বনি” মিয়মিত পাঠ করিলে এই সব অবাস্তর প্রশ্ন করিবার অবকাশ থাকে না। অচিরে ব্যবহার পরিবর্তন সাধনে আমাদের আশ্রমকে এই দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে যে, ১৩৬৮ সনের প্রতিধ্বনির এক সহস্র গ্রাহক আমরা ত্রিপুরা

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭১০

রাজ্যের অখণ্ডদের মধ্য হইতেই সংগ্রহ করিব এবং আগামী কাল
মানের মধ্যেই সেই এক সহস্র গ্রাহকের বার্ষিক টাঁদা বারানগী পাঠাইব।

সর্বশেষে মণ্ডলীর সংগঠন সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে আমার
বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—

“মণ্ডলীং স্থাপয়িত্বা চ মত্তেত গুরুবিগ্রহম্।

আনুগত্যঞ্চ তস্তাং হি জানীয়াৎ গুরুসেবনম্॥”

মণ্ডলী স্থাপন করিয়া ইঁহাকে শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিগ্রহ-স্বরূপ বহন
করিয়া ইঁহার প্রতি অনুগত থাকাই গুরুসেবার সমতুল জ্ঞান করি-
তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। অখণ্ড-আদর্শ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্র হিসাবে
অখণ্ড-মণ্ডলীর সৃষ্টি। অখণ্ড-সংহিতার পঠন-পাঠন, সময়ের
উপাসনা ও হরি-ওঁ কীর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই আদর্শ প্রচার করিতে
হইবে। ইঁহার মধ্যে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—“তোমরা আমার
প্রাণতুল্য প্রিয় কিন্তু সমবেত উপাসনা আমার প্রাণাধিক প্রিয়।
সমবেত উপাসনায় নিয়মিত যোগদান করিয়া তোমরাও আমার প্রাণাধিক
প্রিয় হও।” কিন্তু আমরা তাঁহার এই প্রাণাধিক প্রিয় কাণ্ডটির প্রতিও
সমান ওঁদাসীত্বই প্রদর্শন করিতেছি। অচিরে এই অবস্থার প্রতিকার
একান্ত বাঞ্ছনীয়। সংঘবদ্ধ না হইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না, তাই
মানুষ সামাজিক জীব। কিন্তু সংঘবদ্ধতার নাম করিয়া আমরা
নির্ব্বিচারে যে-কোনও সংঘে যোগদান করিতে পারি না। ঢেঁড়-
ডাকাতেও সংঘ আছে, তেমন সংঘ কাহারও কাম্য হইতে পারে না।
আবার এমন অনেক সংসংঘও আছে, যাহা অস্ত্রের পক্ষে উপকারী
হইলেও আমাদের পক্ষে উপযোগী না হইতে পারে। তাই সকলেই
নিজ নিজ জীবনাদর্শের অনুরূপ সংঘেই সংঘবদ্ধ হইতে চায়। সেইজন্য

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৭১১

প্রতিস্থানে অখণ্ড-মণ্ডলী গঠিত হইতেছে প্রয়োজনেরই তাগিদে। সভ্যতার ভাবকের সংখ্যাবৃদ্ধিও তাই অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। তবু কাহাকেও স্বধর্ম-ত্যাগে বা আমাদের ধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করিবার প্রয়োজন হয় না, বাহা অগ্রাগ্র সংঘের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়ে। নিজ নিজ ধর্মমতে নিষ্ঠা অবিচল রাখিও শুধু মাত্র পরধর্মমতের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গী বাহার আছে, তিনিই আমাদের আপনার আপন। তাই, সকল সম্প্রদায়ের লোককে নিয়া আমরা সমবেত উপাসনা করিতে সক্ষম। সমবেত উপাসনার মধ্য-গঠন ক্ষমতা অভাবনীয়। বিভিন্ন-মতাবলম্বী লোককে সংঘবদ্ধ করিবার এমন মিলন-মঞ্চ শ্রীশ্রীবাবামণির অদ্বিতীয় সৃষ্টি। ইহার পূর্বে নিখিল জগতের কোনও মনীষী, মনস্বী ধর্মনেতা বা সংঘগুরু এমন অসাম্প্রদায়িক মিলন-মঞ্চ বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে পারেন নাই। অদ্বৈত ও দার্শনিকতা উভয় দিক্ দিয়া সমভাবে কর্মজন-গ্রহণীয় এমন বস্তু, একেবারে অনন্ত। সমবেত উপাসনা নিখিল বিশ্বের সকল মানুষকে নিয়া নূতন সমাজ-বাবস্থা গড়িবার জন্তই আবির্ভূত হইয়াছে।

আদর্শ-প্রচারের অন্ততর কর্তৃপক্ষ হিসাবে গ্রামে গ্রামে মণ্ডলী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি অখণ্ডের গৃহে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠানের প্রচলনে মনোযোগ দিতে হইবে। মণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনায় যেমন গ্রামের প্রতিটি অখণ্ডের উপস্থিতি হইবে বাধ্যতামূলক, প্রতি অখণ্ডের পারিবারিক সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় শুধু পরিবারের প্রতি জনের যোগদান বাধ্যকর। কোনও অখণ্ড যদি অগ্র কোন কাজের, এমনকি নিজের ব্যক্তিগত দৈনন্দিন উপাসনারও ক্ষতি না করিয়া সেই এক একাধিক পারিবারিক সমবেত উপাসনায় যোগ-

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

৭১২

দান করিতে পারেন, তবে তিনি নিশ্চিতই সেই সুযোগ হইতে নিজে
বঞ্চিত করিবেন না। কিন্তু পারিবারিক সামগ্রিক সমবেত উপাসনায়
আসল উদ্দেশ্য হইবে প্রতিবেশী অথগুণের সমবেত উপাসনায় বো-
দানের সহজ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া উৎসাহ-দান। লক্ষ্মীপূজা, শনি-
পূজায় যেমন পাড়া-প্রতিবেশীর নিঃসঙ্কোচে আসেন, এমনকি পাঁচা-
শুনিবার জন্ত দুই এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হন।
তেমনি নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা সমবেত উপাসনায় যোগদানে নিজে
প্রতিবেশীর প্রাণে আগ্রহ সৃষ্টিও অসম্ভব হইবে না। অথগুণ-সংহিতা
পাঠ ও হরি-ওঁ-কীর্তন সহযুক্ত এই সমবেত উপাসনা একাধারে ত্রি-
বন্ধাজ্ঞের প্রয়োগসিদ্ধ সূত্রপায়। তাই এই ধরনের প্রচেষ্টা অথগুণ-আদর্শ
প্রচারে ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ হইবে, নিঃসন্দেহ।

পার্কৃত্য-জাতি-অধ্যুষিত ত্রিপুরা রাজ্যের অথগুণ-মণ্ডলী সমূহের একই
বিশেষ কর্তব্য সরল পার্কৃত্য জাতির মধ্যে অথগুণ-আদর্শ প্রচার।
কেন্দ্রের দায়িত্বে বিভিন্ন সময়ে এ সম্পর্কে যতটুকু কাজ হইয়াছে
তাহাতে কখনও কখনও আপনাদের সাধ্যমতন সহযোগ দান প্রদর্শন।
কিন্তু এই একান্ত অপরিহার্য স্থানীয় কর্তব্যের দায়িত্ব সম্পূর্ণ-ভাৱে
আপনাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কেন্দ্র হইতে কাজটির ফল
হওয়ায় কর্মপন্থা-নির্ণয় ও অভিজ্ঞতা-অর্জনের সহজ সুযোগ আপনার
লাভ করিয়াছেন। এখন প্রদর্শিত কর্মপন্থায় অধিকতর ব্যাপকভাবে
কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। সমতলকে আঁকড়াইয়া থাকিবার নি-
আজ আর নাই। পাহাড়ে পর্বতে আমরা দিগকে আশ্রয় খুঁজিই
হইবে। সেজন্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন এবং মুদ্রমত
সামাজিক ভাবধারা প্রসারের তাগিদে আমরা দিগকে বন-পর্বতবাদী
সরলপ্রাণ মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে আদর্শ-প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

দার্দ্র-প্রচার-ব্যপদেশে আমাদের উচ্চ-ভাবে প্রতি তাঁহাদের সশ্রদ্ধ
 আগ্রহ সৃষ্টির জন্য আমাদেরকে স্বার্থলেশহীন সমাজ-সেবামূলক কর্মপন্থার
 মাধ্যমে তাঁহাদের অনগ্রসরতা দূর করিয়া সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা
 করিতে হইবে। প্রতিবেশী অনগ্রসর থাকিলে নিজেদের অগ্রগমনও
 বাহত হইবে। তাই শ্রীশ্রীবাবামণি স্বয়ং জীবন বিপন্ন করিয়া বারংবার
 নিঃসঙ্গ পাক্কর্তব্য অঞ্চলে গিয়াছেন এবং নিজব্যয়ে অবিরত প্রচারক
 দল প্রেরণ করিতেছেন। শুধু আদেশ, নির্দেশ বা উপদেশ দিয়াই তিনি
 ক্ষান্ত থাকেন নাই, অত্যাশ্রয় সকল কাজের জন্য এই ব্যাপারেও নিজে কাজ
 করিয়া আমাদের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাহার, অল্প অর্থব্যয়,
 শরীরিক শ্রম, এমনকি জীবন বিপন্ন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।
 আজ আমরা বাধ্য হইয়া বনপর্বতে আশ্রয় নিতেছি কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি
 তাঁহার অনন্তসাধারণ দূরদর্শিতাবলে সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর পূর্বেই এই
 প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব করিয়া আমাদেরকে যথাযথ নির্দেশ
 দিয়াছিলেন। তাঁহার সেদিনের নির্দেশ যথাসময়ে পালন করিলে
 আমাদের সমস্তরাজ্য অনেক সহজে সমাধান হইয়া যাইত। কিন্তু বিলম্ব
 হইলেও আজ আমাদেরকে ব্যাপকতর ভিত্তিতে তাঁহার আরও কর্ম-
 স্পাদনে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে।

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া
 প্রার্থনা জানাই—

সর্বৈ চ স্তুখিনঃ সন্তু সর্বৈ সন্তু নিরাময়াঃ।

সর্বৈ ভদ্রাণি পশ্যন্তু ন কশ্চিদুঃখমাণুয়াৎ॥

ও শান্তিঃ। ও শান্তিঃ॥ ও শান্তিঃ॥

শ্রীপ্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭১২

দান করিতে পারেন, তবে তিনি নিশ্চিতই সেই সুযোগ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবেন না। কিন্তু পারিবারিক সামগ্রিক সমবেত উপাসনায় আসল উদ্দেশ্য হইবে প্রতিবেশী অথগুণের সমবেত উপাসনায় যোগদানের সহজ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া উৎসাহ-দান। লক্ষ্মীপূজা, শনিপূজায় যেমন পাড়া-প্রতিবেশীর নিঃসঙ্কোচে আসেন, এমনকি পাঁচালী শুনিবার জন্ত দুই এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হন না, তেমনই নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা সমবেত উপাসনায় যোগদানে নিজের প্রতিবেশীর প্রাণে আগ্রহ সৃষ্টিও অসম্ভব হইবে না। অথগুণসংহিতা পাঠ ও হরি-ওঁ-কীর্তন সহযুক্ত এই সমবেত উপাসনা একাধারে ত্রিটি ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগসিদ্ধি সূচপায়। তাই এই ধরনের প্রচেষ্টা অথগুণ-আদর্শ প্রচারে ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ হইবে, নিঃসন্দেহ।

পার্কৃত্য-জাতি-অধ্যুষিত ত্রিপুরা রাজ্যের অথগুণ-মণ্ডলী সমূহের একটি বিশেষ কর্তব্য সরল পার্কৃত্য জাতির মধ্যে অথগুণ-আদর্শ প্রচার। কেন্দ্রের দায়িত্বে বিভিন্ন সময়ে এ সম্পর্কে যতটুকু কাজ হইয়াছে, তাহাতে কখনও কখনও আপনাদের সাধ্যমতন সহযোগ দান প্রদর্শিত। কিন্তু এই একান্ত অপরিহার্য স্থানীয় কর্তব্যের দায়িত্ব সম্পূর্ণ-ভাবে আপনাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কেন্দ্র হইতে কাজটির সূচনা হওয়ায় কর্মপন্থা-নির্ণয় ও অভিজ্ঞতা-অর্জনের সহজ সুযোগ আপনায় লাভ করিয়াছেন। এখন প্রদর্শিত কর্মপন্থায় অধিকতর ব্যাপকভাবে কাজ চালাইয়া বাইতে হইবে। সমতলকে আঁকড়াইয়া থাকিবার দিন আজ আর নাই। পাহাড়ে পর্বতে আমরা দিগকে আশ্রয় খুঁজিতেই হইবে। সেজন্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন এবং সুসম্বন্ধ সামাজিক ভাবধারা প্রসারের তাগিদে আমরা দিগকে বন-পর্বতবাসী সরলপ্রাণ মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে আদর্শ-প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

দার্প-প্রচার-ব্যপদেশে আমাদের উচ্চ-ভাবের প্রতি তাঁহাদের সশ্রদ্ধ
 ব্যগ্রহ সৃষ্টির জন্তু আমাদেরকে স্বার্থলেশহীন সমাজ-সেবামূলক কর্মসমূহ
 দ্বারা তাঁহাদের অনগ্রসরতা দূর করিয়া সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা
 করিতে হইবে। প্রতিবেশী অনগ্রসর থাকিলে নিজেদের অগ্রগমনও
 ব্যাহত হইবে। তাই শ্রীশ্রীবাবামণি স্বয়ং জীবন বিপন্ন করিয়া বারংবার
 বিপন্ন-সঙ্কুল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়াছেন এবং নিজব্যয়ে অবিরত প্রচারক
 ম প্রেরণ করিতেছেন। শুধু আদেশ, নির্দেশ বা উপদেশ দিয়াই তিনি
 কৃত্ত থাকেন নাই, অত্যাশ্রিত সকল কাজের দ্বারা এই ব্যাপারেও নিজে কাজ
 করিয়া আমাদের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাহার জন্তু অর্থব্যয়,
 শরীরিক শ্রম, এমনকি জীবন বিপন্ন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।
 আজ আমরা বাধ্য হইয়া বনপর্বতে আশ্রয় নিতেছি কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি
 তাহার অনন্তসাধারণ দূরদর্শিতাবলে সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর পূর্বেই এই
 প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব করিয়া আমাদেরকে যথাযথ নির্দেশ
 দিয়াছিলেন। তাঁহার সেদিনের নির্দেশ যথাসময়ে পালন করিলে
 আমাদের সমস্যা আজ অনেক সহজে সমাধান হইয়া বাইত। কিন্তু বিলম্ব
 হইলেও আজ আমাদেরকে ব্যাপকতর ভিত্তিতে তাঁহার আদর্শ কর্ম-
 সম্পাদনে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে।

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া
 প্রার্থনা জানাই—

সর্বৈ চ সুখিনঃ সন্তু সর্বৈ সন্তু নিরাময়াঃ।

সর্বৈ ভজাণি পশুন্তু ন কশ্চিদদুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥

ও শান্তিঃ। ও শান্তিঃ ॥ ও শান্তিঃ ॥

সদিকাতা

শ্রীপ্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য

সেবাধর্ম

[শ্রীঅনুপম সেন, শিলং অখণ্ডমণ্ডলী]

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব "অখণ্ড সংহিতা"র এক স্থানে সেবাধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,—“যা’ প্রয়োজন, তাকে তা দেওয়ার নাম সেবা। ক্ষুধার্তকে পুষ্পস্তবক দেওয়া সেবা নহে, বিপন্নকে দার্শনিক তিরস্কার ও বৈজ্ঞানিক ঔদাসীন্ধ্য উৎসাহ দেওয়া সেবা নহে, জরগ্রস্তকে তেঁতুলগোলা দেওয়া সেবা নহে।” তিরস্কার শব্দগুলি মনে নাই, ভাবার্থ লিখিলাম।

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড-মণ্ডলী সমূহ উত্তর প্রদেশের দেবাদুন হইতে আসামের শেষ প্রান্ত লিছু পর্যন্ত তিন শতাধিক কেন্দ্রে তৎ-প্রদর্শিত পথে অস্বাভাবিক সেবার অনুষ্ঠান করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সংঘ আকারে বিরাট ইহুদী-ইহুদী ধনবল অতি অল্প, কারণ এই সংঘ জন-সাধারণের নিকট ইহুদী টাঁদা সংগ্রহ করেন না, ভিক্ষা চাহেন না, নিজেদের ক্ষুদ্র শক্তি পরিসরের মধ্যেই যতটুকু পারেন, জনসেবা করেন। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব প্রতিষ্ঠিত অস্বাচক আশ্রমেরই ত্রায় তৎপ্রতিষ্ঠিত অখণ্ডমণ্ডলী সমূহ লোকের কাছে টাঁদা তোলেন না বলিয়াই বিজ্ঞান জাহির করিয়া দেশে দেশে নিজেদের সেবার ফিরিস্তি দাখিল করেন না।

কিন্তু এই কলিকালে নির্বিরোধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানেরও নীরবে ও বিনা ব্যাঘাতে নিজের কাজ করিবার উপায় নাই। ইষ্টাং আমাদে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল। অরাজকতা, হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ, দুর্জন আদি নানা অপকাণ্ড অতি ব্যাপকভাবে ঘটিতে লাগিল। ডাক-

তার-বেলে-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি লইল। অনেক নরনারী নিজ নিজ দীর্ঘকালের
 বসত্থান হইতে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল, কেহ কেহ চিরতরে নিখোঁজ
 হইল। এই সকল আতঙ্কিত ও উৎপীড়িত মানুষগুলির আত্মীয়-
 বন্ধুরা অত্যাচার প্রদেশে বসিয়া উৎকণ্ঠায় ও উদ্বেগে দিন-যাপন করিতে
 গেলেন। এমন সময়ে ততোধিক হঠকারিতা করিয়া ব্রহ্মচারী
 ইলাধিদারী একজন অমুক-চৈতন্য কলিকাতার একখানা প্রতাপশালী
 দৈনিক সংবাদপত্রে নিজের স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় দিবার জন্ত লেখনী
 ধারণ করিলেন। তিনি অত্যাচার ভালমন্দ কথার সহিত এই কথাও
 লিখিলেন যে, স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের আসামে অনেক শিষ্য
 আছে, তিনি আসাম হইতে বহু অর্থ নিয়া থাকেন, তিনি
 এই সময়ে কি করিতেছেন? বলা বাহুল্য, লেখার ভাষা
 আক্রোশমূলক এবং অভদ্রোচিত। স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব
 দেশে অপরিচিত লোক নহেন, তাঁহার ঠিকানা জানা খুব কঠিন
 কথাও নহে, তিনি কি করিতেছেন বলিয়া প্রশ্ন করিয়া সংবাদপত্রের
 লোকসমক্ষে তাঁহাকে হেয় করিবার চেষ্টার মধ্যে কোনও
 কষ্টও নাই, পৌকষও নাই। বাঁহার আচরণ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন
 করিয়া খবরের কাগজে অপপ্রচারের চেষ্টা হইতেছে, তাঁকে একখানা
 পত্র লিখিলেই জানিতে পারা যাইত যে, তিনি কি করিতেছেন।
 অমুকচৈতন্য ব্রহ্মচারীর পত্রের জবাব লিখিয়া শ্রীপ্রিয়-
 ভট্টাচার্য্য এম. এ., এল, এল, বি মহাশয় উক্ত দৈনিক পত্রিকায়
 প্রকাশার্থ প্রেরণ করিলেন। সে প্রতিবাদে কোনও কটুকথা ছিলনা,
 অত্যাচার প্রতি আক্রমণ ছিলনা, কিন্তু অহং-প্রমত্ত পত্রিকা-সম্পাদক
 এই প্রতিবাদ-পত্র ছাপিলেন না। একজন দেশ-প্রখ্যাত নহাপুরুষের
 পত্র হইতে নিন্দা ছাপিতে বাঁহাদের আপত্তি হইল না, তাঁহারা কিন্তু

প্রতিধ্বনি

সেবাধর্ম

[১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭১৬

প্রতিবাদ-পত্রটি পত্রস্থ করিলেন না। ইহাই বর্তমানে সাংবাদিক সভ্যতার মাপকাটি।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, অনেক সুধু সুনামী লোকহিতকার প্রতিষ্ঠান হইতেই শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের জীবন প্রতিষ্ঠান একটু আলাদা ধরণের। এই প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের কাছে চাঁদ তোলেন না, আর স্বামীজীর অযাচক আশ্রমেও তাঁর শিষ্যগণ সে বাহ্য দেন, অযাচিত ভাবেই দেন। শিষ্যরা যখন বাহ্য দেন, স্বামীজী তাহার বহুগুণ অর্থ শিষ্যদের ও জনসাধারণের কল্যাণের জন্ত ব্যয় করেন। স্বামীজী সাধারণ ভিক্ষুক সাধু নহেন, তাঁহার রচিত পুস্তক হইতে তিনি বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা পান, তাঁহার আয়ুর্বেদীয় ঔষধের কারখানা হইতে তিনি বৎসরে ত্রিশ হাজার টাকা পান, তাঁহার নিজের শ্রমে উৎপাদিত ফুলের বীজ বিক্রয় হইতে তিনি বৎসরে তিন চারি হাজার টাকা পাইয়া পাইয়া থাকেন। এ টাকার এক কপর্দকও তিনি নিজে রাখেন না, তিনি তাহা জনকল্যাণে ব্যয় করেন। কলিকাতার দৈনিক পত্রিকা-সম্পাদকদের এই সকল সংবাদ জানিবার আবশ্যকতা নাই, তাই তাঁহারা সম্মানহানিকর উক্তি প্রকাশ করিয়া লজ্জিত হন না।

নোয়াখালীর দাঙ্গার সময়ে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব এক অসাধারণ সেবা জন-সাধারণকে দিয়াছিলেন। ম্যালিগ্‌থার্ট ম্যালেরিয়া হইতে উঠিয়া যেদিন অল্পপথ্য করিলেন, সেদিনই বারাণসী হইতে ছুটিলেন নোয়াখালী। সেদিনকার কাহিনী আজ বর্ণনা করিতে চাহি না। যাঁহারা জানেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, এই নির্ভীক সন্ন্যাসীর সাহস সেদিন কেমন করিয়া উৎপীড়িত শত শত নারীকে নিম্নের হিন্দুসমাজে পুনরায় সম্মান ঠাঁই দিয়াছিল। হাজারটি অধিষ্টোমে বৈরী রমণী জীবনে আর হিন্দুর সংসারে স্থান পাইত না, এই মহামহারীর

একটি মুখের বাক্য সেই দিন তেমন শত শত রমণী অনায়াসে ঘৃণী-পুত্র-পরিবার ফিরিয়া পাইয়াছিল।

আর আসামের অরাজকতার সময়? তিনি তখন হংপিণ্ডের দ্বিতীয় কাতর হইয়া মুম্বরী শৈলে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে শয্যায় কাটাইতেছেন কাল। মঙ্গলবাঁধ তাঁহার সবল স্বাস্থ্য হরণ করিয়াছে। তিনি নিরুপায় হইয়া শৈলাবাসে সাধ্যাতীত ব্যয়ে চিকিৎসায় বিব্রত। পরামর্শী হইলেও তিনি কি ঘুমাইয়া ছিলেন? সেই অবস্থাতেও তিনি ঘুমাই-হেলনে তাঁহার বিশ্বস্ত সেবকগণকে নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সে কর্মে অর্থের প্রয়োজন হয় কিন্তু তিনি এজন্ত নিজ কর্মীদেরকে জনসাধারণের কাছ হইতে টাকা সংগ্রহ করিতে দেন নাই।

সেই সময়ে যে সকল বিচিত্র সেবা চলিয়াছে, তাহারই একটি ক্ষুদ্র অংশ শিলং অখণ্ডমণ্ডলীর চেষ্টায় চতুর্দিকে ছর্ভাবনা-ক্লিষ্ট আত্মীয়-বন্ধনদিগকে নিখোঁজ আত্মীয়দের কুশল-সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া। আমাদের নিকট শত শত পত্র আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা লিছ, চিন্তুকিয়া, ডিক্রগড়, ডিগবয়, নগাঁও, হোজাই, লামডিং, তেজপুর, বরাইগাঁও, পাণ্ডু, আমিনগাঁও, বড়গোলাই, হাফলং, নাহারকাটিয়া, শিবসাগর, বোরহাট আদি কেন্দ্রের অখণ্ড-মণ্ডলীকে খোঁজ করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছি। ইঁহারা প্রত্যেকে প্রাণপণ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। কলিকাতার Relief welfare Ambulance Corporation ও কত চিঠি আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। সমগ্র অসামব্যাপী অখণ্ড-মণ্ডলী সমূহের ভ্রাতা-ভগিনীদের শ্রম, চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে আমরা সকল স্থানেরই প্রায় শত-করা নব্বই জন নিরুদ্দিষ্টের সাহায্য করিয়া দিয়াছি। অখণ্ড-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নহেন, এমন অনেক

সজ্জনও এই কাজে শ্রম করিয়াছেন। বলা প্রয়োজন, “আনন্দবাহু” ও “বৃগান্তর” আমাদের বিজ্ঞাপন বিনা মূল্যে ছাপাইয়া দেওয়াতে আমাদের সেবা করিবার সুযোগ ব্যাপকতর হইয়াছে। কলিকাতা অখণ্ডমণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীপ্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য এম-এম, এল-এল-বি মহাশয় আসামের সমস্ত মণ্ডলীকে নিজ নিজ কর্তব্যে অবাহিত হইবার জন্ত প্রেরণা যোগাইয়াছেন।

শিলং অখণ্ডমণ্ডলীর ছোট ছোট ভগিনীরা এবং যুবক ভাতারা এই কাজে আমাদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কুমারী অসীম পাল চৌধুরী, কুমারী কৃষ্ণা পাল চৌধুরী, কুমারী সুমিত্রা মজুমদার, সর্বশ্রী শচীন্দ্র দেব, যতীন্দ্র দেব ও রতীশ দাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বকর্ম্য তত্ত্বাবধান করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় ভাতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী ও শ্রীরাকেশ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শত শত প্রশংসালিপির দুই চারিখানার অনুলিপি এই সঙ্গে দিতেছি। যথা,—

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের শ্রীমৎ স্বামীত্যাগ্যানন্দজী মহারাজ ৫-৮-৫০ তারিখে লিখিয়াছেন,—“আর্তদের সেবার জন্ত আপনাদের এই চেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। শ্রীভগবান্ আপনাদের এই মহতী চেষ্টার সহায় হউন এবং আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন।”

শ্রীঅমিতাভ সেন, আসানসোল (বর্দ্ধমান) হইতে লিখিয়াছেন,—
“In fine, I like to thank you for the measure you have taken to relieve the worries of thousands of people who are far from the actual spot of horror but anxiously awaiting for news of their dear and near ones” (2-8-50)

শ্রীবিষ্ণুভূষণ ভট্টাচার্য্য, বিশালগড় (ত্রিপুরা) হইতে লিখিয়াছেন,—
 যেভাবে আমার নিখোঁজ ভ্রাতাদের সন্ধান অতি অল্প সময়ের মধ্যে
 দিয়াছেন, সেজন্য আমি শিলং ও বড়গোলাই অখণ্ড-মণ্ডলীর নিকট
 চিরকৃতজ্ঞ।” (২৬-৮-৬০)

শ্রীশম্ভুনাথ মোদক, মেমারি (বর্ধমান) হইতে লিখিয়াছেন,—
 “শ্রীশ্রীস্বপানন্দ পরমহংস দেবের অখণ্ড-মণ্ডলীর সাহায্য-কার্য্য সম্বন্ধে
 ধন্যবাদ।”

শ্রীনিশিকান্ত রায়, কলিকাতা (স্কট লেন) হইতে লিখিয়াছেন,—
 “আপনার আমার আত্মীয়দের খোঁজ দেবার জন্ত যা করেছেন, তার
 জন্য শেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।” (১০-৮-৬০)

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী, শীতলপুর কলিয়ারী (বর্ধমান) হইতে
 লিখিয়াছেন,—“আপনাদের মণ্ডলীর মারফতে আমার ভগ্নীপতির সংবাদ
 জ্ঞাত হইয়াছি। আপনাদের অখণ্ডমণ্ডলীর শুভ কামনা
 করি।” (১৩-৯-৬০)

বিশ্ববাণী

বিগত ১০ই ভাদ্র ২৬শে আগষ্ট অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী
 স্বপানন্দ পরমহংস দেব বর্ধমান বিদ্যার্থী-ভবন হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে
 সন্ধ্যার সময়ে, একটি বক্তৃতা দেন। সোয়া একঘণ্টাব্যাপী ভাষণে
 তিনি বলেন,—“তোমরা কেহই নিজেদিগকে ক্ষুদ্র মনে করিও না। কেহই
 তোমরা তুচ্ছ নহ। তোমাদের মধ্যে অপরিমিত শক্তি রহিয়াছে।
 সেই শক্তিকে বিকশিত করিয়া তোলারই জন্ত তোমরা সমগ্র শক্তিকে

কেন্দ্রীভূত কর। এই ধারণা এক জনেও মনের কোণে রাখিও না, জগতে তোমাদের অসাধ্য কাজ কিছু আছে। একযুগ আগে তোমাদের পিতামাতারা রাজনৈতিক কারণে নিজ নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্ব এবং নিঃসম্বল অবস্থায় নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়াই যে তোমরা দুনিয়ার হতভাগা, এই ভুল ধারণাকে তোমরা মন হইতে একেবারে অপসারিত করিয়া দাও। আত্মশক্তির বলে, অসামর্থ্য পৌরুষের বলে, কল্পনাশীত দুঃখসহনের সামর্থ্যের মধ্য দিয়া তোমরা জগতে নিজেদের যোগ্য সম্মান আদায় করিয়া লইবে, ইহাই তোমাদের পণ হউক। কাহারও কোনও ষড়যন্ত্রে বা কাহারও কোনও ভ্রষ্ট যেন তোমাদিগকে প্রতিনিয়ত শক্তিসংগ্রহের অদম্য সাধনা হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে। একমন একপ্রাণ হইয়া তোমরা যোগ্য সংগ্রহে লাগিয়া যাও। যোগ্যতা বলিতে অনেক জিনিষ বুঝায়। শক্তিসংগ্রহ, ঐক্য-সাধনা, নিয়মানুবর্তিতা, সর্বদা নির্ভীকতা, সর্বসংকারো দূরন্ত সংসাহস, প্রয়োজন-ক্ষেত্রে অকল্পনীয় দুঃসাহস—সবই যোগ্যতার পর্যায়ে পড়ে। দেহে মনে প্রাণে, ইচ্ছায় অভিলাষে সঙ্কল্পে, চেতনায় চরিত্রে যত্নে, আগ্রহে উৎসাহে ও উদ্দীপনায় তোমাদিগকে খাপখোলা তলোয়ারের মতন উত্তম এবং শাণ দেওয়া বর্ষার-মত উজ্জল হইতে হইবে। কল্পনার গভীরতা এবং আকাজ্জক উদ্যমতাকে আদর্শ সহনীয়তার সহিত সমন্বিত করিতে হইবে। জীবনকে হুল্লভ সৌভাগ্য অর্জনের জগু প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহার জগু সুহৃৎ আত্মত্যাগের সাধনা করিতে হইবে। জীবনের মূলদেশে সংঘম এবং ব্রহ্মচর্যকে স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহার সাধনা করিতে হইবে ভানহীন অকপট শুভবুদ্ধির প্রেরণায়।”

দ্বিতীয়, ১৩৬৭]

বিশ্বাবাণী

প্রতিধ্বনি

৭২১

হাতসমাজ মন্ত্রনুষ্কের মত এই ভাষণ শোনে। সহরের বহু সন্তান সজ্জন সন্তান যোগদান করিয়াছিলেন।

২৭শে আগষ্ট ১১ই ভাদ্র, শনিবার অপরাহ্ন পাঁচটায় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব কলিকাতা ১২২।১ বি, আপার সারকুলার রোডে একঘণ্টাব্যাপী উপদেশ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন,—
“কাজের লোককে মনে রাখিতে হইবে যে, অনেক কথা কহিয়া যেন কাজ নষ্ট না করি। প্রায়ই দেখা যায় যে, সভা-সম্মেলনে অনেক বক্তৃতা হয়, কিন্তু কাজ হয় না। তাহার কারণ এই যে, নানাজনের নানা কথার বক্তব্য ও মন্তব্য মানুষের মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়,—যেই মন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত অল্পষ্ঠানের আয়োজন, তাহা পিছনে পড়িয়া থাকে। এই কারণেই প্রকৃত কাজের লোকেরা বেশী কথা ভাল বাসেন না।”

২০শে সেপ্টেম্বর ৪ঠা আশ্বিন মহালয়া দিবসে কলিকাতা ১০নং বার্ক ষ্ট্রীটে শ্রীমোনাজ মোহন গাঙ্গুলীর বাড়ীতে একটি সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হয়। উপাসনান্তে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব নিকটীর্ষ একটি ভাষণ দেন। তাহাতে বলেন,—“অনাদি অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়া আমাদের কর্তব্যের ক্ষেত্র;—অতীত হইতে আমরা কিছুই নহি, ভবিষ্যৎও আমাদের জন্ত স্বল্পকালব্যাপী নহে। বিশ্বের প্রতিটি অতীত ও প্রতিটি অনাগত প্রাণীর সহিত আমাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ এবং ইহাদের প্রতি জনের প্রতি রহিয়াছে আমাদের অসীম কর্তব্য। এই বহুই আমরা আত্মকেন্দ্রিক হইয়া স্বার্থপর জীবন যাপন করিতে পারি না। আমাদের সকলের জন্ত বাঁচিতে হইবে এবং সকলের জন্ত প্রাণদান করিতে হইবে।”

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম

[১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭২২

(৬২৬)

হরিওঁ

পুপুনকী আশ্রম

১২ই আশ্বিন, ১৩৫১

পরমকল্যাণীয়াষুঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পত্রের উত্তর চাহ না, প্রাণে প্রাণে যোগাযোগ চাহ। তাহারই হইবে। প্রাণ ভরিয়া নাম কর, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় টলিও না, সকলকে সকল রকমে সুখী করিয়া তাহারই ফাঁকে ফাঁকে আমার পরিচয় নাম স্মরণ করিয়া আমার সহিত প্রাণের যোগ চিরস্থির করিয়া না। যে যাহা চাহে, আমি তাহাকে তাহাই দেই। যে যে-ভাবে পাইতে চাহে, আমি তাহার কাছে সেই ভাবেই আসি। আমাকে সংশয় সন্দেহ লইয়া যে দেখে, তাহাকে সেই সংশয়ের মধ্য দিয়াই আমি স্বীকার করি। যে নীরব আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া চাহে, তাহাকে আমি তাহারই মতন হইয়া দেখা দেই, ধরা দেই, আপন হই, নিরবচ্ছিন্ন হই। অভেদ আপন মতায় তাহার সহিত মিলিয়া থাকি। আমি সকলেরই মনের মতন হইয়া তাহার আপন হই। ইত—

আশীর্বাদ
স্বরূপানন্দ

(৬২৭)

হরি-ওঁ

পুপুনকী আশ্রম

১২ই আশ্বিন, ১৩৫১

পরমকল্যাণভাজমেযুঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রণবমস্ত্রের উচ্চারণ সম্পর্কে জর্জরিত অপরীক্ষিত-চরিত্র ব্রাহ্মণের

সহিত আলোচনা করিতে যাওয়ায় তোমার ভুল হইয়াছে। ইহারা নিজেরা প্রায় কেহই প্রণবমন্ত্র-সাধনা করেন না, কিন্তু অত্ৰকে করিতে দেখিলে নানা কূট কথার বিস্তার দ্বারা তাহার নিষ্ঠা ও বিশ্বাস নষ্ট করিবার জ্ঞ হাজার কুতর্ক তোলেন। ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না। ইহারা নিজেরাও প্রণব-সাধনা করিবেন না, বলিবেন, উহা উচ্চাধিকারীই ঘনা, কিন্তু অত্ৰে করিতেছে দেখিলে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জ্ঞ শাস্ত্রজলধি মন্থন করিয়া কেবল নক্স-কুন্তীরই তুলিবেন। ইহাদের বৃত্তিকে মূল্য দিয়া মনের অশান্তি ও প্রাণের অন্তঃসৃজন করিও না।

তোমাকে দীক্ষাদানকালে যে উচ্চারণ শুনাইয়াছিলাম, তাহা ঠিকই তোমার মনে আছে। তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়া যে মনে কর, তাহা তোমার ভ্রম। এই নিজিষ একবার শুনিলে কেহই সহজে ভুলিতে পারেনা বা ভোলা সাধারণ একটা কথা নয়। যাহা তোমার স্মরণে আছে, তাহার অনুরূপ ভাবেই তুমি নাম জপিয়া যাও, সাধন করিয়া যাও। ইহাতেই আমি তোমাকে সাধনে সাফল্য প্রদান করিব। তোমার জীবনে আমার আশীর্বাদের চেয়ে বেশী মূল্যবান জিনিষ আর কিছুই নাই। তুমি মন হইতে দ্বিধা দূর কর, সকল সংশয় পরিহার কর।

তথাপি আমার সহিত যদি আবার দেখা হয়, মনে করিয়া উচ্চারণটা আমার কর্ণে আবার শুনিয়া নিও। সম্প্রতি আমি নানা কারণে কিছুকাল ভ্রমণ করিতে পারিবনা বলিয়াই মনে হইতেছে। এই জন্মই তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎকারের একটু দেরী হইতে পারে। কিন্তু আমার সাক্ষাৎকার পাইবার একটা চমৎকার উপায় এবং স্থান আছে। সেই উপায়টী হইতেছে সমবেত উপাসনা আর সেই স্থানটী হইতেছে সমবেত উপাসনার আসন। সকলে যখন সমবেত উপাসনা-

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্য

[৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭২৪

কালে ব্রহ্মগায়ত্রী-গান ও হরি-৫-কীর্তন করিতে থাকিবে, তখন তাহাদের সকলের কর্ণের মাঝখানে তোমরা সুনিশ্চিত আমার কণ্ঠ উচ্চারিত ওঙ্কার শুনিতে পাইবে। আমার জীবৎকালেই এই ঘটনা হাজার হাজার স্থানে ঘটয়াছে এবং আমার দেহাবসানের পরেও অনন্তকাল ইহা হইতে থাকিবে। তোমরা ওঙ্কারের শুদ্ধ উচ্চারণের জন্ত অল্প কাহারও কাছে যাইও না, যাইবার প্রয়োজন নাই।

নারী যেমন স্বামীর জন্ত উন্মাদ হয়, তুমি তেমন আমার জন্ত উন্মাদ হইয়াছ। ইহার চাইতে সুখের কথা আর কি হইতে পারে? আমি অনন্তকোটি কল্পকাল নানা রূপে নানা দেহে আবিভূত হইয়া আমারই জন্ত উন্মাদ হইয়াছিলাম। কখনো রাম হইয়া, কখনো কৃষ্ণ হইয়া, কখনো বুদ্ধ হইয়া, কখনো শঙ্কর হইয়া, কখনো গৌরানন্দ হইয়া, আমি আমাকে ভজনা করিবার জন্ত পাগল হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলাম। ছুটিতে ছুটিতে আমি আমাকে পাইয়াও ছিলাম। কিন্তু ছুটার ভিতরে যে পরম সুখ আছে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ আন্বাদন করিবারই জন্ত আমি আমাকে সম্পূর্ণ রূপে পাইয়াও আবার বিরহ-দুঃখে জলিয়া মরিবার জন্ত কাতর ও কাঙ্গাল হইয়াছি। সুতরাং তুমি পাগল-প্রায় হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তোমার এই উন্মাদনা চিরস্থায়ী হউক, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

বারাণসী

১২ই আশ্বিন, ১৩৬৬

হরি-ওঁ

(৬২৮)

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমাদের সহরটাকে তোমরা পৃথিবীর
দর্শ্যশ্রেষ্ঠ স্থানে পরিণত করিবে। ইহা না করিয়া তোমরা ছাড়িবে না।
যাহা কিছু সম্মানের, শ্রদ্ধার, গৌরবের আছে, তাহার সব কিছুই তোমরা
তোমাদের ক্ষুদ্র সহরটীতে আমদানী করিবে এবং তাহাদের পরিপূর্ণ
দৃশ্যলীন করিবে। যাহাতে প্রত্যেকটি মানুষের মনে নিম্নত উচ্চ
উন্নতির উদ্দীপনা জাগিতে থাকে এবং এই উদ্দীপনা কিছুতেই স্তিমিত
হইবার অবসর না পায়, তাহা তোমাদের করিতে হইবে। সহরের
বৃক-সম্প্রদায়ের মধ্যে আজই কাজ আরম্ভ কর। আমি আমার সমগ্র
জীবন জুড়িয়া যুবকদের মধ্যেই কাজ করিয়াছি। কিন্তু এখন সেই
বল যুবকেরা প্রবীণ হইয়াছে এবং ভুলিয়া গিয়াছে যে আমার আরও
কাজ তাহাদের চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহারই নাম স্বাধীন পরি-
শোধ করা। তোমরা প্রবীণ সাজিও না। যুবকের উত্তম লইয়া তোমরা
কাছে রাখিয়া পড়।

কিশোর এবং যুবকদের মধ্যে আদর্শবাদ প্রচারের কালে অনেক
লোকই মনে করিয়া থাকেন যে তাহাদের ভিতরে কতকগুলি নূতন
নূতন অন্ধ বিশ্বাস প্রবেশ করাইয়া দেওয়াই খুব একটা বড় কাজ।
বড় কাজ ত ইহা নহেই, এমন কি ইহা কাজও নহে, ইহা অকাজ
তাহাদের খোলা চখে পৃথিবীর পানে তাকাইবার সাহস প্রদান করাই
আল কাজ। আমি যদি অন্ধ কুসংস্কার ঢুকাইয়া দেওয়ার কাজকে
স্বনন্দ কাজ বলিয়া মনে করিতাম, তাহা হইলে আমি জীবন ভরিয়া যে
অনেক লক্ষ বালক ও যুবকের সহিত নিজের ভাবের আদান প্রদান
পরিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে ইহাদেরই চেষ্টায় আমি কোটি ভোটে
কখন ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা পাইবার ব্যবস্থা কয়েম ও

পাকা করিয়া লইতে পারিতাম। ইহাদের আমি কেবল স্বাধীন বুদ্ধি পথই দেখাইয়াছি। ইহাদের শত শত কেন, হাজার হাজার বলিতে ভুল হইবে না, লক্ষ লক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাদের লক্ষ লক্ষ জনকে আমি আমার পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যানো পর মাস বৎসরের পর বৎসর কেবল শুনাইয়াছি আত্মশক্তির দ্বৈত বাণী। সেই অশরীরী বাণী অনেক ঘুমন্তকে জাগাইয়াছে, তাহার প্রমাণ জালালাবাদ পাহাড়ের পাথরের স্তূপে স্তূপে রক্তের অগ্নরে এক লিখিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ আজিও বাংলার দুই চারিজন অসাধারণ মনীষীর জীবনে রহিয়া গিয়াছে। তাহার প্রমাণ ভারতের এক অতি শ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগী মরণজয়ী পুরুষের জীবনের মধ্যে রহিয়াছে। আমি তেমন গান গাহিতে চাহিয়াছিলাম, যে গান শুনিয়া যুগ্ম জাগিয়া উঠিবে, কঠোরতার প্রচণ্ড তাড়নে ভাঙিবে গড়িবে কিন্তু যে কোন্ গোপন পুরে বসিয়া রাগিনী আলাপ করিয়া গেল, তার অনুমানেও না আনিতে পারে, তাই আজ আমি তাহাদের পুণ্য নাম সমূহ উচ্চারণ করিয়া তোমাদের শুনাইতে চাহি না। কিন্তু ইহা চাহি যে, আমি যাহা করিয়াছিলাম, আমি যাহা করিতে যাইয়া সকল কাজকে তুচ্ছ করিয়াছিলাম, আমি যাহা করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলাম, তোমরা সেই কাজটীতে হাত দাও। তোমরা আমার বাহ হও, এই কথাটা বহুবার বলিয়াছি, আবার তাহা উচ্চারণ করিতেছি।

তোমরা যদি কাহারও ভিতরে কোনও নবভাবের উন্মেষ করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমাদের নিজের জীবনকেও তেমন করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। অপরের হিতসাধন যে কেবল অপরেরই হিতসাধন নহে, পরন্তু নিজেরও হিতসাধন, নিজেকেও গড়িয়া তোলা, নিজেকেও আদর্শের ডাকে উদ্ধাম গতিতে পরিচালিত করা, নিজের শত সহস্র ক্রী

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৭২৭

ও অসম্পূর্ণতা বিদূরিত করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব ও সত্যমুন্দর হওয়া, ইহা তোমরা
কেহ ভুলিয়া যাইও না।

আমি ছোটদের লইয়াই আমার কাজ শুরু করিয়াছি। বয়সে ছোট,
জ্ঞাতিতে ছোট, শিক্ষায় সংস্কৃতিতে ছোট, আর্থিক সম্বন্ধে ছোট,—
ইহারা চিরকাল আমার কর্মের ক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। তথাকথিত
বড়দের মধ্যে অনেকেই সত্য সত্য বড় অবশ্যই থাকিতে পারেন, কিন্তু
বড়দের মধ্যে আমি মাথা গলাইতে যাইনাই, তাহার প্রয়োজন অনুভব
করি নাই, তাহা করিবার অবসর পাই নাই। আমি যাহাদের নিয়া
কাজ শুরু করিয়াছিলাম, তাহাদের সম্পর্কে কাজ আমার সম্পূর্ণ হইয়া
গিয়াছে, এমন কথা বলিবার দিন আসে নাই। বরং ইহাই বলিব যে,
বড় হুকু কাজ কবা হইয়াছে, তাহার লক্ষ লক্ষ গুণ কাজ অবহেলায়
পড়িয়া রহিয়াছে। তোমরা আসিয়া হাত লাগাও সেই অসম্পূর্ণ বিরাট
বিশাল কাজে।

কাজকে তোমরা আড়ম্বরের সহিত অভেদ বলিয়া মনে করিও না।
অধিকাংশ সময়ে আড়ম্বরকেই কাজ বলিয়া ভ্রম করা হয়। তাহার
চাইতেও মারাত্মক ভ্রম মানুষের এই যে, কথা বলাকেই তাহারা কাজ
বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আড়ম্বরকে আমরা চলিত কথায় বলিয়া
থাকি হুজুগ সৃষ্টি করা। কথা বা হুজুগ, দুইটা জিনিষেরই নিশ্চিত এক
একটা সম্মানযোগ্য স্থান আছে, যাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।
কিন্তু আসল কাজের দিকেই আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে
চাহিতেছি।

মানবাত্মার মুক্তিই তোমাদের কাম্য। কোন্ অবতারের পূজা
ব্যবহৃত হইল বা না হইল, তাহার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। তোমরা

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৫ সংখ্যা]

৭২৮

মানবের আত্মার মুক্তির দিকে তাকাইয়াই তাহাকে যাবতীয় উপদেশ ও প্রেরণা দিবে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২৯)

হরি-ওঁ

পুপুন্যী আশ্রম

১৩ই আশ্বিন, ১৩৬৪

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া খুশী হইলাম। তুমি আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি নূতন লোক, তবু তোমাকেই হয়ত পাহাড়ের কাজের ভার দিয়া আগামী শীতে পাঠাইতে পারি। তুমি কি-সেই কাজ সম্পর্কে নিজ দায়িত্ব স্বরণ করিয়াছ?

কৃতকগুলি বিষয়ে তুমি খুবই কাঁচা বা নূতন আছ। তুমি কি তোমার যোগ্যতা পূর্ণ করিয়া লইবার জন্ত অগ্রত গিয়া থাকিতে পারিবে? অনেকেরই ত ঘরের মায়া বড় বিষম মায়া।

তোমার পত্রে অশেষ ভক্তিভাব রহিয়াছে। আমি তোমার পত্র পাঠ করিয়া খুশীই হইয়াছি। কিন্তু একটা কথা কি জানো? চিঠিপত্রে অনেকেই ভক্তিভাব দেখাইয়া থাকে, কাজের বেলায় কিন্তু তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। যে বাহাকে ভক্তি করে, সে তাহার সহিত প্রতারণা করে না। যে বাহার প্রতি ভক্তিশীল, সে তাহার সহিত কপটতা করে না। আমি চাহি এমন কর্মী, যে পাহাড়ে গিয়া

সদায়ে কাজ করিয়া আসিবে, যে একটি পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গেও কোনও
চপলতা করিবে না, যে ভ্রমণের যাবতীয় টাকাকড়ির হিসাবপত্র নিয়মিত
ভাবে এবং সন্দেহাতীত সততার সহিত রক্ষা করিবে, বাহার হাতে
একটি পয়সারও অপব্যয় হইবে না, যে অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে
গিয়া নিজেকে জাহির করিবার জন্ত বা কৌশলে নিজে গুরুদেব
সাজিবার জন্ত কোনও চেষ্টা করিবে না, যে সহকর্মীদের সহিত আন্তরিক
সৌহার্দ্য ও প্রীতি রক্ষা করিবার প্রয়োজনে অনায়াসে নিজের মান,
বশ, স্বার্থ আদি ত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে। তাহা তোমার
পক্ষে সম্ভব হইবে কি? যদি হয়, তবে পত্র দিও, আমি তোমাকে
যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা দিয়া তৈরী করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিব।
নিজেকে না গড়িয়া লইয়া প্রচার-কার্য্যে হাত দিতে গেলে পচা শামুকে
পা কাটিয়া বিল্টাট ঘটে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩০)

ধর্ম-ও

পুণ্যনুশী আশ্রম

১৩ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।
তোমার নামে বিশ্বাস আছে, ভগবানে নির্ভর আছে, পরিগৃহীত
দামনে অটুট অহরহাগ আছে। তাই তুমি তোমার জীবনের এমন সকল
টানা বর্ণনা করিতে পারিলে। ইহার যে এক বিন্দুও মিথ্যা নয়, তাহা
আমি জানি।

তোমার বৈধব্যের ঠিক পরদিনটাতেই তোমাকে দীক্ষা দিয়া আপন করিয়া লইয়াছিলাম। দীক্ষার যে কি শক্তি, তাহা তুমি সেই দ্বিধা জীবনে সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছিলে। আমি বাহ্য চিরজীবন সাধন করিয়াছি, তাহাই তোমাকে দীক্ষামূলে প্রদান করিয়াছিলাম। কি সাধ্য আছে যে দীক্ষা তোমার জীবনে অসাধারণ কিছু করিবে না? সেদিন তোমার বান্ধব কেহ ছিল না, সেদিন তোমার পরিজনেরাও তোমাকে ভয়ের বস্তু বলিয়া মনে করিয়াছিল, সেদিন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কাছে থাকিলে তোমার দীক্ষায় বাধা সৃষ্টি করিতেন। কিন্তু তোমার পথ তোমাকে আমার কাছে টানিয়া আনিল, আমি দ্বিধাহীন মনে তোমাকে আপন করিয়া লইলাম। তুমি যে সেইদিনের কথা স্মরণ করিয়া এত পুলকিত ও কৃতজ্ঞ হইতেছ, তাহাতে আমার অগাধ আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে।

তারপরে আজ দুইটি যুগ চলিয়া গিয়াছে। প্রাণের আনন্দে তুমি তোমার সাধন করিয়া যাইতেছ। তোমার জীবনে ভগবানের রূপ যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে কে না পুলকিত হইবে! বিরাট পড়ো বাড়ীতে একটা বুদ্ধা শ্বাশুড়ী লইয়া বংশের ধারাতুকে পাহারা দিয়া যাইতেছ, কাহারও একটা সন্তান নাই, তু' বিষার বৈদ্য জমি নাই, তবু তোমরা তোমাদের গুরুদেবের জন্মোৎসবের দিনে কাহারও কাছে কিছুমাত্র না চাহিয়া না যাচিয়া একটা অঘটন ঘটাইলে, ইহাতে এক দিকে ভগবানের মহিমা প্রকাশিত হইতেছে, অতীতকালে ভক্তেরও মহিমা প্রচারিত হইতেছে। তবে তোমার বৈদ্য সকল গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী তোমাকে কাজে নামাইয়া দিয়া শেষ বলিলেন, আজ উৎসব হইবে না, তাহারা বড়ই অপ্রতিভ হইল, এই

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম

প্রতিধ্বনি

৭৩১

টুকুই মাত্র আফশোসের বিষয়। ভবিষ্যতে তাহাদের ভরসায় কোনও কাজে নামিও না মা।

অমাবস্তার রাত্রে ভীষণ ঝড়ের মাঝে তোমার হাতের বাতি নিবিয়া গেল, তুমি আর্ন্ত চীৎকার করিয়া মানুষের সাহায্য চাহিলে না, চাহিলে পরমপ্রেমময় প্রাণপ্রভুর দয়া আর বিনা দেশলাইতে আপনা আপনি বাতি আবার জলিয়া উঠিল, ইহা ইন্দ্রজাল বা তোমার চোখের ভুল নহে। ইহাই হয়। তবে এই সকল কথা লোকের কাছে প্রচার করিও না। তুমি ইহা সত্য বলিয়াই জানো, কিন্তু অতুলে বলিবার দরকার নাই। এই সকল ঘটনা আমার কোনও মহিমাতে হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। অলৌকিক ব্যাপার প্রচারের মধ্যে একটা গুরুতর ত্রুটি এই রহিয়াছে যে, যে যাহা দেখিয়াছে, সত্য সত্য তাহারই প্রচার আরম্ভ করিয়া দিলেও অজ্ঞাত-গারে অনেক উপরন্তু কথা আসিয়া সংযোজিত হইয়া যায়, কোটি মুদ্রা মূল্যের হীরার টুকুরোটি ভেজাল মিশিয়া আকারে অনেক বড় হয় কিন্তু তাহার দাম কমিয়া হয় কাণাকড়ি।

কেবল সাধন করিয়া যাও মা, জীবনে আরও শত শত অনুভূতি আসিবে। স্বপ্ন নহে, কল্পনা নহে, সত্য অনুভূতি অন্তরে জাগিবে, নরেক্রিয় দ্বারা তাহাকে সত্য বলিয়া পাইবে, চিরন্তন সত্য তোমার বোধগম্য ভাবে তোমার কাছে ধরা দিবে। কেবল সাধন করিয়া যাও। বিরাট বংশের পরিত্যক্ত ঐ বিশাল শূন্য দেউলে একাকিনী বসিয়া বাহার প্রহরা দিতেছ মা, সে কিন্তু তোমার পরমপ্রেমময়ের অফুরন্ত প্রেম। সেই প্রেম তোমার ইহপরজীবনকে পরিষিক্ত করিয়া দিয়া

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭৩২

তোমাকে সার্থক করিতে আসিতেছে। বিভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাহারই অগ্রসূচনা মাত্র। বিভূতির মোহে মজিও না।

শৃগ ঘরের ঘরনী হইলেও তুমি মা ঘরের বউ। তোমার বর বিয়াল্লিশ পার হইলেও তুমি এখনো ঐ বংশের বধূ মাত্র। তুমি নান-স্থানবর্তী তোমার গুরুভাইদের সহিত অত্যন্ত সংশ্রব করিও না। তাহাদের সহিত নিজের স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রাখিয়াই চলিও। নিজেকে যে সুরক্ষিত রাখে, সে অত্মকে রক্ষার যোগ্যতা অর্জন করে। তুমি আধুনিক অসভ্যতা ও হট্টগোলের অনুসরণ করিও না।

পুনরপি আশীর্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩১)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৩ই কা্তিক, ১৩৬০

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রতিবেশীদের মনে যদি সব বিরুদ্ধ সংস্কার থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে নিজের মনের ভাব একাগ্র রাখিয়া চলা কঠিন হয়, ইহা অতি সত্য কথা। বিশেষ করিয়া আবার যদি নিজ পরিবারের লোকদেরই সংস্কার হয় বিপরীত, তাহা হইলে সাধন করিবার পথে পদে পদে আসে বাধা। তাই তাহা আরও মারাত্মক। কিন্তু আমার সন্তানেরা হতাশ হইবে না কোনও কিছুতেই। তাহাদের এমন অতুল

ঐশ্বর্য ও পরিণামে স্বপথের জয়ে এমন অসাধারণ বিশ্বাস থাকা দরকার, যেন ইহারই বলে তাহারা সকল বিঘ্ন পদতলে চাপিয়া আগাইয়া বাইতে পারে। তোমরা অপরের সংস্কারে আঘাত না হানিয়া নিজের পথে নির্ভীক মনে অবিচলিত চরণে চলিতে থাক।

তোমরা প্রতিজ্ঞনে সাধনে এমন ভাবে অনুরাগী হও, যেন তোমাদের নিষ্ঠা অপর শত শত জনের মনকে আপনা আপনি সাধনপথে টানিয়া আনে। সকলকেই তোমারই পথে আনিতে হইবে, এমন উচ্চাশা বা হ্রস্বকাজ্জ্বার কোনও প্রয়োজন নাই। যে যেই পথে আছে, সে সেই পথে থাকিয়াই তোমার নিষ্ঠা ও সাধনানুরাগ দেখিয়া নিজের পথে আগাইয়া বাইবার জন্ত যেন আগ্রহবান্ হয়। সকলকে নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্ত কোনও চেষ্টা না করিয়া বা কোনও আকাজ্জ্ব না রাখিয়াও সকলকে সাধনানুরাগী করিতে হইবে, ইহাই হওয়া চাই তোমার জীবনের অসাধারণ বিশেষত্ব।

নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া শত শত নরনারীর জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিবার নামই আদর্শ-প্রচার। আমাকে জনসমক্ষে বড় করিয়া গরিবার তোমাদের কোনও প্রয়োজন নাই, আদর্শই জগৎসমক্ষে বড় হইয়া উঠুক। আমাকে যদি পৃথিবীর লোকে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে কাহারও কোনও ক্ষতি হইবে না কিন্তু আদর্শ যদি ভুলিয়া যায়, তবেই তাহা ক্ষতি হইবার হইবে। যোগ-বিভূতি জগতে লক্ষ লক্ষ সাধকের জীবনে দেখা গিয়াছে কিন্তু তাহার বর্ণনা দ্বারাই মানুষের মনকে পাপ-বৃত্তি, ক্রোধমুক্ত, পাশমুক্ত করা যায় না। আমার জীবনেও যদি যোগ-বিভূতি কেহ কিছু দেখিয়া থাক, তবে তাহাকে চাপিয়া ধাও। আমি সেই মহান্ আদর্শের প্রতিনিধি, তাহার প্রচারেই তোমরা কর দায়নিয়োগ।

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭৩৪

সকল মত ও সকল পথের সাধকদের প্রতি থাকিও শ্রদ্ধিত ও সম্মান। কাহারও মত-পথকে আক্রমণ করিয়া তোমার অগ্রগতির পথ নহে। তোমার পথ বিশ্বজনের সহিত অবিচ্ছেদ প্রেমের গথ। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩২)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১০ই কার্তিক, ১৩৯১

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ জানিও।

আমি ত চাহি যে, তোমাদের মধ্য হইতে অসাধারণ কর্মী সমূহের আবির্ভাব ঘটুক। যাঁহারা কর্মী বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই কাজ না করিয়া কর্মী হন নাই। তোমরাও প্রত্যেকে কাজ হাতে নাও। কাজ না করিয়া কেবল দিস্তায় দিস্তায় কাগজ লিখিলেই কর্মী হইতে পারিবে না। তোমরা অকারণে পত্র লেখা ছাড়িয়া দাও। আমার পক্ষে জীবন ভরিয়াই পত্র লেখা সুসম্ভব ব্যাপার নহে। আমি তোমাদের একজনকে একখানা পত্র লিখিলে তাহার দ্বারা দশজনে লাভবান হইবার চেষ্টা করিবে, ইহাই সর্বত ব্যবস্থা। তোমাদের কাহাকেও একদিন একখানা পত্র লিখিলে তাহার সহায়তায় হাজার বছর ধরিয়া কাজ চালাইবে, ইহাই আমি চাহি। তোমরা পত্র-লিখনকে একটা বিলাসিতার পর্যায়ে নিয়া ফেলিও না।

অন্তরে প্রেমামুণীলন থাকিলে কথার প্রয়োজন কমিয়া যায়। কথা
 বনারশুক নহে কিন্তু কেবল কথারই ব্যাপার চালাইতে থাকিলে সেই
 কথার কোনও দামই থাকে না। প্রেম আসিলে অল্প কথায় কাজ
 হয়। কেবল বিনাইয়া বিনাইয়া সাহিত্য-রচনা পত্র-লিখনের উদ্দেশ্য
 হইতে পারে না। সাহিত্য-রচনার জন্ত যেই সকল পত্র লিখিত হয়,
 তাহার মধ্যে কাজ করিবার প্রেরণা কমই থাকে। তোমরা সুদীর্ঘ
 পত্র দিয়া আমাকে অনেক সময়ে যে বিরক্ত করিয়া থাক, তাহার
 প্রধান কারণ এই যে, তোমরা মনে কর যে, অল্প কথা কহিলে আমি
 তোমাদের বক্তব্য বুঝিতে পারিব না। আধুনিক উপন্যাসের মনস্তত্ত্বের
 মতন পত্রকেও চিবাঁইয়া চিবাঁইয়া অসামান্য এক সাহিত্য-কীর্তি করিবার
 চেষ্টার মধ্যে একটা অসাধারণ রকমের আত্মপ্রতারণা রহিয়াছে।
 তোমার পত্রের ভাষা খুব অসাধারণ হইলে বা তাহার শব্দ-বিত্যাস
 অতিশয় অভাবনীয় হইলেই তাহা যে কাজের বেলায় অসাধারণ বা
 অপূর্ণ বলিয়া গণিত হইবে, ইহার কি কোনও স্থিরতা আছে?
 সেনাধ্যক্ষকে কেহ আলঙ্কারিক ভাষায় মার্চ করিবার অর্ডার দিতে
 পারেন নাই, সহজবোধ্য আদেশ না হইলে সৈনিকের দল তাহা পালন
 করিয়া উঠিতে পারে না। তোমরা বাহুল্য বর্জন করিয়া চলিতে শিক্ষা
 কর। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩৩)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৪ই কার্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি এক স্থান হইতে অগ্র স্থানে বদলী হইয়া আসিয়াছ, ইহা আমি ভগবানেরই আশীর্বাদ মনে করি। পূর্বতন স্থানে এক ভাবে আদর্শ-প্রচার করিয়া আসিতেছিলে, এখন নূতনতর পরিবেশে নূতন ভাবে তোমাকে আদর্শ-প্রচার করিতে হইবে। তাহার জন্ত তোমার চাই আদর্শ জীবন। আশীর্বাদ করি, তাহা তোমার লাভ হউক।

নূতন পরিবেশে যে পড়িয়াছ, তাহা ত স্থানে প্রবেশমাত্রই উপলব্ধিতে আসিয়া গিয়াছে। তোমার মন্ত বা পথ যে হয়, অপরের মন্ত বা পথ যে শ্রেয়ঃ, তাহা শুনিয়াই তোমার যাত্রা শুরু হইল। এই অবস্থাতে তোমার প্রয়োজন হইবে অসাধারণ সংযমের। অস্ত্রেরা নিজ মতকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্ত তোমার মতকে নিকৃষ্ট বলিতে যখন বাধ্য হইতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে, যে, তাঁহাদের নিজের মতের নিরপেক্ষ মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলিবার মতন কিছু নাই। বাহা ভাল, তাহা অগ্র সব মন্দ না হইলেও, ভাল হইতে পারে। তুমি অগ্র মত-বাদীদের নিজ নিজ ইষ্টনাম ব্যাখ্যার মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিও না। অপরের ইষ্টনামের কি অর্থ, কি ব্যাখ্যা, কি বিশদ ইঙ্গিত, তাহা নিয়া নিজেকে মন্ত করিও না। তোমার ইষ্ট-নাম সম্পর্কে তুমি বাহা জান, তাহা নিয়াই তুমি সন্তুষ্ট থাকিতে পার। অপরের নিকটে ওঙ্কারের অর্থ, ব্যাখ্যা, মহিমাকীর্তনেরও তোমার প্রয়োজন নাই।

নিজের সাধন লইয়া নিজে পাক। অত্ৰ মত-পথ-মন্ত্র-তন্ত্রকে নিন্দা না
করিয়া যে নিজের পথে নিজের মতে নিজের সাধনে অবিচলিত বিক্রমে
চলা যায়, তোমরা তাহারই দৃষ্টান্ত-স্থানীয় হও।

তুমি লিখিয়াছ যে, কোনও এক মন্ত্রের সাধকেরা ওঙ্কার মানেন না।
নাই বা মানিলেন। তাঁহাদের মানিবার প্রয়োজন নাই, তাই মানেন না,
তোমার প্রয়োজন আছে, তুমি ত মানিতেছ। তাহাতেই ত হইবে।
ওঙ্কার বাহার মানেন না বা জ্বীলোক ও শূদ্রকে ওঙ্কারের সাধন হইতে
বাছিয়া বঞ্চিত রাখাই পরম ধর্ম বলিয়া মনে করেন, এমন ব্যক্তিদের
কিছু ওঙ্কারসংযুক্ত নামধারণ করিয়া লোকসমাজে পরিচয় দিতে
দেখা বাইতেছে। ওঙ্কারমন্ত্রে দীক্ষা পাইবে আশা করিয়া কেহ
কেহ ইহাদের নিকটে গিয়া হঠাৎ অত্ৰমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া
উবেগ ও মনস্তাপ নিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন
প্রত্যক্ষ ঘটনাও আমি নিজে জানি। তুমি লিখিয়াছ, কেহ
কেহ ওঙ্কারের চেয়েও বড় এক মন্ত্রের কথা বলিতেছেন।
বেশ ত, যিনি যেই মন্ত্রে সাধন করেন, তিনি সেই মন্ত্রকেই
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করুন, ইহা ত ভালই। যতক্ষণ তিনি তাঁহার নিজ সাধনার
ক্ষেত্রেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার এই বক্তব্য
কিছুই কহিবার নাই। কিন্তু তোমাকে তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করি-
বার জন্ত যদি বাগ্‌জাল-বিস্তার হইয়া থাকে, তবে তাঁহার সহিত এই
বিষয়ে আলোচনা বর্জনই-উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহাকে তাঁহার নিজ মত
হইতে স্থলিত করিবার জন্ত তোমার কিছুই করিবার নাই। কারণ,
নিজের মত ও নিজের পথ অনুসারে জগতের প্রতি জনকে চলিতে
দিবার স্বাধীনতা তুমি দিবে। অন্ধ গোঁড়ামীর তুমি উপাসক নহ।
নিজ নিজ গুরুদেবকে বা গুরুদেবস্থানীয়কে অবতার বলিয়া প্রচার

করিবার একটা আসাধারণ ঝাঁক ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বাংলাদেশেই এই হাওয়াটা একটু প্রবলতর মনে হয়। কেহ অবতার হইতে চাহিলে তাঁহাকে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ বলিয়া প্রমাণ করিতে হয়। নতুবা অবতার-বাদে বিশ্বাসীরা হয়ত বা কল্কে দিবেন না। ইহা অবতার-পূজকদের এক বিষম দুর্বলতা। শ্রীকৃষ্ণ মানবতার যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, হয়ত ভারত ইহার চাইতেও বলিষ্ঠতর আদর্শের উপাসনা করিতে চাহে। শ্রীরামচন্দ্র যে লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাহার চাইতেও হয়ত স্বচ্ছতর লীলার উপাসনা ভারতবাসী করিতে চাহে। এই সম্ভাবনার কথাটা বাহারি বেমালুম ভুলিয়া যান, তাঁহারা অবতার বলিয়া কাহাকেও প্রচার করিবার কালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বা শ্রীরামের সহিত তাঁহাকে অভেদ করিবার চেষ্টা করেন। পরমপুরুষ আদি কথাগুলি এই ভাবেই আধুনিক মহাপুরুষদের সম্পর্কে তাঁহাদের ভক্তদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে। ভক্তেরা নিজ নিজ গুরুদেবকে যেমন খুশী ডাকিতে পারেন, ইহারই জন্ত দেখিতেছি যে একজন মহাপুরুষ সম্পর্কে পরমপুরুষ কথাটি প্রযুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক মহাপুরুষের ভক্তেরা তাঁহাদের নিজ নিজ গুরুদেবের সম্পর্কে পরমপুরুষ কথাটির ব্যবহার শুরু করিয়া দিয়াছেন। অনেককাল আগের কথা, আমি নাটঘর গ্রামে গিয়াছিলাম। নাটঘরের পার্শ্ববর্তী কোনও গ্রামের যুবকেরা আমাকে সাধক পুরুষ বলিয়া মানিতে অস্বীকার করে। আমি এই বিষয়ে তাহাদের সহিত এক কথায় একমত হই। স্বাধিকারে বিখ্যাতসাধক হরিষ-সাধু তখন সগর্বে সোম্লাসে যুবকদিগকে বলিয়াছিলেন, “তোমরা ইঁহাকে সাধক বলিয়া না মানিতে পার, কিন্তু ইনি পুরুষোত্তম।” উক্ত যুবকেরা যথানত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আমি হাসিয়া হরিষ সাধুকে জিজ্ঞাসা

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

ধ্বং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৭৩৯

করিয়াছিলাম, আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া ডাক দিলে ত আমি ছোট হইয়া গেলাম গো, আমাকে প্রকৃতিপুরুষোত্তম বলিয়া ডাকা উচিত। আমি প্রকৃতিরও উত্তম, পুরুষেরও উত্তম। সাধকেরা নিজ নিজ সাধনের এক একটা অবস্থায় নিজেদের মধ্যে কোটি বিধের স্রষ্টারও স্রষ্টাকে দেখিয়া থাকেন। তখন তিনি পুরুষোত্তম, তখন তিনি প্রকৃতি-উত্তম, তখন তিনি প্রকৃতি-পুরুষোত্তমোত্তম। সাধকেরা অনেকেই ইহা নিজ নিজ সাধন-জীবনে অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তেরা যদি কেবল মল-বুদ্ধির জন্ত বা নিজ গুরুকে শ্রেষ্ঠ ও অপরের গুরুকে নিকৃষ্ট দেখাইবার জন্তই এই সকল শব্দ ব্যবহার করেন, তবে তাহা মতাজ্ঞ প্রচারক ও কক্ষচ্যুত গ্রহের যোগ্য হইবে। অত্বেরা নিজ নিজ গুরুদেবকে লইয়া কে কি করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া তোমরা সময় নষ্ট করিও না। প্রকৃত গুরু স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর প্রভৃতির অবতার বলিয়া প্রচার করার ভিতরে কোনও মার্ককতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

উপাসনাকালে তোমার যেই সকল উৎকৃষ্ট ভাবের আবেশ আসে, তাহা তোমার অগ্রগতির সূচনা করিতেছে। কিন্তু এই সকল বিষয় দৃষ্টকে বলিও না। বলিতে গেলেই অহং-মহারাজ ফুলিয়া ওঠেন এবং নানা বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটাইয়া বিপাক সৃষ্টি করেন। অহংকে যতই চাপিয়া রাখিতে পারিবে, ততই তোমার সাধনের অনুকূল অবস্থা বাড়িবে। নিম্নে অসহায় শিশুর মতন জানিয়া নিয়ত ভগবানের নাম করিতে থাক। ভগবানের দয়াকে নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ আশ্বাদন করিবার জন্ত যমিয়া হইয়া ওঠ। আমার প্রাণভরা প্রেম লও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম

[৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭৪০

(৬৩৪)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৪ই কার্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশির্বাদ জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। তোমরা যে নিজের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দিয়া ছোট ছোট ছেলের উপরে বড় কাজের ভার অর্পণ করিয়া পিছনে থাকিয়া তাহাদের কেবল সহায়তাই করিয়া বাইতেছ, ইহাতে কি যে আনন্দিত হইয়াছি, বলিবার নহে। নেতৃত্বের মোহে মানুষ আসল কাজকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। তোমরা ছোটদের মধ্যে তোমাদের অধিকার নিজ হাতে বিতরণ করিয়া দিয়া তাহাদের মধ্যে যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ বাড়াইয়া দিয়াছ। তোমাদের এই দৃষ্টান্ত দেশের রাজনৈতিক নেতারা অনুসরণ করিলে দেশ লাভবান হইত।

দেখ বাবা, আমি একটা কথা বুঝি। তাহার নাম কাজ। কাজ যদি হয়, তবে যে ইচ্ছা নেতা হউক গিয়া। কাজ হইবে না, কেবল কর্তালি আর মোড়লি চলিবে, কেবল ফাই-ফরমাইস খাটাইয়া কর্মীদের মনে জালা ধরাইয়া দেওয়া হইবে, মানুষকে মানুষ বলিয়া না মানিয়া দলের বিচারে তাহাকে ছোট বা বড় করা হইবে, যে যত অধিক কুটবুদ্ধি, সে তত অধিক ক্ষমতা সন্তোষ করিবে, ক্ষমতাকে জনসেবার জন্ত ব্যবহার না করিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র ও সাময়িক স্বার্থের প্রয়োজন প্রয়োগ করিবে, ইহা অতিশয় অবাঞ্ছিত অবস্থা। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেম।

প্রতিধ্বনি

৭৪১

প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ এই যে, দেশের মাথাগুলি এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ও অভিভূত। কিন্তু সেই সকল মাথা কাটিয়া ফেলিয়া চিকিৎসা করিবার দুঃসাহস কাহারও নাই, তাই আমাদের কাছে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ভাবে ইহার প্রতিবিধান করিয়া আস্তে আস্তে দেশের আবহাওয়ার পরিবর্তন করিতে হইবে। অন্ততঃ ধর্মসংঘগুলিতে চরিত্রের বিনয় ইহা করিতে দিবে না বলিয়া আমি আশা করি। অনেক সময়ে আমরা দুঃশাসাও যে করিয়া থাকি, তাহা ঠিক, তবু আমি আশা করি। অবশ্য ইহাও অতিশয় সত্য যে, আমরা ধার্মিক-নামধারী লোকেরাই যে জগতের সেরা ধার্মিক, তাহা নহে। ভগবানকে প্রভু জানিয়া যে অপরের প্রতি ভগবানের সন্তানের প্রাণ ব্যবহার করে, সেই ধার্মিক। আমরা সকলে তেমন ধার্মিক হইতে চেষ্টা করি, এস ইহা আমাদের সাধনা হউক।

তোমাদের মণ্ডলীর নবনির্বাচিত ছোট ছোট ছেলেরা কাজ যে ভাল ভাবে চালাইতেছে, ইহা তোমার পক্ষে অবগত হইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। ইহাদের প্রতিজনকে অহমিকার কবল হইতে রক্ষা করিয়া চলিও। চারা গাছে বেড়া দিতে হয়। অহংকারের ধাক্কায় ইহাদের না ভালপালা ভাঙ্গে, তাহার দিকে লক্ষ্য দিও। ইহাদের যেমন সার-গোবর অর্থাৎ উৎসাহ ও প্রশংসাধারাবর্ষণাদি দ্বারা পরিপোষণ করিতে হইবে, তেমন আবার ইহাদের অগ্রায় করিবার প্রবৃত্তি দেখিলে তাহা কাঁচি দিয়া কাটিয়াও দিতে হইবে। সেই কাঁচিতে প্রেমের মধু মাখান থাক। চাই। ইতি—

আশীর্বাদক

অরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম।

[৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭৪২

(৬৩৫)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৭ই কার্তিক, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্বাদ জানিও।

তোমাদের পত্রগুলি পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আশ্রম হইতে প্রেরিত ফুলের বীজগুলি হইতে চারিদিকে ঘরে ঘরে ফুল ফুটিতেছে এবং সেই সকল ফুলে সাধারণ বীজ অপেক্ষা অনেক বেশী বিচিত্রতা দেখা যাইতেছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আশ্রমে চেষ্টা করা হয় যে নানা রকমের অসাধারণত্ব-মণ্ডিত ফুলের বীজ উৎপাদিত হইতে পারে। আশ্রমকে নিজের পায়ে দাঁড় করাইবার জন্ত যখন নানা উপায়ের অনুসন্ধান করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ ফুলবীজ উৎপাদনের ব্যাপারটা প্রাধান্য পাইয়া গেল। সেই অবধি ইহারই দ্বারা পুপুনরী আশ্রমের প্রধান ব্যয়গুলি চলিয়া আসিতেছে। তাই পুপুনরীতে ইহারই চেষ্টা চলিতেছে যে প্রতি বৎসর কি করিয়া ফুলের বীজের মধ্যে নানা বিশিষ্টতা সঞ্চারিত করা যায়। এক সময়ে আমি ত একেবারে বৈজ্ঞানিকের মতন নিষ্ঠা ও নীতি লইয়া এই কাজে হাত দিয়াছিলাম। আমার বহু বৎসরের শ্রম যখন সাফল্যমণ্ডিত হইল, তখন পুপুনরী উৎপাদনই আশ্রমে একটা বড় কাজ হইয়াছে। ভারতের অনেকগুলি বিখ্যাত বীজ-ব্যবসায়ী পুপুনরী হইতে বীজ নিয়া থাকেন। যে বীজ বেশী পড়িয়া থাকে, তাহাই আমি এক এক বৎসর এক এক জায়গায় উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়া থাকি। তোমাদের ওখানে যে ফুল বীজ

অগ্রহারণ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৭৪৩

পাঠাইয়াছি, তাহার আসল উদ্দেশ্যই ত হইল এই যে, ঘরে ঘরে ফুল
হুটুক, আর বিশ্বস্ততার প্রতি মানুষের মন ভক্তিতে আশ্রুত হউক।
মূলের মতন ভক্তি-বর্ধক জিনিষ কমই আছে। আর, যে-কোনও
উৎসাহ লইয়াই হউক, ভক্তির অধিকারী হইবার মতন সৌভাগ্য
আর কিছুতে নাই। তোমরা তোমাদের প্রাণমন ভক্তিরসে অভিষিক্ত
করিয়া সার্থক-জন্মা হও, ইহাই আশীর্বাদ করি।

তোমরা সর্বদা ভগবানের নামের মধ্যে নিজেদের সমগ্র সত্তাকে
ভুগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিও। বাহা করিলে ইহাতে সহায়তা ও
উৎসাহ বাড়ে, তাহাই তোমাদের করণীয়। বাহা দ্বারা ভগবানের কাছ
হইতে মন দূরে সরিয়া আসে, তাহা হইতে তোমরাও দূরে সরিয়া
থাকিও।

তোমরা এমন জীবন যাপন করিতে থাক, বাহা সকলের
সম্প্রদায়িক। তোমরা সকল জীবের বান্ধব হইতে চেষ্টা কর।
তোমরা সকলের সুখে সুখী হও, তোমরা সকলের মধ্যে প্রকৃত আনন্দের
পরিবেশনে সহায়তা কর। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩৬)

ধরি-ও.

বারাণসী

১৮ই কার্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু:—

মেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস
নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। ওখানে তোমার সমসামক আর কে কে কোথায় আছে, তাহার খোঁজ লইতে চেষ্টা করিও। এমন বিচিত্র নহে যে, সব চাইতে অপ্রত্যাশিত স্থানটাতেই তুমি সব চাইতে বেশী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়টিকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

যে-কোনও সমসামকের সহিত পরিচিত হইবার পরেই একটি বিষয়ে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য দিবে, তোমার মঙ্গল যেন তাহার এবং তাহার মঙ্গল যেন তোমার জীবনকে সুনীতি, সদাচার, সততা ও সাধনের পথে অধিকতর পরাক্রম প্রদান করে। কেবল আত্মীয়তা করিবার জন্ত গুরুভাই খুঁজিয়া বেড়ান কোনও কাজের কথা নহে। অনেক স্থানেই দেখিতেছি যে, গুরুভাই গুরুভগিনী খুঁজিয়া বাহির করিয়া ভাইফোঁটার ভোলা-পানীয়ই সংগৃহীত হইতেছে, উভয় পক্ষের মিলনে জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্ত, অজ্ঞান নাশের জন্ত, অপ্রেম অশান্তি প্রশমিত করিবার জন্ত, বিশেষ করিয়া অন্তরের স্বচ্ছতা সাধনের জন্ত ও ভগবানের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ বৃদ্ধির জন্ত চেষ্টা হইতেছে না। অনেক স্থানেই গুরুভাই খুঁজিয়া নিয়া কেবল ব্যবসায় আর বাণিজ্যের আলোচনাই হইতেছে। তাহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য-মূলভ অনেক অপ্রীতিকর ব্যাপারও ঘটতেছে, যাহা গুরুভাই-গুরুবোনদের মধ্যে কখনো হইয়া উচিত নহে। এক জনের সঙ্গে অপরের পরিচয় যদি কেবল টাকা ধার চাহিবার জন্তই হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কেন অন্তত না হইবে? তোমরা পরস্পরের শক্তি-বর্ধনে সহায়তা করিবে, ইহাই তোমাদের মনোভঙ্গী হওয়া উচিত।

কিছুকাল আগে একজন দেশনেতা ক্ষমতার চূড়ান্ত আসনে বসিয়া সরকারী কর্মচারীদের অসামুখ্যতার সাফাই গাহিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত দেশটাই অসামুখ্য হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে সরকারী

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৭৪৫

অফিসারেরা নিজেদের সাধুতা বজায় রাখেন কি করিয়া? কথাটা এমনই একটা ছেলে-মানুষী উক্তি যে, কোনও দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে ইহা কেহই উপযুক্ত বলিয়া মন্তব্য করিতে পারে না। দেশ যে অসাধুতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহা এক পরম সত্য। দেশের শ্রেষ্ঠ লোকগুলি নিলজ্জ হুঃসাহসে বেপরোয়া অসাধুতা নিজেরাই করিয়া যাইতেছেন এবং অত্মকে করিতে দিতেছেন, ইহারই ফলে জনসাধারণের মন আরও বেশী কলুষিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সকল যুক্তি দেখাইয়া তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে অসাধুতাকে সমর্থন করিতে পার না। তোমাদের এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেন তোমাদের সতীর্থ এক জনও প্রাণ গেলেও অসাধু হইতে প্ররোচনা না পায় বা ইচ্ছা করিলেও অসাধু হইতে না পারে।

বদি ঐ অঞ্চলে কোনও সমসাধক খুঁজিয়া না পাও, তাহা হইলে তোমার অন্তরের ভাবকে সর্বদা সজাগ রাখিবার জন্ত কিছু সাহিত্য-বৃত্তব লোককে তোমার আদর্শের বাণীর সহিত পরিচিত করিয়া লইয়া একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লও। তাহাতে তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে। ইহাতেই আধ্যাত্মিক পথে অগ্রগমন বাড়িয়া যায়।
ইতি—

আশীর্বাদক
অরূপানন্দ

(৬৩৭)

বারাণসী

১৮ই কা্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

মেহের বাবা—,তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা মেহ ও আশিস
আনিও।

আর্থিক দুর্ভাগ্য তোমাকে এক পার্শ্বত্যাগ স্থান হইতে অত্র পার্শ্বত্যাগ স্থানে নিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ভিতরে ভগবানের কোনও মঙ্গলময় অভিপ্রায় নিশ্চয়ই আছে। যে কাজ একটা পার্শ্বত্যাগ অঞ্চলে পাহাড়ীদের ভিতরে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাই অত্রও তোমাকে দিয়া ভগবান্ করাইতে চাহেন বলিয়া অনুমান করা চলে না কি? সকল বিষয়ে সানন্দে বরণ করিয়া লও। শত বিপত্তির মাঝ দিয়া তোমাকে তোমার ভরণী সাহসের সহিত চালাইতে হইবে।

যে স্থান নিতান্তই অপরিচিত বলিয়া মনে করিতেছে, হয়ত সেখানেও কাছে-ভিতে তোমার কোনও-কোনও আপনার জন লুকাইয়া আছে। আমি বিগত পঞ্চাশটা বৎসর ধরিয়া যে কাজ অবিরাম অবিশ্রাম করিয়া যাইতেছি, তাহার ফল যে কত সুদূরপ্রসারী, তাহা হয়ত তোমার হঠাৎ এক পাহাড়ের অনাদৃত কোণে পাইবে। তুমি আশা ছাড়িও না যে, তোমার কোনও সমস্যাধক নিকটেই কোথাও হয়ত অনেক কাল ধরিয়া তোমার মতন একজন সমস্যাধকের সঙ্গে পাইবার আগ্রহ নইয়া ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

যেই মুহূর্ত্তে এমন কোনও আপনার-জনের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়া যাইবে, অমনি তোমরা একটা মণ্ডলী গঠন করিয়া ফেলিবে। মণ্ডলী করিলেই সমবেত উপাসনা করিতে হয়, আর সমবেত উপাসনা করিতে কমপক্ষে তিন জন লাগে। আমার জন্ম সঙ্কলিত একখানা আসন রাখিয়া তাহার পিছনে তোমরা তোমাদের দুই খানা আসন পাতিবে। তাহা হইলেই সমবেত উপাসনা শুরু হইতে পারিবে। ইহার মধ্যে তোমাদের সমস্যাধক ছাড়া অত্র মতের অত্র পথের যদি কেহ শুদ্ধ সাধক মনে যোগ দিতে চাহেন, তবে তাহাকেও আদর করিয়া আনিয়া বসাইবে। যতক্ষণ কেহ তোমার সমবেত উপাসনার চিরাচরিত রীতি

ভঙ্গ করিবার জন্ত জিদ না করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই তোমাদের সমবেত উপাসনায় অবাঞ্ছিত নহেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিবে হরি-ওঁ নাম-কীর্তনের প্রবল বন্তা হইতে। বেশী লোক না পাও, দুইটা প্রাণী মিলিয়াই কীর্তন শুরু করিয়া দিবে। কোথাও বসিয়া ধ্যানাবেশে নাম কীর্তন করিয়া যাইতে থাকিলে আপনা আপনি চারিদিকের লোক মাতাল হইয়া আসিয়া তোমাদের নামমহোৎসবে যোগ দিবেন। আর যেই সুবিধা পাইবে, দ্বারে দ্বারে হরিওঁ-নামের মধুর ঝঙ্কার শুনাইয়া আকাশ বাতাস মণ্ডিত করিয়া চলিবে। বাস, তোমাদের সংগঠন-কার্য্য শুরু হইয়া গেল।

যখন দেখিবে যে তোমাদের মধ্যে সমসাধক বেশ কয়েকজন জুটিয়া গিয়াছে, তখন হইতে যখনই যেই কাজটিতে তোমরা হাত দাও, নিয়মই করিয়া লইবে যে সকলের সকল শক্তি একসঙ্গে নিয়োজিত হওয়া চাই। নেকোন অল্পটানই কর, কাহাকেও তাহা হইতে দূরে থাকিতে দিবে না। ইহা তোমাদের একটি বড় রকমের নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লও।

আজ তুমি একটি পার্বত্য গ্রামে একা পড়িয়া আছ। কিন্তু দীর্ঘকাল তুমি একা থাকিবেনা। তাহা জানিয়াই আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া এই কথাটা ভবিষ্যতের জন্ত ভাল করিয়া মনে রাখিবার নির্দেশ দিয়া রাখিতে চাহি যে, সকলের সকল শক্তি একটি মাত্র কাজে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োগ করিবার শক্তি যে কত বড় যোগ্যতা, তাহা তোমরা ভুলিও না।

অনেকবারই তোমার মনে আগ্রহ জাগিতেছে, আমাকে দেখিবার জন্য। ইহা স্বাভাবিক। আমাকে যে দেখিতে চায়, সে দেখিতে পায়। আমি যে তোমাদের নাম-সাধনার সময় প্রতিদিনই তোমাদের কাছে যাই। আমি যে তোমাদের সমবেত উপাসনার সময়ে সকলের সামনের

আসনটীতে বসিয়া তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা করি, তোমাদের কর্তৃক মিলাইয়া উপাসনার স্তোত্র সমূহ গান করি। তোমরা আমাকে তোমাদের সমবেত উপাসনার সময়ে অনন্ত কালই তোমাদের সঙ্গে পাইবে।

ভগবানের নাম সাধন ও নাম প্রচার তোমাদের জীবনের এক প্রধান কাজ হউক। নিজের জীবনে নামের সাধনা থাকিলে কাহারও পক্ষেই অপরের মনে নাম-সাধনার রুচি সৃষ্টি করা কঠিন কাজ হয় না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩৮)

হরিওঁ

বাবাণসী

১৯শে কার্তিক, ১৩৯১

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ জানিও।

তুমি আমায় বশঃকীর্তন করিয়াছ। আমি কি অসাধারণ কাজ একাকী করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার একটা বিরাট ফিরিস্তি দিয়া তোমার অন্তরের অসাধারণ শ্রদ্ধা আমাকে অর্পণ করিয়াছ। প্রশংসা শুনিলে কে না সুখী হয়? আমিও সুখী নিশ্চয়ই হইয়াছি। কিন্তু তোমাদের একটা বিষয় ভুল হইয়া যায়। আমি যে বিপুল পরিমাণ কাজ একটা জীবনে নানা দিক দিয়া করিয়াছি বলিয়া তোমাদের ধারণা, সেই সকল কাজ আমি সত্যই একাকী করিতে পারি নাই। আমাকে

ছোট ছোট সহায়তা দিয়া কত ছেলে কত মেয়ে যে কাজ করিবার যোগ্যতা দিয়াছে, তাহা তোমরা জান না, আমিও তাহাদের সকলের কথা শ্রবণ রাখিতে সমর্থ হই নাই। একদিন যখন নিজের পরিচয় না দিয়া দিকে দিকে যুবকদিগকে সপ্তাহে শত খানি করিয়া নূতন নূতন সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়া দেশের কিশোর ও যুবক মনের উপরে সত্য রাজ্য সত্য আদর্শে জীবনোৎসর্গের প্রেরণা সঞ্চার করিয়া বাইতেছিলাম, তখন আমার এক এক খানা পত্রকে বাহারা নকল করিয়া দিত এবং একখানা মুশাবিদাকে দশ বিশ পঁচিশটি আলাদা স্থানে আলাদা খানাদা নামে পাঠাইবার সহায়তা করিত, তাহাদের মধ্যে কত জন আজ ইহলোকেও নাই। মূল পত্রগুলিই মাত্র আমি লিখিতাম, তাহার অন্তর্নিপুণি, নানা জনে নানা হস্তাক্ষরে তৈরী করিয়া দিত। আমার এই পত্রপ্রচার-প্রয়াসের ফলে দেশের আবহাওয়া পরিবর্তনের দিক দিয়া কি কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহার বিবরণ আমি নিজ মুখে দিতে চাহি না। বাহারা সেই দিনকার অনামা পত্র-লেখকের পত্র পড়িয়া যানের পর মাস কখনো কখনো বৎসরের পর বৎসর নূতন ভাবে চিন্তা করিতে বাধ্য হইত, তাহাদের অনেকেই আজ ভারতভূমিতে স্বপ্রতিষ্ঠিত পুরুষ। তাঁহারা নিজ মুখে এই কাহিনী স্বীকার না করিলে আমি তাহাদের নামোচ্চারণ করিয়া তাঁহাদের লোকমান কমাইতে পারি না বা তাঁহাদের সুখ্য নামের সুযোগে নিজের প্রতিপত্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারি না।

পদ্ধতিবদ্ধভাবে উহাই ছিল আমার প্রথম কাজ। বলিতে গেলে, উহাই ছিল আমার বহু বৎসরের জ্ঞাত প্রধান কাজ। সেই কাজটি আমার একান্ত শক্তিতে হয় নাই। বহু জনের শ্রম তাহাতে মিলিয়াছিল বলিয়াই আমার লিখিত একখানা পত্রের কখনো কখনো এক শতখানা

অনুলিপি একশতটি গ্রামে একই দিনে রওনা হইতে পারিত। আজও আমার সেই তরুণ বন্ধুদের কথা স্মরণে পড়ে, যদিও তাহাদের কত জনের নাম ভুলিয়া গিয়াছি। জীবন ভরিয়া এত লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহায়তা আমি লইয়াছি ও পাইয়াছি যে, অকৃতজ্ঞতা হইলেও তাহাদের সকলকে স্মরণে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই।

সাধারণতঃ যশ বাঁহারা অর্জন করেন, তাঁহারা নিজেদের পূর্ণ কৃতিত্বে যশের অধিকারী হন না। অতঃ কত লোকের কৃতিত্ব তাঁহাদেরই কৃতিত্ব বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার ফলে অসাধারণ যশের তাঁহারা অধিকারী হন। কেহ কেহ না জানিয়া তাহা করেন। কিন্তু আমি ত জানি যে আমার জীবনের প্রতিটি পরিচ্ছেদে শত শত ছোট-বড় সহকর্মী নিজেদের পরিচয় গোপন রাখিয়া আমার হইয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের খণ আমি অস্বীকার করিব কি করিয়া?

কাজ করিয়া যাইবার জন্ত যে কয়টা দিন আমার জন্ত আছে, তাহাতেও হয়ত কত কত জানিত অজানিত সহকর্মীর পরিশ্রমের সহায়তা আমি পাইব। যে যেটুকু সহায়তা করিবে, তাহাই মানন্দ চিত্তে গ্রহণ করিব। হয়ত এমন হইতে পারে যে, সেই সকল চেষ্টা অনেক বর্ষ বহন করিয়া আনিবে। কিন্তু ইহা মনে করা ভুল হইবে যে সকলটা যশ আমারই প্রাপ্য। পৃথিবী-জোড়াই শ্রমবিভাগ আছে। কিন্তু যশ বস্তুটা প্রায়ই ভাগ করিয়া ভোগ করা হয় না।

তোমাদের অঞ্চলে এইবার তিনসুকিয়াতে বেশ একটা শারদীয় উপাসনা হইয়া গেল। প্রতিবার একটা নির্দিষ্ট ভক্তের গৃহে এই উপাসনা হইত, নির্দিষ্ট একজনের বায়ে ও দায়িত্বে। অন্তেরা তাহাতে যাহা পারিতেন, সহযোগ করিতেন। এই সহযোগে তাহাদের কৃতিত্ব বাড়িত, কিন্তু একটা মাত্র পরিবারের ইহা অনুষ্ঠান বলিয়া, ইহাতে কেহ

কুগ্রহাষণ, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৭৫১

মহাবাগ না দিলে তাহাতে দোষ স্পর্শিত না। এইবার অনুষ্ঠানটি একটি মাত্র পরিবারের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে নাই। এইবার সকলে মিলিয়া সকলের পক্ষে সকলের জন্ত সকলকে হইয়া অনুষ্ঠানটি করিয়াছে। ইহাতে যে অসাধারণ আনন্দের উল্লাস রহিয়াছে, তাহা প্রায় প্রতি জনের গহ্বরেই উপলব্ধি করিয়াছি। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে তোমরা শিক্ষা কর যে প্রকৃত সর্বজনীনতা কতই শান্তিপ্রদ, কতই লাভজনক, কতই বলবর্দ্ধক। নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া তোমরা যখন সর্বজনের কামনা করিবে, তখন যে বল তোমাদের আসিবে, তাহার কোনও ভুলনা নাই।

মঙ্গলবার মেরামতের কাজের মডেলটি তৈরী করিতেছি। একটি করিয়া গড়িতেছি, আর একটি করিয়া ভাঙিতেছি। কতবার গড়িব আর কতবার ভাঙিব, তাহা জানি না। যতক্ষণ মনে সন্তোষ না আসিবে, ততক্ষণ এই ভাঙ্গাগড়ার কাজই চলিবে। যাই সন্তোষ আসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় মাটিতে কংক্রিট পড়িতে আরম্ভ করিবে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩৯)

৪৫-৬

বারাণসী

১২শে কার্তিক, ১৩৬৬

প্রথম কল্যাণীয়াসু :—

মেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা মেহ ও আশিস জানিও।

প্রতিধ্বনি

স্বতঃ প্রেরণা

[৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭৫২

তোমার পত্রখানাতে তোমার অসুখের কথা জানিয়া চঞ্চল হইলাম। আশীর্বাদ করি তুমি দ্রুত নিরাময় হও।

দীর্ঘকালস্থায়ী অসুখগুলির একটা মারাত্মক কুফল আছে। তাহা মনোভঙ্গীর উপরে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘকাল ধরিয়া অসুখের চিন্তা করিতে করিতে শেষে মস্তিষ্কের কতকগুলি স্নায়ু, যাহাকে বলে ভেণ্ড্রুল, পরিবর্তন আনয়ন করে। ইহার ফলে কতকগুলি মনোভাব রোগীর উপরে রোগ সারিবার পরেও চিরস্থায়ী হইয়া মোরসী পাট্টা লয়। ইহা কোনও দিক দিয়াই ভাল নহে।

সেই ক্ষণ আমি তোমাকে নির্দেশ দিতেছি যে, তুমি ইহার বিপরীত প্রক্রিয়া অবিলম্বে আরম্ভ কর। প্রতিদিন প্রাতে একটা নির্দিষ্ট সময় এবং রাত্ৰিতে শয়নের পূর্বে কিছুকাল ধরিয়া কেবল সঙ্কল্প করিতে থাক, আমি ভাল হইবই, আমি ভাল হইবই। এইভাবে মাসখানেক করিয়া পরে তুমি এক দিন হঠাৎ লক্ষ্য করিয়া অবাক হইয়া যাইবে যে, তোমার মধ্যে রোগকে দমাইয়া রাখিবার একটা অসাধারণ বল আপনা আপনি আসিয়া গিয়াছে। ইতি—

আশীর্বাদ
স্বরূপানন্দ

(৬৪০)

হরিওঁ

বারাণসী

১৯শে কার্তিক, ১৩৩৩

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বঙ্গবাহুণ, ১০৬৭]

ধ্বতং প্রোলা

প্রতিধ্বনি

৭৫৩

নানা দুর্ঘ্যোগে ও শারীরিক অশান্তিতে অশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছ জানিয়া ব্যথিত হইলাম। আশীর্বাদ করি, তোমার সকল অসুবিধা দূর হউক। মনে রাখিও, সততার পথে চলিলে একদিন উঠিতে পারিবেই। পরিচ্ছন্ন মন যে কি অসাধারণ সম্পদ, তাহা ত আজকাল অনেকই জানে না। তুমি সর্বপ্রকার পাপ ও অত্যাচার হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া মনকে পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্ত আত্মাণ চেষ্টা করিও। না জানিয়া কাহারও ক্ষতি করিয়া থাকিলে, তাহাতে মনের পরিচ্ছন্নতা যায় না কিন্তু জানিয়া শুনিয়া অপরের ক্ষতির মধ্য দিয়া নিজের কুশল-চেষ্টা করিলে তাহাতে মন অপরিচ্ছন্ন ও ভাবাক্রান্ত হইয়া যায়। যতীতে কি করিয়াছ না করিয়াছ, তাহার চিন্তা একেবারেই ছাড়িয়া দাও। এখন হইতে সাবধান হইয়া যাও।

নিজের সাধন-ভজনে মনকে একাগ্র কর। নিজেকে জাহির করিবার জন্ত চেষ্টা করিও না। নিজেকে সাধু বলিয়া অপরের নিকট পরিচিত করিবার চেষ্টার মধ্যে যে কপটতা রহিয়াছে, তাহা সাধনের পথে শত্রু। তোমরা নিজেরাই নিজেদের সাধন কল্পলতিকাকে কপটতা দিয়া সমূলে উচ্ছেদ করিতে বাইও না।

তাড়াতাড়ি বড়লোক হইবার জন্ত অত্যাচার অবৈধ পথে অর্থাহরণের চেষ্টা হইতে বিরক্ত হও। অত্ন সকলেও তাহাতে এই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়, তাহার জন্ত, যেখানে পার, লোককে প্রেরণা দাও এবং অন্যকে সুপারামর্শ দিয়া, প্রলুব্ধকে নববল দিয়া সহায়তা কর। অপরকে সাহায্য করিতে গিয়া বারংবার নিজের পানে তাকাও, নিজেকে সরল হৃদয় করিতে বাইয়া অন্তকে সহায়তা কর। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরণা

[৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭৫৪

(৬৪১)

হরি-ওঁ,

বারাণসী

১৯শে কার্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াস্তু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশির্বাদ জানিও।

তোমাদের বাড়ীর পাশেই যে উদাস্ত মহিলাদের সরকারী শিবি আছে, তাহাতে তোমার কয়েকজন গুরুভগিনী আছে। তাহাদের সহিত পরিচয়-স্থাপন করিও এবং তাহাদের জ্ঞাত কখন তোমারি করিতে পার, তাহার দিকে নজর রাখিও। তাহাদের মধ্যে কেহ যে অসাধারণ কর্মশক্তিম্পন্ন হইয়াও আজ কেবল নেতাদের হুঁকুমেরই দরুণ নিরাশ্রয়ার জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হইয়েছে ইহাদের কর্মশক্তিকে কি করিয়া সমাজমঙ্গল কাজে আনিয়া প্রদান করা যায়, তাহার রাস্তাও তোমাদেরই চেষ্টা করিয়া বাহির করিয়া হইবে।

কিন্তু ইহার চাইতেও অনেক আগেকার কাজ অনেক দিন ধরিতে তোমাদের জ্ঞাত জমা হইয়া রহিয়াছিল। তোমাদের গ্রামটার কাছের মাইলের মধ্যেই এত বড় একটা সহর পড়িয়া আছে, যেখানে তোমাদের গুরুভগিনীর সংখ্যা কমপক্ষে দুই তিন শত হইবে। প্রত্যহ সেখানে চাকুরী করিতে যাও আর বিকালে গৃহে ফিরিয়া আস। তুমি কি কখনো ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, তোমার পক্ষে তোমার এই সকল ভগিনীর ভিতরে কাজ করিবার সুযোগ ও দায়িত্ব রহিয়াছে? কেন ইহাদের প্রতিজ্ঞাই সংসারের ঘানি টানিয়াই নিজেদের জীবনের সব কাজ হইতে গেল বলিয়া মনে করিবে? কেন ইহাদের নিকটে গিয়া বলিবে

দ্বপ্রহারণ, ১৩৬৭]

দ্বতং প্রেরা

প্রাভদ্বান

৭৫৫

যে, ইহাদের ইহার চাইতেও বড় কাজ রহিয়াছে, বাহা সংসারের
 বাবতীর কর্তব্য করিবার ফাঁকে ফাঁকেই করিয়া যাওয়া যায়? কেন
 ইহাদের নিকটে এই ধারণাটা পরিবেশন করিবে না যে, ইহারা কেবলই
 সংসারী করিতে আসে নাই, সংসারে থাকিয়াও সংসারের বাহিরের
 শত প্রকারের কল্যাণ-কাজে ইহারা আত্মনিয়োগ করিতে পারে?
 কেন ইহাদের কাছে গিয়া বারংবার অনুরণ করাইয়া দিবে না যে, ইহারা
 দীক্ষা গ্রহণ করিবার দিন জগন্মঙ্গলের দীক্ষা লইয়াছিল, যেই দীক্ষা
 কেবল নিজের মুক্তিরই জন্ত নহে, পরন্তু বিশ্বের প্রতিজনের মুক্তিসাধন
 করিবার জন্ত? ইহারা-যে করিলে অনেক কিছু করিতে পারে, তাহা
 ইহাদের কেন বুঝাইয়া বলিবে না? ইহাদের প্রতিজনের যে কত
 জাগের সামর্থ্য, কত সংগঠনের যোগ্যতা, কত কাজ করিবার শক্তি,
 ইহার পরীক্ষা হইল না বলিয়াই ইহারা নিজেদিগকে নিতান্তই অপদার্থ
 বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছে। আমি চাহি যে, তুমি আর একটা দিনও
 বিলম্ব না করিয়া ইহাদের মধ্যে কাজে লাগিয়া যাও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪২)

বারাণসী

১৯শে কার্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস
 আনিবে।

তোমাদের নিকটে আমি তারাপুর ক্যাম্পের ঠিকানায় কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, তোমরা আবার আর এক ক্যাম্পে বদলী হইয়া আসিয়াছ। তোমাদের লইয়া সরকারী কর্তার কি যে দাবা-খেলা খেলিতেছেন, তাহা মানববুদ্ধির অগম্য ব্যাপার। কতবার যে তোমরা কত ক্যাম্প বদল করিলে, কতবার যে তোমাদের কত ঠিকানা হইল, হিসাব করাই কঠিন। তোমাদের দিয়া যতটুকু কাজ তোমাদের জ্ঞান বা সমাজের জ্ঞান হইতে পারে, তাহার পরীক্ষা যে-কোনও একটা স্থানেই চলিতে পারত। তোমাদের ঠাইনাক্ত করিয়া করিয়া একটা অব্যবস্থিত অবস্থাকে যেন ইচ্ছা করিয়াই জীয়াইয়া রাখা হইতেছে।

যাহা হউক, যেখানেই তোমরা যে যাও, কেহই নিজ আদর্শ ভুলিও না। তোমরা তোমাদের ঐ অর্দ্ধ-বন্দিদশার মধ্যেও মাঝে মাঝে অনেক কষ্টপাটের পরিচয় দিয়াছ, মাঝে মাঝে কল্পনাতীত ত্যাগ দেখাইয়াছ। তোমাদের যে উহা বৈশিষ্ট্য, ইহা ভুলিও না।

সকল অবস্থাতেও তোমরা আদর্শবাদী থাকিও। সংসারের সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াও তোমাদের মেরুদণ্ড শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। তোমরা কোনও মানুষের কোনও অত্যাচারকে প্রশ্রয় দিও না। তোমরা মহিলা বলিয়াই তোমাদের উপরে নানা দিক হইতে যত অনুবিধা আসে, আর তাহা তোমরা মুখ বুজিয়া সহিয়া যাইতে বাধ্য হও। আমি তোমাদের বারংবার বলিতেছি যে, তোমরা তোমাদের নিজ মহনীয়ত্বে বিশ্বাস হারাইও না। যেই সকল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোলে করিয়া তোমরা দেশত্যাগ করিয়াছিলে, তাহাদের মধ্য হইতে জগৎপাবন পুরুষ-মহিলাদের আবির্ভাব যে অসম্ভব, তাহা তোমরা মনে করিও না। আমি সেই দিনটীর দিকেই তাকাইয়া থাকিব, যেদিন

স্বগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৭৫৭

তোমাদের কোলের নিধিরা জগতের নিধি বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য
হইবে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪৩)

হরিও

বারাণসী

১৯শে কা্তিক, ১৩৬৬

পবনকল্যাণভাজনেষু :—

মেহের বাবা—, তোমার পত্রে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ র—র
অকাল পরলোকগমনের সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। মাত্র সাত
বৎসর বয়সে সে ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেল, ইহাতে প্রাণটা হাহাকার
করিয়া উঠিল। কত সম্ভাবনাই না নিয়া সে আসিয়াছিল। কেন
আসে, কেন যায়, মানুষ তাহা জানে না। আসিলে আনন্দ করে,
চলিয়া গেলে কাঁদিয়া আকুল হয়। বান্ধবেরা সান্ত্বনা দেয়, সহানুভূতি
দেখায়, কিন্তু যে যায়, সে আর আসে না। ইহার মধ্যে ভগবানের কি
এক অনির্বচনীয় অভিপ্রায় রহিয়াছে, মাত্র তাহার কথা ভাবিয়া
নতশিরে তাহা মানিয়া লইতে হয়। তোমার, বিশেষ করিয়া আমার
কল্যাণীয়া মায়ের, এই নিদারুণ শোকে কি যে সান্ত্বনা দিব, তাহারই
কি ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে আমার ভৌতিক অস্তিত্বের
চাইতেও একটা বড় আস্তিত্ব আছে, যাহাতে আমি জগতের সকলকে
অনন্তকাল ধরিয়া বুকে বেড়িয়া রাখিতেছি। তোমার থোকা আমার
সেই কোড়ে আসিয়া বসিয়াছে। ইহা বিশ্বাস করিয়া, মনকে যত
কত পার, ভারমুক্ত কর।

ছেলেটা জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। তোমাদের ওখানকার পণ্ডিতেরা হয়ত বলিতেছেন যে, ইহা অপমৃত্যু, অতএব শ্রাদ্ধ হইবে না। সাধারণে তাহাদের কথা শুনুক। কিন্তু তোমরা আমার সম্মান, তোমরা আমার কথা গুনিবে। যে যুগে যে শাস্ত্র রচনা হইয়াছিল, সেই যুগের লোকের প্রয়োজন বুঝিয়া সেই যুগের বুঝিয়া তাহা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে যদি পরবর্তী কোনও যুগের প্রয়োজন না মিটে, তাহা হইলে পরবর্তী যুগে আবার নূতন শাস্ত্র রচনা হইয়াছে বা পূর্বেরকার শাস্ত্রের উপরে নূতন ব্যাখ্যা-সংযোজন ঘটয়াছে। প্রচলিত শাস্ত্রীয় মতবাদ যদি তোমার জলে-ডোবা ছেলেটার শ্রাদ্ধে আগুনি করিয়া থাকে, তোমাদের তাহাতে ভাবনার কিছুই নাই। তোমরা অথগুমতে ইহার শ্রাদ্ধ করিবে। মণিপুর রোডে, লামডিং-এ, ফারকাটিং-নাওজানে তোমাদের অনেক গুরুভাই রহিয়াছেন, তাহাদের খবর দিয়া তোমার ছেলের শ্রাদ্ধ অথগুমতে সমাপন কর। এই ব্যাপারে তোমার মনে কোনও কুণ্ঠা-থাকার প্রয়োজন নাই। হে দেহ ছাড়িলে অন্তরে যে বিপুল শোক উপজাত হয়, তাহা শান্তি করিবার জন্তও শ্রাদ্ধ নিতান্তই প্রয়োজন। ছেলে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে বলিয়াই তাহার আত্মার শান্তির জন্ত কিছুই করা চলিবে না, ইহা আগেকার দিনের অন্ধ মত, বাহা তোমাদের মানিবার প্রয়োজন নাই। শ্রাদ্ধে আত্মার শান্তি হয়, সকল মতের শ্রাদ্ধেরই ফল এক। ইতি—

আশীর্বাদ
অরুণানন্দ

(৬৪৪)

হরিও

বারাণসী

২০শে কার্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

মেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা মেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমার ভক্তিমতী কোষ্ঠী কতর বিবাহ স্থির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেছি। তাহার সহিত যে যুবকটির বিবাহ হইতেছে, তাহাকেও প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেছি। তাহাদের নবজীবন সুখময়, শান্তিময়, তৃপ্তিময় ও আনন্দময় হউক।

তোমার ভাবী জামাতাকে আমি বিশেষ ভাগ্যবান মনে করিতেছি। কারণ, সে এমন একটা কুমারীকে বিবাহ করিতে যাইতেছে, যাহার কোমরবাঁ নিষ্ঠানীল সাধনে কাটিয়াছে। দীক্ষার পরে তোমার মেয়ে একটা দিনও সাধনে অবহেলা করে নাই। ইহা কি সামান্য কথা? তাহার সাধনানুরাগ তাহাকে সমস্ত জীবন ভরিয়া অশেষ সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী করিবে। স্বামীর গৃহে যাইয়া সে সত্য সত্য সৌভাগ্য-মণী হইবে।

আমি সাধারণতঃ কুমারী মেয়েদের দীক্ষা দিতে খুব আগ্রহ অনুভব করি না। তাহার কারণ এই যে, বিবাহের পরে গিয়া কে কোন্ ঘরে পড়িবে, কোথায় হিরণ্যকশিপু, কোথায় জটীলা-কুটিলার দল তাহাকে বিরিয়া বসিবে, কোথায় সে তাহার গৃহীত মত ও পথের জ্ঞান লাস্তিত হইবে, কোথায় সে অপরের মন রক্ষার জ্ঞান মিছামিছি আবার নূতন করিয়া আর একটা দীক্ষা লইবার অভিনয় করিয়া নিজেকে নিষ্ঠাচ্যুত

করিবে, তাহার কোনও ঠিকানা নাই। তথাপি কত কুমারী মেয়ে দলে দলে আসিয়া দীক্ষা লইয়া যাইতেছে। দীক্ষা জীবনের মনঃমন্ডল, দীক্ষা জীবনের অশেষ পাথেয়, দীক্ষা নর-জীবনের নবজন্ম। তাই দীক্ষা নিতে আগ্রহী হইয়া কেহ আসিলে তাহাকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দেওয়াও খুব কাজের কথা নহে। কিন্তু দীক্ষা নিবার পরে অনেকেই সাধন করে না। ইহাতে দীক্ষার সম্মান কমিয়া যায়, দীক্ষাদাতার প্রত্যাশায় ঘটে, দীক্ষিতের জীবনের উন্নতিমুখিনী গতি শ্লথ হইয়া পড়ে। তোমার কথা দীক্ষা নিবার পরে সাধন করিয়াছে, অবহেলা করে নাই, গুরুদত্ত মহাবস্তুকে ভুলিয়া রহে নাই। তাহার কুশলকে কে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবে?

চিরকালের সংস্কারে আবদ্ধ একটা পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও তুমি তোমার প্রতিটি মাজুল্য কাজে সমবেত উপাসনা করিয়া যাইতেছ। ইহা তোমার সমবেত উপাসনার প্রতি অশেষ প্রীতি ও আস্থার পরিচায়ক। মেয়ে দেখাইবার দিনও সমবেত উপাসনা করিলে, আবার বিবাহের দিনও তাহা করিবে। ইহা হইতে তোমার অন্তরের নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যে নিষ্ঠাবান, সেই ত সাধন করিয়া তাহার অমৃতময় ফল পায়। তোমার নিষ্ঠাতে আমি অতিশয় গুরুদত্ত হইয়াছি। তোমার গ্রাম প্রতিটি সন্তানের মধ্যে নিষ্ঠা জিনিষটা আনুক। নিষ্ঠা আসিলে অনেক অকারণ দুর্বলতা আপনা আপনি নাশ পায়। কেবল যুক্তি, কেবল তর্ক, কেবল শাসন, আর কেবল ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা মানুষের মনের দীর্ঘকাল-পোষিত সংস্কার দূর হয় না। সাধনই তাহা সম্ভব। সাধনহীনেরা নিষ্ঠাহীন হয়। নিষ্ঠাহীনেরা দুর্বলময় হইবে না ত কে হইবে? ইতি—

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

৭৬১

(৬৪৫)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২০শে কা্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াস্থ —

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস
জানিও।

তোমাদের পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। তোমরা জীবনকে
গতানুগতিক ভাবে গ্রহণ করিও না। সমাজ ও সংসারের পরিবেশ
যেখানেই নিয়া ফেলুক, তোমরা তোমাদের অসাধারণত্বের পরিচয়
দিতে চেষ্টা করিও। তার জন্ত তোমাদের সব চাইতে বেশী প্রয়োজন
হইবে অন্তরভরা মমতার। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪৬)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২০শে কা্তিক, ১৩৬৬

স্নেহের বাবা—, তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস
জানিও।

স্বপ্নে তুমি জর্জরিত হইয়াছ। আন্তে আন্তে দিনা শোধ করিয়া
দাও। সংসারের আয় তোমার কম, মেয়েদেরও কিছু কিছু সদ্ভাবে
আয় করিবার জন্ত সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ কর। আজকাল

আগেকার মতন মেয়েদের ঘরে ঘরে বস্তাবন্দী তৈজসের মতন রাখিবার রেওয়াজও নাই, প্রয়োজনও নাই।

অভাবে পড়িয়া তুমি নিজহাতে হলচালনা করিয়া তোমার সামান্য জমিটুকুতে চাষ কর জানিয়া সুখীই হইয়াছি। আমি আজও প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষাকালে আশ্রমের জমিতে লাঙ্গল চালাই। সাধনা, সংহিতা এবং আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের লইয়া আমি এখনো আশ্রমের ক্ষেতে কাদার মধ্যে ধানের চারা রোপণ করি। আমি আমার এই বয়সে বাহা পারি বা করি, তাহা তোমরা যুবক বয়সে করিতে পারিবে না বা করিবে না? সকল জাতিই লাঙ্গল চালাইতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে যদি শাস্ত্রের কোনও বচন থাকিয়া থাকে, তবে তাহা মধ্য যুগের জন্ত, আজিকার জন্ত নহে। হলচালনায় অসম্মানের কিছু নাই। নিজের ক্ষেত নিজে করিবে, ইহার চাইতে গৌরবের আর কি আছে? ইতি—

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবাবামণির আন্দামানে শুভাগমন সম্ভাবনাঃ—অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব এবং প্রতিধ্বনি সম্পাদিকা ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী সম্ভবতঃ জানুয়ারী মাসে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে শুভাগমন করিবেন। বিশেষ বিশেষ স্থান গুলিতে তাঁহার বাংলায় ভাষণ দিবেন। আন্দামানে আনুমানিক দুই সপ্তাহ তাঁহার

ধাকিবেন। উৎসাহী সজ্জনের প্রগ্রাম তৈরীর ব্যাপারে অবিলম্বে
নিরীক্ষানায় যোগাযোগ করুন। কারণ, প্রথমে শ্রীশ্রীস্বামীজী ও
ব্রহ্মচারিণী মহোদয়া চাথাম এই ঠিকানায়ই উঠিবেন। যথা—
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, চার্জম্যান, পাওয়ার হাউস, পোঃ চাথাম, আন্দামান্‌স্‌।

কোনও কারণে তাঁহাদের ভ্রমণের তারিখ পরিবর্তিত হইলে তাহা
উপরোক্ত শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্তকে জানান হইবে এবং জিজ্ঞাসু সজ্জনেরা
তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া নিবেন। এই বিষয়ে বারানসীতে কেহ পত্র-
ব্যবহার করিবেন না।

নিজের পায়ে দাঁড়াও :—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনেক পীড়া-
পীড়ির ফলে পরিকল্পনা-কমিশন নাকি শেষ পর্য্যন্ত তৃতীয় পরিকল্পনার
জ্ঞাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৩৪১ কোটি টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিবার অনু-
মতি দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা-কমিশন নাকি ইহাও জানাইয়া
দিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনার জ্ঞাপ্ত ভারত সরকার ১৬০ কোটি
টাকার বেশী দিতে পারিবেন না। ফলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এখন পরি-
কল্পনার জ্ঞাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ১৮১ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবার
দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু দেশকে আর কতদূরে প্রপীড়িত
করা সম্ভবও নহে, সম্ভব ও নহে। এজন্য তিনি রাজ্যের ব্যয় হইতে অর্থ
বাচাইয়া কাজ করিতে চাহেন। তাহার এই আত্মশক্তিতে নির্ভর
করিবার চেষ্টাকে আশা করি, প্রত্যেকেই অভিনন্দিত করিবেন।

পরিকল্পনা-কমিশনের সহিত যে ডাঃ বিধানচন্দ্রের বিশেষ মতানৈক্য
হইয়াছে, সংবাদপত্রের রিপোর্ট পাঠ করিলে তাহা অনুভব করা যায়।
কিন্তু আরও একটা অশুভ ইঙ্গিতও টের পাইয়া যায় যে, বিধানচন্দ্র যদি
নিজভূক্তবীর্য্যে নিজের রাজ্য হইতে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজ
রাজ্যের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন-কার্য্যগুলির সফল রূপায়ণ দিতে চেষ্টা

করেন, তবে তাহাতে পরিকল্পনা-কমিশনের প্রসন্ন সম্মতি নাই। এই অসম্মতির কারণ বুঝা কঠিন।

রুশ নারী ও প্রসাধন দ্রব্য :—গান্ধীগ্রামে (মাজরা)-র ১৩ই অক্টোবরের খবরে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এখানে বলেন যে, রাশিয়ার স্ত্রীলোকগণ প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহার করেন না। তিনি স্বয়ং সম্প্রতি রাশিয়া ভ্রমণ করিয়া ইহা দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি রুশ নারীগণের মুখে পাউডার, পমেড, দেখেন নাই বরং তাহাদের চেহারায় দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা উত্তর ভারতেরই প্রসাধন-সামগ্রীর উপদ্রব বেশী।

আয়ুর্বেদ-গবেষণার সরকারী পরিকল্পনা :—প্রকাশ, দেশজ ও আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা এবং ঔষধ প্রস্তুত সম্পর্কে গবেষণাকে উৎসাহ দিবার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, কলিকাতায় অবস্থিত তিনটি আয়ুর্বেদ শিক্ষণালয়কে লইয়া রাজ্য সরকার যে, তিনটি “রাষ্ট্রীয় আয়ুর্বেদ কলেজ” স্থাপনের বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন, তাহার একটিতে ঐ গবেষণা চালাইবার আয়োজন হইবে। দেশজ পদ্ধতিতে ঔষধ প্রস্তুতের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ত্রিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ঠহা ছাড়া অল্প দুইটি জায়গার একটিতে আধুনিক পদ্ধতিতে এবং অল্পটিতে প্রাচীন প্রথা আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন। প্রস্তাবিত আইন কার্যাকরী হইলে ঐ পরিকল্পনা চালু হইবে।

সংবিধানের পবিত্রতা :—রেজুণের ১৩ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী উ নু আজ অ-বোদ্ধগণকে এই আখ্যাস দেন যে,

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৭৬৫

ধর্মীয় স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি দেশের সংবিধানে রহিয়াছে, তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করা হইবে।

তিনি বলেন, ‘অনতিবিলম্বেই’ বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করা হইবে—কিন্তু তখনও ধর্ম-বিশ্বাস বা ধর্মীয় আচার-আচরণের জন্ত কাহারও প্রতি কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না। উ. নু. ষাও বলেন, দেশের অধিকাংশ মানুষের অভিপ্রায় অনুযায়ী বৌদ্ধধর্ম “রাষ্ট্রীয় ধর্ম” বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু তজ্জন্ত অত্যাচার ধর্মে বিশ্বাসীরা যেন শঙ্কিত না হন। দেশের সংবিধানে প্রত্যেকটী মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা বরাবরই অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

প্রধানমন্ত্রী উ. নু. মহাশয়ের ললিত ভাষণে অজ্ঞ-ধর্মালম্বীরা নিশ্চিন্ত হইবেন কি না, সন্দেহ। কারণ, দেবদূতগণের সদিচ্ছার ফলে সংবিধানে অনেক পবিত্র আশ্রম সমূহ লিখিত হইয়া থাকে কিন্তু এই বিশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন-গগনের নীচে সভ্যতাভিমাত্রী স্বাধীন দেশেও জাতি, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কিত সংবিধান-প্রদত্ত আশ্রম পদদলিত করিয়া ধর্ম-বর্ণ মানুষের উপর উৎপীড়ন করিতেছে আর সংবিধানের রক্ষারক্ষকেরা তাহা নিবারণ করিতে পারেন নাই, এমন দৃষ্টান্ত বোধ হয় হাতের কাছেই আছে।

সত্যযুগ কি ফিরিয়া আসিল?—সিউড়ির ১৩ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ,—লাভপুর উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাহাদের বিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রধানশিক্ষকের অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে ছাত্রেরা যে গুরু-দক্ষিণা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহা কেবল অভিনবই নয়, আধুনিকযুগে গুরুভক্তির ও প্রীতির এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। লাভপুর বিদ্যালয়ে প্রথম ৭ বৎসর সহকারী শিক্ষক ও পরে একাধিক্রমে দ্বিতীয় ৩৭ বৎসরকাল প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন শ্রীপুলিন-

বিহারী চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘ ৪৪ বৎসরকাল লাভপুরে বসবাসের পর বিদায় লইয়া বৃদ্ধবয়সে স্বগ্রামে সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে ফিরিয়া যাইবেন শুধুমাত্র একটি উপযুক্ত বাসগৃহের অভাবে, ইহা উহার অগণিত ছাত্রের নিকট বেদনাদায়ক বোধ হওয়ায় তাহারা বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষকদের ক্রী-কোয়ার্টারের সংলগ্ন একস্থানে একটি নবনির্মিত বিহা-পাকা বাড়ী দান করার সিদ্ধান্ত করে। উক্ত গৃহনির্মাণের কাধ্য গ্রা-সম্পূর্ণ। ৩০শে অক্টোবর পুলিশবাবু অবসর গ্রহণ করিলে আনুষ্ঠানিক-ভাবে উক্ত ভবন তাঁহাকে দক্ষিণাস্বরূপ অর্পণ করা হইবে এবং গ্রামে ঐ ক্ষুদ্র পল্লীটিকে “গুরুপল্লী” নামে অভিহিত করা হইবে।

মুক্তকণ্ঠে বলিব, ধন্য লাভপুরের ছাত্রগণ। তোমাদের মধ্যে সত্য-যুগের পুনরাগম দর্শন করিয়া মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছি।

সংস্কৃত চর্চার প্রয়োজনীয়তা :—কলিকাতার ১৬ই অক্টোবর খবরে প্রকাশ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত এক বিবৃদ্ধনসমাবেশে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন যে, সাধারণের মধ্যে সংস্কৃত-চর্চা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। সংস্কৃত-চর্চার ঐতি-দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতের ঐতিহ্য নিহিত। বিদেশে ভারতের যে ভাষাটি বিদেশীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহা হইলো সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষাকে যেন ভুলিয়া না যাই। শিক্ষামন্ত্রী তৎপ-গবেষক, অধ্যাপকদের কাছে সংস্কৃত ভাষার প্রতি আরও মনোযোগী হইবার জন্ত আহ্বান জানান।

অখণ্ডমতে শ্রীদ্ধ :—বিগত ২১শে অক্টোবর ৪ঠা কার্তিক আগরতলাতে শ্রীগোপলচন্দ্র, হারাণচন্দ্র, শকেশচন্দ্র, অরুণচন্দ্র ও মন্ট চন্দ্র দে ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের পরলোকগত সুখান্নিক পিতা রাজমোহন

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৭৬৭

দে মহশয়ের শ্রদ্ধার্থ্য অথগুণতে সম্পন্ন করেন। বিধিসম্মত ভাবে নগর-কৌর্ভন, সমবেত উপাসনা, অথগু-সংহিতা দান, হরি-ও নাম-কৌর্ভন এবং সমাগত ও নিমন্ত্রিতগণকে অন্ন-প্রসাদাদি দান প্রভৃতি কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। আগরতলা সহরের অধিকাংশ অথগুলাতা-ভগিনী এবং বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সজ্জন ও মহিলা এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন এবং উদ্দীপন। সঞ্চারণ করত করেন।

ডাঃ কাটজু ও সংস্কৃত ভাষাঃ—মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ কৈলাস নাথ কাটজু রাজস্ব ট্যাগুনজীর অনগ্রসাধারণ হিন্দী অনুরাগের কথা উল্লেখ করিয়া রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সংস্কৃতের অবিসম্বাদিত দাবীর যথার্থ বলেন—‘হিন্দীর প্রতি আমার অপরিণীম অনুরাগ থাক। সবেও আমি বিশ্বাস করি, আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্য বা কিছু যত্নেই একমাত্র সংস্কৃতেই আছে বিধৃত। একমাত্র তামিল ব্যতীত আমাদের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃতের নিকট স্বর্ণী। সংস্কৃত প্রায় সবগুলি আঞ্চলিক ভাষারই জননী। সংস্কৃতে ভাল জ্ঞান থাকিলে অগ্রাগ্র আঞ্চলিক ভাষায় জ্ঞানার্জনও সহজ হয়। সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী এবং ইহার শব্দ ভাণ্ডারও অপরিণীম। এক-দিক বলিতে গেলে সরকারী স্বীকৃতি ব্যতীতই সংস্কৃত ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গড়িয়া উঠিতেছে। আমার মনে পড়ে এগার বৎসর পূর্বে যখন রাষ্ট্রভাষা নিয়া আলাপ আলোচনা চলিতেছিল, তখন একজন কন্নড়ী প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ বলিয়াছিলেন,—‘এ ধরনের বাক্‌বিতণ্ডার প্রাপ্য আমি উপলব্ধি করিতে পারি না। ভারতের একটি জাতীয় ভাষা আছেই এবং তাহা সংস্কৃত।’ সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিলে সংস্কৃত-

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭৬৮

সাম্রাজ্যবাদের অভিযোগ কখনও উঠিতেই পারিত না। আজকাল বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যালয়ে সংস্কৃতকে অবশ্য-পাঠ্য-রূপে গ্রহণ করা হইতেছে এবং জনগণ অধিকতর সংস্কৃতানুরাগী হইতেছে। প্রতিটি হিন্দু পরিবারে ধর্মীয় পূজা অর্চন এই মহতী ভাষায়ই সম্পন্ন হয়। জন্ম বিবাহাদি প্রতিটি অনুষ্ঠান এই ভাষার মাধ্যমেই নির্বাহিত হয়। এখন আমাদের প্রয়োজন হইল, পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা এই ভাষার সরলীকরণ। এই কাজ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু আরও দ্রুততর হওয়া প্রয়োজন।

অখণ্ড-বাণী

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(১৮৬)

দীক্ষা গ্রহণের প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্যই হইবে আত্মিক উন্নতি লাভ। দীক্ষা গ্রহণ ক'রে যদি সঙ্গে সঙ্গে কোনও উন্নতি হয় হোক, না হয় না-হোক, সেই দিকে লক্ষ্যই রাখিতে হবে। শীতলা দেবীর কাছে লোকে পাঠ্য মানত করে যে মনোবৃত্তি বশতঃ, ঈশ্বর-প্রেমিকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ কখনো সেই মনোবৃত্তি নিয়ে চলতে পারে না। রোগ সারাবার জন্ত, মোক্ষদায় জন্মের জন্ত, স্বামী বশীকরণের জন্ত, স্ত্রী বাধ্যকরণের জন্ত, পরীক্ষায় পাশের জন্ত, চাকুরী পাবার জন্ত, পুত্র লাভের জন্ত প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করার মনোবৃত্তিই দেশ থেকে দূর ক'রে দিতে হবে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

৭৬২

(১৮৭)

দীক্ষার মানে কি? নবজন্ম লাভ। গত-জন্মের সব কনু-কালিমার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে, অতীতের পাপময় সংসারগুলির হাত এড়িয়ে, নূতন ক'রে জীবনের পথ চলতে আরম্ভ করা। যে কামুক ছিল, সে কামের সেবা ছাড়বে, যে লম্পট ছিল, সে লাম্পট্য পরিহার কর্কে, যে পরস্বাপহারী ছিল, সে চুরি-জুচ্চোরী ছাড়বে, যে পরনিন্দুক ছিল, সে পরচর্চা ও পরদোষানুসন্ধান ত্যাগ কর্কে, যে অহঙ্কারী ও দাস্তিক ছিল, সে বিনয়ী ও বিনয় হবে,—এই সঙ্কল্প নিয়ে নূতন ক'রে জীবন-বালা আরম্ভ করাই দীক্ষার উদ্দেশ্য। বড়ই যত্ননা বোধ করি তখন, যখন লোকগুলি দলে দলে পার্থিব ছোটখাট প্রয়োজনের দাবী মিটিবার উপায়স্বরূপে দীক্ষার মত অপার্থিব ব্যাপারকে গ্রহণ কত্তে আসে। এ যেন ভগবানের নামকে সাড়ষরে উপহাস করা।

(১৮৮)

প্রথমই ক্রমশঃ শক্তিশালী সমাজ সৃষ্টি করে, শক্তিশালী জাতির পত্তন করে। দৃষ্টি যখন তোমার পরলোকের দিকে, তখন তুমি গুহাবাসীর একক জীবন যাপন করো, কিন্তু ইহলোকেও যখন তোমাকে বিচরণ কত্তে হবে, তখন তোমার সমদ্রাতৃ জাগতিক দ্রুত দূর কর্কার ব্যাপারে পরস্পরের বলবর্ধক হবে।

(১৮৯)

ক্রোধ দমন খুব শক্ত নয়। জগতে যে কাউকে কখনো ভালবেসেছে, তার পক্ষে ক্রোধ দমন সহজ কথা।

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭৭০

পিতাকে বা মাতাকে, স্বামীকে কি গুরুকে, পুত্রকে বা কন্যাকে কে-
কোনও একজনকে যে নিঃস্বার্থভাবে নিষ্কলুষ মনে, ভালবেসেছে, তার
পক্ষে ক্রোধ-দমনের পথ অতি সূক্ষ্ম। বন্ধের ভিতরে তোমার সেই
প্রাণপ্রিয়তম প্রিয়জনের কথা চিন্তা কর। তাঁর প্রেমময় মুখখান
তোমার বন্ধের ভিতরে যেন বিরাজ কচ্ছে, এই রকম ধ্যান কর। তোমার
হৃদয়ের সমস্ত আবেগ যেন তাঁর মধুময় উপস্থিতিতে ধ্বংস হয়ে যাক,
এই রকম ভাবনা কর। দেখবে, ক্রোধ পালাবার পথ পাবে না।
ক্রোধের মরুভূমিতে দেখতে না দেখতে প্রীতির গঙ্গা-বয়নার শীতল ধারা
বইতে থাকবে। সদিচ্ছা, সহৃদয়তা, সহানুভূতি ও স্নেহশীলতার দ্বারা
মঞ্জরী অপূর্ণ সাজে আত্মপ্রকাশ করবে।

(১৯০)

ভালবাসতেও শিখতে হয়। জগতের ভালবাসা বর-
পক্ষি। তাতে কাম আছে, স্বার্থ আছে। তোমার
ভালবাসা থেকে সেই কাম আর স্বার্থকে তুমি দূর ক'রে দাও। তবে
তোমার খাঁটি ভালবাসা আসবে। জগতের যার প্রতি যখন বসন্ত
ভালবাসা আসে, পরীক্ষা কর, তাতে তোমার স্বার্থ কতখানি আছে
আর প্রাণপণে সেই ভালবাসা থেকে স্বার্থকে দূর কত্তে চেষ্টা কর।
ভাবেই যখন যার প্রতি তোমার প্রাণের অনুরাগ ধাবিত হোক, তখন
তখন তুমি ভগবানের নামের ফিটকিরি দিয়ে সেই ভালবাসাকে মনস্ত-
কত্তে চেষ্টা কর। দীর্ঘকাল এই ভাবে চেষ্টা কত্তে কত্তে এমন অপূর্ণ
অবস্থায় এসে তোমার জীবন পৌঁছুবে যে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে
তোমার ভালবাসায় কখনই আর মলিনতা থাকতে পারবে না।

সংগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

অথ-বাণী

প্রতিধ্বনি

৭৭১

(১৯১)

প্রত্যেক উঁথানে প্রত্যেক পতনে ভগবানের নামকে অবলম্বন কর।
অক্ষয় তীর নামকে নিয়েই চল।

(১৯২)

নাযের মহিমায় সত্য জাগ্রত হবে, সত্যের মহিমায়
দুঃখ দূর হবে। তোমরা প্রাণপণে ভগবানের নামকে অবলম্বন
কর। বাইরের কাজ তোমাদের ষার যাই হোক, ভিতরের কাজ ঐ
একটী। নাম কর আর প্রেম কর। নামে প্রেম জাগবে, প্রেমে নাম
হুটবে।

(১৯৩)

আমি দেখতে চাই না বন্ধু, তুমি কতখানি হিন্দু
আর কতখানি মুসলমান। আমি দেখতে চাই, তুমি
কতখানি মানুষ। আমি জানতে চাই না, তোমার পৈতৃস্থানা
কত লম্বা বা তোমার টার্কি-ফেজের পুচ্ছ কত দীর্ঘ। আমি দেখতে
চাই, তুমি তোমার বাক্যে, তোমার কার্যে, তোমার চিন্তায় কতখানি
মানুষ। আমি মানুষ চাই এবং সেই মানুষ যে-সম্প্রদায়ের ভিতরই
সেপ্তে পাই না কেন, তারই আমি পূজা করব।

(১৯৪)

মৃত্যু যখন হবে, তখন আজ না কাল, সে কথা ভাবা নিরর্থক।
সর্বকণ্ঠ তৈরী হ'য়ে থাকাই ভাল!

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

৭৭২

(১৯৫)

হিংসা ও বিদ্বেষ বর্জন ক'রে বিপদের মাঝেও নির্ভয় হও।
নির্ভীকতাই ঈশ্বর-বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

(১৯৬)

ধ্বংস যার স্বভাব, সে ধ্বংস কর্বে। গড়া যার স্বভাব, সে গঠন
কর্বে। মহাদেব প্রলয় বিধান করেন ব'লে কি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁর সাথে
লড়াই কর্বেন? মহেশ্বর ধ্বংস করুন, ব্রহ্মা দ্বিগুন উৎসাহে সৃষ্টি কর্বেন।
তোরা নিরুৎসাহ হোস্ না। উৎসাহই জীবনের লক্ষণ।

(১৯৭)

মৃত্যুকে লোকে অত ভয় করে কেন জানিস?
তারা জানে না, মৃত্যু জিনিষটা কি। মৃত্যুতে কি তোমার
ধ্বংস হয়, না, তুমি নবজীবন পাও? তাতে কি তোমার অবসান ঘটে,
না আরম্ভ হয়? মৃত্যুতে কি তুমি কিছু হারাও, না লাভ কর? মৃত্যুতেই
কি তোমার সবকিছু শেষ হ'য়ে যায়, না অখণ্ডজীবনের দুয়ার খুলে যায়?
এই অজ্ঞানতাই মৃত্যুকে ভয়ের জিনিষ ক'রে রেখেছে। যেমন, অন্ধকার
রাতে তোমার পথ চলতে ভয় করে কিন্তু হাতে আলো থাকলেই ভয়
দূরে যায়। অজ্ঞানতাই ভয়ের জনক। মৃত্যুর মাঝে ভয়ের কিছু
নেই।

(১৯৮)

চিরকাল বেঁচে থাকারটা অস্বাভাবিক, মৃত্যুটাই স্বাভাবিক।
যেমন তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা স্বাভাবিক, আহার-নিদ্রা স্বাভাবিক,
মৃত্যু তেমনি স্বাভাবিক। স্বাভাবিক ব্যাপারকে ভয়

দ্বগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

৭৭৩

করা ভুল। মৃত্যু তোমার প্রয়োজন, নইলে দীর্ঘকাল একটা জীর্ণ, ক্লান্ত, স্বকর্ণ্য দেহের বোঝা বহিতে বহিতে শেষে তোমার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যেত। মৃত্যু আছে বলেই জরা-ব্যাধির হাত থেকে তুমি রক্ষা পাও। নীরোগ চিরযৌবন যদি না পাওয়া যায়, তা হ'লে স্বপ্নামা বা হনুমানও প্রতাহ মৃত্যুকামনা কতেন। মৃত্যুর মানে কি? দেহের পরিবর্তন ছাড়া ত' মৃত্যু আর কিছুই নয়! পুস্তকের যেমন একটা মলাট ছিঁড়ল, তুমি আর একটা মলাট পরিয়ে নিলে। পরিধানের একখানা বস্ত্র ছিঁড়ল, তুমি আর একখানা বস্ত্র পরিধান করলে। কাপড় পরাণো হ'লেই তাকে ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন হবে। যা প্রয়োজন, তাতে আপত্তি করা ভুল। ছেঁড়া কাপড় ফেলে দেবার জ্ঞান তৈরী হ'য়ে থাকেই সম্ভব। মৃত্যু সর্বজনীন। কার মৃত্যু হয় নি? রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, বীণা, সব ঈশ্বর্যাবতারের সজ্জ, দেহত্যাগ করেন নি? কেউ হয়ত দীর্ঘকাল বাঁচেন, কেউ অল্পকাল বাঁচেন। কিন্তু সবাইকে মরতে হয়েছে। সুতরাং যা সর্বজনীন, তার সঙ্গে মনেই হোক, আর বাক্যেই হোক, ঝগড়া করা বিষম ভ্রম। মৃত্যুর মানে ধ্বংস নয়, মৃত্যুর মানে বিবর্তন। শীতকালে অনেক গাছের পাতা প'ড়ে যায়, আবার বসন্তে নতুন পাতা গজায়। মৃত্যুতেও তেমন তোমার পুরাণো শরীর ঝ'ড়ে প'ড়ে নতুন কাঁচা কচি সুন্দর শরীর লাভ হয়।

(১৯৯)

সেধে গিয়ে মৃত্যুর গ্রাসে গড়িয়ে পড়ারও কোনো মানে নেই। মৃত্যু এসে যায় ত' উত্তম, না আসে ত' জীবনটাকে মানুষের মত বন নিয়ে মানুষের আচরণ দিয়ে ভোগ ক'রে যাও। “কেউ যার হৃৎকণ্ঠ কতে পারে না, মৃত্যু তারও শাস্তিদাতা, কেউ যার বন্ধনচ্ছেদন কতে পারে না, মৃত্যু তার স্বাধীনতা-দাতা, কেউ যার রোগ সারাতে পারে না,

মৃত্যু তার মহৌষধ”—এইরূপ সব কথা প্রচার ক’রে মৃত্যুকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা অনেকে করেছেন। ফলে আত্মহত্যা করার বাস্তবিক বেড়েছে। কিন্তু আত্মহত্যা ক’রে কেউ কর্মফলের হাত এড়িয়ে যেতে পারে না। যে দুঃখটা এই শরীর নিয়ে পেতে তোমার আপত্তি, সেই দুঃখটা পরবর্তী শরীরেও তোমাকে পেতেই হবে। সুতরাং যতক্ষণ না স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু ঘটে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজে ইচ্ছে ক’রে মরবার চেষ্টা ক’রে লাভ নেই। যে চেষ্টায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, সেই চেষ্টায় ব্রতী হওয়া ভুল।

(২০০)

জীবন ও মৃত্যুর প্রতি সম্ভাব রাখ। আসক্তি নয়, বিতৃষ্ণাও নয়, একেবারে নিরপেক্ষ উদাসীন। জীবন কালে ভগবান তোমার সাথে এক হ’য়ে আছেন, এই বিশ্বাস ক’রে দুঃখকে অগ্রাহ্য কর। মরলে ভগবানের সাথে তুমি এক হ’য়ে যাবে, এই বিশ্বাস ক’রে ভয়কে জয় কর। বিবাহিত ব্যক্তির মরতে ভয় পায়। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এই যে, সংসারে এরা আসক্ত, আসক্তি এদের অনন্ত জীবনের অনন্ত বিস্তারের কথা বিশ্বরণ করাচ্ছে। অবিবাহিত ব্যক্তির সহজেই আত্মহত্যা করে। এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে, দায়িত্বজ্ঞানের এদের অভাব এবং ইহকালের কর্মের ফল যে কর্মফল না হওয়া পর্যন্ত জন্মজন্মান্তরেও তোমাকে অনুসরণ করো, একথা বিশ্বাস। কারো জীবনের প্রতি অতিতৃষ্ণা মৃত্যুকে ভয়ের জিনিষ ক’রে রেখেছে। কারো জীবনের প্রতি অতিবিতৃষ্ণা জীবনকে অবাঞ্ছনীয় ক’রে ফেলেছে। কিন্তু তোমরা এই দুইদলের একদলেরও অন্তর্ভুক্ত হ’তে পার না। তোমরা হবে জীবন ও মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে সমদৃষ্টি। জীবন থাকবে

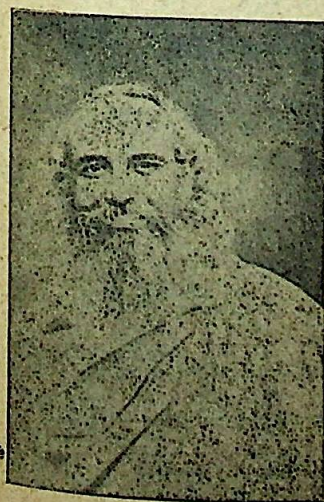
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

/০

হয়, থাকুক, তার পূর্ণ সদ্যাবহার করবার জন্তই মাত্র তুমি অধিকারী।
 নরপ আসবার হোক, আসুক, তাকে বীরের মত নির্ভয়ে আলিঙ্গন করারই
 মাত্র তুমি অধিকারী। কিন্তু কখন তোমার মৃত্যু হবে বা কতদিন তুমি
 বাঁচবে, সেই হিসাব তোমার করার কোনো প্রয়োজন নেই।

অগণিত কস্মীর কৰ্ম্মযোগের আদর্শ;
 সংখ্যাতীত সাধকের ধ্যানের
 দেবতা, কৰ্ম্মসাধনার স্রাব-
 লসনের প্রচারক,
 অসাম্প্রদায়িকতার
 প্রমুখ বিগ্রহ



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ-তালিকা

এই ভ্রমণে যশস্বিনী বাগ্মিনী ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীও
তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন।

—ঃ মালদহ :—

স্থিতিস্থান :—C/o. শ্রীকৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী, ওঙ্কারধাম, কুড়ুলপুর
পোঃ মালদহ, জেলা মালদহ।

সমবেত উপাসনা :—২৫শে নবেম্বর, ৯ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার দহ
৫৥০ ঘটিকা।

ভাষণ :—২৬শে নবেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ, শানবার এবং ২৭শে
নবেম্বর, রবিবার অপরাহ্ন ৪৥০ ঘটিকা।

দীক্ষা :—উক্ত শনি ও রবিবার প্রাতে ৭টা।

মালদহ ত্যাগ :—১২ই অগ্রহায়ণ, সোমবার বেলা ১০টা।

—ঃ বালুরঘাট :—

স্থিতিস্থান :—C/o. শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে, উকিল, সভাপতি বালুরঘাট
অখণ্ডমণ্ডলী, পোঃ বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

সমবেত উপাসনা :—২৯শে নবেম্বর, ১৩ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার দহ

৫৥০ ঘটিকা।

প্রতিধ্বনি

(মাসিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ { পৌষ, ১৩৬৭ { ৯ম সংখ্যা

মুর্ছনা

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব]

(:৮)

তোমারে বাসিলে ভাল

মরণের ভয়

তোমারি চরণ-তলে

পেয়ে যায় লয় ॥

যে তোমারে ভালবাসে,

মরণ তাহার পাশে

প্রেমভরে ছুটে আসে

অতি সহৃদয় ;

মরণ তাহার কাছে

বিভীষিকা নয় ॥

তোমার অধর হ'তে
 স্নেহের স্রুধা
 মরণ বহিয়া আনে
 হরিতে ক্ষুধা,
 হরিতে সকল তৃষা,
 ঘুচাতে নিবিড় নিশা
 মরণ বহিয়া আনে
 প্রেমের মলয়
 তোমার পরশ-মাথা
 ভালবাসা-ময় ॥

মরণ আসিবে বলি'
 ভয় নাহি মোর,
 মরণের কথা শুনি'
 বুকে বাড়ে জোর,
 জীবন-মরণ-মাঝে
 শুধু তব প্রেম রাজে,
 সমান আমার কাছে
 সৃজন-বিলয় ॥

(১৯)

মরণ কেবল নামেই ভয়ঙ্কর,
 মৃত্যু আছে ব'লেই সৃষ্টি
 অপূর্ব সুন্দর ॥

মৃত্যু দিয়ে আড়াল ক'রে
 নিজের স্বরূপ রাখলে ধ'রে,
 কার্টলে আড়াল অমনি দয়াল
 শিথল মনোহর ॥

জন্ম মৃত্যু রহস্য দুই
 একের পায়ে বাঁধা,
 দুই জনেরই সুরের সাধন
 এক তারেতে সাধা,
 একজনাতে যুক্ত দুজন
 সমান শক্তিদর ॥

দূর হ'য়ে যাক আমার আঁখির
 জন্ম-মৃত্যু-বাঁধা,
 দূর হ'য়ে যাক সকল বন্দ,
 সকল ভেদ ও বাধা,
 একের মাঝে হোক সমাধি
 শাস্ত্রত নশ্বর ॥

(২০)

জীবন তাহার নাম—

নিয়ত সংগ্রাম,
 সতত সজাগ চেষ্টা,
 নাহিক বিশ্রাম ॥

প্রতিধ্বনি

মূর্চ্ছনা

[১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

৭৭৮

অনুদিন অনুক্ষণ
 অসত্যের সাথে রণ,
 উৎসাহ উদ্ভূত সদা,
 যত্ন অবিরাম ॥

নিমেষের তরে নাহি
 আলস্যের লেশ,
 হাসি-মুখে সহ্য করে
 অকথন ক্লেশ,
 অতিশয় সজ্ঞাপনে
 নিবিড় বাহু-বন্ধনে
 হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখে
 পরব্রহ্ম-নাম,
 অন্তরে দর্শন করে
 রূপ অভিরাম ॥

সেই ভাগ্যবান জন
 নমস্ত আমার,
 জীবনের ভিত্তিমূলে
 নিত্যপ্রেম বার,
 পিয়া নাম-রসায়ন
 বার চিত্ত-তনু-মন
 হেরি শত প্রলোভন
 নিয়ত নিকাম ॥

(২১)

জন্মেছ ভাই মানুষ পরিচয়ে ॥

সর্বকর্মের জাগাও শক্তি

সত্য মানুষ হ'য়ে ॥

দুঃখী জনার দুঃখদূরণ,

অবোধ জনার বোধের ক্ষুরণ,

তোমার সকল সাধের পূরণ

এক সাথেতে লয়ে,

চলো রে ভাই ধাতু-জীবন

পুণ্য কেতন ব'য়ে ॥

কর্মফলে যেই যেখানে

থাকুক না ভাই প'ড়ে

তোমার চেষ্টা সেই সেখানে

তুলুক মানুষ গ'ড়ে,

অনাদৃতে দাও হে সোহাগ,

তুচ্ছ জনে দাও অনুরাগ,

আত্মস্থখে হও বীতরাগ

স্থিতপ্রজ্ঞ হ'য়ে,

আত্মদানের করবে যজ্ঞ

সকল মানুষ ল'য়ে ॥

সেই ত আসল মানুষ রে ভাই,
 নিজের জন্ত যার কিছু নাই,
 পরের জন্ত রচে রে ঠাই
 নিজেই ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে;
 পরের দুঃখ দূর ক'রে দেয়
 নিজেই দুঃখ স'য়ে॥

(২২)

মানুষের সাথে মানুষের পরিচয়
 প্রেম দিয়া শুধু হয়,
 স্বার্থ-বিহীন শুদ্ধতা-দীন
 স্নিগ্ধ হৃদে যা রয়,
 পুণ্যে বাহার জন্ম, নিত্য
 তৃপ্তিতে যার লয়॥

হিংসা-নিন্দা-দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষে
 জর্জরিত এ ধরা,
 তার মাঝে তোরে বল কোন দেশে
 মানুষ দিবে রে ধরা?
 সে দেশ প্রেমের, সে দেশ স্নেহের,
 মমতায় মধুময়॥

পর নহে পর, সে যে রে আপন,
 প্রেম দিয়া যায় চিনা;
 কে কার আপন, অতি প্রিয়জন,
 কে জানিবে প্রেম বিনা?
 দিবস রজনী প্রেমালুশীলন
 হোক রে সাধনা মারাটি জীবন,
 হৃদয়ের তার পরাইবি যদি
 খুঁজে আনু প্রেম-বীণা;
 প্রেম-বাঁধারে গভীর আঁধারে
 অরুণ হবে উদয়,
 স্তব্ধ হইবে উত্তফণ
 ত্রুদ্ধ লালসা-চয় ॥

সভাপতির অভিভাষণ ❀

ও যস্মাজ্জাতং জগদ্ সৰ্ব্বং যস্মিন্বেব বিলীয়তে ।

যেনেদং ধার্য্যতে চৈব তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

পরমপূজ্যমীয়া মাতৃমণ্ডলী, পরমশ্রদ্ধাভাজন সমাগত অতিথি-
 বৃন্দ, প্রাণপ্রিয় অথগুভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

আপনারা আমার অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা ও প্রেমময় জয়গুরু-সম্ভাষণ
 গ্রহণ করুন ।

* ২০শে নভেম্বর ৪ঠা অগ্রহারণ রবিবার কাছাড় জেলা প্রতিনিধি-সম্মেলনে শ্রীপ্রিয়কান্ত
 চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এল-এল-বি প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ ।

শাস্ত্রত প্রেমের মূর্তিবিগ্রহ পরমাশ্রয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের রাতুল চরণে
প্রণত হইয়া আকুল প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করি,—হে পরম
গুরো! যে অহৈতুকী করুণাবলে মূকের মুখে ফোটে অমৃতভাষণ, পদু
করে দুর্গম গিরি লঙ্ঘন, সেই করুণার কণামাত্র সাধন-ভজনহীন এই
অযোগ্য সম্ভানে দান করিয়া তোমাগতপ্রাণ সাধননিষ্ঠ ত্যাগপ্রব
প্রতিনিধিবৃন্দ-সমাহত এই মহৎ সম্মেলনের গুরুদায়িত্ব বহনে আমা
সহায় হও, আমাকে শক্তি দাও। হে প্রভো! একনিষ্ঠ ভগবৎ
সাধনের অপরিহার্য ফলস্বরূপ স্বর্গীর প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার অধিকারী
সর্বথা যোগ্যতার সমুপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ যে অপার স্নেহবশতঃ আমা
রায় নিতান্ত গুণহীন অযোগ্যকে এই পুণ্য-সমাবেশে সভাপতির মর্যাদা-
পূর্ণ পদে বৃত্ত করিলেন, আমি যেন তোমার অহৈতুকী কৃপাবলে তাঁহাদের
স্নেহ সহযোগিতা লাভে ধন্য হই—আমার উপর হস্ত গুরুদায়িত্ব বর্ধায়
পালন করিয়া তাঁহাদের অপার স্নেহের মর্যাদাদানে সক্ষম হই। হে
পরমশরণ! নিজগুণে সম্মেলনের সর্বতোভদ্র সাফল্যের আশিসদান
আমাদের কৃতকৃতার্থ কর।

সমাগত মাতা ভ্রাতা-ভগিনী ও সজ্জনগণ! আপনাদের রায় সুরম্য
ঐতিহ্যের অধিকারী প্রতিনিধিমণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের সর্ব-
শ্রুততার কথা ভাবিয়া আমি লজ্জায় ত্রিস্ত্রিমাণ। কোন্ ঐতিহ্যের সম্পদ
নিয়া কোন্ যোগ্যতার অধিকারে আমি আজ আপনাদের নিকট আমা
প্রাণের বারতা নিবেদন করিব? মুখ্যতঃ যে উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য
যে আশু কর্তব্য সম্পাদনের জন্ত আপনারা শত অশ্লুযোগ-অশ্লুবিধার
অগ্রাহ্য করিয়া, ব্যক্তিগত অসংখ্য কর্তব্যকেও উপেক্ষা করিয়া এখানে
সমবেত হইয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যসাধনে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া, সেই কর্তব্য

পরিপালনে কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে অপরাধী হইয়া আমি কোন্ অধিকারে আপনাদের কর্তব্য নির্ণয়ে সহায়তা করিব ?

মঙ্গলবাঁধের বিপর্যয়-রোধে কর্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্তই আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। মঙ্গলবাঁধের বিপর্যয় যে আমাদের ত্যাগানু-শীলনের একটা সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, এ বিষয়ে সম্যক্রূপে অবহিত হইয়াই আমরা আপনাদের যথাকর্তব্য স্থির করিতে হইবে। যে মঙ্গলবাঁধ খ্রীষ্টবামণির সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসরের একক অমানুষিক শ্রম ও অতুলনীয় ত্যাগের জলন্ত নিদর্শন হিসাবে মাত্র এক বৎসর পূর্বে ঢল ঢল যৌবন-যুগ্মমণ্ডিত মঙ্গল-সায়রের পরিপূর্ণরূপ পরিগ্রহ করিয়া অনাগত ভবিষ্যতের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদানের যোগ্যতা সঞ্চয় করিয়াছিল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত সেই মঙ্গলবাঁধের পুনর্নির্মাণও তখনই তাহার অলৌকিক সামর্থ্যবলে লোকলোচনের অন্তরালবর্তিনী একক প্রচেষ্টায়ই সুসম্পন্ন হইত। তাই এই সুযোগের আমরা কতটুকু ব্যবহার করিয়াছি, তাহাই হইবে আজ আমাদের বিচার্য। সম্মেলনের পর সম্মেলন করিয়া আমরা কস্ম্পহ্ন গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সেই কস্ম্পহ্ন আমরা নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছি কিনা, তাহা আজ আমাদের বিচার করিতে হইবে। কাহারও প্রতি অভিযোগ অথবা কাহাকেও গোষারোপ করিয়া নহে পরন্তু গৃহীত কস্ম্পহ্নকে রূপদানের বাস্তব দৃষ্টিকোণ পর্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ কস্ম্পহ্ন গ্রহণের জন্তই এরূপ বিচার-বিবেচনা অপরিহার্য।

কাছাড়ের ভ্রাতাভাগিনী আপনারা বিগত সম্মেলনে যে বৈপ্লবিক কস্ম্পহ্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ফলাফলের বিচার-বিবেচনায় তাহার পূর্বে আমি আপনাদিগকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে যত্নবশত জানাই। আপনাদের এই সিদ্ধান্তের সংবাদ পাইয়া

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাণ ভরিয়া আপনাদের আশীর্বাদ করিয়াই কান্ত থাকেন নাই, এই মহৎ দৃষ্টান্তের প্রশংসা করিবার কোন সুযোগেরই তিনি অপচয় করেন নাই। আর্থিক সহযোগিতার পরিমাণের দিক দিয়া ইহা এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই, মঙ্গলবান্ধের অসম্পূর্ণতার পক্ষে প্রেক্ষিতে একথা স্বীকার করা বাইতে পারে। কিন্তু সপরিবারে একবেলা অনাহারে থাকিয়া আপনারা যে অর্থটুকু মঙ্গলবান্ধের জন্য সাশ্রয় করিলেন, তাহার মূল্য ত' অর্থের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে না। মঙ্গলবান্ধের প্রতি আপনাদের প্রাণের যে নিবিড়তম সম্পর্ক ইহা দ্বারা স্থাপিত হইল তাহা, সমগ্র সংঘের অমূল্য সম্পদ। আজ যদি সর্ব স্থানের প্রতিটি অথও ভ্রাতাভগিনী এই দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রাণময় সহযোগের পরিচয় দিতে সক্ষম হন, তবে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, মঙ্গলবান্ধ সংস্কারের আর্থিক প্রয়োজনের পরিমাণ হিসাবে তদ্ব্যবহৃত নগণ্যই হউক, শ্রীশ্রীবাবামণি যে ভাবে আমাদের সহযোগিতা দানের কণামাত্র সুযোগ না দিয়া একক প্রচেষ্টায় মঙ্গলবান্ধকে গড়িয়াছিলেন, তেমনি ভাবে সেই নগণ্য সহযোগিতার অতিরিক্ত কণামাত্র গ্রহণ না করিয়া বিপর্য্যস্ত মঙ্গলবান্ধকে পুনর্গঠিত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিব না। স্বাবলম্বনের মূর্ত্তপ্রতীক তিনি। গুরু হইয়াও নিজ শিষ্যের কাছেও অযাচক তিনি। তাই ত তিনি তিনি তাঁহার সম্মাননের স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিয়া তাহাদেরই দৃষ্টান্তে সমগ্র জগৎগোষ্ঠী স্বাবলম্বনের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহেন! জগৎ ইতে ভিক্ষারূতি দূর করিতে চাহেন। তারই জন্য মঙ্গলবান্ধের বিপর্য্যায়। যে মঙ্গলবান্ধ একদা সমগ্র জগতের সর্বমঙ্গলের আকর হইয়া অথও সংঘের গৌরবে বিষয় হইবে, সেই মঙ্গলবান্ধ প্রতিটি অথও স্বাবলম্বনের প্রতীক হিসাবে গড়িয়া উঠুক, ইহাই তাঁহার অভীক্ষা। তাই তিনি স্বয়ং মনুষ্যগণ

কুমতার মধ্যে নিজ প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া আমাদের ত্যাগ-শক্তিকে প্রবোধিত করিবার জন্ত বারম্বার প্রাণাত্যয় শ্রমে জীবন বিপন্ন করিতেছেন, কিন্তু আমরা কি এখনও নিশ্চেষ্ট থাকিয়া তাঁহার দেব-দেহের উপর এই অমানুষিক অভ্যাসের সহ্য করিব? না, নিজেদের আমরা জগতের কাছে এত অপদার্থ প্রতিপন্ন করিতে পারি না—সেই অধিকারও আমাদের নাই। আমাদের যে তাঁহারই সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে, একদা সমগ্র জগৎ বাঁহাকে স্বাবলম্বনের মূর্ত্ত বিগ্রহ-রূপে পূজা করিবে।

আজ শ্রীগুরুর বিগ্রহস্বরূপ প্রতিনিধি-মণ্ডলীর সন্মুখে দাঁড়াইয়া বারম্বার তাঁহারই অভয়চরণ স্মরণে পড়িতেছে, যিনি নিদারুণ বিপর্যয়ের মধ্যেও নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে কর্তব্য-সম্পাদন করিয়া যাইতেছেন। বিপদকে যিনি সম্পদেরই অগ্রদূত বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহাই ত স্বাভাবিক! তাই তিনি বিভিন্ন সময়ে আমাদের বলিয়াছেন—প্রতিনিধি সম্মেলনকে তোমরা মঙ্গলবোধের প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ রাখিও না। মঙ্গলবোধের লক্ষ্য বাহা, প্রতিনিধি সম্মেলনেরও যে লক্ষ্য তাহাই, একথা তোমরা ভুলিও না। যে আদর্শকে বাস্তবে রূপদানের জন্ত মঙ্গলবোধের সৃষ্টি, সেই আদর্শকে জগন্ময় প্রচারের জন্ত সংগঠনের দিকে নজর দাও। মঙ্গলবোধ তাহার আপন গতিতেই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবে। কিন্তু মঙ্গলবোধকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমাদের পরস্পর মিলনের এই সুযোগ যদি তোমাদের সংঘশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক না হইল, তবে সম্মেলনের উদ্দেশ্যই নিরর্থক হইবে। সম্মেলনের মাধ্যমে তোমাদের পারস্পরিক প্রেম বর্দ্ধিত হউক, একাত্মতা সৃষ্টি হউক তোমাদের মধ্যে। একের সাধননিষ্ঠা অপরের সাধনানুরাগ বর্দ্ধনের সহায়ক হউক। একের ত্যাগের দৃষ্টান্ত অপরকে ত্যাগের পথে দিক-

প্রেরণা। ত্যাগেই প্রেমের বিকাশ। সাধন-সজ্জাত প্রেম তোমাদের বিশ্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করুক। এই বিশ্বজনীন প্রেমই অখণ্ড-আদর্শের মূল, যাহা ব্যতীত আমরা অখণ্ড নামে পরিচিত হইবার অযোগ্য। বিশ্বের সকলকে আপন করিবার সাধনাই অখণ্ড-সাধন। তাই অখণ্ডের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন—

“সবারে আপন কর, বিশ্বেরে কর ঘর।

নিখিল-ভুবনে যেন কেহ নাহি থাকে পর॥”

এই যে আত্মপর-বিভেদ-বর্জিত অবস্থা, যাহাতে নিখিল ভুবনে কেহ কাহারও পর থাকিবে না, যে অবস্থায় নিখিল বিশ্বই হইবে প্রতিজ্ঞের আপনার আপন, সে অবস্থা আসে নিখিল প্রেম হইতে। সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত প্রেম মানুষের ভগবদ্বক্ত শক্তি, যাহা নিখিল বিশ্বের প্রতিনিয়ত ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। সন্তানের প্রতি মাতাপিতার প্রেম স্নেহরূপে সর্বদা তাহাকে বিপদ-আপদে রক্ষা করিতেছে, স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ভালবাসার আকারে সুখে দুঃখে মিলনকে স্থায়ী করিয়াছে, বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের প্রেম কর্তব্য-পালনের মধ্যে প্রকাশিত, তেমনি প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর প্রেমের প্রকাশ সহাবস্থানের উদারতার মাধ্যমে। কিন্তু এই সহজাত প্রেম আত্মপর-বিচারসাপেক্ষ বার্ষ-সংঘাতের ক্ষেত্রে হয় অকার্য্যকর। তাই শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন—

“আপন জনেরে সবাই বাসেরে ভালো,

পরেরে বাসিতে প্রয়োজন হৃদয়ের;

যার মাঝে আছে বিশ্বপ্রেমের আলো,

যার মাঝে আছে উদারতা সাগরের॥”

এই বিশ্বপ্রেমের আলো জ্বালাইতে প্রয়োজন সাধনের দিয়া-কাঠির। সাধনসম্ভ্রাত প্রেমেই মানুষের হৃদয়ে সাগরের উদারতা করে সঞ্চারিত, যে উদারতা আত্মপর-বিভেদ বিসর্জনের হয় সহায়ক। আজ দিকে দিকে বিভেদ-বিচ্ছেদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা দেখিয়া আতঙ্কে দিশাহারা হইলে চলিবে না। অপ্রেমের এই খাণ্ডবদাহন প্রেমের বলেই আমা-দিককে নির্বাপিত করিতে হইবে। তারই জন্ত চাই সাধন—যে সাধন নিখিল বিশ্বকে একসূত্রে করিবে গ্রথিত, সেই জগন্মঙ্গলের সাধন। সেই সাধনই অখণ্ডের সাধন। অখণ্ডের সাধন তাহার একার মঙ্গলের জন্তই নহে। পরন্তু নিখিল বিশ্বের সকলের মঙ্গল-কামনাই তাহার সাধন। তাই অখণ্ডমণ্ডলেশ্বরের শ্রীমুখে উচ্চারিত হইল—

“একলা আমি মুক্ত হতে চাই না প্রাণনাথ,

আমায় তুমি যুক্ত কর বিশ্বজন্য সাধ ॥”

এবং তারই জন্ত বারংবার জন্মমৃত্যুর ক্লেশকেও তিনি হাসিমুখে বরণ করিয়া নিতে কুণ্ঠিত নহেন। পরার্থে আত্মত্যাগের মাধ্যমেই জীবের মুক্তিপথের নিশানা। তাই যে পর্য্যন্ত বিশ্বের একটি জীবও মুক্তির আশ্বাদে বঞ্চিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তিনি দধীচির ত্রায় আত্মত্যাগে সকলকে উদ্ধৃত্ত করিবার জন্ত বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করিবার আশ্বাস দিতেছেন—

“আবার আসিব, আবার হাসিব,

আবার গাহিব গান ;

শুধু বলিবারে,—পরহিত তরে,

নিজেরে করহ দান ॥”

পরার্থে আত্মদানের প্রেরণা আসে বিশ্বজনীন প্রেম হইতে, যে প্রেম জগন্মঙ্গল সাধনের দ্বারা হয় সজাত। তাই নিখিল বিশ্বের সকলকে জগন্মঙ্গল সাধনের প্রতি করিতে হইবে আকৃষ্ট। নিখিল বিশ্বের সকলের মঙ্গলের জন্তই যে সাধন, নিখিল বিশ্বের সকলকে নিয়াই হইবে সেই সাধন। তারই জন্ত শ্রীশ্রীবাবামণি আৰ্য্য সভ্যতার সুবর্ণযুগের বৈদিক সমবেত উপাসনার করিলেন পুনঃ-প্রবর্তন। সেই সময়েও উপাসনায় অখণ্ড-সাধক বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানাইবে—

“যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে নিকট অথবা দূর,

এস হে সকলে প্রাণ-ফুল-দলে পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥”

এই আহ্বান সার্থক হয় না, শুধু মুখের কথায়। এর জন্ত চাই অখণ্ড সাধকের অফুরন্ত প্রেম,—সেই বিশ্বজনীন প্রেম, বাহ্য একাগ্র নিষ্ঠা ও উদগ্র সাধনে হয় প্রবদ্ধিত। ছোট-বড়'র পার্থক্য ভুলিয়া উচ্চ-নীচের বিভেদ ত্যজিয়া, সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রমিয়া, দেশ-বিদেশের দূর উপেক্ষিয়া—সকলে মিলিয়া যে উপাসনায় হইবে সম্মিলিত, সে কাহার উপাসনা, কোন্ শ্রীপ্রভুর পূজা? সকল সাম্প্রদায়িক মতবাদের উর্ধ্ব অবস্থিত, সাকারেতে নিরাকার, নিত্য-নিরঞ্জন পরব্রহ্মের নাদরূপ ওঙ্কার-বিগ্রহ সেই উপাস্ত্রের প্রতীক, আর সর্বমস্ত্রের সার, সর্বমস্ত্রের প্রাণ, সর্ব স্বীকৃতির দ্ব্যতক প্রণবই তাহার জপের মন্ত্র। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-বিধায়ক যে মস্ত্রের অনুভূতিতে বিশ্বকবির কণ্ঠে উচ্ছসিত আবেগে ধ্বনিত হইল—

“হেথা একদিন বিরাম-বিহীন মহা-ওঙ্কার-ধ্বনি

হৃদয়-তন্ত্রে একের মস্ত্রে উঠেছিল রণরনি”।

তপস্তাবলে একের অনলে বহুরে আইতি দিয়া

বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া॥”

মৃত্যু-জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা বেদের সার-
ব্রহ্মগায়ত্রী তাহার সমবেত সঙ্গীত। শোক-তাপ-জর্জরিত কদর্য্য এই
মর্ত্যলোকে স্বর্গের নন্দন-শোভা ফিরাইয়া আনিবার ইহাই যে একমাত্র
পন্থা। তাই যে বিশ্বজনীন প্রেমের বলে সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া—
সকলকে সমভাবে শ্রেষ্ঠের এই অধিকার অকুণ্ঠে বিতরণ সম্ভব, সেই
বিশ্বজনীন প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ প্রেমাবতার অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী
যরপানন্দ পরমহংসদেব সকল সংস্কার এবং সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে উঠিয়া
গাহিলেন—

“আচণ্ডাল ব্রাহ্মণেরে ওঙ্কারের মহামন্ত্র গানে
জাগাও জাগাও আজি ব্রহ্মগায়ত্রীর মহাতানে।
বীর্ঘ্যবান্ ব্রাহ্মণের তপস্তার কুণ্ঠাহীন বল
ছোট-বড় সকলের মর্ম্মদেশ করুক নির্ম্মল ॥”

প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রীর এই সর্ব্বজনীন স্বীকৃতিদানের বৈপ্লবিক আদর্শ
গ্রহণে নিজ জীবনকে বিপন্ন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।
যে প্রেমের টানে তিনি নির্বিচারে সকলকে দিলেন শ্রেষ্ঠ সাধনের
অধিকার, সেই প্রেমেরই বলে “খর তরবারি দেখি শিরোপরি”
তাঁহার “চিত্তে নাহিক ভয়”। তাই একে একে আজ সকল বিরুদ্ধবাদী
বিরুদ্ধতা পরিহার করিতেছেন, কেহ কেহ অনুকূল হইয়াছেন, কেহ বা
হইয়াছেন তাঁহার শরণাগত। এই অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে তাঁহার
প্রেমেরই বলে। তাই তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছেন—
“ছোট, বড়, উঁচু, নীচ, যে যেখানে আছে,
কবে প্রেমভরে টানিয়া আনিবি কাছে?”

তঁাহার এই আহ্বান, তঁাহার এই নির্দেশ আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে, জীবনকে প্রেমের অমরাকুঞ্জে করিতে হইবে রূপান্তরিত। তবেই আমরা সক্ষম হইব বিশ্বদেবতার পূজায় বিশ্বজনকে মিলিত করিতে। বস্তুর বহুতা, তার্কিকের তর্ক, যুক্তিবাদীর যুক্তি কোন কিছুই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। একমাত্র প্রেমই সেই শক্তির আধার, যাহা অপরের হৃদয়ের পরিবর্তনে হয় সক্ষম, পরকে আপন করিবার, দূরকে নিকটে টানিবার রাখে যোগ্যতা—

“কথার কুহেলী নহে,—প্রেমের প্রসার

সবার খুলিয়া দিল হৃদয় ছয়ার;

রহিল না ত্রিভুনে কেহ কারো পর॥”

শ্রীশ্রীবাবামণির এই বাণীই তঁাহার প্রকৃষ্ট নির্দর্শন।

ঐশ্বরিক ভালবাসার পূজারী আচার্য্য স্বরূপানন্দ, ভালবাসার বিশ্বজনীন ক্ষমতায় তঁাহার অফুরন্ত বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসেরই মুক্তন জাগিল তঁাহার সুরে—

এক কণা ভালবাসা

পুরাইবে মোর আশা,

গোপ্পদে আমি গড়িব সাগর

অশান্ত কুতূহলে॥”

ভালবাসার অমোঘ শক্তিতে সকল বিভেদ বিচ্ছেদ দূর হয়, যাহা আত্মপর বিশ্বৃত হয়। তাই জগতের সকলকে আপন করিবার পথ নির্দেশ করিলেন শ্রীশ্রীবাবামণি—

পৌষ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৭২১

“সবারে ডাকিয়া আন প্রাণের পাশে,
সেই ত’ আপনজন, যে ভালবাসে ॥”

এই স্বর্গীয় ভালবাসার সর্বতোবিস্তারই ত সমস্ত দুর্যোগের ঘটাইবে অবসান। ভালবাসা অপরিমেয় শক্তির আধার। ভালবাসা ঐশী শক্তির একান্ত প্রকাশ। ভালবাসার পূর্ণ পরিণতি মানুষকে দেবত্বে রূপিত করে। জীব তখন শিবত্বে হয় প্রতিষ্ঠিত। তাই ভালবাসার সূৰ্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীশ্রীবাবামণি ধ্বংস-ত্রাসে আতঙ্কিত সপিল-ক্রকুটি-ভীত অত্যাচারিতদের অভয় দিয়া বলিলেন—

“বজ্রময় ঝঙ্কারমাথা সাঁঝে, দুর্গতি ও দুর্যোগের মাঝে
জাগিয়া উঠিল মহা-আনন্দের খনি, আমি তার ক্রীণ অনুধ্বনি ॥”
সেই মহা-আনন্দের খনি পরম প্রেমময় শ্রীভগবান। তাঁহার অমৃতময় নামের সেবাই মানুষের অন্তরে জাগায় স্বার্থলেশহীন অনাবিল ভালবাসা, যে ভালবাসার বলে হিংসা-দেষ-পরিপূর্ণ এই পৃথিবীকে স্বর্গীয় সুসমা-গুণ্ডিত নন্দন-কাননে করা যায় পরিণত। তাই ত তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—

“যে আছ যেখানে এস হে সবে,
সাধন করিয়া দেবতা হবে।”

মানবতার পূজারী স্বরূপানন্দ। মানুষকে দেবতায় পরিণত করিয়াই তিনি তৃপ্ত নন, তাঁহার ধ্যানের মানব দেবতারও হবে পূজ্য, হবে সর্বশ্রেষ্ঠ। জীবকে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার জীবন-সাধনা। দুর্যোগের ঘনঘটা দেখিয়া তিনি হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়েন না। সাময়িক বিহুতির হাত হইতে মানুষকে স্বভাবে ফিরাইয়া আনিবার জ্ঞান করেন কর্তব্য-নির্দেশ—

প্রতিধ্বনি

সভাপতির অভিভাষণ

[১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

৭১২

“পশুর মত খাওয়া-খাওয়া নয়রে পেশা তোর,
তুই যে মানুষ, জীবের শ্রেষ্ঠ, প্রেমেই যে তোর জোরা।”

সেই প্রেমের বলে—

“সবারে মিলায়ে এক মহাবিশ্ব
সৃজন করাই তোর যোগ্য যে হয়॥”

কেননা—

“মানুষ হইয়া ভবে পশুর মতন রবে,
মানব-জীবনে এই পরিণাম নয়॥”

তাই প্রেমেরই বলে—

“পশু রে মানুষ কর, স্বভাবে আসীন
মানুষের মন হোক দেবতায় লীন॥”

ভালবাসার অভাবই যে মানব-জীবনে সকল বিপত্তির কারণ, তাহার
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই তিনি বলিলেন—

“বাসতে ভাল পারলি না তুই, বুধাই যে তোর মানুষ নাম।

হিংসা, ঘৃণা, মিথ্যা কেবল দেয় রে ঘৃণ্য পরিণাম॥”

জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আজ ভালবাসা ভুলিয়া পশুত্বকে বরণ করিয়া
নিতেছে। এই অবস্থার প্রতিকার আজ সর্বাত্মে প্রয়োজন। আর
সেই প্রতিকার একমাত্র ভালবাসার অনুশীলন, যে ভালবাসা আত্মপানের
বিনিময়েও পরকে আপন করিয়া দূরকে নিকট করিয়া যত্নবোধে
ঘটাইবে বিকাশ। তাই উদাত্তকণ্ঠে ত্যাগের পথে আহ্বান জানাইলেন

আচার্য্য স্বরূপানন্দ—

পৌষ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৭৯৩

“দে দিয়ে দে সব-কিছু তোমার
 সর্বজনের সুখ-কাম,
 আশ্রদানে বাড়বে রে তোমার
 সত্য মানুষ নামের দাম,”

মনুষ্য-সাধনার এই বাণী তাঁহার মানব-প্ৰীতির এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন।
 মনুষ্যত্বের প্ৰতি তাঁহার অপৰিসীম অনুরাগ দেবত্বকেও তুচ্ছ করে।
 কেননা, এই মনুষ্যত্ব যে দেবেরও হৃদয়ভিত্তিক! তাই ত মনুষ্যত্ব সাধনা-
 ন্তর তাঁহার জ্ঞানের অভিব্যক্তি—

“মানুষ শুধু নয় রে মানুষ, সৃষ্টিতে সে সব-সেরা,
 দেবত্ব আর ঈশ্বরত্ব চৌদিকেতে রয় ঘেরা,॥”

এখানেই শেষ নয়। ধ্যানের দৃষ্টি আরও প্রসারিত করিয়া তিনি
 দেখিলেন—

“মানুষ মানবতার বেদী, নাই রে তাতে হিংসা-ঘেব;
 দেবতারও পূজ্য মানুষ, পুণ্য কীর্তি তার অশেষ॥”

সেই কীর্তিমান মানুষের স্বরূপ—

“সর্বজনের সুখের লাগি’ নিত্য নয়ন রয় রে জাগি,
 বিশ্বজনার হৃৎ-দূরণ ধ্যান যে তাহার অবিরাম।

তাই ত মানুষ সবার শ্রেষ্ঠ, তাই ত’ মানুষ অভিরাম॥”

বিশ্বজনের হৃৎ-দূর করাই বাহার একমাত্র ধ্যান, সেই অভিরাম
 পুরুষ—

“ইচ্ছা হলে পারে রে মে

দেবতা জঁগরের বেশে

লক্ষ কোটি আর্তজনের

প্রাণ করিতে পূর্ণকাম॥”

কিন্তু কিসের বলে মানুষ সর্বশক্তিমানের শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া লক্ষ কোটি আর্তজনের প্রাণ পূর্ণকাম করিবে? সে ত’ প্রেমেরই বলে, প্রেমেই হইবে তাহার জীবনের রূপান্তর, রক্তমাংসের দেহটাই ত তাহার স্বরূপ নয়। তাই ষুগাচার্যের ধ্যানলোকে—

“রক্ত মাংস নয় রে মানুষ;

মানুষ প্রেমের পুণ্য ধাম॥”

মনুষ্যত্বের সাধনা প্রেমেরই সাধনা, যে প্রেম চাওয়া-পাওয়ার হিঙ্গু-নিকাসের বাহিরে, যে প্রেম প্রতিদান-নিরপেক্ষভাবে দূরকে নিকট করে, পরকে আপন করে। তারই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই প্রেম-স্বরূপ বারামণির মধ্যে—

“যে আমারে চাহিয়াছে, আমি তার চিরকাল;

যে আমারে চাহে নাই, আমি তারো হই;

অতি কাছে অতি দূরে, ছড়ান প্রেমের জাল,

সকলেরে বাঁধি আমি, কারো পর নই॥”

পতিত-পাবন অনাথ-শরণ প্রেম-স্বরূপ আচার্যদেবকে আত্মার আত্মীয়-রূপে পাইবার পন্থাও তাই তিনিই নির্দেশ করিয়াছেন—

“পতিত অধম অনাথের লাগি’ পরাণ বাহার কাঁদে,

অমল, প্রীতির প্রসূন-মালায় সেই ত আমারে বাঁধে॥

পৌষ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৭২৫

আমুন, আমরা একনিষ্ঠ সাধনের দ্বারা জীবনকে স্বর্গীয় প্রেমের
স্বয়ময় মণ্ডিত করিয়া উচ্চ-নীচ ছোট-বড়'র ভেদ ভুলিয়া সকলকে
সমভাবে সমাদর করিয়া আমাদের পরমপ্রিয় বাবামণির সন্তানরূপে
পরিচয় দিবার যোগ্যতা অর্জন করি। তিনি কতবার কতভাবে
আমাদের বলিয়াছেন—ছোটকে অবহেলা করিও না, ক্ষুদ্রকে অনাদর
করিও না, বিশ্বের একটি প্রাণীকেও উপেক্ষা করিও না। বিশ্বদেবের
উপাসক তোমরা, বিশ্বের সকলের সহযোগিতার মাধ্যমেই তোমাদের
দুঃখময় হইবে অব্যাহত। নিজ জীবনে তিনি বহুবার নিতান্ত অলস
অকর্মণ্যকে দিয়া অসাধারণ কর্ম সম্পাদন করাইয়া আমাদের
শক্তিতে বিশ্বাস-পরায়ণ হইবার প্রেরণা দিয়াছেন। তাই তিনি
বলিলেন—

“পিপীলিকা নহে ক্ষুদ্র, তাহারেও ডাক তব কাজে;
অনাদৃত কেহ যেন নাহি রহে ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে॥”

যেনদিন, জীবনের কত ঘটনার মাধ্যমে আমরা তাঁহার “ক্ষুদ্র
পিপীলিকার দ্বারা মত্ত হস্তীর কর্ম-সম্পাদনের” দৃষ্টান্ত দেখিতেছি, অথচ
তাঁহার এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আমরা সমর্থ
হইরাছি কি? উচ্চ-নীচের বিভেদ, ক্ষুদ্র-বৃহত্তের পার্থক্য ভুলিয়া
সকলকে আমাদের সকল কার্যে সাদর আহ্বান জানাইতে পারিলাম
কোথায়? তাই না অবহেলিত জীবনমৃতদের জন্ত তাঁহার প্রাণ
দিয়া উঠিল—

“ছোট বলি, নীচ বলি’ অবহেলা করিছে

মাহাদেবে নরনারী ধরণী-ভরা,

সদাই রহিল যারা কেবলি পিছে পিছে

জীবন থাকিতে যারা রহিল মরা,

তাহাদের সকলেরে নব-জীবন-সুধায়

করিব সঞ্জীবিত এই মোর সাধ,

সকলের আগে যাতে আসিয়া তারা দাঁড়ায়

জীবনের কাজে ল'ভে আত্মপ্রসাদ।"

এই অসাধ্য-সাধন তাঁহারই পক্ষে সম্ভব যিনি, বলিয়াছেন,—“যে
বড় সকলেরে, বাসি ভাল প্রাণভরে।” এই প্রাণভরা ভালবাসা
দ্বারাই তিনি নীচ, ছোট, অবজ্ঞাতকে নব-জীবন-সুধায় সঞ্জীবিত
করিবেন। আমাদেরও তিনি অনন্ত জীবনের আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন—
“বাঁচো সকলের তরে, সীমাহীন কাল ধরে” এই একই উদ্দেশ্য
সংসাধনের জন্ত।

যুগে যুগে মহাপুরুষেরা প্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছেন জগৎ হইতে
হানাহানি হিংসা-ঘেঁষ বিদূরণের জন্ত। তবুও আজও হিংসার উত্তর
পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া আতঙ্কে বুক কাঁপিয়া উঠে। তাই যুগে যুগে
নব নব রূপে আবির্ভাব তাঁর ধর্ম্মতীর পাপভার লাঘবের তরে। যুগের
প্রয়োজনের তাগিদে আবির্ভাব হয় যুগাবতারকর মহাপুরুষের।
যুগোপযোগী পন্থায় তাঁহার প্রতীকার নির্দেশ করেন। জগৎ-জোড়ায়
অশান্ত পরিবেশের দিকে তাকাইয়া যুগাবতার আচাঞ্চল্য বরূপান
ব্যথাহত চিত্তে গাহিয়াছিলেন—

“তাপদগধ ধরনী।

কণ্ঠ পিপাসিত শুষ্ক হৃদয় তার,

বন্ধ ভরিয়া শুধু রুদ্ধ হাহাকার,
সর্ব-অঙ্গ-জোড়া জলন্ত অঙ্গার,
জালায় জলিছে জননী॥”

প্রতিকার ধনিত হইল তাঁহারই কণ্ঠে—

“কে আছ কোথায় ওরে জননীর সন্তান,
জীবন-শোণিত আজি করাও মায়েরে পান,
বাঁচাও মায়েরে করি’ আপন জীবন দান,
কণ্ঠে ফুটাও তাঁর নিত্য-অভয়-বাণী॥”

সন্তানের আত্মদানই এর একমাত্র প্রতিকার। তাই তাঁহার সন্তানের
প্রার্থনা, তাঁহারই ভাষায়—

“আমায় তুমি শিখাও প্রভো জীবন-দানের খেলা,
কেমন ক’রে ভাসাতে হয় অকুল মাঝে ভেলা।
বিদ্রোহের ঐ চক্ৰকানি, উন্মিমালায় ক্রুদ্ধ বাণী
কেমন ক’রে সাজাবে মোর আনন্দেরই মেলা॥”

তারই জন্ত তিনি আমাদের দিয়াছেন অভয়-সাধনের দাফা। আর
শত বাধা-বিপত্তির মধ্যে নির্ভীক চিত্তে সাধন পথে অগ্রগমনের প্রেরণাও
দিয়াছেন তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায়—

“শত বাধা শত বিঘ্ন করুক গর্জন,
সিংহ ব্যাঘ্র করুক না তীব্র আক্রমণ,
তথাপি নির্ভীক প্রাণে
আপন লক্ষ্যের পানে

উদ্ধার মতন বেগে করহ গমন,
ভয়ে ভুলিও না চির-সাধনার ধন॥”

আত্মবিশ্বাসের বলে দুর্যোগের মধ্যে লক্ষ্যপথে অবিচল থাকিবার
জগৎ তাঁহার উৎসাহোদীপক বাণী—মৃতের প্রাণেও সাড়া জাগায়—

“লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর শত অপমান,
নির্যাতন অভ্যুত্থান পরিত্রাণ,
সব দলি’ পদতলে
আত্মবিশ্বাসের বলে
আপন অভীষ্ট পথে হও আগুয়ান,
তিমির-নিবিড় নিশা হোক অবসান ॥”

অবশেষে অগ্রগমনের পথে অথগু-সাধকের উৎসাহ অটুট রাখিবার
জগৎ উজ্জল ভবিষ্যতের মনোরম আলেখ্য রচনা করিয়াছেন অনবদ্য
ভাষায়—

“সম্মুখে চাহিয়া দেখ, তব ভবিষ্যৎ
কি সুন্দর, কি উজ্জল, কেমন বৃহৎ,
ধ্যানময় বিধাতার
অপরূপ সৃষ্টি কার
রচিছে বৈচিত্র্যময় মূর্তি মহৎ !
অগ্রসর হও পুত্র, এ তোমারি পথ !”

কিন্তু নির্ভীক প্রাণে, আত্মবিশ্বাসের বলে আমরা অভীষ্টনাভের জগৎ
তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রগতি অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছি কি?
তাহা যদি পারিতাম, সাধন যদি আমরা নিষ্ঠার সহিত করিতাম, তবে
অমা-রজনীর বিভীষিকা অগ্রাহ করিয়া আমরাও তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ
মিলাইয়া-গাহিতে পারিতাম—

“আমুক গভীরা রজনী, আমি ভয় ত করি না তারে ।

নাম-যে আমার পরমসঙ্গী, জপিব তা বারে বারে ॥”

নামকে যিনি পরম সঙ্গী করিয়াছেন, বিশ্বজনীন, প্রেম তাঁহার মধ্যে শাশ্বত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । তাই জগৎ-জোড়া খাণ্ডব দাহনের মধ্যেও তিনি বলিলেন—

“প্রাণ গেলেও করবি না তুই প্রেমের অপলাপ ।” প্রেমের যত্নাবেই একে অপরকে পর ভাবে । তখন প্রেমের অপলাপ করিয়া—“আপন জনে পর ভেবে তুই ভুগ্‌বি মনস্তাপ ।” কেননা, এই অপ্রেম ত কণ্ঠস্থায়ী । প্রেমই চিরস্থায়ী । তাই সাময়িক বিশ্বৃতির অপনোদন হইলে মনস্তাপ অবশ্যস্তাবী । তাই শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন—

“আজকে যাদের শত্রু ভাবিস,

আপন তারা তোর ;—

এক নিমেষে বুঝতে পারি

ঘুরলে মনের মোড় ।”

মনের মোড় ফিরাইবার পন্থারও তিনি নির্দেশ করিলেন—

“বুদ্ধিরে তুই ঠিকপথে নে,

বন্ধুতা কর বিবেক সনে,

প্রাণ থেকে তুই দূর কবে দে

প্রতিহিংসার ছাপ ।”

কেননা হিংসার প্রতিকার হিংসার দ্বারা হয় না । প্রেমের বলেই হিংসাকে প্রতিহত করা যায় । প্রতিহিংসা শুধু বিদেষকে চিরস্থায়ী করে । তাই তিনি সত্যকবানী উচ্চারণ করিলেন—

আত্মবিশ্বাসের বলে দুর্ঘোণের মধ্যে লক্ষ্যপথে অবিচল থাকিবার
জগৎ তাঁহার উৎসাহোদীপক বাণী—মৃতের প্রাণেও সাড়া জাগায়—

“লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর শত অপমান,
নির্যাতন অন্ত্যাচার পর্বতপ্রমাণ,
নব দলি’ পদতলে
আত্মবিশ্বাসের বলে
আপন অভীষ্ট পথে হও আগুয়ান,
তিমির-নিবিড় নিশা হোক অবসান ॥”

অবশেষে অগ্রগমনের পথে অথণ্ড-সাধকের উৎসাহ অটুট রাখিবার
জগৎ উজ্জল ভবিষ্যতের মনোরম আলেখ্য রচনা করিয়াছেন অবস্থা
ভাষায়—

“সন্মুখে চাহিয়া দেখ, তব ভবিষ্যৎ
কি সুন্দর, কি উজ্জল, কেমন বৃহৎ,
ধ্যানময় বিধাতার
অপরূপ সৃষ্টি কার
রচিছে বৈচিত্র্যময় মূর্তি মহৎ !
অগ্রসর হও পুত্র, এ তোমারি পথ ॥”

কিন্তু নির্ভীক প্রাণে, আত্মবিশ্বাসের বলে আমরা অভীষ্টলাভের জগৎ
তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রগতি অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছি কি?
তাহা যদি পারিতাম, সাধন যদি আমরা নিষ্ঠার সহিত করিতাম, তবে
অমা-রজনীর বিভীষিকা অগ্রাহ করিয়া আমরাও তাঁহার কর্তে কর্তা
মিলাইয়া-গাহিতে পারিতাম—

“আমুক গভীরা রজনী, আমি ভয় ত করি না তারে।

নাম যে আমার পরমসঙ্গী, জপিব তা বারে বারে ॥”

নামকে যিনি পরম সঙ্গী করিয়াছেন, বিশ্বজনীন, প্রেম তাঁহার মধ্যে শ্রুত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাই জগৎ-জোড়া খাণ্ডব মহনের মধ্যেও তিনি বলিলেন—

“প্রাণ গেলেও করবি না তুই প্রেমের অপলাপ।” প্রেমের দাবাবেই একে অপরকে পর ভাবে। তখন প্রেমের অপলাপ করিয়া—“আপন জনে পর ভেবে তুই ভুগ্‌বি মনস্তাপ।” কেননা, এই অপ্রেম ত কণস্থায়ী। প্রেমই চিরস্থায়ী। তাই সাময়িক বিন্দুতির অপনোদন হইলে মনস্তাপ অবশ্যস্তাবী। তাই শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন—

“আজকে যাদের শত্রু ভাবিস,
আপন তারা তোর ;—

এক নিমেষে বৃষ্ণতে পাবি

ঘুরলে মনের মোড়।”

মনের মোড় ফিরাইবার পহারও তিনি নির্দেশ করিলেন—

“বুদ্ধিরে তুই ঠিকপথে নে,

বন্ধুতা কর বিবেক সনে,

প্রাণ থেকে তুই দূর কবে দে

প্রতিহিংসার ছাপ।”

কেননা হিংসার প্রতিকার হিংসার দ্বারা হয় না। প্রেমের বলেই হিংসাকে প্রতিহত করা যায়। প্রতিহিংসা শুধু বিদেষকে চিরস্থায়ী করে। তাই তিনি সত্যকবানী উচ্চারণ করিলেন—

“করুবি কারে ঘৃণা, ওরে
 করুবি কারে ঘেব,
 ঘেবাঘেবি—রেশারেশি—
 মূর্থতা অশেষ।”

আর তারই পরিণাম—

“বিঘেষ আর হিংসা দিয়ে
 বরুবি কিবা লাভ ?
 ওতে বাড়বে শুধু পাপ ॥”

তাই যীশুখ্রীষ্টের অমরবাণী—“পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে নাহে”
 প্রতিধ্বনিত হইল আচার্য্য স্বরূপানন্দের স্বকীয় ভঙ্গিমা—

“পাপের মাঝেই পাপীর নিধন,
 এইকথা নয় ভুল ;
 পাপ থেকে যে রইল দূরে,
 কে তার সমতুল ?”

তাই পাপের পথ হইতে, বিঘেষের পথ হইতে, হিংসার পথ হইতে
 প্রতিনিবৃত্ত করিয়া প্রেমের পথে, মিলনের পথে করিলেন দিগ্‌দর্শন।
 কষুকণ্ঠে তাঁহার ধ্বনিত হইল—

“অমিলন সত্য মরণ,
 মিলনেই সত্য জীবন।”

মিলনের পথেই হইবে অতীতের সকল পাপের অবসান।
 বাণী শুনাইলেন তিনি—

পৌষ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৮০১

“হিংসায় উচ্ছলিত
 বিদ্বেষে উচ্চকিত
 সকলের লাস্ত চিত্ত
 জেগে এক মহান গানে
 ভুলে যাক বিভিন্নতা,
 ভুলে যাক অতীত কথা,
 ভুলে যাক প্রাণের ব্যথা,
 মিলে যাক ঐক্যতানে ॥”

ভবিষ্যতের আশঙ্কা নিরসনের পন্থাও তিনি প্রদর্শন করিলেন—

“মননের সকল ক্রটি,
 কুসাজের সকল জুটি
 ঘুচে যাক, যাক্রে মুছে
 প্রেমিকের প্রেমের বানে ॥”

মিলনের পরিধি আরও বিস্তৃত হইল। বিভিন্ন-ভাষা-ভাষীর স্বাতন্ত্র্য
 বজায় রাখিয়াই ঐক্যবদ্ধ হইবার পথ-নির্দেশ করিলেন—

“যে ভাষায় গান্ধী রে গান,
 বিভেদের হোক অবসান
 সান্ত্বনা-শান্তি-মাথা
 মধুময় প্রেমের দানে ॥”

তাই ভেদবোধ পরিহার করিয়া ভাবটুকুকেই সার করিতে
 বলিলেন। কেননা—

“বক্ষ জুড়িয়া যার প্রেম ও আশা,

সকল ভাবাই তার মাতৃভাষা ।”

তেমন প্রেমিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন—

“জগতের ভিন্ন ভাষা

কত যে ছিন্ন আশা,

সকলি হোক মিলিত

ভোরই ঐ বিরাট প্রাণে ।”

দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বিভেদ বিসম্বাদ পরিহারের পথ
তাহার অনবদ্য । হিংসার কুটিল পথ পরিহার করিয়া প্রেমের বলেই এই
বিভেদকে দূর করিতে হইবে । তাই নিখিল বিশ্বের সকলকে ডাকি
বলিলেন—

“জননী, জন্ম-ভূমি, বিশ্ব-এ’ তিন,

এক ওরে এক, নহে ভিন্, নহে ভিন্ ॥

একের মাঝারে তিন, তিনেতেই এক,

প্রেমের নয়ন খুলি’ প্রাণ ভ’রে দেখ,

থাকিস্ না হিংসার চির-পরাধীন ॥”

প্রেমের অভাবে আমরা আজ এককেই তিন বলিয়া ভ্রম করি অথবা
তিনের মধ্যে যে সামান্য, তাহাকে খুঁজিয়া পাই না । আর হিংসার দ্বারা
সেই বিভেদকে করি চিরস্থায়ী । যেখানে প্রেমের অনন্তিত্ব, সেখানেই
হিংসার বিকার সকল কল্যাণকে করে বিদূরিত । সেজন্যই আর
প্রেমের অনুশীলন হইয়াছে একান্ত অপরিহার্য । বিশ্বের সমস্ত সমস্যার
নিরসনে প্রেমের অমোঘ শক্তির নিদর্শন অগণ্যমণ্ডলের আদর্শ
স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের জীবনের প্রতিটি বাক্যে, কার্যে ও চিন্তায়

পৌষ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিধ্বনি

৮০৩

মুপরিষ্ট। তাই জগন্ময় আজ প্রেমের বিকাশ ঘটাইতে হইবে।
 নিজে প্রেমিক হইয়া প্রেমের বিশ্বজয়ী আকষণে সকলকে প্রেমের পথে
 টানিয়া আনিতে হইবে। তবেই আজিকার কদর্য মর্ত্যলোক স্বর্গের
 নবন-শোভায় সুশোভিত হইয়া উঠিবে। মর্ত্যের এই স্বর্গীয় পরিবর্তনে
 আমরা যদি আমাদের শক্তি-সামর্থ্য ক্রীত্বীবামণির প্রদর্শিত পন্থায়
 নিয়োজিত করিতে সদা-সচেতন থাকি, তবেই আমরা পরমপিতার সন্তান
 বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার লাভ করিব। সেই পরম অধিকার
 লাভের পথে আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি-সংশোধন মানসে আমি আজ
 আমার বক্তব্যকে সর্বতোভাবে তাঁহারই বাণী-সঙ্কলনে রূপায়িত করিতে
 আমার ক্ষুদ্র সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিয়াছি। আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত
 সচেতন যে, এই প্রতিনিধি-মণ্ডলীতে সমুপস্থিত আমার অগ্রজগণ সকলেই
 ক্রীত্বীবামণির জীবনাদর্শকে নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিবার
 প্রচেষ্টায় আমার চেয়ে অধিকতর অগ্রসর।

তাঁহার অবিস্মরণীয় বাণী আপনাদের চিত্তপটে আলোপ্য রেখায়
 অঙ্কিত। তথাপি যাহাকে শতবার দেখিয়া দেখার আশা মিটেনা,
 তাঁহার ক্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী সহস্রবার শুনিয়াও কর্ণশ্রান্ত হয় না, তাঁহার
 চির-পুরাতন অথচ চিরনূতন বাণী বার বার বলিয়াও রসনা তৃপ্ত হয় না।
 তাহা ছাড়াও বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁহার বাণীর স্মরণ মনন নিধি-
 যাসনের যে বিশেষ তাৎপর্য আছে, তাহা ত উপেক্ষা করা যায় না।
 যে সময়ে নিদারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াও মানুষ একদেশদর্শিতা-মুক্ত
 হইতে না পারার জটিল পরিস্থিতিকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া
 ফেলিতেছে, সেই সময়ে তাঁহার পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার নিদর্শন স্বরূপ যে
 নিরপেক্ষ সমাধানের ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি, তাহারই বলে অতীতের
 সঙ্কট আর-অবিশ্বাস দূর করিয়া নীচতা-হীনতা-বোধ শতখণ্ডে চূর্ণ

করিয়া আমাদেরকে আত্মস্থ হইতে হইবে। জাতিকে বাঁচাইবার এছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই। প্রতিহিংসার পথে নহে, প্রেমের পথে,—
অবিশ্বাসের পথে নহে, ভালবাসার পথে জাতিকে পরিচালিত করিতে
হইবে। আজ সকলকে জানাইতে হইবে, বুঝাইতে হইবে, শিখাইতে
হইবে—

“হিমাঙ্গি হ’তে আরো বেশী উচু হোক
ভালবাসিবার বিচিত্র সুখ-লোক,
অতিক্রমিয়া কোটি বিশ্বের সীমা

ছড়াইয়া যাক্ তোর ছবাহর ডোর ॥”

জাতিকে বাঁচাইবার নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

আজ কর্তব্য আমাদের উভয় দিকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে
একদিকে সংঘের অস্তিত্ব আর একদিকে জাতির অস্তিত্ব যুগপৎ উভয়
বিপন্ন। কেননা, জাতিকে বাদ দিয়া ত সংঘ টিকিতে পারেনা। তাই
জাতীয় বিপর্যয় সংঘের অস্তিত্বকেও বিপর্যাস্ত করে। বিশেষতঃ যে দেশ
দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা
সৃষ্ট নহে, সেই অখণ্ড-সংঘ জাতির ক্ষুদ্র-বৃহৎ রূপক বা সীমাবদ্ধ
কোনও ছবিপাকে নিজেকে সম্বন্ধে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারেনা।
তাই আজ আমাদেরকে সাধকের একনিষ্ঠা নিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।
উভয়ের প্রতিকার-পন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।
সেই সামঞ্জস্যের ইঙ্গিত আছে খ্রীষ্টীয়াবামণির আদর্শে। আমরা যদি
তঁহার আদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারি, তবেই একান্ত
হই সমস্যার সমাধান সম্ভব। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাই প্রয়োজন
হইয়াছে নূতন করিয়া তাঁহার বাণীর পর্যালোচনা। সেই প্রয়োজন

পৌষ, ১৩৬৭]

সভাপতির অভিভাষণ

প্রতিনিধি

৮০৫

ভাগিদে আজ আমি কর্তব্যবোধে যাহা করিলাম, তাহার সকল ত্রুটি-
বিচ্যুতি আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

মাত্র সাতদিন পূর্বে ত্রিপুরারাজ্য অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলনের
নজপতি হিসাবে আমার যে বক্তব্য অখণ্ড-সমাজের নিকট রাখিয়াছি,
এখানে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া তৎপ্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ
করতঃ কর্তব্য নির্দ্ধারণের সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি।

আপনাদের স্নেহ-প্রদত্ত সুযোগের কতটুকু সদ্যবহার করিতে সক্ষম
হইলাম, জানিনা। হয়তঃ অপব্যবহারই করিয়াছি। তথাপি আপনা-
দের ক্ষমাহীন স্নেহানুরক্তি আমার সকল ত্রুটি সকল বিচ্যুতি দূর করিয়া
সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে, ইহাই একান্তভাবে প্রত্যাশা করি।

পরিশেষে জাতির এই দুর্দিনের প্রতিকারে শ্রীশ্রীবাবামণি যে
কর্কটপূর্ণ-প্রপূরক অমোঘ পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎপ্রতি সকলের
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। সেই
পন্থা তাহারই অনবদ্য ভাষায় আপনাদের উপহার দিতেছি—

“চল দলে দলে, হরি-ওঁ ব’লে

পথে, প্রান্তরে, জঙ্গলে,

জাগ্রত জনে ঘুমন্তগণে

টানিয়া আনিবে মঙ্গলে।

মর্দিত করি’ অবিশ্বাসের

উষ্ণ বায়ুর ঝঞ্ঝারে

মিথু অমিয় কর বরিষণ

হরি-ওঁ মধু-ঝঞ্ঝারে।

প্রতিধ্বনি

ভ্রম-সংশোধন

[২ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

৮০৬

যুক্তির ধূলি নামুক মাটিতে,
 কর্দম হোক অশ্রুতে,
 প্রণব-মন্ত্রে দানুক দীক্ষা
 চির-চণ্ডাল অ-শ্রুতে ।
 মহাপাতকী কি পুণ্যকর্মী
 কাহারো না করি' ভেদ-বিচার
 সবার আননে ফুটুক হাত্ত,
 সবারে দানিয়া নিজাধিকার ।
 নিজেই চিনিয়া চিনিবে বিশ্ব,
 চিনিবে প্রকৃত আপন জন ;
 চিনিবে, চিনাবে, দেখিবে, দেখাবে,
 কোথায় কেমন পরমধন ।"

ওঁ শান্তিঃ । ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

কলিকাতা

শ্রীপ্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য

ভ্রম-সংশোধন

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীঅনুপম সেন মহাশয় লিখিত "সেবা" প্রবন্ধে
 অবাচক আশ্রমের আয় সম্পর্কে ৭১৬ পৃষ্ঠায় যে সকল অঙ্ক ছাপা
 হইয়াছে, তাহা মুদ্রাকর-প্রমাদ । ইহা সঠিক সংখ্যা নহে এবং
 সংখ্যা পাণ্ডুলিপিতে ছিল, ছাপিবার কালে তাহার ওলটপালট
 হইয়াছে । প্রঃ সংঃ

পৌষ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

৮০৭

বিশ্ব-বাণী

বিগত ১৬ই কা্তিক, ২রা নবেম্বর তারিখ বুধবার দুর্গাপুর (বর্দ্ধমান) ব্রীহৎমোহন ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট নামক চমৎকার একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সমবেত উপাসনান্তে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব ক্ষুদ্র একটি প্রার্থনাস্তিক ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন,—সকলের সর্বশক্তি এক সঙ্গে এক কাজে লাগাইতে পারিবার কৌশলই সংঘকে শক্তিশালী করে। সংঘের ভিতরে আদেশ পালনের প্রবৃত্তিকে অনুশীলনের দ্বারা আর পারস্পরিক মমত্বের দ্বারা ইহা সম্ভব হয়। যে গুরু শিষ্যদের স্বাধীনতা দেন, সে গুরু প্রকৃত প্রস্তাবে দায়িত্বই দেন। যে যত স্বাধীনতা পায়, তার তত অধিক আজ্ঞাবহতার প্রয়োজন পড়ে। উন্ন্যার্গগামী উচ্ছৃঙ্খলতার নাম স্বাধীনতা নহে। যে কোনও কাজ করিবার জন্ত আগে প্রয়োজন সামগ্রিক ধ্যান এবং তার পরে প্রয়োজন ব্যাপক প্রস্তুতি। ধ্যান নিভৃত কাজ, প্রস্তুতিও অনেক সময়ে নীরব হইতে বাধ্য। কস্ম-সাফল্যের এই মূল সূত্রে উপেক্ষা করিয়া বাহারা চলে, তাহারা খুব কম সাফল্যই অর্জন করিয়া থাকে। এই কথাগুলি শ্রবণ রাখিয়া সকলের চলা উচিত। শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ এবং ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির দ্বারাও অতি বৃহৎ কস্মের সম্পাদন-সম্ভাবনা সম্পর্কে সকলকে সজাগ থাকিতে হইবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আতিথেয় সমাগত সকল ভক্তবৃন্দ বিশেষ ভাবে আধ্যাতিক হন।

১৮ কা্তিক ৪ঠা নবেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব চিত্তরঞ্জন (বর্দ্ধমান) শ্রীলতা মাঠে এক বিরাট

জনতার সমক্ষে দেড় ঘণ্টাব্যাপী এক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন,—পরিস্থিতির হতবুদ্ধিকর বিপর্যয় দেখিয়া কোনও ব্যক্তি বা জাতিরই মুসরিয়া পড়া সম্ভব নহে। যে জাতির ভিতরে একটা মাত্র শক্ত মেরুদণ্ডের মানুষ জন্মিয়াছেন, সে জাতির ভিতরে আরও বহু মানুষ যে ঐক্য সামর্থ্য ও যোগ্যতানিয়া আবির্ভূত হইতে পারেন, এই বিশ্বাস থাকা আমাদের উচিত। বিশেষ করিয়া, যেই জাতির ভিতরে একই সময়ে বা কাছাকাছি সময়ে অনেকগুলি অসামান্য-শক্তিধর পুরুষ আবির্ভাব সম্ভব হয়, সেই জাতির কোনও সময়েই হতাশ হওয়া সম্ভব নহে। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, ক্ষমত্যাধকারীদের অবিচার, সাম্প্রদায়িক হীনীতি বা প্রাদেশিকতার অত্যাচার একটা সত্যিকার জাতিকে কখনো নিশ্চূল করিতে পারে না। এই ধারণা প্রত্যেকের থাকা উচিত এবং প্রত্যেকটা নরনারীর মধ্যে যে মহাশক্তি মুগ্ধ ভাবে বিद्यমান রহিয়াছে, সংযম, ব্রহ্মচর্যা ও ধর্ম্মানুশীলনের বলে তাহাকে প্রকাশিত ও প্রকটিত করিয়া তোলা উচিত।

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী তাঁহার দুই ঘণ্টাব্যাপী ভাষণে বলেন—ভারতবর্ষ তাহার ধর্ম্মসাধনার ঐকান্তিকতার মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বের শ্লাঘনীয় এবং বরণীয় মহত্ব অর্জন করিয়াছিল। আমরা যে সেই মহিমার পুনরুদ্ধার করিতে অবশ্যই পারি, এই ধারণা ও বিশ্বাস আমাদের লোপ পাওয়া উচিত নহে। ধর্ম্মবলে আমরা ভারতের লুপ্ত গৌরবকে উদ্ধার করিব, এই কথা যেন আমাদের স্মরণে থাকে। ঐ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, ধর্ম্মের ভান আর ধর্ম্ম এক নহে, মানুষের কার্য নিজের মহত্বকে অশেষ চাকচিক্যে প্রকাশিত করিয়া ধর্ম্ম আর প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া সমার্থক নহে। আমাদের প্রকৃত ধার্ম্মিক হইয়া

১৯শে কার্তিক অপরাহ্নে সোয়া পাঁচ ঘটিকায় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব চিত্তরঞ্জে তাঁহার দ্বিতীয় ভাষণ দেন। দেড় ঘণ্টাব্যাপী ভাষণে তিনি বলেন,—ধর্মের বিরুদ্ধে অতি শক্তিশালী জনমত তৈরী হইয়াছে। ধর্মের নামে যে অধর্মের অনুশীলনই বেশী হইতেছে, এই বিষয়ে বলিতে গেলে দ্বিমত নাই। একদল মানুষকে অপর এক বৃহত্তর দল মানুষের উপরে ছড়ি ঘুরাইবার সুযোগ দিবার জন্তই যে ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে, এই কথা নানা নিপুণ যুক্তির সহিত প্রচারিত হইতেছে। ধর্মের উপলক্ষ্য করিয়া অনাচার ও অত্যাচার উভয়ই যথেষ্ট বা কল্পনা-ভীত পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি ধর্ম এমন একটা জিনিষ, যাহা না হইলে আমাদের চলে না। রাজনীতির জন্ম পেটের ক্ষুধা এবং কন্ডার ক্ষুধা হইতে, ধর্মের জন্ম প্রাণের ক্ষুধা হইতে। ধর্মের নামে যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহার মোখিক প্রতিবাদে কোনও লাভ নাই, কারণ ইহার মধ্যে বহুলাংশ সত্যও রহিয়াছে। কাৰ্যতঃ অভিযোগ খণ্ডনের জন্ত জীবনে কলঙ্কমুক্ত অনাবিল ধর্মকে যুগান্তীকৃত করিতে হইবে। ইহাই আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের ধ্যান ছিল, ছিল জাগ্রতের স্বপ্ন, ছিল স্বপ্নের জাগৃতি। কিন্তু আমরা দায়বদ্ধহীন হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত স্মহান্ কোস্তুভ মণিকেও হেয় জান করিয়া স্তূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। যুক্তিবাদের হেতুভাগ আশ্রয় করিয়া আমরা প্রকৃত সদযুক্তিকে অবহেলা করিয়াছি এবং মানুষ নামে জগতের বুকে ক্ষীণ বক্ষে বিচরণ করিবার যোগ্যতা অজ্ঞানে পরাভূত হইয়াছি। কেন আমরা এই পণ আজ করিব না যে, একেবারে নিষ্কিন্ধ হইয়া যাইবার বাঁকি নিয়াও আমরা জগতে চিরকাল বিদ্যমান থাকিবার সাধনা করিয়া যাইব? আমাদের ভয়, দুর্বলতা, সঙ্কোচ, দ্বিধা, হীনমত্যতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। নবজীবনের অমৃত-

রসায়নে জীবনের ভাঙকে পূর্ণ করিয়া আমরা লইবই, ইহার জন্ত যে
ত্যাগই স্বীকার করিতে হউক, যে পরিমাণ দুঃখই আমাদের ভুগিতে
হউক। আজ শুনিব বীথ্যের বাণী, আজ শুনাইব পৌরুষের বাক্য।
ভীক, দুর্বল, আত্মাবজ্ঞাপরায়ণদের জীবনে আজ দিব্য এক রূপান্তর
ঘটুক।

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী তাঁহার ভাষণে বলেন,—সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা
নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্তে অনেক অনুপ্রেরণা আমাদের জন্ত দিয়া
গিয়াছেন। সন্ন্যাসাশ্রমই একমাত্র প্রশংসনীয় আশ্রম, অত্র আশ্রমগুলি
নিন্দাই বা হয়, এই ভ্রান্ত বোধ পরিহার করিয়াও আমরা সন্ন্যাসীদের
জীবন হইতে অনিন্দনীয় দৃষ্টান্ত সমূহ গ্রহণ করিব এবং প্রত্যেকে নিজ
নিজ প্রয়োজনের দাবী ও জীবনের উপযোগিতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া
তাহাদের সদ্যবহার করিব। ভারতের অতীত গৌরবজনক মহনীরতা
পুনরায় আমাদের জীবনে ফুটিয়া উঠিতে পারে, এই বিশ্বাস যেন
আমরা না হারাই। বিশ্বাসই মানুষের বল, অবিশ্বাসই তাহার
পরাজয়। আমরা যেন বিশ্বাসী হই।

৬ নবেম্বর ২০ কার্তিক রবিবার অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকার
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব চিত্তরঞ্জে তাঁহার তৃতীয় ভাষণ
দেন। তিনি বলেন,—আইনের লক্ষ্য হইতেছে জনসাধারণকে সমাজের
অমঙ্গলকর কার্য হইতে বিরত রাখা। কিন্তু তাহার উপায় হইতেছে
ভীতিপ্রদর্শন। চুরী করিও না, কারণ চুরী করিলে জেল খাটতে
হইবে। ধর্ম্মের আত্মিক উদ্দেশ্যের দিক বাদ দিলেও তাহার
সামাজিক উদ্দেশ্য একটা অতি বিরাট বস্তু। ধর্ম্মও চাহে যে
জনসাধারণ যেন সমাজের ক্ষতিকর কাজে রত না হয় শুধু রক্ত না
হয়, তাহাই নহে, এমন কি রূচও যেন না পায়, এককণা রোচনাও

যেন অন্তরে না জাগে। ইহার উপায়ও ধর্ম বলিয়া দিতেছেন। এক এক ধর্ম এক এক প্রকার এবং কোনও কোনও ধর্ম বহুপ্রকার উপায়-নির্দেশ করিতেছেন, যাহা অবলম্বন করিলে মন হইতে পাপের প্রবৃত্তি দূর হইয়া যাইবে। পাপের প্রবৃত্তিই যদি চলিয়া যায়, পাপ করিবে কে? পাপই যদি কেহ না করে, সমাজের অকুশল হইবে কি করিয়া? এই হিসাবে ধর্ম এবং আইনের উদ্দেশ্য এক, যদিও ধর্মের প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতা আইন অপেক্ষা অনেক ব্যাপক, অনেক বহুমুখ। ধর্মের সহিত ভেজাল মিশিয়া ধর্মকে সমালোচকদের কুট রসনার ইন্ধন করিলেও ধর্ম যখন স্বভাবে অবস্থিত, তখন তাহা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং জগৎ সকলেরই অশেষ কুশল সম্পাদনে সমর্থ। এই কারণেই ধর্মকে পরিহার করার কুবুদ্ধি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। ধর্ম যদি আমাদের প্রাণে সাহস না দিয়া দেয় কাপুরুষতা, আমাদের বাহুতে বল-সঞ্চার না করিয়া করে দুর্নীতির সহিত গাঁটছড়া বাঁধিবার প্ররোচনা, তাহা হইলে এমন ধর্ম আমাদের বাঞ্ছনীয় না হইয়া বর্জ্যনীয়ই হইবে। প্রকৃত যাহা ধর্ম, যাহা প্রাণের আহার, মনের বিকাশ-সহায়ক, দেহের শুদ্ধতা-সঞ্চারক, কর্মের পৌরুষ-প্রদায়ক, চেষ্টার অনন্তত্ব-বিধায়ক, ধ্যানের অবিচ্ছিন্নতা-সম্পাদক, লক্ষ্যের একতানতা-বিধায়ক, সর্বজনের সহিত মৈত্রী এবং প্রেমের বন্ধন-রচক, আমরা সেই ধর্মেরই সাধন করিতে চাহি। ধর্ম নামে অধর্ম, অপধর্ম বা উপধর্মের পূজা করিলে আমাদের প্রাণের পিপাসা মিটিবে না।

ঐচ্ছাসিক সাধনা দেবী তাঁহার তৃতীয় দিনের দুই ঘণ্টাব্যাপী ভাষণে বলেন,—গার্হস্থ্য জীবনকে হেয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া করিয়া অনেক ধর্মোপদেশ্য মানুষের মনে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার বা দুর্বলতা ঢুকাইয়া

দিয়াছেন যে, সংসার না ছাড়িলে ধর্ম হইবে না। এই কুসংসার আমাদের ছাড়িতেই হইবে। অতীত ভারতবর্ষের ধর্ম-জীবনগুলি অনুধাবন করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাই, অধিকাংশই সংসারশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন। সন্ন্যাসের চিরকালই প্রয়োজন আছে কিন্তু গার্হস্থ্যও মিথ্যা নহে। সুতরাং গৃহি-সন্ন্যাসি-নির্বিশেষে সকলেই এক মনে এক প্রাণে ধর্মের সাধনা করিতে থাকুন, ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতাগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে যে অসামান্য উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়।

১৩ই নবেম্বর ২৭ কার্তিক রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকাতে তারকেশ্বর (হুগলী) ধর্মীয় পাঠাগারের চতুর্থ বার্ষিক উৎসবের সভাপতি রূপে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব পৌনে দুই ঘণ্টাব্যাপী একটা ভাষণ দেন। তিনি বলেন,—সর্ব ধর্মই শিখাইয়াছে প্রেম। কোনো ধর্ম সেই শিক্ষা সর্বব্যাপক, কোনো ধর্ম তা আংশিক এবং সঙ্কীর্ণ। কিন্তু আদিম বর্বর যুগ হইতেই ধর্ম মানুষের মনকে স্বার্থত্যাগী, আত্মত্যাগী, অনাদরকারী, আদর্শের জ্ঞাত আত্মবিসর্জনে উৎসাহবান্ এবং পরকে আপন করিবার কাজে কুচিমান, আগ্রহবান্ ও চেষ্টাশীল করিয়াছে। জগতে প্রেমই শাস্ত্রত সত্য, প্রেমেই নিত্য কুশল। এইজন্তই প্রেমের প্রকর্ষ সাধনেই ধর্মসমূহের চেষ্টা। এই হিসাবে ধর্ম মানুষের পরম অবলম্বন; ধর্মহীন মানুষ হয় না, হইতে পারে না। যাহাতে আমরা ধর্মের অভিনয়ে গা ঢালিয়া না দিয়া সর্বজীবে সমত্ববোধ বিস্তার করিয়া প্রকৃত ধর্মের অনুশীলন ও অনুসরণ করিতে পারি, তাহাই আমাদের কাম হউক। আকাশের ঘনঘটা দেখিয়া আমাদের বিচলিত হইলে চলিবে না। চতুর্দিকে ঘৃণ্য পরিবেশ এবং হীন ষড়যন্ত্র দেখিয়া আমাদের ভা

পৌষ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৮১৩

পাইলে চলিবে না। আমাদেরকে জগত্তের পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া
মুছিয়া দিবার আয়োজন যতই দ্রুত ও নিশ্চয় হইয়া থাকুক না কেন,
মরিতে আমরা চাহি না, মরিব না, মরিতে পারি না। আমরা মৃত্যুর হাত
হইতে অমৃতভাণ্ডার নিজেদের ধর্মের বলে ছিনাইয়া নিয়া জগতে দৃষ্টান্ত
স্থাপন করিব যে, জগতে চিরকাল ধর্মেরই জয় এবং অধর্মেরই
পরাজয়।

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী তাঁহার দুই ঘণ্টাব্যাপী ভাষণে বলেন,—
ভারতীয় পুরুষ এবং ভারতীয় নারী উভয়েরই ধ্যানের আদর্শ দিবা-
জীবন। সেই জীবন সাধনার দ্বারা লাভ করা যায়। যে সাধনা
ত্যাগ, ব্রহ্মচর্যা ও সংযমের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই দিবাজীবনের
বিধাত্রী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুণ্যমাস পৌষ মাস :—এই মাসে আবির্ভূত হইয়াছিলেন
লোকভ্রাতা বাণেশ্বর, গণগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহ আর, অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
ঐশ্বর্যময়ী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব। অখণ্ডগণের নিকটে এই মাসের
প্রতিটি দিন একটি বিশেষ দিন। আমরা আমাদের অগণিত ভ্রাতা ও
ভগিনীদের নিকটে এই নিবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন এই
মাসটি ভরিয়া লোকহিত সাধন করেন, পুণ্য কাজে রত থাকেন,
পারোপকারে ব্রতী হন, জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সৌহার্দ
স্থাপনে বদ্বান হন, হরি-ও কীর্তনে আকাশ বাতাস মুখরিত করেন,

ঘরে ঘরে অথও-সংহিতা পাঠ করিয়া মানবমাত্রেয়ই মনে দিব্য চেতনার উন্মেষ সাধনে যত্নবান হন।

প্রধানমন্ত্রীর ভক্তি :- ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ. হু. কলিকাতার বি. সি. লাহা আর্ট গ্যালারি দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই আর্ট গ্যালারির নীচের তলে ভগবান্ বুদ্ধের দুইটি প্রাচীন মূর্তি ছিল। দ্বিতলে উঠিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে প্রধানমন্ত্রী উ. হু. বলিলেন,—“না, উঠিব না, কারণ নীচের তলে ভগবান্ বুদ্ধের মূর্তি রহিয়াছে। আমি উপরে উঠিলে তাঁহার অমর্যাদা হইবে।” বাধ্য হইয়া গ্যালারির কর্তাদের নীচের বুদ্ধমূর্তি উপরে তুলিয়া আনিতে হইল, তবে ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উপরতলার শিল্পদ্রব্য সমূহ দেখিতে যাইতে সম্মত হইলেন।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা :- বৈজ্ঞানিক এবং টেকনিক্যাল পরিভাষা-বোর্ডের সাম্প্রতিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান এবং কারিগরী বিজ্ঞানের ভাষায় প্রচলিত বিভিন্ন শব্দ ও সংস্কৃতির একটা ভারতীয় রূপ তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক পরিভাষা এবং সংস্কৃত প্রচলিত আছে, তাহাই ভারতীয় ভাষাসমূহে প্রচলিত থাকিবে। বিভিন্ন মূল ধাতুর এবং পদার্থের পরিচায়ক শব্দের সম্পর্কেও এই নীতি অনুসৃত হইবে। অর্থাৎ প্রচলিত আন্তর্জাতিক পরিভাষাই ভারতীয় ভাষাসমূহে গৃহীত হইবে। বোর্ডের বৈঠকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ভারতীয়তা সৃষ্টির পণ্ডিতীপনার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রকাশ করা হইয়াছে। সরকারকে অনুরোধও করা হইয়াছে যে, এ ধরনের জবড়জং দেশীয় পরিভাষার বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনার প্রয়াস যেন নিবৃত্ত করা হয়।

ইতিমধ্যে কিন্তু অনেক রাজ্য-সরকারের প্রচুর পরমা জলে ঢাণিয়া দেশী পারিভাষিক শব্দ তৈরী হইয়াছে। যেমন, রেলের সিগন্যালকে

করা হইয়াছে “সঙ্কেত-পটিকা।” ক্লোরিংকে আমরা “গন্ধহরিণ” নাম দিয়াছিলাম। এতজ্ঞাতীয় দেশীয় পরিভাষার কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শব্দগুলি এক একটি শাব্দিক কীর্ত্তি হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান বুঝিবার জন্ত, অথবা বিজ্ঞানের তত্ত্ব লিখিবার জন্ত ভারতীয়ের কাছেই উহা যে কোন সুবিধার ও স্বাচ্ছন্দ্যের হেতু হইয়াছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জগলুল পাশার প্রভাবে মিশরীয় পণ্ডিতেরাও আধুনিক বৈজ্ঞানিক শব্দের বিপুল আরবীয় পরিভাষা রচনা করিয়া-
ছিলেন। তেঁরো বংশের চেষ্টায় একটি বিপুল আরবীয় পরিভাষা মিশর সরকার রচনা করাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই পরিভাষাময় বিরাট অভিধান আবর্জনা হিসাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অকারণ স্বদেশীানা এক প্রকারের মানসিক বিকলতা। হাইড্রো-
জেন, অক্সিজেন, ইলেকট্রনের নূতন নাম হইলেই ভারত বিজ্ঞান-
জগতের শীর্ষে আরোহণ করিবে, এমন ভ্রান্ত ধারণা আমাদের থাকা
উচিত নহে।

শ্রীরামধারী মাহাতো :- “মন্দির” দ্বিতীয় সংস্করণ একখানার
জন্ত শ্রীরামধারী মাহাতো মহাশয় তিনটি টাকা পাঠাইয়াছিলেন।
রূপে কোনও ঠিকানা না থাকায় তাঁহাকে “মন্দির”ও পাঠাইতে পারা
বাইতেছে না। এমতাবস্থায় আমাদের সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকটে
অরোধ এই যে, কোন্ স্থান হইতে শ্রীরামধারী মাহাতো এই তিন
টাকা পাঠাইয়াছিলেন, সেই ঠিকানাটি যে ভাবে হউক সংগ্রহ করিয়া
৪১, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা (৬) শ্রীমতিলাল সেনের নিকটে
পাঠাইবেন।

বাহ্যিক সভ্যতায় আতঙ্ক :- ওয়াশিংটনের ১৫ই নবেম্বরের সংবাদে
প্রকাশ,—ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীএম. সি. চাগলা আজ এখানে এক

বক্তৃতায় বলেন, যন্ত্র মানুষের ত্রায় চিন্তা করিতে পারিবে, একথা ভাবিয়া আমি শিহরিয়া উঠিতেছি। আগে হইতে নির্বাচনের কলার বলিয়া দিতেছে, এ যন্ত্র ত হাতের কাছেই রহিয়াছে। ক্লীভল্যান্ডে এমন একটি যন্ত্র দেখিলাম, যা 'সিন্ফোনী' বা সুর-সুবমা সৃষ্টি করিতেছে। তবু ভাগ্য ভাল, এ সুরটা তেমন ভাল হয় নাই। বিজ্ঞানীরা নাকি এমন যন্ত্র তৈরী করিবেন, যা রোগ-নির্ণয় করিবে, মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শও দিবে। বাস্তবিক, যন্ত্র মানুষকে কোথায় নিয়া যাইতেছে! ইলেকট্রনিক-বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া আমি আতঙ্ক বোধ করিতেছি না, সুরের জগতে, সঙ্গীতের পৃথিবীতে, মানুষের ভাগবত ও আদিক সাধনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের এই প্রাচুর্ভাব আমি মানিয়া নিতে পারি না।

শ্রীচাগলা আরও বলেন, শিল্পকলার চর্চাকে বহু পিছনে রাখিয়া বিজ্ঞানের শিক্ষা আগাইয়া চলিয়াছে। বর্তমান যুগের ইহাই ইহাও সর্বাপেক্ষা বড় বিপদের লক্ষণ। যে শিক্ষা মানুষের ভাগবত ও আদিক প্রয়োজন মিটাইতে পারে না, তার মধ্যেই বিপদের বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অবশ্য আমি একথা বলি না যে, গজদন্ত-মীনারে বসে এ পৃথিবীর সমস্ত কিছু শুভ ও অশুভ শক্তিকে অস্বীকার করিয়া যাইতে হইবে, আমি মোটেই তা বলিতেছি না। আমরা চাই এমন মানুষ, এ পৃথিবী ও পৃথিবীর বর্তমান সমাজকে স্বীকার করিয়া নিয়াও উর্দ্ধের দরজা আকাশের দিকে যাহারা তাকাইতে পারিবে।

ডি-ভি-সি ও বিদ্যুৎ:—গত ১৬ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ দে, নয়াদিল্লীতে ডি-ভি-সি'র সহিত সংশ্লিষ্ট ত্রি-সরকার এবং পরিবহন কমিশন ও ডি-ভি-সি কর্তৃপক্ষ স্বার্থহীন ভাষায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রকাশ যে, ইহার ফলে অক্ষমতার কথা স্বীকার করিয়াছে

নয়া দিল্লীর সরকারী মহলে উদ্বোধনের সঞ্চার হইয়াছে। অপরপক্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান ডি-ভি-সি'র বিদ্যুতের উপর নির্ভর করিয়া পশ্চিম বাংলা ও বিহারের শিল্পাঞ্চলগুলিতে নব নব উদ্বোধনের আয়োজন করিয়া রহিয়াছেন তাহারা লইয়া নবভারত গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছিল, ইহার ফলে ঐসব অঞ্চলে হতাশার সঞ্চার করিয়াছে।

আরও প্রকাশ, ডি-ভি-সি কর্তৃপক্ষ উক্ত বৈঠকে জানাইয়াছেন যে, মাইথন এবং পাঞ্চং প্রোজেক্টের যে দুইটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। উক্ত কেন্দ্র দুইটি হইতে দামানসোল, রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কেন্দ্রদ্বয় বন্ধ করার ফলে কোন কোন কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হইবে এবং ঐ সকল শিল্পে বেকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। উৎপাদন কেন্দ্রদ্বয় বন্ধ করার কারণস্বরূপ ডি-ভি-সি কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, 'জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যাইবে না। কারণ, দামোদরে যে পরিমাণ জল পাওয়া যাইবে, তাহাতে জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পক্ষে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব নয়। অপর পক্ষে এক শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারদের মতে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করিতে হইলে যে সকল প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল থাকা দরকার, পরিকল্পনা ব্যয়িতারা প্রথমে সেই দিকে দৃষ্টি দেন নাই। উক্ত বিশেষজ্ঞদের মতে (১) বারিপাতপূর্ণ জলে পরিপূর্ণ নদী হইতে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। (২) জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করিতে অরণ্যের গুরুত্বও নেহাৎ কম নয়। (৩) কৃত্রিম জলপ্রপাত হইতে টারবাইন যন্ত্রের সাহায্যে জলবেগাত্মক শক্তি উৎপন্ন করা হয়। সুতরাং এই শক্তি শিল্প বিকলোৎপাদনের যথেষ্ট সাহায্য করে।

আমাদের বিশ্বাস, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র যাহাতে বন্ধ করিয়া

দিতে না হয়, কর্তৃপক্ষের সেই দিকে নজর রাখিয়া কাজ করাই সমস্ত হইবে। ডি-ভি-সি'র ঢকা-নিলাদ শূণ্ণে পর্য্যাবসিত হইলে তাহা কেবল কলঙ্ককরই হইবে, তাহা নহে, অনেক ভাবী সম্ভাবনা নষ্টও হইবে। জাতির মনে হতাশার সৃষ্টি হইবে।

বরাউনিতে তৈল-শোধনাগার :- আসাম-নাহারকাটিয়ার কেবো-সিন তৈল শোধনের কারখানার জন্ত বিহারের বরাউনিতে পনরো শত একর জমি খাস করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়ান ইঞ্জিনীয়ারেরা বরাউনিতে কারখানা স্থাপন সম্পর্কে কতকগুলি অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, বরাউনিতে তৈল-শোধনাগার স্থাপন করিতে হইলে কারখানার ২৫০ একর পরিমিত জমিতে ৬ হুঁ গভীর স্থান বাগি দিয়া ভর্তি করিতে হইবে এবং এজন্ত ২ কোটি টাকা খরচ হইবে। দ্বিতীয়তঃ কারখানার জন্ত নির্বাচিত স্থানের জমি নীচে জলের অবস্থানের জন্ত কারখানায় শোধিত তৈল রাখিবার আধার-সমূহ খুব সতর্কতাসহকারে নির্মাণ করিলেও জলের সহিত তৈলের সংযোগ সাধিত হওয়ার ফলে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তৃতীয়তঃ কারখানা হইতে নির্গত জল যে স্থানে গিয়া পড়িবে, তাহা হইতে গঙ্গা নদী পর্য্যন্ত জল নির্গমনের জন্ত হয় ছয় মাইল লম্বা একটি খাল কাটিয়া হইবে—না হয় অনেকগুলি পাম্প বসাইয়া এই জল অপসারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রকাশ যে, রাশিয়ার ইঞ্জিনীয়ারদের এই সব কথাই ফলে ভারতীয় পরিকল্পনা-কমিশন বরাউনিতে তৈল-সংশোধনাগারে কাজ আরম্ভ করিবার জন্ত চূড়ান্ত নির্দেশ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

এই সংবাদ দ্বিবিধ বিচারেই উদ্বেগজনক। বরাউনিতে এই কারখানাটি হইলে বরাউনি অঞ্চলের এবং বিহারের জনসাধারণের

[পৌষ, ১৩৩৭]

৮১৯

অতি দ্রুত ঐহিক উন্নতি লাভের বিশেষ এবং অপ্রত্যাশিত সহায়তা
হইত। সুতরাং কারখানা এখানে স্থাপিত না হইলে আশাভঙ্গ-
জনিত উদ্বেগ ও অশান্তি অপ্রত্যাশিত নহে। কিন্তু আলোচ্য তৈল-
শোধনাগারের সহিত সমগ্র ভারতের স্বার্থও জড়িত। ফলে,
প্রয়োজনের তুলনায় অত্যধিক মূলধন নিয়োগ করিতে হইলে
বা বিস্তারনের ফলে কারখানার ও প্রাণের হানি হইলে, সেই ক্ষতি
ভারতেরই ক্ষতি।

ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের উপযোগিতা :—বোম্বাইয়ের ১৯শে নবেম্বরের
সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডাঃ বি, ভি, কেশকার
এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে দেশে এমন অবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার উপর
গুরু আরোপ করেন, বাহাতে বহুসংখ্যক ছোট ছোট সংবাদপত্র গড়িয়া
উঠিয়া পল্লীবাসীদের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয়। বর্তমানে বড় বড়
সংবাদপত্রগোষ্ঠীর আধিপত্য রহিয়াছে। উন্নত দেশগুলিতে অবশ্য ইহা
দুর্দুর্বিহায্য। অত্যাশ্চর্য্য শিল্পের ত্রায় ভারতেও সংবাদপত্র শিল্প এক বিরাট
একচেটিয়া ব্যবসায়ের পরিণত হইয়াছে। তিনি বলেন, সংবাদপত্র
শিল্পের সহিত বাহারা জড়িত, তাহাদেরই এমন উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি
করিতে হইবে, বাহাতে বহুসংখ্যক ছোট ছোট কাগজ গড়িয়া উঠিতে
পারে। ইংরাজী সংবাদপত্রগুলি বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল
করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদের ভারতীয় ভাষায়
প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির নিকট পরাজয় বরণ করিতে হইবে। একমাত্র
ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি বিশেষ করিয়া ছোট ছোট
সংবাদপত্রগুলি গ্রামবাসীদের নিকট পৌছিতে সক্ষম হইবে। জাপানে
সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যার তুলনায় ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির প্রচার-
সংখ্যা অত্যন্ত কম। সুদূর ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভারতীয় সংবাদপত্র-

গুলি পরিচালিত হয় না বলিয়া সম্ভবতঃ প্রচারসংখ্যা এত কম। এমনও হইতে পারে যে, সংবাদপত্রে যেসব জিনিষ পরিবেশন করা হয়, তাহা হয়ত জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি করিতে পারে না। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, সম্পাদক অথবা সাংবাদিকদের নিকট বাহা তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, তাহা হয়ত জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়াছে।

তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ভাল কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলি কি কি কারণে নিজেদের অস্তিত্ব নিয়াই বিপন্ন হইয়াছেন, বড়কর্তাদের কোন্ কোন্ খামখেয়ালীর দরুণ প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহ করিতে গিয়া গলদঘর্ষ হইতেছেন এবং পরে হাল ছাড়িয়া দিয়া খাতি খাইতেছেন, সেই সংবাদটি রাখিতে পারিলে ভাল কাজ করিতেন।

ছাত্রদের অভিযোগ কিসে দূর হইবে?—কলিকাতার ১৫ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ,—পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে ডাইন চ্যান্সেলার ডাঃ সুবোধ মিত্রকে যে সম্বন্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, তাহার উত্তরে ডাঃ মিত্র বলেন যে, তাঁহারা পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা চিন্তা করিতেছেন। তিনি মনে করেন যে, প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলি যদি সরল, সিধা এবং স্পষ্ট হয়, তাহা হইলে ছাত্রদের অভিযোগের কারণ বহুলাংশে দূরীভূত হইবে।

বহুলাংশে দূরীভূত হইলেই চলিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। সর্ব্বাংশে দূর করিতে হইবে। পরীক্ষকেরা কি অপক্ষপাত ভাবে খাতা দেখেন? কেহ কেহ কি খামখেয়ালী করিয়া ছাত্রদের উপরে ভাষার প্রাপ্য শাসনদণ্ড উত্তোলন করেন? বহু ছাত্রছাত্রীর খাতা দেখিবার আগেই কি ঠোঙ্গা তৈরীর দোকানে চলিয়া যায়? নম্বর যোগ করিতে বসিয়া কি টেবুলেটারেরা ভুল ফল লেখেন? পাশ ছাত্রছাত্রীকে ফেল

আর ফেল ছাত্রছাত্রীকে পাশ বলিয়া ঘোষণা করিয়া কি মাঝে মাঝে
দুঃস্বপ্নহীন অমানুষিক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়?

এগুলিও বিবেচনা করিতে হইবে। মৌখিক অমৃত-ভাষণে বা
দাপাতমধুর আশ্বাসে পাপ দূর হইবে না।

অনভিজ্ঞের আশ্ফালন :—কলিকাতার ২২শে নবেম্বরের সংবাদে
প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অনাথবন্ধু রায় “ঐতিহ্যশালী”
আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির সহায়তা ও উন্নতি কল্পে পশ্চিমবঙ্গ বিধান
সভায় বিল উত্থাপন করিলে বিরোধী পক্ষের সদস্য ডাঃ মণীন্দ্র মোহন
চক্রবর্তী (ফেরোয়ার্ড ব্লক) বলেন যে, অতি পুরাতন এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে
আইনের মাধ্যমে সঞ্জীবিত করিবার কোনও যুক্তি আছে বলিয়া তিনি মনে
করেন না। কেবলমাত্র ঐতিহ্য রক্ষার জন্তই যদি এই আইন প্রয়োগ
করিতে হয়, তাহা হইলে সতীদাহ প্রথার ঐতিহ্যকেও বাঁচাইয়া রাখিতে
হয়। তাঁহার মতে কবিরাজিতে টাইফয়েডের কোনও ঔষধ নাই।
আয়ুর্বেদের কদর ত শুধু মদনানন্দ মোদকে আর মৃত সঞ্জীবনী সুরায়।

ডাঃ চক্রবর্তী চমৎকার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আয়ুর্বেদ অনভিজ্ঞ
ব্যক্তিরা এই জাতীয় প্রলাপ ব্যতীত আর কি উক্তি করিতে পারে?

ভাষা ও ঐক্য :—দিল্লীর ২১শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ,
নরাদিল্লিতে ফিরোজ শাহ রোডস্থিত ভারতীয় তথ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এক
জনসভায় “ভাষা-সমস্যা ও ভারতের ঐক্য” সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সংসদ-
দল ও রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের প্রাক্তন সদস্য সর্দার কে এম পানিকর
বলেন যে, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যপুনর্গঠিত হওয়ার ফলে দেশের
ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার-আশঙ্কা ‘নিবৃদ্ধিতা-প্রসূতা’। ভারতের বিভিন্ন
অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক হইতে পরস্পরের উপর এত নির্ভরশীল যে,
ইহারা পৃথক হইয়া থাকিতে পারে না। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুন-

গঠিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিবে দূরে থাকুক, বরং সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তামিল-ভাষী ও তেলেগুভাষীদের মধ্যে একটা বৈরিতা ছিল, কিন্তু এখন তাহাদের নিজ নিজ পৃথক রাজ্য হওয়ায় তাহাদের মধ্যে মিত্রতা গড়িয়া উঠিয়াছে। মারাঠি ও গুজরাতিদিগের সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে।

তিনি প্রধানতঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টি আলোচনা করিয়া বলেন যে, ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন প্রশ্ন নাই। স্ব স্ব অঞ্চলে প্রত্যেকটি ভাষার পূর্ণবিকাশের সুযোগ দিতে হইবে। ভারতে এক উর্দু ব্যতীত অল্প সমস্ত-ভাষাই সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ভারতের মত বিশাল দেশে বহু ভাষা থাকাই স্বাভাবিক। বহুভাষী দেশ পৃথিবীতে নূন কিছু নয়। সমগ্র ইউরোপে একমাত্র জার্মানী ও ইটালীই একভাষা-ভাষী দেশ। এমন কি, গ্রেট ব্রিটেনেরও ভাষা-সমস্তা রহিয়াছে। উত্তরাঞ্চলের স্কটিশ ভাষা এবং ওয়েলসের ওয়েলশ্ ভাষা ইংরেজী হইতে অনেকখানি ভিন্ন।

শ্রীপাণিকর তাঁহার সমগ্র বক্তৃতায় আসামের সাপ্রতিক ভাষা-লগ্না সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নাই। -

জেনে রাখা ভাল :- ভারত সরকারের পত্র-স্থচনা-কার্যালয় দ্বারা প্রকাশিত তথ্য হইতে জানা যায় যে, ভারতের রেল লাইনের মোট-লম্বা ৪৮,৮৬ মাইল। তার মধ্যে ব্রডগেজ লাইন ২৬,০৫৩ মাইল; মীটার-গেজ লাইন ২৮,৮১৬ মাইল এবং ছোট লাইন ৩,৭১৭ মাইল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও ২,০০০ হাজার মাইল লম্বা রেল লাইন ভারতে স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পোষ, ১৩৬৭]

সামগ্রিক প্রসঙ্গ

প্রতিক্রিয়া

৮২৩

ত্রিপুরা-রাজ্য অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলনের নবম অধিবেশন :—

স্থান—উদয়পুর, তারিখ—২৭শে কার্তিক, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৬০, রবিবার, সময়—অপরাহ্ন এক ঘটিকা।

২৭শে কার্তিক রবিবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় শান্ত পরিবেশের মধ্যে একটি সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হয়। সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দের আহ্বায়ক গ্রহণের পর নির্দিষ্ট সময়ে স্থানীয় রমেশ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-গৃহে এক গাভীপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সভার কার্য আরম্ভ হয়। আগরতলা, পুরাণ আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, বিশালগড়, কাকরাবন, মধুবন, মুহুরীপুর, জোলাইবাড়ী, অমরপুর, ফিলিয়া, লেখুছড়া, কমলপুর, শালগড়া, মেলাঘর, মোহরছড়া, তেলিয়া-বুড়া, চরিলাম, সাক্রাম, চাম্পামুড়া, চক্রপুর, কৈলাসহর এই চব্বিশটি মণ্ডলীর প্রতিনিধিরা যোগদান করিয়াছিলেন। আগরতলা হইতে উনসত্তর জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি শ্রদ্ধেয় প্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য এম-এ-এল-এল-বি (কলিকাতা) এবং শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি শ্রীসনৎ কুমার দে, উকিল (খোয়াই, ত্রিপুরা) কে মালা-চন্দনে ভূষিত করা হয়। আগরতলার ভ্রাতা শ্রীচিন্তাহরণ সিংহ উদ্বোধন-সঙ্গীতটি (খণ্ড আজিকে হোক অখণ্ড) গাহিবার সময় অখণ্ড-সঙ্গীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সমাগত সকল অখণ্ড প্রদ্বারিত চিত্তে নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন।

তৎপর স্থানীয় রমেশ হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষক শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত বি-এ, বি-টি মহাশয় বিনীতভাবে বলেন যে তিনি তাঁহার স্কুল-পুত্র এই ধর্মীয় সম্মেলনের জন্ত প্রদান করিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেকটি মহাপুরুষের বাণীই

মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত উন্নতির ধারক। সদৃশ্যের বালী ও উপদেশাবলী ব্যক্তি এবং সমাজের গ্লানি দূর করার পক্ষে এক অমোদ্য অস্ত্র। তিনি বলেন,—“আমি এখন পর্য্যন্ত কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী না হইলেও ইহা বুঝি যে, অধঃপতিত সমাজকে উন্নত করিতে হইলে এই অখণ্ড-সম্প্রদায়ের আদর্শকে সকলের মধ্যে প্রচার ও প্রসার একান্ত আবশ্যক।” ইহার পর অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীগগন চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সুরচিত কবিতায় লিখিত একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। কবিতাটি সুরচিত এবং ভাব-সমৃদ্ধ হইয়াছিল। স্থানাভাবে মৃদু সন্তব হইল না। তৎপর উদয়পুরের ভ্রাতা শ্রীহেমেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক মহাশয় শ্রীশ্রীবাসদেব লিখিত একটি পত্র পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় তাঁহার ভাষণ দানের পূর্বে বাংলার সুসন্তান ও ভারতের গৌরব এয়ার মার্শাল সুরেন মুখার্জীর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সকলের তাঁহার আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট প্রার্থনা করিতে বলিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে এক মিনিট প্রার্থনা করেন। সভাপতির ভাষণদানের পর উপস্থিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে কয়েকজনে ভাষণ দান করেন। সভাপতির অভিভাষণ প্রতিধ্বনির অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

উদয়পুরের শ্রীনলিনীরঞ্জন ভৌমিক বলেন,—দেশের দুঃখ-হ্রদ্য ও কলঙ্ক দূর করার জন্ত শক্তিমান কর্মীর প্রয়োজন।

বিলনিয়ার শ্রীমহেন্দ্র কুমার বল বলেন,—শক্তিধর বাবামণির সন্তান হইয়াও আমরা সংঘশক্তির পরিচয় দিতে পারি না। ইহার কারণ আমাদের নিজেদের ভিতরের গলদ। আমরা বাবামণির এক লক্ষ সন্তান। লক্ষ অখণ্ড যদি আগাইয়া আসি, তাহা হইলে দেশটি

পৌষ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৮২৫

মঙ্গলবাধ নির্মাণ হইয়া বাইতে পারে। শুধু সংঘশক্তির অভাবেই ইহা হইতেছে না। আমি সমাগত প্রতিনিধিবর্গের নিকট আবেদন করিতেছি যে, কি ভাবে চলিলে আমাদের সংঘটিকে জগতের মধ্যে এক অবিস্মরণীয় সংঘরূপে গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহার উপায় আপনারা বুঝিয়া বাহির করুন।

আগরতলার শ্রীনীলমোহন ঘোষ বলেন,—আমাদের শ্রীশ্রীবাবামণির উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করা ও তাঁহার বাণী এবং উপদেশ ঠিক ঠিক ভাবে গ্রহণ ও অনুশীলন করা কর্তব্য। বাবামণি যৌবনে ১১ বৎসর কাল জীমুখ দর্শন করেন নাই। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রভুত কীর্তি সমূহ সম্পাদন করিয়াছেন। বাবামণির প্রদত্ত নামের সাধনা করিয়া আমাদের স্বরূপানন্দ-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিজ্ঞানের বিরাট আবিষ্কার যারগান্ধী এটম বোমার শক্তিকে তুচ্ছ করার ক্ষমতা রাখে বাবামণির আদর্শবাদ।

আগরতলার ভগিনী শ্রীশৈলজা বর্মণ বলেন,—গুরুই ভগবান। অত্যন্ত সম্প্রদায় গুরুকে ভগবান মনে করিয়া তাঁহার মাধ্যমেই ভগবানের পূজা করেন। কিন্তু আমাদের বাবামণি বলেন,—তিনি পথ-প্রদর্শক। আমরা সকলেই গুরুর নিকট হইতে কিছু লাভ করিয়াছি। কিন্তু নিম্নে আমরা কি করিয়াছি? জগতে গুরুভক্তির অনেক নিদর্শন বহিয়াছে। শিবাজী নিজ রাজ্য গুরুকে দান করিয়াছিলেন। জলাশয় খনন করানো এক পুণ্যকার্য, তাহা আমরা জানিলেও তাহা অত্যন্ত ব্যবসায়্য বলিয়া সকলে তাহা করিতে পারি না। কিন্তু ষৎসামান্য দিয়াও কি আমরা রামচন্দ্রের কাঠবিড়ালীর সহায়তার গ্রাম মঙ্গলবাধ উপপুণ্যকার্যে মহাযোগ করিতে পারি না?

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

৮২৬

কমলপুরের শ্রীভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—মঙ্গলবারের জন্ম বাবামণি সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিদিমণিরও চলিয়াছে কঠোর শ্রম। এই কঠোর শ্রমকে কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে কেন আমরা আগাইয়া আসিব না?

বিশালগড়ের শ্রীমুকুন্দলাল চৌধুরী বলেন,—পরস্পরের প্রতি সহযোগের অভাবেই আমরা কোনও বড় কাজ করিতে পারি না। গুরুদেব আমাদের কি দিয়াছেন এবং তৎপরিবর্তে আমি গুরুকে কি দিয়াছি, তাহা চিন্তা করার দিন আসিয়াছে।

চড়িলামের ত্রিপুরী ভ্রাতা শ্রীযোগেন্দ্র দেববর্মা বড় চমৎকার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—আমি সাধক নই, তাই আমার ডাক লোক আসে না, ইহাই আমি বুঝিয়াছি। আমি প্রার্থনা করি, সৎগুরু আমাদের সাধনা করিবার শক্তি প্রদান করুন।

কৈলাসহরের শ্রীশচীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী বি-এ, বি-টি বলেন,—আমাদের আদর্শ অসম্প্রদায়িক। এই বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক মহাশয় আমাদের সম্প্রদায়ের আদর্শের প্রশংসা করিয়াছেন। 'মানব-দেহধারী পরমাত্মাকে আমরা কেহ স্মরণ করি কি, বাহাকে দীক্ষার গৃহে জীবনের সব পাপ সঁপিয়া দিয়াছিলাম? তিনি কিছুই চাহেন না বলিয়া কি আমরা নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া গেলাম? মঙ্গলবার সম্পর্কে আমাদের নিজেদের মধ্যেই কত অবাস্তব ও অসঙ্গত প্রশ্ন উঠে। কিন্তু ভারত সরকারের পরিকল্পনায় তো কোন প্রশ্ন উঠে না। মঙ্গলবার পরিকল্পনা কাহার রচিত? যিনি ছিলেন, যিনি আছেন এবং যিনি থাকিবেন এই পরিকল্পনাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতেই হইবে

এবং এইজন্ত চাই সংগঠন। ধীশুর ছিলেন বারো জন প্রকৃত শিষ্য। কিন্তু আমরা যে একজনও তাহা হইতে পারিলাম না। সাধনা না করিলে প্রকৃত শিষ্য হওয়া যায় না। তাই বাবার ইচ্ছা যাহারা সত্যি সত্যি স্বরূপানন্দ-সন্তান হইতে পারিবেন, তাঁহারাই যেন ভবিষ্যতে দীক্ষা-গৃহে ঢোকেন। বাবামণির বাণী—“অথও মতবাদ নিজগুণেই প্রচারিত হবে, তোমরা সাধন পরায়ণ হও।” স্বরূপানন্দ-অথও-আদর্শকে বহন করিবার জন্ত চাই গঙ্গার পুত্র বারিধারা বহনকারী দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রায় সাধক।

মধুপুর আশ্রমের শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী বলেন,—বাংলার কয়েকটি অজাতশত্রু বালককে লইয়া আচার্য্য স্বরূপানন্দ পুপুন্কার কার্য্য আরম্ভ করেন। আজ কঙ্করাকীর্ণ মরুভূমিতুল্য পুপুন্কা শস্ত্র-শ্রামলা। আচার্য্য স্বরূপানন্দের কামনা—“একলা আমি মুক্ত হতে চাই না প্রাণনাথ।” তাঁহার আহ্বান—“তোমরা আমার বাহু হও।” কিন্তু আনরা তাঁহার কামনাও বুঝিতে চাই না আর তাঁহার আহ্বানেও সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না।

ইহার পর প্রস্তাব গ্রহণ ও সমর্থন করা চলিতে থাকে। ২৫।৩০টি মণ্ডলীর প্রায় ২৫০ (আড়াইশত) প্রতিনিধি-পরিশোভিত সভাটিকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করেন সভাপতি মহোদয়। আগরতলার ভগিনী শ্রামলা দেবী সমাগত প্রতিনিধিদিগকে উপস্থিত দানের অর্থ প্রদান করার জন্ত আহ্বান করিলে অল্পক্ষণের জন্ত সামান্য বিশৃঙ্খলা সভাগৃহে দেখা দেয়। সকলেই নিজ নিজ মণ্ডলীর অর্থ প্রদান করিবার জন্ত আগাইয়া আসিতে থাকেন। সভাগৃহে একটা প্রাণ-

চঞ্চলতা দেখা যায়। কিন্তু সুযোগ্য সভাপতি মহোদয়ের চেষ্টার অচিরেই শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। ইহার পর সকলে নিজ নিজ মণ্ডলীর নাম ও টাকার অঙ্ক লিখিয়া কাগজের চিটের সঙ্গে টাকা গাঁথিয়া এক একজন করিয়া আগাইয়া আসিয়া টাকা দিতে থাকেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বিদ্যালয়-গৃহটি দেওয়ার জন্ত রমেশ হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষক মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সকলকে ধন্যবাদ জানান। উদয়পুর মণ্ডলীর সভাপতি, সম্মেলনের সভাপতি, প্রধান-অতিথি ও সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর আগরতলার শ্রীচিন্তাহরণ সিংহ সমাপ্তি সঙ্গীত (জগত ডাকিছে আজ তোমারে) গানটী করেন। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে সভার কার্য সমাপ্ত হয়। ত্রিপুরা-রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিনিধি-সম্মেলনগুলির মধ্যে এই সম্মেলনটি গাভীর্ষ্যে, প্রতিনিধি সমাগমে, প্রস্তাব গ্রহণে, শৃঙ্খলা বজায় রাখার এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সম্মেলনে যে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, সকল স্থানের সকল অঞ্চল-মণ্ডলীকে নিম্নঠিকানায় পত্র লিখিয়া তাহার অনুলিপি গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে। যথা :—শ্রীশশীধ্রশেখর ভদ্র, আর. এম্. এস্, অফিস, পোঃ—আগরতলা, ত্রিপুরা। উদয়পুর (রাধা কিশোরপুর) অখণ্ডমণ্ডলীর সম্পাদকের ঠিকানা না দিয়া আমরা আগরতলা মণ্ডলীর একজন কর্মীর সহিত এই বিষয়ে যোগাযোগ করিতে এই জন্ত অনুরোধ করিতেছি যে, আগরতলা হইতে পত্রোত্তর দ্রুত পাওয়া যাইবে।

অখণ্ড-বাণী

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(২০১)

মুসলমানের আমলনামার আর হিন্দুর চিত্রগুপ্তের মোটের উপরে একই মর্শ্ব। অর্থাৎ, জীবন ভ'রে যে কাজই তুমি কর না কেন, সব-কিছুই হিসাব-নিকাশ একটা আছে। সুতরাং এখন থেকেই চেষ্টা কর, যাতে হিসাবের খাতায় খারাপ কথা লেখা না হ'তে পারে। সকল ধর্ম-সম্প্রদায়েরই উপদেশ ঐ এক—আখেরের কথা ভাব, ভবিষ্যতের জ্ঞান হ'সিরার হও। আমলনামাটা রূপকই হোক, আর চিত্রগুপ্ত ব্যক্তিটি কাল্পনিকই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। হিসাবের যে শোধবোধ কত্তে হবেই, এইটা হচ্ছে আসল কথা। সুতরাং শেষের কথা ভাব এবং সেইমত কাজ কর। রঙ-তামাসায় দিন কাটালেই চলবে না, ভবিষ্যতের দিকেও তাকাতে হবে। যে বীজ বপন কচ্ছ, সেই বৃক্ষই জন্মাবে, সেই ফসলই তুলতে হবে।

(২০২)

ভবিষ্যতের দিকে প্রায় কারো দৃষ্টি থাকে না। কারণ, বর্তমানকেই জগতের একমাত্র সত্য ব'লে তোমরা বিশ্বাস কর। অনিত্য বর্তমানকে চিরস্থায়ী ব'লে তোমরা ভ্রম কর। বর্তমানের ক্ষুদ্র ভালবাসার তুচ্ছ জিনিষগুলিকেই অমর ব'লে জ্ঞান কর। তাই ভুলে যাও যে, বর্তমানটা অতীতেরই ফল, আবার ভবিষ্যৎটা বর্তমানেরই ফল। তাই সর্বোপায়ে প্রয়োজন, বর্তমানের দাসত্ব জিনিষগুলিকে অগ্ণস্থায়ী ব'লে উপলব্ধি করার। তাতে ভ্রম

দূর হয়, দূরদৃষ্টি বাড়ে, ধীরতা আসে ও আশ্রয়ের জ্ঞান তৈরী হ'তে সামর্থ্য জন্মে। আসক্তি কমাও, আসক্তি কমাও, সকল কাজে নিপু হ'য়েও নির্লিপ্ততা অবলম্বন কর, পদপাতায় জলের তায় নির্লিপ্ত হও, কর্তব্য জ্ঞানে কাজ ক'রে যাও, ভোগের নেশা বর্জন ক'রে শ্রম কর,— ভবিষ্যতের হিসাব এর ফলে আপনা-আপনি ঠিক হ'য়ে যাবে।

(২০৩)

আমার চিন্তা তাদেরই জ্ঞান ব্যাকুল, যারা তপস্যা কর্কে একান্তে, আর তপস্যার ফলকে ছড়িয়ে দেবে কোটি ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। তাদের জ্ঞান ব্যাকুল ব'লেই অনুক্ষণ আমার তপশ্চর্যা ক'রে নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ কতে প্রবল বাসনা হয়। তুণ্য ক'রেই আমি সাধন কতে চাই, কোলাহল ক'রে নয়, কিন্তু আমার নীরব সাধনা জগতের সবচেয়ে বড় কৰ্ম্মকোলাহলের জন্মদান কর্কে।

(২০৪)

তোরা ক্ষণস্থায়ী বস্তুর উপাসনা কর্কে, না ক্ষণস্থায়ী ভাবে কর্কে? তাদের উপাসনাও নিত্য হোক, তাদের উপাসনার বস্তুও নিত্য হোক। ধ্বংসশীল, জরামরগশীল, বিকারশীল বস্তু তোদের উপাস্ত নয়,—ধ্বংসাতীত, জন্মমরগরহিত, অবিকারী পরমেশ্বর তোদের উপাস্ত। এই প্রত্যয়কে অন্তরে দৃঢ় কর্। এই বিশ্বাসে হৃদয়কে পূর্ণ কর্। এই নিষ্ঠায় জীবনকে সঞ্চাল কর্। নিত্যের উপাসনা কর্, আর নিত্য উপাসনা কর্।

(২০৫)

আগে জেনে নে, তুই অনিত্য নোন্। তুই যে
 নিত্য, তুই যে শাশ্বত, তোর যে জন্ম নেই, তোর যে মৃত্যু নেই,
 তোর যে ক্ষয় নেই, তোর যে বৃদ্ধি নেই, তোর যে ব্যাধি নেই, তোর যে
 জরা নেই, তুই যে অবিকারী পরম সত্য, এইটাই আগে বুঝে নে বাপ্। তবে
 ত'দেখ'বি, তোর উপাশ্রয় বস্তুর স্বরূপ ও লক্ষণ তুই নির্ণয় কত্তে পাচ্ছিস্!
 নিজেকে জান্, তবে তোর উপাশ্রয়কে জান্'বি।

(২০৬)

নিত্যের উপাসনায় অনিত্যের সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন
 হতে পারে। যেমন, খুব ভারী ঘরের খুঁটা উপরের দিকে তুলতে
 হ'লে ছোট্ট একটি দশ-মরদার ব্যবহার দরকার হ'তে পারে। কিন্তু
 দশমর্দা দশমর্দাই থেকে যায়, সে কখনো খুঁটির কাজ কত্তে পারে না।
 নিত্যকে উপাসনার জন্ত পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, চন্দন, সলিল, বিগ্রহ
 প্রভৃতি অনিত্য জিনিষের প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু এগুলি
 দশমর্দা ছাড়া আর কিছুই নয়,—নোকা নদী পার ক'রে দিতে পারে, কিন্তু
 নোকা নোকাই থাকে, নোকা কখনও পরপারের রূপ ধারণ করে না।

(২০৭)

নাকার ছাড়া পূজা হয় না, শজ্জাবণ্টা ছাড়া আরতি
 হয় না, এসব ভাস্ত ধারণা পরিত্যাগ কর্। যিনি
 দমীয়, সীমাহীন-রূপে তার অর্চনা হয়। অর্চনায় বিবেচ্য হস্তপদের
 প্রবৃত্তি নয়, চিন্তের প্রবৃত্তি। চিন্ত কি সেই নিখিল প্রেমস্বরূপের প্রতি
 প্রবৃত্তি? এই একটিমাত্র প্রশ্নের জবাব থেকেই সব কথার

জবাব হবে। বাহুপূজা অধম পূজা, কিন্তু তথাপি সে পূজাই বটে, যদি চিত্তের ভিতরে থাকে পূজার প্রবৃত্তি। আভ্যন্তর পূজা কঠিন পূজা, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ যদি নাও হয়, তবু সে পূজাই বটে, চিত্তের পূজামুখিনী প্রবৃত্তি যদি থাকে। সেই পূজাভিমুখিনী প্রবৃত্তিকে জাগাও। সেইটাই হচ্ছে আসল কথা।

(২০৮)

ভগবানের পরমপবিত্র নামই প্রকৃত সদ্গুরু। তাঁকে নিয়ে ডুবে যাওয়াই সবচেয়ে পবিত্র কর্তব্য। ঐ নামকেই দীক্ষাগুরু আর ঐ নামকেই শিক্ষাগুরু বলে জ্ঞান করা উচিত। নাম কত্তে কত্তে পরমাত্মার সেবায় জীবনোৎসর্গের একনিষ্ঠ সঙ্কল্প যখন এসে গেল, জানতে হবে, তখনই দীক্ষা হল। নাম কত্তে কত্তে নামের গুণেই অন্তরের সহস্র সহস্র সমস্তার সমাধান যখন হাতে লাগল, জানতে হবে, তখনই শিক্ষা হ'ল। একমাত্র নাম ছাড়া জ্ঞান কোনও গুরুর প্রাধাত্য স্বীকার করা মূর্থতা-বিশেষ। নাম পবিত্রতম, নিষ্কলুষ, অপাপবিদ্ধ বস্তু। আর মানুষ-গুরুর ভ্রম প্রতিপদে, ক্রটি ক্ষণে ক্ষণে, দেহাত্মবোধমূলভ নানা প্রমাদ তার অবিরাম। তাকে গুরু মনে না ক'রে নামকেই গুরু বলে জ্ঞান করা উচিত। নামকে শত্রু ক'রে ধর, নামকে প্রাণের পরম আশ্রয় বলে জান, নামকে জীবনের চরম আশ্রয় বলে জ্ঞান কর, নাম-কল্পতরুর শীতল ছায়ায় তাপিত প্রাণ জুড়াও, জীবনের নব-বসন্তে নামের বিহগকাকলী শুনে কর্ণ পরিতৃপ্ত কর, অবিরাম অমুদ্রণ নাম স্মরণ ক'রে মনকে ত্রাণের পথে টেনে নাও, যখনি সুযোগ পাও ভগবানের নামকীর্তন ক'রে রসনা সার্থক কর। আর সব ভুলে যাও।

(২০৯)

গুরু আর সদগুরু এক জিনিষ নয়। যে-কেহ
দে-কারো গুরু হ'তে পারেন, কিন্তু যে-কেউ সদগুরু হ'তে পারেন
না। গুরু শুধু তাঁর শিষ্যেরই গুরু, সদগুরু তাঁর শিষ্য-অশিষ্য-নির্বিশেষে
“সকলের” গুরু। তপস্শ্রাব শক্তিতে সদগুরুর উচ্চ থাকে যাঁরা ওঠেন,
তাঁরা সকলের শিষ্যকেই নিজ নিজ নিষ্ঠায় রেখে তার উন্নতি-বিধান
করেন। সদগুরুরা অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষা দেনও না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ
করজনের মন্ত্র পাল্টে দিয়েছিলেন? প্রভু জগদ্বন্ধু করজনকে মন্ত্রদান
করেছিলেন? ঋষি অরবিন্দ করজনকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপদেশ প্রদান
করেছেন? তবু এঁদের প্রভাব-শক্তি শত শত জীবনের উপর
বাস্তব্য কাজ করেছে। মধুলুকে ভ্রমরের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সাধন-প্রাপ্ত
ব্যক্তিদের নিষ্ঠার মূল শিথিল করার চেষ্টা এঁরা করেন নি। কারণ,
এঁরা শুধু গুরু নন, এঁরা সদগুরু। সদগুরু পথে ঘাটে মেলে না, তাই
ব্যতিক্রম গুরুদেবরাই মধুলুকে ভ্রমরের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দেখিয়ে অপরের
শিষ্যকে নিজ শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত করবার জন্ত অত প্রতিভা আর অত
ব্যবসায়কে অপব্যয়িত করেন।

(২১০)

তুমি যার কাছ থেকেই মন্ত্র নিয়ে থাক না কেন,
নাম ক'রে বাও, ওতেই তোমার মুক্তি হবে, ওতেই
তোমার শান্তি হবে, ওতেই তোমার ইহ-পর-জীবনের পরমকল্যাণ
সাধিত হবে। সুতরাং শকুনির চীৎকারে কর্ণপাত করোনা। মন্ত্রদাতা
যদি মন্ত্রের সাথে তোমাকে অসংযম আর ব্যভিচারের জীবন না দিয়ে

থাকেন, পরানিষ্ট আর হিংসাপ্রবৃত্তির ইন্ধন যদি ঐ মস্তকের ভিতরেই লুক্কায়িত না থেকে থাকে, তবে জেনো, ঐ মস্তকেই তোমার সকল কল্যাণ হবে। শকুনি বল্লাম কেন? ধর্ম-জগতের শকুনি তাঁরা। যারা পচাগরুর মাংস ভালবাসেন। লম্পটেরা যেমন নিজের দ্বীপ পরিবর্তে পরদ্বীপের প্রতি একটু বেশী প্রীতি অনুভব করে। ধীর পরের শিষ্যকে নিজের শিষ্য করবার জন্য ব্যাকুল, তাঁদের আর শকুনির মতই দেখি। ঠিক শকুনির মত আকাশের উর্দ্ধদেশে বিচরণ ক'রে তত্ত্বজ্ঞানের কত মধুর আর কত গভীর আলোচনাই করেন, কিন্তু দৃষ্টি থাকে কি ক'রে একটা শিষ্য বাড়াবেন। যে ব্যাধ তাঁর জাল ছড়িয়ে ব'সে আছেন অথ লোকের কপোত ধরার জন্য। এঁরা জগতের সব চেয়ে বড় জুয়াচোর। নিঃস্বার্থপরতার ভান এঁদের অসম্ভব রকমের, দুবছর সঙ্গে থেকেও হয়ত চালকা ধীরে উঠতে পারেন না। স্ক্রকোশলে এঁরা ধীরে ধীরে হোমার নির্দিষ্ট সাধন-মার্গে গ্রস্ত মনকে টলাতে থাকবেন এবং ঝল্প দিয়ে ঘাড় ভাঙ্গবার জন্য হয়ত মাসের পর মাস প্রতীক্ষা ক'রে বেড়াবেন। রজোমতী রমণীর পরিত্যক্ত অপবিত্র বস্ত্রখণ্ডের গ্রায় অম্পৃশ্য জ্ঞানে এসব ব্যাধদের সংসর্গ পরিত্যাগ কর।

(২১১)

শিক্ষাগুরু কি শিখাবেন? নূতন একটা মন্ত্র? জেনো, ওটা একটা ধাপ্পাবাজি মাত্র। তোমাকে শিষ্য ক'রে হয় তাঁর অর্থ, নয় তাঁর লোকমান বুদ্ধির সাহায্য হবে, তাই তিনি মন্ত্র দিয়ে তোমাকে ত্রাণ কত্তে চান। কিন্তু যে মন্ত্রটা তুমি আগেই পেয়েছ, তাতেই ত তোমার ত্রাণ হ'তে পারে! আবার নূতন মন্ত্র কেন? কুমিল্লা থেকে চন্দ্রনাথ যাবার টিকিট তোমার

হাতেই রয়েছে। আবার নূতন টিকিট দিয়ে কি হবে? একটা যাত্রীর কট টিকিট লাগে? প্রকৃতই শিক্ষাগুরু হ'য়ে যদি কেউ আসেন যে বাপ, তিনি মন্ত্রের ঝুলি নিয়ে তোমার কাণে উজাড় করবেন না, তাঁর জীবনের আচরণ দেখে তুমি তাঁর মত ঈশ্বরানুরাগী হবে, প্রেমিক হবে, পবিত্র হবে, সদাচারী হবে, সত্যশীল হবে, জিতেন্দ্রিয় হবে, নিষ্ঠাবান হবে, আনন্দময় হবে। জগৎকে খোলা চোখে দেখে বাবা, চখ বুকে অন্ধের মত চল না।

(২১২)

ভগবানকে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝান যায় না। উপলব্ধির ভিতর দিয়েই সেই রসস্বরূপ নিজের রসকে আন্বাদন করান। তপস্যা ছাড়া উপলব্ধিও জন্মে না। একনিষ্ঠা ছাড়া তপস্যা জন্মে না। বিশ্বাস ব্যতীত একনিষ্ঠাও আসে না। আবার ব্রহ্মচর্য ছাড়া পূর্ণ বিশ্বাসেরও অভ্যুদয় ঘটে না। সুতরাং—ন তপস্তপ ইত্যাহব্রহ্মচর্যং তপোত্তমম্।

(২১৩)

ধর্মের মূল ব্রহ্মচর্য্যে। ব্রহ্মচর্য্যের মূল নিয়ত-কর্ম্মশীলতায়। কর্ম্মশীলতার ওহি নিকাম আভিপ্রায়ে। আর নিকামতার প্রতিষ্ঠা ঈশ্বরানুধ্যান পূর্ব্বক কর্ম্মচর্য্যায়। তাই আমি ছেলেদের বলি,—কাদা ছান্, ইট কাট, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম কর্। ছেলেদের বলি,—কৌপীন পরিধান কর, মেয়েদের মায়ের মতন দেখ্, আর সর্ব্বক্ষণ সংকাজে রক্তধাক্।

(২১৪)

জাতিটাকে সংযমী, সদাচারী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও কঠোর
ক'রে গ'ড়ে তোলা চাই। তবে না এ জাতি ভগবানকে
ভালবাসতে শিখবে! ভগবানকে ভালবাসার গোড়াঘরই
যে সংযম আর ব্রহ্মচর্য্য! সকল আধ্যাত্মিক সম্পদের
খনিই যে জিতেন্দ্রিয়ত্বের প্রতিষ্ঠায়! দুর্ব্বলের, অলসের, পরগলগ্রহের
ভগবৎ-প্রেমে অনেক সময়ে লোকবঞ্চনা বা আত্মপ্রতারণা থাকে।

(২১৫)

তোমরা সবাই যুবক। ধর্ম্মপথে আসার ফলে সমাজের তোমরা শ্রদ্ধা
পাত্র হয়েছ। গৃহে গৃহে তোমাদের সম্মান। সর্ব্বত্র তোমাদের অবাধ
স্বাধীনতা। এই কারণেই তোমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা থাকা
উচিত যে, কুমারী মেয়েদের প্রতি তোমাদের ব্যবহার কিরূপ হবে।
সধবা আর বিধবা মেয়েরা নিজেরাই অনেকটা জানে যে, পুরুষদের সাথে
কি ভাবে চলা উচিত আর কি ভাবে চলা অনুচিত। সংসারের দুখ-
দুঃখ ও অভিজ্ঞতা তাদের অধিকাংশকেই এই বিষয়ে একটু আধটু
সচেতন ক'রে রেখেছে। তাই তারা শ্রদ্ধা-সম্মান দেখাতে গিয়েও
নিজের হিন্দাব ঠিক রেখে চলে, অবশ্য যদি শিক্ষা-দীক্ষায় বা অভিজ্ঞতায়
কোনও প্রকার গুরুতর ত্রুটি কারো না থাকে। কিন্তু কুমারীদের
তা' নয়। তারা সংসারের নানা বৈচিত্র্যের অতি অল্পই বোঝে, অল্পই
জানে, মানব-জীবনের গূঢ় রহস্যগুলি সম্বন্ধে তারা একেবারে অনভিজ্ঞ।
তাই তারা অতিশয় সরলা এবং বিয়বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ
নিঃশঙ্কা। এই কারণেই কুমারী মেয়েদের প্রতি তোমাদের ব্যবহার
কেমন হবে, তা তোমাদের স্পষ্টরূপে জানা থাকা উচিত।

(২১৬)

সবাইকে ভালোবাসো, সকলের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালীল হও, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক'রো না। নিষ্পাপা কুমারী নির্ভয়ে সকলের সাথে মিশে, কিন্তু তুমি তাকে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে মিশতে দিওনা। স্নেহবুদ্ধি থাকবে তোমার যত, তার প্রতি পূজাবুদ্ধি থাকে যেন তার দশগুণ। তোমার কোনো কথা, কোনো ইচ্ছিত, তোমার কোনো ব্যবহার, তোমার কোনো দৃষ্টান্ত তার মনকে যাতে পঙ্কিল চিন্তার পথে ধাবিত কতে না পারে, তার দিকে রাখ তীক্ষ্ণদৃষ্টি। সহৃদয়তা দিয়ে কোনো কুমারীর ভাল কতে না পার, নিজের ভুল-ভ্রান্তি দিয়ে তার মন ক'রে না বস, সেই দিকে দাও তীব্র লক্ষ্য। জাতিটার সমগ্র ভবিষ্যৎ বুকিয়ে আছে কুমারীদের পবিত্রতায়, এই কথাটা নিমেষের জ্ঞাতও ভুলো না। বর্ধমানের বগা, খুলনার হাভক্ষ, বিক্রমপুরের টর্ণেডো, ৮০ সনের চুনিকম্প, আর সুরাটের প্লেগ, এই সব লোকক্ষয়কর প্রলয়-তুল্য বিপদে যে ব্যক্তি নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে পরের সেবা করেছে, সে কোটি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল সঞ্চয় করেছে, বলতে হবে। কিন্তু এত ক'রেও যদি সে এসে নিজের আচরণের দোষে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে একটি কুমারী মেয়ের মনের ভিতরে কামচিন্তার উত্তেজক হয়, তবে তার সকল পুণ্য ছারখার হ'য়ে গেল, জানতে-হবে। কুমারীর পবিত্রতাকে রক্ষা করার মত বড় পুণ্য নেই, তার পবিত্রতাকে নষ্ট করার মত বড় পাপ নেই,—এই কথা সর্বদা মনে রেখো।

(২১৭)

“আমি হিন্দু” “আমি মুসলমান” এ কথা শুনতে শুনতে কাণ খালা-পালা হ'য়ে গেল। কিন্তু “আমি মানুষ”

এ কথা ত' কাউকে বলতে শুনি না। যারা “মানুষ” নয়, তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, তাদের দিয়ে জগতের কোন লাভ নেই। কতকগুলি “অমানুষ” যদি হিন্দু বা মুসলমান হয়, তবে পর-পীড়ন আর জাতিবিদ্বেষ চলবেই চলবে। পণ্ডিত আর মোল্লা, পুরোহিত আর মোল্লা, গুরু আর পীর সবাই মিলে হিন্দু আর মুসলমান তৈরী কচ্ছেন, “মানুষ” তৈরী করবার চেষ্টা কচ্ছেন না। তারই জ্ব বারংবার সে সব ব্যাপারই ঘটতে পাচ্ছে, যা সভ্যজাতির পক্ষে কনক-জনক, লজ্জাজনক। “সবার উপরে মানুষ সত্য”,—এই কথা আমাদের শিখতে হবে, শিখাতে হবে।

(২১৮)

শুধু মন্ত্র দিলেই ভক্ত হয়? শুধু মন্ত্র দিলেই দ্বি হয়? মন্ত্র না দিয়েও কি কারো সঙ্গে প্রাণের যোগ সৃষ্টি করা যায় না? জীবনাদর্শ দানের কোনো মূল্য নেই? জীবনাদর্শ গ্রহণের কোনও সার্থকতা নেই? তোমরা ভাবছ, আমি মন্ত্র দিয়েই জগতের গুরু হব? না, না, তা নয়, মন্ত্র না দিয়েই আমি সকলের গুরু হব। অগ্নিশলাকার মত আমি সকলের অন্তরে প্রবেশ করব এবং মোহতিমিরাচ্ছন্ন জীবনকে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করব। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান আর বৌদ্ধ কেউ আমার পর থাকবে না, আমি কারো পর থাকব না। কারণ, জগতের সকল সম্প্রদায়ই আমার আর আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের।

(২১৯)

শাস্ত্রবচন যদি বলে যে, শুধু হিন্দু, শুধু মুসলমান বা শুধু খ্রীষ্টানেরই মুক্তি হবে, অপর ধর্মাবলম্বী দের নরকে পড়

মরতে হবে, তবে সেই বচনটিকে আমি মানি না। ভগবানের দৃষ্টিতে কে হিন্দু আর কে মুসলমান? ভগবান্ কি টিকী আর টুপীর বিচার করে স্বর্গ-নরক ব্যবস্থা করবেন? না, কে পরস্বাপহারী, কে পরোপকারী, কে লম্পট, কে জিতেন্দ্রিয়, কে অসাধু, কে সৎ, কে মিথ্যাবাদী, কে সত্যসন্ধ তার বিচার করবেন? হজরত মহম্মদের দোহাই দিয়ে যে পরগৃহে অগ্নি-সংযোগ করে, তার যে বেহেস্তে স্থান হবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। সদাশিব মহাদেবের দোহাই দিয়ে যে মত্তপান করে, আর পরনারীর সঙ্গ করে, তার যে স্বর্গে জায়গা হবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। কে কার দোহাই দিচ্ছে, সেইটে বড় কথা নয়, কে কি রকম জীবন বাপন কচ্ছে, সেইটাই বড় কথা। যীশুখ্রীষ্টের দোহাই দিয়ে যারা জোণের মুখে নিরপরাধ কুম্ভাগ্ন-জাতিগুলিকে ধ্বংস করে' দিচ্ছে, স্বর্গে তাঁদের জায়গা হবে? এসব আজগুবি গল্প আমি বিশ্বাস করি না। ভগবান্ বুদ্ধের দোহাই দিয়ে জাপান যদি আজ চীন আক্রমণ করে এবং নির্ধর অত্যাচারে নারী ও পুরুষের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, তবে তারা স্বর্গ পাবে, এসব উপত্যাস অতি অশ্রদ্ধেয়। ভগবানের দৃষ্টিতে সব ধর্মাবলম্বীই সমান, কারণ, সব ধর্মেরই উৎপত্তি ভগবান্কে আশ্রয় ক'রে হয়েছে। ভগবানের নাম ক'রে কেউ কোনো কু কাজ কলে' তিনি তা কমা করবেন না।

(২২০)

মৌলভী আর মোল্লা, পণ্ডিত আর পুরোহিত, এদের প্রত্যেকের কর্তব্য, এই কথাটা নিজ নিজ শিষ্য আর ভজমানদের বুঝিয়ে দেওয়া। "হিন্দু হও" বা "মুসলমান হও" এই উপদেশ না দিয়ে, উপদেশ দিতে হবে, "মানুষ হও"। মানুষ যে হবে,

সে হিন্দু হ'লেও খুব ভাল হিন্দু হবে, মুসলমান হ'লেও খুব ভাল মুসলমান হবে। স্মরণ্যে আগে মানুষ হবার জন্মই প্রত্যেককে প্রেরণা দিতে হবে। একজন ভালো মুসলমানের চেয়ে একজন খারাপ হিন্দু শ্রেষ্ঠ নয়। একজন ভালো হিন্দুর চাইতে একজন খারাপ মুসলমান শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু 'মহুয়া' যার আছে, সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রীষ্টান হোক বা বাই হোক, সেই শ্রেষ্ঠ। এই বোধই সকলের ভিতরে জাগিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

(২২১)

মানুষ যে হবে, সে পরের মনে আঘাত দেবে না, পরস্বাপহরণ করবে না, পরগৃহে অগ্নিপ্রদান করবে না, পরের মাথায় লাঠি ভাঙতে চেষ্টা করবে না। মানুষ যে হবে, সে মিথ্যার আশ্রয় নেবে না, ছল-চাতুরীর সঙ্গে সহযোগ করবে না, নিজের ক্ষুদ্র জিদ বা কুসংস্কারের সম্মান বজায় রাখবার জন্য সর্বসাধারণের শান্তিভঙ্গ করবে না। মানুষ যে হবে, সে নিজের গ্লান্য সঙ্গে সঙ্গে অপরের স্মৃতির বিষয় ভাববে, নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য অপরের স্বার্থ বিবেচনা করবে, নিজের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তার সঙ্গে বিজ্ঞানের মঙ্গলামঙ্গলের কথাও ভাববে।

(২২২)

কোন ধর্ম বড় আর কোন ধর্ম ছোট, এই বিতর্ক নিয়ে লড়াই হ'তে কেন আমরা দিচ্ছি? ধর্মের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় হবে কি তলোয়ারের ধার দিয়ে, কামানের গোলায় উন্মত্তা দিয়ে, না লাঠির ওজন দিয়ে? কোন ধর্ম কেমন মানুষ সৃষ্টি করে, তাই দিয়ে

পৌষ, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

৮৪১

হবে ধর্মের শ্রেষ্ঠতার আর নিকৃষ্টতার বিচার। বীজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হবে তার ফলকে দিয়ে। ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হবে সেই ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠতা দিয়ে। এই বোধ প্রত্যেকের ভিতরে জাগিয়ে দেওয়া আবশ্যক। তবেই এদের প্রতি আপনাদের প্রকৃত কর্তব্য করা হবে। কোনও নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা যদি শত সহস্র সংখ্যায় দেবচরিত্র হয়, মহৎ হয়, উদার হয়, পরোপকারী হয়, স্ত্রীজাতিতে মাতৃবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, সহিষ্ণু হয়, ক্ষমাশীল হয়, সদাচারী হয়, সত্যপ্রিয় হয়, তা হ'লে তাদের শাস্ত্রের উপদেশ অধ্যয়ন না ক'রেও জগতের সকল লোকে সেই ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানবে। আর যদি সেই ধর্মাবলম্বীরা দলে দলে পরগৃহে অগ্নি-সংযোগ করে, লুণ্ঠন-বৃত্তি হয়, পরের মেয়েকে চুরি কত্তে উল্লসিত হয়, অসহিষ্ণু, অত্যাচারী ও অসত্যপ্রিয় হয়, আর এই সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে এই সব কাণ্ড দেখেও যদি প্রতিবাদ না করেন বা প্রশ্রয়ই দেন তাহ'লে তাদের ধর্মশাস্ত্রে যত ভাল ভাল উপদেশই থাকুক না কেন, তাদের বৃত্তিগ্ৰন্থে যত মঙ্গলময় উপদেশই প্রদান করা হ'য়ে থাকুক না কেন, জগতের লোক তাদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞান করবে না। এই কথাটা ধর্মী মাত্রকেই বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তাতেই নিজ ধর্মকে বড় বলে প্রমাণ করবার সুযোগ এবং অধিকার আমাদের বৃদ্ধি হবে।

(২২৩)

ক্ষুদ্র কাজের সঙ্গে সুবৃহৎ ধ্যানকে যুক্ত ক'রে নেওয়াই হচ্ছে জীবনকে মহৎ করার উপায়। যত ক্ষুদ্র কাজেই তুমি হাত দাও না কেন, কাজটির সাথে মহত্তম কল্পনাকে সব সময়ে যুক্ত রাখ।

(২২৪)

নিজের হাতেই গড়বি রে তুই
 নিজের ভবিষ্যৎ,
 নিজের চেষ্টাতেই হবি রে
 শুদ্ধ, মহৎ, সৎ ;
 নিজের বুকের সাহস দিয়েই
 জিন্‌বি ত্রিজগৎ ।

খুঁজবি কেঁবল নিজের সত্তা
 বিশ্ব-ভুবন মাঝে,
 করবি প্রকাশ নিজের বীৰ্য্য
 সকল শ্রেষ্ঠ কাজে,
 যেখানে তুই যাস না কেন
 চলবি বীরের সাজে ।
 এই ভাবেতেই সামান্য লোক
 জগৎপূজ্য হয়,
 ছোট থেকে উচ্চ হওয়া
 কঠিন কিছুই নয়,
 ধৈর্য্য-বলেই হবি রে তুই
 যা তোর ইচ্ছা লয় ।

কিন্তু শুধু একটা কথা
 রাখতে হবে মনে,
 শক্তি বাড়ে ভগবানের
 নিত্য অনুধ্যানে,
 শক্তি বাড়ে তাঁর চরণে
 আত্ম-সমর্পণে ।

পৌষ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

৮৪৩

ধৃতঃ প্রেম্না

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
লিখিত সমসাময়িক পত্রাবলী]

(মুদ্রাকর প্রমাদে ৬৪৭ এবং ৬৪৮ নম্বর পত্র হারান গিয়াছে)

(৬৪৯)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৪শে কার্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।
তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি জীবন-সংগ্রামে অনেক
সংঘর্ষের পরে যে লাইনটি বাছিয়া নিয়াছ, তাহাতে তোমার পরাধীনতার
অবসান হইল এবং স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার আত্মপ্রসাদ অর্জনের
পথ হইল। ইহাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। আশীর্বাদ করি,
তুমি তোমার কর্মপথে অব্যাহত উত্তমে কেবলই অগ্রসর হইতে থাক
এবং উন্নতি কর।

সাধন ব্যাপারে তোমার অপেক্ষা তোমার ধর্মপত্নী অধিকতর এক-
নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পুরুষেরাই
নব্যজ্ঞের আশ্রয় লইয়া অন্তরের অনেক পূর্বসংস্কারকে দূর করিয়া দেয়,
যার মেয়েরা শত যুক্তি সত্ত্বেও অযৌক্তিক পূর্বসংস্কারের পূজা করিয়া
থাকে। তোমার ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া তোমার দুর্বলতা
এবং তাহার দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতায় বিস্মিত হইয়াছি। ধর্মসাধনের

ব্যাপারে তোমার ও তোমার সহধর্মিনীর মধ্যে দ্বিমত হইয়াছে দেখিয়া যেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছি, তেমনই তোমার পত্নী যে অখণ্ড-আদর্শকে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে, তাহার জন্ত অত্যন্ত আনন্দও অনুভব করিতেছি। বেদীতে ওঙ্কার বিগ্রহ থাকিলে অত্র বিগ্রহের সেখানে প্রয়োজনই নাই। বাহার প্রয়োজন নাই, তাহাকে কেন সেখানে নিয়া বসাইবে? এক ওঙ্কারে সর্ববিগ্রহ বিরাজিত।

কোনও কিছু দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই তাহা প্রামাণ্য নহে। কোনও কিছু পূর্বপুরুষেরা করিয়াছেন বলিয়াও তাহা প্রামাণ্য নহে। যাহা নূতন করিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা কেবল নূতনত্বের দরুণই অপ্রামাণ্য হইয়া যাইতে পারে না। সেই দিন আসিতেছে, যেই দিন কেবল কতকগুলি লোকাচারই ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে না। এমন দিনও আসিতেছে, যেদিন কেবল পুরাণ-স্মৃতিই নহে, উপনিষদ ও বেদ পর্য্যন্ত কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া নিজেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইবেন। চোখ বুজিয়া কেবল পূর্ব-সংস্কারকে মানিয়া যাইবার দিন দীর্ঘকাল থাকিবে না।

তুমি তোমার স্ত্রীকে ভুল বুঝিও না। সে তোমার অন্তরঙ্গতম জীবনসঙ্গিনী। সে কি করিয়া ধরিয়া লইল যে, ওঙ্কার সেবা করিলে অত্র কিছুই দরকার নাই, তাহা আগে বুঝিয়া লও। নিশ্চয় সে কোথাও হইতে এই অসাধারণ মনোবল সংগ্রহ করিয়াছে। সেই বলের উৎসকে অনুসন্ধান কর। যদি প্রেম সহকারে অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে তোমার পত্নীর মধ্যে তুমি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর পাইয়া যাবে। তুমি তোমার পূর্বসংস্কারের প্রতি অত্যধিক আসক্তি বশতঃ বুঝিতে পারিতেছ না যে, একনিষ্ঠা হারাইয়া সাধন করিবার কোনও মানে হয় না। যে যেই সাধনই করুক, একমন একপ্রাণ হইয়া করুক। একটী

ঠাকুর-ঘরে দশটী দেবতাকে বসাইয়া যে সাধন হয় না, ইহা বুঝিবার
 নামর্থ্য তোমার অচিরেই আসিবে। তুমি অধীর হইও না। এই
 সত্যকে তোমার উপর কেহ জোর করিয়া চাপাইয়া দিক, তাহা আমি
 চাহি না, কিন্তু তোমার ভিতরে যখন প্রেম আসিবে, তখন তুমি একের
 ভিতরে বহুকে দেখিতে পাইবে, বহুকে আলাদা করিয়া পূজা করিবার
 তোমার আবশ্যকতা দূরাইয়া যাইবে। বহুকে পূজা করিতে করিতে
 কেহ কেহ এককে পাইয়া থাকে, ইহা সত্য। কিন্তু এককে পূজন
 করিতে করিতে বহুকে তাহার মধ্যে পাওয়াই সঙ্গততর পথ। কেননা,
 যাহুর জীবন ক্ষণস্থায়ী। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫০)

হরি-ও

বারাণসী

২৫শে কার্তিক, ১৩৬৬

পরকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস
 দিও।

তুমি বাড়ী ছাড়িয়া আশ্রমে চলিয়া আসিতে চাহিয়াছ। না বাবা,
 তাহা করিও না। বুঝা মাতাকে ফেলিয়া আশ্রমে আসিতে তুমি পার
 না। মায়ের সেবার মধ্য দিয়াই জীবন চালাও। মাতৃসেবা পরম ধর্ম।
 যাকে অবহেলা করিয়া সাধন করিতে আশ্রমে আসিলে মায়ের মন
 তোমাকে বারংবার আকর্ষণ করিয়া আবার সংসারে লইয়া যাইবে।

তাঁর চেয়ে যতদিন পার মায়ের সেবার মধ্য নিয়াই সংসারে থাকিয়া সাধন-ভজন করিয়া যাইতে থাক। মনটাকে সাধনভঙ্গে লাগাইয়া রাখিয়া নির্ভয়ে মাতৃসেবা করিয়া যাও। শ্মশানে মশানে গিয়া উপস্থাপন করিবারও তোমার দরকার নাই। একদা শ্মশানে বসিয়া সাধন করা একটা অসাধারণ রকমের লোকপ্রিয়তা পাইয়াছিল। তাই সাধক বলিতে তখন আমরা শ্মশানচারী মহাপুরুষেরই কথা ভাবিতাম। কিন্তু তোমার শরীরটাই একটা কত বড় শ্মশান। ইহার মধ্যে কত কত প্রাণীর নিমেষের মধ্যে বিলয় হইতেছে, তাহা কে বলিবে? সমগ্র জগৎটাই একটা শ্মশান। প্রত্যেক স্থানেই কেহ না কেহ কোনও না কোনও দিন মরিয়াছে। শ্মশান খুঁজিবার জন্ত তোমার সচ মরা পোড়ার স্থানে যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। ঘরে বসিয়াই সাধন করিতে থাক। ইহাতে সর্বসিদ্ধি লাভ হইবে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫১)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৫শে কার্তিক, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

মেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা মেহ ও আশিস জানিও।

ধনীরাই কেবল ধনী নহে, দরিদ্রেরাও ধনী। তোমরা এই সত্যকে স্বীকার কর এবং দরিদ্রদের মধ্যে গিয়া সর্বসক্তি নইয়া কাহ

পৌষ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেক্ষা

প্রতিধ্বনি

৮৪৭

আরম্ভ কর। ধনীদেব হাত করিয়া বত কাজ হইয়াছে, তাহাতে ধনীদেব মর্জি রক্ষা করিতে গিয়া অনেক মহান্ আদর্শবাদীকে আদর্শ বিসর্জনও দিতে হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য, ইহাতে কল্পনার বেশমাত্রও নাই।

যে ভালবাসে, তাহাকেই জীবিত বলিয়া মনে করিবে। এই কথাটি আমি তোমাদের জন্যে জনে জনে হাজার বার করিয়া বলিয়াছি। বাহা ভালবাসে না, তাহারা মৃত। তাহাদের মৃত্যু ঘুচাইবার জন্ত তাহাদিগকে ভালবাসিতে শিখাও।

সৎ হইলে তোমাদেরই লাভ। সৎ হইলে সমাজেরও লাভ। কিন্তু সমাজের লাভ গোণ, তোমার লাভটাই এই স্থানে মুখ্য। প্রাণপণে সৎ থাকিবার চেষ্টা কর।

সৎ লোক গাড়িতে গিয়া সাম্প্রদায়িকতার প্রেতমূর্ত্তি সব রচনা করিও না। প্রেতের বাহ, ভূতের নৃত্য, পিশাচের তাণ্ডব, ইহাই তোমাদের রক্ষা নহে।

অপরূপ অনেক বড়রা বাহা করিতে পারেন নাই, তোমাদের তাহাও করিতে সমর্থ হইতে হইবে, এই পণ কর। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫২)

ইতি-ও

বারাণসী

২৫শে কার্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিবে।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবার চেষ্টায় আনন্দিত হইয়াছি। আশ্রয় দিব না না-বলিয়া অলস থাকিতে দিব না, ইহাই বলা উচিত। অনেকেই আজকাল নিজেদের অলসতার দরুণ নিরাশ্রয় হইয়াছে, অলসতা দূর করিতে পারিলে ইহাদের অধিকাংশেরই আশ্রয় জুটিয়া যাইত। দেশে নিরাশ্রয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি বিপজ্জনক ও কলঙ্ককর। যে যত দিক দিয়া যত জনকে আশ্রয় দিতে পারি, দিবে, কিন্তু তাহাকে অলস থাকিতে দিবে না। অলসতার মের বড় পাপ কিছু নাই, ইহাই জানিবে। দান তত বড় পুণ্য নয়, যত বড় পুণ্য অলসকে পরিশ্রমী করা, অবসাদগ্রস্তকে অধ্যবসায়ী করা, আত্ম-বিশ্বাসহীনকে আত্মবলে বিশ্বাসী করা, নিষ্কর্মাকে কর্মী করা। পুণার্জন সম্পর্কে তোমাদের প্রচলিত ধারণাগুলি একেবারে বদলাইয়া ফেল বাবা, বদলাইয়া ফেল। আমি তোমাদের কাছে জীবনের নূতন মান, নূতন মূল্যবোধ, নূতন রূপায়ণ আনিয়া হাজির করিয়াছি। তোমরা আমার কথাগুলি বুঝিতে চেষ্টা কর। অফুরন্ত প্রেম-সহকারে তোমরা পাপকে মানব-জীবন হইতে নির্বাসিত করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগ। মানুষের সকল পাপই অজ্ঞানতা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে আর তাহার মধ্যে অধিকাংশই শাখা-পল্লবিত হইয়াছে মানুষের মজ্জাগত অলসতা হইতে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

শেষ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেরণা

প্রতিধ্বনি

৮৪৯

(৬৫৩)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৫শে কার্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াস্তু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস
নিও।

তুমি তোমার অপরাধী পুত্র ও পুত্রবধূকে আদর করিয়া কোলে
তুলিয়া লও। ইহাদের প্রতি বন্ধমূল আক্রোশ নিয়া থাকিও না।
ইহাদের ক্ষমা কর। ক্ষমায় তোমার বল বাড়িবে মা, ক্ষমায় তুমি
অনেক বড় হইয়া যাইবে। ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত করিয়া
নিজেকে কেবলই ক্ষত-বিক্ষত করিও না, কেবলই নিজেকে নিজের
কাছেও ছোট করিয়া দিও না। পুত্র তোমার অমতে বিবাহ করিয়াছে,
তাহা তাহার না করাই উচিত ছিল। কিন্তু সে ত তোমার ক্ষমা চাহে।
সে তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া আর দূরে দূরে বাস করিতে চাহে না।
সে তোমাকে সেবা করিবারই অধিকার ফিরিয়া পাইতে চাহিতেছে।
হবে কেন তোমার এত ক্ষুদ্রতা? সে ত অত্র কোন নৈতিক অপরাধ
কর নাই, যাহার জন্ত তোমার গৌরব কমিতে পারে। সে মাত্র ভিন্ন
জাতি হইতে নিজের বধু সংগ্রহ করিয়াছে। যেই জাতিটি হইতে
তাহার বধু আসিয়াছে, তাহাকে তুমি হয়ত তোমার জাতি অপেক্ষা
ছোট মনে কর, ইহাই ত তোমার আফশোষ। কিন্তু তোমার অতীত
পূর্বপুরুষদের কুলজী খুঁজিতে গেলে এমনও ত বাহির হইতে পারে যে,
তাহাদের মধ্যেও অনেকে হয়ত এমন জাতির ছিলেন না, যেই জাতি
বলিয়া আজ পরিচয় দেওয়া হইতেছে। তোমরা ওঙ্কারমন্ত্রের উপাসক,

তোমাদের পক্ষে উদারতা প্রত্যাশা করা যাইবে না। ত. কাহাদের নিকটে তাহা প্রত্যাশা করিব ?

প্রণবে নাকি তোমাদের অধিকার ছিল না। একদল লোক অনেক আন্দোলন করিয়া তোমাদের জাতির মধ্যে কিছু কিছু লোককে প্রণব-মন্ত্রের উপাসক করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। যজ্ঞোপবীত দিয়া তোমাদের সম্মান, ব্রাহ্মণের সমান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সামাজিক ভাবে সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। যজ্ঞোপবীতের বাহ্য আড়ম্বরে প্রবেশ না করিয়া আমি আমার স্বাধিকার বলে তোমাদের প্রতি জনকে ঐশ্বর্যগায়ত্রীর অধিকার দিয়াছি। আর দিয়াছি এই সঙ্কল্প যে, তোমরা অগ্নিসমতেজা ব্রাহ্মণই হও। তোমাদের পক্ষে সকল জাতিকে সাদরে বুকে টানিয়া আনিবার বলের কেন অভাব হইবে মা ?

দর্বলতা দূর কর। মনোবিকার নাশ কর। চিন্তের অধীরতা বিসর্জন দাও। যে-কেহ ব্রাহ্মণের মতন হইয়া তপস্যার জীবন বাণনে প্রস্তুত, তাহাকেই সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হও। ছোট জাতি বলিয়া যেই বধূকে তুমি অবজ্ঞা করিতেছ, তাহার পিতামাতা আবার তোমাদের সামাজিক জাতিটাকে তাহাদের জাতি অপেক্ষা নিকট জান করে। ইহা কি তুমি জানো না ? যেই বধূকে তোমার ঘরে ঢুকিতে দিবে না বলিয়া জেদ করিয়াছ, সে যে তোমারই মতন আমার নিকটে ব্রাহ্মী দীক্ষা লাভ করিয়া গিয়াছে এবং সংযত মনে সংযত প্রাণে প্রণব-ব্রহ্মগায়ত্রী যোগে সাধনা করিতেছে, তাহা কি তুমি জানো মা ? তুমি মন হইতে সকল বিদ্বেষ দূর করিয়া দাও, মনকে উন্মুক্ত কর, মনের কণাট খুলিয়া দাও, মনকে প্রেমরসে প্লাবিত করিবার রাস্তা কর।

যুগে বাঁচিবার দায়ে মানুষ মানুষের সহিত বিভেদ ভুলিতে চাহিতেছে,
সেই যুগে আদর্শের দায়ে তোমরা মানুষের সহিত মিলনগ্রাহি রচনা
করিতে পারিবে না? ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫৪)

হরি-ও

বারাণসী

২৫শে কার্তিক, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস
জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া চিন্তিত হইলাম। নিজেকে কেবলই অক্ষম
আর অধম বলিয়া ভাবিতে থাকিলে যে চিরকালই অক্ষম ও অধম
হইয়া থাকিবে। তুমি অসীম শক্তিধর না হইতে পার, কিন্তু কতকগুলি
কাজ করিবার ক্ষমতা তোমার এই অবস্থায়ও আছে। সেই পরিমাণ
তুমি ক্ষমতাবান্ পুরুষ।

নিজেকে উন্নত না করিয়া অশ্রের মধ্যে ভাব প্রচার করিতে গেলে
মানা অসামঞ্জস্য হেতু নিজের অধোগতি হয়, ইহা সত্য। আবার

নিজেকে উন্নত করিবার উপায় হিসাবেও প্রচারকার্য হাতে নেওয়া যাইতে পারে।

যখন যেটুকু কাজ করিবে, ভিত্তি রাখিও ভগবৎপ্রেমে। প্রেমের সেবাতে ভুলভ্রান্তি কম হয়, ইহলেও তাহার সংশোধন সেই প্রেমের বলেই হয়। অপ্রেমীরাই আত্মাহ্বারে মত্ত হইয়া প্রচারকে নিজের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির কাজে লাগাইয়া থাকে। প্রেমকে কর জীবন, প্রেমকে কর সম্পদ, প্রেমকে কর জীবনের পরম মূলধন, পরম সঞ্চয়।

কোনও কোনও স্থানে কাহাকেও কাহাকেও মণ্ডলী স্থাপন করিতে দেখা যায়। মণ্ডলী ত প্রতিষ্ঠিত হয় না, ইহার নিজেরিগকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে কাহারই প্রতিষ্ঠালাভ হয় না। অপ্রেমেরই ইহা ফল। তোমরা অপ্রেম পরিহার কর, প্রেমিক হও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫৫)

হরি-ওঁ

পুণ্ডরীক

২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজিনীষু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশির
নিও।

গতকাল তোমাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে
 মনের তৃপ্তি হইল না! তুমি অখণ্ড-সংহিতার অসাম্প্রদায়িক বাণী সমূহ
 প্রচারের জন্ত সাহস করিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে নূতন নূতন স্থানে
 ধর্মাবিধান পরিচালন করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে অশেষ প্রশংসার
 কথা। যে যুগে প্যারাসুট সহ বিমান হইতে শূণ্ডে বাষ্প প্রদান করা,
 ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা বা হুর্জয় হিমালয় অভিযানে অগ্রসর
 হওয়া বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে অসম্ভব হয় নাই, সেই যুগে তোমারও
 ধর্মপ্রচার, সত্যপ্রচার, মানবমাত্রের সমতার ও মমতার তত্ত্বপ্রচার-কার্যে
 নির্ভয়ে নামিয়া পড়া আমি মোটেই অস্বাভাবিক মনে করি নাই।
 গীতা দে, আরতি সাহা বা তেনজিৎ-এর কথা কুমারী নোরকে
 সকলেই বাঙ্গালা দেশের লোক। তোমরা নিজেদের অবলা বলিয়া
 আর কল্পনামাত্রও করিবে না। ঘরে ঘরে সেই বাণী তোমরা পৌছাঁও,
 সেই বাণী উদ্বীর্ণ হইয়াছিল স্পৃষ্ট আত্মার যুম ভাঙ্গাইবার জন্ত। যে
 সময়ে কমিউনিষ্ট চীনের সৈন্যদল ভারতের সীমান্তের বহু ভারতসন্তানকে
 নিহত করিয়া ভারতাক্রমণপর্ব দ্বারা চতুর্দিকে ত্রাস-সৃষ্টি করিয়াছে,
 সেই সময়ে সীমান্ত হইতে স্বল্প দূরে তুমি ভুটিয়া, লেপচা, সিকিমি আদির
 পল্লীতে প্রবেশ করিয়া করিয়া হরিনাম বিলাইতে স্নরু করিতে বিন্দুমাত্র
 ভীত হও নাই, ইহা তোমার পক্ষে অশেষ প্রশংসাযোগ্য কাজ
 হইতেছে। নির্ভয়ে কাজ করিয়া যাও। ক্ষুদ্র প্রারম্ভ হইতে জগতে
 অনেক বৃহৎ পরিণতি দেখা গিয়াছে। তুচ্ছ নগণ্য সাধারণ একটা
 কর্ণহুচনা ভাবী কালে বিরাট আন্দোলন ও সার্থক নব-রূপায়ণের দৃষ্টান্ত
 স্থাপন করিয়াছে। তুমি কাজ করিয়া যাও মা, থামিও না।
 তবে, দুইটা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিও,—কারণ তুমি
 স্বীলোক। সহচর-নির্কীচনে সতর্ক থাকিও, যাকে তাকে সঙ্গে লইয়া

কাজ করিতে বাহির হইও না, পরীক্ষিত-চরিত্র এবং জনসমাজে অনিন্দিত সহকর্মীই বাঞ্ছনীয়। বাহাদের গৃহে কাজ করিতে গেলে তোমার নিশ্চল চরিত্রের উপরে অপবাদ আসিবার সম্ভাবনা, আপাততঃ তাহাদের গৃহে গমন হইতে বিরত থাকিও। ভবিষ্যতে কর্মপ্রয়োজনে কি হইবে না-হইবে, ভাবিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বর্তমানে তোমাকে এই নির্দেশটুকু মানিয়া চলিতেই হইবে।

আরও একটি বিষয় সম্পর্কে তোমাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বিশেষ নির্দেশ দিতেছি। অন্তরভরা প্রেম লইয়া সর্বত্র কাজ করিতে কিন্তু শিশু এবং বৃদ্ধ ব্যতীত অপর পুরুষদের সম্পর্কে সেই প্রেমকে বাহ্য প্রকাশ দিতে বিরত থাকিও। সামান্য একটু নয়ন-চটুলতা, সামান্য একটু বচন-চপলতা অনেক সময়ে নির্দোষ মেয়েগুলিকে নিজের স্ত্রী মায়াজালে বাধিয়া অকালে হত্যা করে। সর্বজনে তোমার যে প্রেম, তাহাকে কখনও নীচের জগতে নাগিবার অবসর দিও না, তাহাতে কাহারও দুর্বলতার অবসর রাখিও না, তাহাকে কাহারও প্রলোভন-বুদ্ধির বা রসনা-কণ্ঠ্যনের সুযোগ রূপে ব্যবহৃত হইতে দিও না। প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত তোমরা স্বভাবতঃই সর্বজনের প্রতি প্রেমশীল হইবে কিন্তু তোমাদের চরিত্রের মাধুরী যতই অপরূপ হউক, তোমাদের কোনও বাহ্য চপলতাকে আশ্রয় করিয়া কোথাও যেন কোনও শরভান কখনো ফাঁদ পাতিবার অবসর না বাহির করিতে পারে। এই শিক্ষা দিয়া হইও বজ্রের মত কঠোর, রুদ্ধের মত ভীষণ, বজ্রের মত ক্ষমাহীন।

মহকুমা মণ্ডলীতে কয়েক মাসের মধ্যে বাইতে পার নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম। একবার গিয়া সবগুলি গুরুভগিনীকে তোমার অনুরূপ কার্যে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিয়া আইন।

নিজের অন্তরে কণামাত্র অহঙ্কার না রাখিরা তাহাদের প্রতিজনকে
 ডাকিতে হইবে। “এস তোমর দেখিয়া যাও, আমি কেমন উচ্চ
 স্তরের কথা, অনুকরণ কর আমার কর্মরীতি, ধাতু হও, কৃতার্থ হও”,—
 এই যে আজ নিয়া ডাকিলে দেখিবে একজনকেও কাজে নামাইতে
 পারিবে না। “সামান্য কিছু কাজ আমি করিতে প্রয়াসিনী হইয়াছি,
 পূর্ণসাক্ষ্য আসে নাই, তবু বাবামণি কতই তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন,
 সুতরাং এস ভগিনীগণ সকলে যার যার স্থানে সর্বশক্তি লইয়া কাজে
 লাগি, ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদন করি”,—এই মেজাজে ডাকিলে সকলকে
 পাইবে। একটা কথা অবশ্য তোমাকে সকলের কর্ণেই পৌছাইতে
 হইবে। তাহা হইতেছে এই যে, জগতে এত ছোট কেহ নাই, বাহার
 যার জনসেবা কিছু না কিছু হইতে পারে না। আমি ত জীবন ভরিয়াই
 হোটের মধ্যে বড়কে দেখিয়াছি। তুচ্ছ, অবজ্ঞাত, অতীব হীন ব্যক্তির
 ভিতরে আমি সমুদয় ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়াছি। জগদাসী
 বাহাদিগকে অনাদর করে, বাহাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে অতীব
 নীচ ধারণা পোষণ করে, আমি তাহাদের ভিতরের সুপ্ত ঐরাবতকে
 দেখিয়া ভাবী সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া পুলকিত হইয়াছি।
 ইহাই একমাত্র হৃৎখের ব্যাপার বলিয়া আমি মনে
 করিতেছি যে, ইহাদের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ
 আমরা করিয়া দিতে পারিলাম না। মঠ, মন্দির, আশ্রম,
 মণ্ডলী, সংসদ, পরিষদ, সভ্য, মেবাসদন, জনকল্যাণ-কেন্দ্র
 ও শিবির প্রতিষ্ঠার নাম করিয়া আমরা কেবল নিজেদিগকেই প্রতিষ্ঠিত
 করিবার চেষ্টা করিয়াছি, যুমন্ত গণ-দেবতার জাগরণ
 সম্পাদন করি নাই। অজ্ঞ, মূর্থ, নিরক্ষর লোকগুলির
 মধ্যে কৃত্রিম ঐক্য স্থাপন করিয়া তাহাদের সম্মিলিত

শক্তিকে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন-সিদ্ধিতে নিয়োগ করিয়াছি এবং করিতেছি। ভুলিয়া গিয়াছি যে, ইহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্তই আমরা ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাই, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের প্রয়োজনে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

(৬৫৬)

হরি-ও

পুপুনকী

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬

পরমকল্যাণীয়াস্তু :—

স্নেহের মা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশির্বাদ জানিও।

এই কয়দিন আমি কাহাকেও কোনও পত্র লিখিতে পারি নাই। পুপুনকী আসিয়াই মঙ্গলবাধের কাজে লাগিয়াছি। প্রাতে কার্য্যক্ষেত্রে চলিয়া যাই, আহারাদি সেখানে বসিয়াই করি, প্রত্যহই কাজ সারিতে সারিতে রাত্রি দশটা হইয়া যায়। এবার শীত অত্যধিক অপেক্ষা তীব্রতর দেখা যাইতেছে। আজ মঙ্গলকুটারের পইনের অর্থাৎ জল বাহির হইয়া যাইবার পথের এক তৃতীয়াংশ কাজ শেষ হইয়া যাইবে। প্রাতে আটটায় কাজে লাগিব, সারাদিন মাঠেই থাকিব, সন্ধ্যায় বা তারপরে ফিরিব এবং এই রাত্রেই দেবাদুন একপ্রশ্নে বারণী রওনা হইব। কালী হইতে দুই চারিদিন মধ্যেই পুনঃ কলিকাতা হইয়া ফিরিতেছি। পত্রাদি পুপুনকী ঠিকানাতেই লিখিও।

সৌভাগ্যশঙ্কর পরকার

তোমাদের ওখানে সমবেত উপাসনার প্রতি যুবক ছেলেদের খুব
নজর পড়িয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু সমবেত উপাসনার
প্রসার ও অনুশীলনের সম্পর্কে আগ্রহী কর্মীরা তোমাদের অন্ততর সাধু
প্রস্তাবগুলিকে কার্য্যতঃ রূপ দিতে পরোক্ষ বাধা স্বরূপ হইয়াছে শুনিয়া
দুঃখিতও হইলাম। সমবেত উপাসনার মতন পবিত্র কার্য্যে ইহাদের
কি হইয়াছে, ইহা এক অতীব শুভ লক্ষণ। কিন্তু অন্ততর প্রস্তাব ও
সঙ্কল্প-সমূহকে ব্যাহত করিয়া দিবার মত হুজুগে ইহা পরিণত হইতেছে
দেখিয়া আতঙ্কিত হইলাম। সমবেত উপাসনার প্রসার করিতে হইবে
বলিয়া অত্র সকল প্রস্তাব, সঙ্কল্প ও প্রয়োজনকে একেবারে অবহেলায়
ডুবাইয়া দিতে হইবে, ইহা ত মারাত্মক ভক্তি। বাহা হউক,
ইহাদিগকে তোমরা বাধা দিও না। সত্য সত্য প্রেম লইয়া কাজে
নামিয়া থাকিলে ইহাদের এই কাজ ধারাবাহিক ভাবে চলিবে।
তাহাতে আমার, তোমার, জগতের সকলের লাভ। আর যদি হঠাৎ
হুজুগে ইহার মাতিয়া থাকে, তবে কতকদিন পরে ইহাদের শ্রান্তি
আসিবে, ক্লান্তিবোধ হইবে, উত্তমে ভাঁটা পড়িবে। ইহাদের কাজে
বাধা না দিয়া তোমরা তোমাদের কাজগুলি করিতে লাগিয়া যাও।
ইহারা যখন তোমাদের অন্ততর কাজগুলি কিছুতেই করিবে না বা
করিতে সহায়তা দিবে না এবং কথা কহিতে গেলে যখন কলহই
করিবে, তখন ইহাদের বাদ দিয়া অত্র কর্মীদের দ্বারা তোমাদের আরও
অন্ততর কর্তব্য উদ্ঘোষিত কর।

একটা কথা সর্বদা মনে রাখিও। তাহা এই যে, কাহাকে দিয়া
কোন কাজ হইল না বা হইবে না, সেই বিবেচনাকে কদাচ প্রাধান্য দিবে
না। কাহাকে দিয়া কোন কাজটুকু হইতে পারে, তাহাই সর্বদা
লক্ষ্য করিয়া চল। বাহাকে দিয়া যে সংকারণটুকু হওয়া সম্ভব, বাহা

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্য

[৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা]

৮৫৮

যাহার রুচিকর, ব্যবস্থার দোষে বা বিবেচনার ত্রুটিতে অনেক সময়েই তোমরা তাহাকে দিয়া সেই সংকীর্ণাটুকু করাও না বা করাইতে পার না। অর্থাৎ যাহা অনায়াসে বা অল্পায়াসে সিদ্ধ হইত, তাহা অসিদ্ধ থাকিয়া যায়। কে কি করিল না বা করিতে চাহিল না, সেই বিতর্কে অবতীর্ণ না হইয়া, কাহাকে দিয়া কি করান যাইবে, তাহার দিকে তোমরা নজর দাও। যোগ্য দৃষ্টির অভাবে কত সুসম্ভাবিতব্য কাজ অপূর্ণ রহিয়া যাইতেছে অথচ সময় এবং সুযোগ, স্বাস্থ্য এবং পরমায়ু চিরকাল সমান থাকে না। তোমরা মনের ক্ষোভ দূর কর, অসতর্কতা পরিহার কর, প্রতিজ্ঞনের প্রতিবিন্দু শক্তি তার রুচিমত সাধ্যানুযায়ী সংকল্পে নিয়োজিত করিয়া তাহাকে সার্থক হইবার সুযোগ দাও এবং তোমাদের ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী জগন্মঙ্গল-পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপায়ণের পথে টানিয়া আন। কেবল জল্পনা আর হা-হুতাশে 'কোনও কাজ হইবে না' ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৫৭)

হরি-ওঁ

পুপুনকী
২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

পরমকল্যাণীয়াস্তু :—

স্নেহের মা,— প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পুপুনকীর রূপান্তর হইতেছে। গতকাল আলকুশা গ্রামের মহাত্মা

পৌষ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেমা

প্রতিবন্ধি

৮৫৯

গণের প্রায় পঁচিশ জন আসিয়া সারা দিন ধান ক্ষেতে ধান কাটিয়াছে। তাহাদের এত ভক্তি যে, সন্ধ্যাকালে আহার করিবার আগে কিছুতেই তাহারা সমবেত উপাসনা না করিয়া অন্তঃকরণ গ্রহণ করিল না। এত ভক্তি ও সেবা-ভাব এদেশে কখনো ছিল না।

আজও কালাপাথর, কামনাগড়া ও কুমড়ীর গোয়ালী ও মাহাতো গণ প্রায় জন পঁচিশেক সারাদিন খাটিয়া ধান কাটিয়া দিয়া গেল। তাহাদেরও অন্তঃপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্তরের ভক্তি নিয়া প্রসাদ জানে আহারীয় গ্রহণ করা এদেশে তেত্রিশ বৎসর দেখি নাই। তাই বলিতেছিলাম, হাওয়া ফিরিতেছে।

এখানে দামোদর-তীরে শবদাহ করিতে গেলে নেকড়ে বাঘগুলি বাগনের উপরে লাফাইয়া পড়িত, শ্মশান-বন্ধুদের তাড়াইয়া দিয়া অর্ধদণ্ড মড়া নামাইয়া লইয়া চিবাইয়া খাইত। এখানে টাঙ্গি হাতে করিয়া প্রভাবশালী অমর্য্য ব্যক্তির নিয়োজিত ঘাতক আমার মুণ্ড শিকারের জন্ত দুইটি বৎসর গোপনে সন্ধান খুঁজিয়াছে, কেবল ঈশ্বর-রূপার সফল হয় নাই। এখানে ঘর জ্বলাইয়া আমাকে বিপন্ন করিবার জন্ত ঘরে ঘরে বৈঠক বসিয়াছে, আমিই সাধিয়া তাহাদের সহায়তা করিবার জন্ত দেয়াশলাই পাঠাইয়া দিয়াছি। সেই দেশে আমারই ক্ষেতের ধান কাটিতে লোক আসিতেছে, ইহা আশ্চর্য্য সংবাদ নহে কি?

যেখানে নিরোভ নিলীলস পরিব্রাজককে জোর করিয়া ধরিয়া ভূমিদান করা হয় আর দানের পরেই দান-গ্রহীতাকে শতপ্রকারে হেন্স করিবার জন্ত ধারাবাহিক প্রয়াস পরিচালিত হয়,—যাহার জন্ত আমাকে বগদ মূল্যে আরও বহু ভূমি কিনিয়া তবে আত্মসম্মান বজায় রাখিতে হইয়াছে, সেখানে এসব কি হাওয়া-বদলের লক্ষণ নহে? পতিতেরও উত্থান আছে, অধমও উত্তম হইবে, অজ্ঞানেরও জ্ঞানসঞ্চার

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

৮৬০

ঘটিবে,—ইহা আমি চিরকাল বিশ্বাস করি। গুরুতর শ্রম করিয়া আজ যখন স্বোপার্জিত ভূমির উপরে সমাজের স্থায়ী মঙ্গল গড়িয়া তুলিবার কাজে আমি ব্যস্ত, সেই সময়ে এই পট-পরিবর্তনের দৃশ্য আমার শ্রান্তি-হরণ করিতেছে। এই সময়ে তোমরা এখানে থাকিলে গুরুদেবের ধাতুক্রেত্রে সুপক্ক ধানের শিস আর সাধারণ মানুষের প্রাণের মধ্যে জ্বলন্ত প্রেমের বহ্নি-শিখা দেখিলে কতই না আনন্দ পাইতে। ধানের শিস আর বহ্নিশিখা উভয়েই উর্দ্ধগামী। নিয়দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫৮)

হরি-ওঁ

পুণ্ড্রিকা

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬

পরমকল্যাণীয়েষু—

স্নেহের বাবা —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছি।

আমি ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি যে, অনেকেই আমার নিকটে ছজুগে দীক্ষা লইয়াছিল। ইহারই ফলে ইহারা দীক্ষা পাইবার পরে সাধন করে না। সাধন করে না বলিয়াই ইহারা গুরুভাইদের প্রতি প্রেম অনুভব করে না। সাধন করে না বলিয়াই ইহারা আমাকেও ভালবাসে না। যাহা হউক, আমি হয়ত লীঘ্রই বিলনিয়া বা সাত্রম যাইবার পথে আগরতলা হন্ট করিব। তখনও দীক্ষা হইবে। কিন্তু যাহাতে ছজুগে আকৃষ্ট হইয়া কেহ সেই সময়ে দীক্ষার ঘরে না চুকিতে

পারে, তাহার কড়া ব্যবস্থা তোমাদের করিতে হইবে। দীক্ষা নেয়, সাধন করে না, ইহা যে কত বড় অপরাধ, ইহা ইহারা আজ বুঝিতেছে না। একদিন হয়ত বুঝিবার সময় আসিবে কিন্তু সেদিন সমগ্র জগৎ খুঁজিলেও আজিকার দিনটাকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

তুমি যেই সকল দেবচরিত্র গুরুভাইদের দেখিয়া নিজে দীক্ষা নিবার জন্ত আগ্রহী হইয়াছিলে, তাহাদের কেহ কেহ এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই স্থানান্তরে যাইতে চাইতেছে। তাহাদের মধ্যে দুই একজন সাধন-ভজনে অননুরাগী হইয়া অবাস্তব বিষয় নির্যাস্ত হইয়াছে বলিয়াও হয়ত তোমার মন অশ্রদ্ধা ছুটিয়া যাইতে চাইতেছে। কিন্তু তোমার হতাশ হওয়া উচিত নহে। তোমার যে গুরুভাইরা সাধন-ভজন ছাড়িয়া দিয়া নামে মাত্র অথও হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের দিক হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া নাও। বিরাট জনসমাজে কত হাজার হাজার লোক রহিয়াছেন, যাহারা তোমার গুরুভাই নহেন, তাহাদের মধ্যে আদর্শের বাণী লইয়া অগ্রসর হও। গুরুভাই-নামধারী কপটাচারীরা পিছনেই পড়িয়া থাকুক। তুমি ব্রহ্মাণ্ডের আর সকলকে লইয়া তোমার লক্ষ্য-পথে অগ্রসর হও। জগৎকল্যাণে তোমার কাজ করিতে হইবে। জগৎকল্যাণে তোমাকে জীবনপাত করিতে হইবে। এই কথা ভুলিও না। গুরুভাই নাম দিয়া কতকগুলি অসাধক লোকের সহিত একটা সাম্প্রদায়িকতার বন্ধনে আবদ্ধ হইবার কি প্রয়োজন রহিয়াছে? যে ব্যক্তি সাধন করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছে, তাহাকে গুরুভাই বলিয়া ভাবিবারই বা কি আবশ্যিকতা?

সারা দিনের মধ্যে আমার একটা নিমেষের অবসর নাই। প্রত্যহ প্রাতে কিছু আহার করিয়া সোজা মাঠে যাই, ফিরিয়া আসি কোনও

দিন সন্ধ্যা সাতটায়, কোনও দিন আটটায়, কোনও দিন রাত্রি দশটাও হইয়া যায়। প্রথর শীতে খোলা মাঠে কাজ করিতে ক্লেশ অবশ্যস্তাবী। এই কয়দিনের শ্রমে শরীর খারাপ বোধ করিতেছি, তাই ঠিক করিয়াছি আগামী দুই তিন দিন মাঠে এক দুই ঘণ্টার বেশী থাকিব না। তাই তোমাদের পত্রের জবাব দিবার ফুরাস্ত হইতে হইবে।

তোমার যেই সকল গুরুভাইকে দেখিতেছ বর্তমানে উদাসীন, তাহারা সকলেই যে উদাসীন থাকিয়া যাইবে, ইহা মনে করিও না। ইহাদের মধ্যেও অনেক সদাশ্রমী আছেন, যাঁহাদের আত্মপ্রকাশে বিলম্ব হইতেছে। যখন সকলেই জাগিতে চাহিতেছে, সেই সময়ে কেহ কেহ ঘুমাইয়া থাকিবার জন্য জিদ করিতে থাকিবে, ইহা অশোভন। কিন্তু ঘুমন্তকে মৃত বলিয়া মনে করিবার প্রয়োজন নাই। ইহারা তোমার কথা শোনে না বলিয়াই প্রয়োজনীয় কথা বলিতে বিরত হইবে, এমন কাপুরুষতা যেন তোমার কখনো না হয়। তুমি তোমার কর্তব্য করিয়া যাও। ফলাফলের দিকে তাকাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে যদি মনে করিতে থাক যে তোমার শ্রম বিফলে যাইতেছে, তাহা হইলে সেখানে আরও অধিক পরিমাণে শ্রম করিবে, অভিনবতর পরিকল্পনা অধীনে কাজ করিবে। সকল ঘুমন্তকেই জাগাইতে হইবে, এমন কি মৃতকেও বাঁচাইতে হইবে।

সকলকে আমার আশীর্বাদ দিবে। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

পৌষ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম্না

প্রতিপন্ন

৮৬৩

(৬৫৯)

হরিওঁ

পুপুনকী

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসুঃ—

স্নেহের মা—, শরীরের অধীন হইও না। মনকে সতেজ রাখ। তোমরা স্বরূপানন্দ-সন্তান। অসাধ্য-সাধন করিবার জন্তই তোমাদের জন্ম। কণকালের জন্তও আত্মবিশ্বাস হারাইও না। প্রেম আসিলে কাম থাকে না। তোমরা প্রকৃত প্রেমিক হও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬০)

হরি-ওঁ

পুপুনকী

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে। তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তবে, সেই সুখের মধ্যে চন্দ্ৰের কলঙ্ক-রেখাও একটুখানি দাগ আছে। তাহা এই যে, তোমরা মাত্র ষটিকতক গুরুভাই একটা প্রতিষ্ঠাশালী সহরে বাস করিতেছ, বনমন্ডলের মনোমন্দিরে ভগবানের আরতির বাতি জ্বালিবার কত তোমাদের সুযোগ, সুবিধা এবং সম্ভাবনা, কিন্তু তোমরা এই অল্প কয়টা পোক একলক্ষ্য একমত হইতে পারিতেছ না বলিয়া তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের অনুশীলন হইতেছে না, তোমাদের

স্বাভাবিক শক্তি ক্রমশঃ ঝিমাইয়া মিয়ারিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। আমি চাহি যে, তোমরা ঐক্যবলপ্রবুদ্ধ হও।

তুমি মাঝে মাঝে মৌনী থাকিতে চাহিতেছ, ইহা ত খুব ভাল কথা। তবে মনে রাখিও, মৌনকালটুকুতে কুচিন্তা একেবারে প্রত্যাহার করিতে হইবে। স্বল্পকালই মৌনী থাক, ক্ষতি নাই কিন্তু তাহা কেন তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্কলকে দূতর করে।

অনেক সময়ে কুচিন্তা আসে শরীরের ধর্ম্মে। ইহা নিয়া মন খারাপ করিতে নাই। যথাসাধ্য দেহমন পবিত্র রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে থাক। কখনো কখনো বিফল হইতেছ বলিয়া নিজেকে অপদার্থ জ্ঞান করিবে কেন? নিজেকে কুচিন্তার উর্দ্ধে রাখিতে চেষ্টা করিবেই। সাফল্য বৈফল্য বড় কথা নয়, নিরন্তর পুরুষকার-প্রয়োগই বড় কথা। তুমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছ, তাহা বড় কথা নয়, কোন্ দিকে যাইবার জন্ত তুমি আপ্রাণ প্রয়াসী হইয়াছ, তাহাই বড় কথা। লক্ষ্য স্থির রাখ, চরণ তোমার যেখানেই থাক।

দ্রব্যগুণে রোগ সারে, এই হিসাবে মাদুলী কখনো কখনো রোগারোগ্য-বিধায়ক হইতে পারে। কিন্তু মাদুলীদাতাকে স্বর্ণ, মূল্য আদি কিনিয়া দিবার পরে আবার পারিশ্রমিক পঁচিশটি টাকা দিবার কথা যখন উঠিয়াছে, তখন ব্যাপারটা অন্তরূপ দাঁড়াইল। সাধুর বেশ ধরিয়া অনেকে পয়সা রুজি করিবার জন্ত মাদুলী বেচে। ইহাঙ্গিকে বিশ্বাস করার কোনও সার্থকতা দেখি না।

তুমি বাংলায় উপাসনা করিতে চাহিয়াছ। ইহাতে দোষ কি? কিন্তু বৌদ্ধমন্ত্রের বাংলা অনুবাদ কি হইবে বল ত? তাহার কোনও অনুবাদ হয় না। তাহার অর্থ অন্তরে জাগাইয়া রাখিতে হয়, তাহার বদলে মাতৃভাষার কোনও শব্দ চালান যায় না। সুতরাং "বাংলায়

উপাসনা করিব” বলিলেই তুমি বাংলায় মন্ত্রজপ করিতে পারিতেছ
কৈ?

সমবেত উপাসনাটি ত বাংলায় হইবার উপায় নাই। স্তোত্রগুলি
সংস্কৃতে রচিত বলিয়া ভারতের সকল প্রান্তের উপাসকদের পক্ষে সমান
সুবোধ্য বা সমান দুর্বোধ্য। অথবা আরও সত্য করিয়া বলিতে গেলে,
ভারতের অধিকাংশ ভাষাই সংস্কৃতের কাছে সুপ্রচুর ঋণী বলিয়া সংস্কৃতে
রচিত মন্ত্রের কতকাংশ সকলের নিকট প্রায় সমান সুবোধ্য। বিশেষতঃ
রাজানুগ্রহ ব্যতীতই সংস্কৃত ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা রূপে আজও বিद्यমান
রহিয়াছে। এই ভাষাতে সমবেত উপাসনা করিতে আপত্তি করা
সঙ্গত নহে। একদিন ইয়োরোপ আমেরিকার লোকদের সহিত এই
সংস্কৃতের মাধ্যমে আমাদের নিবিড় প্রাণের যোগ যে হইবে না, তাহা
মনে করিও না। জার্মেনীর এক শ্রেণীর বিদগ্ধ পুরুষ নিজেদের মধ্যে
অনর্গল সংস্কৃতে কথা কহিয়া থাকেন।

সংস্কৃত স্তোত্রের উচ্চারণ তোমার শুদ্ধ হয় না। ইহারও প্রতীকার
আছে। বাঁহাদের উচ্চারণ শুদ্ধ, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিয়া
করিয়া বহু বারের চেষ্টায় তোমার এই ত্রুটির সংশোধন হইতে পারে।
এই বিষয়ে সপ্রেম আগ্রহ থাকা দরকার। তোমাদের মধ্যে বাহাদের
আগ্রহ আছে, তাহাদেরও দেখিয়াছি, যখন সুরজ্ঞ উচ্চারণ-দক্ষ ব্যক্তির
সহিত সমবেত উপাসনায় বসে, তখনও নিজের সুর, কণ্ঠ ও অভ্যাসকেই
প্রাধান্য দিয়া শিক্ষাপ্রদানক্রম যোগ্য পুরুষের শিক্ষিত কণ্ঠকে একেবারে
অতলে ডুবাইয়া দেয়। ইহা হইতে বিরত হইতে হইবে।

সমবেত উপাসনাকে তোমরা প্রেম দিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর।
সমবেত উপাসনাকে আমি প্রাণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। এই সমবেত
উপাসনা একদিন পৃথিবীর সকল দেশে বিস্তার লাভ করিবে। যে

দেশে হিন্দুধর্ম বিস্তার লাভ করে নাই, এমন কি হয়ত একজনও হিন্দু নাই, তেমন দেশেও সমবেত উপাসনা নিজ্বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবে। ইহাও আশ্চর্য্য নহে যে, আমার এই শরীরের বিত্তমানতাই এই সকল ঘটয়া যাইবে। তোমরা সমবেত উপাসনাকে অবহেলা করিও না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬১)

হরি-ওঁ

পুপুনকী

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার দুই বৎসর আগের লিখিত পত্রখানার অল্প জবাব দিতে বসিয়াছি। হয়ত অবাক্ হইবে। আমার সন্তানের কোনও জিনিষ আমার নিকটে অবজ্ঞার নহে। অনাদর করিয়া আমি এক খানা পত্রও ফেলিয়া দেই না, যদিও অসংখ্য পত্র জমিয়া গেলে কখনো বস্তাবন্দী করিয়া, কখনো ছিড়িয়া, ট্রাক, বাক্স, টেবিলের উপরে পত্রের ভিড় কমাই। তোমার পরবর্তী পত্র এবং উক্ত পত্র, উভয়েরই জবাব একসঙ্গে দিতেছি।

“ওঙ্কারের জয়যাত্রা”তে আমার সত্য জীবনী প্রচারিত হইয়াছে, করিত বা মিথ্যা কাহিনীর স্থান উহাতে হয় নাই। ইহারই জন্ত ইহা দেখিয়া আসিয়া তোমার সহধর্ম্মিণীর মনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের এমন সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা

জাগিয়াছে। সত্যই আমার মৌনব্রত-কালে হাজার হাজার দম্পতী সুদীর্ঘ সংযম-ব্রত পালন করিয়া আমার তপস্তার সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছিল এবং ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক দম্পতীই এই ব্রত সুনির্দিষ্ট কাল পালন করিতে সমর্থ। “অসম্ভব” “অসম্ভব” বলিয়া কলরোল তুলিয়া দাম্পত্য-সংযম পালনকে একমাত্র অবতার-তুল্য মহাপুরুষগণেরই আচরণীয় অভাবনীয় ব্যাপার বলিয়া দূরে সরাইয়া না রাখিলে, এই ব্রতটি তোমাদের মতন রক্তমাংসের সাধারণ মানুষের পক্ষে উদ্ভাপন-যোগ্য ব্যাপার। অতীতে অনেকে ইহা পালন করিয়াছেন কিন্তু বিষয়টা সর্বসাধারণে প্রচারিত হয় নাই। এই জন্তই ইহা অসাধ্য, অকল্পনীয় ও অভাবিত বলিয়া এক ধারণা তোমাদের জন্মিয়াছিল। আজ সুদীর্ঘকাল দাম্পত্য সংযম পালন করিয়া তোমরা ইহার সুসাধ্যতা বুঝিয়াছ এবং ইহা দ্বারা কি যে অপারীক্ষা শক্তিশালী হয়, তাহাও অনুভব করিতেছ। মৃতরাং গার্হস্থ্যধর্ম পালনের প্রয়োজনে যখন ইন্দ্রিয়-ব্যবহার সত্যই আবশ্যক হইবে, তখনকার সময়টুকু ছাড়া জীবনের বাকী সমগ্র সময় মধ্যে মধ্যে দুই চারি বৎসর করিয়া দাম্পত্য সংযম পালন করিয়া যাইতে থাক। তোমার সহধর্মিণীকে সহস্রবার প্রশংসা করিতে হয় যে, অত্যাশ্চর্য শত শত নারী “ওঙ্কারের জয়যাত্রা” ছায়াছবি দেখিয়া আসিবার পরেও যখন ইন্দ্রিয়-সুখভোগাতুর জীবন যাপনের ব্যাকুলতা ছাড়িতে পারে নাই, তখন তোমার পত্নী ছবিটি দেখিয়া আসিবার পরক্ষণেই তোমাকে ব্রতাবলম্ব করিতে সমর্থ হইয়াছে। তোমার স্ত্রীর ত্রায় আরও দুই চারি জনের স্ত্রী অত্যাশ্চর্য স্থানে ইহা করিয়াছে। “ওঙ্কারের জয়যাত্রা” ছায়াছবির নির্মাতাদের সমস্ত বায় এবং শ্রমের সাফল্য এই দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

তোমাদের অঞ্চলে যাবাবর রিয়াংদের যে হর্গতি হইয়াছে, তাহাতে

আমি আন্তরিক ব্যথিত। অনেকগুলি জরুরী ব্যাপারেই সরকারী নীতি কোনও সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা নিয়া পরিচালিত হইতেছে না, ইহাই সাম্প্রতিক ঘটনাবলি হইতে প্রতীত হইতেছে। বাযাবরগণ ভূমি-সমস্তা-সমাপান-পথের এক নিদারুণ কণ্টক, ইহা বার্থ। কিন্তু আদিমকাল হইতে যাহারা বাযাবর থাকিয়াই জুমফসলে জীবন ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগকে একস্থানে স্থায়ী নিবাস স্থাপনে বাধ্য করিবার উপায় পুলিশের লাঠি আর হস্তি-শুণ্ড নহে। ইহাদিগকে যাবগিট করিয়া বা ইহাদের ঘর-দুয়ার ভাঙ্গিয়া সর্ব্বশ বিনাশ করিলেই ইহারা বাযাবরত্ব পরিত্যাগ করিবে না। ইহাদের নিকটে এই বাণী ও আশ্বাস পৌছাইতে হইবে যে, ইহারা যে যেই স্থানে বসিয়াছে, সেই স্থান আর ত্যাগ করিতে পারিবে না, ত্যাগ করিলেই তাহাদের অধিকৃত সমস্ত ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবে। তাহা হইলেই ইহাদের অধিকাংশ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাযাবরত্ব ছাড়িবে। তাহার পরে ইহাদের শিখাইতে হইবে যে, বিরাট বন-সম্পদ কাটিয়া নষ্ট করিয়া জুম করার অপেক্ষা স্থায়ী ভাবে সুপরিষ্কৃত অল্পতর ভূমিতেও কি করিয়া লাভজনক কৃষি হইতে পারে। এই সহজ সরল পথ না ধরিয়া কেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব, মহকুমা অধিকর্তা আদি লাঠি-সোটার প্রতি অত সুনজর দিলেন, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। স্বাভাবিক ব্যাপারকে স্বাভাবিক ভাবে না নিলে পরিণামে অনেক অনর্থ আসে। আজিকার নিরীহ রিয়াং কাহারও কুপ্ররোচনার যদি নাগাদের মত ক্ষিপ্ত হয়, তখন কি হইবে? যে ভদ্রলোকেরা তোমাদের ভোট ভাঙ্গাইয়া বিধান-সভায় আর লোকসভায় জনসাধারণের প্রতি-নিধিত্ব করিতে যান, অবিলম্বে তাহাদের দৃষ্টি তোমরা সকলে মিদিয়া আকর্ষণ কর।

পৌষ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেমা

প্রতিধ্বনি

৮৬২

এই সকল রিয়াংদের মধ্যে আমাদের ধর্ম প্রচার-কার্য সুদীর্ঘকাল যাবৎ চলিয়াছে। ইহাদের অনেক আপদ-বিপদে আমি আর্থিক সহায়তা করিবার চেষ্টা করিয়াছি আবার ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই-দশ দিন অর্দ্ধাশনে থাকিয়া পরমা বাঁচাইয়া তাহাও আমাকে মঙ্গলবাঁধ মেরামতের কার্যে পাঠাইয়াছে। ইহাদের সহিত আমার এই অগুরঙ্গতার বিষয় জানিবার পরে কেহ কেহ যে প্রচার আরম্ভ করিয়াছে,—“তোমরা স্বরূপানন্দের শিষ্য হও, দেখিও সরকারী কর্তারা তোমাদের জুমের জমি কাড়িয়া নিতে পারিবে না”—ইহা হয়ত খুব অস্বাভাবিক নহে। আমি খ্রীষ্টান মিশনারীদের মত ধনী নহি অথবা সমগ্র খ্রীষ্টান পৃথিবী ঐ সকল মিশনারীদের পিছনে যেমন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আমার পিছনে তোমার দেশের সমাজের এক-লক্ষ ভাগের এক ভাগ শক্তিও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া নাই। তবু যে বিপন্ন রিয়াংরা আমাকেই ত্রাণকর্তা মনে করিতে চাহিতেছে, তাহার কারণ এই যে, অত্যাচারের প্রবল শ্রোতের মাঝে ধরিবার মত আজ একটি সুখণ্ডও তাহাদের হাতের কাছে নাই। এই অবস্থাতে তাহারা কেহ কেহ আমাকে রাজনৈতিক ব্যাপারেও সর্বশক্তিমান বলিয়া ভ্রম করিতে যত্নবত্বই পারে। কিন্তু তোমাদের কোনও গুরুভাই নিজেদের সম-ধর্মীয় সংখ্যা বাড়াইবার জন্ত এই পরিস্থিতিকে যদি সুযোগ রূপে গ্রহণ করে, তবে জানিও, তাহা অত্যাচার এবং পাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমরা এই জাতীয় হীন প্রচারণা বন্ধ করিবার আশু ব্যবস্থা কর। অতীত দিকে তোমরা চারিদিক হইতে আবেদন-নিবেদন বিধান-সভায়, বিধান-সভার সভ্যদের নিকট এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তথা মুখ্য মন্ত্রীর নিকট পাঠাইতে থাক। এই সম্পর্কে স্থানে স্থানে জনসভার অনুষ্ঠান হইলে ভাল হয় আর এই সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদপত্র-সম্পাদকদের তোমরা অবহিত

কর। এই সকল ভ্রম-ত্রুটি-অব্যবস্থার সংশোধনের জন্ত যদি লেখনী খরচ না করিবেন, তবে সম্পাদক হইয়া পত্রিকা অফিসের চেয়ারে বসি বুঝা আড়ম্বর মাত্র।

তুমি এক একটা অতিশয় আনন্দদায়ক সংস্কার দেখিতেছ, আর তাহার উপসংহার হইতেছে দৃশ্যের চূড়ান্ত পর্য্যায়ের নিদ্রাযোগে শরীরের ক্ষয়,—ইহাকে খারাপ লক্ষণ বলিয়া মনে করিও না। শরীরের দ্বর্ষে মলমূত্র ত্যাগের দ্বারা আপনা আপনি বাহ্য অনেকেরই হইয়া থাকে, মন তাহার একটা ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিতে গিয়া স্বপ্নের সৃষ্টি করে। মন তামসিক নিম্নতায় পড়িয়া থাকিলে ব্যাখ্যাটী হয় অতীব কণ্ঠ্য পাপ-পঙ্কিল দৃশ্যের দ্বারা। মন সাত্ত্বিক উচ্চতায় আরোহণ করিলে প্রাকৃতিক উৎপাতের ব্যাখ্যাটী একটা পবিত্র দৃশ্যের মধ্য দিয়াও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। তোমার পক্ষে তাহাই হইতেছে মনে হয়। এই সকল বস্তু সম্পর্কে তোমার উদ্ভিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই, তবে শারীরিক ক্ষয়প্রবণতা নিবারণের জন্ত সন্দীপনী, সন্ধিনী, আদি মুদ্রা নিয়মিত অভ্যাস করা সম্ভব।

তোমাদের স্বামি-স্বামী দুই বৎসরের ব্রহ্মচর্যা-ব্রত উদ্‌ঘাপনের পরে পুনরায় একবৎসরের জন্ত ব্রতাবদ্ধ হইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। এই বৎসরটীও সানন্দে কাটিয়া যাউক। ইহার পরে তোমরা সন্তান লাভে সচেষ্ট হইও।

তোমাদের মণ্ডলীতে সমবেত উপাসনায় কেহ আসে না শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু সুখবর এই দিয়াছি যে, নাথ-জাতীয় ভ্রাতৃ-ভগিনীরা অধিক সংখ্যায় আসে। বেশ, ইহাই মন্দ কি, এই সমাজের লোকের মধ্যেই এখন তোমাদের প্রচারণা বাড়াইয়া দাও। ফলে সমবেত-উপাসনায় উপস্থিতির সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে পারে। সমবেত

উপাসনা আমার হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ। যে ইহাতে যোগদান করে, সে আমার অপরিণীত প্রীতি অর্জন করে, আমাকে অনির্বচনীয় প্রীতি দান করে। আমাকে বাহারা ভালবাসে, তাহাদের প্রতিজনের কাছে আমার মনের এই কথাটি বারংবার শুনাও।

প্রেমহীন জীবন লইয়া মানুষগুলি অন্ধের মত চলিতেছে। এই মন্তাই কেহই কোনও মতে বা পথে স্থির হইতে পারিতেছে না। তোমরা অগ্রেমিকদিগকে প্রেমিক হইতে সহায়তা কর। কেবল ঘৃণ্য-বর্ধসেবা আর ক্ষুদ্র স্ত্রীতে লোভ করিয়া করিয়া সকলে যে রসাতলে গেল।

তোমাদের ওখানে আমার একটা ভ্রমণ-তালিকা হয়ত কয়েক মাস পরেই রচিত হইবে। দীক্ষার ঘরে কতকগুলি বাজে লোকের ভিড় হইবে না, ইহাই আমি চাহি। বাহারা আমার চিন্তা ও আদর্শের সহিত পরিচিত হইয়াছে, বাহারা আমার প্রদর্শিত পথে মানুষ সঙ্কল্পে চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, বাহারা গুরুবাক্য পালনের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করিতে বন্ধপরিকর, বাহারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে কোনও সময়ে বলি দিয়া সর্বজনের কুশল সম্পাদনে সহায়তা করিতে প্রস্তুত, মাত্র তেমন লোকদেরই দীক্ষার ঘরে ঢুকিতে দিও। দীক্ষাকে একটা হুজুগের ব্যাপারে পরিণত হইতে দিবার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, লক্ষ শিষ্যের গুরু হইয়াও জগৎকল্যাণকর্মে আমি প্রায় একাকী শ্রম করিয়া বাইতে বাধ্য হইতেছি। এই ব্যাপারে তোমাদের দায়িত্ব কম নহে। মানুষের মধ্যে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রচার তোমরা করিতেছ না, অথচ দীক্ষার ঘরে ভিড় সামলান কঠিন হইতেছে।

ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

—জন্মদিন উপলক্ষে—

বিতাট সুযোগ

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

শ্রীহস্ত-রচিত

নিম্নলিখিত (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত পুস্তকগুলি এক কপি করিয়া
পূর্ণ মূল্যে গ্রহণ করিলে—

(ক)

নাম	মূল্য	নাম	মূল্য
১। জীবনের প্রথম প্রভাত	১০	১২। কুমারীর পবিত্রতা ২য় খণ্ড	১০
২। সরল ব্রহ্মচর্য্য	১০/০	১৩। নবযুগের নারী	১০
৩। কর্মের পথে	১১	১৪। সধবার সংযম ১ম খণ্ড	১০
৪। কর্ম ভেরী	১১০	১৫। " " ২য় খণ্ড	১০
৫। আত্মগঠন	১১০	১৬। প্রবুদ্ধ যৌবন	১০
৬। নববর্ষের বাণী	১১০	১৭। বিধবার জীবন-যজ্ঞ	১০
৭। পথের সাথী	১১০	১৮। অসংযমের মূলোচ্ছেদ	১০
৮। পথের সঞ্চয়	১১০	১৯। মন্দির (২য় সংস্করণ)	১০
৯। সর্পাঘাতের চিকিৎসা	১০	২০। শাস্তির বারতা ১ম খণ্ড	১০
১০। জীজাতিতে মাতৃভাব	১১	২১। " " ২য় খণ্ড	১০
১১। কুমারীর পবিত্রতা ১ম খণ্ড	১০	২২। " " ৩য় খণ্ড	১০

প্রতিধ্বনি

(মাসিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ } মাঘ, ১৩৬৭ { ১০ম সংখ্যা

অখণ্ড-বাণী

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(২২৫)

আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রাতঃস্থান থেকে শয্যায় শয়ন পর্যন্ত প্রত্যেকটা ব্যাপারকে তপস্যায় পরিণত কতে চেয়েছিলেন। তাঁদেরই বংশধর তোরা। ইট কাটা, দালান গাথা, ঘর ঝাট দেওয়া, বন পরিষ্কার করা, পুকুরের পানা ফেলা, গাছে জল দেওয়া—সব কিছু কাজের ভিতরে তপশ্চেতনাকে জাগিয়ে রাখ। কুলী দিয়ে যে কাজ হ'তে পারে, সে কাজ তোদের দিয়ে করাই কেন, নিজেই বা করি কেন? তোরা অনেকেই ধনীর ছেলে। দামিও গাল ফুলিয়ে চ'খ বুজে গাছ-তলায় ব'সে থাকলেই বরং এখনকার চাইতে বেশী মোটা মোটা মালপোয়া খেতে পাব। তবু

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৮৭৪

কেন এ পরিশ্রম স্বীকার? কারণ, কর্মের ভিতর যোগকে প্রতিষ্ঠিত
কতে হবে, যোগের সাথে কর্মকে মিলিয়ে নিতে হবে, ধর্ম-জীবনকে
অলসতার রাহুগ্রাস এবং পরমুখাপেক্ষিতার অপবাদ থেকে মুক্ত করে
হবে। তাই না আমার এত শ্রম, তাই না আমার এত উৎসর্গ।
আমার যারা ছেলে, তারা আমার মর্মের কথা বুঝে নাও, স্থির হও,
মনকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত কর এবং তারপরে নিঃশব্দে ইট কাট। -ইট
কাটাও একটা তপস্যা, অন্ততঃ এই কয় ঘণ্টা ইট কাটার চাইতে তোমার
বড় তপস্যা আর কিছু নেই।

(২২৬)

তোমাদের চিন্তা-ধারার মধ্যে আমার জীবনের আদর্শ একটু একটু
করিয়া স্থান লাভ করিতেছে দেখিয়া আরও প্রীত হইলাম। তির
বাবারা, একটা কথা মনে রাখিও যে, তপস্যার শক্তিই তোমাদের মধ্যে
সত্যিকার তেজ ও বীৰ্য্য দান করিবে। তপস্যার মধ্য দিয়া যে সাহিত্যের
সৃষ্টি, তাহাই ভারতের মাটিকে বরাহ-দংশ্ট্রায় ওলট-পালট করিতে সক্ষম
হইবে। তপস্যার অগ্নিতে পরিপুষ্ট হইয়া যে ভাবধারা প্রসারিত হইবে,
তাহাই বাঙ্গালীর সহিত অবাঙ্গালী প্রদেশ-সমূহকে অচ্ছেদ্য নৈকট্যের
পাশে আবদ্ধ করিবে। বাঙ্গালীর জীবন-মধ্যে ত্যাগ-তপস্যার ভিতর
দিয়া যে সৌরভময় সত্য-প্রসূর্ণ প্রস্ফুটিত হইবে, তাহাই বাঙ্গালী ও
বহির্বাঙ্গালীকে আশা-আদর্শের অলঙ্ঘনীয় আত্মীয়তায় ঐক্যবদ্ধ
করিয়া লইবে। তাই, তোমাদের সকল সাহিত্যিক প্রয়াসের পশ্চাতে
একনিষ্ঠ তপস্যার ভিত্তিকেই সর্বপ্রায়ে খুব দৃঢ়, খুব শক্ত, খুব কঠিন
করিতে হইবে।

মাঘ, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

৮৭৫

বিস্বাস করিও, সমগ্র ভারতের শতধা-বিভিন্ন মত-পথকে একীভূত করিয়া বৃহত্তর জগৎকল্যাণে নিয়োজিত করিবার উপযুক্ত উপাদান বাঙ্গালী-চরিত্রের মধ্যে রহিয়াছে। পরমতে সহিষ্ণুতার যে সক্ষম বাঙ্গালী জাতি কপিলাবস্তুর ঋষি গৌতমের কাল হইতে করিয়া আসিতেছে, তাহাই তাহাকে পরস্পর বিবদমান শত সাধন-পথের সামঞ্জস্য বিধানের সামর্থ্য প্রদান করিবে। কিন্তু নিজের প্রসুপ্ত শক্তিকে পৌরুষ-প্রভার জাগ্রত ও উত্তর করিবার জন্ত বাঙ্গালী যুবকের আজ তীব্র সাধনা চাই।

(২২৭)

উচ্চ আশ্ফালন কোনও জাতিকে বড় করে না, চঞ্চল চীৎকার কাহারও ললাট-দেশে বিজয়ীর রাজটীকা অঙ্কিত করে না। নীরব, গভীর, একাগ্র তপস্বাই ব্যক্তির বা জাতির ভাগ্য-নির্ধারণ করে।

(২২৮)

তপস্বী কর, জীবনকে কর্মময় করিবার জন্ত। মনকে বাঁধো প্রেমে আর বাহকে বাঁধো কর্মে। অনেকে কাজ করে কিন্তু প্রাণ নেই, অনেকের প্রাণ আছে কিন্তু কাজ করে না,—তোমরা কর্মবস্তুর হও, প্রাণবস্তুর হও। যতটুকু প্রতিদান পাও, ততটুকুই কাজ করো না, কর্ম তোমার অনন্ত হোক, প্রতিদান তার বত অল্পই হোক না কেন। তোমার কাজের ভিতর দিয়ে সমগ্র মানব-জাতির মঙ্গলকে স্পর্শ কর। সাফল্যের তাড়না নয়, তপস্বীর প্রেরণাই তোমাকে কাজের সাথে লগ্ন করুক। যশের তাড়না নয়,

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৮৭৬

আত্মদানের কামনাই তোমাকে কর্মসম্পন্নতার আহুতিতে পরিণত করুক। সাফল্য বা যশের প্ররোচনা-বর্জিত হ'য়ে যদি কাজ করতে পার, তবে আমি তোমাদিগকে দেবতা ব'লে মনে করব। কারণ, নিষ্কাম নির্লোভ কর্মই সকল শ্রেষ্ঠ তপস্যার পূর্ণবেদী।

(২২৯)

দাতাদের মধ্যে চারিটি শ্রেণী আছে। যারা দান করে প্রাণের আবেগে এবং দাতৃত্বের সহিত নিজেদের পরিচয় বা কোনও দাবীকে যুক্ত করে না, তারা দান-ব্রাহ্মণ। যারা সংকার্যে দান করে, কিন্তু কীর্তির জন্ত, যশের জন্ত, তারা দান-ক্ষত্র। যারা দান করে, কিন্তু হিসাবী বুদ্ধি ত্যাগ করতে পারে না, তারা দান-বৈশ্য। যারা দান করে এবং তা করে পাপ কার্যে সমর্থন পাওয়ার জন্ত, তারা দান-শূদ্র। দান-ব্রাহ্মণের দানই গ্রহণীয়। দান-ক্ষত্রের দান গ্রহণে চিন্তে মালিণ্য আসে। দান-বৈশ্যের দান গ্রহণে চিন্তে সঙ্কোচ ও নীচতা আসে। দান-শূদ্রের দান গ্রহণে নরকের রাস্তা পাকা হয়।

(২৩০)

আসি নাই আমি আমার এ জীবন একটীমাত্র সম্প্রদায়ের গণ্ডীবদ্ধ আদর্শের প্রচারে ব্যয় করিয়া যাইতে, তথাপি চাহিয়া দেখ, জগতে এমন কোন্ আদর্শবাদী ভাবকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যাহাকে কঠোর নির্ধ্যাতন না সহিতে হইয়াছিল? এমন কি যাহারা এই সকল যুগপ্রবর্তক জগদগুরু পতাকা বহিয়া চলিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বা নিকৃতি কোথায় ছিল?

মাস, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

৮৭৭

রগতে বাঁহাদের কাজ যত গুরুত্বপূর্ণ, দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট, তাঁহাদের তত
অধিক। মনুষ্যত্বের সাধককে দুঃখ কখনই ত্যাগ করে নাই।

(২৩১)

চিত্ত বাহার পবিত্র, তার সংস্পর্শে আসিলে অপরের মন সহজেই
পবিত্রতার ভাবে আবিষ্ট হইয়া যায়। তুমি যখন নীচভাব-প্ররোচিত,
তখন তোমার সংস্পর্শে অপরকে নীচতাই দিবে। তুমি যখন উচ্চ-
ভাবানুপ্রাণিত, তখন তোমার সংস্পর্শে অপরকে উচ্চ-চিন্তার তরঙ্গ-তাড়নে
আলোড়িত করিবেই। এই জগুই আমি বর্তমান ভারতের প্রত্যেক
যুবকের পক্ষে ভগবৎ-সাধনার আবশ্যকতাকে এত বড় করিয়া দেখি।
কারণ, ভগবৎ-সাধনাই বর্তমানের যুবককে অনায়াসলব্ধ চারিত্রিক সম্পদ
ও স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক শুদ্ধতা প্রদান করিয়া জীবনের প্রত্যেক
বর্ষক্ষেত্রের পক্ষে উপযুক্ত সৈনিক করিয়া গড়িয়া তুলিবে।

(২৩২)

ইন্ড্রিয়-লালসাতুর চঞ্চল মন ভগবানের নামের শক্তিতে বশীভূত
হয়। নামের নিবিষ্ট সেবার মধ্য দিয়া মনের কুরুচিসমূহ প্রশমিত হয়
এবং কীর্ণশ্রোতা সুরুচিসমূহ প্রবলতর বেগ ও প্রবর্তিততর আকার
প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্বতোভাবে নিজের চিত্তকে নামের আশ্রয়ে
নিয়া ফেলিয়া দাও। একটা মুহূর্তও বৃথা বাইতে দিও
না। অহুংকণ পরমাত্মার পরম অভয় নাম স্মরণ করিতে থাক।
যজ্ঞাসের বলে সকল অসাধ্য সাধিত হয়, তোমারও চপল চিত্ত নামের
স্মরণ করিতে করিতে আপনি স্থির ও স্নিগ্ধ হইবে।

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৮৭৮

(২৩৩)

মন কামেন্দ্রিয়সমূহে গিয়া বসিতে পারিলেই যত চাঞ্চল্যকর ও উদ্বেগজনক চিন্তা প্রবল হইতে আরম্ভ করে। এই জন্তই প্রয়োজন কামেন্দ্রিয়সমূহে পবিত্রতার ধ্যান করা। পবিত্রতার ধ্যান করা আর পবিত্রতার আধার কোনও প্রিয় বস্তুর ধ্যান করা প্রায় সমান কথা। নিজমূলে তোমার অভীষ্ট মূর্তির ধ্যান করিও এবং মনে মনে বারংবার নিজের উপরে এই শাসন প্রচার করিতে থাকিও যে,—‘এই ইন্দ্রিয় পরমাত্মার নিবাস-ভূমি, নীচ ঘৃণ্য হীন ও অবৈধ সুখলালসার পরিতৃষ্ণি জন্ত ইহা নহে।’ এইরূপ প্রতিদিন প্রতিক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে আপনি কাম প্রশমিত হইবে।

(২৩৪)

তোমার জীবন যে পরমাত্মার পরম-মঙ্গলময় মহানামের কুপাশিত, এই বিশ্বাস হারাইও না, বাবা। এ নামে যে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার জীবন কিছুতেই ব্যর্থতার ভাসিয়া যাইতে পারে না, পারে না, পারে না। সাধন কর,—একাগ্রচিত্তে, একাগ্রমনে; সম্পূর্ণ নির্ভর সহকারে সাধন কর। নামের মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া মৃতসঞ্জীবনী সুধা আহরণ করিয়া লও।

(২৩৫)

ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখাটাকে একটা নিতান্ত হাশুকের মূঢ়তা বলিয়া ষাঁহার প্রচার করিতেছেন, তাহারাই যে তোমার জীবনের আদর্শ হইবেন, একথা কে বলিল? পাশ্চাত্যের সর্বনাশা লোভ আর অপূরণীয় রিপু-চরিতার্থতার আকাজাই

মাঘ, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

৮৭২

যদি সভ্যতা হইয়া থাকে, তবে ভারতবাসী যেন কোটিকল্পকাল অসভ্য হইয়াই থাকে, আমি এই প্রার্থনা করি। নিজ নিজ জীবনের ইচ্ছিয়-তাড়নাকে ভদ্র পোষাকে বাজারে বাহির করিয়া যাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন এবং তাঁহাদের সৃষ্ট উপদংশরোগীগুলিকেই সৌন্দর্যের আদর্শ বলিয়া প্রচার করতঃ তাহাদের বিখজনীন মূল্য দাবী করিতেছেন, তাঁহারা দেশ, জাতি ও জগতের জন্ত যে কল্যাণ-সাহিত্যই সৃষ্টি করিতেছেন, এই কথা কি ভাবিয়া দেখিবার এবং দেখিয়া বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই? বিকারগ্রস্ত রোগীর ত্রায় মৃত্যুকালেও যাহারা শুধু ভোগের বস্তুই অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, সেই আত্মদেবত্ববোধ-বর্জিত মদ-মত্ত পাশ্চাত্য কখনও ভারতের আদর্শ হইতে পারে না। ভারতকে নিজের আদর্শের জন্ত এই ভারতের মৃত্তিকাই খনন করিতে হইবে এবং পুরাতত্ত্বের গহন-গুহার অভ্যন্তর হইতে তার প্রাণের দেবতাকে বাহির করিতে হইবে। আজ তোমরা রামায়ণ পড় না, মহাভারত পড় না, এই গুলিকে গাল-গল্প বলিয়া উড়াইয়া দাও, আর যদি পড়, তবে ইন্দ্রের গুরুপত্নীগমন, আর দুর্যোধনের গরুড়রিকেই প্রধান কথা বলিয়া গণনা কর, তাই আজ কামুকতার পূজারীদের লেখনী-গ্রহত কদর্যা চরিত্রগুলি তোমাদিগকে অত অভিভূত করে। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ ঘোষণা করিয়াছিল যে ত্যাগ ও সংযমই তাহার আদর্শ। মধ্য যুগে ভারতকে যতই ক্লোরোফর্ম করা হউক না কেন, চিরকাল কখনো তাহার চৈতন্য-বিলোপ ঘটাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না।

(২৩৬)

ভগবানকে ডেকে ডেকে লোকে অলস হয়, ভগবানকে ডেকে আমি কন্ঠ হইয়েছি। তোরাও ভগবানকে ডাক

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৮৮০

তোরাও কণ্ঠ হবি। প্রতি কণ্ঠের সাথে ভগবানকে জড়িয়ে রাখ্। হরিদ্রা ছাড়া যেমন কোনো তরকারী রান্না হয় না, ভগবানকে ছাড়াও যেন তেমন ভোদের কোন কার্য না হয়।

(২৩৭)

চাহি সেই প্রেমময়
 প্রাণময় সুন্দর হৃদয়,
 কোনো দুঃখে, কোনো বিষে
 যাহা কভু বিচলিত নয়,
 যে পরাণে বাজে শুধু
 পরার্থের মোহন-রাগিণী,
 যে অন্তরে জাগে সদা
 ব্যথিতের সুকরণ ধ্বনি,
 পরেরে আপন করি'
 নিজবক্ষে ঠাই দিতে চায়,
 হে পুত্র, জানিও নিত্য,
 সেই স্বর্গ পায় এ ধরায়।

“স্বর্গলোভে কত জন
 কত কিছু করে আচরণ,
 কেহ থাকে উদ্ধবাহ
 চতুর্দিকে জালে হত্যাশন,
 কেহ শিরে জটাভার

মাঘ, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

৮৮১

বহে, কেহ কঠিন শৃঙ্খল
 চরণে কটিতে বাঁধে,
 কিন্তু জেনো সকলি নিষ্ফল,
 পর-দুঃখে নিজ প্রাণে
 দুঃখ যদি না হয় জাগ্রত,
 সকল তপস্তা তার
 ব্যর্থতায় হয় পরাহত ।

নিজ-সুখে অনাসক্ত,
 পর-দুঃখে বিব্রত যে জন,
 তারি স্থির চিত্ত মাঝে
 পরমাত্মা করেন রমণ,
 তারি জীবনের কন্ঠে
 ভাগবতী লীলার প্রকাশ,
 পবিত্র পরশে তার
 বহুস্ররা পূর্ণ করে আশ,
 তেমন আনন্দ-মধু-
 সুরসাল জীবন তোমার,
 লব্ধ হোক, পুত্র মোর,
 আশীর্বাদ করি বারংবার ।

(২৩৮)

প্রশান্ত নির্ভর নিয়া
 ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায়,
 নির্ভয়ে দুর্গম-পথে

অগ্রসর হ'য়ে যারা যায়,

প্রতিধ্বনি

৮৮২

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

ডর-ভয় কিছু নাই
 এ জগতে তাহারাই
 ত্রিদিব-বাহিত্রি ধন
 মৃতসঞ্জীবনী সূধা পায়,
 আকর্ষণ করিয়া পান
 দান করে তৃষিত ধরায়।

“দুর্কলের তরে নাই
 জগতের কোনও মঙ্গল,
 ভিক্ষাসার শক্তিরান
 একমাত্র ক্রন্দন সম্বল,
 পরমুখ পানে চায়
 করে শুধু হায় হায়,
 দুয়ারে দুয়ারে তার
 ঘটে শত লাঞ্ছনা কেবল,
 হুঃখে আর অপমানে
 তার নেত্রে সদা বহে জল।

“সত্য যদি জানিয়াছ,
 ‘হতে হবে ষথার্থ মানুষ’,
 লক্ষ্য যদি চিনিয়াছ—
 বিশ্বাস্য পূর্ণ পরিতোষ,
 জানিও আপন হাত
 একমাত্র জগন্নাথ,
 কর পূজা বাহুবলে,
 এ বাহুর সানন্দ-সন্তোষ

মাস, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

৮৮৩

সমূলে করিবে ধ্বংস

কু-গ্রহের রক্ত রক্ত রোষ ।

“কিন্তু তুমি জানো কি গো,

ভয়-ত্রস্ত শক্তি পরাণ

মৃত্যুহীন সাহসের

কোথা হ'তে পাইবে সন্ধান?

দুর্বলের বাহ ক্ষীণ,

শ্রমকুণ্ড, — শক্তিহীন,

কোন্ ইন্দ্রজালে হবে

সমুত্ত কণ্ঠে স্তমহান?

অসাধ্য সাধিবে কার

মহাবলে হ'য়ে বলীয়ান?

“ব্রহ্মচর্য্য এই বল,

ব্রহ্মচর্য্য শক্তির আকর,

ইন্দ্রিয় সংযত হ'লে,

পদানত বিশ্ব-চরাচর

সংসারের ষাট-মন্ত্রে

ক্ষুদ্র এই দেহ-ষন্ত্রে

বিষাট ব্রহ্মাণ্ড-পতি

রচি' লন লীলার আসর,

সাহস তখনি জাগে

ত্রিলোক-বিপ্লাবী ভয়ঙ্কর ।

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৮৮৪

“হে পুত্র! জানিয়া লও

অসংযম বিদুরিতে হবে,

বীৰ্য্যবান্ হও যদি,

পুত্র ‘বলি’ মানি তোরে তবে।

সিংহের শাবক হ’য়ে

শৃগালের মত র’য়ে

নিজেরে গোরবী ব’লে

প্রচার ক’রো না কলরবে,

কোনও মহিমা নাই

দুর্ব্বলের ঘৃণ্য পরাভবো।

(২৩৯)

জুয়াচুরি আর প্রবঞ্চনা দ্বারা কোনও মহৎ কার্য সম্পাদিত হইতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করিও না। ছল-চাতুরী আর চালাকীর ভিত্তি দিয়া ত্যাগশূদ্ধ সুমঙ্গল জীবনের আবির্ভাব অতি অসম্ভব ব্যাপার। সুবিধাবাদী সুযোগপন্থীদের সংসর্গে পড়িয়া এই বিরাট সত্যকে বিস্মৃত হইও না। যে মশলার দালান গাঁথিবে, সেই মশলার মধ্যেই যদি ভেজাল থাকে, তবে ছাদ টিকিবে কিসের জোরে? পরপ্রবঞ্চনা আর আত্মবঞ্চনা উভয়ই বঞ্চনা এবং উভয়ই কল্যাণঘাতিনী। চালাকীর উপরে নির্ভর না করিয়া চরিত্রবলের উপরে নির্ভর কর। প্রাত্যহিক প্রত্যেকটী প্রয়াসের ভিতরে প্রাণের প্রাচুর্য্য, ধ্যানের স্পষ্টতা, আকাজক সততা আর চরিত্রের সরলতাকে প্রতিষ্ঠিত কর।

মাস, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

৮৮৫

(২৪০)

জীবনকে তপঃ-সাধনের উপযুক্ত কর, তপস্বীকে জীবন-গঠনের
 যত্নকূল কর। তপস্বাহীন জীবন যেমন বৃক্ষহীন প্রান্তরতুল্য এবং
 পথিকের পক্ষে আশ্রয়-সম্ভাবনা-বর্জিত, নিরর্থক, তপস্বী তেমন
 কষ্টকরমাকুল বনপথের দ্বারা প্রতিপদে পথিকের গতিবেগের হ্রাসজনক
 এবং অলাভজনক অভিনিবেশাকর্ষক। জীবন বলিতে বুঝিও, নিজের
 এবং জগতের পক্ষে মঙ্গলকর অস্তিত্ব; তপস্বী বলিতে বুঝিও,
 লাভজনক বস্তু বা অবস্থাকে পাইবার জন্য প্রীতিজনক বস্তু, অবস্থা বা
 অভ্যাস ত্যাগ।

(২৪১)

অভিষ্কা শুধু তোমাকেই কষ্টমহিষ্য করিবে না, তোমার স্পর্শে
 বহু লোক আসিবে, সবাইকে করিবে। এই জন্য অভিষ্কা নবযুগের
 নতুন মন্ত্র।

(২৪২)

মিথ্যা যবে চতুর্দিকে করে আক্রমণ,
 সত্যের নিকটে তার নিষ্ফল গর্জন।
 অপবাদ, নিন্দা যবে ধরিবে বেড়িয়া,
 আদর্শ নিষ্ঠার বলে স্থির হবে হিয়া।

(২৪৩)

মহত্ব বাধার মধ্যেও নিরন্তর ভগবানের পরম পবিত্র নাম মনে
 মনে স্মরণ রাখিবে। ইহারই ফলে নিত্য নব প্রতিভার উন্মেষণ নিজের

ভিতরে অনুভব করিতে থাকিবে। ভগবানের নাম প্রতিভার অকুণ্ঠ উৎস। অনেক নাস্তিকও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তোমার সেইদিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই। তুমি বিশ্বাস করিও, তোমার প্রতিভা নামের সেবার মধ্য দিয়াই পূর্ণাঙ্গ হইবে এবং সর্বতোমুখতা ও সর্বাস্তমুন্দরতা পাইবে।

(২৪৪)

যত বড় মহাপুরুষই তুমি হও, এমন ছোট ছোট অনেক কাজই তোমাকে কত্তে হবে, বাইরে থেকে দেখতে যে কাজ তুচ্ছ, নগণ্য এবং অনিত্য। কিন্তু অনিত্য কাজ ক'রেও নিত্য্যভিনিবেশের শক্তিতে তুমি নিত্য-মঙ্গলই লাভ করবে। মাটি, কাদা, জল, ইট, কাঠ, ঘর, দুয়ার, দালান, ক্ষেত, সবই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তবু এদের নিয়ে খাটতে হয়, অনিত্য দেহকে পর্যাপ্ত কত পরিচর্যা কত্তে হয়। কারণ, পরিচর্যা তুমি অনিত্যকে কত্তে পার, কিন্তু পরিচর্যার প্রকৃত লক্ষ্য সেই নিত্য বস্তু, যার ক্ষয় নেই, যার ক্ষয় নেই, যার বিকার নেই, যার পরিবর্তন নেই। অনিত্যের ভিতর দিয়েও অনুক্ষণ নিত্যকেই অনুসন্ধান কত্তে থাক। তাহলে অনিত্য জগৎ ধ্বংস হ'য়ে গেলেও তোমার শ্রম কখনো ব্যর্থ হ'তে পার্কে না।

বাংলা, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

৮৮৭

আন্দামানবাসী ভ্রাতা এবং ভগিনীগণের প্রতি

[ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী]

“প্রতিধ্বনি” অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় সাময়িক প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অখণ্ডমণ্ডলেখনর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের আন্দামান-দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণের বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং ভাষণ-দান কার্যে সহায়তা করিবার জন্ত আমার ত্রায় নিগূর্ণ কর্মীও সঙ্গে যাইবে। উৎসাহী সঙ্কল্পের প্রগ্রাম তৈরীর ব্যাপারে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, চার্লসম্যান, পাণ্ডার হাওস, পোঃ চাথাম, আন্দামান ঠিকানায় যোগাযোগ করিলে আমাদের পক্ষে স্থির করা সম্ভব হয় যে, কখন আমরা রওনা হইব এবং আন্দামানে কত দিন থাকিব।

পূর্বে আমরা ঠিক করিয়াছিলাম যে, এই জানুয়ারী মাসেই যাইব। কিন্তু ঠিকানায় আমরা খবরাখবর লইয়া যাহা জানিতেছি, তাহাতে বুঝিতেছি যে, এই দ্বীপপুঞ্জে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনীদের মধ্যে এই বিষয়ে যথোপযুক্ত আগ্রহ সৃষ্টি হইবার আগে আমরা গেলে কল অর্থব্যয় করিয়া যাতায়াত আমাদের ব্যর্থ-শ্রম হইবে। এখানে বসিয়াই আন্দামান-বাসী বাঙ্গালী ভাইবোনদের প্রাণে যেটুকু উদ্দীপনা দিতে পারি, আগে তাহা পরিবেশন করিয়া লই, তাহার পরে পরমপূজ্য-পার গুরুদেবকে নিয়া রওনা হইব। এই কারণে আমাদের আন্দামান ভ্রমণ একটু বিলম্বিত হইতে পারে। এজন্য কাহারও হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। পরমেত্ব যদি বাধা না দেন, তবে যাইতে আমরা প্রসঙ্গ চেষ্টাই করিব।

প্রতিদ্বনি] আন্দামানবাসী ভ্রাতা-ভগিনীগণের প্রতি [৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা
৮৮৮

আন্দামানের এক স্থান হইতে অত্র যাতায়াতের যে সকল অনু-
বিধার সংবাদ আমরা জ্ঞাত হইলাম, তাহাতে মাত্র দুই সপ্তাহ সময়
মধ্যে অভিলষিত কার্য সমাপ্ত করিয়া আসিতে পারিব বহি-
ধারণা করা অসম্ভব। শুধু একটা খাল বা খাড়ী পার হইবার জ-
যেখানে ফেরা ষ্টীমারের প্রত্যাশায় দুই, তিন, চারি দিন বসিয়া থাকি-
হয়, সেখানে মাত্র দুই সপ্তাহে উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য আন্দামান ঘুরি-
এবং সেখানে করিবার মত কাজ কিছু করিয়া আসা যায় না। এই
কারণে স্থির হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব পৌ-
রোয়ারে পৌছা হইতে শুরু করিয়া পোর্ট ব্লেয়ার ত্যাগ পর্যন্ত যে
দেড় মাস (৪৫ দিন) সময় আন্দামানের জন্ত নিয়োগ করিলে
আন্দামানবাসী সুধী সজ্জনেরা ভ্রাতা শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দত্তের সহিত যোগ-
যোগ করিয়া প্রগ্রাম করা বিষয়ে সহযোগ দিলে এই বিষয়ে শে-
সিদ্ধান্ত দ্রুত গৃহীত হওয়া সম্ভব হইবে।

বাঙ্গালী জাতি বড়ই আত্মবিশ্বস্ত এবং দলাদলি-প্রিয়। রামমোহন
বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের জন-
এই জাতির ভিতরে হইয়াছিল, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির
যে বাঙ্গালী পিতার ঔরসে আর বাঙ্গালী মায়ের গর্ভে জন্ম
করিতে হইয়াছিল, ইহা নিয়া আমাদের গর্বের অন্ত নাই, কিন্তু এই
সকল জগদ্বরেণ্য পুরুষের সদগুণাবলি আমাদের কাহারও স্মরণে নাই।
ফলে, আমরা যেখানে যাই, সেখানেই দলাদলি করি, আত্মকল্যাণ
দ্বারা নিজেদের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ ও সন্মানকে খর্ব করি। বিচিত্র নহে যে
আন্দামানেও দুই এক স্থানে আমাদের এই হীন স্বভাব একটু আঁট
মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে বা উঠি-উঠি করিতেছে। ইহা বলা নিষায়ের

বর্ষ, ১৩৬৭] আন্দামানবাসী ভ্রাতা-ভগিনীগণের প্রতি প্রতিধ্বনি

৮৮৯

হে, আমরা এমন কোনও স্থানে বাইয়া বেদনা সংগ্রহে আকাজ্ঞা নহি।
 তবে যদি আমাদের আগমনে কোনও স্থানে দলাদলির অবমানের
 সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ থাকে, তাহা হইলে আমরা
 যেমন স্থানকে ভ্রমণ-তালিকা হইতে বর্জন করিব না।

যে যে স্থানে ব্যবস্থা হইবে এবং যোগ্যভাবে প্রচার হইবে, সেই সেই
 স্থানে খ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ও
 ইংরেজীতে ভাষণ দিবেন। আমি সর্বত্রই বাংলা ভাষায় বলিব।
 ঈশ্বরকৃপেব সাধারণত প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা সময় ভাষণ দেন, আর
 আমি তাঁহার আদেশানুসারে দেড় কি দুই ঘণ্টা বলিয়া থাকি। আচার্য্য-
 দেব যানব্র জীবনের সামগ্রিক সমস্তা নিয়াই আলোচনা করিয়া থাকেন,
 আমি প্রধানতঃ নারীজাতির আত্মোন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেই।
 যানব্র জনসমাজকে কি ভাবে সেবা দিলে তাঁহারা লাভবান হইবেন,
 তাহাই আমাদের লক্ষ্য থাকে আমরা আমাদের কোনও স্বার্থ-সাধনের
 জন্য কুত্সাপি কদাচ গমন করি না। আমরা ধন, সম্পত্তি বা দান সংগ্রহের
 জন্য লালসিত নহি। এই জন্তই খ্রীশ্রীবাবামণি (খ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ
 পরমহংস দেব) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম দিয়াছেন, অষাচক
 আশ্রম।

আমাদের আন্দামান ভ্রমণ সম্পর্কে কেহ বারানসীতে আমাদের
 সহিত সরাসরি পত্র-ব্যবহার করিবেন না। সকলকেই পত্র লিখিতে
 হইবে, খ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, চার্লসম্যান, পাওয়ার হাউস, পোঃ চাথাম,
 আন্দামান নামে ও ঠিকানায়।

প্রতিধ্বনি

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৮৯০

ধৃতঃ প্রেমা

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
লিখিত সমসাময়িক পত্রাবলী]

(৬৬২)

হরি-ওঁ

পুণ্ডরী

২রা পৌষ, ১৩৫৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।
এবার জন্মদিনে আমার টাটানগর আসি আসি করিয়াও দা
হইল না। এজন্ত কেহ মনঃক্ষুণ্ণ হইও না। এখন মঙ্গলবাধ ঘেরা
সবচেয়ে বড় কথা। আগামী জন্মদিনে আসিব।

তুমি শীঘ্রই স্বপ্নরালে ঘাইবে গুনিয়া সুখী হইলাম। বিবর্ত
পরে মেয়েদের শ্বশুরগৃহের উপযোগী করিয়া মনটাকে গঠন
প্রয়োজন। ভারতীয় গার্হস্থ্যের আদর্শ হইতেছে সকল পরিবার
সেবার মধ্য দিয়া অন্তরে তৃপ্তি, তৃষ্টি ও আত্মপ্রসাদ অর্জন কর
স্বামী ও তাঁহার আত্মীয়দিগকে মৎপথে আকৃষ্ট করিবার জন্য
প্রয়াস পাওয়া প্রত্যেক বধূর কর্তব্য। এই কর্তব্য উদ্বাপন করিয়া
হইলে সেই সংসারের প্রত্যেকটি প্রাণিকে ভালবাসিতে হইবে।

মাস, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিফলি

৮৯১

সংসার মধুময় হয়। আশীর্বাদ করি, তোমার সংসার মধুময়
হউক। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬৩)

হরি-ও

পুপুনকী

২রা পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াস্তু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি দরিদ্র বলিয়া সমবেত উপাসনায় যাইবে না, ইহা কোনও
কাজের কথা নহে। অত্যাগ্র ভাইবোনেরা সকলেই কি সজ্জের জন্ত
আর্থিক ভাগ স্বীকার করিতেছে? অনেকে সামর্থ্য থাকে সত্ত্বেও
কিছু করে না। তোমার সামর্থ্য নাই, তুমি আত্মীয়-বান্ধব দ্বারা প্রবঞ্চিত
বিষয়বুদ্ধিহীন দুর্ভাগা বিধবা। তুমি মোটা মোটা টাকা মণ্ডলীকে চাঁদা
দিতে পার না বলিয়া যাহারা তোমাকে বিদ্রূপ করে, তাহারা সজ্জের
শত্রু। অথগুণমণ্ডলীর সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে খালি হাতে
আসিতে নাই। তুমি একটা গুচ্ছ দুর্কা বা কয়েকটা বিল্ব-তুলসী নিয়াই
যোগ দিও। টাকা দিতে পার না বলিয়া যাহারা গঞ্জন করিবে,
তাহারা আদর্শভ্রষ্ট পাপিষ্ঠ। তুমি তাহাদের নিন্দাবাক্যে কর্ণপাতও
করিও না।

তোমার মতন অভাগা নারীরা দলে দলে শুধু পুষ্প-চন্দন হাতে লইয়া
সমবেত উপাসনায় যোগদান করিতে আসুক। আমি ইহাই চাহি

প্রাণতর্কান

ধৃতং প্রেম

[১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৮৯২

ধনগর্বে ক্ষীণ দান্তিকদের জন্ত সমবেত উপাসনা নহে, তাহাদের জন্ত আত্মপ্রচারের দ্বার অত্র খোলা রাখিয়াছে। উপাসনায় প্রতিজ্ঞা নিরহঙ্কার মনে আসিয়া যোগ দিবে, ইহাই আমার ইচ্ছা এবং নির্দেশ।

লক্ষ্য হউক তোমাদের প্রেম। কাহারও প্রশংসালভ দে তোমাদের লক্ষ্য না হয়। কাহারও নিন্দাতে যেন তোমাদের মন বিচলিত না হয়। কে কত গভীর ভাবে ভগবানে প্রেম অর্পণ করিতে পার, তাহা নিয়া হউক তোমাদের সুদারুণ প্রতিযোগিতা। প্রেমের অনুশীলনে সকলে সকলকে ছাড়াইয়া যাইতে চেষ্টা কর। প্রেমের অভিনয়ে দু'দিনের যশ মিলে, শাস্তি আসে না, অন্তরে বাইরে পুষ্টি সঞ্চার হয় না। ইতি—

আশীর্বাদ

অরুণানন্দ

(৬৬৪)

হরি-ওঁ

পুণ্ড্রী

২রা পৌষ, ১৩৬৩

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার নিকটে এখন হইতে নানা স্থানের মণ্ডলীর চিঠি-পত্র যাইতে পারে। সেই সকল চিঠি গেলে তাহা তুমি তোমার ব্যক্তিগত লক্ষ্য বা নিজস্ব ধন বলিয়া মনে না করিয়া, তাহাতে তোমার প্রত্যেক গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর প্রয়োজন এবং অধিকার আছে মনে করিয়া তাহা প্রত্যেককে দেখাইও এবং সেই সকল পত্র হইতে প্রত্যেক

মাস, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেরণা

প্রাতিপদ

৮২৩

যতটুকু জ্ঞান, বিবেক, সদ্বুদ্ধি ও প্রেরণা সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার সুযোগ দিও। অবশ্য, কোনও পত্রে তোমার নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয় থাকিলে তাহা সকলকে দেখান সম্ভবও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে।

তোমাদের ক্ষুদ্র সহরটির চারিদিকে কত স্থানে কত বন-জঙ্গলের আনাচে কানাচে তোমার গুরুভাই এবং ভরুভগিনী কোনও প্রকারে আসিয়া মাথা গুঁজিয়া রহিয়াছে, তাহা খুঁজিলেই বুঝিবে। ইহাদের প্রত্যেককে পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিয়া বাহির কর এবং সকলকে সমবেত উপাসনার প্রতি আকৃষ্ট কর।

তুমি ধনী বা পদস্থ নহ বলিয়া কেহ তোমার কথা শুনিবে না, ইহা মনে করিও না। বাহাদের ধনী মনে কর, তাহারা প্রতিজনেই ধনী নহে, অনেকে ধনীর সম্মান লাভ করিয়াও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দরুণ নানা অজানিত বিপদে পড়িয়া কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছে। আর ধনীরা সকলেই দরিদ্রকে অবজ্ঞা করে, ইহাও মনে করা সম্ভব হইবে না। অনেক ধনীই প্রাণহীন বটে কিন্তু কতক ধনীর ভিতরে প্রাণের চাঞ্চল্য পূর্ণভাবে বিদ্যমান। কাহাকেও ধনী বা দরিদ্র হিসাবে না ডাকিয়া, মানুষ হিসাবে ডাকিবে। মানুষের ডাক মানুষ শুনিবে। মানুষ হিসাবে মানুষকে ডাকিলে তোমার ধন বা পদব্যাধারও প্রয়োজন পড়িবে না। মানুষ হইতে গেলেই প্রেমের প্রয়োজন। প্রেম তোমাদের হউক অফুরন্ত। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

দ্বিতীয় প্রেক্ষা

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৮৯৪

(৬৬৫)

হরি-ওঁ

পুণ্যকী

২রা পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের কি স্থানীয় যুবকদের প্রতি কোনও কর্তব্য নাই? আমি আমার সমগ্র কৈশোর এবং যৌবন এমনকি পোড়াবস্থারও অধিকাংশ কাল কাটাইয়াছি, যুবকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের প্রচারে, বীর্যের বাণী বর্ষণে, অমানুষকে মানুষ করিবার চেষ্টায়, হতাশ-পতিতকে টানিয়া তুলিয়া নবজীবনের অরুণালোক প্রদর্শনের প্রয়াসে। সেই কাজ তোমাদের প্রতিজনের হাতে তুলিয়া নিবার কি সময় আসে নাই?

আমি চাই যে আর একটা দিনও বিলম্ব না করিয়া বালক, কিশোর এবং যুবকদের মধ্যে কাজ শুরু কর। আমি চাই যে, এই ক্ষুদ্র মহলে যে কয়টি তোমার সমদীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষ ও নারী আছে, তাহাদের প্রতিজনকে আজ এই মুহূর্ত হইতেই কাজে নামাইয়া দাও। এজন্য অফুরন্ত প্রেম লইয়া তোমরা অগ্রসর হও। সম্প্রদায় বিস্তার নহে, যাহা গড়া তোমাদের লক্ষ্য-হউক ইতি—

আনন্দময়

স্বরূপানন্দ

মাঘ, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেরণা

প্রতিধ্বনি

৮২৫

(৬৬৬)

হরি-ও

পুপুনী,

২রা পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীমান্ ম—আমার নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত আশ্রমটির দায়িত্ব নিয়া নিয়ত কেবল বিপদ আপদের সহিত লড়াই দিয়াই চলিতেছে। সম্প্রতি তাহার বিরুদ্ধে কয়েকটি মুসলমান স্ত্রীলোককে বাদী করিয়া একটি মিথ্যা মামলা উপস্থিত করান হইয়াছে। সে আজ সাত মাস ধরিয়া মোনী। এই অবস্থায় তোমরা তাহার বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে, ইহাই আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। তাই তোমাদের পত্র লিখিয়াছিলাম।

তুমি জবাবে লিখিলে যে, তুমি মামলা-মোকদ্দমা বোঝ না, এই জন্ত ফেণী বাওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিলে। চমৎকার গুরুভাই তুমি। একটা বিপদের সময়ে হৃদয়বান পরে পর্য্যন্ত আসিয়া দুইটি মুখের সহানুভূতি জানাইয়া যায়। তুমি যদি ফেণী গিয়া শ্রীমান্ ম—র সহিত দেখা করিয়া দুইটি সহানুভূতির কথা বলিয়া আসিতে, তাহা হইলে তোমার নয় শত পঞ্চাশ টাকা রেলভাড়া লাগিত না। তোমার পত্র হইতে তোমাদের হৃদয়হীনতা ও অন্তঃসারশূণ্যতার পরিচয় পাইতেছি। গুরুভাইএর বিপদে গুরুভাইএর প্রাণ যেখানে কাঁদে না, সেখানে গুরুদেবের জন্মোৎসবে লাভড়া-খিচুড়ী খরচ করা যে একটা অর্থহীন হুজুগ, তাহা তোমাদের বোধগম্য হইবে কবে? যেই পত্রে তুমি তোমার অপদার্থতার এমন চমৎকার পরিচয় দিয়াছ, সেই পত্রেই আবার নিতান্ত নির্ভর্যের মত আমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছ যে, তোমাদের আগামী

প্রতধ্বনি

ধ্বতং প্রেমা

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

৮৯৬

১৩ই পৌষের জন্মোৎসব সফল হয়। গুরুদেবের কার্যভার নিয়া যে সকল শিষ্য বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আছে, তাহাদের উপরে সত্যিকার বিপদ আসিয়া পড়ার পরেও দূরে দূরে সরিয়া থাকিয়া গুরুদেবের জন্মদিনে কতকগুলি হুজুগ, আড়ম্বর, জনসমারোহ, দীর্ঘতাং ভোজ্যতাং করাকে কি তোমরা জন্মোৎসব বল? আমি ইহাকে জন্মোৎসব বলি না, আমি ইহাকে নাম দেই প্রহসন। তোমরা প্রহসন হইতে বিরত হও। আমার জন্মোৎসবের নাম করিয়া তোমরা যাহা করিতে যাইতেছ, তাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক কুশল আসিবে বলিয়া কোন্ যুক্তিতে ধারণা করিতেছ? গুরুতে প্রেম নাই বলিয়া তোমাদের গুরুভাইতে প্রেম নাই,—তু জন্মোৎসব?

সত্যই যদি জন্মোৎসব করিতে হয়, অনাড়ম্বর হইয়া নিজ গৃহে বসিয়া অনশনে থাকিয়া ঐ দিনটী ভগবানের নাম করিয়া কর্তব্য অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত কর, ইহাই আমি চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৬৭)

হরি-ওঁ

পুণ্ড্রকী

৫ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াস্তু :—

স্নেহের—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

আজ বড় কঠোর শ্রম গিয়াছে। মঙ্গলকুটারের উপরে লিফ্টের ভুল করা হইয়াছিল। সংশোধন করিতে আমাকেই মাচা বাহিয়া

মাঘ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৮২৭

উঠিতে এবং কর্ণি ধরিতে হইল। নামিয়া আসিবার উপায় নাই, তাই বেলী খাটায় আহারীয় ঐ উপরেই নেওয়াইতে হইল। খাইতে খাইতে একটা লক্ষা লিণ্টেলের গাথুনির মধ্যে পড়িয়া গেল। ভাবিলাম, শুধু লক্ষায় ত চলিবে না, ছুটি আতপানও নিষ্কেপ করি। স্তত্রাং দরজার উপরে চিরকালের জন্ত আমার প্রসাদ সিমেন্টের বুক সযত্নে গাথুনি হইয়া রহিল। আর রহিল আমার আশীর্বাদ যে, এখানে আসিয়া নিবিষ্ট মনে যে অখণ্ডনামের সেবা করিবে, সে বাহিরে গিয়া পরিশ্রম করিলেই অনার্জন করিবে, অনেক চিন্তা তাহার থাকিবে না। এই বরটি আমি তোমাদের সকলের দিকে তাকাইয়া দিয়া রাখিলাম জানিও।

পরিশ্রম রোজই চলিতেছে, কিন্তু স্নানাহারটা সময়মত করি। আজ স্নান হয় নাই, প্রাতেও এককণা জলযোগ হয় নাই। আহারও অসময়ে বলিয়া দুই তিন চামচের বেশী গ্রহণ করিতে পারি নাই। তবে আনন্দ এই যে, যত কাজ বাড়িতেছে, তত কাজ শেষও হইতেছে এবং বাবজীবন আমার যত কাজ শেষ হইবে, তত কাজই বাড়িতে থাকিবে। দুইটাই আমার নিকটে সমান আনন্দের। ইতি—

আশীর্বাদক

অরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

স্বতঃ প্রেরণা

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৮৯৮

(৬৬৮)

হরি-ওঁ

পুণ্ড্রী

৭ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ২১শে ভাদ্র তারিখের পত্র পাইয়াছি। আমি এখন মঙ্গলবাঁধের কাজ নিয়া এত ব্যস্ত যে, হাজার পত্র টেবিলে জমিয়া গিয়াছে। এই কারণেই তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। এই বিলম্বের জন্ত মনে কোনও ক্লেশ নিও না।

তোমরা পাহাড়ীরা বড় সরল, বড়ই সহজ-বিশ্বাসপরায়ণ। ইহা তোমাদের এক মস্তবড় গুণ, ইহাই আবার তোমাদের এক মারাত্মক দোষ। তোমাদের সরলতার ও সহজ-বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগে অনেকে তোমাদিগকে প্রতারণিত করিয়াছে, আবার অনেকে ধর্মের নামে তোমাদিগকে বিপথেও পরিচালিত করিয়াছে। তোমরা পরস্পরের ভাষা না বুঝিলেও এক গোত্রের পাহাড়ীরা অল্প গোত্রের পাহাড়ীদের সহিত ভাব-বিনিময়ের জন্ত চিরকাল কম পক্ষে হাজার বছর ধরিয়া বাংলা ভাষাকে মাধ্যম করিয়া চলিয়াছিল। এই ব্যাপারে আগরতলার মহারাজাধিরাজগণের কৃতিত্ব অসাধারণ। কিন্তু সম্প্রতি ভাষায় গতি অল্প অসরল পথে পরিচালনের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তোমাদের চরিত্রে এবং বিশ্বাসে সহজে গ্রহণ এবং সহজে বর্জনের প্রবণতা থাকায়, জানিনা, কতকাল তোমাদের সহিত বঙ্গভাষার যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিব। হয়ত কয়েক দশকের মধ্যেই তোমরা বঙ্গভাষায় সঞ্চিত আমাদের স্বচ্ছ চিন্তাগুলির সহিত পরিচয় স্থাপনের

মাঘ, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেম

প্রতিধ্বনি

৮২২

কমতা, যোগ্যতা, সুযোগ এবং অনুরাগ হারাইয়া ফেলিবে। এই সময়ে তোমাদের সমাজের মধ্যে একটা বিপ্লবের অগ্রদূত রূপে প্রবেশ করিতে আমি একটু কিন্তু কিন্তু বোধ করিতেছি।

অখণ্ডমতে বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ আমি প্রচলন করি নাই। এই মতে একদা বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদি সর্বকর্ম্য হইবে, এই ভবিষ্যৎবাণী মাত্র আমি করিয়াছিলাম। আজ সেই ভবিষ্যৎবাণী দিকে দিকে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারই সাফল্য দেখি : তোমরা পর্যাস্ত পাহাড়-অঞ্চলে অখণ্ডমতে বিবাহ ও শ্রাদ্ধ প্রথার প্রচলনে আগ্রহী হইয়াছ। তুমি চাহিয়াছ, অখণ্ডমতে বিবাহের পদ্ধতিটী যেন বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া আমি তোমাদের নিকটে পাঠাই। তাহা হইলেই এই মাসে ফাল্গুনে বেসংক শত বিবাহ তোমাদের জাতির মধ্যে হইবে, তাহা অখণ্ড-বিধানে হইতে পারিবে।

কিন্তু বাবা অত তাড়াতাড়ি কোনও নূতন মত বা নূতন পথ গ্রহণ করিতে নাই। আগেই বলিয়াছি, তোমরা সরল এবং সহজ-বিশ্বাস-প্রবণ। ইষ্ঠাৎ নূতন মতে চলিয়া অনেক বিবাহ শাদী-ঘটাইয়া তারপরে একদিন যদি ভিন্নমতাবলম্বী একজন বাকুপটু লোকের কথার দাপটের সম্মুখে পড়িয়া তোমাদের মতটা বদল হইয়া যায়, তখন কেমন হইবে? আগে তোমাদের জাতির পাহাড়ী সম্প্রদায়ের আশি নব্বই হাজার লোকের ঘোড়ালদের আনিয়া একত্র কর, সকলে মিলিয়া বৈঠক করিয়া আগে স্থির কর যে, সমস্ত সমাজই বাবামণির নির্দেশে চালাবে, প্রাণ-পেলোও বারংবার মত ও পথ পরিবর্তিত করিবে না, তবে ত আমি তোমাদিগকে অখণ্ডমতে বিবাহ-কর্ম্য করাইতে নির্দেশ দিতে পারি। বিবাহের মত আনন্দজনক ব্যাপারে খাওয়া-দাওয়ার ও আমোদ-

প্রমোদের প্রাচুর্য্য থাকা স্বাভাবিক। বাহার বাহা খাত্ত, সে তাহা খাইবে, ইহাতে বোধ হয় আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু অখণ্ডবিধানে বিবাহ হইবার পরে মটকীর পর মটকী বোঝাই মত্তরস সমস্ত বাড়ীর আঙ্গিনা বাহিয়া চারিদিকে গড়াইতে থাকিবে, উন্মত্তের ছায় কাণ্ডজ্ঞান-হীন হইয়া নারীপুরুষেরা বাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবে, ইহা কি প্রকারে সমর্থন করা যাইবে? এই কারণেই অখণ্ড-বিধানে বিবাহ প্রবর্তন করিবার পূর্বে তোমাদের সমস্ত সমাজটির একত্র হইয়া সঙ্কল্প গ্রহণ প্রয়োজন। একবার আমি তোমাদের অঞ্চলে সহস্রাধিক নরনারীকে দীক্ষা দিয়াছিলাম। দীক্ষারই স্বাভাবিক ফলে ইহারা মত্তপান পরিত্যাগ করিয়াছিল। বাহাদের জুমের ফসল উঠিবার পরে দুই-তৃতীয়াংশ খাত্ত মত্ত প্রস্তুত করিতে চলিয়া যায়, তাহারা দীক্ষা নিয়াই মত্তপান ত্যাগ করিয়া ফেলিল। ইহা এক আশ্চর্য্য ঘটনা। তোমরাও ত সেই সকল দীক্ষিতদের অন্ততম। তোমরা নিজেরাও ইহাতে আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিলে। কিন্তু প্রচুর মত্তপান তোমাদের সামাজিক প্রথা, অটল মত্তপান তোমাদের সামাজিক শিষ্টাচার, বেপরোয়া মত্তপান তোমাদের কৌলিক সংস্কার। তাই কয়েক সহস্র লোকের মত্তপানবিরতি দেখিয়া তখন তোমাদের সমাজের মাথাওয়ালা লোকগুলি আমার বিরুদ্ধে গজিয়া উঠিয়াছিল। আমি যখন ডাক্তার অবিনাশকে নেতা করিয়া ঐ দুর্গম অরণ্যে গ্রামে গ্রামে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের জন্ত সেবাদান করিতে পাঠাইয়াছিলাম, তখন ইহাদের নিকটে আমার কর্ম্মীরা লাঞ্চিত হইয়াছিল। এই সকল ঘটনার কথা স্মরণ রাখিয়া তোমাদের ধীরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে যে, অখণ্ড-মতে বিবাহের প্রথা তোমরা প্রচলন করিবে কি না। আমি ত চাহি যে, তোমরা সাহস সঙ্কল্প

মাস, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেম

প্রতিধ্বনি

২০১

কর, কিন্তু হঠকারিণী করিয়া, বিনা বিবেচনায়, সহসা নূতন মতে আসা উচিত হইবে না। অথগু-বিধানে বিবাহ হইলে সেই বিবাহে মন্থপান চলিবে না।

তোমাদের সহজ-বিধানপরায়ণতার আর একটা দৃষ্টান্ত বলি। সামাত্র কিছুদিন আগে তোমাদেরই স্বজাতীয় একজন পাহাড়ীয়া মাধু হঠাৎ আবিভূত হইয়া টিলায় টিলায় ঘুরিয়া তাঁর ইচ্ছামতন এক ধর্মের প্রচার করিতেছিলেন। তিনি আমার বিরুদ্ধে, আমার মতামতের বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদগার করিতে লাগিলেন। যেই মুহূর্তে তাঁহার এই অদ্ভুত প্রচারকাণ্ড শুরু হইল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার জাতি-ভাইরা অকারণে আমার উপরে ক্ষেপিয়া গেল। তখন তোমাদের মধ্যে দুইচারিজন নিষ্ঠাবান সাধক ব্যতীত আর সকলের মন ও মুখ আমার দিক হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। সামাত্র একটু প্রচারণায় তোমাদের অনেক দিনের গৃহীত মতামত যেন দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। এই ভাবে সহজে যাহাদের মত টলে, মন গলে, বুদ্ধি চলে, এইভাবে সহজে যাহাদের বিবেক-বিচার পরিবর্তিত হয়, তাহাদের জন্য একটা বিধান প্রবর্তন হঠাৎ হইতে পারে না।

আমার কাছ হইতে বিবাহের বিধান পাইবার জন্য তোমরা আগে প্রস্তুত হও। তারপরে আমি আসিয়া এক দিনে সমস্ত সমাজের গঠন পরিবর্তন করিয়া দিয়া যাইব। বিপ্লব আমার জন্ম-নক্ষত্রের গতিপথ, বিপ্লব আমার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধন, বিপ্লব আমার রক্তমাংস-সেদমজ্জায় ওতপ্রোত। আমি কি বিপ্লবকে অপছন্দ করিব? কিন্তু তোমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। আমার একটা মাত্র অঙ্গুলী-হেলনে যাহারা প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইবে, আগে তোমার পাহাড়ীয়া জাতিগুলির মধ্য হইতে

তাহাদের খুঁজিয়া বাহির কর। তাহাদিগকে অন্ধকার গুহা আর নিবিড় মূলিবাঁশের ঘন জঙ্গলের ছায়া হইতে টানিয়া প্রদীপ্ত সূর্য্যাকিরণে দণ্ডায়মান কর। তাহাদের কণ্ঠে ধ্বনি উচ্চারিত হউক,—“হে গুরো, তোমার আদেশ পালনের জন্ত প্রয়োজন হইলে নিজ হৃৎপিণ্ড নিজ হাতে উৎপাটন করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইব না।” তবে ত আমি কাহ্ন আরম্ভ করিব! আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, একথা তোমরা বিশ্বাস করিতে পার। কিন্তু আমার সৈন্যদল কোথায়? বিনা সৈনিকে যুদ্ধ-পরিচালন সম্ভব নহে।

তোমরা যে কয়জন আছ আমার বিশ্বাসী কর্মী, তাহাদের প্রতিজনকে অবিলম্বে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। আমার বিপ্লব সাধনের জন্ত তোমাদিগকে হাজার হাজার সৈনিক সংগ্রহ করিতে হইবে। এমন সৈনিক, বাহারা জীবনকে, মৃত্যুকে, জয়কে, পরাজয়কে সমান বলিয়া জ্ঞান ক’রে, উপদেশ-পালনকেই জীবনের চূড়ান্ত কর্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

কেহ কেহ অথগুমতে শ্রাদ্ধ ও বিবাহ করিতেছে কেবল ব্যঙ্গ-সঙ্কোচের প্রয়োজনে। অথগুমতে শ্রাদ্ধ ও বিবাহে সত্যই ব্যয় বড় অর। বিশেষতঃ এই সকল উপাসনায় বাহারা যোগ দিবে, তাহাদের প্রত্যেককেই হাতে করিয়া কিছু না কিছু নিয়া আসিতে হয় বলিয়া একের বিরাট বোঝা দেশের হাতের নগণ্য লাঠিতে পরিণত হয়। তোমরাও শুধু সম্ভ্রায় বিবাহ-শ্রাদ্ধ হইবে বলিয়াই যদি অথগু-বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাক, তবে তাহা ভুল হইতেছে। আদর্শের টানে আমার পথে আসিবে, স্রবো-স্রবিধার লোভে নহে, ইহাই আমার কাম্য।

অথগুদীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া মাত্রই তুমি ব্রাহ্মণে হইলে,—পূর্বে তুমি জন্মস্থানে যেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া থাক না কেন। মৃতরা

মাঘ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

২০৩

তোমাদের শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণের ত্রায় একাদশাহেই হইবে। সমবেত উপাসনাবারা শ্রাদ্ধ ও বিবাহ হইলে সেই দিন কেহই কোথাও প্রানি-হত্যা করে না। ইহাই আপনা আপনি নিয়মে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই নিয়ম তোমাদেরও পালন করিতে হইবে।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬৯)

হবি-ও

পুপুনী

৭ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু .—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ঐশ্বর্যময়ী তিথিতে নগরাষ্টবাড়ীতে যে ওঙ্কার-বিগ্রহ পূজিত হইবেন, তাহাতে শুধু ওঙ্কারই থাকিবেন, ভিতরে অথ কোনও মূর্ত্তি থাকিবার প্রয়োজন নাই। যত তিথিতেই যত উপাসনা করিবে, একমাত্র অদ্বিতীয় ওঙ্কারই পূজিত হইবেন। ওঙ্কারের মধ্যে এক এক তিথিতে এক এক দেবতার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিয়া তোমরা সস্তায় পোকমনোরঞ্জন করিও না। এই জাতীয় চেষ্টা তোমাদের আদর্শ এবং পন্থাকে আস্তে আস্তে নির্মূল করিয়া দিবে। সকল মতের পূজক ও উপাসকদের প্রতি উদার ও সহিষ্ণু হও কিন্তু নিজেদের মতের ভিতরে ভিন্ন মত বা বিচিত্র মনোহারিত্ব ঢুকাইয়া অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ভাবনারূপ বিশুদ্ধ শোণিত-ধারার মধ্যে অল্প জিনিষ ইনজেকশানের

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

২০৪

দ্বারা মিশাইয়া দিও না। সর্বসম্প্রদায়ে প্রেম রাখ কিন্তু নিজের মতে
অটুট থাক। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭০)

হরি-ওঁ

পুণ্ড্রকী

৮ই পৌষ, ১৩৬৩

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাল বেলা বারোটায় তোমার রেজিষ্টার্ড পত্র, পাই। তখন আমি
মঙ্গলকুটিরের ঢালাই কাজে ব্যস্ত। প্রাতে নয়টায় কাজে লাগিয়াছি,
রাত্রি নয়টায় আশ্রমে ফিরিলাম। জরুরী হইলেও আর লেখনী লইয়া
বসিতে মন চাহিল না। এখন শেষ রাত্রে পত্রোত্তর দিতেছি।

তোমার তিনসুকিয়া সম্মেলনের ভাষণটি চমৎকার হইয়াছে।
ইহাতে আমাদের আদর্শকে স্পষ্টীকৃত করিবার একটা সুন্দর প্রয়াস
আছে। তোমরা যদি মনোযোগ দিয়া প্রত্যেকে আমার রচনাবলী ও
বচনাবলী পাঠ কর, তবে তাহা তোমাদের সকলের পক্ষে অপেক্ষ
কল্যাণের হেতু হইবে। কারণ আমার লেখনী বা রচনা হইতে
জীবনে কখনো একটা শব্দও সাহিত্যিক যশোলাভের প্রেরণায় বা
বিনা উপলক্ষ্যে বা কল্পিত ব্যক্তিগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বহির্গত হয়
নাই। তোমরা তোমাদের নিজ সংঘের সাহিত্যকে প্রতিজ্ঞা পাঠ
করিতে অভ্যাস কর।

মাস, ১৩৬৭]

ধ্বং প্রেম

প্রতিধ্বনি

২০৫

সতীশের মোনাছড়ার ভাষণ, ও অবনীর আগরতলার ভাষণও চমৎকার হইয়াছে। সংবাদে জানিয়াছি, উভয়ের ভাষণই সকলের চিত্ত জবীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু তোমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে কাজ,—কথা নহে। কাজের প্রয়োজনে তোমরা কথা কহিতেছ, এইটুকু প্রত্যেকে মনে রাখিও। কথা বলাই যেন তোমাদের কাজ না হইয়া দাঁড়ায়। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭১)

হরি-ও

পুপুনী

৯ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—,আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার বুদ্ধ পিতার রোগকষ্টের কথা অবগত হইয়া বড়ই বাধিত আছি। আমি নিয়ত আশীর্বাদ করিতেছি, তাঁহার যেন বাহিরের জালা ও ভিতরের সন্তাপ সবই ভগবানের প্রেম-কোমল স্তূথস্পর্শে নিবারিত হয়।

দুঃখবস্থায় তিনি আমাকে বারংবার দেখিতেছেন। তোমরা ইহাকে করুণা মনে করিও না। ইহা সত্য যে যিনি যেই মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া থাকুন না কেন, আমার সহিত সবার যোগ, আমার সহিত সকলের অবিচ্ছিন্ন আত্মীয়তা। তাই যেই সময়ে তোমার পিতার অন্তর্লোক আলোকে পুলকে উজ্জ্বল হইবার প্রয়োজন, সেই সময়ে আমি নিয়ত

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্য

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৯০৬

তঁাহার কাছে কাছে রহিয়াছি, তঁাহাকে সপ্রেমে বুকে আবরিয়া ধরিতেছি। তিনি যখন যাহা দেখিতেছেন, সব সত্য, সব স্বার্থ।

তবে তিনি কখন কি দেখিতেছেন, কি বুঝিতেছেন, কি বলিতেছেন, তাহা বাহিরে প্রচার করিও না। সর্বজীবের প্রাণ হইয়া আমি সকলের সাথে থাকিতে চাহি, অবতার হইয়া মন্দিরে পূজা পাইতে চাহি না। জগতে এমন সত্য ঘটনা আছে, যাহা ঔপচারিকের কল্পনাকে নিপুত করিয়া দিতে পারে। অলৌকিক দর্শন কেবলই মস্তিষ্কের বিকৃতি বা কল্প মনের ক্রিয়া নহে, ইহা মস্তিষ্কের স্থিরতা এবং সূস্থ মনেরও ফল। তবে এ সকল বিষয় বাহিরে প্রচার করিও না।

প্রাণপণে পিতৃসেবা কর। পিতৃমাতৃ সেবার তুল্য মহান্ ধর্ম জগতে আর কিছু নাই। পিতৃমাতৃপরায়ণতা হারাইয়া পত্নীপরায়ণতার আশ্রয় নিয়া পাশ্চাত্য জগৎ মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হারাইয়াছে। তোমরা তাহা হারাইও না। পিতৃসেবাতে কত প্রেম, তাহা নিকাম নিঃস্বার্থ একাগ্র সেবার মধ্য দিয়া আশ্বাদন করিতে পারিবে, অগ্রাধায় নহে।

ইতি—

আশীর্বাদ
স্বরূপানন্দ

(৬৭২)

হরি-ওঁ

পরমকল্যাণভাজিণীষু :—

গুণুনকী

১০ই পৌষ, ১৩৬৬

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।
তোমার পত্র খানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। দাম্পত্য-জীবন

মাঘ, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেমা

প্রতিধ্বনি

২০৭

সংযম পালন প্রথম সময়ে খুবই কঠিন ব্যাপার। এ জগতই তোমাদের বারংবার ভুল হইতেছিল। কিন্তু কিছুকাল জোর করিয়া সংযম পালনের ফলে অভ্যাসজ দুর্বলতা দূর হইয়া যায়। তখন দেখা যায় যে, দৈহিক ঘনিষ্ঠতা ব্যতীতও স্বামী এবং পত্নীতে গভীর ভালবাসা থাকা সম্ভব। তখন ভালবাসার বলেই সংযম স্বভাবতঃ রক্ষিত হয়, জোর করিয়া রক্ষা করার চেষ্টা করিতে হয় না।

তোমাদের সেই অবস্থাটি আসিয়াছে। আমি ইহাতে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। বিবাহিত জীবনে সংযম-পালন নিতান্তই মুখ্যতা বলিয়া বাহারা প্রচার করিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকেই আবার সন্তানের জন্মনিরোধ আন্দোলনে নানা কৃত্রিম উপায়ের প্রয়োগ সম্পর্কিত ওকালতি করিতে দেখা যাইতেছে। ইহারা কেহই জানে না যে প্রেমের শক্তি কি, প্রেমের স্বভাবই বা কি। প্রেম দুইকে এক করে, বিচ্ছিন্নকে বাধে, দুর্বলকে সবল করে, অক্ষমকে ক্ষমতা দেয়। প্রেম সামর্থ্য দেয়, প্রেম সংযম দেয়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত প্রেম থাকিলে একে অত্কে দুর্বলতার মুহূর্তে রক্ষা করিতে পারে।

তোমরা তোমাদের প্রেমের শক্তিতে আর ভগবানের নামের শক্তিতে বিশ্বাসী হও। জগতে তোমাদের অসাধ্য কাজ কিছুই থাকিবে না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭৩)

হরিওঁ

পুপুনকী

১০ই পৌষ, ১৩৪৩

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ও কল্যাণীয়া মায়ের পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। যে কয়জন দাম্পত্য জীবনে সুনির্দিষ্ট কাল সংযম পালনের সঙ্কল্প নিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছে, উপযুক্ত প্রয়াসের পরে তাহারা প্রতিজ্ঞানৈই এ সঙ্কল্প যোগ্যভাবে উদ্‌যাপনে সমর্থ হইয়াছে। আমার পুত্র-কন্যাদের সম্পর্কে এই কথা পূর্ণতঃ সত্য। তোমার আগে তোমার যে সকল ভ্রাতা এই পবিত্র ব্রত পালন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে সফলকাম হইয়াছেন। এই সকল দৃষ্টান্তের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বল-সংগ্রহ কর। দাম্পত্য সংযম অসম্ভব ব্যাপার নহে। প্রয়োজন নির্ঠা ও সাহসের

নিজ্জন্দের দাম্পত্য সংযমকে বাহিরে জাহির করিতে যাইও না। তাহাতে বাহ্যদুরীর ভাব আসিয়া যায় এবং ইহার ফলে দ্রুত পতন আসে। নতুন বিনীত নিরহঙ্কার মনে ব্রতপালন করিবে। অহঙ্কার সর্বদাই পতনের হেতু হয়। কারণ, অহংকার প্রেমকে দুর্বল করে ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

মাঘ, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

৯০৯

(৬৭৪)

হরি-ওঁ

পুপুনকী

১০ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

তোমার কার্ড পাইয়া সুখী হইলাম । লখিমপুর জিলা প্রতিনিধি-
সম্মেলনের তিনসুকিয়া অধিবেশন সম্পর্কে তোমার মন্তব্য পাঠ করিলাম ।
তুমি সত্য কথাই লিখিয়াছ । আমি কোনও মন্তব্য দিতে পারি না ।
তোমার মন্তব্য অল্ৰান্ত, ইহাই বলিতে পারি ।

ইহার প্রতীকার কি ? মণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা । তোমাদের
কয়েকজনকে সমগ্র জেলাটির সবগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে হরিওঁ-নামকীর্তন
লইয়া ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে । যাহাদের সকলে ছোট, হীন, নীচ
বলিয়া থাকে, সেই অবস্থাত নরনারীদের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে ।
তাহাদের সকলকে টানিয়া আনিয়া বক্ষে ধারণ করিতে হইবে ।
তাহাদের সামর্থ্য এবং সম্ভাবনা সমূহ যে তোমাদের অপেক্ষা কম নহে,
এই বোধ তাহাদের মধ্যে জাগাইতে হইবে । আশু চিকিৎসার জন্ত
যেই অন্তর্দর্শী ব্যবস্থাই অবলম্বন কর না কেন, স্থায়ী চিকিৎসায় ইহাই
বিহিত ব্যবস্থা জানিও ।

নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষাও যখন এক ঘণ্টা অধিক সময় ব্যাপিয়া
তোমাদের আলোচনা চলিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তখন একথা বুঝিতে
যদি কষ্ট হইবে কেন যে, তোমাদের সম্মেলনের প্রকৃত সাফল্য সম্পর্কে
তোমরা যতটা প্রত্যাশা করিয়াছিলে, তাহা পূরণ হয় নাই ? বেশী
যদি প্রয়োজন মাত্র তখনই হয়, যখন শ্রোতার কাজ করিবার জন্ত

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম

[২ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

২১০

আসেন না, আসেন ভাল ভাল কথা, উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া কর্ণে ও মনের সাহিত্য-রস-পিপাসা মিটাইতে। তোমরা ভবিষ্যতের সম্মেলন-গুলিতে আরও কম সময়ে কাজ সারিতে চেষ্টা করিবে।

অন্তরের দরদ মুখের কথায় আর stunt এ কখনো উদ্ভিষ্ট হয় না। দরদী স্বভাবটী জন্মিলে তবে দরদ জন্মে। অতি গুরুতর আলোচনা অতি সাধারণ ফল প্রসব করিলে ভাবিতে ই হইবে যে, দরদী জনের অভাব ঘটিয়াছে। এই দরদ বিনা সাধনে জাগে না। ভবিষ্যতে তোমরা কোনও সম্মেলন করিলে তাহার প্রধান আলোচ্য বিষয় রাখিবে, কি করিলে প্রত্যেকের ভিতরে নিয়ত সাধনের লিপ্সা জাগরিত হইবে। অসাধকদের মিলিত সুভাষিত ভাষণও কোলাহল বা হট্ট-চিংকারে মত লাগে। সাধকদের স্তিমিত ভাষায় স্বল্প কথনও মধুর অর্থের স্বাদ নিয়া বিমল সঙ্গীতের রূপ পায়। তোমরা সাধক হও। তাহা হইলে বহির্মুখ হৈ চৈ করিবার প্রয়োজন কমিয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৭৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।
কলিকাতায় আজ ছেলেমেয়েরা নীরব জপ-যজ্ঞ করিতেছে। এ এক অতীব চমৎকার ব্যাপার। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই ছেলেমেয়েরা জপ বসিয়া গিয়াছে। যে যতক্ষণ বসিতে পারিতেছে, অপিয়াই যাইতেছে—

মাস, ১৩৬৭]

বৃত্তং শ্রেয়া

প্রতিধ্বনি

২১১

সহ নাই, কোলাহল নাই। যাহার যখন উঠিবার সময় হইতেছে, নীরবে উঠিয়া যাইতেছে, কাহারও বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন সৃষ্টি করিতেছে না। যে বসিতেছে, দুই-এক ঘণ্টা একাধারে বসিয়া নাম জপ করিবেই, এই সহস্র নিয়াই বসিতেছে। চমৎকার এক আবহাওয়া, দিব্য এক প্রশান্তি সৃষ্টি হইয়াছে। জন্মোৎসব-সপ্তাহের একটা দিনকে ইহারা এই ভাবে অস্বাভাবিক করিয়া রাখিল। এই দৃষ্টান্ত সর্বত্র অনুসৃত হওয়া উচিত।

সন্ধ্যার পরে এই জপযজ্ঞের উদ্ঘাপন হইবে জপ-সমর্পণ মন্ত্রের দ্বারা। থোয়াই হইতে শ্রীমান দেবেশ প্রসাদ কলিকাতা অঞ্চল মণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাইয়া পত্র দিয়াছে যে, এই অভিনব ব্যবস্থার দ্বারা এক অত্যাশ্চর্য্য শুচিতার সৃষ্টি করা হইল। আমি দেবেশের কথার সহিত একমত।

বারাণসীতে জন্মোৎসব বিনা আড়ম্বরে করিতেছ জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। উৎসবের আসল লক্ষ্য চিত্তের প্রশান্তি ও বিমল আত্ম-প্রসাদ। সেই আত্মপ্রসাদ তোমাদের যেন সাত্ত্বিক হয়।

আমি ত তোমাকে নিষেধই করিয়াছিলাম যে, নীরবে অনাড়ম্বর ভাবে কাজ সার, কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে নামিও না। আপনা আপনি যাহারা আসিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের উপস্থিতি কি কিছু কম গৌরবের? তাঁহাদের প্রীতিপূর্ণ সহযোগ কি কিছু কম আদরের? যমুকে আসিবে, তমুকে আসিবে বলিয়া প্রত্যাশা কেন করিতে যাও? প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়া চলার মত সুখ কি জগতে আছে? আমি গুরু বলিয়াই কি দাবী করিয়া বসিব যে, শিষ্যেরা আমার জন্মোৎসব করুক, আমার জন্মদিনের উপাসনায় আসুক? শিষ্যদের কাছে কেন আমার প্রত্যাশা থাকিবে? লোকের নিকটে তোমাদের গুরুভাই বলিয়া পরিচয় প্রদানকারীরা যদি জন্মদিনের উপাসনায় যোগ দিতে না আসিয়া

থাকেন, তবে বুঝিও, সেই দিন তাঁহাদের আসিবার কোনও বিশেষ প্রতিবন্ধক ছিল। তবে এবার যেমন জন্মদিনের উপাসনায় কাহাকেও নিমন্ত্রণ দাও নাই, আগামী বৎসর সমূহেও তাহাই করিবে। এবার আমি পুপুন্যী আশ্রমেও নিতাইকে জন্মদিনের উপাসনায় নিমন্ত্রণ প্রেরণে নিষেধ করিয়াছি। যাঁহারা তবু আসিয়াছেন, ভাল করিয়াছেন। বাহরা আসেন নাই, তাঁহারাও মন্দ কাজ করিয়াছেন বলিয়া মনে করি না। গুরুর জন্মদিনে গুরুভাইদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াই গুরুধামে আনিতে হইবে, এই হীনতা পরিত্যাগ কর।

জন্মোৎসব উপলক্ষে অনেক স্থানেই প্রচুর ব্যয় হইয়া থাকে। আশ্রমের উৎসব তুমি চিরকালই আশ্রমের ব্যয়ে করিয়া আসিতে, তোমার ভাতা-ভগিনীদের কাছে কখনও হাত পাত নাই। তোমাদের এই সুন্দর প্রথাটি যেন চিরকাল বজায় থাকে। কিন্তু নানাহানের জন্মোৎসবে তাহা সম্ভব নহে। মণ্ডলীগুলি নিজ নিজ প্রভাবান্বিত স্থানের গুরুভাই-গুরুভগিনীদের কাছ হইতে টাকা তোলে। অনেক স্থানে প্রচুর টাকা ওঠে এবং প্রচুর ব্যয় হয়। ইহার সবটাই সদ্ব্যবহারে না, প্রদান করিবার সময় আসিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, সংগৃহীত অর্থের কতক পরিমাণ সমাজের স্থায়ী কল্যাণে ব্যয়িত হওয়া কর্তব্য। কেহ কেহ জানাইতেছেন যে, এই কথা বলিয়া কার্যে নামিবার পরে অধিকাংশের হাত ছোট হইয়া যাইতেছে। ছেলেমেয়েদের কেহ কেহ স্থির করিয়াছিল যে, এবারকার জন্মোৎসবের ব্যয়-হ্রাস করিয়া বাকী টাকা তাহারা মঙ্গলবাঁধ মেরামতের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজে অবিলম্বে পাঠাইবে। খ—মণ্ডলীর সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, গুরু প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে দাতাদের দানের উৎসাহ কমিয়া গেল। ফলে, উৎসবের ব্যয়-হ্রাস করিবার পরেও মঙ্গলবাঁধের মঙ্গলকার্যে কিছু

ষাঢ়, ১৩৬৭]

মূর্চ্ছনা

প্রতিদ্বন্দ্বি

৯১৩

পাঠাইবার মত থাকিবে কি না, সংশয় জন্মিয়াছে। অপর দিকে ভিক্রগড় হইতে একজন প্রধান কর্ম্মী জানাইয়াছেন যে, বায় সঙ্কোচ করা হইবে বলিয়া একটা প্রাণীও হস্ত-সঙ্কোচে সম্মত নহেন, বরঞ্চ কোনও কোনও ক্ষেত্রে দানের পরিমাণ-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে, আমার পুত্রকন্যাদের মতিগতি কোথাও কোথাও কেমন রূপান্তর পাইতেছে। পরিণামে সদবুদ্ধিরই জয় হইবে, ইহা নিশ্চিত। সাময়িক কোনও অসুবিধা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। যদ্যপিও সর্বত্র যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, প্রতি বৎসর তাহার শতকরা পঁচিশ ভাগ বাঁচাইয়া স্থায়ী সংকল্পে নিয়োগের চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। সেই কচিটুকু আসিবে ছেলেমেয়েদের মন হইতে হুজুগের ভাবটা কমিয়া গেলে। হুজুগ চিন্তার স্বচ্ছতাও দূরগামিতাকে আবিষ্ট করিয়া রাখে। হুজুগ চিন্তাকে শ্লথগামিনী ও মদালসা করে। হুজুগ বাদ দিলে উৎসব হয় না, আবার হুজুগ বাড়িলে উৎসবের স্থায়ী ফল কিছুই থাকে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

মূর্চ্ছনা

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব]

(২৩)

মনের কথাটি ঘুরে যায় আশে পাশে

সরল সহজ কবিত্বহীন ভাষে,

তারে ধরি' আমি শুনাই তোদেরে
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ॥

মনে যাহা জাগে সকলের আগে
উষার ললাটে সিঁদুরের রাগে,
চকিতে ছড়ায় দশ-দিগ্-ভাগে

অনন্ত মহাকাশে,
দিতে চায় কোটি প্রাণে স্বাক্ষর
অদম্য অভিলাষে
নিজেরে ধরিতে সবার স্মৃথে,
বাঁধিতে প্রেমের পাশে ॥

আমার চিত্ত বিশ্বের মধু দিয়া
নিঃশ্বের শত দুঃখরাশিরে
নিতে চায় আবরিয়া,

হৃদয়-রক্ত পরমবস্ত্রে
দিতে নিঙারিয়া;
মনের কথাটা কমল-কাননে হাসে,
মনের কথাটা সাগর-সলিলে ভাসে
পূর্ণিমা-অমা জানিয়া সমান
বিমুক্ত উচ্ছ্বাসে ॥

(২৪)

শূদ্রে তোরা যতই করিলি স্বপ্না,
ততই সাধের জননী তোদের
জগতে হইল দীনা,

মাঘ, ১৩৬৭]

মৃচ্ছনা

প্রতিধ্বনি

৯১৫

তন্তই হইল সম্পদহীনা,

যুগে যুগে পরাধীনা ॥

শূদ্রে তোরা জানিলি ক্ষুদ্র ব'লে
 চরকাল হায় রাখিলি চরণে দ'লে,
 ব্রহ্ম-বিদ্যা-অধিকার হ'তে বঞ্চিলি কত ছলে
 আজি তারি ফলে আপনার ব'লে
 কেহ নাহি দেয় চিনা,
 গতিহীন জয়-রথের চক্র,
 ছিন্ন হৃদয়-বীণা ॥

ছোটরে সাদরে বক্ষে তুলিয়া নে রে,
 চোখের পলকে শক্তি যাবে রে বেড়ে,
 বিরুদ্ধ যত অপদেবতারি নিমেষে যাইবে হেরে
 ভারত-জননী মহিমা-শালিনী
 হবে রে সেদিন জগৎ-পালিনী
 মহাগৌরব-সিংহাসনে সে
 হইবে রে সমাসীনা ॥

(২৫)

বিষ-বিপদ! কি তোমার বাহাদুরী?
 নিমেষে তোমারে দিব উড়াইয়া
 বাম হাতে দিয়া তিন তুড়ী ॥

গগনের ষত ঘন-ঘটা সব
একটা নিমেষে হইবে নীরব,
শত সূর্য্যের লইয়া বিভব
উঠিবে অভয় প্রসূরি ॥

ভয়ে ভীত আমি হইব না,
পরাজয় বরি' লইব না;
সিদ্ধ সাধনা দিব্য চেষ্টনা
করিয়াছে মোর মন চুরি ॥

(২৬)

কৃতান্তে আমি করিব না ভয়,
এই করি আজি পণ।
মৃত্যুর সাথে দিব আমি মহারণ ॥

সবাই যাহারে বাসে শুধু ভয়,
সংগ্রামে তারে করিব যে জয়,
শুধু প্রেমবলে শক্তি তাহার
করিব অপহরণ,
বুকভরা স্নেহে টানি' হৃদি-গেহে
করিব চির-আপন ॥

মৃত্যু নহে ত' ধ্বংসই শুধু,
জীবনের সে যে দূত!
হলাহলে ঘেরা অমৃতের মধু,
ভাবিতে কি অদভুত!
বাহিরের আঁখি-নিমীলন, সে ত'
ভিতরে উন্মীলন!

মাঘ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

১১৭

বিশ্ববাণী

বিগত ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭, ২৬শে নবেম্বর, ১৯৬০ শনিবার
 রাতদহ সহরে টাউন হলে প্রায় ছয় হাজার জনতার এক বিরাট
 সমাবেশে বিকাল সাড়ে চারি ঘটিকায় অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী
 স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব পোনে দুই ঘণ্টাব্যাপী একটা ভাষণ দেন।
 তিনি বলেন,—ধর্মের নামে জগতে যথেষ্ট অনাচার, অত্যাচার, অবিচার
 ঘটিয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু ইহার দরুণ ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কমিতে
 পারে না। প্রকৃত ধর্ম জগতের অশেষ কুশল বিধান করিতেছে বলিয়াই
 ওহার এত সম্মান, এত আদর। ধর্মের এই আদর দেখিয়াই সন্তায়
 ইহা পাইবার জন্ত ধর্মের নামে অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আসল
 কাছে বলিয়াই নকল থাকে। নকলের প্রাচুর্য দুঃখজনক কিন্তু ইহাতে
 আসলের মহিমা, যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায় না। বরঞ্চ
 নকল-ধর্ম জগতে অশেষ অশান্তি হইতেছে বলিয়া আসল ধর্মের
 আবশ্যপ্রকাশ আরও অধিক প্রয়োজনীয় এবং জরুরী। আসল ধর্ম
 কাহাকে বলিব? ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ কি? বাহা সর্বাঙ্গিঙ্গনকারী,
 তাহাই সদ্ধর্ম। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদেষ সৃজন করিয়া নহে,
 সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে প্রেম ও সৌহৃদ্য বাড়াইয়া বাহা আত্মবিস্তার করে,
 তাহাই সদ্ধর্ম। বাহা নিজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রতিটি প্রাণে বিস্তারের
 শাকজ্ঞা ও মিলনের তৃপ্তি সৃষ্টি করে, তাহাই সদ্ধর্ম। জীবে জীবে
 প্রেম ও মৈত্রী সৃষ্টি করিয়া বাহা প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি মানুষের পক্ষে
 প্রয়োজনীয় সামগ্রী করিয়া তোলে, তাহা সদ্ধর্ম। বাহা বিপন্নের বিপদকে,
 আপন্নের আপদকে, দুঃখার্জের দুঃখকে, উৎপীড়িতের উৎপীড়নকে

নিজের মহিমায় প্রশমিত করিয়া দেয় এবং একজনের অসহনীয় ক্রোশকে হাজার জনের মধ্যে পরম সহানুভূতিবশে বণ্টন করিয়া দিয়া সহনীয় করিয়া দেয়, তাহাই ধর্ম। সত্যদর্শন হইতে এই ধর্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সত্যানুভূতি হইতে হইয়া থাকে ইহার সৃষ্টি।

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী তাঁহার দেড় ঘণ্টাব্যাপী ভাষণে বলেন,—চারিদিকে আমাদিগকে নিহত করিবার যড়যন্ত্রজাল বিস্তারিত হইতেছে ইহা আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমাদের ভীত হইলে চলিবে না। আমরা ধর্মের বলে অন্তরে বিপুল সাহস সঞ্চয় করিব, ধর্মের বলে অবহেলে বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হইব।—এই প্রত্যয় প্রতিটি পুরুষ ও রমণীর মধ্যে আজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অনেকবার এই জাতি অকথনীয় বিপদে পড়িয়াছে, যোগ্যতার বলে উদ্ধারও পাইয়াছে। এবারও আমাদিগকে যোগ্যতা সঞ্চয় করিতে হইবে। কাপুরুষের কোথাও শাস্তি নাই, ভীক ও দুর্বলের কোথাও কল্যাণ নাই। আমাদিগকে কাপুরুষতা পরিহার করিতে হইবে, বীণা অর্জন করিতে হইবে। বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রতিজনকে শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে। আচার্য্য বরিষ্ঠ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া সেই বীণ্যের বাণী ঘরে ঘরে বিলাইয়া যাইতেছেন। তাঁহার সেই উপদেশকে আমাদের জীবনের কর্মে রূপবস্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

১১ই অগ্রহায়ণ রবিবার সভাস্থলে জনতা প্রায় আট হাজার হয়। মহারে এমন কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না, যাহারা বক্তৃতা শুনিতে আসেন নাই। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব তাঁহার দেড় ঘণ্টা ব্যাপী ভাষণে বলেন,—আর্য্য একটা জাতি নহে, ইহা সভ্যতার একটা নির্দিষ্ট উৎকর্ষের পরিচায়ক উন্নতির মানদণ্ড-স্বরূপ। যাহারা এই

মাঘ, ১৩৬৭]

বিশ্ববাণী

প্রতিধ্বনি

৯১৯

উন্নতিকে আয়ত্ত করিতেন, পূর্বতন আর্ধ্যদের দ্বারা তাঁহারা আর্ধ্য-
 রূপে স্বীকৃত হইতেন। বেদের স্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে,—“কৃণত্ব
 বিশ্বমর্ষম্,—সকলকে আর্ধ্যো পরিণত করা।” প্রাচীন আর্ধ্য জাতি
 সেই উপদেশকে পালন করিতে গিয়াই শত শত আর্ধ্যোত্তর জাতির
 গুণবান পুরুষ ও গুণবতী নারীদিগকে গুণানুসারে দলে দলে ব্রাহ্মণত্ব,
 ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব প্রদান করিয়াছিলেন এবং বাহারা এই তিনটি পর্যায়ের
 একটাতেও পড়েন না, তাহাদিগকে apprentice বা শিক্ষানবীশ
 রূপে গ্রহণ করিয়া শূদ্র নাম দিয়াছিলেন। যোগ্যতা অর্জনের দ্বারা
 এই শূদ্র বৈশ্য, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইতে
 পারিত। কেহ কেহ শূদ্রত্ব হইতে সোজাসুজিও ব্রাহ্মণত্বে উপনীত
 হইয়াছেন। ব্রাহ্মণও একটা জাতি নহে, একটা গুণবাচক উপাধি
 মাত্র। বাহার ব্রহ্মদর্শন ঘটিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ। উৎপত্তি, যে ব্রহ্মদর্শনের
 মাধ্যমে সকল ভোগ-সুখে বিসম্বন্ধ দিয়া সদাচার, মিতাচার, হিতাচার
 অবলম্বন করিয়াছে, সেও ব্রাহ্মণ। ততোধিক উৎপত্তি, যে ব্রাহ্মণগণের
 সংসর্গে কাল কাটাইতেছে, ব্রাহ্মণগণের চিন্তা, অনুশীলন ও তপস্তার
 সহিত প্রত্যক্ষভাবে ও স্পষ্টরূপে যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, সেও
 ব্রাহ্মণ। ফলতঃ যেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ওরসে জন্মিয়া স্বভাবতঃই ব্রাহ্মণ্য
 ত্যাগ-তপস্তার সহিত অনায়াসে পরিচিত হইতেছে, সেও ব্রাহ্মণ। এই
 ব্রাহ্মণ ছিলেন জগৎকল্যাণের প্রতীক, আত্মকল্যাণে একান্ত উদাসীন
 পরকল্যাণাজীব মহাপুরুষ। তাই ব্রাহ্মণ জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন।
 আজও তোমাদের ব্রাহ্মণ হইবার অধিকার আছে, আজও তোমরা
 জগৎপূজ্য হইতে পার। চাই কেবল সেই ত্যাগের অনুশীলন, বাহার
 কল বিশ্বজাতির কুশল।

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী তাঁহার দুই ঘণ্টাব্যাপী ভাষণে বলেন,—

প্রতিধ্বনি

কণিকা

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৯২০

প্রাচীন ভারতের ঋষি মুক্তার হাত হইতে অমৃতকুন্ত কাড়িয়া আনিয়া ছিলেন। সেই অমৃত ধর্মের অমৃত। সেই অমৃত মুক্তাকে হরণ করে, কল্যাণকে বরণ করে। সেই অমৃত সংসারের প্রতিটি জীবের ভিতরে শান্তি, স্বস্তি, আনন্দ প্রতিষ্ঠিত করে। কেবল নিজেকে লইয়াই নহে, বিশ্বের সকলকে লইয়া মানুষ্যের কর্তব্যের ব্যাপকতা, এই বোধকে জাগ্রত করিয়া এই অমৃত সর্বজনের শুভকল্লে আত্মাহুতি দিবার জন্য প্রতিজনকে উদ্বুদ্ধ করে। আজ ত্যাগই আমাদের জীবনের ভিত্তি গঠন করুক, ব্রহ্মচর্যা হউক আমাদের জীবন গঠনের প্রধান মালমশালা।

কণিকা

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

কণিকা, কণিকা নহে,

ইহা এক গুণ সঙ্কলন,

গুরুমুখশ্রুত বাণী

করিয়াছি ইহাতে গ্রন্থন।

—সংহিতা দেবী

(১)

শাস্ত্র প্রেমের লাগি

বিশ্বের সবার আকিঞ্চন,

ত্যাগ নাই, তাই আশা

কাহারও হয় না পূরণ।

মাস, ১৩৬৭]

কণিকা

প্রতিধ্বনি

৯২১

নিজেরে করিয়া দান

বিশ্বেরে তুলিয়া লও বৃকে,

আত্মদানে সত্য প্রেম

জাগিয়া উঠিবে মহামুখে।

প্রেম ধন, প্রেম পুণ্য,

প্রেম হয় তপস্যা সুন্দর,

প্রেমের পীষ্ম পানে

লভ প্রাণ সত্য অনন্তর।

(২)

হৃদয় হইতে হতাশারে কর দূর,

নিরাশারে কর সুদূরে নির্বাসন,

সাফল্য তব হইবে সুপ্রচুর—

এ আশারে দাও প্রাণের সিংহাসন।

ঝঙ্কা গরজে তুলি' সংশয়-ধূলি,

অহিকুল করে পদতলে দংশন,—

এরা যে মিথ্যা, সে কথা যেয়ো না ভুলি,

অগ্রমংগনে দৃঢ় কর তব মন।

দুর্বল শুধু নিজেরে হত্যা করে

হতাশার সাথে বাঁধিয়া প্রণয়-ডোর;

সবল কি কভু মরণ-গভরে পড়ে—

বৃকে যার আশা, প্রাণে ভরসার জোর?

আশার উৎস জাগে বিশ্বাস হ'তে,

বিশ্বাস কভু ছাড়িও না কোনোমতে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শুভ জন্মোৎসব :—শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের নয়দিন-
ব্যাপী শুভ জন্মোৎসব বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, পূর্ব-
বঙ্গ এবং অন্যান্য বহুস্থানে সংশ্রুত সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়া
গেল। এই উপলক্ষে সর্বস্থানেই সমবেত উপাসনায় বিপুল জন-
সমাবেশ হইয়াছিল এবং জনসভাগুলিতে দেশবরেণ্য ব্যক্তির পোষো-
হিত্য করিয়া এবং ভাষণ দিয়া অনুষ্ঠানের মর্যাদা-বর্দ্ধন করিয়াছেন।
কোথাও কোথাও স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত-সম্মেলনের অসামান্য সাফল্য
হইয়াছিল। কোনও কোনও স্থানে সাত দিনই নগর-সদ্বীর্ভন
হইয়াছিল। কলিকাতার জনসভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন,
কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিনয়ক নাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিধ্বনি-সম্পাদিকাকে সেই সভায় উদ্বোধনীয় ভাষণ
দিতে হইয়াছিল। দ্বিশতাধিক স্থানে জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত
হইয়াছে এবং ইহার মাধ্যমে স্বরূপানন্দ-জীবন-দর্শন প্রচারিত হইয়াছে।

কলিকাতা কয়েক বৎসর যাবৎ একটা অতি চমৎকার অনুষ্ঠান
হইতেছে। এবারও তাহা বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে।
রবিবার দিন উদয়াস্ত নাম-জপযজ্ঞ চলিয়াছে। আশ্রমে কোথাও
কাহাকেও কথা কহিতে দেওয়া হয় নাই। যাহারা জপে বসিয়াছেন,
কেহই এক ঘণ্টার কম জপ করেন নাই, কেহ কেহ পূর্ণ বারো ঘণ্টাকাল
জপ করিয়া তবে যজ্ঞের সমাপ্তি করিয়াছেন। সারাদিনই আশ্রমের
প্রতিটি কক্ষ জাপক পুরুষ ও নারীর মৌনগভীর গান্ধীর্থ্যে পূর্ণ ছিল।
এই দৃশ্য সত্যই স্বর্গীয়।

মাঘ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৯২৩

লামডিংএ এবার একটা অভিনব অনুষ্ঠান হইয়াছে। বুধবার দিন তাঁহারা উদয়াস্ত অথও-সংহিতা পাঠ করিয়াছেন। এমন একটা সুন্দর অনুষ্ঠান এইবারই সম্ভবতঃ প্রথম হইল।

কুমিল্লা প্রভৃতি কয়েকটা স্থানে সমবেত ভক্তবৃন্দ নানাভাবে নানা অলৌকিক ঐশী শক্তির বিকাশ দেখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীবাবামণি এই সকল ঘটনা প্রচার করিতে সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

খড়াপুরের অনুষ্ঠানে উড়িষ্যার লক্ষপ্লাথ হইতে বহু ভ্রাতা-ভগিনী বোগদান করিয়াছিলেন। তদপেক্ষাও আনন্দের বিষয় এই যে, তারাপুর, মুখবণ্ডা, নারায়ণপুর,—উড়িষ্যার এই তিনটা মণ্ডলী আলাদা আলাদা ভাবে উৎসব করিলেও পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ সহযোগ দিয়াছেন।

ত্রিপুরা, কাছাড়, আসাম ও উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই উৎসব যতিশয় সাফল্যের সহিত উদ্ঘাপিত হইয়াছে। সুদূর দেৱাদুনেও এইবার যথাযোগ্যভাবে অনুষ্ঠান হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে এইবার পুপুনকী অঞ্চলের কথাও উল্লেখ করিতে হয়। মঙ্গলবার পুপুনকী আশ্রমে, বুধবার কামনাগড়া, (পুপুনকী গ্রাম নিয়া) বৃহস্পতিবার কালাপাথর, শুক্রবার আলকুশা, (আলকুশা, গোপালপুর, বাসা, বান্ধডি প্রভৃতি নিয়া), শনিবার ধানডাবর কেন্দ্রে, রবিবার জামগড়িয়া মন্দিরে, সোমবার চাশ, মঙ্গলবার কুমড়ী (কুমড়ি, লুটুটাড়, কবড়া প্রভৃতি নিয়া) কেন্দ্রে অনুষ্ঠান ও আদর্শ-প্রচার হয়। হরি-ও কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ প্রচুর ভাবে হয়। ধানবাদ জিলার পল্লীগ্রামে এভাবে অনুষ্ঠান ইতঃপূর্বে আর হয় নাই।

জন্মোৎসবগুলি আমাদের আদর্শ-প্রচার-কার্যের প্রারম্ভ মাত্র, শেষ নহে, এই কথা সকলকে আমাদের মনে রাখিতে হইবে। শ্রীশ্রীবাবামণি

তাঁহার শুভজন্মদিনের অনুষ্ঠানকে চিরকালই অনাড়ম্বর রাখিবার জন্য আমাদের বলিয়াছেন। তথাপি ভক্তজনের একান্ত আগ্রহে প্রায় সর্বত্রই যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং প্রচুর অর্থব্যয়ও অকাতরে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতে পারি, বর্ধমানের বুদ্ধদে এবং আসানসোলে আর পশ্চিম দিনাজপুরের পতিরাম আদি স্থানে এবার নূতন জন্মোৎসব হইল। 'সিংভূমের জামশেদপুরে এই অনুষ্ঠান বহু বৎসর ধাব্য হইতেছে। সর্বত্রই সমারোহ অসাধারণ ও ব্যয় অচেন হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দেশ মনে রাখিয়া আমাদের এই উপলক্ষে ধীরে ধীরে সমাজের স্থায়ী মঙ্গল-মূলক কাজের প্রতি অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

কোনও কোনও স্থানে এবার শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-জীবনী নাট্যকার গ্রহণ করিয়া অভিনয়ের মাধ্যমে আদর্শ-প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল। বিস্তারিত সংবাদ পাইবার পরে আমরা সেই বিষয়ে বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিব। নাট্যকাহিনীর একেটা রচনা আমরা দেখিয়াছি। বড়ই সুখের বিষয় যে শ্রীশ্রীবাবামণি নিজেকে অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া পূজিত বা প্রচারিত হইতে চাহেন না। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নাট্যকাররা নাটক রচনা করিয়াছেন। “সকল মানুষই মহৎ হইতে পারে, উন্নতির দ্বার সকলের জন্য খোলা, কেবল চেষ্টা করিয়া অগ্রসর হইবার প্রয়োজন”—এই স্বরূপানন্দ-বলীকেই রূপ দিবার চেষ্টা মতাই সাধু প্রয়াস।

এই প্রসঙ্গে একটা অযৌক্তিক গোঁড়ামির বিষয়ও উল্লেখ করিতে হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—“সমবেত উপাসনার স্থানে আমার প্রতিচিত্র পূজার আসনে বসাইবে না।” কিন্তু তাঁহার জন্মোৎসব হইতেছে, তাঁহার একখানা প্রতিচিত্রও উৎসব-মণ্ডপের কোনও স্থানে রাখা যাইবে না, এইরূপ জিদ উৎসব-কর্মকর্তাদের অযৌক্তিক জিদ এবং

মাঘ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

২২৫

বুদ্ধিহীন গোড়ামি ব্যতীত আর কিছুই নহে। উত্তরবঙ্গের কোনও একটি জংশন-সহরের কয়েক বৎসর পূর্বে এই জাতীয় একটি হতবুদ্ধিকর ব্যাপার নিয়া মর্শ্ববেদনার কারণ ঘটয়াছিল। এবার আমরা স্বচক্ষে দৃষ্ট উৎসব মণ্ডপের কোনও স্থানেই শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিচিত্র নাই দেখিয়া অবাক হইয়াছি। আবার পশ্চিমবঙ্গের এক জেলা সহরে এবার ভ্রাতারা উৎসব-মণ্ডপের মধ্যে কোনও একটি অনাদৃত কোণেও শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিচিত্র রাখিতে দেন নাই; বাঁহারা রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁহারা মর্শ্বপীড়িত হইয়া গৃহে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন। বাঁহার জন্মোৎসব, তাঁহার প্রতিচিত্র কেন যে উৎসব মণ্ডপে থাকিবে না? ইহার যুক্তি আমাদের বোধগম্য হইল না।

বিহারের রাজধানীর নিকটবর্তী দুই একস্থানে একটি চির-প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটাতো কিছু মনোভঙ্গ ঘটয়াছে। সমবেত উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্যরূপে পক্কান-প্রসাদ সজ্জিত করা সর্বত্রই আমাদের প্রথার বহির্ভূত। কিন্তু এই প্রথাবহির্ভূত কাজটাই করা হইয়াছে। এই সকল অজ্ঞানতা-জনিত ত্রুটি জন্মোৎসবের মত অনুষ্ঠানে না হওয়াই উচিত।

এই নিবন্ধ লিখিবার কালে সকল স্থানের অনুষ্ঠানের বিবরণ আমাদের হস্তগত হই নাই। প্রতি বৎসরই বিবরণ পাঠাইতে প্রায় সকল স্থানের ভ্রাতারাই অত্যধিক দেরী করেন। এবারও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ফলে আমরা সকল স্থানের অনুষ্ঠানের পূর্ণ ছবিটি পাঠকদের সমক্ষে ধরিতে পারিলাম না। তবে একথা সত্য যে, এবারকার জন্মোৎসব ও তাহার লোক-প্রভাব অশ্রাব্য বারের উৎসবের অপেক্ষা প্রায় সর্বত্রই

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[২ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৯১৬

অধিকতর ব্যাপক ও গভীর হইয়াছে। এই জনপ্রভায়ে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া সর্বত্র ঘরে ঘরে অখণ্ড-সংহিতা পাঠের কার্যক্রম নিয়া আমাদের কৰ্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

অসমিয়া ভাষার অখণ্ড-সংহিতা প্রকাশের সম্ভাব্যতা;—গোহাটীতে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীধনীরাম দাস বহু অসমি়া সজ্জনকে “প্রতিধ্বনি”তে প্রকাশিত অখণ্ড-বাণী সমূহ পাঠ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে অনেক শিক্ষিত অসমিয়া সজ্জনের মত সম্পূর্ণ অখণ্ড-সংহিতা পাঠের আগ্রহ জন্মিয়াছে। সহরের এই এক স্থানে অখণ্ড-সংহিতার অসমিয়া অনুবাদ করিয়া তাহা অসমিয়া-পরিষদ নগরাংশে সমবেত উপাসনার পূর্বে পাঠ করিবার ফলে উপাসনার সমাগত জনগণের ভিতরে বিশেষ সুফল লক্ষ্য করা গিয়াছে। ব্রাহ্ম শ্রীধনীরাম দাস অখণ্ড-সংহিতার অসমিয়া অনুবাদ প্রকাশে প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতেছেন। নিশ্চয়ই এই সকল সংবাদ জাতিতে জাতিতে শান্তিকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চারিত করিবে।

কলিকাতায় দীক্ষা :—আগামী ২২শে জানুয়ারী, ১৯১৬ খ্রিঃ, রবিবার প্রাতে আটটায় সমবেত উপাসনার পরে ১২২।১বি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোডে (আপার সারকুলার রোড) মণিকতলা, ছায়া বিল্ডিং-এর ত্রিতলে ব্যাকুল দীক্ষার্থীদিগকে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীধর্মী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব দীক্ষা দিবেন। দূরবর্তী স্থান হইতে বাহ্যিক আসিবেন, তাঁহারা কলিকাতা বা তদুপকর্ষে নিজ নিজ আত্মীয় গৃহে স্থিতির ব্যবস্থা করিবেন। কারণ, ছায়া বিল্ডিং-এ স্থানের অত্যন্ত অসঙ্কুলান এবং বাড়ীওয়ালার জলসরবরাহের ব্যবস্থার প্রতিবিগত কয়েক মাস ধরিয়া কোনও নজর না দেওয়াতে

মাদ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

২২৭

আশ্রমবাসী এবং অগ্রাগ্র ভাড়াটিয়া সকলেরই নিদারুণ জলকষ্ট চলিতেছে।

বালুরঘাট ও পতিরাম :—বালুরঘাট পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা-মদর, পতিরাম তাহার আট নয় মাইল দূরবর্তী একটি সাধারণ গ্রাম। খ্রীষ্টাব্দে স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ-কালে এই দুইটি স্থানে কতকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটিয়াছে।

পতিরামের মত ক্ষুদ্র স্থানে জনসভায় পাঁচ ছয় হাজার জনতার সমাবেশ কখনও কল্পনা করা যায় না। কিন্তু তাহাই এখানে ঘটয়াছিল। বালুরঘাটের ভ্রাতা শ্রীমতেন্দ্র নারায়ণ পণ্ডিত পতিরামকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকের গ্রামগুলিতে দশটি দিন অক্লান্ত শ্রম করিয়া দুই বেলা সমানে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া গিয়াছেন। ইহারই যথাবিক সফলতা পতিরামের যাবতীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দিকে দিকে নানা স্থানে আমাদের শত শত যোগ্য ভ্রাতা আছেন, যাঁহারা সপ্তাহের কতক সময় অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া গুনাইবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলে দেখিতে না দেখিতে বিরাট ধর্ম-বিপ্লব ঘটাইতে পারেন। পতিরাম তাহার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত-রূপ হইয়া রহিল।

বালুরঘাট সম্পর্কে আর কি বলিব, এমন নিখুঁত সংগঠন আমরা ইহার পূর্বে অত্র কোনও স্থানে দেখি নাই। কি ভাবে তাঁহারা কি করিয়াছেন, তাহার বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করিতে চাহি না। যোগ্য ভ্রাতারা প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে একজন করিয়া “মজীব” প্রতিনিধি যদি অখণ্ডমণ্ডলেখরের পরবর্তী বালুরঘাট ভ্রমণের কালে দুই চারিদিন আগে প্রেরণ করেন, তবে বিশেষ উপকৃত হইবেন। ইহাতে তাঁহাদের আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধা বাড়িবে।

ভাষার প্রশ্নে :—ভারতীয়গণের ভাষাগত শিক্ষা সম্পর্কে নানা আচার্য্য বিনোবা বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয়ের পক্ষে ভারতের চৌদ্দটি জাতীয় ভাষা শিক্ষা করা উচিত। তিনি বেই কথ্যটি বলিয়াছেন, তাহা সাধু। প্রত্যেক ভারতীয়ের স্বদেশীয় বিভিন্ন ভাষায় অধিকার থাকা দুইটি কারণেই বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ স্বকীয় যোগ্যতা বর্দ্ধন, দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যস্থায়ী সম্প্রীতির ভিত্তি স্থাপন। কিন্তু বর্তমান দুর্যোগময় সংগ্রামের মধ্যে ভারতের চৌদ্দটি ভাষা শিক্ষা করা বাস্তবে সম্ভব নহে। বহুভাষাবিদ হরিনাথ দে ছত্রিশটি ভাষা জানিতেন। ইহার জন্ত তঁাহাকে ভাষার সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে হইয়াছিল। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্ভব নহে এবং প্রয়োজনও নহে। নিজ মাতৃভাষার অতিরিক্ত ভারতের চারিটি প্রান্তের চারিটি ভাষা শিখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। অপর প্রদেশবাসীরা কি করিতে জানি না। কিন্তু বাঙ্গালীর এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ অবহেলা আছে। অপর প্রদেশবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালীর জীবন সংগ্রাম-জটিলতর, ইহা এক কারণ হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর মত জাতি নাই, বাঙ্গালী মত ভাষা নাই—এই জাতীয় অভিমানও ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। জীবন-সংগ্রাম এবং মনোবৈকল্যকে উপেক্ষা করিয়া এই বিষয়ে তাহাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে সংস্কৃতকে অবশ্য পাঠ্য করা উচিত। আচার্য্য বিনোবা এই কথা বলিলে সমস্তর সমাধান আরও সহজ হইত। সংস্কৃত ভাষা হইতে যতকাল আমরা দূরে থাকিব, ততকাল ভারতে সত্য সত্য আত্মিক ঐক্য স্থাপিত হওয়া সুদূরপর্যায়ত।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত :—নেপালের রাজধানী কাটমণ্ডুতে রাজা মন্দের

মাস, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৩২২

করান। মন্ত্রী সভাকে যখন বরখাস্ত করিয়া মন্ত্রীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া
 সুবিধান ও সংসদ বাতিল করিয়া দিলেন, সেই সময়ে সেখানকার
 ভারতীয় রাষ্ট্রদূত যুগয়া করিতে এবং তৎসম্পর্কিত অগ্রাগ্র আংশকীয়
 কার্য বাস্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি বন্ধু-রাষ্ট্রে এত বড় একটা
 পরিবর্তনের সমসাময়িক সংবাদ রাখিতে পারেন নাই। এমন একটা
 ঘটনা ঘটবার পূর্বে কি কোনও ছায়া পূর্বগামিনী হয় না? ভারতীয়
 রাষ্ট্রদূতেরা কি জ্ঞাত বুঝিতে পারেন না যে, ভারত-রাষ্ট্রের বিপুল অর্থব্যয়
 করিয়া তাঁহাদিগকে যে দেশে পাঠান হইয়াছে, সে দেশে ভোজ-সভার
 আয়োজন আর শিকার করা ছাড়াও মহত্তর কাজ কিছু তাঁহাদের
 করণীয় আছে? শ্রীনেহরু নাকি বলিয়াছেন যে, কাঠমণ্ডুর ভারতীয়
 রাষ্ট্রদূত রাজা মহেন্দ্রের মনের কথা জানিতেন না বলিয়াই শিকার
 করিতে বনে গিয়াছিলেন। জানিতে পারিলে যে যাইতেন না, ইহা
 অসম্ভব নহে। কিন্তু একটা রাষ্ট্রে গোপনে যে সকল প্রস্তুতি চলে,
 তার হঠাৎ এক একটা গুরুতর বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটয়া যায়, সেখানে
 সবার সম্ভাবনা সম্পর্কে এককণা অনুমান করিবার সামর্থ্য রাষ্ট্রদূতদের
 কেন থাকিবে না, ইহাও মস্ত বড় প্রশ্ন। হাজেরীতে বিদ্রোহ হইল,
 ভারতের রাষ্ট্রদূত ঘটনা ঘটনার পরে ছাড়া আগে কিছুই জানিতে
 পারিলেন না। সুয়েজে যুদ্ধ হইল, ভারতের রাষ্ট্রদূত অনুরূপ যোগ্যতাই
 দেখাইলেন। পাকিস্তানে সাময়িক তত্ত্বের অভুত্থান হইল, সেখানেও
 ভারতীয় রাষ্ট্রদূত উল্লিখিত দুইটা দেশেরই মত নিজ কার্যস্থলে
 অপর্যাপ্ত। তুরস্কে বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে সেখানকার ভারতীয়
 রাষ্ট্রদূত শ্রীনেহরুকে জানাইয়াছিলেন যে, মেন্ডেরেস মন্ত্রিসভা জন-
 স্বেচ্ছায়ের আত্মভাঙ্গন, এই কথার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীনেহরু
 বিশ্বাসের প্রণাম করিলেন এবং মেন্ডেরেস সরকারের প্রশান্তিও

গাহিলেন। শ্রীনেহেরুর তুরস্কের সীমান্ত পার হইবার সঙ্গে সঙ্গে
মেন্ডেরেস সরকারের পতন হইল। রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থান নূর
সরকারকে প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীনেহেরুর শ্রীমুখকথিত মেন্ডেরেস সরকারে
প্রশস্তিকে সমগ্র জগতের নিকটে উপহাসের সামগ্রী করিল। অতঃপর
দেশের রাষ্ট্রদূতগণের কার্যের ফল কি এইরূপই হয়? রাষ্ট্র
নিয়োগের যোগ্যতার মাপকাঠি কি? কর্তব্য কার্যে অযোগ্যতাই কি
এই পদলাভ করিবার পক্ষে যোগ্যতা? কেন ভারতবর্ষ এই জাতীয়
রাষ্ট্রদূতদিগকে বিদেশে পাঠাইতেছে? বিদেশী রাষ্ট্রের গুরুতর বিপদে
সময়ে আমাদের যে রাষ্ট্রদূতেরা কার্যস্থলে না থাকিয়া শিকারে বা অপর
অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদের অনুপস্থিতির কারণের মাহাত্ম্য
গাহিবার প্রয়োজন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর হয় কেন? ও
প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না। কিন্তু প্রশ্নটি ত মনে জাগে।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূতগণ বিদেশে যেই প্রকার যোগ্যতা দেখাইতেছেন,
বুর্শি, মার্কিন, রাশিয়ান বা জাপানী রাষ্ট্রদূতেরা বিদেশে এইরূপ
যোগ্যতা দেখাইলে কি শাস্তিপ্রাপ্ত হইতেন না? রাষ্ট্রদূতের কার্য আর
গুরুতর কার্য এক পর্যায়ে নহে। কিন্তু বিদেশী রাষ্ট্রের সর্ব
জরুরী সংবাদ অপরে জানিবার পূর্বে জানিতে পারার যোগ্যতা
রাষ্ট্রদূতের থাকা প্রয়োজন। ঘটনার পূর্বাভাস নিজ দেশের সরকারকে
নিয়ত জানানো তাঁহার কর্তব্য। রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র এবং লোকশাস্ত্র
তাঁহার এমন অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন, বাহাতে হাঁচি শুনিয়া তিনি
মাপ হইতে টুকটুকি পৃথক করিতে পারেন। ভারত নিরপেক্ষ দেশ
বলিয়াই পৃথিবীর নানা স্থানের শত্রু মিত্র দেশগুলির নানা প্রাশাসনিক
বিবর্তন ও বৈপ্লবিক ঘটনা ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনের উপর কোনও
গুরুতর বিপদ ঘটাইতে পারে না, এইরূপ ধারণা নিতান্ত মুর্থতা এবং

শ্রাব, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৯৩১

কাকের চোখ বুজিয়া ডিম লুকাইবার মতন হাশু কর। একটা জাতিকে
 বধন বৃণে ধরে, তখন চরণ হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সর্বত্রই কেবল ছিদ্র
 হইতে থাকে। ভারত-রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে আমরা কি
 নিছিন্ন কর্তব্য-পরায়ণতা প্রত্যাশা করিতে পারি না? প্রত্যাশা কেন,
 ঘাবী করিব। আর একটি বৎসর পরেই ত শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী-
 ভিলাবীরা “একটি ভোট দিন” বলিয়া দলে দলে আমাদের ঘরের ছয়ারে
 ধর্ষা দিবেন।

বাহ্যতামূলক সংস্কৃত শিক্ষা :—বিগত ১৯শে নবম্বর কলিকাতায়
 বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ডাঃ কেশকার
 বলেন, যে সময়ে যুরোপ এবং ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস
 প্রভৃতি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতের চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে,
 সে সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি ভারতীয়দের বিরাগ অত্যন্ত পরিতাপের
 বিষয়। তবে কোনও কোনও রাজ্যে সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া
 উঠিতেছে দেখিয়া স্বাধীন ভারতে সংস্কৃত তাহার যোগ্যস্থান লাভে
 বঞ্চিত হইবে না ভাবিয়া তিনি আনন্দও প্রকাশ করেন। তিনি আরও
 বলেন, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টিয়ান-নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীর স্বদেশের
 শিলা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জানিবার জন্ত সংস্কৃত জানা আবশ্যক।
 সেজন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃত অবশ্য-পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারণের
 দ্রষ্টও তিনি সুপারীশ করেন। তাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও
 জীবনবাহ্য সম্পর্কে তাহারা সম্যক অবহিত হইতে পারিবে। সংস্কৃত
 অনুষ্ঠানাদি প্রচারের ব্যাপারে আকাশ-বাণীকে পরামর্শদানের জন্ত
 মন্ত্রাজের ডাক্তার রাঘবনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং
 অনুরূপ কমিটি আকাশ-বাণীর অগ্রাগ্র কেদ্রেও সংগঠিত হইবে বলিয়া
 তিনি ঘোষণা করেন।

কথাগুলি চমৎকার ! সংস্কৃতির প্রতি ভারতবাসীর অনুরাগ বৃদ্ধির জন্ত বিভিন্ন সময়ে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে উপায় অবলম্বনে বিনা আয়াসে জনসাধারণকে সংস্কৃতানুরাগী করা যায়, সে উপায় অবলম্বনে তাঁহাদের মাঝে হইতে দেখিলে আমরা স্মৃখী হইতাম। সংস্কৃতির মাধ্যমেই ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সংস্কৃত হইতেই ভারতের প্রায় সবগুলি ভাষার উৎপত্তি, সংস্কৃত উত্তমরূপে শিক্ষা করিলে যৎসামান্য ভাষার উৎকর্ষ-সাধন তথা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ সহজসাধ্য, এ সকল জ্ঞানগর্ভ কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। একথাও শুনিয়াছি যে, সংস্কৃতির মাধ্যমেই বহুভাষাভাষী ভারতীয়দের মধ্যে প্রকৃত ভারতীয়ত্ব-বোধের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-বিধায়িত্বী সেই সংস্কৃত ভাষাকে জাতীয় জীবন হইতে সযত্নে দূরে সরাইয়া রাখিবার ফলে দেশে আজ অনৈক্যের ঘনঘটা দেখিয়াও রাষ্ট্রনেতাদের চेतনার সঞ্চার হইতেছে না। যথাপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ কাটজু তাই বলিয়াছিলেন, “সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিলে সংস্কৃত সাম্রাজ্যবাদের অভিযোগ উঠিত না।” আর সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিলে সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির জন্ত পৃথক কোন প্রচেষ্টারও প্রয়োজনই হইত না। সংস্কৃতানুরাগী ডাঃ কেশকার এ বিষয়ে তাঁহার প্রভাব প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হইবেন কি ? কেবল কথায় চিঁড়া ভিজিবে না।

কাছাড় জিলা অঞ্চল-প্রতিনিধি-সম্মেলন :—৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ বাং (২০।১১।৬০ ইং) রবিবার তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সম্মেলনে কাছাড় জেলার তিনশত বাইশ জন প্রতিনিধি সমবেত হন। লাল, মুক্তাছড়া, মোহনপুর, নিলামবাজার, ত্রিপুর এই পাঁচটি

মাদ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

১৩৩

মণ্ডলীর প্রতিনিধিরা অনুপস্থিত ছিলেন। শিলচর ব্যতীতও আরও বহুশতা মণ্ডলীর প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে মেহেরপুরের সংখ্যা ছিল বোল; করিমগঞ্জের বারো, লক্ষ্মীপুরের দশ। আনুষ্ঠানিক মণ্ডলী নাই, এক বা একাধিক গুরুভ্রাতা আছেন, এমন উনিশটা স্থান হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন। মণ্ডলী নাই, অথচ ইচ্ছা করিলে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিতেন, এমন বোলটা স্থান হইতে কোনও প্রতিনিধি আসেন নাই। প্রতিনিধি সম্মেলনের ব্যয় নির্বাহার্থ নিম্ন-নিখিত মণ্ডলী সমূহ আর্থিক এবং খাদ্যদ্রব্যাদি দিয়া সহযোগ করিয়াছেন,—শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, বদরপুর, লালামুখ, বিক্রমপুর, বাঘোবাহার, সুলতানীছড়া, কাটলিছড়া, বরধল, নারায়ণপুর, লক্ষ্মীপুর, দিখাল, মাইবং, লালং, বিন্ধাকান্দি, মনাছড়া।

শ্রীশ্রীবাবামণির নির্বাচিত শ্রীযুক্ত প্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য এম-এ, এন্-এল্-বি মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ, রবিবার, শিলচর অধরচান্দ হাইস্কুলে বেলা ১২টায় কাছাড় জিলা অথও-প্রতিনিধি সম্মেলনের এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সভারস্তের পূর্বে মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত রাকেশরঞ্জন দাশগুপ্ত বি-এ মহাশয়কে তাঁহাদের স্থিতি-স্থান তুল্যপটি, চিত্রালী-ষ্টুডিও হইতে হরি-ওঁ কীর্ত্তন সহযোগে অভ্যর্থনা করিয়া সভামণ্ডপে লইয়া আসা হয়।

শিলচর অথওমণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীবিজ্ঞেননাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাদর আপ্যায়নে মাননীয় সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহোদয় সুলভিত সভামঞ্চে আসন গ্রহণ করিলে কুমারী আলো (১) ও কুমারী আলো (২) তাঁহাদিগকে চন্দন ও পুষ্পমালা ভূষিত করে।

তৎপর মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের পরিচালনায় গুরুবন্দনা “বন্দে মদা সুন্দরম্” সমন্বয়ে গীত হওয়ার পর শ্রীমতী অণিমা দাস কর্তৃক সুললিত কণ্ঠে “খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড” এই অখণ্ড সঙ্গীতটি গীত হয়। সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে অখণ্ড-সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ সকলে উঠিয়া দাঁড়ান।

অতঃপর শ্রীধ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক সম্মেলন উপলক্ষে শ্রীশ্রীবাবাণির আশীর্বাণী-সম্বলিত দুইখানা পত্র পঠিত হয়। তদনন্তর কাটিহারের শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ দাস, চিনামারার শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিপুর রোডের শ্রদ্ধেয় সুকুমার চক্রবর্তী, গোঁহাটীর শ্রদ্ধেয় ধনীরাম দাস এবং লালার শ্রদ্ধেয় রমণচন্দ্র নাথ পুরকার মহাশয়গণের শুভেচ্ছা-বাণী পঠিত হয়।

ইহার পর কুমারী দীপ্তিকণা শ্রীশ্রীবাবাণির “বর্ষ কি গেল চলে” কবিতাটি স্মৃষ্টি-কণ্ঠে আবৃত্তি করে।

কবিতা আবৃত্তির পর শ্রীধ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় অভ্যর্থনা-ভাষণ পাঠ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রতিনিধি-সম্মেলনের ভাষণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বর্তমান সময়ে অখণ্ড-সমাজের কতিপয় সমস্যা সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইহার সমাধানের পন্থা নির্ধারণের জন্ত আবেদন জানান।

অভ্যর্থনা-ভাষণের পর মাননীয় প্রধান অতিথি শ্রীরাকেশবরদাস দাসগুপ্ত মহাশয় সুললিত-ভাষায় একটি সুদীর্ঘ লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। তাহার ভাষণে মঙ্গল-বাধরূপে পুণ্যকর্মের সহায়তা দিয়া শুভ হইতে, ধন্য হইতে, জগতের এক অপূর্ব বিশ্বয়-সৃষ্টির অংশভাগীরাণে কৃতার্থ হইবার সুযোগ গ্রহণ করিতে উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হয়। সম্ভবতঃ কেন্দ্রসমূহে যে লোককল্যাণী চেষ্টা চলিতেছে, তাহার দৃষ্টি

মাস, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৯৩৫

বথার্থ ও প্রাণময় যোগ রক্ষা করিতে তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলেন যে,—পুণ্যকর্মের সহায়তার দুর্দমনীয় ইচ্ছা আমে ইষ্ট-নিষ্ঠা হইতে। শ্রীশ্রীবাবামণি এক মহাধর্মের, মহাভাবের, মহানু আদর্শের মূর্ত প্রতীক। অন্তর দিয়া তাহা অনুভব করিতে হইবে, তবেই আমরা তাঁহার যথার্থরূপের পরিচয় পাইব। তিনি আরও বলেন যে,—শুধু অখণ্ড-সজ্জ হিসাবে নহে, জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে, দেশ হিসাবে টিকিয়া থাকিতে হইলে সনাতন, সর্বাদ্বিলনকারী, সর্বজন-গ্রাহ এই অখণ্ড-আদর্শের পথেই চলিতে হইবে।

অতঃপর শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্থির, ধীর এবং মধুবর্ষী কর্তে একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন যে,—মঙ্গলবাদের বিপর্যয়-রোধে কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্তই এই সম্মেলন। মঙ্গলবাদের বিপর্যয় যে আমাদের ত্যাগানুশীলনের একটা সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, এ বিষয়ে সম্যক্রূপে অবহিত হইয়াই আমাদের গণকে যথাকর্তব্য স্থির করিতে হইবে। মঙ্গলবাদ একদা সমগ্র জগতের সর্বমঙ্গলের আকর হইয়া অখণ্ড-সজ্জের গৌরবের বিষয় হইবে। সেই মঙ্গলবাদ প্রতিটি অখণ্ডের স্বাবলম্বনের প্রতীক হিসাবে গড়িয়া উঠুক, ইহাই তাঁহার অভিপ্সা। তিনি আরও বলেন যে,—এরূপ সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের পারস্পরিক প্রেম বদ্ধিত হউক। একের ত্যাগের দৃষ্টান্ত অপরকে ত্যাগের দিকে দিক্ প্রেরণা। ত্যাগেই প্রেমের বিকাশ। অতঃপর তিনি অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর ও অখণ্ড-ধর্ম সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী তন্ময় হইয়া তাহা শ্রবণ করেন এবং তাবাবেগে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। পরিশেষে, জাতির মহাহৃদয়ের প্রতিকারে শ্রীশ্রীবাবামণি যে সর্বাতীষ্ট-প্রাপ্তরক অমোঘ-পন্থা প্রদর্শন

প্রতিধ্বনি

৯৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

করিয়াছেন, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার করেন।

মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের ভাষণান্তে কুমারী আলো (১), রীণা, মাধুরী, আলো (২) ও সন্ধ্যা কর্তৃক শ্রীশ্রীবাবামণির “এক দিকে চল, এক দিকে চল” সঙ্গীতটি সমবেত-কণ্ঠে গীত হয়।

অতঃপর বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ বাং তারিখে শিলচরে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি-সম্মেলনে গৃহীত কর্মপন্থার রূপায়ণ সম্পর্কে উপস্থিত মণ্ডলী সমূহের বক্তব্য শ্রবণে সভাপতি মহাশয় ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এক এক করিয়া সমস্ত মণ্ডলীর মুখপাত্রগণ নিজেদের কার্যাবলীর বিবরণ ব্যক্ত করেন। ইহাতে দেখা যায় যে,—সুলতানীছড়া, লালার, ভুবরীঘাট, রংপুর, ধোয়ারবন্দ, লালামুখ-বাগান, হাফলং, পালৈ ও জয়নগর এই কয়েকটি স্থান ব্যতীত অত্রাশ্র মণ্ডলীর বা অখণ্ডের ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতিসমূহ যথাযথ রক্ষিত হয় নাই।

বিবৃতি প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় চন্দ্রশেখর ভদ্র মহাশয় এক ভাতি উৎসাহ-ব্যঞ্জক সংবাদ পরিবেশন করেন। তিনি বলেন যে, ধলাই-বাগানে নিয়মিতভাবে যে সাপ্তাহিক ও বিশেষ সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিটি অখণ্ড এবং স্থানীয় সজ্জনেরা অনেকেই নিয়মিত যোগদান করেন। প্রতিটি উপাসনাতেই শতাধিক উপাসক গিলিত হন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, বাগানের শ্রমজীবী ব্রাহ্ম-ভগিনীরাও সমবেত উপাসনায় প্রতিজ্ঞে নিয়মিত যোগদান করেন এবং কেহই শূন্য হস্তে আসেন না।

তদনন্তর সর্বসম্মতিক্রমে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের সুদক্ষ পরিচালনায় প্রস্তাবাবলী আলোচনার সময়ে কোন প্রকারের

শাব, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

২০৭

বিতর্কমূলক সমস্তার সৃষ্টি হয় নাই। ঐ সকল প্রস্তাবের নকল চাহিয়া পত্র দিলে নিম্ন ঠিকানা হইতে তাহা প্রেরণ করা হইবে। বখা, ডাঃ বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, টিকরবস্তি, পোঃ শিলচর, কাছাড়।

নিম্নলিখিত দুইটি প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। সমবেত উপাসনা, হরি-ওঁ কীর্তন ও অখণ্ড-সংহিতার পঠন-পাঠন এই তিনটি কার্য্যই মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে সমবেত-উপাসনাকে শ্রীশ্রীবাবামনি তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় অনুষ্ঠান বলিয়া বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা স্পষ্টতঃই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে,—যাঁহারা নিয়মিতভাবে সমবেত উপাসনাতে যোগদান করেন, শ্রীশ্রীবাবামনির মূর্ত্ত-বিগ্রহ-রূপ মণ্ডলীর তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক। সুতরাং সমবেত উপাসনায় প্রতিটি অখণ্ড বাহাতে যোগদান করেন, তজ্জন্তু সকল মণ্ডলীকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীনরেশচন্দ্র দেব, শিলচর।

সমর্থক—শ্রীকেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, সোনাইছড়া।

২। সন্জের সঙ্গে বাহাতে প্রতিটি ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে, তজ্জন্তু প্রত্যেকের “প্রতিধ্বনি” পাঠ একান্ত কর্তব্য এবং শ্রীশ্রীবাবামনির ভাবাদর্শ বাহাতে প্রতি অখণ্ড-পরিবারে ব্যাপক ভাবে আলোচিত ও প্রসারিত হয়, তজ্জন্তু ‘অখণ্ড-সংহিতা’ সংগ্রহে প্রত্যেক অখণ্ড-পরিবারকে প্রেরণা-দানে আমাদের সকলের যথেষ্ট সচেষ্ট হইতে হইবে। তহুদেঞ্জে প্রস্তাব করা যাইতেছে যে,—সমগ্র কাছাড়-জিলার প্রতিটি মণ্ডলী হইতে প্রতি মণ্ডলীর অধীন মোট অখণ্ড-পরিবারের সংখ্যা, কত পরিবারে “প্রতিধ্বনি” রাখেন এবং অন্ততঃ একখণ্ড হইলেও ‘অখণ্ড-সংহিতা’ কত পরিবারে আছে, তাহার এক পরিসংখ্যান

মাঘ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ [৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

৯৩৮

নিয়া এক মাসের মধ্যে শিলচরে ডাঃ বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীমহীতোষ রায়, শিলচর।

সমর্থক—শ্রীরাজবিহারী ভৌমিক, হাইলাকান্দি।

প্রস্তাবাবলী গৃহীত হওয়ার পর কাটিগড়ার শ্রীযুক্ত কনকরঞ্জন দাস মহাশয় মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন।

ইহার পর মাননীয় সভাপতি মহাশয় আবেগময়ী ভাষায় তাঁহার উপসংহারীয় ভাষণ সমাপ্ত করিলে পর যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনাতে কুমারী রীণা, আলো (১), সন্ধ্যা, আলো (২) ও মাধুরী শ্রীশ্রীবামণির “পরকে যারা আপন ভাবে, তারাই আমার আপন জন” সঙ্গীতটি গাহিলে প্রেমধ্বনি সহযোগে সভারকার্য্য সমাপ্ত হয়।

(সংবাদদাতা :—শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল, সম্পাদক, শিলচর
অখণ্ডমণ্ডলী)

[স্থানাভাবে সম্পূর্ণ বিবরণ ছাপা সম্ভব হইল না।—প্রঃ সঃ]

প্রত্যাখ্যান :—বেকুবাড়ী হইতে যে প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর নাকি খোলাখুলি আলোচনা হয়। শ্রীনেহেরু প্রতিনিধিদলের উক্তির বৌদ্ধিকতা অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনি নাকি বলেন যে, পাকিস্তান বিকল্প প্রস্তাব অগ্রাহ করার পরে বেকুবাড়ী পাকিস্তানকে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া তাঁহার আর উপায় নাই। বেকুবাড়ী ইস্তাক্তরের দরুণ বাঁহারা বাস্তব্য় হইবেন, তাঁহাদের পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করিবেন বলিয়া তিনি উদার আশ্বাস প্রদান করেন। সংবাদে প্রকাশ, এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, ইস্তাক্তরের পরেও

মাদ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

৯৩৯

যেন বেকুবাদীর অধিবাসীরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পরিত্যাগ না করেন, যেন তাঁহাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ভারত সরকার লইতে পারেন। কেননা তদ্রূপ হইলে ভারত সরকার তাঁহাদিগের নিরাপত্তার জন্ত পাকিস্তানকে চাপ দিতে পারিবে, আবার অল্প দিকে ক্রমেক্রমে ভারতীয় এলাকায় তাঁহাদের পুনর্বাসনের ভাল ব্যবস্থাও করিতে পারিবে।

বেকুবাদীর প্রতিনিধিদল এই সকল আশ্বাস এবং উপদেশের কি বলা নির্ধারণ করিয়াছেন, জানা যায় নাই। তবে, সংবাদে প্রকাশ যে, প্রতিনিধি-দলের অধিকাংশই ছিলেন বেকুবাদী অঞ্চলের চাষী পরিবারের লোক। বেকুবাদী-দিল্লী যাতায়াতে তাঁহাদের অধিকাংশকেই তাঁহাদের বাৎসরিক আয়ের একটা মোটা অংশ ব্যয় করিতে হইয়াছে বলিয়া শ্রীনেহেরু বুঝিতে পারিয়া দয়ার্দ্র হন এবং তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্যের বদান্ত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। কিন্তু প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন

এত বড় একটা দেশের একজন প্রধান মন্ত্রীর প্রদত্ত পাঁচশত টাকার একখানা চেক আবার তাঁহার কাছেই ফিরিয়া গেল, ইহা একটি অনন্ত-সাধারণ ঘটনা। গরীবেরও আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে।

ঝাঞ্জে ও ঔষধে ভেজাল ;—বিগত ১৯শে ডিসেম্বর বেলগাছিয়ায় শ্রী জি কর মেডিকেল কলেজ প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র পুনর্মিলন উৎসবের মূল সভাপতির ভাষণে ডাঃ নীহার মুন্সী মন্তব্য করেন.—আমাদের এই দেশে যেখানে অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থাই জনগণের বাস্তবহানির প্রধান কারণ, সেখানে খাদ্য, দ্রব্য ও ঔষধে ভেজাল নিয়োধের দ্রুত সত্যিকার কার্য্যকরী পন্থাদি অবলম্বিত হয় নাই, ইহা অদ্ভুত ঠেকে। তিনি আরও বলেন যে, যে ব্যক্তি অপরকে বিষ প্রয়োগ করিয়া

মারে, তাহাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, কিন্তু বাহারা নিদারুণ লোভের বশবর্তী হইয়া খাও ও ঔষধে ভেজাল দিয়া সমগ্র জাতিকে দীরে দীরে বিষ প্রয়োগে তাহার জীবনী-শক্তি হরণ করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় না। অথচ খাও ও ঔষধে ভেজাল দিয়া উহার গুণ ও শক্তি নষ্ট করা এমন একটি অপরাধ, বাহার বিরুদ্ধে চরম দণ্ড দেওয়াই বিধেয়।

লোক-গণনার সত্যতাঃ—কোন কোন সংবাদপত্রে উদ্দেশের সহিত কয়েকটি সংবাদ পাঠ করিলাম, সংবাদ-দাতারা তাঁহাদের বিবৃতিতে বলিতেছেন যে, লোক-গণনার যে আয়োজন চলিতেছে, তাহাতে কোন কোনও প্রদেশের বঙ্গভাষী অঞ্চলগুলিতে নানাপ্রকার অসামুখ্যতার আশ্রয় লওয়া হইতেছে। কোন কোন অঞ্চলে যে সব শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীকে এলুমারেটর, সুপারভাইজরস ইত্যাদি পদে নিয়োগ করা হইতেছে, তাঁহাদের নাকি এই বলিয়া শাসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে যে, মাতৃভাষার স্থলে প্রকৃত মাতৃভাষা না লিখিয়া অথবা একটি ভাষার উল্লেখ করিতেই হইবে এবং না করিলে চাকুরী বাইবে। এই জাতীয় সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বাংলার বাহিরের বঙ্গভাষীদের পক্ষে বড়ই বিপদের কথা। কেননা মাতৃভাষা শিক্ষা করিবার পবিত্র অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ইহা এক দুষ্ট চক্রান্ত। আমরা বহুবার শুনিয়াছি, বিগত লোক-গণনাতেও কোনও কোনও প্রদেশে এইরূপ হইয়াছিল এবং এই অভিযোগ সত্য হওয়া বিচিত্র নহে। একটা স্বাধীন দেশে লোক-গণনার সময়ে সরকারী কর্মচারীরা সত্য-রক্ষা করিবেন না, এইরূপ ঘটনা বড়ই লজ্জাকর। শুধু লজ্জাকর নহে, অপমানকর, মানিকর এবং জাতির সর্ববিধ মঙ্গলের হস্তারক। যে জাতি নিজেদের সেন্সাসকে মিথ্যা বলিয়া জানে বা মিথ্যা করিয়া লেখে,

ষাৎ, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

২৪১

সে জাতি প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের পিতৃ-পরিচয়কে অস্বীকার করিতেছে।

সীমানা কমিশনের সুপারিশ সমূহ আংশিক রাখিয়া এবং আংশিক অণালন করিয়া যেমন-তেমন করিয়া ভাষাভিত্তিক রাজ্য সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। ভাষার দ্বন্দ্ব এইখানেই শেষ হইয়া যাওয়া উচিত। স্বাধীন ভারতসকলেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা বলুক, সগর্বে নিজ নিজ মাতৃভাষার পরিচয় প্রদান করুক, ভীতিগ্রস্ত হইয়া সত্য পরিচয় গোপন রাখিতে কেহ যেন বাধ্য না হয়.—ইহাই প্রয়োজন। কেননা, মিথ্যা মিথ্যাকেই সৃষ্টি করিবে, বাহার ফলে যে স্বাধীনতা আমরা নিজেদের যোগ্যতায় অর্জন করিয়াছি বলিয়া অভিমান করি, তাহা তিক্ত এবং বিবাদ হইয়া যাইবে। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে আমরা এই সময়ে অগ্রসর হইয়া আসিতে আহ্বান করিতেছি। নেতৃত্বের উচ্চ আসনে বসিয়া বড় বড় কথা বলিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। “সত্যমেব জয়তে” যে কল্যাণ রাষ্ট্রের-মূলমন্ত্র, সে রাজ্যের সেন্সাসে যেন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা না হয়।

সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রাজনীতিকেরা অনেক মিথ্যার ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু হায়, তাঁহারা জানেন না যে তাঁহাদের সমর্থনকারীরাও মনে মনে তাঁহাদের ঘৃণা করিয়া থাকে। মিথ্যাবাদী নেন ঘৃণার পাত্র, মিথ্যা বলিতে যাহারা বাধ্য করে, তাহারাও তেমন ঘৃণার পাত্র। মহাত্মা গান্ধী সত্য এবং প্রেমের বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন,—সত্য যদি বিসর্জিত হয়, প্রেম গায়ের জোরে বসিয়া থাকিতে পারে না।

আমরা অনেকেই সংস্কৃতকে আমাদের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিতে অভিলাষী। কারণ, আন্তে আন্তে সংস্কৃতের চর্চা করিতে করিতে এই ভাষা পুনরায় সমগ্র ভারতের ভাষায় পরিণত হইবার যোগ্যতা রাখে।

একদা সমগ্র ভারত সংস্কৃত ভাষাতেই কথা বলিত। পুনরায় সেই দিনটি ফিরিয়া আসা কিছুই বিচিত্র নহে। দুই চারিটা রাষ্ট্র-বিপ্লব বা গণনাট্যের পট-পরিবর্তন একটা জাতির সুদীর্ঘ জীবনে কিছুই নহে, ধীরে ধীরে সমগ্র জাতিকে সংস্কৃতভাষিসারী করিবার জন্ত বলা উচিত এবং আমাদের মনে হয়, সংস্কৃত অল্প কিছু ও বাহারা জানেন, তাঁহাদের এই সংস্কৃতজ্ঞানের কথাটি এবারকার সেন্সাসে আগ্রহ সহকারে এবং জোর করিয়া হইলেও লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন। সত্য কথা লিখাইতে কাহারও ভয় পাওয়া উচিত নহে।

আন্দামান সম্পর্কে :—অগ্রহায়ণের প্রতিধ্বনিতে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, পূজ্যপাদ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব এবং প্রতিধ্বনি সম্পাদিকা ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীর আন্দামান ভ্রমণের তালিকা হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

এতদ্বিষয়ে আমরা দুই চারিখানা পত্র পাইয়াছি। পত্রলেখকদের নিকট নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন এই বিষয়ের সকল পত্র শ্রীবিষ্ণু কৃষ্ণ দত্ত, চার্লসম্যান, পাওয়ার হাউস, পোঃ চাথাম, আন্দামান ঠিকানায় লেখেন, বারাগসীতে আমাদের নিকটে নহে।

দূরবর্তী দেশে, বিশেষ করিয়া এক স্থানের সহিত অল্প স্থানের স্বাভাবিক যোগাযোগ-ব্যবস্থা যেখানে খুবই সঙ্কীর্ণ, তেমন স্থানে একটা ভ্রমণ-তালিকা করিতে হইলে পূর্বাঙ্কে অনেকগুলি বিষয়ের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, প্রস্তুতিরও আবশ্যিকতা আছে। এই সকল প্রাথমিক ব্যাপারে বিলম্ব ঘটিলে ভ্রমণ-তালিকা বিলম্বে রচিত হওয়া সম্ভব নহে।

আন্দামানে আমাদের গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী মাত্র একটা দলগতী। সুতরাং একার অসাধ্য কোনও অধ্যবসায়ে ব্রতী হইতে আমরা তাঁহাকে

ষাট, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

২৪৩

ব্যয় করিতে পারি না। শিলং হইতে একটা সাংস্কৃতিক দল
পাঠাইবার বিষয়ে এক ভ্রাতা এক প্রস্তাব করিয়া পত্র দিয়াছেন।
আমাদের মনে হয়, প্রস্তাব সাধু হইলেও ব্যয়াক্রমের বিষয় ভাবিয়া
দিনঃ মণ্ডলী স্বতঃই ইহাতে নিরুৎসাহ হইবেন।

আন্দামানে অনেকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অঞ্চল রহিয়াছে। কোন্
কোন স্থান শ্রীশ্রীশ্রী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের ভ্রমণের জন্ত নির্ধারিত
হইবে এবং যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা বুঝিয়া কোন্ স্থানের পরে কোন্
স্থানে ভ্রমণের তালিকা করা উচিত, এই সকল বিষয় আন্দামানের
নানান্থানবাসী বাঙ্গালী সজ্জনগণের সহযোগ ব্যতীত পূর্বেই নির্ধারিত
হইতে পারে না। এই কারণে আমরা “প্রতিধ্বনি”র বর্তমান সংখ্যাটিও
আন্দামানের প্রায় সর্বস্থানে এক হাজার বঙ্গভাষী সজ্জনের নিকট
প্রেরণ করিলাম। ইহার যদি সংপ্রতিক্রিয়া কিছু হয়, তবে উপরে
নির্ধারিত ঠিকানায় শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত যেন তাহা দ্রুত জানিতে পারেন,
ইহাই অভিলাষ।

গৌহাটীতে একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানঃ—গত ১১ই
জিসেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় আমরা রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর
শর্মা বাড়ীতে সমবেত উপাসনা করিয়াছি। উক্ত উপাসনায় গৌহাটী
বঙলীর প্রায় ৮০ জন ভ্রাতা-ভগিনী যোগদান করেন। এই উপাসনা
পরিচালনা করিয়াছেন, কলিকাতা হইতে আগত শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা
প্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়। কয়েকজন বিশিষ্ট অসমীয়া অনখণ্ড
ভক্তও এই উপাসনায় উপস্থিত হন। গৌহাটীতে এত সংখ্যক ভ্রাতা-
ভগিনীলহ একত্র স্নানশালায় উপাসনা আমি এখানে আসার পর এই
প্রথম দেখিলাম। তবে সবই সদৃশকর ক্রপা। তাহা না হইলে
উপাসনার দিন সকালে রায়বাহাদুরের বড়ছেলে শ্রীনির্মল শর্মা যখন

নারিকেলের জুতা চিন্তা করিতেছিলেন যে, নারিকেল বাজার হইতে কিনিয়া আনা হইবে, না নিজের গাছ হইতে পাড়াইবে—বাজার হইতে কিনিয়া আনারও লোক নাই এবং গাছ হইতে পাড়াইবারও লোক নাই, তখন তিনি একটু বিশেষ চিন্তাশ্রিত হন। কারণ, তখন বেলাও অনেক। বাহা হউক, এমন সময় একটা সাধারণ লোক “বাবু পান লব নেই, পান রাখিব” বলিয়া জিজ্ঞাসা করে এবং তিনি “পান নে লাগে” বলিয়া বলেন। কিন্তু লোকটী জোর করিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়ে এবং বলে “বাবু খুব ভাল পান”। তখন নির্মলবাবু লোকটীর নিকট একটা টোপলায় ছোবড়া ছাড়ান এবং পরিষ্কারভায়ে ছিলান নয়টী নারিকেল দেখিতে পান এবং আনন্দের সহিত ঐ ত্রায়ামূল্যে খরিদ করিয়া নেন। লোকটীকে সন্ধ্যায় উপাসনায় আসার জুতা তিনি খুব অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু তিনি আসেন নাই। ইহা যে শ্রীগুরুরই লীলা, নির্মলবাবু ইহা ধরিয়া লইয়াছেন, উপস্থিত সকলকে আবেগভরে বলিয়াছেন। তবে আমরা বুঝিয়াছি, ঐ সাধারণ বেশে পান বিক্রী করা লোকটী শ্রীশ্রীবাবামণি স্বয়ং।

উপাসনায় রায়বাহাদুর কষ্টে হইলেও বিগ্রহে অঞ্জলি দিয়াছেন এবং অতিকষ্টে “বড় আপ্যায়িত হইলাম” বলিয়া সমবেত সকলের নিকট বলেন।

এই উপাসনায় পাণ্ডু অখণ্ডমণ্ডলী হইতেও ছয়জন ভ্রাতা বোগদান করিয়াছেন।

(সংবাদদাতা :—শ্রীধনীরাম দাস, গোহাটী)

মাঘ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

২৪৫

পথের সন্ধান .

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব]

(১)

ধর্মের বলে আমাদের বাঁচিবার অধিকার অর্জন করিতে হইবে।
অধর্মের আশ্রয় লইয়া বাঁচিতে চাহিও না।

(২)

সংখ্যায় অন্ন হইলেও তোমাদের শক্তি কম নহে। সংখ্যাবলে
মানবেরা পার্থিব স্বার্থ আদায় করে, ধর্মবলে দেবতারা নিজেদের দুর্ভাগ্য
দূর করে। ধর্মবলে দেবতারা জগতের ত্রাস ধ্বংস করে। ধর্মেরই
আশ্রয় লও, অধর্মের নহে।

(৩)

ধর্ম তোমাদের জীবনে মূর্তিমন্ত হউন। ধর্ম যেন কেবল ওষ্ঠে আর
গ্রন্থে আবদ্ধ না থাকেন। তোমরা প্রত্যেকে ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ হও।

(৪)

ধর্ম অভয়দাতা, কারণ তিনি নিজেই অভয়। ধর্মকে আশ্রয় কর
যার ভয়কে সবলে বিনাশ কর। ধর্ম জীবনের হউক আলোক, — ভয়ের
অন্ধকার, বিভীষিকার তমিস্রা জীবন হইতে অপগত হউক।

(৫)

ভীতও হইও না, ভয়ও দেখাইও না। নিজে হও নিভীক, সকলকে
বিলাও অভয়ের অমৃত।

(৬)

কোনও অবস্থাতেই ভগবানকে ভুলিও না, ধর্ম্যচ্যুত হইও না, পাগল
প্রশ্রয় দিও না, দুর্বলতার আশ্রয় নিও না, মিথ্যা যুক্তি সৃষ্টি করি
আত্মপ্রবঞ্চনা করিও না। ধ্বংস হইয়া যাইব তথাপি মানুষ হইয়া
অধিকার ত্যাগ করিব না, এই জিদ, এই সঙ্কল্প নিয়া পথ চল।

(৭)

সহস্র বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও চিত্ত স্থির রাখিয়া চলিও। ঈশ্বরের দর
বিশ্বাস আছে, তার আবার ভয় কি?

(৮)

আমি তোমাদের প্রতি জনকে বীৰ্য্যে এবং বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে
চাহি। তোমরা বীৰ্য্যহীন হইও না, তোমরা বিশ্বাস হারাইও না।

(৯)

অনেকের ধারণা, আমি উলুবনে মুক্তা ছড়াইতেছি। এই ধারণার
সহিত আমি যুক্ত করিতে চাহি না। আমি মুক্তাই যে ছড়াইতেছি, ছাড়ি
নহে, ইহা সত্য জানিও। উলুবন একদা চন্দনবনে পরিণত হইবে।
ইহা আমার সিদ্ধবাণী।

শ্রাব, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

২৪৭

(১০)

সকলের মনে অভয় জাগাও। সকলকে সাহসী করিয়া তোল।
 শুধু সাহসী নহে, হুঃসাহসী কর, অসমসাহসী কর। কাপুরুষের জীবনে
 শান্তিও নাই, গৌরবও নাই, আনন্দ ত' দূরেরই কথা। জগৎ হইতে
 হ্রীবত্ব আর কাপুরুষত্বকে নির্বাসিত কর।

(১১)

তোমাদের প্রাণ ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণ হউক। একের প্রেম সহস্র
 জনকে প্রেমিক করুক। ভুবন ভরিয়া তোমরা প্রেমের জয় গাহিয়া
 বাও। প্রেম ভয় দূর করে, ভয়ের কারণকে উৎপাটিত করে, অভয়
 দেয়।

(১২)

সত্যময় চেষ্টা আর ভয়হীন জীবন বড়ই শ্লাঘার, বড়ই গৌরবের।
 ইহাই তোমার হউক। মিথ্যাকে বর্জন কর, ভয়কে নির্বাসন দাও,
 জীবনের সিংহাসনে বসাও প্রেমকে।

(১৩)

আশা হারাইও না। উৎসাহে ভাটা পড়িতে দিও না। রক্তের
 স্রোতকে ক্ষীণ হইতে দিও না। সবল সতেজ স্বাভাবিক বিকাশের পথে
 কোনও বাধাকেই মানিও না। ভূজ-বিক্রমে নিজের অধিকারকে অর্জন
 কর।

(১৪)

তোমাদের প্রত্যেককে আমি সাহসিকতার বাণী শুনাইতে চাই। ভীৰুতা বর্জন কর। জগতের কাহারও অনিষ্ট করিবে না, এই পণ কর। কিন্তু অত্যাগ বিচার-বিভ্রমে অধর্মকে ধর্মের আসন দিয়া নিজের অনিষ্ট সাধন করিতেও দিও না। যুগে যুগে ধর্মের নিত্য নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে কিন্তু ধর্ম সনাতন। আজিকার যুগে কাপুরুষের কোনও ধর্ম থাকিতে পারে না। তোমরা বীর হও।

(১৫)

অধর্মকে কেন ধর্মের পূজা দিবে? অত্যাগকে কেন ত্রায়ের আসনে বসিতে দিবে! পাপকে কেন পুণ্য বলিয়া প্রচারিত হইতে দিবে! অত্যাচারকে কেন করুণা বলিয়া স্বীকার করিবে? ছেদকে কেন মৈত্রী বলিয়া ভ্রম করিবে? মিষ্টি কথাতে কেন মিষ্ট ব্যবহার বলিয়া মারিয়া লইবে? ধর্মকে রাখিয়া ঢাকিয়া প্রকাশ করিতে হয় না। ধর্ম তার নগ্ন সৌন্দর্য্যেই সুষমামণ্ডিত পরমমঙ্গল। অধর্মকে অস্বীকার কর। পল্লবিত বচন আর অলঙ্কৃত ভাষাই ধর্ম নহে। ধর্ম হইতেছে জীবনকে মঙ্গলের সহিত ধরিয়া রাখিবার নিরপেক্ষ সূত্র।

(১৬)

একাই সংকাজ শুরু করিতে হয়। কবে দশজন আসিয়া মিলিবে, তারপরে কাজ শুরু করিবে, এই বুদ্ধি ভাল নহে। কাজ একাই করিয়া বাইতে হয়। থামিতে নাই, ঘামিতে নাই। অর্থাৎ অবিরাম কাজ চালাইয়া বাইবে কিন্তু ক্লান্ত হইবে না। দীর্ঘকাল কাজ করিবার পরে একদিন দেখিতে পাইবে, দুই একটা লোক তোমার কাছ ঘেঁষিতে

মাস, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

২৪২

চাহিতেছে। সকলে যখন দেখিতে পায় যে, কাহারও সাহায্য-সহায়তা ব্যতীতই একটা গোয়ার-গোবিন্দ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাজে লাগিয়া রহিয়াছে, একটা মাত্র কাজই আপ্রাণ নিষ্ঠায় চালাইয়া বাইতেছে, ঝড়-ঝঞ্ঝা বাধা-বিঘ্ন, ভয়-বিভীষিকা, কুসংস্কার ও ভ্রমকে মানিতেছে না, কিছুতেই কাজ ছাড়িতেছে না, তখন তাহার সহকর্মী জোটে।

(১৭)

শক্তিমানেরা দলবদ্ধ হয় জগজ্জয় করিবার জন্ত। দুর্বলেরা দলবদ্ধ হয় আত্মরক্ষা করিবার জন্ত। তোমরা দলবদ্ধ হইও ক্ষুদ্রতম, দুর্বলতম, হীনতম মানুষটারও ভিতরে ব্রহ্মশক্তির জাগরণের জন্ত। তোমরা দলবদ্ধ হইও, মানবাত্মার মনের শৃঙ্খল কাটিয়া দিবার জন্ত। তোমরা দলবদ্ধ হইও, প্রাণ-প্রিয়তমকে প্রতি জনের পক্ষে সুলভ্য করিয়া দিবার জন্ত।

(১৮)

ঐক্যের অনুশীলন কর। প্রতি জনে প্রতি জনকে প্রাণ দিয়া ভাগবাস। একের জন্ত অপরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হও, সমর্থক হও। যথেষ্ট ভাই বলিয়া ডাকিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়া দিও না।

(১৯)

তোমরা ঐক্য এবং একাগ্রতার অনুশীলন কর। সমস্ত মনটাকে টানিয়া আনিয়া একটা স্থানে নিবিষ্ট করার নাম একাগ্রতা। ইহা বানসিক একাগ্রতা। সমগ্র চেষ্টাকে চারিদিক হইতে টানিয়া আনিয়া উপগ্রহ করিয়া একটা সময়ে একটা স্থানে নিয়োজিত করিবার তোমাদের

প্রতিধ্বনি

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৯৫০

প্রয়োজন। ইহাতে নিষ্ঠা, বিশ্বাস, আনুগত্য, শৃঙ্খলা ও কর্মঠতা
প্রয়োজন। তোমরা কোনও কারণেই পিছনে হঠিয়া যাইও না।

(২০)

সৎকাজের জন্ত ডাক আসিলে হাতের সব মামুলী কাজ মুলত্ব
রাখিয়া সাড়া দিবার যোগ্যতা ব্যক্তি, সংঘ ও জাতি এই তিনটিই
শক্তিশালী করে। এক ডাকে সকলে মিলিত হইবার অভ্যাস তোমরা
অর্জন কর।

(২১)

বুদ্ধ, জরাজীর্ণ, দুর্বল, পঙ্গু দেহেও তুমি জগতের অনেক কল্যাণ
করিতে পার। কারণ, শরীর তোমার নিয়ত-ক্ষয়শীল হইলেও অক্ষয়
অক্ষর, অবায়, অনির্বচনীয় শক্তিদ্বারা পরব্রহ্ম তোমার ভিতরে রহিয়াছেন।
তোমার বিক্রম অমিত। এই প্রত্যয়কে সাধনার দ্বারা জাগ্রত কর।

(২২)

জীবনকে ষতটা পার, বহির্শুদ্ধতামুক্ত কর, অন্তর্শুদ্ধ সাধনার তোমার
সাধক হও।

(২৩)

সাধন কর আর জগতের কল্যাণ কর। নিজেকে সর্বদা ইয় সাধন-
কর্মে, নয় জগৎকল্যাণ-কর্মে নিয়োজিত রাখ। প্রাণভরা ভালবাসা
লইয়া প্রতিটি কাজ কর। জীবনকে প্রেমময় কর। কর্ম হউক প্রেম,
ধর্ম হউক প্রেম।

মাঘ, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

৯৫১

(২৪)

নিজে আনন্দময় হও এবং সকলকে আনন্দ দাও। সমগ্র জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ কর। ভাবে, ভাষায়, কর্মে সাধন কর আনন্দের, প্রসার কর আনন্দের, প্রচার কর আনন্দ। আনন্দই তোমার জীবন হউক, আনন্দই তোমার অমৃত হউক।

(২৫)

তোমরা সংখ্যায় অল্প হইলেও ত্যাগে, তপস্যায়, সাধনে ও উপলব্ধিতে শ্রেষ্ঠ হইতে পার। সেই উপায় ও অধিকার তোমাদের হাত হইতে কেহই কাড়িয়া নিতে পারিবে না। চরিত্রের শৌর্য্যে যাহারা বরীয়ান, তাহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও অধিক কাজ করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া, তাহাদের মধ্যে যদি ঐক্য থাকে, তাহা হইলে তাহারা অনেক অকল্পনীয় ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া অকল্পনীয় জঞ্জাল নিমেষের মধ্যে অপসারিত করিতে পারে।

(২৬)

বড় বড় কথা বলিতে পারাকে যোগ্যতা বলিয়া ভুল করিও না। বড় বড় শব্দ উচ্চারণের দক্ষতাকে বড় বড় কার্য সম্পাদন বলিয়া মনে করিও না। কথা কমাইয়া কাজ বাড়াও। কথা খাটো করিয়া কাজে হাত লাগ। কাজ, কাজ আর কাজ,—ইহাই হউক জপমন্ত্র।

(২৭)

বয়সে বাড়িলেই কেহ বড় হয় না, বই পড়িলেই কেহ জ্ঞানী হয় না,—পরমবুদ্ধ ও পরমমহতের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের দ্বারা বড় বা

প্রতিধ্বনি

পথের সন্ধান

[১২ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৯৫২

জ্ঞানী হইতে হয়। কারণ, তিনিই জ্ঞান ও বৃহত্তের মূল। তোমরা বড় হও, তোমরা জ্ঞানী হও, তবেই তোমরা প্রেমিক হইতে পারিবে।

(২৮)

অকিঞ্চিৎকর দানের পশ্চাতেও অনেক সময়ে অতি বিরাট প্রাণ থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র দানও অতীব মহান ভাণ্ডে পরিণত হয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একটা মহৎ কাজের পিছনে সহযোগ-হস্ত লইয়া লাগিয়া থাকা একটা তুচ্ছ কথা নহে। তোমাদের ত্যাগ যেন তোমাদের অহঙ্কারের মাধায় ধূলিপড়া দেয়, তোমাদের ত্যাগ যেন তোমাদের বিনয়ের শ্রীবুদ্ধি সাধন করে।

(২৯)

সকলের প্রাণে আশ্বাস জাগাও, বিশ্বাস জাগাও। নিঃশ্বাসে-প্রাণে প্রত্যেকে অভয়-স্বরূপের সঙ্গ কর। নামে মাত্র সাধক না থাকিয়া কাজেও সাধক হও।

(৩০)

একটা নিমেষে একটা শতাব্দীর জঞ্জাল অপসারণ করিয়া দিবে, যে শক্তি তোমার আছে। কেন নিজের সামর্থ্যকে বিশ্বাস করিতেছ না? কেন নিজের শক্তিকে উদ্ধুদ্ধ করিবার সাধনায় লাগিয়া যাইতেছ না? কেন বুধা কর্ম আর বুধা প্রজন্মে সময় নষ্ট করিতেছ?

(৩১)

সহকর্মীদের শক্তির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি দিও, নেতিবাচক নয়। কে কাজ করে না, তাহা দেখিয়া হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। কে

স্বাধ, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

৯৫৩

কাজ করে বা করিতে পারিবে, তাহা দ্রুত স্থির করিতে পারাই নেতার প্রধান যোগ্যতা। যাহারা কাজ করে বা করিতে পারে, তাহাদের প্রতি জনকে শ্রেষ্ঠ কাজ দাও, নিকৃষ্ট কাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর।

(৩২)

কর্ম হউক পবিত্রতার সাধক, পবিত্রতা হউক কর্মের ধারক, বাহক এবং প্রবর্তক। চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে শুচিতা হউক তোমার বিশেষত্ব।

(৩৩)

একজন আর একজনকে হিংসা করিয়া কখনো প্রতিষ্ঠান চালানো যায় না। কাজ অল্প হউক, তবু হিংসা, কর্তৃত্বপ্রকাশ, দলাদলি কমুক। সংঘ বাঁচে প্রেমে, বাড়েও প্রেমে, বুদ্ধির বলে বা সংখ্যার জোরে নয়।

(৩৪)

সাধন করিলে সকল দোষই দূর হয়। সংঘ বরং কাজ না করুক, জুহুঅনুবর্তীরা সাধন করুক। ইহা জরুরী কথা। সাধনহীন ব্যক্তিদের সংঘ আত্ম-কলহের আড্ডা হয়।

(৩৫)

শিথিল যাহার শ্রদ্ধা, মহৎ কর্মের কোনও বিপুল দায়িত্বের ব্যাপারে তাহার উপরে নির্ভর করিতে পার না। সাহায্য কর মানুষকে শ্রদ্ধাবান হইতে। শ্রদ্ধাবান হইলেই সংকল্পী হওয়া সম্ভব।

(৩৬)

পরনিন্দকেরা আসিলে কোন কাজটা করে জানো? তাহারা পরের

প্রতিধ্বনি

২৫৪

পথের সন্ধান

[৩ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

ঘাড়ে দোষ চাপাইবার নাম করিয়া জগৎসমক্ষে নিজেদের দোষগুলিই উদ্ঘাটিত করে। জানে না তাহারা যে কি করিতেছে। জানিলে বা এই কথাটা বুঝিলে তাহাদের রসনা অনেক আগেই স্তব্ধ হইয়া যাইত।

(৩৭)

যে কাজে বুঁকি আছে, সে কাজ খুব সম্তর্পিত হস্তে করিতে হয়। ঝোঁকের বশে ঝুঁকি লইও না। যথোচিত বিচার-বিবেচনার পরে বুঁকি লইবে। বুঁকি ছাড়া অনেক মহৎ কাজ করাই যায় না। এই কারণেই বুঁকি নিবার যোগ্যতা-সঞ্চয় প্রয়োজন।

(৩৮)

যার নিজের ভিতরে দোষ যত বেশী, সে অপরের দোষ তত বেশী করিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়। পরের দোষ খোঁজার ফলে নিজের দোষ বুঝি মানুষের চখে ঢাকা পড়িল, এইরূপই সে মনে মনে ভাবে। কিন্তু পরের দোষ দেখিতে দেখিতে গুণবান পুরুষেরও গুণ হ্রাস পায়, দোষবৃত্ত ব্যক্তির ত' কথাই নাই। দৃষ্টিকে অপরের দোষ হইতে ফিরাইয়া নিজের দিকে আন। নিজের দোষ সংশোধন কর। নিজেকে নিষ্পাপ কর, নির্মল কর, সুন্দর কর।

(৩৯)

অপাপবিদ্ধ শ্রীভগবানকে নিয়ত স্মরণ করিতে করিতে ভুলিও
অপাপবিদ্ধ হইবে। নিমেষের জন্ত তাঁহাকে ভুলিও না।

মাঘ, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

২৫৫

(৪০)

কেহ তোমার বিরুদ্ধবাদী থাকিলে তাহাকে প্রেমের দ্বারা জয় করিও, কটুক্তি দ্বারা নহে। কটুক্তি দ্বারা পরম বান্ধবেরও মনোভাব বিকৃত হইতে পারে। ইহার ফল শুভ নহে। সত্ব্তি দ্বারা শত্রুদেরও মনোভাব কখনো কখনো অন্তকুল হয়। ইহার ফল শুভ।

(৪১)

মানুষের দেহ পাইলাম, মস্তিষ্ক পাইলাম, মন পাইলাম, ঐতিহ্য পাইলাম, অথচ জগতের জন্ত কিছুই করিয়া যাইতে পারিলাম না, এই অনুশোচনা যেন আমাদের একজনকেও না করিতে হয়। মানুষজন্মের পূর্ণ সদ্যবহার করা চাই,—ইহাই প্রতি জনের পণ হউক।

(৪২)

বীজ বপনের আগেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। বীজ বপনের পরে ক্ষেত্রপ্রস্তুতির চেষ্টা অনেক সময়ে বৃথা বা পণ্ডশ্রম হয়। বীজ-বপনকেই বড় কথা মনে করিও না। ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে বিশেষ ভাবে যত্নবান হও।

(৪৩)

মানুষের মনের শুচিতা-বোধকে জাগাইয়া তোল কিন্তু শুচিবায়ু যেন না বাড়ে। পবিত্রতার সাধনা আর ছুৎমার্গ সমার্থবাচক নহে।

(৪৪)

সকলকেই সমাদর করিও। কিন্তু বিখ্যাস করিও কেবল বিখ্যাসের যোগ্য পাত্রকে, নির্ভর করিও সুপরীক্ষিত-চরিত্র ব্যক্তির উপর।

প্রতিধ্বনি

৯৫৬

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

(৪৫)

তোমার পরিচয় তোমার আচরণে। অতঃপর পরিচয়-পত্র দিয়া কি করিবে?

(৪৬)

যাহাকে সহকর্মী রূপে পাইবার তোমার আশা, তাহাকে তোমার আদর্শ সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত রাখিও না। তোমার আদর্শের বাণী সর্বত্র প্রচার কর। ইহার ফলে এমন অনেক নরনারী তোমার হাতে হাত মিলাইতে আসিবে, জীবনে যাহাদের সাহায্য ও সহযোগ কল্পনাও করিতে পার না। নিজে আদর্শনিষ্ঠ থাকিয়া আদর্শ প্রচার করিও। এইরূপ প্রচার অব্যর্থ ফলদায়ক হইয়া থাকে।

(৪৭)

শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবে অথচ গুরুর আদেশ-নির্দেশ মানিবে না, ইহা এক প্রকারের প্রভারণা। গুরুর আদেশ পালনে অনিচ্ছা থাকে ত' গুরুদেবকে স্পষ্ট জানাইয়া দাও যে, তুমি তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহ। ইহা দ্বারা সকল দিকের শুভ হইবে।

(৪৮)

শুচিশুদ্ধ-চরিত্রের ও উন্নত-রুচির লোকগুলিকে যদি তোমাদের সহকর্মীরূপে পাইতে চাহ, তাহা হইলে চতুর্দিকে কেবল উৎকৃষ্টতম চিন্তার বিকীরণ ঘটাও, প্রকৃষ্টতম আদর্শের বিকাশ চালাও। অন্য কল্পনায় নহে, সূচীসূক্ষ্ম শলাকা চালাইয়া মানুষের মনে প্রাণে উত্তাপ, উদ্বেজনা, উদ্দীপনা ও উৎসাহ জাগাও।

মাঘ, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

৯৫৭

(৪৯)

অশান্ত মনকে জোর করিয়া শান্ত করিবার অভ্যাস আয়ত্ত কর।
অশান্ত মনে কোনও মহৎ কার্য্য নির্ভুল ভাবে করা যায় না। এই জন্তই
মনের শান্তির প্রয়োজন। নিজের বলে যেখানে মনকে শান্ত করিতে
পারিবে না, সেখানে ভগবানের চরণে নির্ভর দ্বারা তাহাকে শান্ত করিবে।

(৫০)

চারিদিকের আবহাওয়া যতই প্রতিকূল হউক, তোমাকে তোমার
লক্ষ্যের পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের পুণ্য আদর্শ
কখনো ভুলিও না।

(৫১)

নামসম্বল লোভ ছাড়িয়া যখন বহু মানুষ সন্তুষ্টিতে একযোগে শ্রম
ও ত্যাগ স্বীকার করে, তখন কেবল উদ্দেশ্যই সংস্কৃত হয়, তাহা নহে,
জীবিকালের কর্ম্মজনের জন্ত ঐতিহ্যও সৃষ্টি হয়।

(৫২)

হাতে যন্ত্র পাইলে তবু কাজে লাগিবে না, ইহা মূঢ়তা। তোমরা
প্রতি জনে কাজে লাগিয়া যাও। মহাগ্রন্থকে যত্ন করিয়া শালুর কাপড়ে
বাঁধিয়া তাকে রাখিয়া দিলে বা সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিলেই কাজ
হয় না। তাহাকে পড়িতে হয়, তাহাকে পড়াইতে হয়। জমি পাইয়া
চাষ করিলে না। বীজ পাইয়া বপন করিলে না। হাতিয়ার পাইয়া
যুদ্ধ করিলে না। ইহা সঙ্গত নহে।

প্রতিধ্বনি

৯৫৮

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

(৫৩)

তোমরা প্রত্যেকে সম্ভাব-প্রচারের সৈনিক হও। রুগ্ন, বৃদ্ধ, দুর্বল, নারী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নগণ্য ও প্রভাবশালী নির্বিশেষে প্রতি জনে নিজ নিজ পরিচয়ের পরিধির মধ্যে কাজ শুরু করিয়া দাও। একটি দিনও বৃথা যাইতে দিও না। ক্রমশঃ পরিধি বাড়িবে।

(৫৪)

সাফল্য দেখিয়া ভাবিও না যে, কাজ শেষ হইয়া গেল। বরং কাজ এখানে আরম্ভ হইল। আরও অগ্রসর হইতে হইবে। ধামিয়া গেলে চলিবে না।

(৫৫)

নীচবে যাহারা কাজ করিল, তাহাদের কম প্রশংসা পাইবার কথা নহে। কিন্তু কেহই তাহাদিগকে প্রশংসা করে না। কিন্তু স্মৃতির বিষয় এই যে, তাহারা প্রশংসাকে গ্রাহ্য করে না। কর্ম্ম যাহাদের ব্রত, তাহারা নাম-বশের লোভ ছাড়িয়াই কাজ করিবে।

(৫৬)

যতই চলিবে, ততই তোমার পথ দিগন্ত-বিস্তারিত হইতে থাকিবে। অফুরন্ত তোমার পথ, চলিতে চলিতেই চতুর্দিকে অজস্র ধারায় পুণ্য ও কল্যাণ বিতরণ করিয়া চল। এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিও না। যতটুকু আগাইয়াছ, তার চেয়েও আগে তোমাকে যাইতে হইবে। ধামিবার অধিকার তোমার নাই।

বাং, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

২৫৯

(৫৭)

পথের সৃষ্টি তোমার পায়ে তলায় নয়, মনে। মন চলে তাই চরণ
 চলে। মনকে দিবারাত্রি কেবল সম্মুখের দিকে ঠেঁলিয়া নিয়া চল।
 মনকে পশ্চাদ্গামী হইতে দিও না।

(৫৮)

দীর্ঘ-শরীরে আধি-ব্যাধি নিয়তই থাকিবে। তাহা সত্ত্বেও তোমাকে
 অগ্রসর হইতে হইবে। সাময়িক শয্যায় পড়িয়াছ বলিয়াই তোমার
 যত্নগতিকে রুদ্ধ থাকিতে দিতে পার না। যখন শরীর কর্মে অক্ষম
 হইবে, তখন মনকে কাজে লাগাইয়া রাখিবে।

(৫৯)

অন্ন অন্ন শক্তি পৃথিবীতে কাহার না আছে? সকলের সকল শক্তি
 একত্র আহরণ করিয়া নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার যোগ্যতার
 নাই নেতৃত্ব।

(৬০)

ভগবানকে ভালবাস, ভগবানের জীবকে ভালবাস, ভগবানের
 পৃথিবীকে ভালবাস। এই ভালবাসাই তোমার ধর্ম হউক।

(৬১)

তোমরা বেশীক্ষণ বসিয়া জপ কর, অধিক সময় কীর্তন কর, ইহাই
 তোমাদের ধর্মবলের পরিচয় নহে। তোমরা মিথ্যা বর্জন করিয়াছ,
 পাপ হইতে দূরে সরিতেছ, পরের উপকারে অগ্রসর হইতেছ, ইহাই

প্রতিধ্বনি

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৯৬০

তোমাদের ধর্ম্যবলের প্রমাণ। তোমাদের জপ-ধ্যান, কীর্তন-উপাসনা
তোমাদের চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হউক।

(৬২)

ধর্ম্যে বিশ্বাস থাকিলেই চলিবে না, ধর্ম্যকে আচরণে রূপ দিতে
হইবে। মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই হইল না, মন্ত্রের সাধন করিতে হইবে।
কোনও পথ ভাল, একথা বুঝিলেই যথেষ্ট হইল না, সেই পথ অনুসরণ
করিতেও হইবে। বিশ্বাস ও অনুশীলন, সংস্কল্প গ্রহণ ও তদনুযায়ী
জীবন-পরিচালন, অন্তরের উপলব্ধি ও আচরণ এতদুভয়ের মধ্যে দূরত্ব
রাখা চলিবে না।

(৬৩)

বিপদের ভিতরেও সত্যকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা
করিতে হইবে। চেষ্টা সত্ত্বেও যদি সত্যভ্রংশ জন্মে, তবে তাতে দোষ কম
কিন্তু গোড়াতেই হাল ছাড়িয়া দেওয়া কাপুরুষের কাজ। বিপদ যদি
বাড়িয়াও যায়, তবু সত্যকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টার মধ্যে একটা দৃষ্টি
পৌরুষ আছে, যাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে নিয়ত আত্মপ্রসাদ।

(৬৪)

সম্পদের মধ্যে সত্যকে ধরিয়া রাখাও কম কঠিন নহে। সম্পদ
দেহমনের উত্তম স্বভাবকে শিথিল করে, চরিত্রের সতর্কতা নষ্ট করে
এবং এই জগতই বিনা কারণে অসত্যের আশ্রয়ে প্রয়োচনা দেয়। এই
কারণে সম্পৎকালেই অতিরিক্ত সাবধানতাব প্রয়োজন।

মাস, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

৯৬১

(৬৫)

আড়ম্বর কমাইয়া আনন্দ কিসে বাড়ান যায়, তাহার দিকে লক্ষ্য দাও। আড়ম্বর বাড়াইয়া আনন্দ লাভের যে প্রয়াস করিতেছ, তাহাতে আনন্দের মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে।

(৬৬)

তোমার আনন্দের ভাগ তুমি সকলকে দাও, সকলের আনন্দের ভাগ তুমি যতটা পার, কুড়াইয়া লও। ভোজ-সভায় নহে, অপরের উন্নতিতে তৃপ্তিবোধেই আনন্দের উৎস সহজে খুলিয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের উপভোগে নহে, ইন্দ্রিয় থাকিতেও অতীন্দ্রিয়ে, ভোগ্যবস্তু থাকিতেও ভোগাতীত তত্ত্বে, সসীম হইয়াও অসীমত্বে আনন্দের উপলব্ধি করিতে হইবে।

(৬৭)

নিজেকে সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিবার প্রয়াসের ভিতর দিয়া সকলকে সকলের সহিত মিলাইবার সুযোগ আসে। সকলের সহিত সকলের মিলনেই বিনা আয়াসে আনন্দ উপজাত হয়। যে মিলন ঘটনার্ধগন্ধহীন, সেই মিলনে আনন্দ তত গভীর।

(৬৮)

কণিক আনন্দে নহে, নিত্যানন্দে লক্ষ্য দাও। কণিকও নিত্যেরই অংশ, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। তাই ইহাতে মত্ত হইয়া বহির্গুথ হইও না। ভূমি তোমাকে অন্তর্গুথ করিবে, ফলে তোমার আত্মপরিচয় মিলিবে।

প্রতিধ্বনি

পথের সন্ধান

[১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৯৬২

(৬৯)

সত্য পথে চলা বড় শক্ত কাজ। কিন্তু শক্ত হইলেও সেই পথে আঁকড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা করিয়া বিফল হইলে সেই বিফলতাও কিছু না কিছু কুশলের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু চেষ্টা না করার ভিতরে কুশল কোথায় ?

(৭০)

অসত্যকারী ও অসত্যচারী ব্যক্তিদের সম্মান-সম্বর্দ্ধনা দিয়া নিজে অসত্যের অংশভাক্ করা হয়। অসত্যপথপ্রায়ীর সহিত অকারণন্দ সৃষ্টির তোমার প্রয়োজন নাই কিন্তু তাহাকে প্রশ্রয় দিবার পাণ্ডুর হইতে দূরে থাক।

(৭১)

মিথ্যাকে সত্যের মত প্রতীয়মান করিবার বাচ্চাতুখ্য অনেক থাকে কিন্তু তাহাতে মিথ্যা কখনো সত্য হইয়া যায় না।

(৭২)

সত্য ও মিথ্যা এক হিসাবে আপেক্ষিক সত্য বা আপেক্ষিক মিথ্যা। সকল সত্য ও সকল মিথ্যার উর্দ্ধদেশে নিজেই স্থাপন করিবার যোগ্যতা অর্জন কর। স্বরাট ও স্বাধীন হও। সকল পরাপেক্ষার অতীত হও। নির্বিকার নির্বিকল্প সত্তা হও।

(৭৩)

যেখানেই যখন যাও, লক্ষ্য রাখিও যেন, তোমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও

মাস, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

৯৬৩

বাক্যের ফলে চতুর্দিকে কেবল সচ্চিন্তারই প্রসার হইতে থাকে।
সচ্চিন্তাকে স্বর্ণখনির চেয়ে দামী বলিয়া জানিও।

(৭৪)

সকলে মিলিয়া চতুর্দিকে সচ্চিন্তার প্রসার সাধনে আত্মনিয়োগ কর।
কেবল খাইয়া, দাইয়া, চাকুরী করিয়া আর লোক খাটাইয়া অন্তরে শান্তি
আসে না। শান্তি আসে নিজেকে উন্নত মহান্ ভাবের মধ্যে নিমজ্জিত
করিয়া রাখিবার সফল চেষ্টার মধ্যে।

(৭৫)

চেষ্টা তোমার বিফলও হইতে পারে কিন্তু সৎচেষ্টার নিজস্বই একটা
বুণ আছে। সৎচেষ্টা অধিকাংশ সময়েই তাহার নিজ দাবীতে নিজ
অধিকারে সফল হয়। সৎচেষ্টা কখনো কখনো দারুণ সংগ্রামের
মধ্য দিয়া জয়ী হয়। সৎচেষ্টা কখনো কখনো বিফলও হয়।
সাকল্য বৈফল্য বাহাই ঘটুক, সচ্চিন্তা নিজেই সম্ভ্রান্ত, নিজেই কুলীন
নিজেই অতুলন আতিজাভ্যের মহিমা উন্নত।

(৭৬)

ঈশ্বর-বিশ্বাস আর অব্যবস্থিত-চিন্ততা এক সঙ্গে চলিতে পারে না।
বারংবার যখন মতি-পরিপূর্তন ঘটিতেছে, তখন জানিবে, তোমার ঈশ্বর-
বিশ্বাস নাই। ঈশ্বরে সর্বহীন দ্বিধাহীন বন্দহীন বিশ্বাস স্থাপনের জন্য
আপকে পণ কর। ঈশ্বর-বিশ্বাস আসিল কি তুমি বিশ্বজয়ী হইলে,
তোমার আর কোথাও হারিবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র ঈশ্বর-বিশ্বাস
নাচকেই জীবনের চূড়ান্ত উন্নতি বলিয়া গণ্য-কর। ভালবাস ঈশ্বর-

প্রতিধ্বনি

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৯৬৪

বিশ্বাসীদিগকে, শ্রদ্ধা কর তাহাদিগকে, পূজা কর তাহাদের পবন-নির্ভরশীলতাকে।

(৭৭)

দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিও না। কর্তব্যপালনে সাহস সংগ্রহ কর। শুধু সাহসী হইবে কেন, দৃঃসাহসী হও। সর্বশক্তি লইয়া নিজের যোগ্যতা বর্দ্ধন কর। তোমার ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে চারিদিকে সকলের মধ্যে সংক্রামিত কর। সহস্র যোগ্য ব্যক্তি মিলিয়া একটি মহাশক্তিতে পরিণত হও। একে অপরকে খাটো করিবার জ্ঞান নহে। বড় করিবার জ্ঞান যত্ববান হও। নিজের সাফল্যকে সকলের সাফল্যে পরিণত কর। সকলের একাগ্র হিতৈষণাকে তোমার কর্মশক্তির সহিত সংযুক্ত কর।

(৭৮)

দায়িত্বের মহত্ত্ব এবং কর্তব্যের বৃহত্ত্ব সম্পর্কে তোমাদের ধারণা বহু অস্পষ্ট থাকিবে, কঠোরতার জাগৃতি ঘটিতে তত বিলম্ব হইবে। যাহারা সংশয়বাদী, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না। তাহাদের চোপার মুখে কাপড় চাপিয়া ধর। অতি ভাবী ব্যক্তিরা কেবল নিজেকে জাহির করিবার জ্ঞানই হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করিতেছে। ইহাদের উপর হইতে আস্থা তুলিয়া লও। ইহারা জনহীন সভামঞ্চের বক্তা হউক। ইহাদের মুখনিঃসৃত অপদার্থ ভাষণ গলাধঃকরণ করিবার জ্ঞান ভিড় করিও না।

(৭৯)

কাহাকেও লুকা করিও না, নিজেও কাহারো লোভে পড়িও না। লাভ-লোভের উর্দ্ধে থাকিয়া কর্তব্য-পালনের চেষ্টা কর। নিজের

মাঘ, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

১৬৫

প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্তু যে লোভ, তাহাই দোষের। দেশের বা মানব-
জাতির গৌরব বর্দ্ধনের যে লিপ্সা, তাহা দোষের নহে।

(৮০)

ভাষা তোমার স্বচ্ছ হউক, তোমার অন্তরের সুন্দরতম ভাব যেন
স্বাভাবিক ভিতর দিয়া দেখা যায়। ভাবে আর ভাষায় যেখানে পূর্ণ মিল,
বিধের সহিত তোমারও সেখানে পূর্ণ মিল।

(৮১)

সর্বশক্তি লইয়া ভিতরের বার্কিক্য দূর কর। নিজেকে চিরনবীন
স্রিয়োবনশালী বলিয়া অনুভব কর। সকল দুর্বলতা পরিহার কর।

(৮২)

অবসাদ আসে সাধনের অভাব হইতে। তোমরা তোমাদের নিত্য-
বোধ সাধনের বলে জাগরিত কর।

(৮৩)

তোমাদের এক এক জনের ভিতরে হাজার হাজার লোকের মনকে
সংগৃহীত টানিয়া আনিবার শক্তি হউক। সাধন কর, সাধন করিয়া শক্তি
সংগ্রহ কর। সাধনেই শক্তি আসে, কেবল উচ্চাকাঙ্ক্ষাতে নহে।

(৮৪)

তোমরা প্রতি জনে সত্য চিন্তার, সত্য ধর্মের, সত্য জীবনের
প্রতিনিধি হও। চারিদিকে ধর্মের বল, কর্মের প্রভাব, প্রেমের
সমাপ বিকীর্ণ কর।

প্রতিধ্বনি

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৯৬৬

(৮৫)

সাহস এবং ঐক্য ব্যতীত কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। কোনও স্থানেই না। চালাকী আর কপটতা বাঁচিয়া থাকিবার সাহায্য করে না। সকলে সাহসী হও আর প্রেমিক হও।

(৮৬)

সহৃদ্ষেণে যেই ব্যক্তি প্রতিভার পরিচালনা করে, তাহার কাহ্ন হইতে কেহই সুযোগ কাড়িয়া নিতে পারে না।

(৮৭)

সর্বদা পচ্ছিত্তায় মগ্ন থাকিও। সচ্ছিত্তা অতিশয় সুন্দর সংকল্প।

(৮৮)

পিতার সচ্ছিত্তা ও সদনুশীলনকে পুত্র যেই সমাজে সহজে অনুসরণ করিতে পারে, আমি বলিব, সেই সমাজই শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে স্থায়ী কল্যাণের পথবর্ত্তিনী করিতে পারিয়াছে। স্বামীর সংস্কারকে যে সংসারে পত্নী সর্বতোভাবে পোষণ ও পরিরক্ষণ করিয়া চলিতে সক্ষম, আমি বলিব, সেই সংসারই দিব্য-জীবন লাভের সহজ সোপান।

(৮৯)

লোকে খুঁজিতেছে, কোথায় ভগবান আছেন, কোন্ বস্তুরে আছেন। আমি খুঁজিতেছি, কোথায় তিনি নাই, কোন্ বস্তুরে নাই। লোকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইতেছে, পাইতেছে না। আমি তাঁহা ছাড়া কোন্ বস্তু আছে, খুঁজিয়া তাহা পাইতেছি না। আমি তাঁহাকে সর্বত্র দেখিতেছি, সর্বত্র পাইতেছি। এমন কি ভয়ঙ্করী বিভীষিকা,

রাধ, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

১৬৭

নিদারূপ অসম্মান, প্রাণাত্যয়কারিণী বিপত্তি, সব-কিছুতে তিনিই
 আছেন, অতঃ সব এই আছে, এই নাই। নিয়ত চলিতেছে বলিয়াই
 রূপংকে ধরিতে পারিতেছ না, তিনি নিত্য বলিয়াই তাঁহাকে ছাড়িতে
 পারিতেছি না।

(১০)

সদ্ভাব আসিলে তাহাকে স্থায়ী করিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা
 করিও। একই ভাব বারংবার আসিলে বারংবারই তাহাকে সাদর
 সম্বরণ দিবে। ভাবের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা করিবে।
 ব্রহ্মচর্যা পালন সদ্ভাবের স্থায়িত্ব প্রদান করে, একথা কখনো ভুলিও
 না। সদ্ভাব মহাশক্তির আধার। সদ্ভাবের সঙ্গ মহাশক্তিরই
 সঙ্গ। সত্যজীবন লাভ করিতে হইলে এই কথাটি মনে রাখিতে
 হইবে।

(১১)

জগতে কাহার কি অভিসন্ধি, বুঝিয়া ওঠ। কষ্টকর ব্যাপার।
 কখনো কখনো বুঝা অসাধ্য। অপরের অভিসন্ধি যাহাই থাকুক,
 তোমার উদ্দেশ্য যেন সর্বদাই সৎ থাকে।

(১২)

অনধিকারীকে উত্তমাদিকার প্রদান করিলে কখনো কখনো সে
 তাহার পদমর্যাদার অসম্মান করে, উচ্চ স্থানে থাকিয়াও নীচ কর্মে
 মন দেয়। শুধু এই যুক্তিতেই নিম্নস্থানাধিকারীর উন্নতি অবরুদ্ধ
 করিতে পার না। যে যাহাতে উত্তম হইতে পারে না, তাহার জন্য
 তাহাকে সর্বতোষিক্রমে সাহায্য কর।

প্রতিধ্বনি

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৯৬৮

(৯৩)

ভগবদ্বিশ্বাসের বলে জগতে সকল অসাধ্য সুসাধ্য হইতে পারে। ভগবানের চরণে কায়মনোবাক্যে প্রণত হও। তাঁহার নিকটে নিয়ন্ত ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের আকুলতা, আত্মাহুতির যোগ্যতা প্রার্থনা কর।

(৯৪)

দেশের দূরত্বকে দূরত্ব বলিয়া ভ্রম করিও না। প্রাণের দূরত্বই প্রকৃত বিচ্ছেদ। প্রাণে প্রাণে তোমরা এক হইয়া যাও। এই একত্ব বোধের প্রতাপে একের জন্ত অপরে অনায়াসে আত্মোৎসর্গ কর। যে যাহার জন্ত সর্বস্ব দিতে পারে, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে পারে, সেই ত প্রকৃত প্রেমিক।

(৯৫)

যাহাদিগকে অপরিচিত বলিয়া মনে করিতেছ, স্বচ্ছ চিন্তার দ্বারা আকর্ষণে তাহাদের সহিত তোমার অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপিত হইবে। পরিচয় পরিচয় সর্বতোভাবে, চয় মানে সংগ্রহ, আকর্ষণ, সংগৃহ। পরিচয় কথার প্রকৃত মানে হইতেছে একজনকে সর্বতোভাবে আপন করিয়া লওয়া। লোক-দেখান পরিচয় নহে, প্রাণ-মজান পরিচয় তোমাকে করিতে হইবে।

(৯৬)

প্রতিটি শুভকর্মে সজ্জনদের সমুৎসাহ কামনা করিবে। সাধুজনের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। পরহিতকারী মহাপ্রাণ পুরুষদের আমন্ত্রণ

মাঘ, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

৯৬৯

করিবে। ইহাতে শুভকর্ষ্ম শুভতর, মঙ্গলতর, কল্যাণতর হইবে।
মূলের সৌন্দর্য্যই বথেষ্ট, তাই বলিয়া কি তাহাতে সৌরভ কাহারও
অকামনীয়?

(৯৬)

প্রতিদিন মানুষ নূতন করিয়া জীবনের আনন্দ গ্রহণ করিতেছে।
এই আনন্দনে যাহাতে পূর্ণতা আসে, তাহার দিকে রাখিও স্মৃতিষ্ক
হৃদে। একটি ইন্দ্রিয়ের তুচ্ছ সুখ যখন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সুখোৎপাদন করে,
একটি ক্ষুদ্র তৃপ্তি যখন প্রতি অণুপরমাণুতে সুখের প্লাবন ঘটায়, তখন
তুমি তোমার অজানিতে অতিক্রম্যের পথে পদসঞ্চার করিতেছ,
মানিবে। তোমার জীবনে বিশ্বের জীবন জাগ্রত, তোমার তৃপ্তিতে
বিশ্ব পরিতৃপ্ত হউক।

(৯৮)

দুর্যোগ যেমন ভয়ঙ্কর, তাহার পরবর্ত্তী শান্ত অবস্থায় সুযোগ
যেমন অকুরন্ত। দুর্যোগে যাহারা হাহাকার করিতেছিল, এখন
তাহাদিগকে প্রবলতর বিক্রমে স্থায়ী মঙ্গল ও প্রকৃত সম্পদ আহরণে
উৎসাহ দাও। দুর্যোগ একদিকে যেমন মানুষের সহিত মানুষের
নিচ্ছেদ রচনা করিয়াছিল, অত্ৰদিকে মানুষের সহিত মানুষের মনের
দিলনকে সহজতরও করিয়াছে। দুর্যোগ কেবলই দুর্যোগ নহে, যে
দাগ চিনে, তাহার নিকটে সুযোগও বটে। সকল ভ্রাতৃদ্রোহকে
এখন ভ্রাতৃপ্রেমে রূপান্তরিত করিতে লাগিয়া যাও। দ্রোহ, ঘের,
হিংসা ও আঘাত সত্য নহে, প্রেমই সত্য বস্তু।

প্রতিধ্বনি

অভ্যর্থনা-ভাষণ

[১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

৯৭০

(৯৯)

কাজের কাজ কিছুই করিবে না বা করিলে অতি অনুল্লেখ্য কাজ করিবে, কিন্তু হা-হতাশ করিবে গগন বিদীর্ণ করিয়া, পবন কপিত করিয়া। ইহা কাজের লোকের লক্ষণ নহে। প্রতিটি পুরুষ ও নারী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সত্যিকার কাজে সুনিশ্চিত রূপে এবং পরিচ্ছন্নভাবে নিয়োগ করিতে উদ্বৃত্ত হও। কেবল কথা, কেবল পরিকল্পনা, কেবল অবাস্তব বিষয়ে মনোনিবেশ কোনও কাজে আসিবে না।

অভ্যর্থনা-ভাষণ *

পরমশ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয়, প্রধান অতিথি মহোদয়, সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সুহৃদ-মণ্ডলী,

আপনাদের শুভাগমনে শিলচর অখণ্ড-মণ্ডলীর সেবকবৃন্দ আশা সকলেই পরম আপ্যায়িত এবং অনুগৃহীত। আপনারা আমাদের কৃতজ্ঞ অন্তরের সশ্রদ্ধ সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করুন। জানি, যে মহৎ প্রেরণাবশে নিজেদের মূল্যবান সময় ব্যয় করিয়াও এখানে উপস্থিত হইয়া আপনারা আমাদের ধন্য করিয়াছেন, সেই অন্তর-প্রেরণার মহত্ব আমাদের সকল দোষ ত্রুটিকে আপনাদের স্নেহাবলিষ্ঠ এবং ক্ষমা-সুন্দর করিয়া তুলিবে।

* ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭, ২০শে নবেম্বর, ১৯৬০ ইং রবিবার কাছাড় জেলা অখণ্ড অভ্যর্থনা প্রতিনিধি সম্মেলনে শিলচর অখণ্ডমণ্ডলীর সভাপতি শ্রীদ্বিজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত অভ্যর্থনা ভাষণ।

মার্চ, ১৩৬৭]

অভ্যর্থনা-ভাষণ

প্রতিধ্বনি

১৩৭১

আমাদের প্রতিনিধি-সম্মেলনগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোনও অবস্থাতেই ইহাদিগকে আমরা খাটো করিয়া দেখিতে পারি না। আমাদের কাছে It is a gain throughout, a gain after all. বোগ-বান্ধি রামায়ণে প্রতিনিধি-সম্মেলনকে কুম্ভযোগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে উক্ত আছে,—

“মচ্চিন্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ !
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মানুপযাস্তি তে।”

অর্থাৎ,

“মন প্রাণ যারা মোরে করে সমর্পণ
তাহারা আমার গুণ করিয়া কীর্তন
আমার অমৃতময় তত্ত্ব-কথা যত
পরম্পরে বুঝাইয়া তৃপ্তি পায় কত।
সদাযুক্ত ভক্তে আমি দেই হেন জ্ঞান
হৃদয় আমায় যাতে অনায়াসে পান।”

অগণ-মণ্ডলেখর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব মণ্ডলী-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

“মণ্ডলীং স্থাপয়িত্বা চ মত্রেত গুরু-বিগ্রহম্,
আনুগত্যঞ্চ তস্যোং হি জানিয়াদ্ গুরু-সেবনম্।”

অর্থাৎ, মণ্ডলী স্থাপন করিয়া সেই মণ্ডলীকে গুরু-বিগ্রহ বলিয়া মাত্ৰ
করিবে এবং মণ্ডলীর আনুগত্যকে গুরু-সেবা বলিয়া জানিবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রতিনিধি-সম্মেলনে যোগদান করাকে আমরা যেন ভীর্থ-যাত্রার সমান পুণ্য-কর্ম্য বলিয়া জ্ঞান করি।

আমাদের প্রতিনিধি-সম্মেলনগুলিকে এই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বিচার করিতে হইবে। ইহা একটা সামুলী সম্মেলন নয়,—ইহা ধর্ম-সম্মেলন। ইহাতে মণ্ডলীদেহের ক্ষীণ রক্ত-স্রোতে তরঙ্গের প্রবাহ খেলে।

কিন্তু, বিচারে আমরা প্রায়শঃই ভুল করি। একরূপ কথাও বলিতে কুঠা বোধ করি না যে, প্রতিনিধি-সম্মেলনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়, অগ্রভাবে ব্যয়িত হইলে তাহা সার্থক হইত। ইহা দ্বারা আমাদের চিন্তার দৈর্ঘ্যই প্রকটিত হইতেছে, যেহেতু, আমাদের যাবতীয় কর্মের প্রেরণাকেই আমরা একরূপ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রাণবন্ত করিয়া তুলি। অত্র কথায়, আমাদের অভিক্ষা-মন্ত্রের স্থায়ী এবং সুদূরপ্রসারী কর্মধারার ইহাই হইল মূল উৎস। আমরা যদি ভুলিয়া না যাই যে, আমরা কাহারো এবং কাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতেছি, তাহা হইলেই আমাদের যাবতীয় চিন্তাধারা নিভুল-পথে পরিচালিত হইবে।

অখণ্ড-মণ্ডলেখর বর্তমান জগতের অপূর্ব বিস্ময়। তিনি যে বাণী, যে আদর্শ প্রচারিত করিয়া যাইতেছেন, ভাবী কালের তাহাই হইবে অলান্ত-দিগ্‌দর্শন। আমরা দৃষ্টতঃ তাহার ধারক এবং বাহক হইলেও কার্যতঃ কতটুকু, একথা বিচার করিবার উপযুক্ত সময় এখনই। স্বরূপানন্দ-সন্তান বলিয়া আমাদের মধ্যে একটা আভিজাত্য বা কৌলীন্য-বোধ স্পষ্ট। কিন্তু গুণহীন কৌলীন্যের বড়াই করিয়া শূন্তে মৌখ-নির্মাণের পরিকল্পনা হাস্যাম্পদ। স্বরূপানন্দের পর আমাদের মণ্ডলী-সমূহের কি গতি হইবে, কি ভাবে চলিবে, এ নিয়া আমাদের ভাবনার অন্ত নাই! কিন্তু পুণ্য নরদেহে তাঁহার জীবন্ত উপস্থিতির কালে আমরা

শ্রাব, ১৩৬৭]

অভ্যর্থনা-ভাষণ

প্রতিধ্বনি

২৭৩

কে কি করিতেছি আর না করিতেছি, সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি কৈ ?
আমার কেবলি বলিতে ইচ্ছা হয়,—

শ্রবণ রয়েছে তবু তোমার সে ডাক নাহি শুনি,
রয়েছে নয়ন তবু দেখে নাহি দেখি,
জাগিয়া রয়েছি হায় মোহাচ্ছন্ন তন্দ্রাতুর হয়ে
জাগ্রতের সেই ঘুম কভু ভাঙ্গিবে কি ?
আপনার ইষ্ট-চিন্তা জগতের কল্যাণের তরে
এক করি মিশাইয়া উৎসর্গিয়া প্রাণ,
প্রতি পলে আপনারে তিলে তিলে করিতেছে ক্ষয়,
বিফল কি দধীচির এই আত্মদান ?

আমরা কি করিতেছি ? সাধকের সন্তানদের সে সাধনা কৈ,
ত্যাগীর সন্তানদের সে ত্যাগ কৈ, কর্ম্মীর সন্তানদের সে কর্ম্মশ্রমণা কৈ, কৈ
আমাদের সেই গুরু-আনুগত্য,—যাহা দ্বারা আমরা প্রকৃতই সন্তানত্বের
দাবী করিতে পারি ? শ্রীশ্রীবাবামণি তাই বুঝি বলিয়াছেন,—

“লক্ষ লক্ষ পুত্র যার, সে-ও অপুত্রক,
পুত্র যদি নাহি হয় ধর্ম্মের রক্ষক।”

আমি প্রসঙ্গক্রমে একটু আত্মবিশ্লেষণ করিতে চাই। আমাদের
ত্রুপ বিশাল অখণ্ড-সমাজের একমাত্র মুখপত্র “প্রতিধ্বনি”র কয়জন
আমরা গ্রাহক ? যে কোনও কার্যো, তাহা যত ক্ষুদ্রই হউক, অথবা যত
বিশালই হউক, আমাদের সম্মিলিত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা কৈ ? পারস্পরিক
সহযোগ কৈ, অন্ততঃ সহানুভূতির স্পর্শটুকুই বা কৈ ? পরন্তু, ওদাসীত্ব
স্বাচ্ছন্দ্য এবং আত্ম-গোপনের প্রয়াসই বহুক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় !

এমতও দেখা যায় যে,—সত্যিকার যাহারা কর্ম্মী, আমাদের ব্যবহারে তাহারা উৎসাহী না হইয়া হতবল হইয়া যাইতেছেন। আমাদের গুরু-আনুগত্যও অনুরূপই। যে সমবেত-উপাসনাকে শ্রীশ্রীবাবামণি তাহার প্রাণাধিক প্রিয় অনুষ্ঠান বলিয়া বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন, সেই সমবেত উপাসনাতে আমরা নিয়মিত যোগদান করি কি? সমবেত উপাসনা, হরি-ও কীর্ত্তন ও অখণ্ড-সংহিতার পঠন-পাঠন, এই তিনটি কার্য্যইত মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার মূখ্য উদ্দেশ্য। সংস্কৃতকে রাষ্ট্র-ভাষা করার জন্ত শ্রীশ্রীবাবামণিরই প্রেরণায় শ্রদ্ধেয় চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় লোকসভাতে যে বিল আনয়ন করিয়াছেন, তাহার সমর্থন-সূচক পত্র প্রেরণের জন্ত “প্রতিধ্বনি”তে মাসের পর মাস শ্রীশ্রীবাবামণি যে নির্দেশ দিয়া যাইতেছেন, আমি অতি সঙ্গতভাবেই জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি যে, আমাদের কয়জন তাহাতে সাড়া দিয়াছি? মঙ্গল-বাঁধ পরি-কল্পনা অভিক্ষু-সন্ন্যাসীর স্বাবলম্বন-সাধনার ভিত্তি-ভূমি। একথা আমাদের কাহারও আজ অজানা থাকিবার কথা নয়। ইহাতে যদি আমাদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগ, সামর্থ্যানুযায়ী সহযোগ, ধার্ম-বাহিক সহযোগ থাকিত, এতদিনেও কি উহা অসমাপ্তই থাকিয়া যায়? মঙ্গল-বাঁধ ত আমাদের সমাজ-হিতকর কর্ম্মের সূচনামাত্র—আর ইহাতেই আমরা হিম্-সিম্ খাইয়া গেলাম?

তাই সর্ব্বাঙ্গে আজ চাই আমাদের আত্মগঠনের সাধনা। অখণ্ড-মণ্ডলীসমূহের সংগঠন-সম্পর্কে তাড়াহুড়া না করিয়া আমাদের যাহা আশু করণীয়, তাহাই আমরা করিয়া যাইব, স্বাভাবিকভাবেই সং-সংগতি হইবে। মাসেক দিন আগে এ সম্পর্কে শ্রীশ্রীবাবামণি যাহা বলিয়াছেন, আপনাদের অবগতির জন্য তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন,—“তোমরা সুদূর কালের দিকে তাকাইয়া কাজ করিয়া

মাস, ১৩৬৭]

অভ্যর্থনা-ভাষণ

প্রতিধ্বনি

১৭৫

নাও। আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি, ততদিন আমিই যেন তোমাদের কেন্দ্র থাকি, অথবা কোনও কেন্দ্রের কথা তোমরা ভাবিও না বাবারা।” তাঁহার কথার মর্মার্থ আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তিনি সর্বদাই নির্দেশ দিয়া আসিতেছেন,—“যেখানেই তোমরা ২৩ জন অথবা দুই, সেখানেই একটি করিয়া মণ্ডলী স্থাপন কর।” মণ্ডলীর কেন্দ্র শ্রীশ্রীবাবামণিই থাকিবেন। কিন্তু যেখানেই সম্ভব, নূতন মণ্ডলী স্থাপনে প্রচেষ্টা কৈ ?

আমি আমাদের গোটাকয়েক সমস্তার কথা উল্লেখ করিলাম, যাপনাদের কাছে সমাধানের উপায় পাওয়া যাইবে বলিয়া। আমার ঈচ্ছা আপনারা মার্জনা করিবেন।

পরিশেষে পরমপিতা শ্রীশ্রীবাবামণির রাতুল-চরণে এই নিবেদন জানাইয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব যে, আমাদের আজিকার এই সম্মেলন যেন সার্থক হয়। বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, হয়তঃ কত অনস্বিধা বরণ করিয়াও বাঁহারা এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া আমাদের ধন্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টাই যেন ফলপ্রসূ হয়।

আপনাদিগকে আমার পুনরভিবাধন নিবেদন করি।

শিলচর

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রতিধ্বনি

৯৭৬

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

অখণ্ড-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল।

কি কি বিষয়বস্তু তাহাতে আছে, সঙ্গীয় সূচীপত্র দেখিলেই বুঝিবেন। মূল্য চারি টাকা।

ষষ্ঠ খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
অখণ্ডদের সমবেত উপাসনা	১০৩	অতীতের প্রতিহিংসা	৪০৪
অখণ্ডনাম কি বস্তু	২২২	অনাথের আশ্রয়	২৫২
অখণ্ডনামের অর্থ	২২১	অনামা ব্যক্তিদের নিষ্ঠা	৮৪
অখণ্ডের আহারীয় নির্ণয়	৫৭	অনাসক্ত কর্মযোগ	৪৪৪
অখণ্ডের শিষ্য-সংগ্রহ	৪৪	অনাসক্ত শ্রম	২৪১
অগ্নিদহন	৩৮৬	অনিচ্ছায় ধর্ষিতা কুমারীর	
অগ্রসর হও পুত্র	৩১৩	বিবাহ	৩২৩
অজ্ঞাত ব্যক্তিকে গুরু		অনিত্যকে নিত্য কর	৩১৬
করিও না	৫২	অনিত্য জীবনকে নিত্য কর	২২৫
অজ্ঞানের প্রেম হয় না	৭৩	অনিত্য জীবনকে সার্থক কর	১৪৪
অটল বিশ্বাসের মূল্য	৩৫	অনিত্যের ভিতর দিয়া	
অতপস্বীর বিচারে প্রমাদ		নিত্যানুসন্ধান	৪৪৭
ধাকে	১০৩	অনুক্ষণ ভগবানের নাম	৩৪৪
অতিথি-সেবা	৩১০	অনুতাপের পাপত্ব ও পুণ্যত্ব	২৪৩
অতীতকে অতীতের গর্ভেই		অত্মায়কে অত্মায় বলিয়া	
থাকিতে দাও	২৪১	ভাবিতে শিখ	৯৩
অতীত ভারত পুনরাবিভূত			২৭৫
হও	১৬৫	অধ্যবসায় ও ব্রহ্মচর্য্য	২২০
অতীতের জগদগুরু ভারতবর্ষ	৯০	অপধর্ম্ম ও অপকর্ম্ম	

ষাধ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

/০১

(অথগু-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
দুপরের প্রলোভন বর্জিত করিও না	৯৬	আত্মদানের দৃঢ়তা	২৪৬
দুর্গ ও হীনাজ সব।	৮১	আত্মহত্যা ও সংবাদ-পত্র	৩৬৯
দরিদ্র্য নাম কর	৩২২	আত্মহত্যা নিষ্প্রয়োজন	৩৬২
দরিদ্র্যের শাস্তি নাই	৩০৯	আত্মহত্যার নিষ্ফলতা	৩৬৩
দ্বৈধ নারী-সঙ্গ-লিপ্সুর		আত্মহত্যা-রোগ ও নরহত্যা- রোগ	৩৬৯
মন ফিরাইবার উপায়	১৯২	আত্মগুপ্তি ও পরোপকার	৩৩
দুঃখভাবকদের আত্ম-		আত্মার মৃত্যু নাই	৪০০
সংশোধনের আবশ্যিকতা	২২৩	আত্মীয়তার বাড়াবাড়ি	৬৫
দুঃখের শক্তি	১৩২	আদর্শের অবিস্মরণ	১৫২
ভিক্ষা ও কষ্টসহিষ্ণুতা	৪৪৫	আদর্শের পূজায় দুঃখবরণ	৩১৩
দুর্গতিবোধনং পুংসাম	৪০৭	আধার পবিত্র কর	১৮৬
দুঃখ উপবাস	২৮২	আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার ব্যর্থতা	২৬২
দুঃখ বিবাহ	৩৯৮	আপদস্বপ্ন	৩৬৮
দুঃখপ্রদায়িক সম্প্রদায়	১৮১	আমিষ ও ব্যায়াম	৫৮
দুঃখের পূর্বসংস্কারের কর্তৃত্ব		আমিষ নিরামিষের কলহ	৫৮
দুঃখ ভগবৎ-সাধনের শক্তি	২৭৭	আসক্তিই দুঃখের জননী	৪৫৪
দুঃখিকর জনরব	৩৬৫	আসক্তি কমাও	৩৭৫
দুঃখের আশঙ্কা	৩৮৮	আসল ভালবাসা	২২
দুঃখের কথা ভাব	৩৭৪	আসল যোগ	১৪৮
দুঃখ বে বুঝে নাই, কাল		আশার বাণী	৩১৮
মে বুঝিবে	১৭০	আশীর্বাদ করি বারংবার	৪৩৭
দুঃখগঠনের আবশ্যিকতা	২৬১		

৯০

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

(অথও-সংহিতা বর্ষ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
আশ্রম-জীবন কাহার পক্ষে		উপবাসের উপকারিতা	২৮২
গ্রহণীয়	২৩৮	উপদেশ দাও—“মানুষ হও”	৪১১
আহারীয়ের সাম্বিকতা,		উপযোগিতাই খাতাখাতের	
রাজসিকতা ও ভামসিকতা	৫৬	নির্ণায়ক	১০
আহার্য্য বস্তুতে প্রসাদ জ্ঞান	১৮৩	উপাসক অনিত্য নহেন	৩৭২
ইটের পাজা সাজান	৪২০	উপাসনা-কালে স্পর্শবর্জন	৪২
ইতিহাসের শিক্ষা	৩২৯	উপাসনার বস্তু	৩৮১
ইষ্টক নির্মাণ আরম্ভ	৩৬৫	উপাসনার সময় ও আসন	৪১
ঈশ্বর আছেন	৩০৯	উপেক্ষনাথ ঘোষ	৩৪৯
ঈশ্বর-নির্ভরের মূল	১৯০	একক সাধন ও সমবেত সাধন	২০
ঈশ্বর-নির্ভরের স্বরূপ	১৮৯	এক ছাড়া দুই নাই	২৩৪
ঈশ্বর-বিশ্বাস ও আত্ম-বিশ্বাস	৩০৭	একটি ইন্দ্রিয়ের প্রশ্নে	
ঈশ্বর-বিশ্বাস ও জগৎ-কল্যাণ	৩১০	সকল ইন্দ্রিয়ের প্রশ্নে	১৮২
ঈশ্বর সর্বব্যাপী	৫১	একনিষ্ঠা	৮৭
ঈশ্বর-সাধনায় একনিষ্ঠার স্থান	৪৫০	একনিষ্ঠা ও সময়ের	
ঈশ্বরানুরাগের শক্তি	৮৩	রূপবৈচিত্র্য	২৩৭
উচ্চ হওয়া কঠিন কিছুই নয়	৪১৫	এক ব্যক্তির দুই জীবন লক্ষ্য	২৪
উৎকৃষ্ট তথা নিকৃষ্ট শিক্ষা	৯৮	এক সঙ্গে চল	২২৫
উদ্দেশ্য-বিশ্বস্তির কুফল	২৬৬	ওঙ্কারই সর্বমন্ত্রের প্রাণ	৮৩
উপদেশদাতা ও উপদেশ-		ওঙ্কার জপকালে রূপধান	৮৩
শ্রোতা	৩০১	ওঙ্কার পরমেশ্বরেরই নাম	২১১
উপবাসকে পূর্ণফলদায়ী		ওঙ্কার মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র	২৭
করিবার উপায়	২৮৩	ওঁ জগন্মঙ্গলোহং	

মাস, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

১০

(অথগু-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
কল্যাসাগরের বক্তৃতা	৮৯	কুমারীকে বিবাহ দেওয়া	
কর্ম ও তপস্যা	৪২০	কর্তব্য	৩২৪
কর্ম-শক্তি বনাম কল্লনা-শক্তি	১৪৮	কুমারী-দর্শনে যুবকের কর্তব্য	২০৯
কর্মীর বোগমূর্তি ও বোগীর		কুমারীদের প্রতি অন্ত্রায়	
কর্ম্মমূর্তি	২৮৫	আদর	৪০৩
কলহ-প্রবৃত্তি ও চরিত্র-গঠন	২৭৫	কুমারীদের প্রতি যুবকদের	
কলিকাতা বলিতে কি		ব্যবহার	৪০২
বুঝায় ?	২৪৯	কুমারী মেয়ের সম্পর্কে	
কলিতে কি সন্ন্যাস নাই ?	২৫৩	সতর্কতা	২২৯
কল্লকর মূলে জল দাও	৪৫২	কুমারীর সংসারানভিজ্ঞতা	৪০১
কাজ করিতে করিতে		কৃষিকার্যের উপকারিতা	২৪
উপদেশদান	২৮১	কৈশোরই মানবজীবনের উষা	১১
কাজের সময়ে কথা বলা	৪১৬	কৈশোরের স্বপ্ন	৩২
কাজের হিসাব নাও	৪৪৭	কোথায় থাকা উচিত নয়	২৩
কামদমন ও নাম-সমুদ্র মহন	১০৮	কোদাল মারিয়াও ধ্যান-ভজন	২৮৪
কামদমনের উপায়	৩৪২	কোন কর্ম্মের কোন্ ফল ?	২২৬
কামশাস্তির উপায়	১১৮	কোন্ ধর্ম্ম বড় ?	৪১২
কামেক্রিয়-সংঘমে কড়াকড়ি		কোন্ মন্ত্র জপনীয় ?	৩২০
কেন ?	৫৯	ক্রোধ কখন ভাল ?	৩৪০
কালীবাড়ীর বক্তৃতা	২০৫	ক্রোধ দমনের উপায়	৩৪১
কিশোর মনে ব্রহ্মচর্যের সংস্কার	১২	ক্ষিপ্তকারিতা ও ভগবৎ-	
কীর্তনের ভাব ও ব্যৱহারিক		সাধনা	৪৩১
জীবনের সাধুতা	৭২		

(অখণ্ড-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
ক্ষুদ্র কর্তব্যে দৃঢ় হও	৩৫	চিত্তের পূজামুখিনী প্রবৃত্তি	৩৩০
খাঁটি উপদেশ-গুরু	৫৩	চিত্তের প্রচ্ছন্ন বাসনা দমনে	
খাঁটি ভালবাসা লাভ		ভগবৎ-সাধনা	২৭৯
করিবার উপায়	৩৪২	চিত্র-প্রদর্শন	৩৩৬
গায়ের জোরে সংযম	২৩৫	চিত্তার মৌলিকত্ব	১৯
গীতা সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজনীন		চিত্তা-সংযমের উপায়	২৮০
ধর্মগ্রন্থ	২৭১	চিত্তার স্থানিক শক্তি	১৪৬
গুরু আর সদগুরু	৩৭২	চিরকৌমাৰ্য্য কখন সহজ ?	২৫১
গুরু ও মন্ত্র-ত্যাগেব ক্ষেত্র	১৩৬	চুক্তির দান ও ত্যাগী	৪২২
গুরু-নির্ণয়ের স্বাধীনতা	৩৮	ছাত্রগণই ভবিষ্যৎ ভারতের	
গুরু-মুত্তিধান	৫০	নির্মাতা	৯০
গৃহ-মুদ্রাদি অভ্যাসের সুফল	৪৬	ছেলেদের ঠাকুর	২২০
গ্রাম্য যোগী ভিক্ষা পায় না	২৩১	জগতে কেহই পর নহে	৩৯৩
চট্টগ্রাম অবস্থানের আহ্বান	৪২৪	জগতের পবিত্রতম ধ্বনি	৮৬
চতুর্দিকে গুপ্তঘাতক	৩৭১	জগতের মঙ্গলকে লক্ষ্য রাখ	১৫৬
চরিত্র-আন্দোলন বনাম		জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প	৪৭
রাষ্ট্রীয় আন্দোলন	১৯৭	জননেতা কামিনীকুমার	৩৫৬
চরিত্র-আন্দোলনের		জননেতা ধীরেন্দ্র চন্দ্র	৩৫৫
আবশ্যিকতা	২১৩	জনপ্রিয়তার বিপদ	৩৩৫
চরিত্র-গঠন ও কর্মপদ্ধতি	৩৮৪	জনরবের ধর্ম	৩৬৬
চরিত্রহীন বন্ধুকে বিশ্বাস	১৯৮	জনরবের প্রতি কর্তব্য	৩৬৬
চালাকী নহে, চরিত্র-বল	৪৪৩	জাতি-গঠনে কল্পনার শক্তি	১৪৭
চিত্তশুদ্ধির উপায়	২২৭		

মাঘ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

১/০

(অখণ্ড-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
জাতীয় জীবন ও জাতীয়		তত্ত্বমসি	২৪৩
শিক্ষা	১২৩	তপস্বী হও, দুঃখ দূরে বাইবে	২৮৪
জাতীয় বলবর্ধনে তপস্তার		তপস্বী হও, সাধক হও	৩৭৬
শক্তি	১৪০	তপস্তা বিফল হয় না	১০৭
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী হনুমান্	৩৮৬	তরুণ বয়স ও আধ্যাত্মিক	
ঈদ-কল্যাণের দুইটি পন্থা	২৬৪	সাধন	৪৯
জীবন ও তপস্তা	৪৪৪	তর্কের মরুক্ষেত্র ও যুক্তির	
জীবন ও মৃত্যুর প্রতি		যুদ্ধ	২৭৪
সম্ভাব	৩৬৩	তুমি মোহের, না মোহ	
জীবনকে মহৎ করার উপায়	৪১৩	তোমার	১৩০
জীবন গঠনের ইঙ্গিত	১৬১	তুমি শক্তিশূন্য নও	২১৮
জীবন-পথে প্রলোভন	৯৩	তোমরা দেবী হও	২৯৬
জীবনের প্রধান কাজ	২৫৭	তোমরাই ভগবতী	১৮৫
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন	৩২১	ত্যাগই ঋষিত্ব	২০৮
জোর করিয়া চাপান		ত্যাগই জাতীয় আদর্শ	৪৫৩
চির-কোমার্য	২৫২	ত্যাগই দেবত্ব	১৫১
জ্ঞান, ভক্তি ও কন্ম		ত্যাগী হও	১৫২
পরম্পর বিরোধী নহে	২৭১	দরিদ্রের বিপ্লব ও তার	
জানী, ভক্ত ও কন্মীর		প্রতীকার	৪৫২
পার্থক্য কোথায় ?	২৭২	দল রাধিয়া অনুভূতি হয় না	২৭৩
জৈকীর শব্দে ভগবানের		দল-বুদ্ধির অনিষ্টকারিতা	২৬৭
নাম	৩২২		
জ্ঞান ও কন্মমূল	২৩৫		

১৮০

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

(অখণ্ড-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
দল-বুদ্ধির চেষ্টা ও		দবীত্ব বিকাশে যত্নশীলা হও	১৭৭
সাম্প্রদায়িক বিরোধ	১০২	দেবী-নারী ও দানবী-নারী	১৭৬
দল-বুদ্ধির নির্দোষ উপায়	২৬৭	দেশের কাজ ও চরিত্র-গঠন	৫৮৩
দলাদলির স্বরূপ	১৮০	ধর্মক দিয়া স্বমতে আনয়ন	৩০২
দশদিকে মন দিও না	১৩৫	ধর্ম-সম্ব ও অরাজনৈতিকতা	৪৫৫
দাও গো মোরে পাগল ক'রে	১৮৮	ধর্ম, সমাজ ও পরিবারের	
দাতার প্রকার-ভেদ	৪২৩	মূল্য নির্ণয়	১৫৩
দাম্পত্য জীবনে পবিত্রতার		ধর্মিতা কুমারীর বিবাহ	৩২৬
প্রতিষ্ঠা	৪৩০	ধার্মিক হওয়াই জগতের	
দাম্পত্য পবিত্রতার দৃষ্টান্ত	২৫৮	শান্তির মূল	৩৩২
দায়ে পড়িয়া ঈশ্বর-নির্ভর	১৯০	ধার্মিকের লক্ষণ	৩৩৩
দ্বিবিধ দেবী-প্রতিমা	২৬১	ধ্যান-জপের সর্বোৎকৃষ্ট সময়	১৫
দীক্ষা ও জগৎ-কল্যাণ	১৪৫	নকল ভালবাসা	২২
দীক্ষা-গ্রহণের উদ্দেশ্য	৩৩৯	নববিবাহিতার ভগবৎ-সাধনা	৬৩
দীক্ষাদাতাকে গুরু মনে		নবীনগরের বস্তু তা	১২৪
করা নিশ্চয়োজ্ঞানীয়	২৯২	না জানিয়া প্রতিজ্ঞা	৩৬৪
দীক্ষা দিবার রোগ	২৯১	নামই একমাত্র সত্য	২১৫
দীক্ষা ব্যতীত নাম-জপ	৭	নামই তোমার সর্বস্ব হউক	১৬৩
দীক্ষার অপব্যবহার	৩১৪	নামই প্রকৃত কৃষিক্ষেত্র	১৬২
দীক্ষার মানে	৩০৫	নামই প্রকৃত প্রণয়িনী	১৬৮
“দীক্ষাহীন নামজপ” কথার		নামই সদগুরু	৩৮২
মানে	৮	নামকেই অবলম্বন কর	৩৯০
হই নোকার পা	২০৪		

শাখা, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

১৮০

(অখণ্ড-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
নামকে প্রাণবান্ করিবার উপায়	২৩৬	নারীর সতীত্ব-মহিমা	৮২
নামজপাদির উদ্দেশ্য	৩২১	নারীর সতীত্ব রক্ষা	৪৩৪
নামে ডুবিয়া যাও	৩১২	নারীর সতীত্বের সহিত সমাজের সম্বন্ধ	২০১
নামে বিশ্বাস	৪৩২	নারীর স্বাধীনতা-স্পৃহা ও সতীত্বহীনতা	২০২
নামের ধ্যান	২৫৭	নিঃশব্দ কর্ম্মোৎসাহ	৪৩৩
নামে নিষ্ঠা	৯	নিজ আচরণে পিতামাতার দৃষ্টিদৈত্ব	১৫৪
নামের মহিমা	৩৪৪	নিজেকে বিশ্বাস কর	২৩৩
নামের সঙ্গই প্রকৃত সংসঙ্গ	১০৪	নিজের কর্তব্যে মগ্ন থাক	৮৪
নামের সহিত প্রাণ বাঁধ	১১৯	নিজের মত চালাইতে চেষ্টা করিও না	৩০১
নামের সেবা ও প্রতিভার উন্মেষণ	৪৪৬	নিজের মনের দিকে তাকাও	৬৬
নারী-আন্দোলনে চরিত্রহীন পুরুষদের সংযোগ	২০৩	নিদ্রা ও মোহজয়ের উপায়	৩২৩
নারীই জগৎকে জাগাইবে	১৭৩	নিত্যের উপাসনা ও নিত্য উপাসনা	৩৮১
নারী জাগরণের বাঁধা	১৭৪	নিত্যের উপাসনায় অনিত্যের সাহায্য গ্রহণ	৩৮২
নারী মঙ্গলের জন্তও পুরুষের চরিত্র-সাধনার দরকার	২০৪	নিরুৎসাহ হইও না	৩৬০
নারী-মন্দির	১৪৫	নির্বিরোধ পরোপকার	৩৪
নারীর দৃঢ়তার আবশ্যকতা	৩২৬	নির্ভয় হও	৩৫
নারীর দেবীত্ব বিকাশের উপায়	১৭৭		
নারীর পতনে সমাজের ক্ষতি	২৩১		

(অথও-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
নিষ্কলঙ্কা কুমারীকে যোন-		পরিশ্রম ও তপস্শ্রা	৩১১
জ্ঞান প্রদান	১৮	পাপ দমনের কোমল পন্থা	২৪৮
নিষ্কাম কর্ম ও তপঃকাম		পাপ ব্রত ও পুণ্য ব্রত	৩২৫
কর্ম	২৯৪	পাপ হইতে উদ্ধারের পথ	২৪৮
নিষ্কাম জীব-হিতৈষণা	৩০০	পাপীরও উদ্ধারের পথ আছে	২৪০
নীরব সাধনা	৩৭৬	পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যস্বাবী	৪০৫
নৈশ অভিযান	৩৬৭	পাপের বিরুদ্ধে খড়্গাহস্ত	
পতন ঘটয়া থাকিলেও		হও	২১৭
আবার দাঁড়াও	৯৫	পার্থিব স্বার্থলোভে মত্ত গ্রহণ	৩৩৮
পতিতার উদ্ধার	৩১৮	পাশ্চাত্য সভ্যতার পতনের	
পথ-প্রদর্শকের অভাব নাই	১৫৪	মূল কোথায়	৯৭
পবিত্র কর বংশ	৬৮	পুরুষের প্রতি নারীর কর্তব্য	১৭৮
পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার		পুরুষ-সংশ্রবের ঝোঁক	১৮
উপায়	২২৮	পুণিমা-সম্মিলনী	১০১
পবিত্রতা আর মাতৃ	১৪১	প্রকৃত অনুতাপ চাই	৩১৮
পবিত্রতা ও ঈশ্বর-বিশ্বাস	৩০৭	প্রকৃত গুরু-বাদ	১৩৭
পবিত্রতার তপস্শ্রা	১৬২	প্রকৃত গুরু-বাদ কি ?	৪৩
পবিত্র হও, পবিত্র কর	১৮৭	প্রচলিত গুরু-বাদের বিপত্তি	১৩৭
পবিত্র হওয়া যায়	১৮৬	প্রতিকোপাসনা বনাম	
পর-কুশলচিন্তার সুফল	৩৪	পৌত্তলিকতা	৮৭
পরমতে বিশেষ প্রচার		প্রবর্তক সাধক ও বিধি-নিষেধ	৫৫
করিও না	৩০২	প্রভাত-ভবনে আগমন	৩৭৫
পরহিতার্থে আত্ম-সংশোধন	৬৩		

মাঘ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

১/০

(অখণ্ড-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রভাব কিভাবে সৃষ্ট হয় ?	২৯৮	বহু মন্ত্রীর বিড়ম্বনা	১৩৪
প্রয়োজন মত ক্রোধ কর	৩৪১	বহু রূপী ভগবান	২৯৩
প্রলোভন ও বিশ্বাসের শক্তি	৯২	বাক্-সংঘম ও চিন্তার সংঘম	২৮৩
প্রলোভন হইতে দূরে থাক	৩১৯	বাক্-সংঘমের বিভিন্ন স্তর	১৮৪
প্রলোভনে আত্মানুসন্ধান	৯৪	বাক্সালী ও অবাক্সালার মিলন	৪১৮
প্রলোভনে পড়া ও অধঃপতিত হওয়া	৯৪	বারংবার মন্ত্র পরিবর্তন	৮৫
প্রলোভনের ভাল দিক	৯৫	বার্দ্ধক্যের উৎসাহ	৪০৭
প্রশম্য ভয় ও অপ্রশম্য ভয়	২৯৩	বালকেরাই দেশের ভবিষ্যৎ	২২১
প্রাণবন্ত নামের লক্ষণ	২৩৭	বাহিরের ভান কমাও	১০৯
প্রাণহীন নামজপ	২৩৬	বিশ্বসঙ্কুল পরিস্থিতিতে	
প্রিয়জন প্রাণে থাকেন	৩৯	মোনব্রত	৪২৪
প্রেমিক ও সন্ন্যাসী	২৫৫	বিচার্জন ও ধর্মার্জন	৩৬
প্রেমিক সন্ন্যাসী	২৫৬	বিচার্খীর নীতি আত্ম-গঠন-নীতি	১৬০
প্রেমিক হও, হঃখ দূরে		বিপজ্জনক সেবা	৮২
যাইবে	২৮৪	বিপৎত্রাণের প্রার্থনা	৩৭
বংশের ছেলের জয়	৩৫৮	বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্ণয়	২৬
বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ	৫৪	বিশ্বাসই যথার্থ বল	৩০৭
বয়ঃ পুত্রকন্টার পিতামাতার		বিশ্বাস কর	৩৩
দায়িত্ব	২১৫	বিশ্বাসীর সঙ্গ	৩০৮
বর্তমানের অধঃপতিত ভারতবর্ষ	৯১	বিশ্বাসের কর্মক্ষেত্র	৩০৮
বহুনিষ্ঠার ভাল-মন্দ	৪৫১	বিশ্বাসের শক্তি	২৪১-৩০৬
বহু গুরুর বিপত্তি	৫০	বীজ, ভূমি ও যন্ত্র	২৫

১৮/০

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

(অখণ্ড-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
বীর হও	১৫২	ব্রহ্মদর্শীর আলোচনা, সঙ্কল্প, উদ্ভব	
বৃহস্পতি সম্মেলনী	১০০	ও সিদ্ধি	৪৮
বেদনায় ফোটে ফুলহার	২০৮	ব্রহ্মানন্দী আশ্র-ভোলাদের প্রতি	
বাভিচার-প্রশ্রয়ী ধর্মমতকে নির্মূল		কৃতজ্ঞ হও	২৩৩
করিবার পরোক্ষ কৌশল	১০৬	ব্রহ্মানন্দ আশ্বাদন ও ব্রহ্মানন্দ	
ব্যাধির ভিতরে লুক্কায়িত মঙ্গল	৩৮৫	বিতরণ	২৩৩
ব্রতচ্যুতির উপদেশ	৩২৪	ভগবৎপ্রেম ও সাধন	৪২১
ব্রতত্যাগ বনাম প্রাণত্যাগ	৩২৪	ভগবৎসাধন ও দাম্পত্য জীবনে	
ব্রতরক্ষা ও নিবিদ্বেষভাব	৩২৫	সংযম	২৮০
ব্রহ্মই গুরু	৪২	ভগবৎসাধনা ও মানসিক	
ব্রহ্মগায়ত্রী ও ব্রাহ্মণত্বে অধিকার	৪৪	শুদ্ধতা	৪২৮
ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের		ভগবদ্ভক্ত শক্তির সদ্যবহার	২১৮
মূল মন্ত্র	৯১	ভগবানই একমাত্র নিত্যবস্তু	৩১১
ব্রহ্মচর্য্যই মহাবলের উৎস	১১০	ভগবানই তোমার গুরু	২৩১
ব্রহ্মচর্য্যই যৌবনের শক্তি	১৭৩	ভগবানই তোমাদের সব	২৩৩
ব্রহ্মচর্য্যই সকল আধ্যাত্মিকতার		ভগবানই ভালবাসার পাত্র	২৩৭
মূল	৪০১	ভগবানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়	৩২১
ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্	৪০০	ভগবানের কাজে আশ্রদান	
ব্রহ্মচর্য্য থাকিলে বাঙ্গালী আরো		কর	২৮৩
বড় হইত	১২১	ভগবানের দীনবন্ধু মূর্তি	২৪০
ব্রহ্মচর্য্য মহাযোগ	৪৪৫	ভগবানের দৃষ্টিতে সকল	
ব্রহ্মচর্য্য শক্তির আকর	৪৩৯	ধর্ম্মাবলম্বীই সমান	৪১০
		ভগবানের নামই প্রকৃত গুরু	১৬৭

মাঘ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

৯৮০

(অথও-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভগবানের নামই প্রকৃত পিতা	১৬৭	ভালবাসা সঞ্চারের উপায়	২৩৮
ভগবানের নামই প্রকৃত		ভীত হইও না, ভয় দেখাইও	
প্রণয়িনী	১৬৮	না	৬৭
ভগবানের নামই প্রকৃত বন্ধু	১৬৮	ভ্রান্তকে ভ্রমমুক্ত কর	১৯৩
ভগবানের নামই প্রকৃত মাতা	১৬৭	মধু ও ভ্রমর	৩৯১
ভবিষ্যতের দিকে তাকাও	২৪২	মন ও ভ্রমর	২৩৫
ভয় নিবারণের উপায়	২৯২	মনশ্চাক্ষল্য প্রশমনে নামের	
ভয়ের পলায়ন ও প্রেমের		সাধনা	৪২৮
পলায়ন	২৩	মন্ত্র-দীক্ষা না দিবার স্থল	৭০
ভাবকে জমাট করিয়া প্রভাব		মন্ত্র না দিলেও শিষ্য হয়	৪০৮
সৃষ্টি কর	৩০০	মন্ত্র না নিয়ে দীক্ষা	২১০
ভাবের চক্ষু ও চর্ম-চক্ষু	৭৫	মন্ত্রবাণী লেখা	৪২০
ভাবের দিকে লক্ষ্য কর	৭৩	মহাদাদর্শের শক্তি	২৪৪
ভাবুকতা ও ভাবপ্রবণতা	১৭৯	মহাভাবে ডুবিয়া যাও	২৯৮
ভারত তপস্তার শক্তিতে		মহিলা-কর্মীর আবশ্যিকতা	২১
বিশ্বাসী	২০৭	মাঝিয়ারার অভ্যর্থনা	১৫৮
ভারতবর্ষের ত্যাগ-সাধনা		মাঝিয়ারা মহিলা-সভায়	
বংশানুক্রমিক	১৬৪	বক্তৃতা	২১৬
ভারতীয় জীবনের আদর্শ	১৬৪	মাৎস্য জয়ের পথ	৩৪৩
ভারতের আদর্শ ত্যাগ ও		মাতা-পিতা ও শিক্ষা	২৬
সংঘর্ষ	৪৩০	মাতৃ প্রকাশের সীমা-রেখা	১৫
ভারতের নবজন্ম	২৪৪	মাতৃপিতৃ-ভক্তি ও নৈতিক-	
ভারতেও রাজনৈতিক		চরিত্র	১৫৪
আন্দোলন অবশ্যস্তাবা	১৫৭		

(অখণ্ড-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
মাতৃভাবের নামে বাড়াবাড়ি ও গোপনতা	১৬	মৃত্যুর স্বরূপ	৩৬১
মাতৃভাবে সান্ত্বনা ও সেবা	১৬	মেয়েদের আত্মবিশ্লেষণ	১৭
মাতৃ-সম্বোধনের মহিমা	৬৬	মেয়েদের মধ্যে পবিত্রতা-	
মাতৃস্নেহের শক্তি	৭২	আন্দোলন পরিচালনার জ্ঞ	
মানব-জীবনের দেবত্ব	১৫০	কর্নিগী প্রয়োজন	১২৪
মানুষ কে ?	১৪২	মেয়ে বিবাহের তাড়না ও	
মানুষ চাই	১৪৩-৩৪২	স্ত্রীশিক্ষা	২৬০
মানুষ-চাষের প্রতিকূলতা	২৭	মোচাগড়া আশ্রমের	
মানুষ হও	৪১১	উদ্বোধনোৎসব	৩৪৬
মানুষের চাষ	২৭	মোচাগড়ায় নারী-মন্দির	১৪৫
মানুষের লক্ষণ	৪১১	মোহের মূল	১৩১
মিথ্যা মাতৃভাবের লক্ষণ	১৬	মৌনব্রতকে পূর্ণ ফলদায়ী	
মিথ্যা মাতৃভাবের শাসন	১৫	করিবার উপায়	২৮৬
মুসলিম যুবকদের মধ্য হইতে		মৌন-রহস্য	৪৫৬
পাপাচার নির্বাসন	১১২	মৌন সম্মিলনী	৪৩৬
মৃত্যু অবধারিত	৬৭	যজ্ঞ হও	৩৭
মৃত্যু ও পবিত্র জীবন	৩৬০	যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান	
মৃত্যু না নূতন দেশ দেখা	৩৭৩	সৃষ্টির প্রেরণা	২৬৩
মৃত্যু-ভয়ের কারণ	৩৬১	যথার্থ স্বামি-সেবা	২২৬
মৃত্যুর অর্থ জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ	৪১৪	যুবক-যুবতীর দীর্ঘকাল একত্রে	
মৃত্যুর জ্ঞ তৈরী থাকা	৩৫২-৩৭৩	বাস	৩২০
		যুবক-যুবতীদের মিশ্রণে বিপদ	
		সঙ্কেত	৬৫

মাঘ, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

৮/০

(অথও-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
বৃক্কের যুবকত্ব কোথায়	১৭২	শকুনির চীৎকারে কান	
বৃক্কেরাই দেশের আশা	১২৮	দিও না	৩২৩
যোগই প্রধান, কৰ্ম্ম অপ্রধান	৪২১	শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করা	১৮৫
যোগ-সাধনা অতি সহজ	৫৩	শরণাগত ও অভেদত্ব	১৬২
যৌবনের জাগরণ	৩১	শিক্ষাগুরু কি শিখাইবেন?	৩২৪
যৌবন বিষম কাল	২২২-৩১৯	শিশু বালিকার প্রতি লম্পটের	
যৌবনের পরিচয়	৩১-২০৬	অত্যাচার নিবারণের উপায়	১৯১
যৌবনের সদ্যবহার	৪০৭	শিষ্যের স্বাধীনতা ও গুরু	২৭৬
যুগীন্দের উপরে ভারতের		শুদ্ধ চিন্তা উপহার দাও	৩৬
দাবী	২১৬	শেষরাত্রে অধ্যয়ন	৩৭৭-৪৪৩
যশোজয় বনাম ইন্দ্রিয়জয়	১৮৩	শ্বাস-প্রশ্বাসে ইষ্ট-স্মরণ	২৮৮
রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের		শ্বাস-প্রশ্বাসের দৌত্য	২৮৮
উৎপত্তি	১৫৭	শ্বাস-প্রশ্বাসের বিরতি	২৮৯
বাক্যকল্পপূরের বক্তৃত্তা	১৪৯	শ্রামগ্রামের শোভাযাত্রা ও	
রূপজলোচন মজুমদার	৩৫১	বক্তৃত্তা	১৭১
যোগাযোগের জন্ত মন্ত্রদান	৬৯	শ্রীশ্রীবাবামণির অন্তরের	
মক্কালাভকল্পে যোগ্যতা অর্জন	৩০	লুক্কায়িত আকাজক্ষা	৩৭০
শিশুশ্রমে ধ্যান	৮৫	শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দেব জীবন-চরিত	২৩২
শোভা ও বাচালতা দূর করিবার		সংবাদপত্র ও নারীধর্ষণ	৩৭০
উপায়	৩৪৩	সংঘমই ভগবানকে পাইবার	
শোভা-সংঘম ও বাক্-সংঘম	২৮২	সহজ পথ	২৩৪
		সংঘমী কে	২১০

৮০/০

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

০ (অথও-সংহিতা বর্ষ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
সংসারী গৃহস্থের গৃহই দেবশালা ২৬০		সত্যের নির্দ্বার অমৃতভূত ২৭৩	
সংসারের ফল ও ব্রতরক্ষা ৩২৪		সদা-সন্দিগ্ধতার দোষ ২৩০	
সংসার ত্যাগ না মোহ ত্যাগ ১৩১		সমগ্র জগৎ পবিত্র হোক ৪০৬	
সংসার-মোহ দূর করার উপায় ৩৪৫		সধবার সিন্দুর ধারণের	
সংসার যদি টানে হে ৩৪৪		উপযোগিতা ২২০	
সংসার শুধু সংই নহে ৩১৫		সনাতন ধর্ম ও সনাতন জীবন ২৬৭	
সংসারাসক্তি ও দুঃখ ১২২		সন্তানের জীবনগঠনে	
সংসারী সধবার ধর্মসাধনা ১১১		পিতামাতার কৃতিত্ব ১৪৩	
সংসারের দোটানা ও		সন্তানের দৃষ্টি ও পিতৃমাতৃ-	
পরমাত্মার নাম ১৩০		চরিত্রের ক্রটি ১৫৫	
সকল আত্মার আত্মীয় হও ৩০৬		সন্দিগ্ধকে বিশ্বাস দাও ২৪০	
সকলের আপন হও ১৫৭		সন্ন্যাস-সংস্কারের আবশ্যকতা	
সকামতাই দুঃখের মূল ২৪৬		কি ২৫১	
সঙ্কল্পপূর্বক জীব-কল্যাণের		সন্ন্যাসী অবজ্ঞার বস্তু নয় ৪৫	
ক্ষেত্র ও পাত্র ২৬৫		সন্ন্যাসীর দার-পরিগ্রহ ৩৩	
সংসার প্রভাব ৪৩৯		সন্ন্যাসীর সংখ্যাযুদ্ধির কারণ ২৫২	
সম্ভবন্ধ সাধু ও এককথ্যানীর		সন্ন্যাসের অবস্থালেভে চেষ্টিত	
জগৎ সেবায় পার্থক্য ২৬৭		হওয়া দরকার ২৫৬	
সতীত্ব-সংস্কারের মূল		সবার উপরে মানুষ সত্য ৪০৮	
কোথায় ? ১৩৫		সভাপতির কর্তব্য ৩২৮	
সত্যনিষ্ঠা ও সমাজের উন্নতি ১৩৮		সমদীক্ষিতের ভ্রাতৃত্ববোধের	
সত্যপালন ও ইন্দ্রিয়সংযম ২২৩		অভাব পক্ষিতার লক্ষণ ৩৭০	
সত্যের জয় ৪৪৮			

সং. ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

৫২/০

(অখণ্ড-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
সম্বন্ধিত ব্যক্তিদের মধ্যে		সাধারণতঃ পুরুষেরাই	
ভ্রাতৃত্ববোধ	৩৩৯	মেয়েদিগকে অসতী করে	২০০
সমবেত উপাসনা মুসলমানদের		সাধিকা মেয়ের প্রয়োজন	২০
অনুকরণ নহে	১০২	সাধিয়া প্রলোভনে যাওয়া	৯৫-৩১৮
সমবেত উপাসনার সাঙ্খ্যিকতা	১০২	সাধুর ভানও সময়ে হিতকর	
সমাজের আত্মবিশ্লেষণ	৩৯৮		হয় ৭৬
সমাজের ক্ষমালীলতা	৩৯৭	সামনের দিকেই চল	২৪২
সমাজ-সংস্কার অবশ্যস্বাভাবী		সাম্প্রদায়িক উদারতার	
ব্যাপার	১২৫	আবশ্যিকতা	৩৪৮
সমাজ-সংস্কারের শ্রেষ্ঠ উপায়	১২৮	সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে জীবনকে	
সমাজ-সংস্কারের সাফল্যের		স্থাপন কর	১৪৩
পরিচয়	১২৬	সাম্প্রদায়িকতার অটুটহাশু	৩৩৬
সমাজ-সংস্কার কাম্য নহে	১২	সাম্প্রদায়িকতার মূল কোথায়	৩৫৭
সমাজের উন্নতির লক্ষণ	৫৫	সাম্প্রদায়িক বিবেকের ভবিষ্যৎ	৪০৬
সম্প্রদায় বিস্তারের যথার্থ		সাম্প্রদায়িক বিরোধ দূরের	
কৌশল	১০৫	উপায়	৩০৩
সর্বদ্বন্দ্ব সংঘম	২১১	সার অন্বেষণ কর	৩১৫
সর্ব ব্রহ্মসং জগৎ	৩০৩	সাহিত্য ও তপশ্চ	৪১৮
স-সঙ্কল জীবকল্যাণের উদ্দেশ্য	২৬৫	সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৩৫২
সদায় উপাসনার নিন্দা কেন ?	৩১২	সুস্থ সমাজের লক্ষণ	১২৭
সাপেক্ষ কবি ভারত রায়	১৭০	সেবকের চক্ষে সম্প্রদায়-ভেদ	
সাপেক্ষের বাক্য	৪১	নাই	৩৩৪

প্রতিধ্বনি-বিজ্ঞাপন

[৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

(অখণ্ড-সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
সেবকের প্রধান প্রয়োজন		স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ	১১
সহানুভূতির	৭৮	স্থানত্যাগের অনুরোধ	৩৮
সেবা ও অহমিকা	৮১	স্বপ্ন, বাস্তব ও কল্পনা	২৩১
সেবা কাহাকে বলে	৭৭	স্বার্থলোভে দীক্ষার মনোবৃত্তি	৩৩৩
সেবার প্রকার-ভেদ	৮০	স্বামি-পরিত্যক্তা সধবার	
সেবার প্রাণ	৭৮	জীবন-সমস্যা	২১৯
সেবাশ্রম কাহাকে বলে	৭৯	স্বামী ও স্ত্রীর প্রকৃত সম্বন্ধ	২০১
স্ত্রীজাতির প্রতি সন্ত্রমবোধ	৬৪	স্বৈচ্ছায় ধর্ষিতা কুমারীর	
স্ত্রীরোগের কারণ ও প্রতীকার	৭১	বিবাহ	৩৬১
স্ত্রীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও		হও মা ভারত-শ্মশানে	
সর্বজনীন আগ্রহ	২৬২	মৃতসঞ্জীবনী স্বরূপিনী	১৫১
স্ত্রীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি ও		হয় ভগবান হও, নয় ভগবানের	
স্রষ্টা	২৫০	হও	২৫৭

ভ্রম-সংশোধন

অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় শ্রীঅনুপম সেন মহাশয় লিখিত “সেবা” প্রবন্ধে অযাচক আশ্রমের আয় সম্পর্কে ৭১৬ পৃষ্ঠায় যে সকল অঙ্ক ছাপা হইয়াছে, তাহা মুদ্রাকর-প্রমাদ। ইহা সঠিক সংখ্যা নহে এবং যে সংখ্যা পাণ্ডুলিপিতে ছিল, ছাপিবার কালে তাহার ওলটপালট হইয়াছে। প্রঃ সঃ

প্রতিধ্বনি

(মাসিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৬৭ { ১১শ সংখ্যা

মূর্ছনা *

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব]

(২৭)

বহুজন থাকে বছরে লইয়া মাতি'।

হে এক! তুমি যে

আমার নিত্য-সাথী ॥

বহু দেবতায় বহু প্রতিমায়

রুচি যে নাই

একের মাঝারে কোটি বিশ্বের

মিলন পাই ;

* "মূর্ছনা" ২০ নং গান "মনের কথাটি" প্রতিধ্বনি মাঘ সংখ্যায় ৮১৪ পৃষ্ঠায় নীচ হইতে ৯ম পংক্তি এবং উপর হইতে ১৫শ পংক্তিতে ভুল ছাপা হইয়াছে। "দিতে নিঙাড়িয়া" স্থলে "চাহে দিতে নিঙাড়িয়া" হইবে।

প্রতিধ্বনি

মূর্ছনা

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

৯৭৮

এক মোর পথ, এক মোর রথ,
 এক মতি, এক গতি,—
 এক মোর লাগি' নিখিল ভুবনে
 রাখিয়াছে কোল পাতি' ॥

একের মাঝারে ডুবিয়া যাইতে চাই,
 এক নিয়া আমি চির-দিবা-রামী
 সুখে কাটাই,
 একের মহিমা, একের গরিমা,
 একের অনিমা, একের লঘিমা,
 অসীম একের কোটি কোটি সীমা
 একেই পাই,
 বিচিত্র এই সৃষ্টির মাঝে
 এক নাম, এক জাতি ॥
 (২৮)

যেদিন তোমারে

একের মাঝারে পেলু,
 সেদিন তোমার নানা মূর্তির
 বহুতা ভুলিয়া গেহু ॥

এক নিয়া মোর সুরু হ'ল পথ,
 একেই ডুবিল যত মনোরথ,
 কাণ পাতি' আমি শুনিলাম শুধু
 একেরি মোহন বেণু ॥

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

মূর্ছনা

প্রতিধ্বনি

২৭২

প্রতি ইন্দ্রিয়ে সহস্র রস
 করিলু আশ্বাদন,
 একটা নামেই হাজার পরশ,
 হাজার উন্মাদন,
 পাখর-কাঁকর হ'য়ে গেল ফুল
 সোরভে আর বর্ণে অতুল,
 ধূলি-মুঠি ধরি—তাই হয়ে গেল
 নিখাদ স্বর্ণ-রেণু ॥

(২৯)

ধৃত আমি, হে পুণ্যনাম,
 পেলাম দরশন ।

সংশয় সন্দেহ আদির
 ঘটল নিরসন ॥

একের মাঝে নিখিল তত্ত্ব,
 অতীত ভবিষ্যতের সত্য,
 এক নিমেষে মধুর হেসে
 হ'ল উদ্ঘাটন,
 ভাবতে গেলে অবাক লাগে,
 অঘটা-ঘটন ॥

সকাল সন্ধ্যা দুপুর নিশীথ,
 গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ কি শীত,
 সকল সময় একটা নামের
 পীষুষ আশ্বাদন,

প্রতিধ্বনি

৯৮০

মৃচ্ছনা

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

আমার সাথে লক্ষ পরাণ

আনন্দে মগন ॥

(৩০)

একরে কেন করিলি হেলা,

দশেতে দিয়া মন,

জীবন কি রে শিশুর খেলা ?

অযতনের ধন ?

ভুলিয়া যা রে হাজার জনে,

একরে ধরু প্রাণে ও মনে ;

যাহারে নিয়া সফল হবি,

তাঁহারি শ্রীচরণ

হাজার-বাতি জ্বালি' আরতি

করিয়া নে বরণ ॥

যা-কিছু আছে একরে দিয়া

জমা রে নেশা একরে নিয়া,

একের লাগি' নিশীথ জাগি'

করু রে প্রেম-সাধন,

একরে সেবি অভয় হবি,

নিয়ত নামে মগন ॥

(৩১)

একরে বাসিলে ভাল,

বিশ্বের সবারে

কাল্পন, ১৩৬৭]

সূচনা

প্রতিধ্বনি

.২৮১

পাবি রে পাবি রে তুই

বন্ধের মাঝারে ॥

একেরে করিয়া অবহেলা

রাতি বুথা যায়, যায়

অবেলার বেলা,

রহিল না মনোরম,

সন্ধ্যা ও উষাগম,

পড়িলি মরুভূ-সম

জলহীন পাথারে ॥

বহরে ভুলিয়া তুই

একের চরণে আয়,

কেন রে স্তম্ভভ

জনম বহিয়া যায়?

আজে-বাজে নানা কাজে

তোরে কি কখনো মাজে

নিয়ত নিরত রহি'

রচিত্তে কারাগারে?

(৩২)

ছোটরে বুকে টানিয়া নে রে,

তবে ত' হবি বড়!

বিশাল হিমালয় ত শুধু

অগুরে করি' জড় ॥

প্রতিধ্বনি

৯৮২

মূর্চ্ছনা

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

অনাদরে যে পড়িয়া আছে,
 ছুটিয়া যা রে তাহারি কাছে,
 বড়'র ভয়ে লুকায়ে শির
 কাঁপে যে থরথর,
 নিজে'রে জানি' অতীব দীন
 যাহার আশা অন্তলে লীন,
 নয়নবারি ভরসাহীন
 ঝরিছে দরদর ॥

স্নেহের টানে আনিয়া কাছে
 ভরিয়া প্রাণমন
 হৃদয়-জোড়া প্রেমের মধু
 করিবি বরষণ,—
 তবে ত তার কাটিবে ভয়
 জাগিবে আশা জীবনময়,
 তবে ত' হাসি' ছুটিয়া আসি'
 জুঝিবে থরতর
 করিতে এই জগৎখানা
 সুখমা-সুন্দর !!

(৩৩)

তোমাতে আমার বিশ্বাস দাও,—
 তোমা'রে জানিয়া সত্য,
 জগতের যত সুমহৎ কাজে
 নির্ভয়ে হব মত্ত ॥

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

মূর্ছনা

প্রতিধ্বনি

৯৮৩

তুমি আছ মোর বনের উৎস
 একথা বুঝায়ে দাও,
 হৃদয়ের যত দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব
 নিজ হাতে মুছে নাও;
 দূর ক'রে দাও শঙ্কা,
 বাজায়ে বিজয়-ডঙ্কা
 তোমারি সেবায় বিকাইয়া দিব
 জীবন তোমারি দত্ত ॥

ছলনা হইতে রক্ষহ বারে বারে,
 নাহি যেন পড়ি সংশয়াক্ষকারে;
 বিশ্বাস দিবা-আলোকের মত
 দেখাইয়া দিক্ মোর পথ যত,
 বিশ্বাস মোর দীন অভিযানে
 জাগাক্ অভিনবত্ব,
 ক্ষুদ্র তুচ্ছ কাজে যেন পারি
 লভিতে মহামহত্ত্ব ॥

জগতের যত সুকঠিন কাজে
 নির্ভয়ে হব মত্ত,
 জগতের যত সাধারণ কাজে
 জাগাব অভিনবত্ব,
 জগতের যত প্রাণহীন কাজে
 প্রাণ পাবে মহামত্তা,

প্রতিধ্বনি

মূর্ছনা

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১৮৪

জগতের যত সুমহৎ কাজে

নিজেরে বিলাব নিত্য ॥

(৩৪)

চারিদিকে যত জঞ্জাল জমে গেল—

সে ত শুধু আমি তোমারে ভুলেছি ব'লে,

দশ দিক্ জুড়ি' বঙ্গা নামিয়া এল—

সে ত শুধু প্রভু মোরে জাগাবার ছলে ॥

তোমারে ভুলিয়া থাকিতে চাহিনু যত,

ততই ত তুমি আসিয়াছ মোর কাছে,

বুঝাতে চেয়েছ—“কেহ নাহি মোর মত”

“এমন আপন আর কোথা বল আছে?”

বুঝাতে চেয়েছ—“ভুলে সংসার-মায়া

আমার বক্ষে আয় রে ছুটিয়া আয়,”

বুঝাতে চেয়েছ—“দেখিয়া অসার ছায়া

কেন প্রাণ তোর প্রলুব্ধ হ'য়ে যায়?”

বুঝাতে চেয়েছ—“আমিই নিকট তোর,

বক্ষে টানিয়া রাখিব আমারি বলে ॥”

তাই তুমি মোরে বিষম বিপদ দিয়া

বার বার কাছে নিতেছ আকর্ষিয়া,

তাই তুমি মোরে দুঃখ-বেদনা দিয়া

জোর করি মোরে লইতেছ আপনিয়া,

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

মূর্ছনা

প্রতিধ্বনি

৯৮৫

কিছুতেই মোরে পর হ'তে দিবে না ক'
তাই জাগ্রত প্রহরীর মত থাক.

অন্ধি-তারকা অনিমেষ তব জলে

চরণ আমার বিপথে যেন না চলে,
কল্পনা দেখিয়া যদি কভু আঁখিজলে
ভাসিতে ভাসিতে পরাই তোমার গলে
বে মালা গেঁথেছি জীবনের প্রতি পলে
হৃদয়-মরসী-সজ্জাত শতদলে ॥

(৩৫)

নিজেরে করিব নিঃশেষে দান

এই হোক আজি পণ,

এই মহাব্রত করিব পালন

আজীবন আমরণ ॥

চন্দন যথা নিজেরে ক্ষয়িয়া

পরমদয়িতে লয় আপনিয়া,

আমিও তেমন নিজেরে খোয়ায়ে

লভিব পরমধন,

আমার প্রাণের প্রভুরে পাইব

আমাতে চির-লগন ॥

সুখ সুখ করি' কাঁদিয়া মরিয়া

নাভ কি আর,

পরমপ্রভুর চরণ যে মোর

সুখ-আগার,

প্রতিধ্বনি

মূর্ছনা

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

৯৮৬

নিজেরে বিলায়ে পরম হরষে
কৃতার্থ হব পরম পরশে,
ধন্য হইবে মোর তনুমন,
ধন্য হবে নয়ন ॥

(৩৬)

মানুষের দেহ পেয়েছি রে ভাই,
মানুষের পেহু মন,
এর চেয়ে বড় ভাগ্য কি আছে?
ধন্য নর-জীবন ॥

এই দেহ ধরি' যত অবতার
খুলিল সবার মুক্তির দ্বার,
এই দেহ ধরি' মুনি-ঋষিগণ
করিল কত সাধন ॥

এমন জীবন হারায়ে হেলায়
বুথায় বুথায় দিন কেটে যায়,
হুঃখের কথা লজ্জার কথা
আছে কি তার মতন?

এ জীবন বুথা কাটিতে দিব না।
ক'টা দিন আছে? করে যায় গণা।
সফল করিব সাধন করিয়া
আয় আজি করি পণ ॥

ফাল্গুন, ১৩৬৭

LIBRARY

প্রতিধ্বনি

No.

১৮৭

Sri Sri Anandamayee Ashram
(৩৭)
BANGARAS.

হও রে নিজে আনন্দময়,
আনন্দ বিলাও রে মুখে।
বিষাদে নিমগ্ন যারা,
আশা জাগাও তাদের বুকে ॥

নিজের মনের শান্তি দিয়া
সবাইকে লও আবেষ্টিয়া,
তোমার শান্ত স্নিগ্ধ হিয়া
সবার যেন হিয়ায় ঢোকে,
ভুলায় যেন সবার সকল
দুঃখ যত এ তিনলোকে ॥

সবার প্রাণে জাগাও শক্তি,
সবার হাতে বিলাও মুক্তি,
সহজ সরল সবল ভক্তি
ঘুচিয়ে দিক্ সকল দুখে,—
সরব কর দীর্ঘ দিনের
দুঃখে অবশ নীরব মুখে ॥

দাও ঘুচিয়ে সকল জনার
পাওনা-দেনার হিসাব-রাখা,
বস্ত্রাতে সব যাক্ ভেসে যাক্,
জাগুক পরাণ ঘোমটা-ঢাকা,
তুলুক মাথা নির্ভয়ে সে,
সবার মাঝে দাঁড়াক এসে,
আনন্দেরি প্রেম-পরশে
বার্থ অতীত যাক্ না চুকে ॥

অখণ্ড-সমাচার

চিত্তরঞ্জে শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের দ্বিতীয়বার শুভাগমন :- শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের শ্রীচরণ সমভিব্যাহারে আমরা বিগত কার্তিক মাসে চিত্তরঞ্জন গিয়াছিলাম। সেখানকার ভ্রাতা-ভগিনীদের স্নেহ ও সমাদর, জনসাধারণের সম্বর্দ্ধনা ও উদ্দীপনা, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নরনারীর অকপট ভালবাসা আমাদের মুগ্ধ করিয়াছিল।

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, পাঁচ মাস সময় অতিক্রান্ত হইতেই দ্বিতীয়বার আমাদের চিত্তরঞ্জন ভ্রমণ সম্ভব হইতেছে।

আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৪ই ফাল্গুন রবিবার ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী বৈকালে চিত্তরঞ্জে ভাষণ দিবেন এবং ১৫ই চিত্তরঞ্জন ত্যাগ করিবেন।

২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৫ ফাল্গুন, সোমবার ৮ নং ডাউন তুফান একস্প্রেসে ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী চিত্তরঞ্জন ত্যাগ করিবেন।

উপরিলিখিত প্রগ্রাম-অনুযায়ী উক্ত তারিখে শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব চিত্তরঞ্জন আসিতে পারিতেছেন না। তিনি তেরো দিন পরে চিত্তরঞ্জন আসিবেন। তাঁহার শুভাগমনের প্রগ্রাম নিম্নরূপ।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব ২৬শে ফাল্গুন, ১০ মার্চ, শুক্রবার বেলা ১০-১৫তে হাওড়া ত্যাগ করিয়া ৭নং আপ তুফান একস্প্রেসে বেলা ১৪-৩১এ চিত্তরঞ্জন শুভাগমন করিতেছেন। চিত্তরঞ্জনবাসী ভ্রাতা-ভগিনীগণের সুবিধা হইলে এই ট্রেনের বদলে তিনি বেনারস এক্সপ্রেসেও হাওড়া হইতে চিত্তরঞ্জন আসিতে পারেন। তদ্বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত চিত্ত অখণ্ড-মণ্ডলীই স্থির করিবেন। চিত্তরঞ্জে

ফাল্গুন, ১৩৬১]

অখণ্ড-সমাচার

প্রতিধ্বনি

৯৮৯

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের ভাষণ হইবে ২৭ ফাল্গুন, ১১ই মার্চ শনিবার এবং ২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ রবিবার, দুই দিনই অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকায়। চিত্তরঞ্জে দীক্ষা হইবে শনি এবং রবিবার দুই দিনই প্রাতে ৭টায়। সোমবার ১৩ মার্চ হয়ত দীক্ষাদান সম্ভব হইবে না, কারণ ঐ দিনই তিনি ৮ নং ডাউন তুফান এক্সপ্রেসে বেলা ১২-৪৭এ চিত্তরঞ্জন ত্যাগ করিবেন এবং ১৭-৩৫এ হাওড়া পৌঁছিবেন।

খুব সম্ভবতঃ চিত্তরঞ্জে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের প্রতিস্থান হইবে,—শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তের গৃহ, চিত্তরঞ্জন-অখণ্ডমণ্ডলী, ষ্ট্রীট নং ২৭, কোয়ার্টার্স নং ৬৫-এ, পোঃ চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান। পত্র-লেখকেরা ভ্রাতা শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে অস্বক্ক হইতেছেন।

আমাদের গতবার ভ্রমণোপলক্ষে চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ যে অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন, অবসরের অভাবে আমরা এতদিন তাহা "প্রতিধ্বনিত" স্বীকার করিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারি নাই। দীপমালা-পরিশোভিত সেই শোভাযাত্রা, সাত আট বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে সেই সুদীর্ঘ পদযাত্রা, পথে পথে, মোড়ে মোড়ে জননী-ভগিনীগণের সুমধুর উল্লুখনি ও পুষ্পলাজাদি বর্ষণ এবং প্রাণভরা প্রেমে বহুকণ্ঠে সুমধুর হরি-ওঁ কীর্তন সবই কৃতজ্ঞতার গহিত স্মরণ করিতেছি। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুসরণ এবং পারস্পরিক সহযোগের তাঁহারা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। বহিরাগত দীক্ষার্থী এবং ভক্তদের প্রতি তাঁহাদের আতিথেয়তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠানটীতে সকল মতের ও সকল পথের নবনারী ভক্তিপূর্ণ চিত্তে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-সমাচার

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

৯৯০

আগামী ত্রিপুরা রাজ্য অখণ্ড-প্রতিনিধি সম্মেলন:—মধুপুর অধ্যক্ষক আশ্রমের শ্রীহরিধন রায়ের আমন্ত্রণে ত্রিপুরা-রাজ্য প্রতিনিধি-সম্মেলনের যে দশম অধিবেশনে আগামী ১লা বা ২রা এপ্রিল অর্থাৎ ১৮ই বা ১৯শে চৈত্র হইতেছে (সঠিক তারিখটী এই সংখ্যার অন্ত্র বিজ্ঞাপন অংশে দেখুন বা শ্রীশশাঙ্ক শেখর ভদ্র, আর. এম. এস অফিস, পোঃ আগরতলা, ত্রিপুরা ঠিকানায় পত্র লিখিয়া জানিয়া নি) তৎসম্পর্কে সমগ্র ত্রিপুরা-রাজ্যের প্রত্যেক স্থানের অখণ্ডমণ্ডলীকে বিশেষ ভাবে অবহিত হইবার জন্ত অনুরোধ করিতেছি।

মধুপুর আশ্রমে আসিতে হইলে আগরতলা হইতে বিশালগড়ের বাসে আমতলা নামিতে হয়। সেখান হইতে আশ্রম পদব্রজে দুই তিন মিনিটের পথ। আগরতলা হইতে রিকশাতেও আসা যায়, ভাড়া সম্ভবতঃ এক টাকা কি পাঁচ সিকা হইবার কথা। পদব্রজে আগরতলা হইতে মধুপুর ছয় মাইলের মতন হইবে।

মধুপুর আশ্রমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক স্থানের অখণ্ড-মণ্ডলী অতি অবগুই নিজ নিজ প্রতিনিধি পাঠাইবেন। ধুব সম্ভবতঃ ধর্ম্মনগর, কাঞ্চনপুর, সাক্রম, অমরপুর, অম্পি প্রভৃতি স্থানের একটী ভ্রাতাও এই কয় বৎসর কোনও সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। ইহা সম্মেলনের ক্ষতি নহে, তাঁহাদের নিজেদেরই ক্ষতি। মুহুরীপুর শান্তির বাজার, বগাফা, লাউগাং বা বিলনিয়ার ভ্রাতাদিগকেও এই বিষয়ে আগ্রহবান্ বলিয়া লক্ষ করা যায় নাই। এই সকল সম্মেলনে যোগদানের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক ত্রিবিধ সুফলই আছে। দোষ দর্শনের জন্ত না গিয়া বা কেবল বাগ্মিতা প্রদর্শনের জন্তই যোগদান না করিয়া বাঁহারা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

অখণ্ড-সমাচার

প্রতিধ্বনি

৯৯১

বিশ্বাস, আস্থা ও প্রেম লইয়া যান, তাঁহারা প্রতি জনেই বিশেষ ভাবে লাভবান হন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যে আরও বহু নূতন নূতন স্থানে অবিলম্বে মণ্ডলী গঠনের জন্ত সকল স্থানের ভ্রাতা ও ভগিনীরা তৎপর হউন। যেই গ্রামে তিন চারি জন অখণ্ড আছেন, সেই গ্রামেই স্থানীয় শ্রদ্ধাবান জনসাধারণকে লইয়া অবিলম্বে একটি অখণ্ড-মণ্ডলী গঠন করিয়া ফেলুন। ইহার প্রত্যক্ষ সফল আমরা নানা স্থানে দেখিয়াছি। কাছাড়ের কালাইন বাজারে অখণ্ড অতি অল্পই ছিলেন, ভ্রাতা শ্রীসোণামণি দাস অনখণ্ড সজ্জনদের লইয়া মণ্ডলী গঠন করিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন, দুই তিন বৎসর কাজ চালাইতে চালাইতে আজ দেখা যাইতেছে যে, সেখানে মণ্ডলীতে অখণ্ড-সংখ্যা একশত অতিক্রম করিয়াছে। কাছাড়ের কাটিগড়ার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। ভ্রাতা শ্রীকনকরঞ্জন দাসের নিষ্ঠা দেখিতে না দেখিতে কাটিগড়াতে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তিকেত্র গড়িয়া তুলিয়াছে। বিজয়েচ্ছা লইয়া প্রতিজ্ঞে কাজে লাগুন। কেবল অলস জল্পনা, অর্থহীন কল্পনা এবং নানা জনের দোষ দর্শন ও দোষ বর্ণনের চেষ্টার মধ্য দিয়া কোনও শুভ ফল আহত হইবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—“প্রতিনিধি-সম্মেলনে যোগদানকে তোমরা তীর্থযাত্রা বলিয়া জ্ঞান করিবে।” তিনি অত্র বলিয়াছেন,—“প্রতিনিধিত্ব যে করিবে, সেই প্রতিনিধিত্ব কাহার? তোমরা কি আমারই প্রতিনিধিত্ব করিতে যাইতেছ না? মণ্ডলীকে আমি তোমাদের গুরু-নিগ্রহ বলিয়া মাত্র করিতে নির্দেশ দিয়াছি, মণ্ডলীং স্থাপয়িত্বা চ মত্তেত গুরুনিগ্রহম্,—তোমাদিগকে সম্মেলনে গিয়া নিজ নিজ অহঙ্কারের প্রতি-নিধিত্ব করিতে হইবে না, হইবে আমায় প্রতিনিধিত্ব করিতে, তোমাদের

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-সমাচার

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

৯৯২

গুরু-বিগ্রহের প্রতিনিধিত্ব করিতে।” সুতরাং সকলে সেই সুপরিচিত মনোভাব নিয়াই যাইবেন, যাইবার, খাইবার বা শুইবার কি অমুবিধা একটা বেলা বা একটা দিন হইল, তাহা নিয়া কেহ বুঝা আলোচনা করিবেন না। সকলে নিজ নিজ শক্তি-সংযোগ করিয়া সম্মেলনের বাহ ও অভ্যন্তর প্রতিটি অঙ্গকে সর্বাপেক্ষ সুন্দর করিতে প্রয়াসী হইবেন। একদল লোক আছেন, যাঁহারা নিজেরা সম্মেলনে যোগ দেন না কিন্তু সম্মেলন হইয়া যাইবার পরে নানা জনের নানা কথায় প্রশ্রয় দেন, এমন কি নিজেরা কু কথা সৃষ্টি করেন। আমাদের কোনও ভ্রাতা-ভগিনী এইরূপ যেন না হন, ইহা আমরা বিশেষ ভাবে আশা করিব। এমন অনেক ভ্রাতা ও ভগিনী আছেন, যাঁহারা কোনও সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ করিতে পারেন না কিন্তু সম্মেলনের উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনে আপ্রাণ যত্ন নিয়া থাকেন। ইঁহারা নমস্। কিন্তু সকলের ব্যাপক কুশলের দিকে তাকাইয়া অনুরোধ করিব, তাঁহারাও যেন অবশ্যই এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া সম্মেলনের গৌরব ও মহত্ত্ব বর্দ্ধন করেন।

আমাদের সম্মুখে অফুরন্ত কাজ এবং আমাদের সজ্ব ক্রম-বর্দ্ধমান সজ্ব। এই অবস্থায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভুল-বুঝাবুঝি যত কম হইবে, ততই আমাদের বেশী মঙ্গল। আমাদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া দোষলেশহীন করিবার উত্তম যত তীব্র হইবে, তত আমরা বেশী লাভবান হইব। নিজ কর্তৃত্ব খাটাইবার চেষ্টা না করিয়া সকলের সহিত সকলে সেবকত্বের বোধ নিয়া যত অধিক মিলিত হইব, ততই আমাদের শক্তি ও যোগ্যতা বাড়িবে, ততই আমাদের কাজের প্রভাব চারিদিকে বিস্তারিত হইবে। বহু-প্রসারী শতশাখ মহা-মুহূর্ত্তের দায় অখণ্ডের সজ্ব বাড়িয়া চলিয়াছে, এই সময়ে আমাদের

একদিকে যেমন অসীম উত্তমের প্রয়োজন, অন্য দিকে তেমন প্রয়োজন দোষ-রোষ-হীন সবল মনোবৃত্তির। আমাদের আজ সাহস এবং শৌর্যের একান্তই আবশ্যিকতা পড়িয়াছে।

আগামী প্রতিনিধি-সম্মেলনে মধুপুরে সমাগত প্রত্যেক স্থানের প্রতিনিধিদের একথারও জবাব দিতে হইবে যে, উদয়পুর (রাধাকিশোর পুর) সম্মেলন হইয়া যাইবার পরে কাহার কাজ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বহুগোপাল গোস্বামীর তিরোধানেঃ—
লোকমুখে শুনিলাম, নবদ্বীপের প্রখ্যাত ভাগবত-পাঠক এবং উপনিষৎ-পুণ্যাদি বহু শাস্ত্রে অশেষ পারদর্শী বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ বহুগোপাল গোস্বামী মহাশয় নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। সংবাদটা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি এবং সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া সঠিক সংবাদ জানিবার জন্ত বড়ই ব্যগ্রতার সহিত উদ্বেগে কাল-ক্ষেপণ করিতেছিলাম।

পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীবাবা (শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব) এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপধামে পত্র লিখিয়া সংবাদের সত্যতা জানিবার জন্ত ব্যাকুল হন। তদন্তরে শ্রীপাদ বহুগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র স্নেহভাজন শ্রীমান্ মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় বিগত ২রা মাঘ তারিখে শ্রীশ্রীবাবাকে নিম্নলিখিত সংবাদ জ্ঞাপন করেন। যথা,—“একটি মর্ম্মবিদারক সংবাদ আপনাকে জানাইতেছি। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব গত ৭ই পৌষ তারিখে ধুমোহুসি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অকস্মাৎ আমাদের সহিত বন্ধনচ্ছেদন করিয়া নিজ অভীপ্সিত নিত্যলীলাময় ধামে প্রবেশ করিয়াছেন। আমি এখনও নাবালক, সংসারের কোনও বিষয়েই আমার কোনও অভিজ্ঞতা নাই। সুতরাং তাঁহার অভাবে আমি একেবারে নিঃসহায় হইয়া

পড়িয়াছি। আমাকে আপনার লাল্য মনে করিয়া আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখিবেন।”

শ্রীশ্রীবাবা এই পত্রপাঠে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পরলোকগত গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়কে নিম্নরূপ পত্র দিয়াছেন।

“স্নেহের বাবা মদনগোপাল,

“তুমি আমার প্রাণভরা স্নেহ ও সান্ত্বনা জানিবে। মহাপুরুষের বংশে জন্মিয়াছ, পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া এই বংশে কত কত অসাধারণ সাধকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহাদের আশীর্বাদের কণামাত্র ধারণে জগদ্বাসী কৃতকৃতার্থ। তাঁহাদের পুণ্যশোণিতধারা তোমার ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে। তুমি নিজেকে একটি নিমেষের জ্ঞাতও অসহায় বা নিরাশ্রয় বলিয়া মনে করিও না। মনে সাহস সঞ্চয় কর বাবা, নিজের যোগ্যতায় এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপন কর। পরমকরুণাধার শ্রীভগবান তোমাকে অতুল যোগ্যতা এবং অতুজ্জ্বল ভবিষ্যৎজীবন প্রদান করুন।

“তোমার পিতৃদেবের সহিত আমার সম্বন্ধ অতি বিচিত্র। আমিও পূর্বে তাঁহাকে দেখি নাই, তিনিও সম্ভবতঃ আমাকে কখনো দেখেন নাই। অথচ আমি তাঁহার সম্পর্কে কিছু না জানিলেও তিনি বোধ হয় আমার সম্পর্কে জানিতেন। পৃথিবীর কত মহৎ লোককেই আমি জানি না, তাই তাঁহাকেও জানিতাম না। কিন্তু আমি ত আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী জুড়িয়া, জীশূন্দের বেদাধিকারের এক বিপ্লব বহন করিয়া চলিতেছি, প্রণব-ব্রহ্মগায়ত্রীর পবিত্র আরাবে পল্লী, প্রান্তর, নগর, কান্তার মণ্ডিত করিয়া চলিয়াছি, এমন কি পুণ্যধাম বারাণসী এবং ত্রীধাম নবদ্বীপও হরি-ও কীর্তনের প্লাবন হইতে দূরে থাকিতে পারেন নাই।

কাল্পন, ১৩৬৭]

অথও-সমাচার

প্রতিধ্বনি

৯৯৫:

প্রায় অধিকাংশ সনাতনী ধর্ম্যাচার্যদের ত্রায় এই বিষয়ে তোমার পিতৃ-দেবেরও স্মৃতিবিরুদ্ধ মনোভাব ছিল। ফলে তিনি নানা স্থানে ইহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিয়াছেন। আগরতলাতে যেদিন ভগবৎকৃপায় শ্রীতার ভূষণ রায়ের গৃহে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হইল, সেদিন তাঁহার এক অভিনব মূর্তি দর্শন করিলাম। তিনি প্রেমাত্মকতার মহিমায় আমার স্নেহানুলিপ্ত কনিষ্ঠ হইলেন, আমি তাঁহার শ্রদ্ধাভিষিষ্ট জ্যেষ্ঠ হইলাম, দুই অপরিচিত মানব পরস্পর যেন সহোদর হইলাম। এই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি সহস্রাধিক দর্শকের বিমুগ্ধ নয়নকে অশ্রুপ্লাবিত করিয়াছিল। ভাই যদুগোপালের সেই দিনের বিনয়, নম্রতা, ভক্তি ও সরলতা আমাকে তাঁহার চিরদিনের জন্য আপনার করিয়া গিয়াছিল।

“আজ তাঁহার বিয়োগে আমিও তোমাদের ত্রায় বিচলিত। যদিও ঈশ্বরেচ্ছাকে কেহই ফিরাইতে পারে না এবং ভগবদভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ চিন্তাও সম্ভব নহে, তবু প্রাণ বারংবার ডাকিয়া বলিতেছে,—আরো দীর্ঘ দিন, আরো দীর্ঘযুগ যদুগোপাল নম্র শরীরে বিদ্যমান থাকিয়া প্রেমের মহিমা কীর্তন করিয়া গেলে জগৎসার কতই না কল্যাণ হইতে পারিত! পৃথিবীর ইতিহাসের খবর বলিতে পারিব না কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ইতিহাসে আমার সহিত ভাই যদুগোপালের প্রেমময় মিলন একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা।

“ভাই যদুগোপালের আত্মার শান্তিকরে আমরা সর্বত্র সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। আগামী ১৮ই কাল্পন ২রা মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় ভারত ও পাকিস্থানের যেখানে যেখানে আমার স্বর্গণ আছেন, সর্বত্রই সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইবে। এই সমবেত উপাসনাতে -স্বীশুদাদি

মিলিত হইয়া পবিত্র ব্রহ্মগায়ত্রী-মন্ত্র এবং হরি-ওঁ নাম গান করিয়া থাকে। যত্নগোপাল ইহার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। এবং ইহারই বিরুদ্ধে শক্তিশালিনী প্রচারণা সাত আট বৎসর কাল অবিচ্ছেদে চালাইয়াছিলেন। আমার সহিত আগরতলায় তাঁহার ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ষটিবার পরে তিনি করিমগঞ্জ যাইয়া সেখানকার অথওমণ্ডলীর আমন্ত্রণে এই সমবেত উপাসনায় দানন্দে যোগদান করেন এবং সর্বসমক্ষে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেই সময়ে মণ্ডলীর সদন্তগণ এই প্রখ্যাত বাগ্মী ও গভীর জ্ঞানী বৈষ্ণবাচার্য্যাকে কিছু উপদেশ দিবার জন্ত অনুরোধ করিলে তিনি বলেন,—‘বাবা সকল, স্বামীজী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দাদা যে সকল উপদেশ অথওমণ্ডলীতে তোমাদের দিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপরে আর কোনও কথা নাই, আর কোনও শাস্ত্র নাই। সর্বদা মনে রাখিও, গুরুবার্চঃ সত্যমসত্যমন্তঃ,—গুরুবাক্যকেই সত্য বলিয়া জানিতে হইবে, অন্ত-কথাকে অসত্য জানিবে।’—গোস্বামীপাদ যত্নগোপালের সেদিনকার সেই মধুর বাণী করিমগঞ্জ অথওমণ্ডলীর প্রতিটি সভ্যের প্রাণে শিলাতে খোদাই-করা অমোঘ লিপির মত অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

“আমরা সর্বস্থানে ভাই যত্নগোপালের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিব। কিছু দিন পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার ইচ্ছা রহিল। তোমার শোকাক্তা জননী দেবীকে এবং পরিবারস্থ অপরাপর সকলকে আমার সাঙ্ঘ্য, সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইবে। পরমা-ভীষ্টদেব তোমাদের সকলের মনকে অশোক অভয় অমৃতময় করুন।

গুভাশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

অখণ্ড-সমাচার

প্রতিধ্বনি

৯৯৭

শ্রীশ্রীবাবামণির লিখিত উক্ত পত্রের পরে আমাদের প্রতিস্থানে উল্লিখিত তারিখে শ্রীপাদ যত্নগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের আত্মার নিত্য-শান্তি কামনা করিয়া সমবেত উপাসনা করা উচিত। বিলনিয়া, উদয়পুর, আগরতলা, তেলিয়ামুড়া, করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দি, নাহারকাটিয়া, তিনসুকিয়া হইতে স্ত্রী করিয়া কুমিল্লা, সাহেবাবাদ, ব্রাহ্মবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ আদি সকল স্থানের মণ্ডলীকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। যেন এই অনুষ্ঠানটি অতিশয় সাংস্কৃতিকতার মধ্য দিয়া উদ্ঘাটিত হয়। উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক স্থানেই আমরা অনুরোধ জানাই-তেছি। সাহায্যে সকল স্থানে ভ্রাতা ও ভগিনীগণদ্বারা যথোচিত গান্ধীর্ষ্য ও একাগ্রতা সহকারে ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় এই অনুষ্ঠান হয় এবং সেই সংবাদ নিয়মিতকিনায় জানান হয়, ইহা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়।

যথা,—

শ্রীমৎ মদনগোপাল গোস্বামী

C/o ৬যত্নগোপাল গোস্বামী

ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী রোড, পোঃ নবদ্বীপ, (নদীয়া)

বন-পাহাড়ের কাজ সম্পর্কে :—শ্রীশ্রীশ্রী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব বিগত ২৮শে পৌষ (১৩৬৭), কলিকাতা হইতে ত্রিপুরার দুর্গম পার্শ্বতা অঞ্চলের কর্মী শ্রীকৃষ্ণবল্লুকে লিখিয়াছেন,—

“সৎকার্য্যে সহায়তা সকল সময়ে মিলে না, আবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে ভগবান্ অপ্রত্যাশিত ভাবে সহায়ক জুটাইয়াও দেন। তুমি মনের সাহস হারাইও না, কাজ করিয়া যাও, থামিয়া থাকিও না, থমকিয়া দাঁড়াইও না।

“তোমার কোনও কোনও পাহাড়ী গুরুভাই কোপীন নিতে চাহিতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। কোপীন নিবার পরে আর জীসঙ্গ করা চলে না, এই একটা কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিও। কোপীন-বস্ত্রকে লোকে সম্মান করে কিন্তু কোপীনধারীকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত নিয়া চলিতে হয়। লোক-দেখান কোপীন-গ্রহণ প্রশংসনীয় নহে।

“পাহাড়গুলির অবস্থা আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছি। ইহাদের পুঞ্জীভূত সংস্কারের জঞ্জাল অপসারণ সহজ কথা নহে। হয়ত আরও দীর্ঘকাল ইহাদের মধ্যে ওঝা-বৈভোর রাজত্ব চলিবে। তাই বলিয়া তুমি হতাশ হইবে কেন? এই অমানিশার অবসান তোমাদেরই দ্বারা হইবে। হাল ছাড়িয়া দিও না।

“হরিনাম গুনিতে ইহাদের কষ্ট হয়, তবু শুনাইয়া যাও। ইহারা অবজ্ঞা করে করুক, তোমার কাজ তুমি বন্ধ রাখিও না। তোমার পাহাড়ী গুরুভাই শ্রীমান্ প— ‘মোতাই বাল্ নাই’ উপাধি পাইয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে এবং চৈত্র মাসের পূজার সময়ে নিজ হস্ত শত শত ছাগল ও কিছু মহিষ বলি দিবার জন্ত তৈরী হইতেছে গুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। পূর্বসংস্কার কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত রক্তে মিশিয়া থাকে। তবু তোমরা হতাশ হইও না। পাহাড়ীদের মধ্যে শ্রীমান্ প— সকলের চেয়ে শিক্ষিত ছিল। কিন্তু সংস্কার তাহাকে নাকাদড়ি দিয়া টানিতেছে। ক্ষুব্ধ হইও না, রুষ্ট হইও না, ভগবানের কাজ তোমাদের করিয়া যাইতেই হইবে, এই কথা ধ্রুব জানিয়া নিজের পথ ধীর গতিতে হইলেও পূর্ণ বিক্রমে চল। আমার আশীর্বাদ নিয়ত তোমার সঙ্গে রহিয়াছে। ইতি—

আশীর্বাদক
‘ব্রহ্মপানক’

উল্লিখিত উপদেশগুলি সকল স্থানের পার্শ্বত্যা অঞ্চলে প্রচার-কর্মীদের মধ্যে অবিলম্বে প্রচারিত হওয়া আবশ্যিক।

মঙ্গলবাঁধ দর্শন সম্পর্কে :- পুপুন্যকীতে শ্রীশ্রীবাবামণি যে বিরাট মঙ্গলবাঁধ করিয়াছেন, তাহা দেখিবার জন্ম যে অগ্রহায়ণ মাসের নির্দিষ্ট কতক সময়ের মধ্যে ভ্রাতা এবং ভগিনীগণকে যাইতে বলা হইয়াছিল, অনেকে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সঠিক বুঝিতে পারেন নাই, মনে হইল। উল্লিখিত তারিখের মধ্যে গেলে পুপুন্যকীতে যে বিরাট মরুভূমী ফুলের চাষ হইয়া থাকে, তাহার অন্তুলন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারিত। এখন বা ইহার পরে গেলে সেই অপরূপ দৃশ্য কাহারও নয়নগোচর হইবে না, কারণ, সব ফুল এখন পাকিয়াছে এবং বীজ সংগৃহীত হইতেছে।

মঙ্গলবাঁধের কাজ পুনরায় শুরু হইয়াছে। এখনো পূর্ণোত্তম দিতে পারা যায় নাই। তাহার প্রধান অন্তরায় আর্থিক। পূর্ণোত্তমে কাজ চালাইতে পারিলে এবং এখন যে কাজ শুরু হইয়াছে, তাহা আগামী বর্ষার পূর্ক পর্য্যন্ত আর বন্ধ না হইলে আশা করা যায় যে, আগামী বর্ষায় আর কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না।

ইতিমধ্যে নানাস্থান হইতে অনেক ভ্রাতা এবং ভগিনী স্বচক্ষে মঙ্গলবাঁধের বিরাট কাজ দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ নিজ নিজ অঞ্চলের হিতৈষী সঙ্গনগণকে বলিলে তাহা দ্বারা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদের সংখ্যাবর্দ্ধন হইবে।

ফুলের জোলুস শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজকর্ম ব্যস্ততার মধ্য দিয়া চালান হইতেছে, এই অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে মঙ্গলবাঁধ দর্শনার্থে কেহ না আসিলেই ভাল। কারণ, কর্মীদেরকে অতি অল্প কয়েকজন

সহায়তাকারীর দ্বারা এই বিরাট ও শ্রমসাধ্য কাজটি করিতে ও করাইতে হয়। এমতাবস্থায় কাজের ব্যস্ততার দরুন মঙ্গলবাধের ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা অভ্যাগতদের প্রতি আবশ্যকীয় কর্তব্যপালন করিতে বা মদত-ভাবে মনোযোগ দিতে অক্ষম হন।

সকলের একত্র মিলনের তারিখটি আমরা আগামী রাসপূর্ণিমা ২১শে নবেম্বর ৫ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার করিব, না, আগামী জন্মতিথি ১০ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার করিব, এই বিষয়ে সকলের মতামত এখনি জানা আবশ্যক। পূজার ছুটিতে করিলে ব্যবসায়ী ভ্রাতাদের যোগদান অসম্ভব ব্যাপার।

কলিকাতায় শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণদর্শন সম্পর্কেঃ—আজ দুই বৎসর যাবৎ এই নিয়ম করা হইয়াছে যে, কলিকাতাতে কেহ রবিবার ব্যতীত শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের শ্রীচরণদর্শন করিতে আসিবেন না। কতকগুলি গুরুতর কারণে এই নিয়মটি করা হইয়াছে।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই নিয়মটি বাহাতে সকলের দ্বারা অনুসৃত হয়, তাহা বিষয়ে কলিকাতা, কলিকাতার উপকণ্ঠ এবং হাওড়া, হুগলী, নদীয়া ও ২৪-পরগণা জেলার অখণ্ড-ভ্রাতা ও ভগিনীগণ মোটেই অবহিত নহেন। আমরা এইবার “প্রতিধ্বনি”র মাধ্যমে সকলকে জানাইতেছি যে, আমাদের ভ্রাতা এবং ভগিনীরা সকল স্থানে সকল পরিচিত লোকদের জানাইয়া দিতে থাকুন যে, রবিবার ছাড়া কাহারও শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণদর্শনের জন্ত ১২২।১ বি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে (আপার সারকুলার রোডে) আসা চলিবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি যেই সময়ে কলিকাতা উপস্থিত থাকেন, সেই সময়ে প্রতি রবিবারে প্রাতে ৮টায় সমবেত উপাসনার পরে নাট্য

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

অখণ্ড-সমাচার

প্রতিধ্বনি

১০০১

নবদীক্ষার্থীদের দীক্ষা হয়। যাহারা অত্র প্রয়োজনে আসেন, তাহারা বিকাল ২১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮১০ ঘটিকা পর্যন্ত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

গুরুদেবদের আচরণ :—সম্প্রতি আমাদের দুই একজন গুরুভ্রাতা বা ভগিনীর মন অত্র অত্র গুরুদেবের কথার ছটায় টলিয়াছে। ক্রিয়া থাকিলেই প্রতিক্রিয়া থাকে, ফলে এই সকল ব্যাপার নিয়া একটু সাম্প্রদায়িক মনঃকষ্ট আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের নিম্নলিখিত উপদেশটুকু সকলকে স্মরণ করিতে বলিতেছি। শ্রীশ্রীবাবাণি পুপুন্যকী হইতে ৩১শে পৌষ ১৩৬৭ তারিখে লিখিয়াছেন,—

“পৃথিবীর সকল গুরুদেবদিগকে নিজ নিজ ইচ্ছামত এবং খুশীমাক্ফিক সম্প্রদায়-বিস্তার করিতে দাও। সকল গুরুরা নিজ নিজ সাধ্যের শেষ সীমায় গিয়াও যেই সকল পাষণ্ডকে দলন করিতে পারিবেন না, আমি সেই স্বল্প কয়েকটা নাস্তিক বা ঈশ্বরে অননুরাগী ব্যক্তিকে লইয়াই বেভাবে পারি নিজের ধর্মের সংসার সুন্দরভাবে গড়িব। তাহাতেও বহু কোটি নরনারী আমার ভাগে পড়িবে। যাহারা সহজেই পরমেশ্বরের পথে আসে, ইহারা তাহাদিগকে টানিয়া নিবার পরে অসাধ্য, দুরারোগ্য, কঠিন আধ্যাত্মিক-পীড়াগ্রস্ত অবহেলিত মানুষ কয়টাকে নিয়া আমি সুখের নীড় বাঁধিব। তোমরা ভিন্ন গুরুর শিষ্যদের মনে কখনো তাহাদের গুরুর প্রতি নির্ভাাহীনতা সৃষ্টি রূপ অপকার্য করিও না। অত্র গুরুরা যে কাজ করিয়া গর্ব বোধ করেন, আমাদের কিন্তু তাহাতে এক কণা পৌরব নাই। তোমরা এই বিশ্বাস অন্তরে রাখ,—‘আমার যারা আপন, তারা কদিন দূরে রইতে পারে?’ ছল, চাতুরী, ফন্দীর পথ আমাদের নহে।”

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

অখণ্ড-সমাচার

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১০০২

শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-জন্মোৎসবের নিগূঢ় তাৎপর্য :—২৪-পরগণা
রামপুর (গাইঘাটা) হইতে ভ্রাতা শ্রীরমণী মোহন ভৌমিক সেখানকার
জন্মোৎসবের সাফল্য বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই উৎসবে বহু
বাহিরের লোক যোগদান করিয়া উৎসবের রীতিনীতি দর্শনে পুলকিত
হইয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে ৩১শে পৌষ (১৩৬৭) তারিখে শ্রীশ্রীবাবামণি
তঁাহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রীশ্রীবামণী
স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব লিখিয়াছেন,—

“আমার জন্মোৎসবে নানা সম্প্রদায়ের এবং বহু বাহিরের লোক
যোগদান করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। ইহাই ত স্বাভাবিক।
কারণ, আমি নির্দিষ্ট কোনও সম্প্রদায়ের নহি। ‘জগতের সকল
সম্প্রদায় আমার, আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের’,—একথা আমি
বহুবর্ষ পূর্বেই উচ্চারণ করিয়াছি। ইহা আমার মুখের কথা নহে,
প্রাণের কথা। মঙ্গলবার আমার জন্মবার, তবু সপ্তাহের সাতটা বার
জুড়িয়া তোমরা উৎসব কর। যতবারে যত মহাজন জন্মিয়াছেন, সকলের
শুভাবির্ভাবের পানে তাকাইয়া আমরা আনন্দ করিব, সকলের মনকে
জগতের শুভসাধনে লাগাইব। শুধু মহাজন নহে, হীনজনের জন্যকেও
আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করিব না। সকলের জন্মদিনই আমাদের আনন্দের
দিন। এই জন্ত এক হিসাবে আমার জন্মোৎসব জগতের সকলের
জন্মোৎসব।”

শ্রীশ্রীবাবামণির উল্লিখিত উদার উপদেশ স্বরণে রাখিয়া আমরা
বেন জগতের সকলকে আমাদের আপনার জন রূপে গ্রহণ করিতে
পারি, এইটাই আমাদের ঐকান্তিকী প্রার্থনা হউক। শ্রীশ্রীবাবামণির
জন্মোৎসব “প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বের সকল আগত ও অনাগত মানুষ ও
প্রাণীর জন্মোৎসবে আনন্দ-উৎসব”, এই এক অসাধারণ বানী বহুবর্ষ

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

অখণ্ড-সমাচার

প্রতিধ্বনি

১০০৩

পূর্বে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীমুখে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার অধুনালুপ্ত মোচাগড়া আশ্রমে একদা এক পৌষ মাসের শুভ জন্মতিথিতে তিনি বলিয়াছিলেন,—“আমার আবির্ভাব, পরমেশ্বরেরই আবির্ভাব, আর সেই পরমেশ্বর বিশ্বের সকল জীবের আবির্ভাবকেই নিজ আবির্ভাব বলিয়া স্বরণ করেন, স্বীকার করেন, গণনা করেন।” আচার্য্য স্বরূপানন্দের জন্মোৎসবকে এই অসাধারণ সর্বজনীন মর্যাদা আমরা যেন প্রতিস্থানে প্রতি বৎসর দিতে পারি।

বিগ্রহের নিকটে পঞ্চান্নভোগ :—কলিকাতায় কোনও এক-স্থানে এবার আসাম-প্রত্যাগত এক দম্পতী তাঁহাদের মানসিক হরি-ওঁ-নাম-কীর্ত্তন করেন। ইহাতে বহু ভক্তের সমাগম হয়। সেখানে একটা বিধিবদ্ধ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল। বিগ্রহের নিকটে পঞ্চান্ন ভোগ, পায়ের আদি সজ্জিত হইয়াছে। এমন ব্যক্তির গৃহে এই অনুষ্ঠানটী হইয়াছে, যিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা অখণ্ড-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

কয়েকজন জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র দিয়াছেন যে, কাজটী কিরূপ হইল। এই সম্পর্কে বারাণসী হইতে ১২ই মাঘ (১৩৬৭) তারিখে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্রলেখকদের জানাইয়া দেন যে,—

“নাম-কীর্ত্তনেই হউক বা সমবেত উপাসনাতেই হউক, পঞ্চান্ন-ভোগ সজ্জিত করা বিশেষ সঙ্গত কারণেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থানেই বিধিবদ্ধ প্রথাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন কিছু প্রবর্তনের একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়, যাহার দরুণ অনুষ্ঠানাদেব মন হইতে প্রকৃত বিধির স্মৃতি উঠিয়া যায়। ইহা সঙ্গত অবস্থা নহে।

“আমাদের সমবেত উপাসনা বা কীর্ত্তনের একটা অসাম্প্রদায়িক ভিত্তি আছে। হরি-ওঁ নামটীই বা সমবেত উপাসনার স্তোত্রগুলিই

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-সমাচার

[১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১০০৪

কেবল অসাম্প্রদায়িক নহে, আমাদের কীর্তন ও উপাসনার চরিত্রই অসাম্প্রদায়িক। ইহার অসাম্প্রদায়িকতা দেখিয়া একজন নৈতিক সনাতনী ইহাতে আকৃষ্ট হইতে পারেন, একজন জৈন বা বিধিমার্গের গুহাচারী বৈষ্ণবও আসিতে পারেন। পক্কান্ন-ভোগ দেওয়ার দরুণ তিনি প্রসাদ গ্রহণের প্রস্তাবে বিব্রত হইতে পারেন না কি? উড়িষ্যার কয়েক স্থানে আগে সমবেত উপাসনায় বহু প্রতিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আসিতেন, শুনিতে পাইয়াছি, এই বিষয়ে বিধিভঙ্গের দরুণ তাঁহারা আসিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, আমরা বন্ধ করিয়াছেন। উপাসনা বা কীর্তনই প্রধান কথা, প্রসাদ গৌণ। সেই গৌণ ব্যাপার নিয়াই কেন আসল ব্যাপারটাকে অপ্রিয় করিয়া তোলা হইবে?—এই বিষয়ে সকল স্থানেই নিয়মলঙ্ঘন নিবারণিত হওয়া প্রয়োজন।

“এমন অনেকে আছেন, যাহারা নিজ ইষ্ট বাতীত অত্র দেবতার প্রসাদ নেন না, কিন্তু গুহ্য-উপাসনার প্রসাদে আদর করেন। তাঁহাদিগকে পক্কান্ন-ভোগ দিয়া বিব্রত করার ভিতরে ভদ্রতা বা সভ্যতার এক কণা স্থানও নাই।

“এমন অনেকে আছেন, যাহারা এক বেলা এক স্থানে এক কণা পক্কান্ন প্রসাদ (পায়েস বা খিচুড়ী) গ্রহণ করিলে সেই বেলা আর পক্কান্ন (অন্নাদি) গ্রহণ করেন না। তাঁহাদিগকেই বা বিব্রত করিবার কি প্রয়োজন আছে?

“সমবেত উপাসনায় বা নাম-কীর্তনে ভোগ-নৈবেদ্য নিতান্ত গৌণ, প্রাণের ভক্তি প্রথম-স্থানীয়, তুলসী-পুষ্প-বিল্বপত্রাদি তাহার সহায়ক বলিয়া দ্বিতীয়-স্থানীয়,—ভোগ-নৈবেদ্য না হইলেও অনুষ্ঠান অগুরু হয় না। এমতাবস্থায় কোনও স্থানেই যাহাতে ভবিষ্যতে বিগ্রহের সম্মুখে সমবেত উপাসনা বা সমবেত কীর্তনাদিতে পক্কান্ন-ভোগ না সাজান হয়,

কাল্পন, ১৩৬৭]

অখণ্ড-সমাচার

প্রতিধ্বনি

১০০৫

এই বিষয়ে সকলের সতর্ক হওয়া উচিত। আত্মের শত্রুটুকু অপেক্ষা বীজ বড় হইয়া গেলে সেই আত্ম সর্বজন-পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। সমবেত উপাসনাদি অনুষ্ঠান যেভাবে বিদ্বাদ্গতিতে সর্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে ইহার গতিশৈথিল্যবিধায়ক কোনও কাজ কাহারও করা উচিত নহে।”

জন্মদিনের উপাসনা :—সম্প্রতি নগাঁও জেলার একটি স্থানে খ্রীশ্রীবাবামণির জন্মদিনে সমবেত উপাসনা পরিত্যক্ত হইয়া উদয়াস্ত কীর্তনের ব্যবস্থা হয়। এই দিনে সমবেত উপাসনা অবশ্য-কর্তব্য জ্ঞানে একটি ভ্রাতা উপাসনার সময়ে নিজ গৃহে গিয়া সমবেত উপাসনা করেন। এই ব্যাপার নিয়া কিছু কিছু ভ্রাতা-ভগিনীদের মনে দুঃখ-বোধ হইয়াছে। তদ্বিষয়ে বিগত ১লা মাঘ (১৩৬৭) খ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব যে পত্র লিখিয়াছেন, নিয়ে তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইল। যথা,—

“জন্মদিনে পৃথিবী-জোড়া লোক সমবেত উপাসনা করিতেছে এবং ঠিক একই সময়ে সকলে সকল স্থানে নিষ্ঠার সহিত এই কাজটিতে বৃত্তী হইতেছে। সেই সময়ে কি অন্তরূপ অনুষ্ঠান রাখা সম্ভব? এই সময়ে পৃথিবীর সকল স্থানের লোক যাহা করিতেছে, তাহার সহিত যোগ রাখিবে না?

“একই আসরে উদয়াস্ত কীর্তন ও সমবেত উপাসনা একই দিনে অসমীচীন। তবে উভয়ের মধ্যে একভাবে একটা সামঞ্জস্য করা যায়। যেমন, সূর্যোদয়ের পূর্বেই অখণ্ড-সংহিতা পাঠ শুরু করিলে, তৎপরে কীর্তন শুরু হইল। ঠিক আটটায় কীর্তন থামিতে না থামিতে ‘জয় জয় বঙ্গ পরাংপর’ শুরু হইল এবং উপাসনার শান্তি-বাচনের সঙ্গে সঙ্গে

প্রতিধ্বনি

১০০৬

অখণ্ড-সমাচার

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

একটি মুহূর্ত দেবী না করিয়া পুনঃ কীর্তন চলিল এবং সূর্যাস্তের পরে অঞ্জলি হইল। এইরূপ ব্যবস্থা করা চলিতে পারে।”

বড়ই ভাল লাগিল :—বাঁকুড়া হইতে অধ্যাপক শ্রীমতীপ্রসাদ ঘোষ এম-এ লিখিয়াছেন,—“আমি প্রতিধ্বনিতে উদ্ধৃত শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ বাণী সমূহ আমার বিশিষ্ট বন্ধুদিগকে পড়িয়া শুনাই, কাহাকেও কাহাকেও পত্রিকাখানা পড়িতে দেই। শ্রীশ্রীবাবামণির বাণী সম্পর্কে বহু প্রশংসা-সূচক বাক্য শুনিতেছি। যথা—(১) বড়ই আকর্ষণীয় জিনিষ, (২) সকলের পড়া উচিত, (৩) বড়ই ভাল লাগিল, (৪) Perfect utterances, (৫) শক্তিশালী লেখক (৬) Excellent, (৭) অনেক নূতন কথা, (৮) সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি। কেহ কেহ এমনও বলিতেছেন,—ঠিক যেন আমারই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লেখা, ইত্যাদি।”

বাহিরের জনসাধারণ যে সময়ে প্রতিধ্বনিতে প্রকাশিত উপদেশ সমূহকে এইরূপ প্রশংসা করিতেছেন, সেই সময়ে আমাদের অখণ্ড-ভ্রাতা ও ভগিনীগণ কি এই পত্রিকাখানার গ্রাহক হইতে বিরত থাকিয়াই তাঁহাদের গুরুনিষ্ঠার পরিচয় দিবেন? বর্তমান বর্ষে অখণ্ডদের মধ্যে প্রতিধ্বনির গ্রাহক-সংখ্যা খুবই অল্প। আগামী ১৩৬৮ বাংলা সালেও কি এই দুরবস্থাই চলিবে? নানাস্থানের অখণ্ডমণ্ডলীগুলি কি এই সময়ে স্থিরিত কর্মোদ্ধত হইবেন না?

মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার পুণ্য :—সম্প্রতি ত্রিপুরার শচীন্দ্রনগর কলোনি হইতে ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণধন দেবনাথ জানাইয়াছেন যে, আগরতলা হইতে কতিপয় ভ্রাতা গিয়া সেখানে একটি নূতন অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন। তৎসম্পর্কে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব পুপুন্য হইতে বিভিন্ন জনকে বিগত ২রা মাঘ (১৩৬৭) যে সকল পত্র লিখিয়াছেন,

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

অখণ্ড-সমাচার

প্রতিবন্ধান

১০০৭

তাহার কিয়দংশ আমাদের ভ্রাতা এবং ভগিনীগণের অবগত্যর্থ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

“একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলে যতখানি পুণ্য, একটি অখণ্ডমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করাকে তোমরা ততখানি বা ততোধিক পুণ্যজনক বলিয়া জ্ঞান করিও। কারণ, অখণ্ডমণ্ডলীগুলি আমার অবয়ব।

“অখণ্ড-সংহিতা আমার বাঙ্গায়ী মূর্তি, অখণ্ডমণ্ডলী আমার শরীর, অখণ্ড-বিগ্রহ আমার প্রাণ, আর তোমরা সকলে একত্র মিলিয়া আমার আত্মা।”

“অখণ্ড হইয়াও যে অখণ্ডমণ্ডলীকে অনাদর করে, সে আমার শরীরকে অনাদর করে। অখণ্ড হইয়াও যে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ না করে, সে আমার বাণীকে অগ্রাহ করে! অখণ্ড হইয়াও যে অখণ্ড-বিগ্রহে সমগ্র মনঃপ্রাণ সমর্পণ না করে, সে আমার প্রাণকে অস্বীকার করে। অখণ্ড হইয়াও যে সমবেত উপাসনায় যোগদান না করে, সে আমার আত্মার সহিত নিজ আত্মীয়তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখে।”

শ্রীশ্রীবাবামণির এই সকল কথা অর্থ এত সুস্পষ্ট যে, ইহার আর বিশদ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু হৃৎকের বিষয়, আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনীরা দলে দলে আসিয়া দীক্ষার ঘরে ঢুকিতে বত আগ্রহবান্, শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দেশ পালনের দিকে তত আগ্রহবান্ নহেন।

একটি সাধু প্রস্তাব :—লক্ষ্য অখণ্ডমণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীহরিদাস চৌধুরী একটি সাধু প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহা এই যে, শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-জ্যোৎসব উপলক্ষে একদিন উদযান্ত-হরি-ও-কীর্তন, একদিন উদযান্ত

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-সমাচার

[১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১০০৮

অখণ্ড-সংহিতা পাঠ এবং একদিন উদয়াস্ত নীরবে নাম-জপমুক্ত চালাইতে হইবে।

জন্মদিনের সমবেত উপাসনাটির সহিত ধ্বন্দ্ব-সৃষ্টি না করিয়া উপরিলিখিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিলে সত্যই অতি সাধু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হইবে।

অখণ্ড-মণ্ডলী সম্পর্কেঃ— শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব বিগত ২৭শে পৌষ, ১৩৬৭ বাংলা তারিখে কলিকাতা ১২২১ বি আপার সারকুলার রোড হইতে মফস্বলের কোনও একটি জেলার জর্নৈক ভ্রাম্যমাণ কর্ম্মীকে একখানা পত্র লেখেন। তাহার কিয়দংশ সকল স্থানের অখণ্ড-মণ্ডলী সমূহের অবগতির জন্য প্রকাশ আবশ্যক বিধায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

“তুমি তোমার সহরের মণ্ডলীর যোগ্য লোকের দ্বারা পুনর্গঠন প্রস্তাব করিয়াছ। যোগ্যতর লোক যদি পাও, পুনর্গঠন নিশ্চিতই সম্ভব। বর্তমানে যাহারা কার্য্য্যকরী সমিতির সভ্য আছেন, তাঁহারা গদী ছাড়িতে চাহেন না, ইহা বোধ হয় সম্ভব নহে। অখণ্ড-মণ্ডলীর সভাপতি, সম্পাদক বা কার্য্য্যনির্বাহক সভার সদস্য থাকিয়া কাহারও পার্থিব লাভ নাই। সুতরাং যোগ্য লোক আসিলে ইহারা সরিয়া যাইবেন না, ইহা আমার মনে হয় না। ইহারা বাহাতে যোগ্য লোককে চিনিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা তোমরা কর।

“তুমি আলাদা করিয়া জেলা-অখণ্ড-মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিবার কথা লিখিয়াছ। ডবকার প্রতিনিধি-সম্মেলনে শ্রীমতী কিরণ বরা যে ভাষণটি দিয়াছিল, ‘প্রতিধ্বনি’ হইতে তাহা পাঠ কর। দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণগুলি তোমরা পড় না, পড়িলেও তাহার অর্থগ্রহণ করিতে চেষ্টা কর না। * * * জেলা-মণ্ডলী

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

অখণ্ড-সমাচার

প্রতিধ্বনি

১০০২

যেখানে যেখানে গঠিত হইয়াছে, দেখা গিয়াছে, তাহার কৰ্তৃত্ব
ব্যতীত আর কিছুই করে না। * * মনে রাখিও, আমি
স্বাধীনতার বাণী লইয়া আসিয়াছি। কেহ কাহারও পরাধীন হইতে
পারিবে না। It is now a constituted principle that all
Mandalis, small or big, shall have direct relation
with the centre. তোমাদের চিন্তাশক্তি পরিচালনের অনিচ্ছাহেতু
এত বড় একটা গুরুতর বিষয় উপেক্ষিত হইতেছে। তোমরা গ্রামে
গ্রামে নূতন মণ্ডলী স্থাপন কর নাই, কিন্তু যেগুলি স্থাপিত হইয়াছে,
তাহার উপরে কৰ্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠান গড়িতে চাহিতেছ। এই
Dictatory (মাতব্বরী) মনোভাব তোমাদের পরিবৰ্জন করিতে
হইবে। * * * প্রত্যেক মণ্ডলীই স্বরাট এবং স্বাধীন থাকিবে,
এবং পরস্পরের সাহিত্য করিবে সহযোগিতা,—কৰ্তৃত্ব নেতৃত্বের কোনও
প্রশ্নই থাকিবে না।

“জেলা-মণ্ডলী করিয়া দুই মাস অন্তর একটা করিয়া অধিবেশন
আমার মতে অর্থহীন। কেননা, তোমার প্রস্তাবানুসারে তাহাতে
আট জন আর নয় জন লোক মিলিত হইবে। এই মিলনের শুভফল
অল্পই হইবে। এই আট জন নয় জন লোককে সকল মণ্ডলীর
লোকেরা ‘কর্তা’ বলিয়া ‘ঘৃণা’ করিবে, সম্মান করিবে না। প্রতিনিধি-
সম্মেলন যে দুই তিন মাস অন্তর হইতেছে, ইহার শুভফল আমি
প্রত্যক্ষ করিতেছি, আর তোমরা দেখিতেছ, তোমাদের জনে জনের
পাথের বায়, আয়োজনকারীদের নানা ক্রটি ইত্যাদি। কোনও
প্রতিনিধি-সম্মেলনে যোগদানে যান-বাহনের যদি কোনও অসুবিধা
ঘটে, আয়োজনকারীদের তাহাতে দোষ কি?

“নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যাহার ইচ্ছা নাই, জগতে সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। * * স্বকীয় প্রতিষ্ঠার লোভ ছাড়িয়া যদি কাজ কর, কোন্ কার্য না তোমরা সাধিতে পার ?

“তোমরা জেলা মণ্ডলীর হৃৎস্পন্দ ত্যাগ করিয়া আমাকেই সকল মণ্ডলীর কেন্দ্র বলিয়া চিনিতে শিখ এবং সকলকে শিখাও।

“সর্বশেষে একটি কথা মনে রাখিও। ব্যক্তিগত ভাবে আমি গুরুদ্রোহীকেও সম্মান করি কিন্তু মণ্ডলীর ভিতরে গুরুদ্রোহীর স্থান নাই। গুরুদ্রোহ যে ত্যাগ করিবে, মাত্র সে-ই মণ্ডলীর সম্ভ্য হইতে পারিবে, অত্রে নহে। গুরুদ্রোহীরা একক থাকিয়া নিজ স্বাধীনতার চর্চা করুক এবং গুরুদ্রোহ ত্যাগ করিয়া মণ্ডলীর স্বাধীনতা রক্ষা করুক।

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ”

শ্রীশ্রীবাবার উল্লিখিত উপদেশগুলি আমরা আমাদের সকল স্থানের অখণ্ড-ভ্রাতা এবং ভগিনীদের স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের সম্ভব কোনও কৃত্রিম প্রয়াসের ফলে বিস্তারিত হইতেছে না, হইতেছে আদর্শবাদের অত্যাচতার সুহৃৎকার আকর্ষণে। এই কারণেই আমাদের প্রতি জনের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সর্বশক্তি নিয়া কন্ঠে অবতীর্ণ হইতে হইবে। আশা করি আমাদের এই মন্তব্যে কেহ বিরক্ত হইবেন না।

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

, ১০১১

ধৃতঃ প্রেম্না

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
লিখিত সমসাময়িক পত্রাবলী]

(৬৭৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। ডবকাতে একটি স্ন-সফল সম্মেলন করিতে
হইলে, তাহার প্রস্তুতি হিসাবে সমস্ত নগাঁও জেলার প্রত্যেক গ্রাম বা
মণ্ডলী হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নিয়া জেলার সদরে একটি বিশেষ
পরামর্শ-সভা আগেই করা প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি। অবশ্য
এই কার্য্য তোমরা না করিলেও ডবকার সম্মেলন সম্মেলন-হিসাবে
নিশ্চয়ই সফল হইবে। জন-সমাগমও হইবে, ভাল ভাল বক্তৃতাও
হইবে, বিদেশ হইতে শক্তিমান কোনও কর্ম্মী পুরুষও সভাপতিত্ব
করিতে নিশ্চয়ই আসিয়া যাইবেন। কিন্তু এত শ্রম, ব্যয় ও আয়োজন
আমল ব্যাপারে মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে। সেই আশঙ্কা প্রচুরই
বিদ্যমান।

কথা না কমাইলে কাজ অগ্রসর হয় না। কথা কহিতে কহিতে জন্ম
ভরিয়া কাজকে পিছাইয়া দিবার অভ্যাসই কেবল অনুশীলিত হইতেছে।
সংপ্রস্তুতবে সশ্রদ্ধ সম্মতি না আসিয়া কুটিল জটিল গ্রন্থিল “কিন্তু, কেন,

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১০১২

যদি”র সৃষ্টি হইতেছে। কাজ বাহারা করে, তাহারা “কিন্তু”, “কেন” আর “যদি” এই তিনটি অব্যয়কে পদাঘাত করিয়া বায় করিয়া দেয়। তোমাদের মধ্যে সেই লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে না। আমি কথার জহরী, কথার জাহাজী। জীবন ভরিয়া কথাই বহিলাম আর কথাই কহিলাম। কিন্তু আমি আমার সমস্ত জীবনে যতগুলি কথা কহিয়াছি, তোমরা এক একটা সম্মেলন উপলক্ষ্যে জনে জনে তাহার দশ-বিশ, পঁচিশ-পঞ্চাশ গুণ কথা কহিয়া ফেল। তাই তোমাদের কথাই হইতেছে, কাজ হইতেছে না।

ডবকা পল্লীগ্রাম। জেলার প্রতিনিধি-সম্মেলন উপলক্ষে নানা স্থান হইতে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি যাইবেন, তাঁহাদের দেখিয়া গ্রামবাসী দরিদ্র অথগোরা হকচকাইয়া যাইবে। অন্ততঃ এই কারণেও তোমাদের কর্তব্য সমগ্র জেলার প্রতি মণ্ডলীর একটা করিয়া দরদী কর্ম্মীকে জেলার সদরে আনিয়া সকলকে নিয়া পূর্ব্বাহ্নেই একত্র পরামর্শ করা। পৃথিবীর সকল স্থানেই বড় কাজের প্রস্তুতিটিকে বেশী মূল্য দেওয়া হয়। তোমরাই কি তাহা হইতে বিরত রহিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা,— প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমা বাড়ীতেই

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেম

প্রতিধ্বনি

১০১৩

ত্রিপুরা-রাজ্যঅথও-প্রতিনিধি-সম্মেলন হইতে যাইতেছে দেখিয়া তুমি আনন্দ ও অনিশ্চয়তায় বিহ্বল হইয়াছ। আনন্দ হইবারই কথা, কারণ এক সঙ্গে একস্থানে অনেক গুলি গুরুভাইকে দেখা আর গুরুদেবকে দেখা প্রায় তুল্য বাপার। গুরুদর্শনে কি পুণ্য, তাহা যাহারা সাধন করে না, তাহারা বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু কেহ বরুক আর না বরুক, দর্শনের সফল যাইবে কোথায়? একটী দিনের জন্ত তোমার গৃহ পবিত্র তীর্থভূমিতে পরিণত হইবে।

কিছু কিছু গুরুভগিনীও হয়ত আসিবেন। কি করিয়া এতগুলি ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্বন্ধনা করিবে, ইহা তোমার নিকটে এক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা পরের গৃহে আসিবেন না, আসিবেন নিজগৃহে। গুরুভাই আর সহোদর ভাইতে তফাৎ কতটুকু? বরং কোনও পার্থিব স্বার্থের সম্পর্ক বা সংঘর্ষ না থাকার দরুণ গুরুভাই সহোদর ভাই অপেক্ষাও আপনতর। যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা নিজেদের প্রেমের গুণেই সকল অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন। তুমিও একমাত্র প্রেম সম্বল করিয়া, যাহা তোমার সাধ্য, তেমনি ব্যবস্থা ও তদ্রূপ আয়োজন কর।

কাজটী তোমার একার নহে, কাজটী তোমাদের সকলের। সুতরাং এই ব্যাপারে চারি দিকের সকল ভ্রাতা-ভগিনীদের ডাকিয়া আনিয়া যুক্ত করিতে চেষ্টা কর। কি তোমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সেই দিকে প্রথম দৃষ্টি রাখিও। কতকগুলি অপব্যয় আর হট্টগোল করিয়া যশ বা অপযশ অর্জন করিবার চেষ্টা কেহ করিও না। অনেক কিছু কর্ম-তালিকা করিয়া সহজ সরল স্বাভাবিক ব্যাপারকে জটিল কুটিল কৃত্রিম করিও না। যাহা দ্বারা একের প্রতি অপরের প্রেম-প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, মাত্র তাহাই করণীয়। যাহা দ্বারা অপ্রেম অপ্ৰীতি প্রশ্রয় পায়, তাহা বর্জনীয়।

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং শ্রেয়া

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

১০১৪

প্রিয়জনদর্শনে প্রিয়জনেরা পুলকিত হইবেন, অন্ধকার চিত্ত ভক্তির জ্যোৎস্নায় আলোকিত হইবে, সকলের হৃদয় হইতে অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব, কুণ্ঠা ও আলম্ভরূপ পাপ দূরীভূত হইবে, ইহাই তোমাদের লক্ষ্য হউক এবং এই লক্ষ্যের আলোকে অগ্র কর্তব্যের নির্দেশগুলি দেখিয়া যাও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৭ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু—

স্নেহের বাবা —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের মণ্ডলী কি ঘুমাইয়া পড়িল? তোমাদের সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় সংঘগত উত্তম, সংগঠন, জনচিত্তে শুচিতা বুদ্ধির জ্ঞান আয়োজন এবং সংঘবদ্ধ ভাবে নিজেদের আন্তরিক সম্পদ বুদ্ধির প্রয়োগ সম্পর্কে কোনও সংবাদ সম্প্রতি কিছু পাইয়াছি মনে হয় না। এই নিঃস্রীকতা তোমাদের কেন থাকিবে?

/ কেহ কেহ আমাকে তোমাদের ওখানে যাইবার জ্ঞান মৌখিক অনুরোধ করিয়াছে। আমার যাইতে অসাধ্য নাই কিন্তু অধিকতর দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ আমাকে নানা দিকে টানিতেছে। যদিও স্বাস্থ্য প্রতিকূল, তবু সবদিক বজায় রাখিয়া চলিতেছি। সকল কর্তব্যই নিষ্কাম চিত্তে করিতেছি। কিন্তু তোমাদের ওখানে আমার প্রতিনিধিত্ব করিবার মতন বস্তু কি কিছুই নাই? আমি কি আমার একটি উপদেশের মধ্যেও

কাল্পন, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেমা

প্রতিধ্বনি

১০১৫

জীবন্ত নহি? শরীর অনুপস্থিত থাকিলেই কি আমি অনুপস্থিত থাকিব? শরীর মরিলেই কি আমি মরিয়া যাইব?

তোমরা আলস্য ছাড়। মনের কুণ্ঠা, সঙ্কোচ, ব্যক্তিগত অহমিকা গা ঝাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দাও। তোমাদের যে বসিয়া থাকাটা অত্যাশ, ইহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। তোমাদের রেলস্টেশনটার উপর দিয়া আমি গত দুই বৎসরে অনুমান পঞ্চাশ বার চলিয়া গিয়াছি, নামিবার অবকাশ হয় নাই। কেন হয় নাই? ইহার মধ্যে কি তোমাদের কোনও দায়িত্ব নাই? যে কয়বার নামিয়াছিলাম, কেবলই কি হুজুগ করিতে নামিয়াছিলাম? সেই হুজুগে আমার লাভ কি এবং কোথায়?

মোহনিদ্রা পরিহার করিয়া সোজা উঠিয়া বস। ধরিত্রীর বুকে দূত-পদবিক্ষেপ সহকারে অগ্রসর হও। জগৎ স্থাপু নহে, কেবল তোমরাই স্থাপু হইয়া জড়বৎ পড়িয়া রহিবে?

চারিদিকে চাহিয়া দেখ। কাজ করিবার ক্ষেত্রের অভাব নাই। কাজ করিবার ইচ্ছাই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। চারিদিকে কত আধার তৃষ্ণার্ত হইয়া প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কত ক্ষুধার্ত চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছে। কৈ তোমাদের হাতে অন্ন-পানীয়, কৈ তোমাদের বুখে অভয় আশ্বাস, কৈ তোমাদের বুকে সেবার আগ্রহ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরা

[১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১০১৬

(৬৭৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

১২শে পৌষ, ১৩৬৬

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সজ্জ্ব প্রাণ আসে গুচিতার মধ্য দিয়া। তোমরা প্রত্যেকে দেহে মনে, প্রাণে, ইচ্ছায়, ক্রটিতে, সঙ্কল্লে, বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে গুটি হও।

সজ্জ্ব শক্তি আসে একতার মধ্য দিয়া। তোমরা কথায়, কাজে আর উদ্ভমে এক হও।

সকলের সর্বশক্তি একটী কাজে একই সময়ে নিয়োগ করিতে পারা অতিশয় বিরাট যোগ্যতা। এই যোগ্যতার তোমরা অধিকারী হও।

জীবমাত্রেরই প্রতি প্রেম লইয়া প্রতিটি কার্য্য কর। তোমাদের আত্ম-প্রীতি, সজ্জ্বপ্রীতি এবং সমাজ-প্রীতি যেন সর্বজীবপ্রীতির উৎস হইতে সঞ্চারিত হয়।

অতীতের মহাপুরুষদের কাহার জীবন হইতে কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করিতে পার, তাহা দেখ। কিন্তু তোমাদের প্রতি জনের জীবনে সত্যের ও ত্যাগের যে নূতনতর প্রতিফলন অসম্ভব নহে, এই বিশ্বাস রাখিও। নিজেকে ছোট করিয়া দেখিও না। মানব-জীবন অতীতের আধারেই আদর্শবাদী হয় কিন্তু তাহার রূপায়ন ভবিষ্যতের জন্ত। অতীত যেখানে মৃত কঙ্কাল, সেখানে সেই কঙ্কাল চূর্ণ করিয়া জমির সার করিয়া লও, অতীতের দ্রমে ভবিষ্যতের পুষ্পায়ন সম্ভব নাও হইতে পারে। জলন্ত ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া চল, অতীতের শিক্ষাকে যতটা সম্ভব সার লইও।

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেমা

প্রতিধ্বনি

১০১৭

অফুরন্ত জীবপ্রীতি তোমাদের প্রতি কর্ণের প্রেরক হউক।
অতীতের জীবদিগকে দাও শ্রদ্ধা, ভবিষ্যতের সকলকে দাও প্রেম।
বর্তমানকেও প্রকারান্তরে ভবিষ্যতেরই অঙ্গ বলিয়া জানিও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ব্যক্তির শক্তি বাড়িলে সজ্জ্বের শক্তি বাড়িবার সহায়তা হয় কিন্তু
এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সহিত নিজেকে মানাইয়া চলিতে না শিখিলে
ব্যক্তিগত শক্তিলাভ মাত্র ব্যক্তিগত বিশেষত্বই হইয়া পড়িয়া থাকে,
তাহার বৃহত্তর সার্থকতা কিছু ঘটে না। কথাটি তোমাদের ভাবিবার
প্রয়োজন আছে। দুইটা কর্তব্য একত্র আসিলে তাহাদের মধ্যে
সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া অবিরোধে কাজ চালাইবার দক্ষতাও তোমাদের
থাকা দরকার। এই দক্ষতার অভাব ঘটিলে ব্যক্তিগত আগ্রহ জেদের
রূপ ধারণ করিয়া আত্ম-কলহের সৃষ্টি করিতে পারে।

তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ তোমাদের প্রেমকে বর্দ্ধিক করুক।
ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি
১০১৮

ধ্বতং প্রেমা

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

(৬৮১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সময় চলিয়া যাইতেছে, আমরা তাহার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তকে চুলের মুঠি ধরিয়া আটক করিয়া রাখিয়া তাহাকে পূর্ণ সদ্যবহারে নিয়োজিত করিতেছি না।—এই অপবাদ যেন আমাদের বিরুদ্ধে কখনও উচ্চারিত হইতে না পারে।

প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য বিরাট, বিশাল, ব্যাপক রূপ ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেছে আর অধিকাংশ মানুষই পাশ কাটাইয়া দূরে সরিয়া নিজেকে ফাঁকি দিতেছে,—এই দৃশ্য কতকাল দেখিবে?

অধিকাংশ কাজে আসল কর্মটুকু বুথা আড়ম্বরের চাপে ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে, বাহু হৈ-টৈ আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া চারিদিকের আলো-বাতাসকে মাতাল করিয়া দিতেছে। অন্ধের দল পরস্পর পরস্পরের সহিত মাথা-ঠোকাঠুকি করিয়া মরিতেছে।—এই দৃশ্য কতকাল লোভনীয় থাকিবে?

প্রেমের নামে মোহের বিকার চলিতেছে, স্নেহের নামে মায়ার ফাঁদ রচিত হইতেছে, ভক্তির নামে চলিতেছে আত্মপূজা। এই অবস্থার কি প্রতীকার নাই?

ঐক্যের নামে ব্যক্তি-প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। উদারতার নামে কাপুরুষতার চর্চা চলিতেছে। ধর্মের নামে অধর্মের ষোড়ষোপচার পূজাযোজন স্ফীত হইতে স্ফীততর হইতেছে।—কেন এই অবস্থা সধ করিয়া থাকিবে?

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

অখণ্ড-সমাচার

প্রতিধ্বনি

১০১২

প্রত্যেকে প্রত্যেকের মনের গহনে প্রবেশ কর। একে অত্মকে মোহ হইতে মুক্ত কর। একে অত্মকে পাপ হইতে বিরত কর। একে অত্মকে দুঃখের পথ হইতে টানিয়া আনিয়া শান্তির পথাক্রম কর। একে অত্মের প্রতি সহনশীল হও, ত্যাগসমর্থ হও, প্রেমিক হও।—ইহা তোমাদের পরম সাধনা।

সকলকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইবে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২০শে পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সম্প্রতি নরসিংপুর হাসপাতাল হইতে তোমার এক নার্স গুরুভগিনী বদলী হইয়া তোমাদের ওখানকার হাসপাতালে আসিয়াছে। নরসিংপুরের হাসপাতালের ডাক্তার উদার-হৃদয় সংলোক ছিলেন। নূতন জায়গায় আসিয়া মেয়েটা নানা উদ্বেগ অনুভব করিতেছে।

এমতাবস্থায় তোমাদের কর্তব্য মেয়েটির সর্বদা খোঁজ-খবর নেওয়া এবং প্রতিটি প্রয়োজনের সময়ে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে নিরুদ্বেগ করা। পরস্পরের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবাবুদ্ধি এবং সাঙ্ঘিক মমত্ব-বোধ তোমাদের প্রয়োজন। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীকেই তোমরা ভালবাসিবে। বিশেষ করিয়া নিজ নিজ গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেয়া

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১০২০

সম্পর্কে এই ভালবাসার অনুশীলন যেন তোমাদের অব্যাহত ও সর্বদা-
সুন্দর হইয়া বিরাজমান থাকে ।

ক্ষুদ্র তোমাদের মণ্ডলী কিন্তু একতার গুণ বিরাট । তোমরা ঐক্য-
প্রবুদ্ধ হইয়া দিকে দিকে মানুষের মনে নিয়ত সদ্ভাবের উদ্দীপনা ছড়াও,
প্রেমের প্রসার কর । ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২১শে পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও ।

মণিপুর রোডের এক পত্রে অবগত হইয়াছি যে, সেখানে শিবসাগর
জেলার যে প্রতিনিধি-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে তোমাদের অঞ্চলের
মণ্ডলীগুলির প্রতিনিধি একজনও যান নাই । দূরত্ব ইহার হেতু হইতে
পারে ।

তিনসুকিয়ার এক পত্রে অবগত হইলাম, সেখানে যে প্রতিনিধি-
সম্মেলন হইয়াছে, তাহাতেও এই সকল মণ্ডলীর প্রতিনিধি কেহ
ছিলেন না । সুতরাং এবার বলিতে হইবে যে দূরত্বই একমাত্র প্রা-
নহে, রুচির অভাবও একটা কারণ ।

কোথাও কোনও সহুদ্দেশ্যমূলক সম্মেলন হইলে প্রত্যেক স্থান
হইতেই তাহাতে প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব । এই জন্ত সম্ভবতঃ, সেই
উদ্দেশ্য সাধনে কার্য্যকর কোনও সহযোগ করিতে তোমার মণ্ডলী যদি

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেরণা

প্রতিধ্বনি

১০২১

সমর্থ নাও হন, তবু সেখান হইতে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য সঞ্চয় করিয়া আসিতে পার, আর পার কতকগুলি উচ্চ প্রেরণা লাভ করিতে। সুতরাং কোথাও সাদরে নিমন্ত্রিত হইবার পরেও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার চেষ্টা না-করাটা এক প্রকারের আত্মকৃতি-সাধন ছাড়া কিছুই নহে।

মানুষে মানুষে প্রেম বাড়ে কিসে? পরস্পরের দেখা-শুনায়, ভাবের আদান-প্রদানে এবং একই স্তম্ভে কৰ্মে সকলের কৰ্মশক্তি বিনিয়োগনে পারস্পরিক প্রেম বাড়ে। যে অনুষ্ঠান মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, দরদ, সহানুভূতি, সহকর্মিতা-বোধ ও সমর্মিতা জাগায়, সামান্য সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণ আবিষ্কার করিয়া তাহার ওজুহাতে সেই অনুষ্ঠান হইতে দূরে থাকা সুবুদ্ধিরও পরিচায়ক নহে, সুস্থ মনেরও প্রমাণ নহে। সুস্থ মন অক্লেশে সকল কাজে লাফাইয়া গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। সুস্থ মনে অতি-হিসাবীর যাবিতা নাই। * * * ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮৪)

হরি-ও

কলিকাতা

২১শে পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াস্তু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জন্মোৎসবের নয় দিন অসংখ্য স্থানে অসংখ্য অনুষ্ঠান হইল এবং তাহার মধ্য দিয়া মানুষের সহিত মানুষের প্রেম-প্রীতির বর্দ্ধন ঘটিল,

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

১০২২

আমাদের সকলের এবং জগতের জন্ত এক অনাবিল শান্তিপ্রদ প্রতিক্রিয়া-বর্জিত লাভ অর্জিত হইল। আশা করি, তোমরা ঐক্য, প্রেম, প্রীতি, হৃদয়তা এবং পারস্পরিক অদোষদর্শিতার মধ্য দিয়া তোমাদের উৎসব উদ্‌যাপন করিয়াছ।

যেখানে যেখানে অখণ্ডমণ্ডলী আছে, সেই সকল স্থান ছাড়াও এবার জন্মোৎসব হইয়াছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান আমাদের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত নহেন, এমন অনেক বৈষ্ণব, শাক্ত ও ব্রাহ্ম মতাবলম্বী প্রতিষ্ঠানে এবার তোমাদের বাবামণির জন্মোৎসব হইয়াছে। আমাদের অসাম্প্রদায়িক আদর্শ অত্র মত ও পথের সহিত কণামাত্র কলহ না করিয়াই ক্রমশঃ বিস্তারিত হইতেছে এবং চিরপ্রচলিত সনাতনী মতাবলম্বী সংস্থা-সমূহের মধ্যে অনেকগুলিতে আমাদের কথা এই বিশেষ সপ্তাহে মানন্দে ও সঙ্গীত স্নেহে আলোচিত হইয়াছে। ইহা হইতে তোমরা আত্ম-বিশ্বাস সংগ্রহ কর।

সাধারণতঃ একই স্থানে দুইটি অখণ্ডমণ্ডলী থাকা উচিত নহে। কারণ, ইহা দ্বারা অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হইতে পারে, বাহার ফলে সরলপ্রাণ ব্যক্তির বিশ্বাস ও নিষ্ঠার দিক দিয়া বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। বড় বড় সহরে কর্ম্মীরা যাতায়াতের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া এক স্থানেই দুইটি বা ততোধিক মণ্ডলী স্থাপন করিতে ছেন মত। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের আন্তরিক ঐক্য বিলুপ্ত হয় নাই। এই জন্তই তাহা অনুমোদনযোগ্য। ছোট ছোট স্থানে কর্ম্মের কেন্দ্র একাধিক থাকিতে পারে কিন্তু মণ্ডলী একাধিক থাকা ভাল নহে।

প্রত্যেক অখণ্ডমণ্ডলীকেই খ্রীশ্চীউপাসনা-প্রণালীর নির্দেশ পালিতে হয়। নিজ নিজ অভিকৃতি অনুযায়ী নবপ্রবর্তন সম্ভব নহে। কারণ, নানা স্থানে নানা প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ নিজ নিজ অভিকৃতি চালাইতে যত্ন

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১০২৩

করিলে শেষে একদিন দেখা যাইবে যে, এক মণ্ডলীর ধর্মীয় আচরণের সহিত অত্র মণ্ডলীর ধর্মীয় আচরণের কোনও সাদৃশ্যই নাই, কিম্বা সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক। ইহা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

আমি এখন পর্য্যন্ত আমার ঋত্বিক বা প্রতিনিধিরূপে কাহাকেও দীক্ষা দিবার অধিকার দেই নাই। কিন্তু কেহ যদি তৎসঙ্গেও এইরূপ দাবী করে, তবে জানিবে, সে আমার শিষ্যরূপে কিছু করিতেছে না এবং সে আমার মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্তও নহে। এমন ব্যক্তির আচরণের সহিত আমার কোনও দায়িত্ব বা সম্পর্ক নাই।

অখণ্ডমণ্ডলী কেবল অখণ্ডদেরই মধ্যে প্রীতি-বর্দ্ধনের চেষ্টা করিবেন না, বিশ্বের সকল মানবের প্রতি প্রীতিরও অনুশীলন করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রেম তোমাদের জীবনের পরম ধর্ম হউক। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮৫)

ইন্দি-ও

শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)

২৪শে পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নানা স্থানের জন্মোৎসবগুলির ব্যয় কমাইয়া উৎসব-উপলক্ষে প্রতি বৎসর এক একটা স্থায়ী মঙ্গল-নিলয় প্রতিষ্ঠার দিকে সকলে লক্ষ্য দিলে বা দিতে পারিলে সত্যই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হইবে। তোমাদের এক এক জনের ভিতরে কত ভক্তি আর কত বিশ্বাস, ভাবিয়া অনেক সময়ে অবাক হই, চুপ হই, মুগ্ধ হই।

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেমা

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১০২৪

চারিদিকের প্রত্যেকটী প্রাণের ভিতরে প্রবেশ কর। ভালবাসা লইয়া, জ্ঞানের আলোক লইয়া দিকে দিকে অভিযান প্রেরণ কর। তোমরা নিজ সজ্জ, নিজ সম্প্রদায়, নিজ দল নিয়াই আবদ্ধ হইয়া থাকিও না। সকল সজ্জ, সকল সম্প্রদায়, সকল দলকে আপন করিবার সাধনায় তোমরা নাম। আমি জীবনে একটী যুহুর্ন্তের জগৎ সাম্প্রদায়িক প্রয়োজন-বোধ নিয়া কোনও কাজ করি নাই, এই বিশ্বাস নিয়া তোমরা আমার অনুসরণ কর। সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে জগৎ হইতে আমার নাম মুছিয়া যাউক। মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধে আর মানুষের মমত্বে আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাহি। তোমরা আমার এই সম্প্রদায়বোধবর্জিত সরল সহজ মনোভাবের প্রতিফলন তোমাদের জীবনে এবং চরিত্রে নিয়ত প্রকট করিও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮৬)

হরিণ্ড

শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)

২৫শে পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কল্পনাভীত দ্রুততায় আমাকে কাজ করিতে হইতেছে। শরীর অনেক সময়ে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না। শরীরের দিকে তাকাইয়া কাজকে শ্লথগতি করিতে পারিতেছি না, কারণ বর্ষা ঠিক সময় মতই আসিয়া যাইবে, আমার দিকে তাকাইয়া একটুও দেবী

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১০২৫

করিবে না। এমন কতকগুলি কাজ আছে, যাহা বর্ষার আগে শেষ না করিলে আর হয়ত জীবনেও শেষ হইবে না। আর, এখনই কাজ না ধরিতে পারিলে বর্ষার আগে তাহা শেষও হইবে না।

তোমরা এতদিন জন্মোৎসবে ব্যস্ত ছিলে। অবশ্য, সেই ব্যস্ততারও আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু এখন তোমাদের নিজ নিজ জেলার প্রত্যেকটা লোকের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। তোমাদের চেষ্টা ও কর্ম যেন ব্যক্তিকেন্দ্রক না হয়। তোমরা নিজেদের অর্ভাঙ্গাকে সর্বত্র ছড়াইয়া দিবার চেষ্টায় নামো।

তোমাদিগকে কাজে নামিতে হইবে। সে কাজ মনকে জয় করা। কথার ছলনায় হৃদয় জয় করা যায় না। প্রাণের বলেই প্রাণকে আকর্ষণ করিতে হয়। নিজেদের মধ্য হইতে অকারণ মতবৈধগুলি দূর না করিতে পারিলে কোনও কালেই তোমরা কাজের লোক হইবে না।

প্রত্যেকে সাধন করিতেছ কি? সাধনা না করিলে কেবল সাহিত্যিক লালিত্যে কথার দাম বাড়ে না। তোমরা মানুষকে সর্বত্র ত্যাগে প্রবুদ্ধ করিতে পার নাই। সাধন ছাড়া ত্যাগ আসে না, কথার সূচাক্রম ত্যাগ আনা যায় না।

টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব করিয়া কখনো বড় বড় কাজ হয় না। কাজ হইবার কথাই আগে মনে রাখা উচিত। তোমরা কি করিয়াছ, দেখিবার পরে লোকে প্রশ্ন করিবে, কত তোমরা বায় করিয়াছ। গর্ভজননী-ভাবে অন্তরে সাদা জাগাইতে হইলে নিজের সারাটি অস্তিত্ব

১০২৬

আন্দোলনে ঢালিয়া দিতে হয়। নামে মন রাখ, মনে নাম রাখ।
ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮৭)

হরি-ওঁ

পুপুনকী

৩রা মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাল সন্ধ্যা সাতটার পুপুনকী পৌছিয়াছি, আজই বেলা এগারটার পুপুনকী ছাড়িব। পুণ্যশ্লোক নগেশ ব্রহ্মচারীজীর পারমাধিক কাজ হইবে। আমাকে যাইতে হইবে। তোমরা কয়জনে জান যে, তিনি বিরাট অথও-সংঘের কত বড় একজন শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন? যে তাঁহার সংসর্গে গিয়াছে, সে-ই আমাদের আদর্শের প্রতি অচলা নিষ্ঠা নিয়া ফিরিয়াছে। নীরবে এই আস্থাদান-কার্য্য তিনি পঞ্চাশটি বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিয়াছেন। অক্রোধ, অরাগ, অবৈর, অজাতশত্রু এই মহাপুরুষের জীবনের মহিমা ও সাধনার গভীরতা এই বিজ্ঞাপনের যুগে তোমাদের কি করিয়া বুঝাইব? তিনি আমার শিষ্য ছিলেন না কিন্তু আমার একটা শিষ্যও তাঁহার অপেক্ষা আমার অধিক অনুগামী ছিলেন বলিয়া আমি জানি না। তোমরা ৭ই মাঘ তারিখে তাঁহার স্বধামগত আত্মার তৃপ্তি-কামনায় সমবেত উপাসনা করিও। সেই দিন

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১০২৭

আমি শিলিগুড়িতে তাঁহার জন্ত সমবেত উপাসনা পরিচালন করিব।

শ্রীমান দ—র কোনও খবর নাট। কোথায় যে সে গেল, কি ভাবে আছে, কিছুই জানা যাইতেছে না। তাহার কি কোনও কারণে মতান্তর বা ভাবান্তর উপস্থিত হইল? আশ্রমের জন্ত সে যে অর্থ দিয়াছে, তাহা কি তাহাকে ফেরৎ দিয়া দিতে হইবে? অতীতে দুই চারিবার অত্যাচার দাতা সম্পর্কে এইরূপ ঘটিয়াছে। তাই কেহ দান করিতে আগু বাড়াইয়া আসিলে আমি তাহা মনে মনে সাময়িক হাওলাত বলিয়া ধরিয়া নেই এবং দাতার মনে ভাবান্তর আসা মাত্র তাহার দান তাহাকে ফিরাইয়া দেই। কেবল পারিলাম না, পুণ্যপুণী আশ্রমের ভূমিদাতাদের ভূমিটা ফেরৎ দিয়া দিতে। নগণ্য-মূল্য কঙ্করাকৃত ভূমিকে লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নন্দন-কাননে রূপান্তরিত করিবার পরে তাহাদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া যায় না, যাহারা ইহা দ্বারা নিতান্তই সাংসারিক ভোগস্বখের উর্দ্ধে আর কোনও উপযোগিতা-পূরণ করিবেন না। ভূমিটার সার্থকতার প্রক্ষেপে এবং আমার দ্বারা ব্যয়িত লক্ষাধিক টাকার উপরে জনসেবা ব্যতীত অত্র কোনও কামনার অধিকার নাই বলিয়াই সেই ভূমি ফেরৎ দিতে পারি নাই। তাও বন-বিভাগ তন্মধ্যে অনেক জমি কাড়িয়া নিয়া আমাকে কতক ভারমুক্ত করিয়াছেন। আমি যদি নিজ অর্থে আরও সম্পত্তি এদেশে ক্রয় না করিতাম, তাহা হইলে দাতার দানের ভূমিটুকু পুনরায় গহন অরণ্যে পরিণত হইবার অবাধ অধিকার দিয়া হয়ত কবেই সরিয়া পড়িতাম। দানগ্রহণ যথকর কার্য্য নহে, দানের সঙ্গে দুঃখও গ্রহণ করিতে হয়।

তোমরা কাহাকেও নিম্নলিখিত দুইটি কার্য্যে কখনও প্রণোদনা দিও না। একটি হইতেছে, আশ্রমকে দান করা। অপরটি হইতেছে,

প্রতিধ্বনি

বৃত্তং প্রেরা

[১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১০২৮

আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা। হজুগে দানও করিতে নাই, দীক্ষাও
নিতে নাই। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮৮)

হরি-ওঁ

পুপুনকী

পরমকল্যাণীয়েষু :—

৩রা মাঘ, ১৩৬৬

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যদিও দেখা যাইতেছে যে, তোমার উপরে চারিদিক হইতে উৎপীড়ন
আসিয়া পড়িতেছে, তথাপি তুমি ধৈর্য্য না হারাইয়া সুধীর প্রবৃত্তি
নির্ব্বিবেশ মনে নিজের কর্তব্য করিয়া যাও। আজ বাহাকে শত্রু
ভাবিতেছ, কাল, পরশ্ব বা তারপর দিন সে হয় বন্ধু হইবে, নয় নিজের
আচরণের অযৌক্তিকতা ও অসমর্থন দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইবে। বিবেচনা
প্রতিও বিবেশ করিও না। প্রেম সহকারে সুদীর্ঘকাল কেবল প্রতীক্ষা
কর তাহার স্বাভাবিক ভাবে চরিত্র ও আচরণ পরিবর্তনের।

প্রেম যেন আমাদের স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। প্রেম যেন
আমাদের লোকান্তরকরণের ব্যাপার না হয়। প্রেমিকেরা বাহুতঃ বাহা
করেন, তাহা করিয়াই যেন আমরা নিজেদিগকে প্রেমিক না ভাবি।
প্রেমিকের অন্তরে যে শুচিতা, সদাশাস্ত্রময় স্নিগ্ধতা, সর্বজনানুভিসারিণী
প্রীতি নিয়ত বিরাজ করে, তাহা যেন আমাদের স্বভাব-সম্পদ হয়,
আমাদের সহজাত সিদ্ধি হয়। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সংস্কৃতই হইবে জাতীয় ভাষা (ডক্টর কৈলাশ নাথ কাটজু ; মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী)

“বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকৃত সর্বশক্তিমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে সর্বভারতে আসন্ন একাদশ প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্ঘাপিত হইবে। আমাদের জাতীয় জীবনে এই মহান বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্যলাভে আমরা ধন্ত। এই বৎসরের প্রজাতন্ত্র-দিবসের অনুষ্ঠানাদিতে ইংলণ্ডের রাণীর যোগদানে অননুসাধারণ মর্যাদা লাভ করিবে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা অদ্বিতীয় ঘটনা। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় পারস্পরিক বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য বিবেচিত হইলেও ভারত ও ইংল্যান্ড কি অপরিসীম সৌহার্দ্যের ভিতর দিয়া পরস্পরের নিকট বিদায় নিয়াছিল। এই বিযুক্তি উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে কোন কলঙ্ক রেখা অঙ্কন করে নাই পরন্তু উভয় দেশের সম্পর্ক অধিকতর সৌহার্দ্যপূর্ণ করিয়াছে।

ঐক্য সমস্যা :-

“ভবনগর কংগ্রেস অধিবেশনে সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ও অখণ্ডতার নিদারুণ সমস্যা সম্পর্কে গভীর পর্যালোচনা হয়। সকলেই ইহা অনুভব করেন যে, ঐক্য ব্যতীত জনগণের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধিই যে শুধু ব্যাহত হইবে তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের মর্যাদার আসনও অবনমিত হইবে। কি প্রকারে এই ঐক্য রক্ষা করা যায় ; তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং ইহার সমাধান-প্রচেষ্টা সর্বাপেক্ষা

প্রতিধ্বনি ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার [৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা
১০৩০ জগৎ সংস্কৃতিই হইবে জাতীয় ভাষা

অগ্রাধিকারের দাবী রাখে। সর্বপ্রকারের বিভেদ-প্রচেষ্টা—মাত্র-
দায়িকতা ভাষাগত সঙ্কীর্ণতা সমূলে বিনষ্ট করিতে হইবে।

ভাষা সমস্যা :-

“ঐ সমস্ত বাধার মধ্যে আবার ভাষাগত সঙ্কীর্ণতাই সবচেয়ে
ক্ষতিকারক। তাই ইহা একান্ত অপরিহার্য যে সমগ্র ভারতের জগৎ
এমন একটি জাতীয় ভাষা থাকা প্রয়োজন, যাহা সর্বত্র কথিত, পঠিত
এবং বোধগম্য হইবে এবং সেই ভাষাটি কাহারও উপর জোর করিয়া
চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। ইহা সর্বজন কর্তৃক সাদরে গৃহীত হওয়া
বাঞ্ছনীয়। অতীত ইতিহাসের পর্যালোচনা এখানে নিম্নয়োজন মনে
করি। ইহা উর্ভাগ্যের বিষয় যে আমাদের সংবিধানে একটি জাতীয়
ভাষার প্রয়োজনের উপর সরাসরি বা স্পষ্টতঃ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।
হিন্দীকে কেন্দ্রের এবং বিভিন্ন-রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের সরকারী
ভাষা হিসাবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

সংস্কৃতির দাবী :-

“জাতীয়” এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। তথাকথিত সরকারী
ভাষা জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হইতে পারে না। আমি এই বিষয়ে
গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছি। পুরাতন বিচার বিতর্কের অবতারণা
করয়া কোন লাভ নাই। এ বিষয়ে যত অধিক চিন্তা পরিচালনা
করি, তত সুনিশ্চিত দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত
হই যে ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃতিই আমাদের জাতীয় ভাষা
হওয়া উচিত বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাই ত্রায়-সঙ্গত।
আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলদেশে নিহিত আছে সংস্কৃত। আর্য
জাতির সৃজনকাল হইতেই সংস্কৃত প্রচলিত আছে। আর্যদের সভ্যতা,

ফাল্গুন, ১৩৬৭] ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্ত প্রতিধ্বনি
সংস্কৃতই হইবে জাতীয় ভাষা ১০৩১

সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্মীয় মতবাদ ও বিশ্বাস যা কিছু সবই বিধৃত আছে সংস্কৃতে। আঞ্চলিক ভাষাগুলি স্ব স্ব অঞ্চলেই প্রচলিত কিন্তু প্রতিটি ভারতবাসীই সংস্কৃতির সহিত পরিচিত। সর্বপ্রকারের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও পৌরাণিক অনুষ্ঠানাদিতে ইহা সর্বদাই ব্যবহৃত হয়। ইহার ধ্বনি সুপরিচিত এবং সুসমাদৃত, ইহা সরল করাও সুসম্ভব। ইহা কথ্য ভাষা হিসাবে জ্ঞানীর ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং চেষ্টার দ্বারা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ইহা কথ্য ভাষার স্থায় ব্যবহৃত হইতে পারে। আমাদের সমস্ত শাস্ত্র সাহিত্যাদি সংস্কৃতেই রচিত। যদি সর্বভারতে সংস্কৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় তবে দশ বৎসরের মধ্যে যে কোন ভারতবাসীর পক্ষে ভারতের যে কোন প্রান্তে গিয়া সংস্কৃতির মাধ্যমে নিজের মনোভাব অপরের বোধগম্য করা এবং পরস্পর আলোচনা করা সুসম্ভব হইবে। অতীতের স্থায় বর্তমানেও সংস্কৃত পুনরায় দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বসাধারণের ঐক্য-বন্ধনের সেতু হইতে পারে। সংস্কৃত গ্রহণের দ্বারা আমাদের সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ, বিচার-বিতর্কের অবসান হইবে এবং আমরা সর্বগুণসম্বিত একটি জাতীয় ভাষা পাইব।

বর্তমানের প্রয়োজনঃ—

“জাতীয় ভাষা-সমস্যা। সষক্রে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া একটি সুসিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্ত আমি আমার দেশবাসীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। আঞ্চলিক ভাষাগুলি স্ব স্ব অঞ্চলে ব্যবহারের জন্ত এবং একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় ভাষা আমাদের সুবৃহৎ দেশের জাতীয় কার্য-পরিচালনের জন্ত গ্রহণই বর্তমানের দাবী। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ব্যাপারে যে-কোনরূপ জবরদস্তী অপছন্দ করি। ইহা সম্পূর্ণভাবে জন-

প্রতিধ্বনি ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার [২ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা
১০৩২ জগৎ সংস্কৃত হইবে জাতীয় ভাষা

সাধারণের স্বাধীন নির্বাচনের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং সিদ্ধান্তটি সর্বসাধারণের স্বতঃপ্রণোদিত সম্মতিতে গৃহীত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যদি জনসাধারণের মত থাকে, তবে তাহাদিগকেই ভারতের সর্বত্র বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

“ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা বিভাগকে এই বিষয়ে বথায়থ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণেই সাংবিধানিক বিধি বিধানের প্রয়োজন হয় না। যদি শিক্ষাদানের ব্যাপক ব্যবস্থার ফলে সংস্কৃত সকলের বোধগম্য হয়, তবে স্বাভাবিক ভাবেই ইহা ভারতের জাতীয় ভাষার কার্যকরী স্বীকৃতিলাভ করিবে,— যেহেতু ইহা বর্তমানেই জাতীয় ভাষার স্থান দখল করিয়া আছে।

“সংস্কৃত কিরূপ সাবলীলভাবে বলা যায় এবং ইহার প্রতি অনুরাগ কত গভীর, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতি বৎসর উজ্জয়িনীতে কালিদাস জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে। কালিদাস ভারতের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। স্বাধীন ভারতের জাতীয় ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবনের মহান্ কার্যে তাঁহাকে অগ্রদূতের মর্যাদা দিয়া আমরা এক অতি পবিত্র কর্তব্য-পালন করিতে পারি।”

প্রবন্ধটি অমৃতবাজার পত্রিকার প্রজাতন্ত্র-দিবস সংখ্যা হইতে অনূদিত। আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে এই অনুরোধ জানাইতেছি যে ডক্টর কাটজুর এই সময়োচিত উক্তির সমর্থন জানাইয়া যেন শত শত অভিনন্দন-পত্র প্রেরণ করেন। জনসমর্থন ব্যতীত এ ধরনের অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রত্যাশা করা যায় না। আর শুধু পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াই সাফল্যও প্রত্যাশা করা যায় না। তাই আমরা ডক্টর কাটজুকেও তাঁহার মতের সমর্থনে জনসমর্থন লাভের জগৎ কার্যকরী পস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানাইতেছি। একবার নেতৃস্থানীয় কেহ সাহস করিয়া প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে অচিরে সর্বভারতে তিনি বিপুল সমর্থন লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

প্রতিদ্বান

১০৩৩

পথের সন্ধান

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(১০০)

সত্যচিন্তার মৃত্যু নাই। হাজার বছর আগে যে সচ্চিন্তা করিয়াছ, আরও হাজার বছর পরে হইলেও তাহা ফলিবে। সচ্চিন্তায় তোমার সংসার ধাক্কাই প্রয়োজন। চিন্তার সাথে জড়িয়া আর কুণ্ডা মিশাইও না।

(১০১)

সংসারকে অসার জানিয়া তাহার মধ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত কর। তাহা হইলে অসারে সার জন্মিবে। সংসার কেবলই সং নহে, তাহাতে সার আছে। ভগবানই সেই সার। তবে মজা এই যে, সংসারকে একেবারে অসার না জানিলে সেই সারের নাগাল পাওয়া যায় না।

(১০২)

কাজ হাতে গুঁজিয়া দিতে পারিলে অকর্ম্মা লোকেরাও কাজের লোক হয়। কাহাকেও তুচ্ছ মনে করিও না। প্রত্যেকটি মানুষের মনে পবিত্র চিন্তা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকের হাতে মহৎ কাজ গছাইয়া দাও।

(১০৩)

পার্পণকে নিপতিত কদর্যা পৃথিবীকে স্বর্গের সুখমায় মণ্ডিত করিতে হইবে, এই তোমাদের পণ হউক।

প্রতিধ্বনি

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১০৩৪

(১০৪)

সৎ হইবার ইচ্ছা যাহার আছে, তাহার সৎ হইবার চেষ্টাও চাই।
জিদ কর, সৎ হইবে, জগন্মঙ্গলকারী হইবে, জীবনে উন্নতি করিবে, দশ-
জনের উন্নতির পথ দেখাইবে। জিদের ক্ষোভে কাজ করিয়া যাও।

(১০৫)

প্রাণপণে যোগ্যতা অর্জন কর,—সংগ্রামের যোগ্যতা, বাঁচিয়া থাকি-
বার যোগ্যতা, অপরকে বাঁচাইবার যোগ্যতা। সহস্র সংগ্রাম দিয়া
প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মাথা উঁচু করিয়া তোমাকে দাঁড়াইয়া
থাকিতে হইবে।

(১০৬)

দিকে দিকে নিজেকে বিস্তারিত কর। তোমার সত্য, তোমার
প্রেম, তোমার আদর্শ, তোমার কর্ম, তোমার ত্যাগ, তোমার তপস্কার
চারিদিকে জয়জয়কার ঘোষিত হউক। নিজেকে নিঃশেষ করিয়া
চারিদিকে সহস্রধা ছড়াইয়া দাও। বিস্তারেই জীবন, সচ্চনে মৃত্যু।
বিশ্বব্যাপী হইয়া যৌবনদীপ্ত অমর জীবনের পরিচয় দাও।

(১০৭)

বিরুদ্ধবাদীরা সজ্জবদ্ধ হইয়াই বা তোমার কি অনিষ্ট করিতে
পারিবে? তোমার আদর্শ নির্মল, তোমার লক্ষ্য উচ্চ এবং সুনির্দিষ্ট,
তোমার গতিপথ ও গমনরীতি পাপ-পঙ্কিলতা-বর্জিত, নির্মল ও নিষ্কলুষ।
তোমাকে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে কে?

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

১০৩৫

(১০৮)

এখন তিল তিল করিয়া শক্তি-সঞ্চয় কর। কাজের সময়ে যেন
বত্তার জলধারার মত বল্গাবিহীন, হিসাবের অতীত, কল্পনাতীত শক্তি
এক সঙ্গে প্রয়োগ করিতে পার।

(১০৯)

ক্ষুদ্র পুণ্য বৃহৎ পুণ্যের পাদপীঠ। ক্ষুদ্র কৃতিত্ব বৃহৎ কৃতিত্বের
অগ্রদূত। তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে আসামাত্র সাফল্য
অর্জনে বদ্ধপরিকর হও,—ক্ষুদ্র চেষ্টাতেও নিখুঁত হও।

(১১০)

একজনের সাফল্য যেখানে শত জনের গৌরব, তেমন সাফল্যই
সার্থক সাফল্য।

(১১১)

উৎসাহ, কেবল উৎসাহই, সকলের মনে জাগাইয়া তোল। বার্থতার
ভ্রুশিষ্টা সকলের মন হইতে দূর করিয়া দাও।

(১১২)

যাহারা একটা সংকারণ্যে নামিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের একাকিত্ব দূর
করিয়া দেওয়া তোমাদের উচিত। প্রথমতঃ উচিত এই জ্ঞান যে, একা
একা কত দিনে কত বড় কাজ সমাধা হইবে, কে জানে? দ্বিতীয়তঃ,
তাহাকে উৎসাহ, উপদেশ, প্রেরণা ও সহায়তা দিয়া তুমি নিজেকে ধন্য
করিবার সুযোগ পাইতেছ। তৃতীয়তঃ একক সাধকের অহংবোধ বা

প্রতিধ্বনি

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

১০৩৪

(১০৪)

সৎ হইবার ইচ্ছা বাহার আছে, তাহার সৎ হইবার চেষ্টাও চাই।
জিদ কর, সৎ হইবে, জগন্মঙ্গলকারী হইবে, জীবনে উন্নতি করিবে, দশ-
জনের উন্নতির পথ দেখাইবে। জিদের জোরে কাজ করিয়া যাও।

(১০৫)

প্রাণপণে যোগ্যতা অর্জন কর,—সংগ্রামের যোগ্যতা, বাঁচিয়া থাকি-
বার যোগ্যতা, অপরকে বাঁচাইবার যোগ্যতা। সহস্র সংগ্রাম দিয়া
প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মাথা উঁচু করিয়া তোমাকে দাঁড়াইয়া
থাকিতে হইবে।

(১০৬)

দিকে দিকে নিজেকে বিস্তারিত কর। তোমার সত্য, তোমার
প্রেম, তোমার আদর্শ, তোমার কর্ম, তোমার ভাগ্য, তোমার তপস্বীর
চারিদিকে জয়জয়কার ঘোষিত হউক। নিজেকে নিঃশেষ করিয়া
চারিদিকে সহস্রধা ছড়াইয়া দাও। বিস্তারেই জীবন, সঙ্কুচনে মৃত্যু।
বিশ্বব্যাপী হইয়া যৌবনদীপ্ত অমর জীবনের পরিচয় দাও।

(১০৭)

বিরুদ্ধবাদীরা সম্ভবতঃ হইয়াই বা তোমার কি অনিষ্ট করিতে
পারিবে? তোমার আদর্শ নির্মল, তোমার লক্ষ্য উচ্চ এবং সুনির্দিষ্ট,
তোমার গতিপথ ও গমনরীতি পাপ-পঙ্কিলতা-বর্জিত, নির্মল ও নিষ্কলুষ।
তোমাকে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে কে?

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

১০৩৫

(১০৮)

এখন তিল তিল করিয়া শক্তি-সঞ্চয় কর। কাজের সময়ে যেন
বস্ত্রের জলধারার মত বল্গাবিহীন, হিসাবের অতীত, কল্পনাতীত শক্তি
এক সঙ্গে প্রয়োগ করিতে পার।

(১০৯)

ক্ষুদ্র পুণ্য বৃহৎ পুণ্যের পাদপীঠ। ক্ষুদ্র কৃতিত্ব বৃহৎ কৃতিত্বের
অগ্রদূত। তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে আসামাত্র সাফল্য
অর্জনে বদ্ধপরিকর হও,—ক্ষুদ্র চেষ্টাতেও নিখুঁত হও।

(১১০)

একজনের সাফল্য যেখানে শত জনের গৌরব, তেমন সাফল্যই
সার্থক সাফল্য।

(১১১)

উৎসাহ, কেবল উৎসাহই, সকলের মনে জাগাইয়া তোল। ব্যর্থতার
ভূচিন্তা সকলের মন হইতে দূর করিয়া দাও।

(১১২)

যাহারা একটা সংকল্পে নামিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের একাকিত্ব দূর
করিয়া দেওয়া তোমাদের উচিত। প্রথমতঃ উচিত এই জ্ঞান যে, একা
একা কত দিনে কত বড় কাজ সমাধা হইবে, কে জানে? দ্বিতীয়তঃ,
তাহাকে উৎসাহ, উপদেশ, প্রেরণা ও সহায়তা দিয়া তুমি নিজেকে ধন্য
করিবার সুযোগ পাইতেছ। তৃতীয়তঃ, একক সাধকের অহংবোধ বা

প্রতিধ্বনি

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

১০৩৬

অন্য রিপূর হঠাৎ উত্তেজনা অসতর্ক মহুর্ভে একটা নিমেষের মধ্যে তাহার
বহু দিনের তপস্যা নষ্ট করিয়া দিতে পারে। তপস্বীকে অক্ষত রাখা
জগতের পক্ষে লাভ।

(১১৩)

লোকের বিরুদ্ধতাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখিও না। তির্যাক্ ভাবে
দেখিবার অভ্যাসই পরিবর্তিত করিয়া ফেল। ধৈর্য্য ধরিয়া সকল বিরুদ্ধ-
তাকে যোগ্য ভাবে সমাদর দাও। অত্যায়ে কাছের মাথা নত করিয়া
নহে, অত্যায়ে অস্বীকার করিয়াই তাহার প্রতি ভদ্র হও। সূর্য্যোদয়
হইতে দ্বিপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত যে তোমার বিরুদ্ধতা করিয়াছে, হয়ত
দেখিবে, যামিনীর শেষ যামে সে নিজের গরজেই বশতা স্বীকার করিয়াছে,
তোমার বন্ধু হইয়াছে, তোমার সেবক হইবে গৌরব বোধ করিতেছে। অধীর
হইও না। অপেক্ষা কর। সহিয়া থাকিবার শৌর্য্য সংগ্রামের জগতে
খুব উপেক্ষণীয় বীরত্ব নহে।

(১১৪)

দীর্ঘকালের কৃতিত্ব তোমার একটা নিমেষে ভাসিয়া যাইবে, প্রবৃত্তির
হাতে নিজেকে এত অসহায় ভাবে অর্পণ করিও না। নিবৃত্তিই মুখের।
তথাপি প্রবৃত্তিতে দোষ নাই, যদি প্রবৃত্তির হাতের ক্রৌড়নক না হইয়া
তাহাকে সর্বদা নিজের হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া চলিতে পার।

(১১৫)

মানুষের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিলে ধর্ম্মাচার্য্যদের পসার বাড়ে, দলে
দলে লোক নির্বিচারে মোহাবিষ্ট হইয়া তাহাদের দলে ভিড়ে। এই
সত্য জানিবার পূরে অনেক ধর্ম্মরাজ-কেশরীও কুসংস্কার ও নিম্নস্তরের

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

১০৩৭

সংস্কারের সহিত তাল মিলাইয়া চলিয়াছেন এবং বিরাট বিপুল সম্প্রদায় গড়িয়াছেন। বিচারশীল মন লইয়া লোক সে ভাবে চলে না, যেমন ভাবে বিচারহীন মন লইয়া মানুষ চলিতে পারে। এই কারণে কখনো কখনো অতি বিগত উচ্চাঙ্গের তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত সঙ্কল্পও দলে পুরু বা সংখ্যাবলে ভারী হইতে পারে নাই। ইহাকে তাহার পরাজয় বলিয়া ভ্রম করিও না।

(১১৬)

সত্যের পরাজয় নাই। সত্যে অবিচলিত হও। সত্যকে জান প্রাণের পরম ধন, সত্যকে জানো তোমার অখণ্ড স্বরূপ, সত্যকে জানো শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও চরম আশ্রয়।

(১১৭)

কখনো হীনমন্যের ভাব অবলম্বন করিও না। জয়ী হইতে পার না, এমন দুর্বল ভাব মনের মধ্যে রাখিও না। অপরের জয়ধ্বনি-মুখরিত রথচক্রনির্ঘোষ শুনিয়া দীর্ঘাশ্বিত হইও না। শক্তিমান কখনো দীর্ঘায় অধীর হয় না।

(১১৮)

দীর্ঘা দুর্বলের আশ্রয়, স্বাবলম্বনে শক্তিমানের পরিচয়। আত্ম-শক্তিবলে তোমরা অসাধ্য-সাধন করিতে পার, এই বিশ্বাস রাখিও এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী চলিও।

(১১৯)

বিশ্বাসকে দূত কর। বিশ্বাসকে মহত্তম আদর্শের সহিত সংযুক্ত কর। বিশ্বাসকে কর্মপ্রবণতার সহিত পরিণীত কর। কেবল বিশ্বাস

প্রতিধ্বনি

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

১০৩৮

করিলেই চলিবে না, বিশ্বাসানুরূপ কাজও করিতে হইবে। কাজ করিতে করিতে তনুত্যাগ বড় চমৎকার সৌভাগ্য। অলস জীবন যাপিও না।

(১২০)

কোনও নামজাদা লোক তোমাদের সহায়ক নাই বলিয়া নিজেদিগকে নিঃসহায় জ্ঞান করিও না। তোমরা ক্ষুদ্রেরাই মিলিত চেষ্টায় বাহ্য করিতে পার, বিখ্যাত পুরুষগণের সহায়তায় তাহা সম্ভব নহে। তোমরা মিলিত হও। খ্যাতির ভিতরে শক্তি নাই, শক্তি রহিয়াছে ব্রীকো।

(১২১)

আমরা বন্ধন-মুক্তির বার্তা লইয়া আসিয়াছি। মানুষকে নূতন নূতন কুসংস্কারের নাগপাশে বাঁধিয়া নিজেদের পূজা প্রবর্তিত করিতে আসি নাই। ইহাই আমাদের অপরাধেয় পৌরুষের অকুরন্ত উৎস।

(১২২)

ত্যাগ জীবনকে বিকশিত করে, স্বার্থপরতা জীবনকে সঙ্কুচিত করে। আত্ম-কেন্দ্রিকতা দৃষ্টির দূরত্ব কমাইয়া দেয়, পরার্থপরতা দৃষ্টিকে সুদূর-প্রসারিণী করে। যে যতটুকু পার, ত্যাগী হও। শাস্ত্রকারেরা ত্যাগকে অমৃতত্ব লাভের প্রধান উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ত্যাগই শান্তির পথ।

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

১০৩৯

(১২৩)

ত্যাগীর সম্মান ভোগীর চেয়ে শতগুণ বেশী। প্রতিষ্ঠাবান্ ভোগীকে সম্মানিত হইতে দেখিয়া প্রলুব্ধ হইও না। ত্যাগী পুরুষকে সম্মানিত হইতে দেখিয়া ত্যাগী হইতে চেষ্টা করিও, ত্যাগীর ভড়ং করিয়া লোক-প্রভারণার চেষ্টা করিও না। অপরকে যে ঠকায়, সে নিজে বেশী ঠকে।

(১২৪)

ত্যাগ যখন প্রেমের উপরে ভিত্তিমান্ হয়, তখন তাহা কেবল আদর্শই সৃষ্টি করে না, তৃপ্তি, তুষ্টি, পুষ্টি এবং কল্যাণকে জন্ম দেয়। ত্যাগীরা সবাই প্রেমিক হও, প্রেমিকেরা সবাই ত্যাগী হও।

(১২৫)

বুথাই জীবন চলিয়া না যায়, তার দিকে রাখ লক্ষ্য। আত্মকল্যাণ ও পরকুশল উভয়েরই জন্ত জীবনকে যুগপৎ নিয়োজিত কর।

(১২৬)

আগেও নহে, পরেও নহে, ঠিক সময় মতন কাজে হাত দিতে পারা এবং ঠিক সময়ের মধ্যে কাজটা আদায় করা প্রকৃত কর্মীর লক্ষণ। এই জন্তই যথার্থ কর্মীরা কর্মের ক্ষেত্র-নির্মাণে লাগিয়া যায় সকলের আগে। আগেই প্রায় এক যুগ পূর্বে। যথার্থ কর্মীদের চরিত্রের অনুশীলন কর।

প্রতিধ্বনি

বিচিত্রা

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১০৪০

(১২৭)

যত কিছু বিরুদ্ধ অবস্থা আসিতেছে, সবই কোনও না কোনও প্রকারে তোমার কিছু না কিছু কুশল-বিধান করিবে, এই বিশ্বাস রাখিও। বাধা দেখিয়া মন-মরা হইও না। বাধাকে জয় করিতে চেষ্টা কর, বাধার মুখে কাবু হইয়া যাইও না।

(১২৮)

তোমার ভিতর দিয়াও মহাশক্তির প্রকাশ হইতে পারে, অবশ্য যদি তুমি সাধন কর।

(১২৯)

তোমরা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করিও না। শক্তির তোমরা অনন্ত আধার। শুধু সাধন করিতেছ না বলিয়া তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না।

 বিচিত্রা

*

*

*

*

*

“তোমার চেয়ে বেশী আর কাউকে ভালবাসতে পারলাম না, তোমাতে ভিন্ন জীবনে আর কিছুতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কতে পারলাম না, এমন কি ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি কতে না পেরে সর্বত্র বিশ্বাস হারিয়েও তোমাকে অবিশ্বাস কতে পারিনি। কারণ, তোমার জীবনের

কাল্পন, ১৩৬৭]

বিচিত্রা

প্রতিধ্বনি

১০৪১

কর্ম ও ধর্ম-সাধনার মধ্যে এক কণাও ফাঁকি খুঁজে বের করতে পারিনি। কাজেই তোমাকে বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না এবং এই বিশ্বাসের ফলেই একদিন আমার জন্ম হ'য়ে গেল অর্থাৎ আমি দেহের মধ্যেই নবজন্ম নিলাম",—শিলং হইতে শ্রীশ্রীবাবামণিকে লিখিয়াছেন এক বিমুগ্ধ সাধক।

পত্রখানার অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যয়ের ছাপ রহিয়াছে। এমন প্রত্যয় আমাদের প্রতিজ্ঞনেরই কবে হইবে?

*

*

*

*

*

ফতেগড় (ইউ, পি.) হইতে জনৈক ভ্রাতা লিখিয়াছেন,—“বাবামণির জন্মোৎসবের দিন আমি শিলং ছিলাম। তবে নগরবাসীরূপে ছিলাম না, ছিলাম শিলং হাসপাতালের রোগী রূপে। ভোরবেলা মাইক যোগে মধুর হরি-ওঁ কীর্তন বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। হাসপাতালের নিকটে একস্থানে হরিসভা নামে পরিচিত একখানা ঘর আছে, তার উপরে মাইক ফিট করা আছে। প্রভাতে যখন হরি-ওঁ কীর্তনের সুর গুলিলাম, তখন যাইতে পারিলাম না। হৃপ্পুরে অসুস্থ শরীর নিয়াই বুজিয়া বাহির করিলাম কীর্তনের স্থান। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই সময়ে একটা প্রাণীও তখন সেখানে ছিল না। আমি ভাবিয়া-ছিলাম যে, কোনও অখণ্ডমণ্ডলীতে বুঝি বাবামণির জন্মোৎসব হইতেছে কিন্তু বাইয়া দেখি, বারো মাসে তেরো পার্কণের হরিসভা। শেষে আমি হাসপাতালের বারান্দায় বসিয়াই জন্মদিনের উপাসনা করিয়াছি।”

ভক্ত ভ্রাতার নিষ্ঠাকে প্রশংসা করিতেছি। এই সম্পর্কে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার যে, অখণ্ড-উপাসনার স্থান-নির্বাচন সম্পর্কে ভাবিবার আছে। স্থানমাহাত্ম্য কে না স্বীকার করিবেন?

প্রতিধ্বনি

বিচিত্র।

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১০৪২

*

*

*

*

*

হাওড়া-ঘাটের একটা ভ্রাতা শ্রীউৎপল দত্ত “মন্দিরে”র গানগুলির ইংরাজি অনুবাদ করিতেছেন। অনুবাদ খুবই সুন্দর হইতেছে, তবে এই অনুবাদের উপরে যোগ্যতর হস্তের একটু পরশের প্রয়োজন হইবে। তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ক্রমে ক্রমে আরও অনেক গানের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া হাত পাকাইতে। তাহার পরে যথাকালে প্রকাশের ব্যবস্থা সম্ভব ও সম্ভব হইবে।

বলা বাহুল্য, স্বরূপানন্দ-চিত্তা-ধারাকে প্রসারিত করিবার কাঙ্ক্ষা এইরূপ উৎসাহ খুবই প্রশংসাজনক।

উক্ত ভ্রাতা আরও একটা প্রস্তাব দিয়াছেন। ভারত সরকারের কাছ হইতে সহযোগিতা নিয়া স্বরূপানন্দ-চিত্র-প্রদর্শনীটি দেশের নানা স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। প্রস্তাব ত নিশ্চয়ই উত্তম কিন্তু দেশটা যখন স্বাধীন, তখন সংকার্য্য যতটা সরকারী সাহায্য ছাড়া করা যায়, তাহার চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে কর্তব্য। সরকারী সাহায্য ছাড়াও আমরা স্বরূপানন্দ-চিত্র-প্রদর্শনী কত স্থানে দেখাইতে পারি, তাহার যোগ্য চেষ্টা এখনো করা হয় নাই। খড়্গাপুর, বাদবপুর, আগরতলা, করিমগঞ্জ, শিলচর, নগাঁও, লামডিং, মণিপুর রোড, বোরহাট, তিনমুকিয়া এবং ডিব্রুগড় এই কয় স্থানেই মাত্র স্বরূপানন্দ-চিত্র-প্রদর্শনী প্রদর্শিত হইয়াছে। যেখানে আমাদের ঐক্য বেশী, সেখানে ইহা অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। আমাদের আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়াই কাজ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

*

*

*

*

*

যখনই দেশে বা জগতে কোনও নূতন চিন্তার আবির্ভাব হয়, প্রায়শই দেখা যায় তখন একজন বিশাল চিন্তানায়কের অনুধ্যানের

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

বিচিত্রা

প্রতিধ্বনি

১০৪৩

অনুসরণ করিয়া অনুপূরক বা বিস্তারক সাহিত্যের উদ্ভব হয়। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শঙ্কর, চৈতন্য, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ আদি প্রত্যেকের সম্পর্কে এই কথা সত্য।

অথগুণ্ডলেখর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের চিন্তাধারারও অনুসরণকারীর সংখ্যা অগণিত। ইহাদের মধ্যে অনেকে অল্প অল্প করিয়া নিজ নিজ চিন্তাকে অক্ষয়ের নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে যত্নবান হইয়াছেন। তন্মধ্যে ভ্রাতা সুধানন্দ গৃহস্থের (৮মন্নথ নাথ গুপ্ত) কিছু কিছু গান অধুনালুপ্ত “অথগু-ভারতী”র মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি আমরা ভ্রাতা শ্রীযতীন্দ্র নাথ দাসের “প্রাণের ঠাকুর” শীর্ষক সঙ্গীতগুলি আস্তে আস্তে ‘প্রতিধ্বনি’তে প্রকাশ করিব বলিয়া ভাবিতেছি। সম্প্রতি আমরা ত্রিপুরার ভ্রাতা শ্রীরমণ চন্দ্র সরকারের লিখিত কবিতার খাতাও দেখিয়াছি। তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আরও শত শত লেখা লিখিয়া হাতের জড়তা মোচন করুন এবং সকল লেখা সম্বন্ধে রক্ষা করুন। প্রতিধ্বনির সম্পাদকের নামে একটি কবিতাও এখন পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। যেখানে বাঁহার লিখিবার ক্ষমতা আছে, তিনি লিখিতে থাকুন এবং নিজ নিজ রচনা সম্বন্ধে রক্ষা করুন। একদা ইহার মধ্যে কিছু অংশ প্রকাশিত হইবেই। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, রচনা যেন আদর্শনিষ্ঠ হয়।

গুরু

[শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের শুভ আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা রামমোহন-রায় পাঠাগার-অঙ্গনে অনুষ্ঠিত জনসভার সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষণ ।]

মানুষের জীবনে গুরু নিত্যান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাথমিক পাঠশালায় স্বল্পশিক্ষিত যে গুরুমশাই আমাকে শৈশবকালে অ, আ, ক, খ শিখিয়েছিলেন, তাঁর প্রয়োজনীয়তা আমার জীবনে অস্বীকার করবার উপায় নেই। তিনি না থাকলে হয়তো নিরক্ষরই থাকতে হ'ত। পরবর্তী জীবনে অগ্র যে সব মনীষীদের নিকট পাঠগ্রহণ করেছি, তাঁরাও আমার জীবনে ছিলেন পরম সম্বল। তাঁরা আমার জীবনে না এলে, জীবনটাই অগ্রপ্রকার হ'ত।

কিন্তু আমার প্রথম জীবনের যিনি গুরুমশাই ছিলেন, গুরুভক্তির প্রাবল্যে যদি চিরদিন তাঁকেই আশ্রয় করে থাকতাম, তাহ'লে আমার শিক্ষার সীমা হ'ত নিত্যান্ত ক্ষুদ্র—তার শেষ হ'ত হয়ত কথামালা, আখ্যান-মঞ্জরী বা ধারাপাত পাঠে।

সেই গুরুই শ্রেষ্ঠ, যিনি ছাত্রের নিকট সম্বন্ধ নিজেকে নিম্নপ্রয়োজন ক'রে তোলেন। পাঠশালার গুরুমশাই যদি ছ' এক বছরের মধ্যে পাঠশালার পাঠটুকু শিখিয়ে দিতে না পারেন—তাহ'লে গুরুমশাই হিসাবে তিনি হন নিত্যান্ত ব্যর্থ, আর তাঁর ছাত্রটা তৈরী হয় একটু নিরেট মূর্থ।

শিক্ষার ভগতে গুরুর প্রয়োজন ছাত্রের চৈতন্য-উদ্বোধনে। কোন

ফাল্গুন ১৩৬৭

গুরু

প্রতিধ্বনি

১০৪৫

Sri Sri Anandam

একটি বিষয় ছাত্রকে বেশ করে বুঝিয়ে দেওয়ায় গুরুর তত গৌরব নাই, যত গৌরব ছাত্রের বুঝবার শক্তিটা স্মরণিত করে দেওয়ায়। অ, আ, ক, খ হয়তো মুখস্থ করাতে হয়—তোতাপাখী পড়ান ক'রে। কিন্তু 'অ' এর পর 'জ' দিলে যে 'অজ' হয়, 'আ' এর পরে 'ম' দিলে যে 'আম' পড়তে হয়, এটা বুঝবার শক্তি যদি ছাত্রের না হয়, তাহ'লে সে জীবনে বই-ই পড়তে পারবে না। পৃথিবীর সব বই তো আর পড়িয়ে মুখস্থ করিয়ে দেওয়া যায় না। তারপর পড়িয়ে মুখস্থ করিয়ে দিলেই বা কি? পড়ুয়াকে পাঠ্যের বিষয়বস্তুটা বুঝতে হবে, নইলে মুখ থেকে পাঠ্য মস্তিষ্কে পৌঁছুবে না। এই বোঝানোর অর্থ মাত্র মানে বলে দেওয়া নয়। ব্যাঘ্র শব্দের অর্থ শার্দ্দূল, আর বিড়াল শব্দের অর্থ মার্জ্জার, একথা শতবার শিখিয়ে দিলেও ছাত্র বাঘে বিড়ালে প্রভেদ বুঝবে না। ফলে হয়তো ব্যাঘ্রকে শার্দ্দূল সম্বোধন করতে করতে একদিন বাঘের পেটেই বাবে। এলাহাবাদে গঙ্গাতীরের এক বাড়ীতে ভূগোল-পাঠ্যরত একটি পশ্চিমা শিশুকে 'নদী' কি, জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে আমায় নদীর ভৌগলিক সংজ্ঞা নির্ভুল মুখস্থ বলেছিল। নদীর উৎপত্তিস্থল কি, তা'ও ঠিক বলেছিল, নদীর শেষ কোথায়, তা'ও সঠিক বলতে পেরেছিল। কিন্তু-যমুনার সঙ্গমস্থল আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, ও জায়গাটা কি? সে উত্তর দিল, "উম্মো সঙ্গমতীরথ হায়"। কিছুতেই তাকে বলাতে পারলাম না যে ওখানে দুটো নদী মিলেছে। তার গুরু তাকে নদী কি, বোঝাতে পারেন নি, চেনান নি, শুধু নদীর মানে মুখস্থ করিয়েছেন। ছাত্রটির জীবনে গুরুর প্রয়োজন সার্থক হয় নি। গুরুটা লম্বু হয়ে গিয়েছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, দীক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুর অনুরূপ প্রয়োজন—
বিশেষতঃ ধর্মের দীক্ষায়। ধর্ম-সাধনার যিনি গুরু, তাঁর প্রয়োজন

প্রথমতঃ ধর্ম-সাধনায় আনন্দের সন্ধান দেওয়ায়। সেই আনন্দ যে পেল, তার সাধনা অব্যাহত থাকবে—কে আর ইচ্ছায় আনন্দ ছেড়ে নিরানন্দ ভোগ করতে চায়! দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রয়োজন ধর্ম শিক্ষা দেওয়ায়—সাধনার পথ দেখিয়ে দেওয়ায়। এই শিক্ষা যে নিতে পারল না, সাধনার পথে যে অগ্রসর হ'তে পারল না, তার পক্ষে গুরু বার্থ। আজীবন গুরুর শ্রীচরণে মাথা ঠুকলেও তার কিছুই হবে না, সে মাথা ঠোকা যত ভক্তিভরেই করা হোক না কেন।

গুরু নিঃসন্দেহে ভক্তির পাত্র। অবিসংবাদী বিশ্বাসেরও পাত্র। পাঠশালার গুরুমশাই যেটাকে 'অ' বলে শিখিয়েছিলেন, সেটাকে যদি বিশ্বাস করে ছাত্র 'অ' না ব'লে 'ক' বলে, তাহ'লে তার শিক্ষার শেষ সেইখানেই। তাঁকে ভক্তি করাও প্রয়োজন আছে—না হ'লে এ বিশ্বাস তাঁর ওপর কিসের থেকে হবে! কিন্তু গুরুভক্তিরও প্রকার-ভেদ আছে। গুরুর প্রতি অবোধ ভক্তি মোহেরই নামান্তর। বুদ্ধিপূর্বক যে ভক্তি, সেটাই প্রকৃত গুরুভক্তি। যার আশা একটি মাত্র মানুষকে প্রণাম ক'রে, তাঁর চরণামৃত পান ক'রে, তাঁরই যশোগাথা কীর্তন ক'রে, তার সব কিছু লাভ হবে—তার বুঝবার মধ্যে একটা ভুল আছে। নিবিড় অরণ্যে যদি পথ হারিয়ে যায়, পথজ্ঞ কোন অরণ্যবাসীর আশ্রয় নিলে সে হয়তো পথটা দেখিয়ে দেবে—কিন্তু সে পথে নিজেকে চলতে হবে, না হ'লে অরণ্যবাস শেষ হবে না। সব পথ-হারার যদি আশা থাকে যে, পথজ্ঞ তাকে কাঁধে করে পথ পার করে দেবে, তাহ'লে সে আশা পূর্ণ না হতেও পারে। গুরুভক্তির মূল তথ্য হচ্ছে গুরুবাক্যে ভক্তি; বাচকের উপর ততটুকুই ভক্তি প্রয়োজন, যেটুকু তাঁর বাক্যে ভক্তি বা বিশ্বাস রাখার জন্ত দরকার। যে লোকটাকে বিশ্বাস করি না, তাঁর কথায় বিশ্বাস

মাঘ, ১৩৬৭]

গুরু

প্রতিধ্বনি

১০৪৭

রাখা শক্ত। সেইজন্তই গুরুকে বিশ্বাস করার প্রয়োজন—না হ'লে তাঁর কথা শুন্ছে কে !

কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, গুরু আর নূতন কথা কি বলবেন, ধর্ম সম্বন্ধে সব কথাই তো বইতে লেখা আছে—তার সুলভ সংস্করণও আছে—পড়ে নিলেই হয়। এ রকম কথা বলার মূলে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আছে। অ, আ, ক, খ শিখবার বই—এর অভাব নেই—কিন্তু সে বই সকলকেই কাউকে না কাউকে গুরুমশাই ঠিক করে পড়তে হয়। কেউ বই কিনেই পড়তে শেখে না। এই অহঙ্কার আশ্রয় করে ধর্মশিক্ষা আরম্ভ করলে, ধর্মের অ, আ, ক, খ শেখাও দুক্লহ হয়ে উঠবে।

কবীরের দোহায় আছে—

“লিখালিখি কী বাত নহি

দেখাদেখি কী বাত

তুলহা তুলহীন মিলি গয়ে

ফিকি পড়ে বরাত।

বিবাহ, নরনারীর উদ্ভাহ-মিলন, বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপানোর মধ্যে নেই, তাদের পরস্পরের চাক্ষুষ দর্শন ও দৈহিক ও আন্তরিক মিলনের মধ্যে আছে। তুলহা-তুলহীনের, বরকনের যখন মিলন হয়ে যায়, তখন বরষাত্রী ফিরেই যায়। ঈশ্বর-প্রেমিকের ভগবৎ-মিলন-যাত্রায় সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। বরষাত্রীর মধ্যে যেমন একজন থাকেন বরকর্তা, যার অনুজ্ঞায় আদেশে উপদেশে যাত্রারস্ত থেকে যাত্রাশেষ পরিচালিত হয় সূষ্ঠুভাবে, তেমনি ঈশ্বর-মিলন-যাত্রায় একজন গুরু থাকা প্রয়োজন। তাঁরই পরিচালনায় ঈশ্বর-মিলন যাত্রার সার্থক সমাপন হবে।

“অথশ্রমশ্রুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।

তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥”

ঈশ্বর-চরণ দর্শন করিয়ে দেওয়াতেই গুরুর পরিশ্রমের শেষ। পূর্ণ ঈশ্বর-জ্ঞান ব্যক্তিগত সাধন-সাপেক্ষ, সেখানে গুরুর প্রয়োজনীয়তা নেই।

সকলের গুরু হয়তো মহামানব নন। শিষ্যের পক্ষে তাতে কিছুই এসে যায় না। গুরুর শিষ্যকে শেখাবার মত সম্বল থাকলেই হ'ল। সাধারণ মানব ও মহামানবের মধ্যে যে ব্যবধান, তারই মধ্যে অনেক মানব আছেন, যিনি আমার গুরু হবার উপযুক্ত।

‘মন্ত্রাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদগুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ’—এই বিশ্বাসই শিষ্যকে সাধন-পথে অগ্রসর করিয়ে দেয়। নিজ গুরু জগদ-গুরু না হ'লেও।

শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-রচিত কয়েকখানি পুস্তিকা আমি পড়েছি। দর্শনের সৌভাগ্য আজই হ'ল। তাঁর রচিত পুস্তক প'ড়ে আমার ধারণা, শিষ্যকে শ্রেয় ও প্রেয় পথে নিয়ে যাবার তাঁর অনেক সম্বল আছে। আর তদুপরি আছে শিষ্য-প্রবোধিনী ভাষার উপর আধিপত্য। যারা তাঁকে বুদ্ধিপূর্বক আশ্রয় করবেন, আমার বিশ্বাস, তাঁরা অনন্ত কল্যাণের পথে পরিচালিত হবেন।

আপনাদের সকলের সঙ্গে জনহিত-ব্রত এই পরম বৈরাগীকে নমস্কার জানাচ্ছি।

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

১০৪৯

অখণ্ড-বার্ণী

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(২৪৫)

কেউ কেউ উপবাস করেন একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্ত। কেউ করেন চিত্ত-শুদ্ধির জন্ত। কেউ করেন শরীরের সুস্থতা সম্পাদনের জন্ত। কেউ করেন শরীরকে কষ্টসহিষ্ণু করবার জন্ত। এ সব উপবাসে নিজের হিত হয়, অথচ অপরের অহিত হয় না। ইহা উত্তম উপবাস। কেউ কেউ উপবাস করেন লোকের উপর নৈতিক চাপ দেবার জন্ত, অর্থাৎ তাদের বিচার ও কর্তব্যবুদ্ধিকে জাগরিত করে তাদের গারাই কোনও একটা অত্যাচারের প্রতিকার করিয়ে নেবার জন্ত। এ উপবাসও অনুত্তম নয়।

কিন্তু কেউ কেউ উপবাস করেন, লোকের উপরে অবৈধ চাপ দিয়ে তাদের স্বার্থ-হানিকর কাজে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদিগকে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য কত্তে। এ উপবাস জুলুমবাজির নামান্তর। কেউ উপবাস করেন টাকা আদায়ের জন্ত, কেউ উপবাস করেন নাম-ঘশ বৃদ্ধির জন্ত। কেউ কেউ করেন জোখবশতঃ, কেউ কেউ করেন অপরের অনিষ্ট-কামনা নিয়ে। এসব উপবাস অতি জঘন্য এবং নিন্দনীয়।

সামান্য প্রয়োজনে বা নিম্নপ্রয়োজনে উপবাস করা অসুচিত। ভগবদন্ত এই দেহকে ভগবানের কাজের জন্ত উপযুক্ত রাখতেই হবে। যে উপবাসে সে উপযুক্ততা নষ্ট হয়, সে উপবাস অসুচিত।

(২৪৬)

জগতে সবাই কুলী, সবাই মজুর। কেউ হয়ত হাত-পা খাটায়, কেউ হয়ত বা মনকে আর বুদ্ধিকে খাটায়। কিন্তু খাটুনি আছে সবারই। শ্রম যে কর্কে না, জগতে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

মেধাবী ও প্রতিভাবান ব্যক্তির ক্ষমতা শ্রমের পক্ষে যোগ্যতর বলে স্থূল শ্রম ছেড়ে দেন। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অনেক ক্ষমতা শ্রমের অযোগ্য ব্যক্তিও স্থূল শ্রম ছেড়ে দিয়ে আলস্যের অবতারে পরিণত হন, দেশ, জাতি বা সমাজ জনোকা-বৃত্তির অনুসরণকারী, পরপিণ্ডোপজীবী, পরগাছাতে পরিপূর্ণ হয়। তার ফলে দেশ, জাতি বা সমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ধ্বংস থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য মেধাবী পুরুষদেরও আজ দৈহিক শ্রমসাধ্য জীবনোপায় গ্রহণ করা কর্তব্য। কারণ, প্রতিভাবানের দৃষ্টান্তই প্রতিভাহীনের অনুসরণ করে।

(২৪৭)

হতাশা আমার নেই। মন্দ জিনিষ আর যত কিছু বল, সবই আমার আছে, কিন্তু হতাশা নেই। অনেকে আমার জীবন-কাহিনী জানতে চায়। আমি বলি না। বলাবার প্রয়োজনই বা কি? বলে বিশ্বাস কর্কেই বা কেন? বিশ্বাস করলেও তাতে শিখবে ত মাত্র ঐ একটা কথা,—হতাশা আমার নেই।

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

অথগু-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০৫১

(২৪৮)

চাই আগে ক্ষেত্র-নির্মাণ। এমন ভূমি তৈরী কতে হবে যেন, দৃঢ়মেরুদণ্ডসম্পন্ন একটা শক্ত রকমের বীৰ্য্য-বরীয়ান্ নববল-প্রবদ্ধ দুর্দ্বর্ষ জাতির সৃষ্টির পক্ষে তা হয় একান্ত অনুকূল। আমি চাই, প্রত্যেক বালক ভারতবর্ষকে ভালবাসুক এবং যা কিছু পূর্ণতা লাভের বিষয়, তাকে বর্জন কতে শিখুক। আমি চাই, প্রত্যেকটা বালিকা ভারতবর্ষকে ভালবাসুক এবং ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ তপঃফলকে নিজ নিজ জীবনে মূর্ত্তিদান করুক। আমি চাই, ভারতের ছাগল, ভেড়া কুকুর, গরুগুলি পর্য্যন্ত ভারতকে এমন গভীরভাবে ভালবাসুক, যেন ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্ত জীবন-বিসর্জনে তারাও গৌরব অনুভব করে। কন্ঠের দিকে যতটা হোক না হোক, ভাবের দিকে আজ পূর্ণতা আসুক, প্রাণে প্রাণে প্রেমের বশ্য বহিতে থাকুক, সেই বশ্যের জলে হৃদয়ের পরতে পরতে পলি পড়ুক, তবে না আশা করব যে, এই মাটিতে শ্রামল-শম্পরাশি অভ্যুদয় হবে, কোমল পুষ্পনিচয় গুচ্ছে গুচ্ছে প্রস্ফুটিত হবে।

(২৪৯)

এমন চিন্তার প্রসার চাই, যে চিন্তা পাথরের মধ্য দিয়ে প্রবেশ-পথ ক'রে নেবে। এমন চিন্তা-প্রসারক চাই, যাঁরা গাধাকে দিয়ে ঘোড়ার কাজ করিয়ে নেবেন, ধূলিকণাকে দিয়ে পর্বতের কাজ করিয়ে নেবেন, জলবিন্দুকে দিয়ে মহাসিন্ধুর বিধবিন্ধবসী তরঙ্গালোড়ন সৃষ্টি করবেন।

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

১০৫২

(২৫০)

যোগীর পক্ষে কৰ্মই হচ্ছে. ভগবত্পাসনা। যে কাজই করুন, তার ভিতর দিয়ে তিনি নিজেকে অনুক্ষণ ভাগবত-চৈতন্যে যুক্ত ক'রে রাখছেন। সুতরাং করণীয় কৰ্ম ক'রে ফেলেই তাঁর চিত্ত নিরুদ্ধেগ, তার ফল “সু” হ'ক আর “কু” হ'ক।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস ও অকংগ্রেসীদের কাজ :—ভাগলপুরের খবরে প্রকাশ যে, বিগত ২৭শে জানুয়ারী আচার্য বিনোবা ভাবে সাধারণতন্ত্র-দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়া বলেন, গান্ধীজীর সময়ের সংযোগসাধনী কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর তাহার সেই অমূল্য ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, নির্বাচনী যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যতীত বর্তমানে কংগ্রেসের আর কোন কাজ নাই বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। কংগ্রেসের সমালোচনা করাই অগ্রাগ্র দলের একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি কংগ্রেসের ভাল কাজ সম্পর্কে তাহারা জানিয়া শুনিয়া ওঁদাসিত্ত প্রকাশ করিয়া থাকে। 'দলীয় কুশাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসীরা কোন কথা বলিতে পারেন না বলিয়া তিনি জানান। সরকারের ব্যয় ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

গত কয়েক বৎসরে ভারতে বহু ভাল কাজ হইয়াছে। কিন্তু নিম্ন-

ফাল্গুন, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

১০৫৩

স্তরের মানুষের অবস্থার কোন পরিবর্তন সৃষ্টি না হওয়ায় তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ এখনও বিद्यমান আছে। তাহাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্ত সামান্যই করা হইয়াছে—ফলে অসন্তোষের বীজও তাহাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

ভারতে ভূমির প্রশ্নই বৃহত্তম সমস্যা। উহার সমাধানের জন্ত এখনও আন্তরিকভাবে কোন চেষ্টা হয় নাই। অপরদিকে শ্রেণী, ভাষা এবং প্রদেশ লইয়া ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, জাতীয় ঐক্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। শ্রীভাবে বলেন, তিনি এই সম্পর্কে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে এক সাধারণ কার্যসূচী গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। তিনি তাহার সেই আহ্বান জনতার প্রতি জানাইয়া বলেন যে, তিনি নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করিয়া আর সময়ের অপব্যবহার করিতে চাহেন না।

এইরূপ পরিস্থিতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্ত আমাদের অবশ্যই কোন সাধারণ কার্যসূচী গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। ভারতের উন্নতির জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে এবং সকলে বাহাতে দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবার জন্য সমভাবে চেষ্টা করিতে পারে তাহার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। এই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানাইয়া ব্যর্থ হইবার কথা তিনি স্বীকার করেন এবং বলেন, সকল নেতার নেতা সেই জনতাকে তিনি এই অবশ্যকরীয় কার্যে হাত দিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। তিনি জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দেশোন্নয়নের কাজে মিলিত হইবার জন্য উপদেশ দেন।

লাঠি :—ইংরেজ আমলে বাংলা পুলিশের লাঠি ছিল ছয় ফুট,

স্বাধীন ভারতে তাহা কমিয়া হইয়াছে চারিফুট। সংখ্যায় নাকি তাহার পনের হাজার। দশ হাজার লাগে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বিভাগে, পাঁচ হাজার কলিকাতা পুলিশে।

সমাধান কোথায়? :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সমাবর্তন-ভাষণে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এবং শ্রী এন. কে. সিদ্ধান্ত উভয়েই শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান বিপর্যয়কর অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোনও সত্যিকারের প্রতিকারপন্থা নির্দেশ করিতে পারেন নাই। উচ্চশিক্ষা-ক্ষেত্রে নির্বিচারে ছাত্রভর্তির ব্যবস্থাদির বৃদ্ধির মাধ্যমে যে এই সমস্ত সমাধান হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করিয়াও দিনের পর দিন কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই যেন সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইতেছে। সত্যিকারের সমাধানের জন্ত জন-গণ ও সরকারের সমগ্র শক্তি আজ পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি নিয়োজিত হওয়া আবশ্যিক। সেজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা-কেন্দ্রীক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রবর্তনের জন্য সর্ব-শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। দেশের প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া বৃত্তিগত শিক্ষা-ব্যবস্থার বহুল প্রসারের মাধ্যমেই যুবশক্তির এই বিপুল অপচয় রোধ করা সম্ভব। আজ একের পর এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইতেছে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সুশমনস কোন পরিকল্পনার আভাস-মাত্র পাওয়া যাইতেছে না। তাই সরকারের সকল প্রচার-প্রচেষ্টা কেবল ফুটাপাত্রে জল ঢালার ন্যায় ব্যর্থতার পর্য্যবসিত হইতেছে। আজ যে সময়ে বড় বড় নেতারা দেশের ছোট খোট সমস্ত সমাধানেও শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিতেছেন, তখন ঝড়ের মুখে পতিত বৃহৎ তরুণীর অক্ষম কর্ণধারের হস্ত হইতে, যেভাবে সাধারণ একজন বাতী নৌকার হাল কাড়িয়া নিয়া সকলকে রক্ষা করে, তেমনি আজ দেশের সাধারণ

প্রতিধ্বনি

(মাসিক পত্রিকা)

৯ম বর্ষ } চৈত্র, ১৩৬৭ { ১২শ সংখ্যা

অখণ্ড-বাণী

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(২৫১)

যখন সবাই প্রাণান্ত উৎসাহে কাজ কচ্ছে, তখন চিরকালের অলসেরাও ব'সে থাকতে পারে না। এ গ্রামের যারা কুঁড়ের বাদশা, কান্কে তারাও অপ্রত্যাশিত পরিশ্রম করেছে। তারই জন্তু না আমি বলি, অলসকে আলস্যের কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা ক'রো না, তার চোখের সামনে শ্রম-যজ্ঞে আহুতি দিতে থাক, এক একবার 'স্বাহা' বলবে, আর এক একটা ক'রে আলস্য-বন্ধন তার ছিঁড়বে।

(২৫২)

লক্ষ্যটা যখন সকলের হ'য় এক, তখন তর্ক-বিতর্ক আর বন্দ্ববদ্ধ ছাড়াই নির্ধারিত হ'য়ে যায় যে, 'কে

১০৫৬

কোন কাজ করবে। উপায় নিয়ে কলহ করার আগে মানুষ যদি লক্ষ্য নিয়ে ঐক্য-সাধন করতে পারে, তা হ'লে উপায়-নির্দ্ধারণের জটিলতা অর্ধেক কমে যায়।

(২৫৩)

ঐক্যের কতকগুলি লক্ষণ আছে। ক'জন লোক যখন ঐক্যবদ্ধ হ'য়েছে তখন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে, এ সব লক্ষণ তাতে রয়েছে কি না। যেখানে ঐক্য রয়েছে, সেখানে পরস্পরে অবিশ্বাস নেই, অনাস্থা নেই, সন্দেহ নেই। যেখানে ঐক্য রয়েছে, সেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিজের সুখ-সুবিধার চেয়ে অপরের সুখ-সুবিধার দিকে বেশী লক্ষ্য দেবে। যেখানে ঐক্য রয়েছে, সেখানে নিজের দেহমনকে সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষম রাখবার জ্ঞান নিম্নতম সুবিধা যতটুকু দরকার, দাবী মাত্র ততটুকুর, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী এর উর্দ্ধে যাবে না। যেখানে ঐক্য রয়েছে, সেখানে পরস্পরের তুচ্ছ ক্রটি বা খুঁটিনাটি পার্থক্যের উপরে জোর দেবার মত সঙ্কীর্ণতা কারো মনে থাকবে না। এই সব লক্ষণ যেখানে রয়েছে, বুঝতে হবে, ঐক্যের প্রস্ফুটন সেখানে বোলকলায় হ'য়েছে।

(২৫৪)

ঐক্যরূপ সূর্যের উদয় হ'লে আত্ম-অবিশ্বাসরূপ অন্ধকার দূর হয়, দুর্ব্বলেরও মনে সাহস জাগে, ভীরা কাপুরুষও হৃদয়-বীণায় দীপক রাগের 'বাক্স' গুন্টে সুর করে। ঐক্যবদ্ধ হ'লে মানুষ অপর সঙ্গীদের তুলনায় নিজের দোষ-ক্রটিগুলি

চৈত্র, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০৫৭

হৃদাশাক্রান্ত না হ'য়েও ধর্তে পারে এবং সহজে নিজেকে সংশোধিত ক'রে নিতে পারে। যে যত অধিক লোকের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে নিতে সমর্থ হয়েছে, জানবে, সে ভগবানের দিকে তত অগ্রসর।

(২৫৫)

বেশী নয়, মাত্র পাঁচটি সমশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যদি এক মনে এক প্রাণে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তারা হিমালয়-শৃঙ্গ উপড়ে ফেলে দিতে পারে, মহাসাগর শুষে দিতে পারে। জগতে কিছুই অসম্ভব নয়, সমপ্রাণ, সমমনা, সমবুদ্ধি, সমমেধা, সমশক্তি, সমচেতা পাঁচটি মাত্র লোক যদি একটা মহাদাদর্শের পতাকার নীচে এসে দাঁড়ায়। এঁদের কাছে কিছুই অসম্ভব নেই।—কিন্তু পাঁচটি লোক কি মিলতে চায়?

(২৫৬)

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ না থাকলেও মানুষের চলে না, আবার এই জিনিষটাই প্রবল হ'লে তা হয় মিলন-পথের প্রবল অন্তরায়।

(২৫৭)

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আর আত্ম-বিলোপ সামাজিক দৃষ্টিতে দু'টারই প্রয়োজন সীমাবদ্ধ। মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে তুলে আনতে প্রবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রয়োজন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ তমোগুণকে শুদ্ধ করে, রজঃ-প্রেরণা দেয়। পশুবৎ মানবের জন্ত এই জিনিষটা শুধু প্রয়োজনই নয়, তার পক্ষে এইটাই হচ্ছে উদ্ধারকর্তা। তার পক্ষে আত্ম-বিলোপ আধোগতির বর্ধক, সুতরাং

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১০৫৮

সর্বনাশকর। কিন্তু রজঃপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে সত্ত্বগুণাভিমুখিতাই ক্রমোন্নতি-সূচক। তার পক্ষে আত্ম-বিলোপের চেষ্টাই আবশ্যক। কেন না, এতে তার মানবত্ব দেবত্বকে পাবে।

(২৫৮)

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আত্ম-বিলোপের সাধনাই একমাত্র সাধনা। এই বিলোপ কোনো মানুষের কাছে নয়, কোনো দলের কাছে নয়, কোনো মতের কাছে নয়, কোনো পথের কাছে নয়, এই আত্ম-বিলোপ সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের কাছে। নিজের নিজস্বতা, নিজের কর্তৃত্ববোধ, নিজের অহমিকা, এমন কি নিজের অস্তিত্বাভিমান পর্যন্ত ভগবানের অমৃতময় সত্তায় ডুবিয়ে দেওয়া। এর চেয়ে বড় ধর্ম নেই, এর চেয়ে বড় পুণ্য নেই, এর চেয়ে বড় সার্থকতা নেই। তোমাদের উপরে আমার যদি কোনও আশীর্বাদ করবার থাকে, তবে তা হচ্ছে এই যে, তোমরা সবাই অথও আনন্দময় শ্রীভগবানে ডুবে যাও।

(২৫৯)

যারা সমাজের সেবা প্রভৃতি বহির্মুখ জীবহিতমূলক কাজ নিয়ে ব্রতী আছেন, তাঁরা এইরূপ আশীর্বাদকে অভিসম্পাত ব'লে মনে ক'রে থাকেন। কারণ, তাঁরা তাঁদের গৃহীত কর্মপন্থায় এত বিশ্বাসী যে, পন্থার দিক দিয়ে নিখিল জগতের মিল যে কখনো হবে না বা হ'তে পারে না, তা কখনো বুঝতে রাজি নন। কিন্তু ভগবানে যে আত্মবিলোপ ক'রেছে, তার কাছে গতির চেয়ে গন্তব্যের ঐক্যের দাম বেশী, পথের চেয়ে লক্ষ্যের একতানতা অধিকতর

চৈত্র, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০৫৯

কাম্য। জগতের যত জন যত কাজ কচ্ছে,—তিনি দেখেন, সবাই কচ্ছে ভগবানের কাজ। জগতের যত জন যত পথে চলেছে,—তিনি দেখেন, সবাই চলেছে ভগবানের পানে। কাউকে তিনি কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট দেখেন না, তিনি দেখেন, সবাই নিজ নিজ অধিষ্ঠান-ভূমিতে শ্রেষ্ঠ, সবাই নিজ নিজ আবেষ্টনীর মধ্যে কর্মী, কাউকে প্রশংসা কাউকে নিন্দা তার উপলব্ধির বাইরে। তিনি জানেন, জগতের যত ভিন্ন ভিন্ন মত, সব একটা আর একটীর অনুপূরণ কচ্ছে, দেখতে যারা পরস্পর-বিরোধী, তারাও একটা আর একটার মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যকে আবাদ-যোগ্য করবার জন্ত চিরকাল বেঁচে রয়েছে, চিরকাল বেঁচে থাকবে। শত ব্ধন্দে শত দ্বিধায় চিত্ত তাঁর আর পীড়িত হয় না, ভগবানকে আপন জেনে সবাইকে তিনি আপন জেনেছেন যে! আপন জনের আচরণ কখনো মন্দও হয় না, দোষেরও হয় না।

(২৬০)

আশ্রমে বাস করার মানে কিরে? কোদাল মায়া আর খিচুড়ী খাওয়া? নিশ্চয়ই নয়। পবিত্র থাকাই আশ্রমবাসের উদ্দেশ্য। অনুক্ষণ বিচার করবি, পবিত্র হচ্ছি কি না, মনের ময়লা দিনের পর দিন ক্রমেই কেটে যাচ্ছে কি না।

(২৬১)

একলক্ষ্য হও। সমগ্র মন, সমগ্র শক্তি একটা লক্ষ্যকে লাভ করবার জন্ত দিয়ে দাও। দশ দিকে মন দিও না। পাঁচটা পতির সেবা জগতে একা দোপদীই পেয়েছিলেন, কিন্তু দুইটা দোপদী ত' আর দেখা গেল না। তোমরা দোপদী হ'তে চেও না,

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-বাণী

[১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১০৬০

তোমরা সীতার মত হও, তোমরা হনুমানের মত হও, তোমরা শ্রীরাধার মত হও। একজনকেই ভালবাস, একজনকে নিয়েই প্রেমের মধুর সম্বন্ধ স্থাপন কর, একজনের জন্তই বেঁচে থাকো, একজনের জন্তই মৃত্যুবরণ কর। পোষাকী প্রেম দশজনকে দেওয়া যায়, প্রাণের প্রেম মাত্র একজনেরই প্রাপ্য। দশ দিকে যারা তাকায় নাই, তারা কেমন ভাগ্যবান। কি গভীর তাঁদের শান্তি, কি গভীর তাঁদের তৃপ্তি !

(২৬২)

সংকার্যেই সজ্জবদ্ধতা হিতকর, অসংকার্যে সজ্জবদ্ধতা সর্বনাশের জনক। দশজনে মিলে সম্মতি দিলেই অসং কাজ কখনো সং হয় না। সজ্জবদ্ধতা সৃষ্টি করার আগে চতুর্দিকে সম্ভাবের প্রসার আবশ্যক। গ্রামের প্রত্যেকটি লোককে উচ্চ চিন্তায় আগে অনুপ্রাণিত কর। তবে ত' সকলের মনে সংকল্পে সহযোগিতা করবার বুদ্ধি আসবে ! সজ্জবদ্ধতা নেই বলে দুঃখ প্রকাশ না ক'রে, আগে সকলে চেষ্টা কর পল্লীর ভিতরে সংস্কারের চর্চা বৃদ্ধি কত্তে। ভাল করে ভেবে দেখ, ভাবের জন্ম আগে, না সজ্জের জন্ম আগে ? ভেবে দেখ, ভাব থেকে সজ্জ হয়, না সজ্জ থেকে ভাব হয় ? ভাব থেকে যদি সজ্জ হয়, তবে, কেমন ভাব থেকে হয় ? সজ্জ থেকে যদি ভাব হয়, তবে কেমন সজ্জ থেকে হয় ? সব রকমের ভাবই কি সজ্জের জন্ম দিতে পারে ? দুর্বল ভাব, তরল ভাব কি ঐক্যের সূত্র রচনা কত্তে পারে ? আদর্শ-বর্জিত সজ্জ কি কোনও বলবান, সুদৃঢ় ও তেজোব্যঞ্জক ভাবকে সম্প্রসারিত কত্তে পারে ? এসব আগে ভাব, ভেবে ভাবের প্রচার শুরু কর, একটি কথা একজনের কাণে শতবার প্রবেশ করাও, এই কথাটি নিয়ে স্বাধীন-ভাবে তাকে চিন্তা

চৈত্র, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০৬১

কত্তে বাধ্য কর, সন্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে ভাল ক'রে তাকিয়ে দে'খে
তার পরে একটা সঙ্কল্পে স্থস্থির হবার মত সুযোগ ও অনুকূল পরিমণ্ডল
তাকে দাও,—এত কাণ্ডের পরে ঠিক কর, সজ্ব তোমাদের হবে কিনা ।
কথায় বলে, ফাঁকি দিলে টাকি মাছ মিলে, কিন্তু শোল মাছ মিলে না ।

(২৬৩)

সাকারত্ব বা নিরাকারত্ব কথাটির উপরে জোর না
দিয়ে জোর দেওয়া উচিত 'উপাসনা' কথাটির উপরে ।
সাকার ভাল, না নিরাকার ভাল, তা নিয়ে তর্ক জগতে ঢের হয়েছে ।
কিন্তু তর্ক থেকে ত' আর অমৃত ওঠে নি । অমৃত উঠেছে, সাধনা
থেকে । যে সাধন করেছে, সেই অমৃত পেয়েছে, সেই অমর হয়েছে,
সেই শান্তি পেয়েছে । অতএব, যার যে ভাবে ভাল লাগে, তার সেই-
ভাবে সাধন ক'রে যাওয়াই মঙ্গল । কে কোন ভাবে ভগবানে আত্ম-
সমর্পণ করেছে, তার উপরে তার কোলীন্ম বা সার্থকতা নির্ভর করে না,
নির্ভর করে, কে কতটা গভীর ভাবে আত্মসমর্পণ কত্তে পেরেছে, তার
উপর ।

(২৬৪)

যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছে, সে নির্ভর হয়েছে । এই
নির্ভরতা সৈনিকের নির্ভরতার মত নয়, যে নির্ভরতায় পরের প্রতি হিংসা
ধাকে । এ নির্ভরতা সর্বজীবে প্রীতি-মূলক ও সর্বজীবের হিতৈষণায় পূর্ণ ।
যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছে, পর-চর্চায় তার প্রীতি নেই, পরানিষ্টে
তার মতি নেই, পরের অমঙ্গলে তার আনন্দ নেই । তার প্রাণ বিমল
শান্তিতে ভরা । সেই শান্তিকে শুধু সুগভীর তৃপ্তি বলে মনে করেই

হবে না, সে শান্তি সকল চিত্তবৃত্তির শান্তি, কাম-ক্রোধের শান্তি, হিংসা-
দ্বেষের শান্তি, সে শান্তি নিজেরও শান্তি, জগতেরও শান্তি ।

(২৬৫)

কীৰ্ত্তন কর, তাঁর মধুময় নামের, যিনি নিখিল
বিশ্বকে নিয়ে এক । কীৰ্ত্তন কর, মন প্রাণ দিয়ে বাহিরের
বিশ্বের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে । কীৰ্ত্তন কর, নিজের প্রাণকে দ্রবীভূত
ক'রে, আর কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীকে গলিয়ে । তোমার কীৰ্ত্তন
তোমারও বেদনা নাশ করুক, কোটি ব্রহ্মাণ্ডেরও ব্যথা দূর করুক ।

(২৬৬)

নিশ্চিত্ততাই সিদ্ধত্বের লক্ষণ । নিরুদ্ধেগ না হ'লে যত শিষ্যেরই গুরু
তুমি হও, তুমি সিদ্ধ নও ।

(২৬৭)

মাধন ছাড়া সিদ্ধত্ব হয় না । যে-কোনও একটা
ভাবের কাছে আত্ম-সমর্পণ ক'রে একেবারে তাতে ডুবে না যেতে
পালে' কেউ নিরুদ্ধেগ হ'তে পারে না । হয় ভাবো, তুমি তাঁর, সুতরাং
তোমার জন্ত তোমার কোনো দায়িত্ব নেই, তোমাকে যিনি পাঠিয়েছেন,
তোমার জন্ত ভাব-বার দায়িত্ব তাঁর, উদ্বেগ অনুভব করার প্রয়োজন
থাকলে তা তিনিই কর্কেন ; নয় ভাবো, তুমিই তিনি, সুতরাং সমুদ্রের
যেমন তার তরঙ্গকে ভয় করবার কারণ নেই, সিংহের যেমন তার
কেশরকে ভয় করা নিশ্চয়োজন, হিমাচলের পক্ষে যেমন তার শৃঙ্গ আর
গুহা, পাথর আর বরফকে ভয় করার আবশ্যিকতা নেই, তেমনি জগতের
কোনও ঝড়, কোনও উৎপাতকেই ভয় করার তোমার কারণ নেই ।

চৈত্র, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০৬৩

(২৬৮)

কর্তব্যপালন আর অন্তরের ধৈর্য্য এই দুইটা জিনিষের মধ্যে সাধারণ মানুষেরা সামঞ্জস্য স্থাপন কতে পারে না। যোগীরাই পারেন, ঋষিরাই পারেন, সাধকেরাই পারেন। এই জন্ম লোকে তাঁদের অবতার ব'লে পূজা কতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় না। মহৎ জীবনের আচরণগুলিকে যতটা সম্ভব নিজ লাভের দিক দিয়ে বিচার ক'রো। হিমালয়ের পাথরে ফুটো খুঁজে বেড়ান আর কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফের মাঝে কালো দাগ খুঁজে বেড়ান কিন্তু লাভের ব্যাপার নয়। তাঁদের জ্যোৎস্নার আমার লাভ আছে, শশচিহ্নে কোন্ লাভ?

(২৬৯)

ভগবানকে ডাক্তে তাঁর একটীমাত্র নামের উপরে সম্যক্ নির্ভর কর। নদীর তীরে গেলে নৌকা অনেক পাবে, কিন্তু উঠতে হবে তোমাকে একটী নৌকাতেই, দুই নৌকাতে পা দেওয়ায় কোন লাভ হবে না। ভগবানের সব নামই সত্য, সব নামই শান্তির আকর, সব নামই হুঃখ-বিনাশন, সব নামই প্রেম-মধুর খনি, কিন্তু এক সঙ্গে সব সাধন কতে যেও না। একটীকেই সাধন কর, একটীতেই যত্ন, একটীতেই ডোব, একটীকে নিয়েই জন্ম-কর্ম্য সার্থক কর। “এক সাধে ত’ সব সাধে, সব সাধে, সব যায়।”

(২৭০)

ভিন্ন ভিন্ন নাও, তাদের প্রভেদ শুধু আকারে, গুণে নয়। সব নৌকাই এপার থেকে ওপারে নিতে পারবে, ছোট হোক আর বড় হোক, তাতে কিছু আটকাবে না। লাল হোক

আর নীল হোক, তাতেও কিছু আটকাবে না। কাঠের হোক আর লোহার হোক, তাতেও কিছু আটকাবে না। শক্ত ক'রে হাল ধ'রে নিষ্ঠা নিয়ে লেগে যদি থাক, তবে মাটির গামলায় ব'সেও তুমি নদী পার হ'য়ে যেতে পারবে। এ নৌকা কোন্ কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে, নৌকার গলুইতে কোন্ মিস্ত্রীর নাম খোদান রয়েছে, তাতেও কিছু বাধ আসবে না। সব নৌকারই শক্তি এক,—যাত্রীকে এক পার থেকে আর এক পারে নিয়ে যাওয়া। কোনও নৌকায় একটু আরাম বেশী, কোনও নৌকায় আয়াস বেশী, কিন্তু এই আরামে আর আয়াসে বিশেষ যায় আসে না, যদি তুমি একটা নৌকাতেই প্রাণপণে হাল ধ'রে থাক আর নির্ভরের পাল তুলে দাও। ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম আকারেই পৃথক, গুণে পৃথক নয়। কুইনাইনের বড়ী খেলেও ম্যালেরিয়া যায়, গুঁড়ো খেলেও ম্যালেরিয়া যায়, মিক্‌চার খেলেও ম্যালেরিয়া যায়। আকারেই তারা পৃথক, বস্তুতে তফাৎ নয়।

(২৭১)

নদী পার হতে সময় সময় এক নৌকার সাধে অপর নৌকার ধাক্কা-ধাক্কি লাগে। এ হচ্ছে সর্বনাশের গোড়া। তোমার নৌকা তুমি চালাও, তোমার সাধন তুমি কর, অপরের নৌকার উপরে আঘাত না দিয়ে, অপরের সাধনে, অপরের মস্ত্র নিন্দা, বিদ্বেষ বা গ্লানি পোষণ না ক'রে। অপর মত আর অপর পথকে বিদ্বেষের চোখে দে'খো না, কেন না, তাতে তোমার নিজেরই সর্বনাশ হবে। চতুর সাধক তাঁরা, যাঁরা এক কণা শক্তিও পর-দোষের উদ্ঘাটনে অপব্যয়িত করেন না।

চৈত্র, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০৬৫

(২৭২)

নিখিল ভুবনে আর কোনো উপদেশের প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকু বাদে যে, আমার কি প্রয়োজন, আমার চেয়ে ভগবান তা বেশী জানেন, স্মরণে দেহি দেহি বলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। সে আবার কেমন মা, ছেলের ক্ষুধা পেয়েছে কিনা যে বোঝে না? যা যখন কর্তব্য বোধ করবে, সেই মত পরিশ্রম ক'রে যাবে, ভগবানের কাছে পারিশ্রমিক দাবী করবে না, তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি তা দেবেন, না হয় না দেবেন, আমি নিঃশঙ্কে কাজ ক'রেই তৃপ্ত, এই হবে সাধকের আদর্শ। যখন যা প্রয়োজন, তিনি তাঁর অপার প্রেমবশে তা দেবেন, আমি সং হই, সাধু হই, অকপট হই, নিকাম হই, জগতের প্রয়োজন বুঝে তিনি প্রাপ্যের অতিরিক্ত শতগুণও দেবেন। তাঁর উপরে সর্বকালে সর্ববিষয়ে সর্বতোভাবে নির্ভর ক'রে থাকাই হচ্ছে আমার তপস্তা।

(২৭৩)

হাত পা ছেড়ে দেওয়ার নাম নির্ভর নয়, তার নাম অলসতা বা ক্লৈব্যা। ফলাফল ভগবানের হাতে মাপে রেখে, ভাল মন্দ কোনও ফলের প্রতিই সোম্লাস বা সবিষাদ দৃষ্টি না দিয়ে, কর্তব্য ক'রে যেতে হবে। কোন্টা কর্তব্য, কোন্টা অকর্তব্য, তা নির্ধারণের জন্ত তাঁরই মুখপানে তাকাব, কিন্তু কর্তব্য বলে কিছু বোধবার পরে আর বিলম্ব করবে না, সিংহ-বিক্রমে শ্রম কত্তে লেগে যাব। সমগ্র পুরুষকারকে তাঁরই কার্য সাধনের জন্ত প্রয়োগ করার নামই নির্ভর।

প্রতিধ্বনি

অথ-গু-বাণী

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১০৬৬

(২৭৪)

দুর্ব্বলেরা ক্লীবতাকেই অনেক সময়ে নির্ভর ব'লে ভ্রম করে। তাই ভগবদ্বিভর লাভ কতে হলে প্রথমেই কতে হয় আত্ম-নির্ভরের সাধনা। নিজের শক্তিতে বিশ্বাস এলে তার পরে লক্ষ্য পড়ে তাঁর উপর, যাঁর কাছ থেকে এসেছে নিজের সব শক্তি। তখন তাঁর পবিত্র অভি-প্রায়ের উপরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়ে নিজের সমগ্র শক্তিকে তাঁরই কার্য সাধনের জন্ত ভয়হীন কুণ্ঠাহীন মনে প্রয়োগ করবার আকাঙ্ক্ষা হয়; কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষাতেও থাকে কত কলুষ, কত কর্তৃত্বের লোভ, কত যশের লোভ। কিন্তু তাঁর কাজকে বহিরাচাররূপে এবং তাঁর নামকে অন্তরারামরূপে গ্রহণ ক'রে যুগপৎ ভিতরে বাইরে সাধন কতে কতে মহাবলের-দুর্ব্বলতা যশোলোভ দূর হ'য়ে যায়। তখনই সত্যিকার নির্ভর আসে।

(২৭৫)

নির্ভরশীল ব্যক্তির ভগবদ্বিশ্বাস সমুদ্রবৎ অতলস্পর্শ। বিশ্বাসশীল ব্যক্তির নির্ভর হিমাচলবৎ অটল অচল। বিশ্বাস আর নির্ভর যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ। একটি ছেড়ে আর একটি থাকে না। একটি এলেই অপরটি এল। অথবা নির্ভর ও বিশ্বাস যেন একই বস্তুর মাত্র দুইটি পৃথক ভঙ্গিমা। বিশ্বাস যেন প্রাণপ্রিয়ের জন্ত বিহান সাদা ধবধবে একখানা অতি কোমল কমলাসন, নির্ভর যেন বজ্রভীতি-তুচ্ছকারী দেবমন্দিরের স্পষ্টীকৃত শির। নির্ভর যেন ভগবদ্বিশ্বাসের ক্রদ্রতেজ, বিশ্বাস যেন ভগবদ্বিভরের স্নিগ্ধ মধু।

চৈত্র, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিদিন

১০৬৭

(২৭৬)

ভগবানকে পাওয়া যায়, প্রেমের ভিতর দিয়ে, ভালবাসার ভিতর দিয়ে, অন্তরঙ্গ সাধনার ভিতর দিয়ে। চালাকীর ভিতর দিয়েও নয়, আড়ম্বরের ভিতর দিয়েও নয়, বিদ্বেষের ভিতর দিয়েও নয়।

কলহ আর কুটিলতা সৃষ্টি ক'রে ক'রে যারা মনে করে যে, ভগবানকে তারা প্রীত কচ্ছে, তারা ভ্রান্ত, তারা অন্ধ। মানুষের প্রাণে আঘাত ক'রে যারা মনে কচ্ছে, তারা ধর্ম্য কচ্ছে, তারা অবাধ, তারা অজ্ঞান। নিখিল ভুবনকে নিয়ে আনন্দোল্লাস-মুখরিত উৎসব যেই পথে, ধর্ম্য সেই পথে। সকলের মুখের স্নানিমা, সকলের মনের বেদনা, সকলের কণ্ঠের কাতরতা অবসান পাবে যেই পথে, ধর্ম্য সেই পথে। ভেদ-বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ বিস্মৃত হ'য়ে সবাইকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দেবে যেই পথে, ধর্ম্য সেই পথে।

কিন্তু হায়, কতজন জগতে ধর্ম্মের নামের ধবজা তুলে জগতের উৎসব-মুখরিত প্রেমাজনগুলিকে শোকের হাহাকারে পূর্ণ কত্তে বদ্ধপরিকর। ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কতজন সদাহাস্য-সমুজ্জল শত শত মুখে দুঃখের বজ্র হেনে বেড়াচ্ছে। সত্যের নামে অসত্য, ভালোর নামে মন্দ, পুণ্যের নামে পাপ দিকে দিকে তাণ্ডব-নর্তন কচ্ছে।

যতটুকু দেখা যায়, যতটুকু বুঝা যায়, বর্তমানে এর মূল সাম্প্রদায়িকতায়। অথচ কেউ একটু খুঁজে দেখে না সাম্প্রদায়িক উৎপত্তি হ'ল কেন, হ'ল কিরূপে। হৃদ খাল নিজের বলে সমুদ্র পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারে না, সামান্য তার জল, সামান্য তার স্রোত, সামান্য বাধায় তার গতি হয় রুদ্ধ, এজত শত শত খাল, শত শত উপনদী সম্মিলিত হ'য়ে মহাবন্দীতে পরিণত হয় এবং সবলে সবেগে

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১০৬৮

সোৎসায়ে সাগরের দিকে চলে। এরই নাম সম্প্রদায়। কিন্তু বহু, তোমরা কচ্ছ কি? ভগবানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবার জন্তই কি দলবদ্ধ হও? না, তাঁর কাছ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছ?

(২৭৭)

বাইরের সহস্র কোলাহলের দিক্ থেকে মনকে টেনে আন। নিজের ভিতরে প্রবেশ কর। নিজের অন্তর অনুসন্ধান কর। নিজের মূল্য নির্ধারণ কর। কতটা এগুচ্ছ, কতটা পিছুচ্ছ, তার হিসাব লও। চুপ ক'রে ভাবো,—ছিলে কি, হ'লে কি, হবে কি,—তবে ধর্মের হৃদিস্ পাবে। কতজন কত কথা কাণে কাণে ব'লে যাচ্ছে, সেই সব কাণাকাণির ভিতরে তাজা প্রাণের পরশ কতখানি আছে আর হিংসা-বিদ্বেষ-ঈর্ষ্যার পুতিগন্ধ কতখানি আছে, তার বিচার হবে, বাইরের কোনও লোকের চরিত্র বা আচরণ, বাক্য অথবা ভঙ্গিমা প্রভৃতির উপরে নয়,—তার বিচার নির্ভর করবে তোমার নিজের অন্তরের স্বচ্ছতা, সুন্দরতা আর অনবদ্যতার উপরে। অন্তর্মুখী হও, অন্তরে ডোব, তবে ধর্মকে পাবে।

(২৭৮)

একটি প্রভুর সেবা কত্তেই জান্ কাবার, আবার
শত শত প্রভু? শত শত বিগ্রহের পূজা ক'রে
কোনো লাভ নেই, মাত্র সময় নষ্ট। বিগ্রহই যদি পূজা কত্তে হয়, তবে
একটিকেই কর্বে। “একজনারে বাস্লে ভাল বিশ্ব-ভুবন আপন তোর।”
সতী রমণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। সে একজনকেই পতি বলে জানে।
শত শত পতির সেবা করে গণিকারা। সমাজ-জীবনে গণিকাবৃত্তি যেমন
নিন্দিত, সাধন-জীবনেও গণিকাবৃত্তি তেমন নিন্দিত।

চৈত্র, ১৩৬৭]

অখণ্ড-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০৬৯

(২৭৯)

ভগবানকে লাভের পথ বহু। যে যে-পথে সুবিধা বুঝবে, চলবে। ভগবান সর্বময়, তাই সব কিছুতেই তাঁর পূজা চলে। তিনি ভাবময়, তাই ভাবুক ব্যক্তি শুধু ভাবের ভিতরেই তাঁর অর্চনা করেন। তিনি অভাবময়, শূন্যবাদী শূন্যের ভিতরেই তাঁর অর্চনা করেন। তিনি বস্তুময়, তাই বস্তুবাদী বস্তুর ভিতরেই তাঁর অর্চনা করেন। তিনি প্রাণময়, তাই প্রাণবাদী প্রাণের ভিতরেই তাঁর অর্চনা করেন। তিনি রূপময়, তাই সাকারবাদী পরিমিত বিগ্রহের ভিতরে তাঁর অর্চনা করেন। তিনি অরূপ, তাই নিরাকারবাদী বিগ্রহ ব্যতীতই তাঁর অর্চনা করেন। তিনি রসময়, তাই রসিক ব্যক্তি শাস্ত্র, দাস্ত্র, বাৎসল্যাদি রসের ভিতরে তাঁর অর্চনা করেন। সর্বময়ের পূজা সর্বভাবেই হয়।

(২৮০)

শত শত মূর্তির পূজা ক'রে যে সমাজ নিজের মধ্যেই নিজে শত খণ্ডে বিভক্ত, সে সমাজ এক হবে কি ক'রে?

সর্বমন্ত্রের সার, সর্বমূর্তির সার ওঙ্কার মন্ত্রে বিশ্বাস ক'রে।

(২৮১)

ওঙ্কারোপাসনা। নাদের উপাসনা। তোমার সৃষ্ট বা তোমার স্রষ্টা কোনও নাদ নয়, যে নাদ আপনা-আপনি স্রুত হ'য়ে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছেন। এখানে প্রশ্ন ওঠে না, কোন্ মন্ত্রের কে ঋষি। ওঙ্কার সর্বমন্ত্রময়, তাই সর্বঋষি এরই উপাসক, আর এই মন্ত্র সর্ব-ঋষি-নিরপেক্ষ।

(২৮২)

তাই ওঙ্কার গুরু-বাদের অপেক্ষা করে না। গুরু যার নেই, সেও এই মহামন্ত্র জপের অধিকারী, যার আছে, সেও অধিকারী। এ মন্ত্র জীবের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত, এ মন্ত্র জীবের কর্ণে স্বতঃশ্রুত, এ মন্ত্র কর্ণে নয়, ওষ্ঠে নয়, অন্তরের অন্তরে সদাজাগ্রত। এ মন্ত্র নিজে নিরালম্ব, কিন্তু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অবলম্বন।

(২৮৩)

ওঙ্কার নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কোনও ভক্ত বা প্রচারকের, কোনও ব্যাখ্যাতা বা টীকাকারের, কোনও শাস্ত্র বা পুরাণের, কোনও দর্শন বা ইতিহাসের প্রতীক্ষা এ মহামন্ত্র করেন না। কোনও সাম্প্রদায়িক মতামত বা কোনও সম্ভবদ্বন্দ্ব প্রয়াসের ইনি অপেক্ষা রাখেন না। অনেক সাধন সেধে সাধকেরা ওঙ্কারের তত্ত্ব আপনি উপলব্ধি করেন।

(২৮৪)

তোমার জীবন তোমার একার নয়। এই জীবনের উপরে নিখিল জগতের সকলের অধিকার। বাগানে যখন পুষ্পে পুষ্পে ফুল ফোটে, তখন তার সৌরভে অধিকার পথচারী প্রত্যেক পথিকের, যদিও তার জন্ম এবং স্থিতি ঐ একটা উদ্ভানেই। তোমরাও এক একজন এক একটা সমাজে জন্মেছ, যার ফলে তোমাদের প্রাথমিক সেবা ঐ নির্দিষ্ট সমাজটাই পাবে। কিন্তু তোমাদের সেবায়, তোমাদের আত্মোৎসর্গে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকলের অধিকার। শুধু বাঙ্গালী নয়, শুধু ভারতবাসী নয়, শুধু মানব জাতি নয়, শুধু প্রাণ-জগৎ নয়, জড় ও

চৈত্র, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০৭১

চেতন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ ও ইন্দ্রিয়াতীত, জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, স্থূল এবং সূক্ষ্ম সকলের জন্ত তোমার জীবন, সকলের জন্ত তুমি।

(২৮৫)

একদিকে তোমার জীবন যেমন তোমার একার নয়, আর একদিকে তোমার জীবন তেমন দু'দিনের জন্ত নয়। জীবন তোমার অসীম ও অনন্ত। বর্ষের পর বর্ষ চ'লে যায়, যুগের পর যুগ চ'লে যায়, জন্মের পর জন্ম চ'লে যায়, কিন্তু জীবন তোমার ফুরায় না। অনন্ত অফুরন্ত অথও জীবনের তুমি অধিকারী। তাই তোমার জীবনের গুরুত্বও অসীম। এই গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি দাও।

(২৮৬)

কুলোকেই তোমাদের পরামর্শ দেবে, জীবন তোমাদের কণস্থায়ী, স্মৃতরাং ক্ষণস্থায়ী সুখ-ভাণ্ডারে যত সুখ আছে, সব সুখ তোমরা নিঃশেষে ভোগ ক'রে নাও। কিন্তু সে পরামর্শ কুপরামর্শ। সুখই যদি পেতে চাও ত' ক্ষণস্থায়ী সুখকে কেন? ভোগই যদি কতে চাও ত' ক্ষণিক ভোগকে কেন? দৃষ্টিকে উন্নত কর, প্রসারিত কর, নিত্য সুখকে আয়ত্ত কতে বদ্ধপরিকর হও। কুলোকের কুপরামর্শে কণপাত ক'রো না।

(২৮৭)

মহতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। নীচ-জীবন-যাপন-কারী সঙ্গীর্ণ-বুদ্ধি ব্যক্তিকে অনুসরণ ক'রো না। যে যাকে অনুসরণ করে, সে তার দোষগুণ অল্প হ'লেও পায়। স্বেতবীৰ্য্য ক্ষীণপ্রাণ অল্পবুদ্ধি

প্রতিধ্বনি

অথও-বাণী

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

১০৭২

ব্যক্তিদের দিকে তাকিও না। দৃষ্টিকে প্রধাবিত কর মহাজীবন-সাপন-কারীদের প্রতি। তাঁদের শ্লাঘ্য জীবনকে ধ্যান কর। তাঁদেরই মত আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস কর। তাঁদেরই মত মানবের স্বাভাবিক পবিত্রতায় আস্থা স্থাপন কর।

(২৮৮)

যারা বলে, মানুষের জন্ম কাম থেকে, অতএব মানুষ কামের চর্চাকেই জীবনের প্রধান অনুশীলন কত্তে বাধ্য, তাদের কথায় অধিক মূল্য দিও না। দেহের জন্ম যে ভাবেই হোক, দেহ আর আত্মা এক নয়। মানুষের দেহটাই তার সত্তা নয়। দেহটা যন্ত্র মাত্র। শিমূল গাছ চিরে তক্তা ক'রে সেই তক্তায় তৈরী সিংহাসনে যদি কেউ দেবতার প্রতিষ্ঠা করে, তাহ'লে কি দেবতার গায়ের বস্ত্র শিমূলের কাঁটা বিঁধবে? মানবদেহ মানবাত্মার কার্য্য-সাধনের যন্ত্র মাত্র। আত্মা চিরপবিত্র। তিনি তাঁর স্বকার্য্য-সাধনের জন্ত যে দেহকে গ্রহণ করেছেন, সেই দেহের উৎপত্তি যে ভাবেই হ'য়ে থাকুক, তা নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিও না। ভগবানের ইচ্ছাতেই দেহের উৎপত্তি ঘটেছে এবং ভগবানের কাজের উপযুক্ত ক'রে একে গ'ড়ে তোলা অসম্ভব নয়। খনির ভিতরে লোহা থাকে, কত ধূলা মাটি আবর্জনা তাতে মিশ্রিত থাকে, কিন্তু তাই থেকেই ইম্পাত তৈরী হয়, এমন ইম্পাত, দৃঢ়তাই যার বিশেষত্ব, যা উজ্জ্বল, যা নিত্যাবশ্যকীয়।

(২৮৯)

তোমার দেহকেও তুমি ইম্পাতের মত গ'ড়ে তুলতে পার। শুধু পার বলব কেন, গড়ার চেষ্টায় তোমার একটা

চৈত্র, ১৩৬৭]

অথও-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০৭৩

মিনিট সময়ও অপচয় করা উচিত নয়। প্রাণপণ যত্নে তোমার দেহকে তুমি গ'ড়ে তোল। সঙ্কল্প কর, এই দেহকে ভগবানের কাজে নিঃশেষে উৎসর্গ করার যোগ্য ক'রে গ'ড়ে তুমি তুলবে। তোমার দেহ জগত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলকার্যে নিয়োজিত হ'য়ে সার্থক হোক, এই কামনা কর।

(২১০)

কাণাকাণি ক'রে যারা মানবজীবনের ইতর ব্যাখ্যা দেয়, তাদের কথায় কর্ণপাত ক'রো না। ইতর কথা শুন্তে শুন্তে মানুষ ইতর হ'য়ে যায়। ছোট কথা শুনে শুনে মানুষ ছোট হ'য়ে যায়। ছোট কথা ক'য়ে ছোট কথা ভেবে মানুষ নিজের মহিমাকে খর্ব্ব করে, নিজের সর্বনাশ সাধন করে।

(২১১)

মানবজীবনের প্রত্যেকটি অংশে ভগবানের অমৃতময় পবিত্র অভিপ্রায়কে শুধু অব্বেষণ কর। প্রত্যেকটি বিবর্তনে আর আবর্তনে তাঁরই কৌশল খেলা ক'রে যাচ্ছে। তাঁর ইচ্ছাকে সকল ব্যাপারে দর্শন কর। অনন্ত জীবনের অধিকারী হে অমৃতের সন্তান, এইটাই তোমার জৈবদত্ত প্রতিভার প্রকৃত প্রয়োগ-ক্ষেত্র।

(২১২)

তোমরা বিশ্বাস করো না, তোমরা ক্ষুদ্রশক্তি। সিংহশাবক কেন নিজেকে শৃগাল-শিশু ব'লে ভ্রম কর্বে? অনাগত কাল জু'ড়ে তোমাদের পৌরুষ-মহিমা মানবতার যে জয়-ধ্বজা দিগ্‌বিদিকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, হে অমৃতের পুত্র, আজ প্রচণ্ড সাহসে সেই পতাকা উত্তোলিত কর।

(২১০)

সঙ্গীত যখন অভ্যুদয়ের সহায়তা করে, তখন ইহা স্বর্গীয় বস্তু। সঙ্গীত যখন পতন-পথের পিচ্ছিলতা বর্ধিত করে, তখন ইহা নারকীয়। সঙ্গীত যখন ভক্তের কণ্ঠে ক্ষুরিত হয়, তখন উহা স্বর্গীয়। সঙ্গীত যখন অভক্তের কণ্ঠে ক্ষুরিত হয়, তখন উহা হয় মর্ত্য, নয় নারকীয়। যে দেশ স্বর্গীয় সঙ্গীতে পূর্ণ, সে দেশে স্বর্গীয় মানবের আবির্ভাব সহজে হয়।

(২১৪)

সাধারণ লোকের রুচিকে অনুকরণ ক'রে যখন কবি তাঁর সঙ্গীতের পদ লেখেন, তখন তিনি নিজের কবিত্ব-শক্তির অমর্যাদা করেন। কবি অসুন্দরে সুন্দর, অন্ধকারে আলো, তিত্ত রুঢ় বাস্তবের মাঝে মধুরস আবিষ্কার করেন। এই স্থানেই কবির কবিত্ব-প্রতিভার মর্যাদা। কিন্তু কবি কল্পলোকের পসারী। অমৃতের তিনি বর্ষণ-কারী। মৃত্যুর মুখে, অবাঞ্ছনীয় পরিণতির মুখে দেশকে জাতিকে জগৎকে ঠেলে নিয়ে তিনি দিতে পারেন না। যদি দেন, তবে তিনি নিজ কবিত্ব-শক্তির দারুণ অসম্মান করেছেন, বলতে হবে। যথার্থ কবিকে সাধারণ ব্যক্তিদের ইতর রুচির উর্দ্ধে অবস্থান কত্তে হবে।

(২১৫)

কবি যখন নোংরা কথা, নোংরা ভাব, নোংরা ইঙ্গিত দিয়ে কাব্য, ছড়া, গান লিখতে বসবেন, তখন তাঁকে কল্পলোকের সৌন্দর্য্যের পূজারী ব'লে জ্ঞান না ক'রে, নিজের অবচেতন চিত্তের অন্তঃস্থলে অবস্থিত কদর্য্যতার সংস্কার পরিবেশনকারী ব'লে মনে

চৈত্র, ১৩৬৭]

অথগু-বাণী

প্রতিধ্বনি

১০৭৫

করায় কোনও দোষ নেই। তোমার চিত্তভূমি কদর্য্যতার ক্রিমি-কীটে
কিলবিলি কচ্ছে, তা নইলে তুমি কেমন ক'রে পৃতিগন্ধ বস্তু সেইখান থেকে
তুলে তুলে পাঠক, গায়ক আর শ্রোতার গায়ে ছুঁড়ে মারতে পার ?
তোমার নিক্রিপ্ত বাণ হয়ত সকলের হৃদয়কে বিদ্ধ কতে সমর্থ হ'তে না
পারে, কিন্তু তাই ব'লে একথা কি ক'রে বলি যে, তুমি পবিত্র-চেতা ?
অনাসক্ত কর্মযোগ তপস্তার সাধ্য হ'তে পারে, কারণ কর্মযোগী কর্তব্যের
বুদ্ধিতে কাজ করেন, এবং যাতে দেশের দশের মঙ্গল, তাকে অবলম্বন
ক'রেই মনুষ্যের কর্তব্যবুদ্ধি উদ্ভিক্ত হয়। কিন্তু অনাসক্ত কবিত্ব কখনও
হয় না। যেখানে কবিত্ব-প্রকাশের প্রেরণারূপে কর্তব্যবুদ্ধি কাজ করে
না, করে শুধু কবিত্ব-প্রকাশের স্বাভাবিক তাগিদ, সেখানে যদি কবি-
সমাজ হিতবিরোধী কোমল চিত্তের পবিত্রতা-বিনাশকারী ভাব-বিলাসে
প্রমত্ত হন, তবে বলতেই হবে, তিনি তাঁর উচ্ছৃঙ্খল উন্নততায় মানবের
ক্ষতি কচ্ছেন।

(২৯৬)

মনকে উলঙ্গ ক'রে যা-তা, বাজে কথা শুকায়ে
বলবার অধিকারকে যদি কবি দাবী করেন, তাহ'লে উলঙ্গ দেহে
যা-তা আরচণ করবার প্রকাশ্য অধিকার সহরের নোংরা পল্লীর পুরুষ-
নারীরা কি দাবী কতে পারে না ? মানবচিতে পশুভাব আছে ব'লেই
কি সেই ভাবে সে প্রচার ক'রে বেড়াবে ? প্রত্যেক মানুষ প্রত্যহ
মলত্যাগ করে, কিন্তু নিজের গৃহেও সে বিষ্ঠার পুঁটলি বেঁধে প্রদর্শনীরূপে
টানিয়ে রাখে না অথবা বন্ধুগৃহেও তা ক্রমালে মুড়ে নিয়ে যায় না।
পাইখানার্টা তার যত কদর্য্যই হোক, ঘর সাজায় সে বেলফুলের মালায়,
বন্ধুগৃহে নিয়ে যায় সে গোলাপ-গুচ্ছ। সাধারণ সামাজিক জীবনেই যদি

চৈত্র, ১৩৬৭]

অথ-বানী

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১০৭৬

নীতিটা দাঁড়ায় এই, তাহ'লে কবি-জীবনেই শুধু নীতিটা হবে সমাজ-গর্হিত, তার কি যুক্তি, কি সঙ্গতি থাকতে পারে ?

(২১৭)

যে গান গেয়ে, যে গান শুনে দেহে আসে না বল, প্রাণে জাগে না উৎসাহ, হৃদয়ে হয় না তৃপ্তি, অন্তরে হয় না শান্তির সঞ্চয়, সে সঙ্গীত গাইতে, সে সঙ্গীত শুন্তে রুঢ় কণ্ঠে অস্বীকার কর। যে সঙ্গীত তোমাকে স্বচ্ছ করে না, নিম্নল করে না, সুন্দর করে না, যে সঙ্গীতের ভাবগুলি তোমার সহিত তোমার সমাজের সম্বন্ধকে, তোমার সহিত তোমার জগতের সম্বন্ধকে সরল, সহজ ও সৌষ্ঠবযুক্ত করে না, যে সঙ্গীতের বাইরের ধ্বনি আর ভিতরের প্রতিধ্বনি পরস্পরের বিরোধী চিত্তবৃত্তির উস্কানি দেয়, সেই সঙ্গীত গান কত্তে বা শ্রবণ কত্তে বজ্রকণ্ঠে অস্বীকার কর।

(২১৮)

কাব্যের নামেই শুধু এ অনাচার হয়েছে, তা নয়, ধর্মের নামেও এ অনাচার যথেষ্ট হয়েছে। ধর্মের মার্কী মে'রেও অনেক পাপ-পঙ্কিলতা জনসমাজে অবাধে চালিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। তোমরা তাতেও তোমাদের প্রবল অস্বীকৃতি ও সরল অনাস্থা জ্ঞাপন কর। ধর্মের নামেও কদর্যা সঙ্গীত চলতে দিতে পার না।

(২১৯)

কোনটা কদর্যা, আর কোনটা নিষ্ফলক, একথা বোঝাবার উপায় কি, এ প্রশ্ন করবার নিশ্চয়ই তোমার অধিকার আছে। কিন্তু এর সর্বজনীন

বিচার সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত মাপকাটিতেই এই বিচার সম্পাদন কতে হবে। যা গেয়ে বা শুনে তোমার বল বাড়ে, সাহস বাড়ে, শান্তি বাড়ে,—তাই তোমার কাছে সুন্দর। যাতে তা হয় না,—তাই অসুন্দর। গান গেয়ে আর শুনে হিসাব নিতে শিখ যে, লাভ কি হ'ল। লাভহীন শ্রম ত, পণ্ডশ্রম। মানবজীবন কর্তব্যসঙ্কুল অতি কঠোর জীবন, ভাব-বিলাসিতা বা ভণ্ডামির স্থান এতে নেই।

অখণ্ড-সমাচার

সমবেত উপাসনা-কালে দেব-বিগ্রহাদি স্থাপনঃ—পূর্ববঙ্গের চাঁদপুর হইতে জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীবামো স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবকে লিখিয়াছেন, তিনি অখণ্ড না হইলেও সমবেত উপাসনায় আনন্দ পান এবং নিজ গৃহে তাহার অনুষ্ঠানও করেন। তিনি চাহেন যে, তাঁহার গৃহে যখন এই অনুষ্ঠান হইবে, তখন যেন ওঙ্কার-বিগ্রহের পাশে আরও দুই একটি দেবতার ছবি রাখিবার অনুমতি দেওয়া হয়। কারণ, ওঙ্কার-বিগ্রহের সহিত অত্র দেবমূর্তি রাখিয়া সমবেত উপাসনা করিতে চাহিলে শ্রীরামদী অখণ্ডমণ্ডলীর সেবকেরা তাহাতে যোগদানে সম্মত নহেন।

এই পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবামোণি বারাণসী হইতে বিগত ১৬ই মাঘ লিখিয়াছেন,—

“সমবেত উপাসনার যাহা বিধিবদ্ধ নিয়ম, তাহা লঙ্ঘন করিয়া সমবেত উপাসনার ভিন্ন বিধি একবার প্রচলন হইতে গেলে সর্বত্রই বিধি-ভঙ্গের হিড়িক পড়িবে। এই কারণে সমবেত উপাসনাতে একমাত্র প্রণব-

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-সমাচার

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১০৭৮

বিগ্রহ ছাড়া অথ কোনও উপাশ্র মূর্তি আদি রাখিতে অনুমতি দিতে পারি না জানিও।”

আলিপুরদুয়ারে অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধঃ—ভ্রাতা শ্রীকণীভূষণ সরকারের পরলোকগতা মাতৃদেবীর আত্মার শান্তি কামনায় ৭ই মাঘ তারিখে দিবসব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল সমারোহের সহিত অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হয়। ভোরে হরি-ওঁ নগর-সঙ্কীর্তনান্তে সকাল ৭টায় শ্রীশ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া ৭টা হইতে ৮টা অখণ্ড-সংহিতা পাঠ, সকাল ৮টায় সমবেত উপাসনা ও উপাসনান্তে দিবসব্যাপী হরি-ওঁ কীর্তন। বেলা ১২।০টায় শ্রদ্ধেয় ডাঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র সরকারের পরিচালনায় কীর্তনের এক ভাগ সহ শ্মশানে গমন ও পরলোকপ্রস্থিতের উদ্দেশ্যে ভোগ ও অঞ্জলি প্রদান। তৎপর সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সাত শত নরনারী পরিতৃপ্তির সহিত শ্রাদ্ধ-বাসরে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় বিগ্রহে অঞ্জলি দানান্তে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় উৎসব সমাপ্ত হয়। এতদুপলক্ষে যোগ্য পাত্রে অখণ্ড-সংহিতা দান ও কঞ্চল বিতরণ করা হয়। অখণ্ড মতের শ্রাদ্ধে কোনও পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না।

চারণকবি সত্যেশ্বরঃ—কলিকাতায় বিগত জন্মোৎসবে অনুষ্ঠিত স্বরূপানন্দ-সঙ্কীর্ত-সম্মেলনে চারণকবি শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় গীতরত্ন মহাশয় তাঁহার ভাস্ক-শ্রদ্ধার্ঘ্য-স্বরূপ স্বরচিত যে গানটি স্বভাবমূলভ উদাত্ত-কণ্ঠে গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন, আমরা নিয়ে তাহা ছাপাইয়া দিলাম :—

স্বরূপের স্বরূপ কিছু দেখতে যদি চাস্

চলে আয় পুপুন্যের ঐ পাহাড়-চূড়ার পাশ।

সেথা যে যজ্ঞশালা কন্মের বিপুল মেলা

শুভতার মাঝে চির সবুজের প্রকাশ ॥

চৈত্র, ১৩৬৭]

অথগু-সমাচার

প্রতিধ্বনি

১০৭২

নীরব শিলা বক্ষে সেথা ঝরেছে সরস ধারা,
রুদ্ধ জমির বৃক্ষলতায় শ্রামলিমা ভরা।

সেথা যে মৃত প্রাণে বহাল স্মৃতি দানে
ওঙ্কার-জীবন-বোধের দীপ্ত উচ্ছ্বাস ॥

কোন্ সে তাপস যুচাল আজ তুখী-দৌনের ক্লেশ
কার সাধনায় কঠোর শ্রমে জাগছে মৃত দেশ?

সে যে মোর বাবামণি স্বরূপানন্দ ঔ-ধ্বনি
আর্য্য-মন্ত্র-উদগাতা পুনঃ প্রশান্ত উচ্ছ্বাস।

প্রণাম তোমায় হে মহর্ষি নবীন বেদব্যাস ॥

এই গানটির কবি আমাদের ভক্ত-ভাই। কোন্ মহাপুরুষের তিনি
আশ্রিত, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি
আমাদের গুরুভ্রাতা নহেন। তাঁহার অন্তরের এই অবিচল শ্রদ্ধা
আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

অথগু-সংঘের মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক ভাব না বলিয়া বর্তমান
কালের যে কোনও ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা গুরুদেবের অপেক্ষা শ্রীশ্রীস্বামী
ব্রহ্মপানন্দ পরমহংস দেবের একান্ত ভক্তগণের মধ্যে আমরা সর্বাপেক্ষা
অধিক ভক্ত-ভাই পাইয়াছি। সকল মঠ এবং সকল আশ্রমের আশ্রিত
তরুণ কবি, তরুণ সাহিত্যিক এবং তরুণ গায়কগণের মধ্যে আচার্য্য
ব্রহ্মপানন্দের নিঃস্বার্থ ভক্ত-সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বেশী। ইহা
আমাদের বিশেষ গৌরবের কথা।

এই উপলক্ষে আমরা শ্রীমতোশ্বর মুখোপাধ্যায় গীতরত্নকে আমাদের
দায়িত্বিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

জগদীশ্বর উপলক্ষে ব্রহ্মপানন্দ-সঙ্গীত :—প্রতি বৎসরই

প্রতিধ্বনি

অথঙ্ক-সমাচার .

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

১০৮০

শ্রীশ্রীবাবামণির জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীতের আসর বসিয়া থাকে এবং স্ত্রানী, গুণী গায়কেরা তাহাতে নিজ নিজ কৃতিত্বপূর্ণ ভক্তিরস পরিবেশন করেন। হুই এক স্থানে একরূপও দেখা যায় যে, নানা রচয়িতার নানা গানের সমাবেশ হয়। আমাদের মতে, এই দিনটোতে তাহা হওয়া উচিত নহে। আচার্য্য স্বরূপানন্দের রচনার মধ্যে অতীব উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা হইতে বাছিয়া পরিবেশন করিলেও হুই এক রাত্রি কাবার হইতে পারে। এমতাবস্থায় স্বরূপানন্দ-সঙ্গীতের আসরে অগ্রাগ্র রচয়িতার রচনা আমদানী করা সম্ভব নহে। কারণ,—স্বরূপানন্দ-আদর্শ প্রচারই এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

যে যে স্থানে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীতের সম্মেলন হইবে, সেই সেই স্থানে শিল্পীদিগকে আগে হইতে শিক্ষা দিয়া তৈরী করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। যা তা গায়কের দ্বারা যা তা ভাবে সঙ্গীত পরিবেশনের ফলে শ্রোতাদের মনে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত সম্পর্কে বিকৃপ ধারণা সৃষ্ট হওয়াও অসম্ভব নহে।

প্রত্যেক স্থানের মণ্ডলীর উচিত স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সমগ্র বর্ষের এই একটা বিশেষ আনন্দদায়ক দিনের স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত পরিবেশনকে অতি উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদায় অভিষিক্ত রাখিবার চেষ্টা করা।

সজ্জবোধ ও জীবনোপায় :—কাছাড় বড়খলার এবং রামকৃষ্ণ নগরের দুইজন কস্মচ্যুত বিপন্ন অথঙ্কের নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি বিগত ১৮ই মাঘ কলিকাতা হইতে এক পত্রে লিখিয়াছেন,—“তোমরা কোনও কোনও স্থানে সজ্জবগত ভাবে খুবই শক্তিশালী। জেলা-হিসাবেও কাছাড়ে তোমাদের ধর্মসজ্জের গ্রায় বিরাট সজ্জ অত্র কোনও মতাবলম্বীদের সম্ভবতঃ নাই। এমতাবস্থায় তোমাদের মধ্যে বেকার-

চৈত্র, ১৩৬৭]

অখণ্ড-সমাচার

প্রতিধ্বনি

১০৮১

সমস্তা বিত্তমান থাকা তোমাদের সংস্কার পক্ষে সম্মানজনক নহে।
একটি বেকার ভাইকে যদি দশটি ভাই মিলিত চেষ্টায় কর্মসংস্থান
করিয়া না দেয়, তবে তাহা লজ্জার কথা। এই প্রসঙ্গে বেকার
অখণ্ডদেরও মনে রাখিতে হইবে যে, কেহ বিশ্বাস করিয়া কোনও কাজ
করিবার সুযোগ করিয়া দিলে, সেই সুযোগকে অসাধুতা বা অবিধিততার
দ্বারা যেন কলঙ্কিত না করা হয়। দুই পক্ষ হইতে এই দুইটি নিয়ম বা
বিধি পালনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলিলে কিছুকাল পরে দেখিতে পাইবে
যে, অত্যন্ত ধর্মসম্পন্ন লোকেরা তোমাদের মহনীয়তা সাগ্রহে ও সাদরে
স্বাক্ষর করিয়া নিতেছেন।”

শ্রীশ্রীবাবামণির লিখিত মন্তব্যের প্রতি প্রতিস্থানের মণ্ডলীর বিশেষ
ভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দুইদিনে ঐক্য এবং সহানুভূতির
বলেই পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে হইবে।

পরলোকে মনোমোহন :—কুমিল্লা জেলার শ্রীরামদীতে
(চাঁদপুর-পুরাণবাজার) একটি অখণ্ডমণ্ডলী আছে। মণ্ডলীর বয়স
কখনো উনচল্লিশ বৎসর। ভ্রাতা মনোমোহন দাস ইহার প্রতিষ্ঠাকাল
ব্যধি প্রতিটি সমবেত উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন এবং মণ্ডলীকে
তাহার মধুর কণ্ঠের হরি-ও নাম-গানে চিরকাল মুগ্ধিত করিয়াছেন।
আজ তিনি মর শরীরে আর নাই। তাহার পুত্র শ্রীমান্ নির্মলকুমারকে
নাথনা-পত্র দিতে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়াছেন,—“আজও মনোমোহনের
সেই সুমধুর কণ্ঠের হরি-ও কীর্তন আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে।
আমি জীবনে কখনো তাহার মধুর নামগান ভুলিতে পারিব না।”
মনোমোহনকে লইয়া আমরা সমবেত উপাসনা করিতাম, হিন্দু-মুসলমান
নির্মিশেষে সকল জাতি মিলিত হইত, সেই দৃশ্য ভুলিব না। ভারত
এ নাকি স্থানের সর্বত্র এই নামধর্মিক সাধকের আত্মার কুশলের জন্য

প্রতিধ্বনি

অখণ্ড-সমাচার

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১০৮২

সমবেত উপাসনা করিবার জন্ত আমরা অনুরোধ করিতেছি। সান্দন-পত্র ও নিম্নাল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—শ্রীনির্মল চন্দ্র দাস, C/O. ৬মনোমোহন দাস, শ্রীরামদৌ অখণ্ডমণ্ডলী, পোঃ পুরাণবাজার, জেলা কুমিল্লা। পূর্ব পাকিস্তান।

বলবৃদ্ধি ও দলবৃদ্ধি :—শ্রীশ্রীবাবামণি বিগত ১৯শে মাঘ তারিখে খড়্গপুর নিবাসিনী জনৈক মহিলা অখণ্ডকে পত্রযোগে জানান,—“এবার অখণ্ডসংখ্যা খড়্গপুরে বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ইহা যেন দলবৃদ্ধিতেই পরিণত না হয়, বলবৃদ্ধিরই এখন প্রয়োজন। ঐক্য, প্রেম, পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারাই বলবৃদ্ধি পায়। নিজ নিজ সাধনে অকপট অনুরাগ এবং সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগদানের অবিচল নিষ্ঠা দ্বারাই তোমাদের বলবৃদ্ধি হইবে, এই কথা একজনেও ভুলিও না।”

সমবেত উপাসনায় শুচিতা :—শ্রীশ্রীবাবামণি বিগত ১৯শে মাঘ তারিখে কাছাড় ভুবরিঘাট নিবাসিনী জনৈক পত্র-লেখিকাকে জানান,—“তুমি লিখিয়াছ, তোমরা সকলেই সমবেত উপাসনাতে বা নামসঙ্কীর্ণনে ধোত পরিকৃত বস্ত্রেই বসিয়া থাক কিন্তু বাহিরের বহু লোক ভক্তিসহকারে আসিয়া যোগ দেন, যদিও তাঁহাদের পরিধানে ধোত-পরিকৃত বস্ত্রাদি থাকে কিনা, নির্ণয় সহজ নহে। এই অবস্থায় কাহাকেও কাহাকেও উপাসনায় বা কীর্তনে বাধা দিলে মনঃক্ষুব্ধ হইবার কথা। এতৎসম্পর্কে কর্তব্য কি, তাহা জানিতে চাহিয়াছ। আমার নির্দেশ এই যে, উপাসনার নিমন্ত্রণ-প্রচারের কালেই জানাইয়া দিতে হইবে যে, উপাসনায় যোগ দিতে শুচিভাবে আসা প্রয়োজন। বাহারা শুচিভাবে আসিয়াছেন, তাঁহাদের আগের দিকে বসাইয়া দিব। পরে রবাহৃত পথচারীরা যদি ভক্তিবশতঃ উপাসনায় বসিয়া যান, তবে তাহাতে আপত্তি করিয়া অশান্তি সৃষ্টি উচিত নহে। সিনেমা-হাউস

চৈত্র, ১৩৬৭]

অখণ্ড-সমাচার

প্রতিধ্বনি

১০৮৩

গুলিতেও নিয়ম আছে যে, মৃত্যুপান করিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে না।
মৃতরাং সমবেত উপাসনায় আসিতে কিভাবে আসা উচিত, তাহা ভাল
করিয়া প্রচার রাখিলে ইহার শুভফলই হইবে।”

বিপন্ন বিধবা ও নিরাশ্রয় শিশু :—বিগত ১৯শে মার্চ
খ্রীষ্টাব্দাবামণি মণিপুর রোড নিবাসী জনৈক সন্তানকে এক পত্রে
লিখিয়াছেন,—“অখণ্ড-বধুরা বিধবা এবং অখণ্ড-শিশুরা পিতৃহীন হইলে
বাহাতে তাহাদের ক্ষুদ্র সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করা যায়, তেমন একটা
সংগঠন তোমাদের মধ্যে অচিরকাল মধ্যেই হওয়া উচিত। এই বিষয়টা
কতক কাল ধরিয়া আমার মনকে বিশেষ ভাবে উৎপীড়িত
করিতেছে।”

কর্মযোগীর মহাপ্রয়াণ ও অখণ্ড-বিধানানুযায়ী শেষকৃত্য
সমাপন :—বড়খল চা বাগানের ডাক্তার সুনীলকুমার দত্ত চৌধুরী
মহাশয়ের পিতৃ-দেবতা ৩২শে চন্দ্র দত্ত চৌধুরী গত ২৯শে পৌষ
শুভ উত্তরায়ণ তিথিতে, ৭২ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন।
তাহার রোগশয্যার পাশে সর্বদাই “অখণ্ড-সংহিতা” থাকিত, মধ্যে মধ্যে
তাহা পাঠ করিতেন। ইহাতে ভাবিয়াছিলাম, তিনি হয়ত একজন
অখণ্ডই হইবেন কিন্তু জিজ্ঞাসার পর জানিতে পারিলাম, কুলগুরু হইতে
দীক্ষিত হইলেও তাহার সাধন-জীবন ও কর্মময়-জীবন চালিত হইত
খ্রীষ্টাব্দাবামণির নির্দেশে—মন্ত্র বদলের প্রয়োজন হয় নাই, কারণ,
“বার বার ইষ্টই তার তার কৃষ্ণ”। আর বিপদাপদে, উত্তম-রাহিত্যে
তিনি নূতন উত্তম ও উৎসাহ সংগ্রহ করতেন ‘অখণ্ড-সংহিতা’ হইতে।
তাহা না হইলে ৬০ বৎসর বয়সে পাকিস্তানের দৌলতে পৈত্রিক বাসভূমি
হইতে বিতাড়িত হইয়া নূতন পরিবেশে নূতন বাড়ী তৈরী করিয়া
তাহাতে শাকসব্জী উৎপন্ন করিয়া প্রদর্শনীতে পুরস্কার লাভ করা সহজ

১০৮৪

হইত না। কেবল কি তাহাই, নিকটবর্তী একটা সরকারী হাসপাতালে ডাক্তারী চাকুরী গ্রহণ করেন এবং যোগ্যতার সহিত প্রায় ৮ বৎসর চাকুরী করিয়া মৃত্যুর মাত্র ২ মাস পূর্বে স্বৈচ্ছায় চাকুরী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। এই যে হৃদান্ত কর্মপ্রেরণা, তাহার উৎস ছিল 'অখণ্ড-সংহিতা'। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে যখন তাঁহার ছেলে জিজ্ঞাসা করেন, বাবা! নাম স্মরণ থাকে ত? তখন তিনি উত্তর দেন, কেন? শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দেশ মত নাম স্মরণ রাখতে আমার ত কোন কষ্ট হয় না বাবা! শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার ইষ্টনাম স্মরণ রাখিয়াছেন বলিয়া তাহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইত। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের সকলে ঘোষণা করেন যে, তাহার সব শেষকৃত্যই অখণ্ড বিধানানুযায়ী হইবে। মৃত্যুর আধ ঘণ্টার মধ্যেই সকলে শোক-সম্বরণ করিয়া সমবেত উপাসনায় বসেন, তৎপর হরি-ওঁ কীর্তন করিয়া আশান্বাতে নেওয়া হয়। অখণ্ডমতে একাদশ দিনে বিনা পুরোহিতে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া বেশ আড়ম্বরের ভিতরেই সর্বজাতি, সর্বধর্ম ও সর্ববর্ণের লোক লইয়া সম্পন্ন হয়। কাছাড়ের অনেক মণ্ডলীর প্রতিনিধিই এই শুভকাজে উপস্থিত ছিলেন। বাগানের বাবু ও শ্রমিকদের সহযোগিতা আদর্শ-স্থানীয়। এমন শৃঙ্খলা বাগান-অঞ্চলে খুব কমই দেখা যায়। উষাকীর্তন, সমবেত উপাসনা, নামজপষষ্ঠ, অখণ্ড-সংহিতা দান, প্রসাদ বিতরণ, সন্ধ্যায় কীর্তন, কর্মসূচীর মধ্যে এই কয়টাই ছিল প্রধান।

এই কর্মযোগীর অনেক কর্মের ঐতিহাসই বলার আছে, তবে রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনে জাগে যে, এই সব কর্মযোগী যে মহাগ্রন্থ হইতে কর্মপ্রেরণা আহরণ করেন, আমাদের মন কি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে না? সে স্মৃতি

চৈত্র, ১৩৬৭]

অখণ্ড-সমাচার

প্রতিধ্বনি

১০৮৫

কবে হইবে? ইতি—উৎসবাগত প্রতিনিধি—শ্রীরাজেন্দ্র কুমার দাস,
ভুবনধর চা-বাগান, ২০শে মাঘ, ১৩৬৭ বাংলা।

সামাজিক দলাদলি ও সমবেত উপাসনা:—বিগত ১২শে
মাঘ তারিখে কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরা-রাজ্যের ঘিলাতলী
বাহারের জনৈক অখণ্ডকে নিম্ন পত্র দিয়াছেন। যথা,—

“সমবেত উপাসনা হইতেছে ধর্ম-কার্য। সমবেত উপাসনার
স্থান হইতেছে মন্দির। সমবেত উপাসনায় যোগদানকারী হইতেছে
তীর্থযাত্রী। কাহার উপর সমাজের কি শাসন আছে বা গ্রামবাসীদের
কি বয়কট আছে, তাহার হিসাব করিয়া কি তোমরা লোককে সমবেত
উপাসনায় প্রবেশ করিতে দিবে বা প্রবেশ-নিষেধ জ্ঞাপন করিবে?
যে ব্যক্তি ভক্তি-বিনয়-চিত্তে গুচিদেহে পবিত্র বস্ত্রে উপাসনার উদ্দেশ্যে
আসিবে, তাহাকে রাজনৈতিক দলাদলি, গ্রাম্য পঞ্চায়েত বা
আদালতের-রায়ের দিকে তাকাইয়া নিষেধ করিবার তোমাদের অধিকার
নাই। সমাজের শাসন একজন লোকের ধোপা নাপিত বন্ধ করিতে
পারে, কিন্তু গুরুদেবের প্রবর্তিত ধর্মের অনুশীলন করিতে কি করিয়া
বাধা দিতে পারে? আমার ধর্ম সমবেত উপাসনায় সকলেরই
যোগদানের অধিকার রহিয়াছে। এমন কি খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরও
আছে।”

উদয়াস্ত কীর্তনের নিয়মাদি:—ধুবুলিয়া নিবাসী জনৈক প্রশ্ন-
কর্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি ২১শে মাঘ তারিখে নিম্নলিখিত
কথা লেখেন,—

“তুমি উদয়াস্ত কীর্তনের নিয়মাদি জানিতে চাহিয়াছ। উদয়াস্ত
কীর্তনের বাধা নিয়ম কিছু নাই। তবে নিম্নলিখিত দুই ভাবে তাহা

১০৮৬

অনুষ্ঠিত হইতেছে। তোমাদের সুবিধানুযায়ী যে-কোনও একভাবে করিতে পার।

“পূর্বদিন সন্ধ্যায় অধিবাস কীর্তন করিতে হয়।

“(ক) সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ‘জয়গুরু’ ধ্বনি দিয়া কতকক্ষণ অথও-সংহিতা পাঠের পরে কীর্তন আরম্ভ হইবে এবং সূর্যাস্তের পর কীর্তন সমাপ্ত করিয়া অঞ্জলি দানান্তে উৎসব-সমাপন।

“(খ) সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি সমবেত উপাসনা আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ লয়ে নিয়মিত হরি-ওঁ কীর্তন এক লহর গাহিয়া লইয়া তারপরে বাজযন্ত্র সহ সঙ্গত করিয়া যে-কোনও সুরে তাতে অবিচ্ছেদ হরি-ওঁ গাহিয়া যাওয়া। যতক্ষণ সমবেত উপাসনার অঙ্গরূপে কীর্তন হইতেছে, ততক্ষণ কোনও বাজযন্ত্র ব্যবহৃত হইবে না। সূর্যাস্তের পরে কীর্তনান্তে বাজযন্ত্র-বর্জিত ভাবে দীর্ঘ লয়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরে এক লহর হরি-ওঁ গাহিয়া অঞ্জলি দানপূর্বক শান্তিবাচনের দ্বারা উৎসব-সমাপ্তি।”

অনুষ্ঠানে সময়ানুবর্তিতা :—শিলং অথওমণ্ডলী হইতে আমরা শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ জন্মোৎসবের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি, তাহাতে একটি বিষয় দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। ভ্রাতা শচীন্দ্র দেব (সম্পাদক) জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা প্রতিদিনের প্রাতঃকাল অনুষ্ঠান বড়ির কাঁটায় কাঁটায় সম্পাদন করিয়াছেন।

বহুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির বিশেষ প্রয়োজন। (১) কর্মভার যোগ্যপাত্রের বণ্টন এবং বণ্টিত কার্য্য বিধিসম্মত সহিত সম্পাদন, (২) অনেক রকমের ইয়বরল প্রগ্রাম না রাখিয়া কাটাছাঁটা সাধানুযায়ী কর্মসূচী তৈরী করা,

- (৩) জনসাধারণকে, এই কর্মসূচীর সহিত ভালভাবে পরিচিত রাখা,
 (৪) পরস্পরের মধ্যে কর্মসম্পাদনে সহযোগিতা দেওয়া।

আশা করি, শিলং-এর ত্রায় সময়ানুবর্তিতা সকল স্থানেই অনুমত হইবে।

বদরপুরের জন্মোৎসব :—বদরপুর অখণ্ডমণ্ডলীর সম্পাদক ভ্রাতা শ্রীম্বোধ চন্দ্র পাল চৌধুরী তাঁহার পঁচিশ জানুয়ারীর পত্রে লিখিয়াছেন,—

“কল্লনাভীত সাফল্যের সহিত এবারকার জন্মোৎসব পালন করিয়াছি। এবারকার উৎসব নানা দিক দিয়াই তাৎপর্যপূর্ণ হইয়াছে। ভ্রাতা শ্রী—.....প্রতি বৎসরই পৃথক্ ভাবে উৎসব করেন। এবার তিনি তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন। তিনি সর্বশক্তি নিয়া মণ্ডলীর উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। * * * নানা কারণে গত দুই তিন বৎসর আমরা উৎসবাদি অতি সংক্ষেপে করিয়াছি। ইহাতে একদিকে আমাদের ভ্রাতারা নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অতীতকালে জনগণচিন্তেও আমরা প্রায় স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই, এসব বিষয় ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে আমিই স্থানীয় ভ্রাতাদের নিকট প্রস্তাব দেই যে, ১২ই পৌষ শ্রীশ্রীবাবামণির শুভ জন্মদিনে নিজ নিজ বাসায় রাগা বন্ধ করিয়া এক বেলার ডাল-চাউল ও বাজার-খরচ মণ্ডলীকে দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে ভোগ-নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ আমরা গ্রহণ করিব। ইহাতে আশ্চর্য্য কাজ হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় সতীশদা জন্মোৎসবের সময় এখানে ছিলেন না। তাই এইরূপ একটা উৎসবের আয়োজন করা আমার নিজের পক্ষেও খুব চিন্তার বিষয় ছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণির কৃপায় সব জলের মত সোজা হইয়া গেল, উপাসনান্তে মাঠক যোগে হরি-ও কীর্তনের মধুর লহরী চারিদিকে বিস্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গিপীলিকার

১০৮৮

মত জনশ্রোত মণ্ডলীর দিকে আসিতে থাকে। প্রত্যেকের প্রদত্ত চাল-ডাইল ও তরকারীতে প্রায় ৮ মনের মত জিনিষ আমাদের হইয়াছিল। বেলা ১ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়াছেন। মোট ৯৬ ডেগ খিচুড়ী রান্না হইয়াছিল।”

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে কে না সুখী হইবেন?

একটী প্রস্তাব—আগামী বৎসর শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-জন্মোৎসব উপলক্ষে একটী কাজ কি করা যায় না? অধিবাস দিবস, উৎক্রমণীয় দিবস, উদযাস্ত কীর্ত্তন ও উদযাস্ত জপযজ্ঞের চারিদিন বাদ দিয়া বাকী পাঁচ দিনে পাঁচ জন সুবক্তা দ্বারা পাঁচটী বিষয়ে কি ভাষণ দেওয়ান যায় না? অবশ্য বক্তাদিগকে অখণ্ড-সংহিতাখানা ভাল করিয়া পড়িতে হইবে। ভাষণের বিষয় :—(১) অখণ্ড-সংহিতা ও বিশ্বজনীনতা, (২) অখণ্ডসংহিতা ও কর্ম্মযোগ, (৩) আদর্শ সমাজ ও আদর্শ জীবন গঠনে অখণ্ডসংহিতা, (৪) অখণ্ডসংহিতায় জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, (৫) অখণ্ড-সংহিতার মধ্যে সুখ ও শান্তির পথ-নির্দেশ।

চিন্তাটী সুখী সমাজে দিয়া রাখিলাম। কালক্রমে ইহা ফলবতী হইতে পারে। (৬ নরেশচন্দ্র দেব, শিলচর *)

অখণ্ডমতে শ্রদ্ধা :—আলিপুর দ্বারের গুরুগতপ্রাণ ভ্রাতা শ্রীহরধ নাথ ভৌমিক সংবাদ দিতেছেন,—সুভাষ পল্লীর ভ্রাতা নন্দলাল দাস বিগত ৬ই পৌষ, পরলোক গমন করেন। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া সমবেত উপাসনান্তে সংস্কার করা হয় এবং যথাকালে অখণ্ডমতে সমবেত

* ভ্রাতা নরেশচন্দ্র দেব শিলচর অখণ্ডমণ্ডলীর একটী স্তম্ভস্বরূপ অসাধারণ কথ্য ছিলেন। বিগত ২১শে মাঘ তিনি সকলকে কাঁদাইয়া অকালে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

উপাসনার দ্বারা বিনা পুরোহিতে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হয়। উপাসনান্তে সমাগত সজ্জনদের পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করান হয়। তৎপর হরি-ওকীর্তন সহকারে মৃতের অস্থি নদীতে বিসর্জন করা হয়।

সমবেত উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্যের পরিমাণ :—সম্প্রতি পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত বেঙ্গলগ্রাম হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী শ্রীশ্রীবাবামণিকে একখানা পত্র লেখেন। তাহার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি জানাইয়াছেন,—“সমবেত উপাসনায় যত ইচ্ছা লোককে নিমন্ত্রণ করিতে পার। তোমার ভোগনৈবেদ্যের আয়োজন কম আছে বসিয়া কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। প্রসাদ ত কণিকা পাইলেই যথেষ্ট। ভোগ-নৈবেদ্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্ত বাড়ী বাড়ী ধন্য দিয়া ঘুরিবার প্রস্তাবও অসুন্দর। বাঁহারা ভক্তিমান, সমবেত উপাসনার স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁহারা হাতে করিয়া যার যা সাধ্য, পূজোপকরণ নিয়া আসিবেন। সব মিলিয়া যাহা হইবে, তাহাতে একা তোমার বা তোমার অগ্র কোনও প্রতিবেশীর যশ হইবে, এই সকল ধারণা কেহ যেন মনে পোষণ না করে। সকলে মিলিয়া সমবেত উপাসনা, সুতরাং যশঃ ত সকলেরই হইতেছে, গ্রাম্য ভাবে দূষিত মন ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়া সমবেত উপাসনাকে দেখিতে যাইও না। যার গৃহেই উপাসনা হইবে, সাধারণতঃ ব্যয়ের চোটটা তাহার উপরে একটু বেশী পড়ে। কিন্তু অগ্রের কাহারও কন্যাবিবাহের বা পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাইতে আসেন নাই যে, আকর্ষণ প্রসাদ না দিতে পারিলে নিন্দা হইবে। বহু স্থানে বিনা নৈবেদ্যেও সমবেত উপাসনা হইয়াছে। তবে ফুলবিশ্বপত্র সম্ভবমত সংগ্রহ প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ডে আমার ছেলেরা সমবেত উপাসনা বিরতুলদীপাদ দিয়াই করিয়াছে। অবশ্য, ইহা আপদকর্য।”

প্রতিনিধি-সম্মেলন সম্পর্কে বিশেষ বিবেচ্য বিষয় :—এ পর্য্যন্ত

১০১০

নানাস্থানে পরপর বহু অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। কিন্তু কতকগুলি বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে আমরা সম্ভবতঃ মনোযোগ দিতেছি না, এইরূপ মনে হইতেছে। বিবেচ্য বিষয়গুলির একটি আমরা নিম্নে লিখিলাম।

সম্মেলনে যিনি সভাপতি হইয়া আসেন, তাঁহার সভাস্থানীয় ভাষণটুকু শোনা ছাড়া, তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা দ্বারা সভার পূর্বে ও পরে নিজেদের কর্তব্য-বিষয়ক প্রত্যয়কে উজ্জ্বল করার কি প্রয়োজন নাই? অনেকে সভারন্তর ঠিক পূর্বে ট্রেন হইতে নামেন এবং সভার কার্য শেষ হইবার আগেই বা শেষ হওয়া মাত্রই ট্রেন ধরিবার জগ্গ ছোটেন।

একটি মাত্র বেলার সম্মেলন। তাহার ৬৭ ঘণ্টা আগে একটি সাধারণ আলোচনা-সভা কি হওয়া উচিত নহে? ইহাতে সম্মেলন-কালে অকারণ বহুতা-সংখ্যার বাড়াবাড়ির প্রয়োজন অনেকটা কমিয়া যায়, প্রত্যেকে নিজেদের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কেও একটু সচেতন হইতে পারেন। তদুপরি নানা মণ্ডলীর প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রগাঢ় একটা পরিচয় হইবারও ইহাতে সুবিধা হয়।

পথের সন্ধান

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব]

(১০০)

উপকারীর উপকার যে পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিবে না, সে মানুষ নহে পশু। তোমরা সর্বদা মানুষের মেরুদণ্ড লইয়া চলিতে চেষ্টা

চৈত্র, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

১০২১

করিও। যে জীব সর্বপ্রথম সরল মেরুদণ্ডে হাটিতে শিখিল, তাহাকেই মানুষ বলিয়া বানয়, গরিলা, শিম্পাঞ্জী হইতে আলাদা করা হইল। মানুষ নাম পৌরুষের ব্যঞ্জক। মানুষোচিত পৌরুষ ত্যাগ না করিলে কেহ অকৃতজ্ঞ হইতে পারে না।

(১৩১)

সংখ্যাবলই বল, তাহা নহে। চরিত্রবলই আসল বল। আদর্শ-নিষ্ঠা হইতে চরিত্রবলের সৃষ্টি।

(১৩২)

বিরুদ্ধ অবস্থা বা প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করিয়া নিজের পথ নিজে কাটিয়া হিমালয় লঙ্ঘন করিবার বা দুর্গম কান্ডার অতিক্রম করিবার ক্ষমতা তোমার আছে, ইহা বিশ্বাস করিও। বিশ্বাসেই বল, অবিশ্বাসে নহে।

(১৩৩)

জীবনের সার্থকতা ত্যাগেও নয়, ভোগেও নয়, প্রেমে। ত্যাগ প্রেমকে সহজলভ্য করে, ভোগ তাহাকে করে দূরায়ত্ত। এই কারণেই জগতে ত্যাগের এত প্রশংসা, এত জয়ধ্বনি। প্রেমিকই জীবিত, অপ্রেমিক মৃত। তুমি প্রেমিক হও।

(১৩৪)

জীবন-স্বাক্ষরের ধ্রুবতারা প্রেম। এই একটা জিনিষে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই তোমার চরণ বিপথে চলিতে পারিবে না। ধ্রুব খুব উজ্জল নক্ষত্র নহে, প্রকৃত-প্রেমও উজ্জ্বল-বর্জিত।

প্রতিধ্বনি

১০৯২

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

(১৩৫)

অপাত্রে অনুগ্রহ অকুশলের সৃষ্টি করে। অনুচিত অনুগ্রহ অকৃতজ্ঞের সৃষ্টি করে। অসময়োচিত অনুগ্রহ সংলোককেও অসং করে। যোগ্যতার সম্মান দাও, শ্রমশীলের সমাদর কর, অলসকে প্রশ্রয় দিও না। অত্যধিক অতিথিপরায়ণ লোকেরা কেবল পুণ্যই সঞ্চয় করেন না, অলস প্রতিপালনের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। যাহাকে অনুগ্রহ করিতেছ, সে তাহা পাইবার জন্ত যোগ্য শ্রম করিতেছে কি না, লক্ষ্য করিয়া দেখ। অন্ন হইলেও যে শ্রম করে, তাহাকে উৎসাহ দেওয়া সম্ভব এবং ধর্মোপেত। কেবল দয়াভিক্ষাই যাহার যোগ্যতা, তাহাকে অর্থ, অন্ন, বস্ত্র বা আশ্রয় না দিয়া অর্জনের যোগ্যতা দান কর। যোগ্যতা আসিলে নিজ ভূজবীর্যেই সে সব করিতে পারিবে।

(১৩৬)

ক্ষেত্রবিশেষে দুঃসাহসের মত গুণ নাই, স্থলবিশেষে ইহার মত দোষও কিছু নাই। দুঃসাহসের পরিণাম যেখানে সফলসম্ভাবী, সেখানে বিফলতার ঝুঁকি নিয়াও আগাইয়া চলিতে হইবে। যেখানে দুঃসাহসের পরিণতি চরিত্রভ্রংশতা, সেখানে একটু কাপুরুষ হইলে দোষ নাই।

(১৩৭)

উচ্চাকাঙ্ক্ষ হও, দুঃসাহসী হও, সংকার্য্যে অপরের সাহস দেখিলে তাহার তারিফ কর, তাহার সাহায্যের জন্ত হাত বাড়াইয়া দাও। ভীর্ণপালের সমালোচনায় আর কাপুরুষের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিও না।

চৈত্র, ১৩৬৭]

পথের সন্ধান

প্রতিধ্বনি

১০৯৩

(১৩৮)

বৃগবৃগান্ত প্রতীক্ষা করিয়া হইলেও পরমা সিদ্ধি আয়ত্ত করিতেই হইবে এইরূপ থাকা চাই ধৈর্য্য, আর, একটী নিমেষের মধ্যেই পরমা সিদ্ধি আয়ত্ত হওয়া চাই, শুধু এই জীবনেই নহে, অতীত দিনের মধ্যে হওয়া চাই, এইরূপ থাকা চাই অধীরতা। এই দুইটী বস্তুর পূর্ণ সামঞ্জস্য হইক তোমার জীবনে।

(১৩৯)

নিষ্ঠা ও ভক্তি পুরুষকারের সহিত প্রযুক্ত হইলে মাটিকে মোগা এবং মোগাকে হীরায় পরিণত করে। তোমরা নিষ্ঠাবান্ হও, ভক্তিমান্ হও, পুরুষকার-প্রবুদ্ধ হও।

(১৪০)

বিপত্তি দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। যুদ্ধ করিয়া সকল বিপত্তি জয় করিতে হইবে। নিশ্চয় সংগ্রামে সকল প্রতিকূল অবস্থাকে পদানত করিতে হইবে।

(১৪১)

যে দেশেই যাও, যে অবস্থাতেই পড়, ভগবানের দয়ায় বিশ্বাস রাখিও আর মানুষের মত শক্ত হইয়া সরল মেরুতে দাঁড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিও। কুকুরের পদলেহন বৃত্তিকে লোভনীয়, শ্লাঘনীয়, সম্মাননীয় বলিয়া জ্ঞান করিও না।

(১৪২)

প্রতিযোগিতা করিয়া কে তোমার কি অনিষ্ট করিতে পারিবে, তুমি

প্রতিধ্বনি

পথের সন্ধান

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১০১৪

যদি সং, সরল ও প্রেমিক হও ? ভগবান্কে ভুলিও না, সংপথ হইতে
চ্যুত হইও না ।

(১৪৩)

সর্বদা ভগবানে মন রাখিয়া পথ চল । দুঃখ-বিপদ সুখ-সম্পদ সব
তঁারই চরণে অর্পণ করিয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হও ।

(১৪৪)

ধৈর্য্যহীন পুরুষ আত্মঘাতী, অধীরতাহীন পুরুষ নপুংসক । ধৈর্য্য
ও অধৈর্য্যকে একাধারে সুসম্বিত করিয়া লাভ কর পূর্ণ জীবন ।

(১৪৫)

জাতিলিঙ্গবিচারের উর্দ্ধে স্থাপন কর মনকে । দেখিও, পতন-
সম্ভাবনা নিমেষে হ্রাস পাইবে । আত্মানাত্মবিচার মনকে স্থির হইতে
সাহায্য করে কিন্তু ব্রহ্মসাগরে অবগাহন মনকে ক্ষীরবৎ প্রগাঢ় করে ।
তখন আর তাহাতে তারল্যের তরঙ্গ, চাঞ্চল্যের বিক্ষেপ, দৌর্ব্বল্যের
লীলালাস্ত থাকে না । উর্দ্ধে চল, কেবলই উর্দ্ধে চল, চল অনন্ত উর্দ্ধে ।
উর্দ্ধ অধঃ সব মিলিয়া যেখানে বিচারের সীমারেখা অতিক্রান্ত হইয়া
গিয়াছে, সেই ব্রহ্মরূপী গগনাতীত অনন্ত সত্তায় নিজেকে নিমজ্জমান কর ।

(১৪৬)

সংগ্রামহীন জীবনকে শান্তিময় জীবন বলিয়া ভ্রম করিও না । শান্তি
আর আনন্দ সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আসে । আপোষহীন সংগ্রামী
মনোভাব লইয়া নির্ভয়ে পথ চল । অকারণে তরবারির আফালন

চৈত্র, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিবন্ধি

১০৯৫

করিও না কিন্তু প্রয়োজনস্থলে তরবারির সদ্যবহারেও পশ্চাৎপদ
হইও না।

(১৪৭)

হীনতাকে স্থায়ী করিয়া রাখে হীনমত্ততা। মন হইতে হীনের
অভিমান দূর কর। হীনতাকে সৃষ্টি করে হীন অনুষ্ঠান। হীন কার্য্য
হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে থাক। চরিত্রের দুর্ব্বলতাকে মহত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা
করিও না। দুর্ব্বলতা টের পাইলে শত্রু হাতে তাকে শাসন করা
আত্মশাসন ও আত্মশোধনই বড় হইবার পথ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরিণত মন ও শুদ্ধ মন :—প্রসঙ্গান্তরে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া
বলিকাতার এক সুপ্রধান দৈনিকে স্নলেখক শ্রীমানস রায় চৌধুরী
কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।
বলা—

“মানসিক অপরিণত লোক শুধুমাত্র নিজেই অসুখী হয় না,
পরিবারের অন্তর্দেহও বহু অসুবিধার সন্মুখীন করে। এই অপরিণতির
লক্ষণ ব্যক্তির নানা আচরণে ফুটে ওঠে। কয়েকটি প্রশ্ন করা যাক।
মনস্থির করে জবাব দিতে চেষ্টা করুন।

“(এক) আপনার চেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কি আপনি সহ্য
করতে পারেন?

১০৯৬

“(দুই) অগ্নির সাহায্য ছাড়াই কি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন ?

“(তিন) আপনি কি সহজেই একজন আশাহীন বিষয় ব্যক্তির মধ্যে আনন্দের সঞ্চার করতে পারেন ?

“(চার) ভবিষ্যৎ সুখের মুখ চেয়ে বর্তমানে দুঃখকষ্ট সহিতে রাজী আছেন কি ?

“(পাঁচ) আপনার বিষয়ে অগ্নির সমালোচনা ও অপ্রীতিকর মন্তব্য কি হাসিমুখে সহ্য করতে পারেন ?

“(ছয়) নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি স্বীকার ক’রে শুধরানোর চেষ্টা করেন কি ?

“(সাত) আপনি কি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সং, আন্তরিক এবং বন্ধু-ভাবাপন্ন ?

“(আট) স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ বয়স ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে যে-কোন মানুষের সঙ্গেই কি আপনি মিশতে পারেন ?

“(নয়) একঘর অচেনা লোকের মাঝে সহজেই যেতে পারেন কি ?

“(দশ) প্রিয়জনকে সুখী করার জন্তে আপনি যে-কোন ভাগ স্বীকার করতে রাজী আছেন কি ?

“দশটি প্রশ্নের উত্তরে যদি হ্যাঁ বলতে পারেন, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, আপনার মানসিক পরিণতি এসেছে। কমপক্ষে সাতটি ‘হ্যাঁ’ সবারই বলা উচিত, এর কম হলে ভাবনার কথা।”

শ্রীমানস রায় চৌধুরী যে প্রশ্নগুলি দিয়াছেন, তাহার পরে আমরা আরও কয়েকটা প্রশ্ন লিখিতে ইচ্ছা করি। শুদ্ধমনা ব্যক্তিরাই জগতে

সুখী হন। আপনি শুদ্ধমনা কিনা, তাহার বিচার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির
দ্বারা হইতে পারে।

(এক) অপরের উন্নতি দেখিলে আপনি ঈর্ষ্যা অনুভব না
করিয়া আনন্দ বোধ করেন ত ?

(দুই) অপরের অনিষ্ট হইতেছে দেখিলে আপনার মনে আনন্দ
না হইয়া দুঃখ উপজাত হয় ত ?

(তিন) অপরকে নিজ মত গ্রহণ করাইবার জন্ত আপনি
কোনও মিথ্যা, ছল, ছাতুরী বা ভীতিপ্রদর্শনে কুণ্ঠাবোধ করেন ত ?

(চারি) নিজে উদর পূরিয়া অন্নপানীয় গ্রহণ কালে নিরন্ন
নিরাশ্রয় অনাথ দুঃখীদের কথা নিমেষের জন্ত হইলেও আপনার
মনে পড়ে ত ?

(পাঁচ) কেহ পরনিন্দা শুরু করিলে আপনি তাহাতে বিরক্তি
এবং অনাগ্রহ অনুভব করেন ত ?

(ছয়) নিজের প্রশংসা চতুর্দিকে জাহির করিবার ব্যাপারে
আপনি আগ্রহহীন বটেন ত ?

(সাত) যাহারা সৎ, পরোপকারী ও ভগবদ্বক্তা, তাহাদের প্রতি
যাভাবিক ভাবেই আপনার অন্তরের শ্রদ্ধা জাগ্রত হয় কি ?

(আট) না জানিয়াও পরের ধন, বস্তু বা সম্পত্তি আপনার
হস্তগত হইয়া গেলে আপনি অনুতপ্ত হন কি ?

(নয়) আপনার যাহারা সঙ্গ করেন, তাহাদিগকে আপনি
সংপাশ্রিত করিবার চেষ্টা করেন কি ?

(দশ) ছোট বড় নির্বিশেষে সকল মানুষই আপনার নিকট
সমাদর লাভ করেন কি ?

আয়ুর্বেদ বিল :- পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উত্থাপিত আয়ুর্বেদ

১০৯৬

“(তুই) অতের সাহায্য ছাড়াই কি কোনও সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন ?

“(তিন) আপনি কি সহজেই একজন আশাহীন বিষন্ন ব্যক্তির মধ্যে আনন্দের সঞ্চার করতে পারেন ?

“(চার) ভবিষ্যৎ সুখের মুখ চেয়ে বর্তমানে দুঃখকষ্ট সহ্যে রাজী আছেন কি ?

“(পাঁচ) আপনার বিষয়ে অতের সমালোচনা ও অপ্রীতিকর মন্তব্য কি হাসিমুখে সহ্য করতে পারেন ?

“(ছয়) নিজের ক্রটিবিচ্যুতি স্বীকার ক’রে শুধরানোর চেষ্টা করেন কি ?

“(সাত) আপনি কি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সৎ, আন্তরিক এবং বন্ধু-ভাবাপন্ন ?

“(আট) স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ বয়স ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে যে-কোন মানুষের সঙ্গেই কি আপনি মিশতে পারেন ?

“(নয়) একঘর অচেনা লোকের মাঝে সহজেই যেতে পারেন কি ?

“(দশ) প্রিয়জনকে সুখী করার জন্তে আপনি যে-কোন ভাগ স্বীকার করতে রাজী আছেন কি ?

“দশটি প্রশ্নের উত্তরে যদি হ্যাঁ বলতে পারেন, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, আপনার মানসিক পরিণতি এসেছে। কমপক্ষে সাতটি ‘হ্যাঁ’ সবারই বলা উচিত, এর কম হলে ভাবনার কথা।”

শ্রীমানস রায় চৌধুরী যে প্রশ্নগুলি দিয়াছেন, তাহার পরে আরও কয়েকটি প্রশ্ন লিখিতে ইচ্ছা করি। শুদ্ধমনা ব্যক্তিরাই জগতে

স্বখী হন। আপনি শুদ্ধমনা কিনা, তাহার বিচার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির দ্বারা হইতে পারে।

(এক) অপরের উন্নতি দেখিলে আপনি ঈর্ষ্যা অনুভব না করিয়া আনন্দ বোধ করেন ত ?

(দুই) অপরের অনিষ্ট হইতেছে দেখিলে আপনার মনে আনন্দ না হইয়া দুঃখ উপজাত হয় ত ?

(তিন) অপরকে নিজ মত গ্রহণ করাইবার জন্ত আপনি কোনও মিথ্যা, ছল, ছাতুরী বা ভীতিপ্রদর্শনে কুঠাবোধ করেন ত ?

(চারি) নিজে উদর পূরিয়া অন্ত্রপানীয় গ্রহণ কালে নিরন্তর নিরাশ্রয় অনাথ দুঃখীদের কথা নিমেষের জন্ত হইলেও আপনার মনে পড়ে ত ?

(পাঁচ) কেহ পরনিন্দা শুরু করিলে আপনি তাহাতে বিরক্তি এবং অনাগ্রহ অনুভব করেন ত ?

(ছয়) নিজের প্রশংসা চতুর্দিকে জাহির করিবার ব্যাপারে আপনি আগ্রহহীন বটেন ত ?

(সাত) যাহারা মৎ, পরোপকারী ও ভগবদুভক্ত, তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আপনার অন্তরের শ্রদ্ধা জাগ্রত হয় কি ?

(আট) না জানিয়াও পরের ধন, বস্তু বা সম্পত্তি আপনার হস্তগত হইয়া গেলে আপনি অনুতপ্ত হন কি ?

(নয়) আপনার যাহারা সঙ্গ করেন, তাঁহাদিগকে আপনি সৎপথপ্রিত করিবার চেষ্টা করেন কি ?

(দশ) ছোট বড় নির্বিশেষে সকল মানুষই আপনার নিকট সদালাভ করেন কি ?

আয়ুর্বেদ বিল :- পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উত্থাপিত আয়ুর্বেদ

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১০৯৮

বিলটি মোটামুটি ভাবে বিধান সভায় সকল দলের সমর্থন লাভ করিয়াছে বলা যায়। কিন্তু যে আয়ুর্বেদ-সেবীদের স্বার্থ ইহার সঙ্গে একান্ত ভাবে জড়িত, তাঁহাদের অধিকাংশই এ বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন। বিলটি এখনও আলোচনার পর্যায়েই আছে। অতএব ইহার গুণাগুণ বিচার করিয়া মতামত ব্যক্ত করা এবং ক্ষতিকর কোনও বিধানের পরিবর্তন সাধন তথা প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজনের জন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা প্রধানতঃ আয়ুর্বেদ-সেবীদেরই একান্ত কর্তব্য। তাঁহাদের এই ওঁদামীত্ব আয়ুর্বেদানুরাগীদের মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছে।

বিলটি সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আয়ুর্বেদ-সেবীদের দীর্ঘদিনের দাবী আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার সরকারী স্বীকৃতি পূরণের পছা হিসাবে বিলের সমর্থন জানাইয়াও কয়েকটি কারণে ইহার বিরোধিতাও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। প্রথমতঃ বিলের বিধানানুসারে একজন রেজিষ্টার্ড আয়ুর্বেদ-চিকিৎসক একজন রেজিষ্টার্ড এ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের সমান মর্যাদা পাইবেন না। বিশেষতঃ সুরা, অহিফেন, স্পিরিট ও এই জাতীয় অত্যন্ত ঔষধ ব্যবহারের ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিবে কিনা সন্দেহ। একজন কবিরাজের ডেথ সার্টিফিকেটও গ্রাহ্য হইবে না। দ্বিতীয়তঃ সরকারী মনোনয়নের ভিত্তিতে অধিকাংশ সদস্যবৃন্দ আয়ুর্বেদ-পরিষদ গঠনের ধারাটির সমস্ত ভাবেই আপত্তিজনক। তৃতীয় আর একটি অত্যন্ত গুরুতর আপত্তি হইল, ঔষধ-প্রস্তুতকারকদের লাইসেন্স গ্রহণের বিধান। ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া লাইসেন্স প্রদানের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে ঔষধ-প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। তাঁহাদের বক্তব্য হইল, বিলে ঔষধের মান ও

চৈত্র, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

১০৯৯

বিগততা পরীক্ষার পর লাইসেন্স দানের নির্দেশ দেওয়া আছে। অথচ এই ধরনের পরীক্ষার কোন নির্ভরযোগ্য সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড অত্য়পি আবিষ্কৃত হয় নাই, আরও আশ্চর্যের বিষয় বর্তমান বিলেও এই মানদণ্ডের কোনও উল্লেখ নাই। এমতাবস্থায় পূর্বাহ্নে সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড নির্দ্ধারিত না করিয়া এবস্থিধ লাইসেন্স-প্রথা প্রবর্তিত হইলে ভূনীতি প্রশ্রয় পাইবে এবং ঔষধ-প্রস্তুতকারীরা অযথা বিব্রত হইবে। যথের কথা এই, একান্ত অযৌক্তিক বিধানটির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ বৃহৎ আয়ুর্বেদ ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের সম্পর্কে লাইসেন্স প্রদানের বিধান বিহারে আছে। আমাদের বিহারস্থিত জাশ্রমে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের জন্ত আবেদন করিয়া আইনের দৌলতে কারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ঔষধ প্রস্তুত করিবার ঘর কিরূপ হইবে, তাহার প্ল্যান ও নকশা দাবী করা হয়। আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আবগারী দারোগাকে কারখানা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত আমরাই বাড়ীঘর তৈরী করিয়া দিব কিনা, আবগারী দারোগা মহাশয় সর্বদার জন্তই সেখানে থাকিবেন কিনা কিম্বা তাঁহাকে মাঝে মাঝে পরিদর্শন করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রতিমাসে কত পরিমাণ কোন ঔষধ তৈরী করা হইবে।—ইহা হইতেই যে-কেহ অনুমান করিতে পারিবেন যে, সরকারের তরফ হইতে এই মনোভাব যতদিন প্রত্যাহত না হইবে, ততদিন আয়ুর্বেদীয় ঔষধের কারখানা কোনও রাজ্যে স্থাপন করা কত বড় কুঁকির ব্যাপার। আমরা সকল দিকে অগ্রসর হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত সরকার পরিত্যাগই করিয়াছিলাম।

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

১১০০

আয়ুর্বেদ একটা বিরাট গৃহশিল্পকে এতকাল ধরিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। অধিকাংশ কবিরাজ নিজ নিজ গৃহে কিছু না কিছু ঔষধ প্রস্তুত করেন, যাহার ফলে ইচ্ছামত অনেক রোগীকে বিনামূল্যেও ঔষধ দিতে পারেন। আয়ুর্বেদ কেবল একটা গৃহশিল্পকেই বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে, একটা বিরাট গৃহদাতব্যকেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সর্বশক্তিমান আইনকর্তারা আর যাহাই করুন, এই দুইটা পুণ্য কৃতিত্বকে গলা টিপিয়া না মারিলে আমরা সুখী হইব।

নেহেরুর পরে কি?—মীরাট কলেজে সমাবর্তন ভাষণে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীধাওয়ান ছাত্রদের গতানুগতিকতার পথে না চলিয়া স্বাধীন চিন্তাশক্তির প্রয়োগে নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ের উপদেশ দেন। শ্রীনেহেরুর অবর্তমানে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সমাজের উচ্চস্তরের একাংশের উদ্বোধন সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের ছাত্র বিরাট পুরুষদের তিরোধানের পরেও যখন নূতন নূতন সাফল্য আমাদের সভ্যতা অগ্রগমনের পথে পাদচারণা করিয়াছে, তখন এই ধরনের আতঙ্ক মানসিক দুর্বলতারই পরিচায়ক। শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণে শোকটী অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়া বাসদেব বলিয়াছিলেন যে, পরিবর্তনের অলঙ্ঘন নিয়মেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়, একথা চিরকালের জট সত্য। তাই শ্রীনেহেরুর পর আমাদের সভ্যতা লোপ পাইবে, এই ধরনের চিন্তা নিরর্থক। তিনি আরও বলেন যে, এই দেশের নাস্তৃত্বিক ভূমিতেই শ্রীনেহেরু চারাবক্ষরূপে শিকড় গাড়েন এবং তাহা হইতেই রস আহরণ করিয়া বিরাট মহীকূহে পরিণত হইয়াছেন। গান্ধী ও নেহেরুর আত্মজীবনী পাঠ করিলেই একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে,

চৈত্র, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

১১০১

বলে বড় হইয়াছেন। তাই, নেহেরুর পরে কি, এই প্রশ্ন তাঁহার মতে আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রতিই অবিশ্বাসের নামান্তর, যে সভ্যতা ভারতবর্ষকে সাংস্কৃতিক ভাবে পৃথিবীর সর্বাধিক উর্বর ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। আর এই মনোভাব সৃষ্ট হইয়াছে দীর্ঘকালের পরাধীনতা-জনিত আমাদের স্বাধীন চিন্তা-শক্তিতে মরিচা ধরার ফলে।

ভারত ও আধ্যাত্মিকতা :—ঐ একই ভাষণে তিনি অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরও অবতারণা করেন। ভারতীয়েরা অবাস্তব স্বপ্নবিলাসী এবং পারমাণ্বিক চিন্তায় বিভোর হইয়া প্রত্যেকে আক্রমণকারীকে আত্মিক ওঁদাসীত্বে উপেক্ষা করিয়াছে, এবস্থিধ অভিযোগ যে ঐতিহাসিক বিচারেও টিকিতে পারে না, তাহার প্রমাণ হিসাবে তিনি হায়াপ্পা হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান আক্রমণের কাল পর্য্যন্ত মানব-উন্নয়নের সকল বিভাগে ভারতের অসাধারণ সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। আমাদের সভ্যতা পাশ্চাত্যের চেয়ে অধিকতর আধ্যাত্মিক, এই উক্তিও অস্বীকার করিয়া ভারতীয় দর্শন যে জীবনের সমস্ত বাস্তব দৃষ্টিতে অবলোকনের বিষয়ে পাশ্চাত্য দর্শনের চেয়ে পশ্চাৎপদ নয়, একথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। মানুষকে সাহস, শৌর্য ও বাস্তব বিজ্ঞতা নিয়া তাহার চারিপার্শ্বের জগৎকে বুঝিতে শিক্ষা দেয় কিনা, ইহাই যে-কোন দর্শনের গুণের আসল নিরিখ। তাঁহার মতে আমাদের দর্শন পুরুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থান স্বীকার করায় অথচ যে কোনও দর্শনের তুলনায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তিনি পরাধীন জাতি হিসাবে বয়োজ্যেষ্ঠরা যে সকল কমপ্লেক্স-এ ভুগিতেছেন, তাহা হইতে মুক্ত থাকিয়া মুক্ত সমাজের সমস্ত সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণে ছাত্র-সমাজকে আহ্বান জানান।

বর্তমান ইংরাজ-লেখকদের অবস্থা :—বিখ্যাত সাহিত্যিক

জে. বি. প্রিষ্টলের ইংরাজ লেখকদের সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে বর্তমান লেখকদের এক অতি করুণ অবস্থার চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে গ্রন্থাগার হইতে পাঠকদের বই নিবার সময় বই-এর লেখকদের কিছু টাকা দিবার জ্ঞান আনীত এক প্রস্তাব ও সেই প্রস্তাবের আলোচনায় জনৈক শ্রমিক সদস্য কর্তৃক উহার বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধটি লিখিত হয়।

প্রস্তাবের সমালোচনায় শ্রমিক সদস্য বলেন যে, বর্তমান লেখকদের টাকার দরকার নাই। এদের অনেকেই শেক্সপীয়র বা স্কটের থেকেও বেশী রোজগার করেন। গ্রন্থাগারিকগণ বিলটির বিরোধিতায় বলেন যে, লেখকরা যদি তাদের লেখার আয় হইতে ভালভাবে বাঁচিবার মত রোজগার করিতে না পারেন, তবে তাঁহার রোজগারের অর্থ রাস্তা দেখিতে পারেন। এই উভয় সমালোচনার উত্তরে প্রিষ্টলে বলেন-যে, শেক্সপীয়রের সময়ের দ্রব্যমূল্য তাঁহার আয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে, বর্তমান লেখকেরা কেহই তাঁহার সমান আয় ত দূরের কথা, কাছাকাছিও পৌঁছিতে পারেন নাই। আর এখনকার লেখক-সংঘের লেখকদের নেট আয় একত্র করিলেও এবট্‌স্‌ফোর্ডের মত বাড়ী তৈরী, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মচারীদের মাইনে দেওয়া সম্ভব হইবে না। মধ্য-ভিক্টোরীয়-যুগের লেখকদের তুলনায় বর্তমান লেখকদের অবস্থা শুধু খারাপই নহে, গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ তাঁহাদের অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে। আর গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তাহাদের দ্রবস্থার প্রতি লেখকরা সব সময়ই সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব নিয়া তাঁহাদের আয়-বৃদ্ধির সুপারিশই করিয়া থাকেন। আয়ের বৃদ্ধির দরুণ তাহাদিগকে গ্রন্থাগারিকের কাজ ছাড়িয়া বাইসাইকেল কারখানায়

চৈত্র, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

১১০৩

কাজ নিবার উপদেশ লেখকেরা কখনো দেন নাই। তাঁহার মতে লেখকদের প্রতি এবস্থিধ বিরূপ সমালোচনা গোটা সমাজের মনো-ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। বর্তমান সমাজে লেখকদের চাইতে নোংরা রাজনীতিক, সুদখোর মহাজন কিংবা ঘোঁটপাকানো লোকরাই অধিকতর সমাদৃত। সরকারী খেতাব বিতরণ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপাধি বিতরণ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই লেখকদের প্রতি অবহেলা সুস্পষ্ট। শুধু ইংলণ্ডেই নহে, ইংরাজী-ভাষী আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশের অবস্থাও একই রূপ। তিনি লিখিয়াছেন যে, সম্প্রতি আমেরিকায় বিভিন্ন ধরণের পেশা এবং জীবিকা সম্পর্কে জনসাধারণের মনোভাব কেমন, তাহার এক নমুনা-পরীক্ষায় লেখকদের স্থান যেখানে পড়িয়াছে, তাহাতে আর ঈর্ষি খানেক নামিলেই চোর-জোচ্চোরদের মধ্যেই তাঁহার স্থান পাইতেন। এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে লেখকরা সুবিধাভোগী নাগরিক হিসাবে সম্মান পান। সে সব দেশের লেখকেরা ইংলণ্ডের লেখকদের কর দিতে হয় জানিয়া আশ্চর্য্য বোধ করেন। এই দেশে লেখকরা মৃত্যুর হাতে মুক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত করভারের জাঁতাকলে পিষ্ট হইতে থাকেন। এই সমস্তই ঘটিতেছে এমন এক দেশে, যেখানে সমাজ-বিরোধী উপায়ে পাপ-পথে কর-মুক্ত ঐর্ষ্য্য গড়িতে দেওয়া হয়। তাঁহার মতে, লেখকদের প্রতি এইরূপ অবিচারের মূল কারণ, তাহাদের ভোটের সংখ্যালভতা। উপরন্তু তাহাদের কোন ইউনিয়নও নাই।

ইংরাজী-ভাষী জনসাধারণ সাহিত্যের সুমহান্ ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়াও কেন লেখকদের অপছন্দ করেন, সে সম্বন্ধে প্রিষ্টলে বলেন,— অধিকাংশ লোকের কাছেই লেখকরা এক ধরণের স্বাধীনতার প্রতীক বলিয়া মনে হয়, যে স্বাধীনতা জনসাধারণ আর ভোগ করেন না।

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

১১০৪

লেখক যেন পুরাণে প্রথার এক শেষ প্রতিভূ। কমুনিষ্ট দেশগুলিতে লেখকরা অনেক সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন-চিত্তে বই লেখার প্রাথমিক অধিকারেই তাঁহারা বঞ্চিত।

আমাদের দেশের লেখকদের অবস্থা এখনও তেমন অবস্থা হয় নাই। তবে লেখক-সম্প্রদায়ের নৈতিক মূল্যবোধ যে হারে অবনতি হইতেছে, তাহাতে সেদিনের আর হয়ত অধিক বিলম্ব নাই। জনসমর্থনের নামে কুরুচির প্রশংসা দিয়া শাস্ত্রত সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব নহে। অল্প-শিক্ষিত জনসাধারণকে কুরুচিসম্পন্ন করিবার, কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের মর্যাদার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। এই বিষয়ে আমাদের দেশের সাহিত্যিক-দের নজর পড়িবে কি?

ডিগ্রিহীনতার যোগ্যতা :—যোগ্যতার সহিত ডিগ্রীর যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, সম্প্রতি তাহার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। হায়দ্রাবাদের ওরা ফেক্সয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাও পাশ না করিয়া শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মোহন সেক্সপীয়র সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যাহা সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ-এর ডাইরেক্টর উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, জীবনের অর্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতাই লেখকের রচনা-শৈলীকে এক স্বতঃস্ফূর্ত দীপ্তি দান করে।

এক ন্যাক্সা বহু লোক থাকে :—আমাদের কলিকাতার ভ্রাতা শ্রীসুধারঞ্জন দাস একদিন পয়গাম পত্রিকার একটি সংখ্যা আনিয়া বলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের তাঁহার পরিচিত কেহ কেহ উত্তেজিতভাবে অনুযোগ করিতেছেন যে, আমাদের গুরুদেব কোনও পত্রিকা বিশেষে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার

চৈত্র, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

১১০৫

করিয়াছেন। আজও কয়েকজনের নিকট অনুরূপ অভিযোগের কথা শুনিয়া ভ্রাতা শ্রীপ্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য পয়গাম পত্রিকার সংশ্লিষ্ট হইট সংখ্যা পাঠ করিয়া কর্তব্য বোধে যে পত্রটি পয়গামে প্রকাশের জন্ত ২৮, ১০৬৭ তারিখে পাঠাইয়াছেন, তাহার অনুলিপি নিম্নে দিলাম।

“মাননীয় সম্পাদক, পয়গাম, ৪৯নং গার্ডনার লেন, কলিকাতা—১৪। মহাশয়, আপনার পত্রিকার ১০ই মাঘ, ১৩৬৭ তারিখের সম্পাদকীয় “বামোজীর দিব্যদৃষ্টি!” এবং ২১শে মাঘের সংখ্যায় প্রকাশিত চাচা চৌধুরীর নিবন্ধ “মন দিয়ে শুনুন “পাঠ করিয়া অনেকে আমাদের এই বলিয়া অভিযোগ করিতেছেন যে, স্বস্তিকায় প্রকাশিত যে প্রবন্ধে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি আপত্তিকর মন্তব্য করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা আমাদের গুরুদেব অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী-স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব কর্তৃক লিখিত। আপনার বিপুল সংখ্যক পাঠকদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত এই অভিযোগ থাকিতে পারে। তাই আপনার পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের বক্তব্য পেশ করা একান্ত কর্তব্য মনে করিয়া এই পত্রটি প্রকাশের অনুরোধ জানাইতেছি।

“অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের অসাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রচার-প্রচেষ্টা আজ সুপরিচিত। কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার মত মহাপুরুষের পক্ষে বিদ্বেষ প্রচার কল্পনারও অতীত। তিনি জানেন, ভাল এবং মন্দ উভয়ই সকল সম্প্রদায়েই আছে। কোনও সম্প্রদায়েই সমস্ত লোকই সমান হইতে পারে না। আবার কোনও সম্প্রদায়ই কেবলমাত্র মন্দ লোকের দ্বারাও গঠিত নহে। কাজেই সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকিতে পারে না। যেমন পারে না হিন্দু, খ্রীষ্টান বা অন্য যে-কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। তাঁহাদের মতের ভেদ আছে, কিন্তু সকলেরই মতের মধ্যে একতা আছে। তাহা হইলেই তাহা হইবে।

অনুরাগীদের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের অসংখ্য লোকের সমাবেশ ঘটয়াছে।

“বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়া আমি এখানে সুস্পষ্টরূপে জানাইতে চাহি যে, স্বস্তিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি বারাণসী অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা অথ গুপ্তলেখের শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের লিখিত নহে। তিনি অযাচক আশ্রম হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা “প্রতিধ্বনি” ব্যতীত আর কোনও পত্র-পত্রিকায় কোনও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেন না। প্রতিধ্বনি পত্রিকার যে-কোনও সংখ্যা পাঠ করিলেই তাঁহার নিজস্ব অসাম্প্রদায়িক মতবাদের বিশিষ্টতা যে-কোনও পাঠক অনুধাবন করিতে পারিবেন। “স্বামী স্বরূপানন্দ” নামে একাধিক মহাপুরুষ ভারতীয় ধর্মজগতে স্ব স্ব মতবাদ অনুযায়ী জনসমাজে কাজ করিতেছেন! কিন্তু উল্লিখিত প্রবন্ধের লেখক কোন্ স্বামী স্বরূপানন্দ, আমরা তাহা জানিনা।

“আশাকরি, উপরিলিখিত বিবরণ পাঠের পর আপনার পাঠক সমাজের মন হইতে আমাদের গুরুদেব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইবে।”

সেন্সাসের শিক্ষা :—বর্তমান লোকগণনার একটি ঘটনা আমরা সকলের অবগতির জন্ত এখানে উল্লেখ করিতেছি। কলিকাতার কোন অঞ্চলে একজন গণনাকারী গৃহকর্তাকে তিনি কি কি ভাষা জানেন, জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে অগাধ ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার নাম উল্লেখ করাতে গণনাকারী এই বলিয়া আপত্তি জানান যে, সংস্কৃত মৃতভাষা বলিয়া তাঁহার উহা উল্লেখ করেন না। গৃহস্বামী তখন অনর্গল সংস্কৃত বলিয়া গণনাকারীর ভ্রম দূর করিতে সক্ষম হওয়ার তিনি উহা লিপিবদ্ধ করেন। আমাদের আশঙ্কা হয়, সর্বত্রই ইংরাজী-শিক্ষিত গণনাকারীদের এই দুঃমূল কুসংস্কার স্বাধীন ভারতে সংস্কৃতের

চৈত্র, ১৩৬৭]

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রতিধ্বনি

১১০৭

প্রকৃত স্থান নির্ধারণের অন্তরায় হইয়াছে। যে দেশে আজিও সহস্র সহস্র সংস্কৃত টোল আছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ ছাত্র অধ্যয়ন করে, যেদেশে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়েও লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে সংস্কৃত পড়িতে হয়, যে দেশে সংস্কৃত-মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত বর্তমান আছে, সেই দেশে বিগত ১৯৫১ সালের লোক-গণনায় সংস্কৃত জানা লোকের সংখ্যা মাত্র ৫৫৫ জন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই সংস্কৃতানুরাগী মজ্ঞনন্দের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

আজ দেশের দিকে দিকে বিভেদ-বিচ্ছেদ যেভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে, তাহাতে ভারতের ঐক্যই সমূহভাবে বিপন্ন। আবার বিভেদের কারণগুলির মধ্যে সাম্প্রতিককালে ভাষাগত বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, বাহা এই মুহূর্তে প্রশমিত করিতে না পারিলে এক অঞ্চলের অধিবাসীর প্রতি অপর অঞ্চলের অধিবাসীর অবিশ্বাস, মন্দেহ চিরস্থায়ী হইবে। এই শোচনীয় পরিণতির হাত হইতে দেশকে রক্ষার জগুই অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীশ্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব রাজনীতি-সম্পর্ক-বিরহিত সমাজ-সংস্কারক হইয়াও পাঁচ বৎসর পূর্বে নদীয়া জেলার ধুবলিয়াতে ত্রিশ সহস্র জন-সমাবেশে সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনের সূচনা করেন। সেই সভায় ভারতের প্রায় সকল স্থানের সমাজ-সংস্কারকামী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ অংশ গ্রহণ করেন। দেশের সর্বস্বাধীন কল্যাণকামী ব্যক্তিরা জাতীয় জীবনে সংস্কৃতির পুনরাবির্ভাবকে একমাত্র নিদান হিসাবে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর কাটজুর গ্রায় ব্যক্তিও এ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। অমৃত বাজার পত্রিকার প্রজাতন্ত্র দিবসের বিশেষ সংখ্যায় লিখিত তাঁহার প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯৪৯ সালে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে

স্বীকার করার যে মত তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও তাহা পরিবর্তন করার প্রয়োজন ত দেখা দেয়ই নাই, পরন্তু বাস্তব অবস্থা তাঁহার বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করিয়াছে। তাঁহার গ্রাম দেশের নেতৃস্থানীয় বহু দেশহিতকামী ব্যক্তি একাধিকবার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দেশের শাসন-কর্তৃত্ব বাহাদের হাতে, তাঁহাদের এ বিষয়ে শোচনীয় ঔদাসীন্য আজ দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গ্রাম মুখ্য তিনটি পদাধিকারীরই আঞ্চলিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদগ্র প্রচেষ্টাকে অহিন্দী ভাষী অঞ্চলে সঙ্গত ভাবেই অগ্রায় ও পক্ষপাত-দোষ-দৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ত আজ জাতীয় জীবনে সংস্কৃতের প্রভাবের একটা স্পষ্ট পরিচয় স্থাপন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই বর্তমান লোকগণনায় সংস্কৃত-জানা লোকের সংখ্যা নির্ধারণ সঠিকভাবে হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এখানে সংস্কৃত-জ্ঞানের মান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। আমাদের মতে বাহারা 'জলম্ আনয়', 'ইহ আগচ্ছ', 'কিং তে নাম' ইত্যাদি বলিতে বুঝিতে সক্ষম, তাঁহারাই সংস্কৃত জানেন। কেননা, এতটুকু জ্ঞান বাহাদের আছে, তাঁহারা প্রয়োজনের তাগিদে অনায়াসে কার্য-পরিচালনোপযোগী জ্ঞান স্বল্প সময়ে অর্জন করিতে সক্ষম। তাহা ছাড়া 'তুম্হারা নাম ক্যা', 'ইদার আ যাত', 'ক্যা কর্তা হ্যায়' ইত্যাদি বলিতে বাহারা সক্ষম, তাঁহারাই যেখানে হিন্দী জানা বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেখানে সংস্কৃতের বেলা পঞ্চতীর্থ, সপ্ততীর্থ না হইলে সংস্কৃত-জানা বলিয়া গ্রাহ হইবে না, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক। আজ জাতীয় জীবনে সংস্কৃতের কোন মর্যাদা নাই বলিয়াই সংস্কৃত জানিয়াও কেহ তাহা প্রকাশ করিবার সুযোগ পান না।

জাতীয় জীবনে ইহার অর্থকরী কোন যোগ্যতা না থাকায় বাহারা শিক্ষা করেন, তাঁহারাও অনভ্যাসে ভুলিয়া যান। তাই সকলের ধারণা, সংস্কৃত-জানা লোকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু আমরা জানি, প্রকৃত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা-নির্ণয় করিলে, হিন্দী সমেত যে কোন আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা হইতে সর্বভারতে সংস্কৃত শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই হইবে অধিক। ইংরাজী শিক্ষিত লোকদের প্রায় প্রত্যেকেই পাঠ্য জীবনে কিছু না কিছু সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছেন। উচ্চশিক্ষিত ধীমান ব্যক্তিদের অধিকাংশই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। কেবল প্রয়োজনের অভাবই তাঁহাদের সংস্কৃত জ্ঞানের প্রসারকে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে। নতুবা দেশের যে-কোন দিকের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত সংস্কৃত সর্ব-ভারতীয় প্রতিভার বিপুল সমাবেশে বিশ্বয় উৎপাদন করিত। সাধারণতঃ হিন্দী ভাষীরাই হিন্দীতে পণ্ডিত হন, যেমন বাংলা ভাষীরা বাংলাতে। অত্যাধিক আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধেও ইহাই সত্য। কিন্তু ভারতের সকল আঞ্চলিক ভাষাভাষী বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোকই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। কাজেই সমগ্র ভারতে সংস্কৃতজ্ঞ লোকের সংখ্যা যে-কোন আঞ্চলিক ভাষায় সুপণ্ডিতদের চেয়ে অধিক, ইহা বলাই বাহুল্য।

সংস্কৃতের পক্ষে অকাটা যুক্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের বর্তমান কর্ণধারগণ গোষ্ঠী-স্বার্থের খাতিরেই তাহা স্বীকার করিবেন না, যতক্ষণ না সরকারী কোনও ব্যবস্থাধীনে ইহার সত্যতা যাচাই হয়। এমতাবস্থায় দেশের কল্যাণকামী প্রতিটি সজ্জনের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ, তাঁহারা অগ্রণী হইয়া বর্তমান লোক-গণনায় তাঁহাদের সংস্কৃত জ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ তথা রাষ্ট্রভাষা

প্রতিধ্বনি

সাময়িক প্রসঙ্গ

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১১১০

হিসাবে সংস্কৃতির দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের ঐক্য তথা
সর্বদ্বন্দ্বীন কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত করুন।

(শ্রীপ্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য)

অখণ্ডমতে বিবাহ :- গত ২৮শে মাঘ শনিবার পাণ্ডু অখণ্ড-
মণ্ডলীর সহযোগিতায় শ্রীরোহিণী কুমার নাথের সহিত কুমারী নিয়তি
রাণীর শুভপরিণয় অখণ্ডমতে সুসম্পন্ন হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বর ও
কন্যাকে বিবাহ-বাসরে অখণ্ড-বিগ্রহের সম্মুখে বসাইয়া প্রথমে অখণ্ড-
সংহিতা পাঠ ও তৎপর বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য গ্রন্থ হইতে নির্বাচিত অংশ
পাঠ করিয়া সমবেত উপাসনা করা হয়। উপাসনান্তে সকলে বিগ্রহে
দেওয়ার পর বর ও কন্যা অখণ্ড-বিগ্রহকে সপ্ত-প্রদক্ষিণ করিয়া বিগ্রহে
অঞ্জলি দানান্তে মাল্যবদল করেন। সপ্ত-প্রদক্ষিণের সময় সকলে
সন্মিলিত কণ্ঠে হরি-ওঁ কীর্ত্তন করেন। তৎপর বরকন্যা সময়োচিত
প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করেন। চতুর্থ দিবসে সমবেত উপাসনার দ্বারা
চতুর্থ-মঙ্গল অনুষ্ঠানও উদ্ঘাপিত হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে আরম্ভের
পূর্ব্বাহ্নে বর ও কন্যা পক্ষের অখণ্ডমতে বিবাহে সম্মতি নেওয়া হয়।
অখণ্ডমতে বিবাহে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না এবং উপাসনায় সকল
সম্প্রদায়ের শুভানুধ্যায়ীরা যোগদান করিতে পারেন।

ইতিপূর্বে প্রতিধ্বনিতে অখণ্ডমতে বিবাহের বহু পূর্ণ বিবরণ
প্রকাশিত হওয়ায় আমরা সংক্ষেপে অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশ
করিলাম।

(সংবাদদাতা :- শ্রী তারাপদ হোড়, সম্পাদক, পাণ্ডু, অখণ্ডমণ্ডলী)

চৈত্র, ১৩৬৭]

প্রতিধ্বনি

১১১১

ধৃতঃ প্রেমা

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
লিখিত সমসাময়িক পত্রাবলী]

(৬৮৯)

হরি-ওঁ

পুপুন্যী

৩রা মাঘ, ১৩৬১

পরমকল্যাণভাজনোন্মুখঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রে তোমার পুত্রের মামলা হইতে মুক্তির সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ক্যাম্পের কম্যাণ্ডান্ট তাহাকে মিথ্যা মামলায় জড়াইয়া নিজের অন্তরের পাশব আক্রোশ মিটাইতে চাহিয়া-ছিলেন। তাহার যড়যন্ত্র-জাল যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, ইহাতে কে না সুখী হইবে? ইহার ভিতরে আমার কোনও অলৌকিকত্ব নাই মা, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদেই তোমার পুত্র অহুন্নভ ও প্রাণ্ডলভ গ্রায়-বিচার পাইয়াছে। তাহার নিকটে কৃতজ্ঞ হও, তাহার চরণে প্রণতি জানাও। আমি কিছুই করি নাই, আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কোনও লাভ নাই।

তোমাদের আর একটা ভগিনী সেদিন কলিকাতা গিয়াছিল। তাহারও অল্পরূপ একটা বিপদ হইয়া এক বৎসর যাবৎ “ডোল” বন্ধ আছে। শিবির ছাড়িয়া অত্র তাহাকে বাইতে হইবে। অথচ ধার-দেনায় সে তল হইয়া আছে। কলিকাতা আসিয়াছিল একটা ব্যবস্থার আসায়। কলিকাতার ছেলেরা আর এক অনাধার কণ্ঠা-বিবাহের

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম্না

[১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১১১২

ভার গ্রহণের চেষ্টা করিতেছে বলিয়া হয়ত এখন এই বিষয়ে তেমন মনোযোগ দিতে পারিতেছে না। তুমি তোমার ঐ বিপন্ন ভগিনীকে জানাইও যে, সে যেন তোমাদের মণ্ডলীর প্রধান কর্মকর্তার দ্বারা এই বিষয়ে কলিকাতার মণ্ডলীতে একটা স্মারক পত্র দেওয়া। একজনের বিপদে শত জন ছুটিয়া আসিবে, ইহাই ত স্তম্ভ সমাজের স্তম্ভ সমাজের লক্ষণ। তবে, ওখানকার স্থানীয় ভ্রাতা-ভগিনীরাও কে কাহাকে কত সহায়তা করিতে পারে, তাহাও দেখিতে হইবে। সকল স্থানেই আত্ম-শক্তির উপরে নির্ভরতা বেশী হওয়া আবশ্যক।

শিবিরের অজ্ঞান, দান্তিক, ক্ষমতাগর্বী কর্তৃপক্ষ অতীতে যতই অত্যাচার করিয়া থাকুক, মানুষ হিসাবে সে সব লোকগুলিকে অপ্রেমের দৃষ্টিতে দেখিবে না। তোমাদের চোখের পাতা যেন সর্বদা প্রেমের মধুতে জ্ঞানের অঞ্জে মধুর ও উজ্জ্বল থাকে। সমস্ত জগৎ পশুতে পূর্ণ হইয়া যাউক, তবু তোমরা পশু হইও না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরি-ওঁ

পুণ্ড্রিকা

৩রা মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাকে এই পত্র তোমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লিখিতেছি না, আমারও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নহে। বহুজনের প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া এই পত্র লিখিতেছি।

চৈত্র, ১৩৬৭]

ধ্বং প্রেম

প্রতিধ্বনি

১১১৩

নিজ জন্মভূমিতে তোমরা চূড়ান্ত লাঞ্ছনা পাইয়া আশ্রয়-শিবিরে বাসিন্দা হইয়াছ। পরানুগ্রহের ভিত্তিতে তোমাদের জীবন ও জীবিকা চলিতেছে। নিজ বাহুবলে নির্ভর করিয়া শিবির ত্যাগের শৌর্য্য বা সাহস এত দিনেও তোমাদের আসে নাই! এমত অবস্থায় তোমরা সমসাধক কয়েকজন লোক নিজেদের মধ্যে তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া-কলহে প্রমত্ত হইলে নিশ্চয়ই কুশল লাভ হইবে না। কলহে যাহাদের রুচি, তাহাদের শাস্ত কর। এই কর্তব্য-ভার গ্রহণ করিয়া এবং এই কর্তব্য-পালন করিয়া তুমি এবং অপরাপর সকলে মহীয়ান হও।

তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দীক্ষা নিবার পরে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধনের বিরোধ-চর্চা করিতেছে এবং নিজেরা মন্ত্র দিয়া শিষ্য করা আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের সম্পর্কে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। যে যেমন বীজ বুনিবে, সে তেমন ফসল তুলিবে। আমার দিক হইতে মাত্র এই কথা বলিবার আছে যে, আমি আগামীবার তোমাদের ওখানে যখন যাইব, তখন যেন দীক্ষার গৃহে এমন একটা লোকও না টোকে, যে আমাদের চিন্তা ও আদর্শের সহিত আগেই পরিচয়-স্থাপন করে নাই। এই বিষয়ে প্রত্যেককে সতর্ক হইতে আমি নির্দেশ দিতেছি। এই নির্দেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়।

এখনও কতক লোকে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে। তুমি যদি স্থানীয় সমসাধকদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও প্রেমের সঞ্চারণার সহায়তা কর, তাহা হইলে আরও শত শত ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হইবে। ইহার ফলে বৃহৎ ও মহৎ কর্তব্য-পালনের যোগ্যতা তোমার শতগুণে বাড়িবে।
ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

স্বতঃ প্রেরণা

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১১১৪

(৬৯১)

হরি-ওঁ

পুপুন্যকী

৩রা মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সেদিন ভুমি বড়ই কাঁদিয়া কাটিয়া গিয়াছ। তোমার ভাইবোন্দের মধ্যে মতান্তর, মনান্তর, দলাদলি, কলহ-কচায়ন কেবলই চলিতেছে, থামিতেছে না, ইহাতে বড়ই উদ্ভিগ্ন ও শোকগ্রস্ত হইয়াছ তুমি। একদিকে তোমাদের শিবিরের দান্তিক, অবিবেচক, প্রাণহীন, হিংস্র ও পশুৎ হীনবুদ্ধি কর্তাদের আচরণ, অত্রদিকে তোমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে পর্য্যন্ত আত্মদন্দ। সত্যই ত! নরক আর কাহাকে বলিব?

তবু ধৈর্য্য ধর। ধৈর্য্যবলেই এই নিদারুণ অবস্থা তোমাদের অতিক্রম করিতে হইবে। কাহারও আচরণের উপরে কোনও মন্তব্য জাহির করিতে যাইও না, উপস্থিত অবস্থানুযায়ী নিজ কর্তব্য নীরবে করিয়া যাও। যে গালি দিয়াছে দেউক, যে মারিয়াছে মারুক, যে অদম্মান করিয়াছে করুক। তোমরা কর্তব্য করিয়া যাও। কর্তব্যে যেন বিরতি না ঘটে। বাহারা বুদ্ধির ভ্রান্তিতে ভুল করিতেছে, তাহারা অধিকাংশই একদা নিজেদের ভ্রম-সংশোধন করিয়া লইতে বাধ্য হইবে। চিরকাল কেহ বিপথে চলিতে পারে না। ইহাদের একজনের প্রতিও এক কণা বিদ্বেষ রাখিও না। ইহাদের মধ্যে স্তবুদ্ধির উদয় হউক, ভগবানের চরণে নিয়ত এই প্রার্থনা কর। তোমাদের প্রত্যেকটী সৎ-প্রার্থনার সহিত আমার কর্তৃ ভগবানের কাছে তোমাদের কথা কহিবে। তোমরা নিরাশ হইও না, হতাশায় ঢলিয়া পড়িও না। জগতে অসাধ-সাধন

চৈত্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১১১৫

অনুক্ষণই হইতেছে। তোমাদের ঐ অপরিচ্ছন্ন উদাস্ত-শিবিরেও তাহা
হইবে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৪ঠা মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। তুমি যে অন্তরের পুঞ্জীভূত
অভিমান দূরে সরাইয়া রাখিয়া পাহাড়ী ভাইবোনদের মধ্যে ভগবানের
নাম শুনাইবার জন্ত ছুটিয়া গিয়াছ, ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইলাম।
তোমাদের জীবন ভগবানের কাজের জন্ত, জীবে জীবে ভগবানের নামে
বিশ্বাস ও রুচি বিলাইবার জন্ত। তোমরা সে কাজ করিবার জন্তই
জীবন-ধারণ করিবে, সে কাজ করিতে করিতেই ভগবানের চরণে
মিশিয়া যাইবে। যে ভগবানের কাজে জীবন দেয়, তার জন্ম জন্ম
গর্ভযন্ত্রণা আর মৃত্যুক্লেশ ভুগিতে হয় না।

এই অভিযান সম্পর্কে যাহারা যাহারা আগ্রহী, তাহাদের প্রতিজনকে
অবিলম্বে তোমাদের ভ্রমণ-তালিকা পাঠাইয়া দাও। সকলের মধ্যে
বধাসাধ্য মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিবে।
নিজে একান্ত ও সমপ্রাণ হইয়া সহকর্মীদের প্রতিজনকে সর্বত্র একান্ত
ও সমপ্রাণ রাখিতে চেষ্টা করিবে। ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের ও নেতৃত্বের

প্রতিধ্বনি

ধ্বং প্রেরা

[২ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১১১৬

অহমিকা দূর করিয়া পথ চলিবে। সরলতা, সাহস ও বিশ্বাসে হৃদয়
ভরপুর রাখিবে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২৩)

৪. হরি-ও

কলিকাতা

৪ঠা মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি শিলিগুড়ি চলিলাম। এই তাড়াহুড়াতে পার্শ্বভ্য অভিব্যানের
কর্মীদের জন্ত আবশ্যকীয় অর্থ পাঠাইয়া যাইতে পারিলাম না। আমি
শিলিগুড়ি হইতে ফিরিয়া টাকার ব্যবস্থা করিব। ইতিমধ্যে তুমি চারি
দিকে যোগাযোগ করিয়া এমন ব্যবস্থা কর যেন অভিযাত্রী-দলের কাহারও
কাজ করিবার গুরুতর অসুবিধা না হয়। অভিযাত্রী কর্মীদের যাহাকে
যাহাকে বাড়ীতে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ প্রয়োজন, তাহাদের সমূহ
প্রয়োজন আমাকে জানাইলে এবং কোন্ ঠিকানায় টাকা পাঠাইতে
হইবে লিখিলে আমি পুপুন্যকী ফিরিয়া সঙ্গে সঙ্গে টাকা মনিঅর্ডার
করিব।

প্রেরিত কর্মীরা যেন কেহ মাঘের এই দারুণ শীতে অনিয়মে স্বাস্থ্যহীন
না হয়, তার দিকে তাকাইয়া কর্মতালিকা তৈরী করিও। আমি
আমার শরীর দিয়া অর্ধশতাব্দী ধরিয়া যে কঠোর শ্রম করিতে সমর্থ
হইয়া আসিতেছি, তাহা এই যুগের তরুণ কর্মীদের পক্ষে সম্ভব নহে,
ইহা মনে রাখিও। তবে আলমুকে, কর্তব্য কার্যে অবহেলাকে,

চৈত্র, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেয়া

প্রতিধ্বনি

১১১৭

কাপুরুষতাকে এবং দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিও না। এই সকল সাধারণ কর্ম্মারাই জগতে অসাধারণ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে, যদি নিজেদের মধ্যে থাকে ঐক্য, আদর্শে থাকে অবিচলিত লক্ষ্য, নির্দেশপালনের জ্ঞান প্রাণদানের থাকে প্রতিজ্ঞা, আর, যাহাদের মধ্যে কাজ করিতে বাইতেছে, তাহাদের প্রতি অন্তরের থাকে অন্তহীন অনুরাগ, অতলম্পর্শ ভালবাসা, সৌম্যহীন প্রেম।

ইহারা যখনই কর্তব্যচরিত্র বা লক্ষ্যগতি হইতে চাহিবে, তখনই ইহাদের মনে ভগবানের নামের সাধনে অনুরক্তি সৃষ্টি করিও। নাম-বহিমুখ হইলেই মন বড় বিষয়ে লিপ্ত থাকিবার যোগ্যতা হারায়। যতগুলি দুর্গম স্থানে সম্ভব, সকল স্থানের তোমরা সকলে আবশ্যক মত কার্যিক সহায়তাও করিও। আর্থিক সহযোগের অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে কার্যিক সহযোগের মূল্য বেশী, বিশেষ করিয়া দুর্গম ঘন-কান্তারে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৪ঠা মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আগরতলা হইতে শ্রীমান্ চি—এবং তেলিয়ামুড়া হইতে শ্রীমান্ লা—ইতিমধ্যে রিয়াং ও চাকমাদের মধ্যে কাজ করিবার জ্ঞান বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহারা তাহাদের পূর্বজানিত পথেই কাজ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া যাইবে। চারিদিকের সকল সহযোগ-মনোবৃত্তি-

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

১১১৮

সম্পন্ন আমার ভক্তদের জানাইয়া দেও যে, ইহাদের অভিযান বাহাতে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করিতে পারে, তজ্জন্ত তনু-মন-ধন দিয়া যে বাহা পারে, ইহাদিগকে সহায়তা করুক। আমি অবিশ্রান্ত ছুটাছুটিতে পড়িয়া সম্প্রতি সকল দিকে সমান মনোযোগ রাখিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। পাহাড়ে অভিযানকারী আমার প্রিয় কর্মীদের বাহাতে সর্বশক্তি প্রচার-কার্য্যেই নিয়োজিত করিয়া অবিভাজ্য মনে অখণ্ডিত প্রযত্নে কাজ করিয়া যাইবার অধিক বাধা না ঘটে, তদ্বিষয়ে সকলে অবহিত হও। এতদিন বাহারা এই একটি নির্দিষ্ট কাজের বিষয়ে মৌখিক আলোচনাই করিয়াছে, আজ তাহাদের শক্তিসামর্থ্য সাধ্যমত এই কাজে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। মানুষের সদৃচ্ছা এবং সংকার্য্যে আত্মনিয়োগের মধ্যে সুদূর বিরহ-রেখা থাকিতে দেওয়া কখনো উচিত নহে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯৫)

কলিকাতা

৪ঠা মাঘ, ১৩৬৬

হরি-ওঁ

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা কাছাড়ের ঐ নিভৃত প্রান্তে চা-বাগিচার ছায়ায় ঢাকা নীরবতায় সাদরে আমার জন্মদিন-পালন করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। তবে উৎসবে প্রসাদ দেওয়া নেওয়া নিয়া তোমাদের মধ্যে একটু মতান্তর মনান্তর হইয়াছে জানিয়া, শঙ্কিত হইলাম। উৎসবে কেহ কাহারও নিকটে টাকাকড়ি চাহে নাই, ইহা ত খুব ভাল কথা।

চৈত্র, ১৩৬৭.]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১১১২

আমার জন্মদিন এভাবেই পালিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেহ যাচিয়া আসিয়া টাকাকড়ি দেয় নাই বলিয়া প্রসাদ নিবার সময়ে তাহাকে খোঁটা শুনিতে হইবে, এতটা নিকৃষ্ট অবস্থা কাহারও মনের হইবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। একজন টাকাকড়ি দিয়াছে কি দেয় নাই, ইহার উপরেই কি প্রসাদ পাইবার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা নির্ভর করিবে? অমুকে ফলমূলবাতামা নিয়া আসিলে ভোগে চড়ান হইবে না, কারণ তাহার প্রতি আক্রোশ আছে,—এই সকল উক্তি ত স্থির-মস্তিষ্ক ব্যক্তির বলিয়া মনে হয় না। যাহারা এই সকল অবস্থার সৃষ্টি করিতে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে দায়ী হইতেছে, তাহাদের জানাইয়া দাও যে, এইরূপ ব্যাপারের অবিলম্বে অবসান না ঘটিলে আমি আগামী বৎসর পর্য্যন্ত এই দেহে থাকিলে আগামী জন্মোৎসবের নয় দিন অনশন করিয়া তোমাদের পাপের জন্ত নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিব। অনশন করিয়া অত্রের মনে প্রভাব বিস্তার ব্যাপারটাকে আমি খুব সাধু উপায় বলিয়া মনে করি না, তবু আমার সহজ সরল উপদেশগুলি যখন কার্য্যকরী হইতেছে না, তখন আমি বাধ্য হইয়াই এই অসুন্দর কষ্টটি নিজের উপরে গ্রহণ করিব।

জিদ, কর্তৃত্ববোধ, অপরকে দাবাইয়া রাখিয়া নিজের মতকে প্রধান করিবার প্রয়াস,—এই সকল দোষ তোমাদের শ্রমিক শ্রেণীটার মধ্যে এতদিন ছিল না। এখন আস্তে আস্তে এই সকল পাপ তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তোমরা কি বাবা আসল কাজে ফাঁকি দিতেছ? তোমরা কি বাবা সাধন-ভজন ছাড়িয়া দিয়াছ? তোমরা কি বাবা বাহিরের নাম-মশের কান্দাল হইয়াছ? তোমরা কি বাবা সম্ভায় কিস্তিমাত করিবার কুবুদ্ধির সহিত মিতালি

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেমা

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১১২০

করিয়াছ? এই জন্তই কি তোমরা পরস্পরের প্রতি দিনের পর দিন অধিকতর প্রেমাকৃষ্ট না হইয়া কেবল বিদ্বিষ্টই হইতেছ?

এই সকল বিষয় তোমরা চিন্তা কর। নিজেরা যদি নিজেদের ভালবাসিতে না পার, তাহা হইলে পরকে ভালবাসার চেষ্টা ত বাবা অভিনয় মাত্রে পর্যাবসিত হইবে। আশীর্বাদ করি, এই দুর্গতি হইতে তোমরা নিজেদের বলেই নিজেদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হও। আশ্ব-
রক্ষার স্মৃতি তোমাদের হউক। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯৬)

মহারাজপুরঘাট ধীমারে

৫ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি, সংহিতা, অঞ্জন, মোহিনী ও নবদ্বীপের ছয়জন কীর্তিনিয়া শিলিগুড়ির পথে। সময় পাই নাই বলিয়া তোমার অত মধুর পত্রখানার জবাব দিতে পারি নাই। নিদারুণ বিপদ তোমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। তুমি কেবল পরমপ্রভুর নামে নির্ভর করিয়া বিপদ হইতে ত্রাণ পাইয়াছ, দুঃখবুদ্ধি প্রতিবেশীর অত্যায়ে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইয়াছ। নামের বলেই তোমার অশেষ অশান্তি বিদূরিত হইয়াছে। আমি বারংবার সেই পুণ্য নামের সন্মুখে প্রণত হইতেছি, বাহা তোমাকে দিল বল ও বিশ্বাস। বিশ্বাসই সকলশক্তির উৎস,—নাম তোমাকে বিশ্বাস দিয়াছে। বলই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি,—নাম তোমাকে বল

দিয়াছে। ধৃত পরমেশ্বরের নাম! এস, আমরা প্রত্যেকে বেন নামকে জীবনের সারসর্বস্ব করিয়া লইতে সবল প্রযত্ন প্রয়োগ করি।

বহুদিন পূর্বে, মনে হয় আঠার বৎসর হইবে, নিতাইদের বাড়ীতে তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা সত্য। আমি বলিয়াছিলাম, যেই গীতাকে ভালবাস, সেই গীতাই আমি, যেই কালী দুর্গা কৃষ্ণ বিষ্ণুকে ভালবাস, সেই কালী দুর্গা কৃষ্ণ বিষ্ণু আমি। বলিয়াছিলাম, সাকার আমি, নিরাকার আমি, দেবতা আমি, সর্বদেবতার ধ্যানের অগম্য ব্রহ্ম আমি, আমিই সব, সবই আমি। কোন্ ভাব হইতে ইহা বলিয়াছিলাম, তোমার পরবর্তী আচরণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহা তুমি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছ। নতুবা এতগুলি বৎসর ধরিয়া দাম্পত্য জীবনে পূর্ণ সংযম পালন করিয়া চলা কখনো তোমার পক্ষে সম্ভব হইত না। বড় একটা কিছু না পাইলে ক্ষুদ্র তুচ্ছ লোভনীয়কে পরিত্যাগ করিয়া চলা যায় না। ভূমার আশ্বাদন না পাইলে ভূমির আকর্ষণের উপরে ওঠা যায় না। আমি আশীর্বাদ করি, তুমি সর্বভূতে ইষ্টদর্শন করিয়া অনন্তকাল শান্তিতে বিরাজ কর। তোমার মতন কতারা যে-কোনও পিতার গৌরবের সামগ্রী। তোমার এই জীবনের স্পর্শে আরও শত শত কামকাতর জীবনে দিব্য প্রেমের মলয় হিল্লোল প্রবাহিত হইতে শুরু করুক। আমি মর্ত্যভূমিতে স্বর্গাদপি মহীয়ান্ এক পুণ্যালোকের আবির্ভাব এবং সূর্য্যাদপি জ্যোতির্ষ্ময় এক পুণ্যালোকের বিস্তার কামনা করিতেছি। * * * ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি
১১২২

দ্বিতীয় প্রেক্ষা

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

(৬৯)

শিলিগুড়ি

ইন্দি-ও

১০ই মার্চ, ১৩৩৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণতরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার প্রাণতুল্য স্নেহে নগেশ ব্রহ্মচারী মহাশয় মহাপ্রয়াণ করিবার পূর্বে আকাজ্জা করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার পারলৌকিক কার্য অখণ্ড-মতে হয়। অভিন্নহৃদয় বন্ধুর এই আকাজ্জা পূরণের জন্ত শিলিগুড়ি আসিয়াছিলাম। অল্প কলিকাতা রওনা হইতেছি। কলিকাতা হইতে পুপুনকী যাইব।

তুমি তোমার পুত্র শ্রীমান্ মা—কে ঐদিন প্রাতেই কলিকাতা পৌছাইয়া দিও। তবেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া পুপুনকী যাওয়া সম্ভব হইবে। আমি অত্যন্ত ব্যস্ততা নিয়া পুপুনকী যাইতেছি। তোমরা টেইন মিস্ করিলে তজ্জন্ত আমি দেৱী করিতে পারিব না।

অনাদরে ও অতিশাসনে পুত্রকন্ঠার মন বিগড়াইয়া যায়, যেমন লেবু বেশী কচলাইলে তেঁতো হয়। আমি পুপুনকীতে স্নেহ ও আদর দিয়া তোমার অবাধ্য পুত্রকে বিনীত ও আজ্ঞাবহ করিয়াছি। তাহার স্বভাবের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। আশা করি, এমন সময়ে তোমরা অকারণে তাহাকে বাড়ীতে রাখিবে না। আশ্রমে থাকিয়া চরিত্র আরও বিশোধিত হইলে দেশে আনিয়া নিজের রুচিমত বিজ্ঞালয়ে ভর্তি করিয়া দিও।

পুত্রকে সং ও চরিত্রবান্ করিতে হইলে পিতামাতার আত্মগঠনে ও

চৈত্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১১২৩

আত্মসংঘমে অধিক লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। তোমাদের ক্রোধ-সংঘম একাগ্রই আবশ্যক।

তুমি ও কল্যাণীয়া মা স—সাধন-ভজনে আরও মনোনিবেশ কর। অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হইতেছ, ইহা আমি জানি। কিন্তু দরিদ্রেরা ঈশ্বরকে ডাকিবে না? ঈশ্বর কি এই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবেন যে, কবে তোমাদের টাকা হইবে, নিশ্চিততা আসিবে, তারপরে তোমরা তাঁহার নামের সাধন করিবে? বস্তুতঃ ধনবানেরাই ভগবানকে বেশী করিয়া ভুলিয়া থাকে। তোমরা দরিদ্র। দরিদ্রের ডাক সহজে একাগ্র হয়। যে দরিদ্র নহে, তাহাকেও ডাক একাগ্র করিবার জন্ত উপবাস-ব্রত পালন করিতে হয়। তোমরা দুর্যোগের মধ্যেই ভগবানকে ডাকিতে শুরু কর বাবা। জীবনের মূল্যবান সময় বুথা চলিয়া যাইতেছে। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯৮)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি

১০ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ওখানকার দুইটা ছেলের দেওয়া টাকা সম্পর্কে বাবদ উল্লেখ করিতে আমাদের কলিকাতার হিসাব-রক্ষক যে ভুল করিয়াছে বলিয়া জানিতেছি, তাহার সহিত তোমার কোনও পত্রের সম্পর্ক আছে বলিয়া আমার স্মরণে পড়ে না। তোমাদের ওখানকার ছেলেরা

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১১২৪

তোমাকে কেন এই বিষয়ে আন্দাজে দোষী করিতে চাহিতেছে, বুঝিলাম না। আমার এই পত্র তাহাদের দেখাইও। আশা করি, তাহার ফল শুভ হইবে।

একে অতের দোষ-ত্রুটি আবিষ্কারের চেষ্টা পরিহার করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ সদৃশ বুদ্ধির চেষ্টায় অধিকতর মনোযোগ দিলে তাহা অধিকতর লাভের কারণ হইবে। মানুষ হিসাবে তোমরা প্রতি জন বড় হও। ভগবদনুরাগ, ত্যাগ ও সংযমের বলেই মানুষ মহৎ হয়। সংকর্ষে রুচি দ্বারা মানুষ নিজের অন্তরের পরিচয় দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে দোষদর্শনের অভ্যাস মানুষকে দুর্বল করে, ক্ষুদ্র করে।

প্রত্যেকে প্রত্যেকে ভালবাস। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯৯)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি

১০ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

* * * একটা মানুষকেও অনাবশ্যক মনে করিবে না। প্রত্যেকের মধ্যে ঘুমন্ত ব্রহ্ম বিরাজমান। প্রত্যেকের নিকটে প্রাণভরা প্রত্যাশা নিয়া গিয়া দাঁড়াও। নিখিল বিশ্বের ঘুম তোমাদের ভাঙিতে হইবে। এই ঘুম ভাঙানোর ব্রতে তোমাদের মনে যেন জাতির পার্থক্য, বর্ণের বিভিন্নতা, ধর্মের বিচিত্রতা কোনও পরিবর্তন সাধন না করিতে পারে।

চৈত্র, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেরা

প্রতিধ্বনি

১১২৫

তোমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ নির্বিশেষে সকলকে জাগাইবে, সকলকে আত্মহত্যার অমৃত বিলাইবে, সকলের সহিত সকলের পরিপূর্ণ মিলনকে সম্ভব করিবার জন্ত যেদিক দিয়া বতটুকু ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার প্রয়োজন, তাহা করিবে। তোমাদের এই স্নমহৎ অথগুপ্ত হেলেখেলা নহে, হুজুগের আন্দোলনও নহে কিম্বা দুই দিন, দুই বৎসর, দুই যুগ বা দুই শতাব্দীর সাধনাও নহে, ইহা তোমাদের অনন্তকালের জন্ত অনন্ত সাধনা। মানুষ ধর্মই পাইয়াছে, কিন্তু দিব্যজীবনকে পাইয়াছে কি? মানুষ সমাজই পাইয়াছে, কিন্তু বিধ্বজনীন আত্মীয়তা পাইয়াছে কি? মানুষ সম্প্রদায়ই গড়িয়াছে, কিন্তু যেই সম্প্রদায়ের ভিতরে সকল সম্প্রদায়ের নিরাপদ আশ্রয়, তাহাকে পাইয়াছে কি? এই জন্তই আমি তোমাদিগকে অথগুপ্ত দিয়াছি, অথগুপ্ত সমাজ দিয়াছি, অথগুপ্ত-সম্প্রদায় দিয়াছি। সকল সাম্প্রদায়িক নীচতা হইতে উদ্ধে উঠিয়া, সকল সাম্প্রদায়িক হীনতার পরিবন্ধন কাটিয়া ফেলিয়া, উদার সর্বলিঙ্গনকারী সত্য জাগ্রত রহিয়া তোমাদিগকে বিশ্বের সকলের সহিত পরমাত্মীয় হইয়া যাইতে হইবে। তোমরা তোমাদের এই ব্রত ভুলিও না, তোমরা নিজেদিগকে অপাত্র জ্ঞান করিও না, তোমরা তোমাদের অন্তরের প্রেমকে কখনও কমিতে দিও না।

শ্রীমান্ ল—কে পাহাড়ের কাজে পাঠাইতে পারিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। তাহার জী ও ভ্রাতৃপুত্রীকে তোমরা তত্ত্বাবধান করিও। সজ্জের কাজ করিতে যে প্রবাসে যায়, তাহার পরিজনবর্গকে দেখা তোমাদের পাব্য কৰ্তব্য। আমি ত আমার সাধ্যমতন আর্থিক সহায়তা এই পরিবারটির জন্ত নিয়মিত পাঠাইয়া যাইতেছি এবং পাঠাইতে থাকিব। কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট? তোমাদের সকলের

প্রতিধ্বনি

ষুভং প্রেরণা

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১১২৬

যে প্রীতিপূর্ণ সহযোগ ইহাদের প্রতিপাল্যবর্গের প্রতি প্রদেয় রহিয়াছে; তাহার কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োজন নহে? মনে রাখিও, বন ও পাহাড়ে তোমরা বাহাদিগকে অজ্ঞাতপরিচয় নানা জাতি ও উপজাতির মধ্যে পাঠাইতেছ, তাহারা হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্ত যাইতেছে না। হিন্দুধর্ম যতই উদার হউক, অহিন্দুর সহিত পার্থক্য সম্বন্ধে রক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য। ব্যবহারগত হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানে হিন্দু সমাজের বাহিরের লোকের যোগদানের অধিকার নাই। হিন্দুধর্ম যে উদার, তাহার তাৎপর্য এই যে, এক এক মত ও পথের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক মতাবলম্বীরা অগ্রমতাবলম্বীদিগকে হিন্দু এই নামটি ধারণে বাধা দেয় নাই, হিন্দু নামে পরিচিত হইবার অধিকারটুকু দিয়াছে। কিন্তু যেখানে এক হিন্দু অন্য হিন্দুর অনুষ্ঠানে যোগ দিলে অনুষ্ঠান অশাস্ত্রীয় ও দূষিত হইয়া যায়, সেখানে হিন্দুধর্ম নামে কোনও বস্তু তোমরা প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পার না। তোমরা অথও ধর্ম প্রচার করিতেছ, বাহাতে সকল ধর্মাবলম্বীর যোগদানের অধিকার আছে, যে-কেহ শুধু উপাসনার মনোভাব ও দৈহিক শুচিতা নিয়া যোগ দিবে, তাহাকেই তোমাদের ধর্ম্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে অধিকার তোমরা দিতে পার, দাও, দিয়া আসিতেছ,—এই বিশেষত্ব কোনও হিন্দু সম্প্রদায়েরই নাই।

তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেমে আকৃষ্ট হও। তোমাদের ঐক্য এক মহাশৌর্যের জন্মদান করুক। তোমাদের কৃত যে কাজ করিবার রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে আজ কোনও ধারণাই করিতে পারিতেছ না। চরিত্রবল, ঐক্য ও ত্যাগের বলে নিজেদের প্রকৃত স্বভাবে স্থিত হইলেই দেখিবে তোমাদের যোগ্য কাজগুলি তোমাদের হাতের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

চৈত্র, ১৩৬৬]

ধ্বংস প্রেরণা

প্রতিধ্বনি

১১২৭

(৭০০)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি

১০ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ক্ষুদ্রেরা যদি জানিত যে তাহারা ক্ষুদ্র নহে, তাহা হইলে তাহারা আর ক্ষুদ্র থাকিত না। আমি জগতের একজনকেও ক্ষুদ্র, ছোট, তুচ্ছ, অবহেলিত, অনাদৃত বা নিষ্পেষিত দেখিতে চাহি না। তোমরা সকল ক্ষুদ্রদের মন হইতে কুসংস্কার দূর করিয়া দাও। দেখুক সকলে নিজ নিজ আভ্যন্তর মহিমার বিরাট ও বিস্ময়কর আলেখ্য। প্রতিজনকে সাধন-পরায়ণ কর।

সাধন না করিলে কেবল মুখের কথায় শক্তির বিকাশ হয় না। অসাধকের আশ্ফালন বেশী, অহঙ্কার বেশী, দাপট বেশী। সাধক ধীর, স্থির, অবিচলিত-প্রতিজ্ঞ এবং কর্তব্যে দৃঢ়। তোমরা সকলে সাধক হও। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০১)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি

১০ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রতিধ্বনি

বৃত্ত প্রেম

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

১১২৮

তোমাদের মণ্ডলীতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়া দুই চারিজন
মধ্যে মনের বা মতের অমিল রহিয়াছে, তাহাকে প্রাধান্য দিও না।
যেখানে যেখানে মিল আছে, সেইখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। প্রত্যেকে
নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধন প্রাণ ভরিয়া কর এবং সকলের ঐক্য-
বিধানের যোগ্য স্বভাব বিকশিত করিবার জন্ত ভগবানের করুণার উপরে
নির্ভর কর। তাঁহার করুণার অসাধ্য কিছু নাই, তোমাদের সাধনের
অসাধ্য কিছু নাই, দুইটিতেই সমান বিশ্বাস কর। তোমার সাধন-প্রচেষ্টা
তাঁহার করুণারই একটা কিরণচ্ছটা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০২)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি

১০ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ঐ উদ্বাস্ত-শিবিরটিতে আমার বারংবার যাইবার ইচ্ছা
হয়। কিন্তু তোমরা অতি সামান্য ব্যাপার নিয়া নিজেদের মধ্যে এত
অমিল ঘটাইয়া ফেলিয়াছ যে, যাই যাই করিয়াও যাইবার প্রাণ্য করিতে
পারি না। অবশ্য, আপাততঃ আমি পুপুন্যকীর মঙ্গলবাঁধের কাজে এত
বাস্ত যে, এখন তু আসিবার চেষ্টা করিবারও সাধ্য নাই। তবে কিছু
দিন পরে আসার সুযোগ হইতে পারে।

ইতিমধ্যে তোমরা নিজেদের মধ্যে একটু সজাগ ভাব সৃষ্টি কর।
সাধন কর, সাধনের বলে তাজা হও। সকলের সঙ্গে সকলের প্রাণ-

চৈত্র, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১১২৯

খোলা প্রেম নিয়া মিলিত হইবার পথগুলি উন্মুক্ত কর। প্রেমই বিশ্বের
সকল অমিলের উচ্ছেদ করিবে। তোমরা প্রেমিক হও। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭০৩)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি

১০ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বড়ই আনন্দের কথা, তুমি চারিদিকের প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও
মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়াছ যে, যে ভাবেই হউক, তোমার অঞ্চলের
পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে কাজ করিবেই। অবিরাম মনে মনে সুদৃঢ়
ভাবে সঙ্কল্প-বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকিলেও তাহার শুভফল প্রকৃত
কর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অন্তরের বল নিমেষের জন্তও হারাইও
না।

অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলে শ্রীমান্ ল—র চেষ্টায় ইতিমধ্যে কাজ শুরু হইয়া
গিয়াছে। তুমি সেখানকার কর্মীদের সহিত নিয়ত যোগাযোগ রাখিও।
আমি এইবার যে অভিযাত্রী দল প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদের কয়েক
দিনের জন্ত তোমাদের অঞ্চলে নিতে পার কিনা দেখ। চারিদিক
ইহাতে সকলের একই সময়ে সমান আগ্রহ জাগিলে কোনও অসাধ্য
কাজই অসাধ্য হইতে দেবী হয় না। হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছ বলিয়াই
তোমরা হিন্দু, এই অযৌক্তিক ধারণা মনে পোষণ করিও না। হিন্দু-
জীবনের সদাচার পালন করে না, অথচ হিন্দু বলিয়া গর্ব করে, তাহারা

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

১১৩০

মিথ্যাচারী। ইহা হইল এক দিকের কথা। অগ্র দিকেও ভাবিবার আছে। অখণ্ডধর্ম হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলকেই আশ্রয় দিতেছে। ইহাদের কাহাকেও পৃথক্ করিয়া দেখে না বলিয়াই অখণ্ডধর্ম এই আশ্রয় দিতে পারিতেছে। অখণ্ডধর্মের দীক্ষিত হইবার পরে তোমাদের কাহারও হিন্দুত্বের অভিমান সঙ্গত নহে। হিন্দুত্বের অভিমান এক দিকে যেমন গৌরবজনক, অগ্র দিকে তেমন সঙ্কীর্ণতারও পরিণামক। হিন্দু বলিয়া যাহারা দুই হাজার বছর ধরিয়া পরিচয় দিয়া আসিল, তাহারা নিজেদিগকে কেবলই সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণতায় গভীবদ্ধ করিল। ইহাতে কোন্ কুশল বাড়িল? আজ নিখিল বিশ্বকে বক্ষে ধারণ করিবার দিন আসিয়াছে, ইহার ফলে হিন্দু ও অহিন্দু দুই দশটা সম্প্রদায় যদি জগৎ হইতে মুছিয়া যায়, তাহা হইলেও কাহারও ক্ষতি হইবে না। তবে, যাহাদের সাধনায় সত্য আছে, তাহাদের বিলোপ কখনো সম্ভব নহে, সাম্প্রদায়িকতার উপাসকদের স্বপক্ষে ইহা একটি প্রবল যুক্তি। ইহা কেবল যুক্তিই নহে, ইহা সত্যই একটি শক্তি। কাহারও সাম্প্রদায়িক যুক্তি ও শক্তিকে অস্বীকার না করিয়াও সকলের মধ্যে দেহ-মন-প্রাণের পরিপূর্ণ মিলন সাধন সম্ভব এবং তাহা করাই অখণ্ডমাত্রের লক্ষ্য। তোমরা তোমাদের এই লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইও না। চারিদিকে তোমাদের সবল সরল সরস চিন্তাধারাকে কেবলই প্রবাহিত করিয়া যাও। আজ কিম্বা কাল, পরম্ব কিম্বা মাসান্তে, বৎসরান্তে বা শতকান্তে তোমাদের চেষ্টা সফল হইবেই। কাহারও প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষপ্রচার করিয়া নহে, অন্যের শতমহশ্রুকেটি দোষে নিরপেক্ষ রহিয়া তোমরা তোমাদের শাস্ত্র সত্যের সাম্যবাপী প্রচার করিয়া যাও। প্রচার কর একাকী প্রচার কর সন্মলে, প্রচার

চৈত্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেমা

প্রতিধ্বনি

১১৩১

কর একটি স্থানে, প্রচার কর যুগপৎ সহস্র স্থানে, প্রচার কর সতেজে,
প্রচার কর সানন্দে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০৪)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি

১০ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা অল্প অল্প করিয়া কাজ করিতেছ কিন্তু কাজে বিরাম নাই।
ইহা যে সাফল্যের একটি প্রধান সর্ত্ত, তাহা হয়ত জান না। আজ যে
কাজকে অসাধ্য বিবেচনা করিতেছ, উত্তম আর প্রেমের বলে তাহা
কিছুকাল পরেই সুসাধ্য হইবে। উত্তমকে কখনো শিথিল হইতে দিও
না।

আর, প্রেমের কথা কি বলিব? প্রেম যত বাড়ে, বল তত বাড়ে।
প্রাণপণে সাধনা কর, বাহাতে প্রেমিক হইতে পার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১১৩২

(৭০৫)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি

১০ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা সংখ্যায় কম, স্থানটাও ক্ষুদ্র। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়া বসিও না যে তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র স্থানে বসিয়া সামান্য কয়েকজনেও অনেক বড় কাজ করিতে পারে। ইহার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। তোমরা মন হইতে সকল হতাশা দূর করিয়া দিও। বিশ্বাসে বল বাড়ে, তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইও। নামের সেবায় বিশ্বাস আসে, তোমরা নিয়ত নামের সেবায় রত থাকিও। প্রেম হইতে নামে রুচি আসে, তোমরা প্রেমিক হইতে চেষ্টা করিও। আবার নাম হইতে প্রেম উপজাত হয়, সুতরাং তোমরা নামের সেবা নিমেষের জন্তও ছাড়িও না। অহর্নিশ নাম কর আর প্রেম কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭০৬)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি

১০ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চৈত্র, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১১৩০

এবার শিলিগুড়ি আসিয়া স্বর্গীয় নগেশ ব্রহ্মচারীজীর পারলৌকিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া নিশ্চয়ই অন্তরে স্বর্গীয় প্রেরণা ও দিব্য অনুভূতি নিয়া গিয়াছে। তাহার সম্বলে এখন স্থানীয় কাজ শুরু করিয়া দাও।

পরমেশ্বর এক, তাঁহার উপরে তাঁহার প্রত্যেকটি সন্তানের পূর্ণ এবং সমান অধিকার। জগতের প্রত্যেকটি মানব বিপুল ও অতুল সম্ভাবনা সমূহ নিয়া আসিয়াছে। এই বিশ্বাসটুকু অটুট রাখিয়া কাজ চালাও।

প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল শক্তিকে কেন্দ্রীভূত কর একটি স্থানে। তবে না জয়লক্ষ্মী হইবে তোমাদের অধিকৃত। দুর্বলের, অক্ষমের, নিয়ত আশ্ফালনকারী প্রজন্মীর জন্ত জগতে কোনও সৌভাগ্য নাই।

আমার প্রত্যেকটি সন্তানকে তাহাদের কর্তব্য অবিরাম স্মরণ করাইয়া যাইতে থাক। একজনকেও কর্তব্যে উদাসীন হইতে দিবে না। প্রতিজনের প্রতি প্রেমশীল হও, প্রতিজনকে প্রেমিক কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৪ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

মেহের বাবা—, প্রাণভরা মেহ ও আশিস জানিও।

অতাই অপরাহ্নে পুপুনকী পৌছিবেছি।

প্রতিধ্বনি

ধ্বংস প্রেম

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১১৩৪

শিলিগুড়িতে পুণ্যশ্লোক নগেশ ব্রহ্মচারীজীর পারলৌকিক উৎসবে তোমাদের ওখান হইতে এতগুলি কর্ম্মী এবং কণ্ঠবান্ কীর্তনকারী শিলিগুড়ি গিয়াছিল যে তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছি। অবশ্য দূরত্ব কম বলিয়াই তোমরা অধিকতর সফল হইয়াছ। তোমাদের অপেক্ষা অধিক দূরত্ব হইতে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের কৃতিত্ব আরও বেশী। শিলচর, লামডিং, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড় হইতে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদিগকে আরও অধিক প্রশংসা করিতে হয়। এক ডাকে তোমরা যে সকল স্থান হইতে আসিয়া জড় হও, ইহা তোমাদের এক মহৎ গুণ। কিন্তু এই গুণটির অনুশীলনে যেমন তোমরা তৎপর রহিয়াছ, তেমন আবার আর একটি গুণের অনুশীলনে কিছুটা পরাভূতও রহিয়াছ। তাহা হইতেছে, আমি যেই সকল স্থানে যাইবার জন্ত তোমাদিগকে নির্দেশ দেই নাই বা দিলেও ইঙ্গিত দিয়াছি, সেই সকল স্থানে না যাওয়া। আলিপুরদুয়ারে বসিয়া সমগ্র কুচবিহার জিলাটার কাজ করা যায়। সেই বিষয়ে তোমরা তৎপর হইয়াছ কি?

মানুষ কুসংস্কারের দাস। তাহাদিগকে সং-সংস্কার দিতে হইলে তজ্জন্ত পদ্ধতিবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন। সে প্রয়াস তোমাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে কোথায়? সেই প্রয়াসের তাগিদ যদি অন্তরে না জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই সকল স্থানের লোকের প্রতি প্রেম তোমাদের অন্তরে জাগে নাই। প্রেম কেন জাগিল না, তাহা অনুসন্ধান কর। জগতের প্রত্যেকটি জীবের জন্ত প্রেম তোমাদের কেন জাগিবে না, মানবাত্মার অন্তরের স্বাধীনতার বার্তা কেন তোমরা প্রচার করিবার ভার স্বেচ্ছায় স্বীয় স্বন্ধে বাঁচিয়া লইবে না? কেন তোমরা চিরাচরিত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের চিন্তার উর্দ্ধে নিজেদিগকে তুলিতে পারিবে না? কেন তোমরা তোমাদের

চৈত্র, ১৩৬৭]

ধ্বংস প্রেরা

প্রতিধ্বনি

১১৩৫

সর্বশক্তিকে সামগ্রিক ভাবে সমগ্র মানবজাতির পরম উন্নয়নে সংযোজিত করিবার জন্ত আগ্রহান্বিত হইবে না? তোমাদের নিশ্চেষ্টতার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ত আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। তোমরা ত জগন্মঙ্গলের সাধন পাইয়াছ। ইহা কেন তোমরা ভুলিয়া থাকিবে? ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০৮)

হরি-ও

কলিকাতা

১৪ই মার্চ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাঠিয়াছি এবং তোমাদের অন্তরের শুদ্ধ আগ্রহের পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। শুদ্ধ আগ্রহ সাধনে অগ্রগতির পরিচায়ক। তোমাদের মধ্যে যাহাদের যাহাদের অন্তরে জগন্মঙ্গলের সেবার নিষ্কলুষ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহারা সেই আকাঙ্ক্ষাকে সর্বজনের মনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং পরিস্ফুরিত করিয়া দিবার জন্ত চেষ্টা করত হও। অনুপ্রবেশ হয় বাহির হইতে, পরিস্ফুরণ হয় ভিতর হইতে। ভিতর এবং বাহির উভয়ত্রই তোমাদের কল্যাণপ্রয়াস কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ স্বচ্ছল অবস্থার লোকদের মনে সংপ্রবৃত্তি কম থাকে, যদিও তাহাদেরই মনে সংপ্রবৃত্তির প্রাচুর্য্য থাকা উচিত। যাহাদের ভিতর সংপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃই কম, তাহাদের মধ্যে পরিশ্রম করিবার কর্মতালিকা একটু বিলম্বিত করিয়া হইলেও দীন-দরিদ্র

চৈত্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

১১৩৬

হওয়া সত্ত্বেও তাহাদেরই মধ্যে আগে অগ্রসর হও, যাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক সংপ্রবৃত্তি অধিক। কাজ তোমাদিগকে সকলের মধ্যেই করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে কাজের আনুকূল্য অধিক, সেখানে আগে ধরিতে হয়। কাহাকেও উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিবার প্রশ্ন ইহা নহে। কার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে সফল করিবার প্রয়োজনে অবলম্বনীয় সং-কর্ম্মনীতির ইহা কৌশল। সুতরাং তোমরা দীন-দরিদ্রের মধ্যে আরও গভীরতর প্রযত্ন আরম্ভ কর। অন্তরভরা প্রেম লইয়া অগ্রসর হইও, দেখিও, মরুভূমির মধ্যেও মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৪ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু —

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সঙ্গীয় পত্রে যাহাদের নামোল্লেখ আছে, তাহাদের প্রত্যেককে পত্রখানা দেখাইও।

চতুর্দিকেই তোমার সহকর্ম্মীরা রহিয়াছেন, যাহাদের বথার্থ মূল্য সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না। ইহারই জন্ত অনেক সময় নিজেকে নিঃসঙ্গ বলিয়া বোধ কর। পৃথিবীতে এমন নিকটতা লইয়া এমন একটা ব্যক্তিও জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহাকে তুমি কখনও কোন কাজে পাইবে না। মানুষের মূল্য সম্পর্কে আনুমানিক ধারণার ভ্রান্তি বশতঃই তোমরা

চৈত্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১১৩৭

কাহাকেও কাহাকেও অকর্ষণ্য জ্ঞান করিয়া থাক। তোমাদের অঞ্চলে
এইরূপ অকর্ষণ্য লোক অনেকগুলি আছে। কিন্তু কোথায় তাহাদের
কর্ষণ্যতা, ইহা দেখিবার সাধনা তোমরা কর নাই। এখন হইতে
প্রত্যেকে সেই দিকে লক্ষ্য দাও। বাজে পাথর মনে করিয়া লোকে
বহুকাল কয়লার খনিকে অনাদর করিয়াছে। কয়লার খনি
মনে করিয়া অনেক কল্পনা-বিলাসী ব্যক্তি স্বর্ণ বা হীরক খনিকে
অবহেলা করিয়া গিয়াছে। তোমরা সেই ভুল করিও না। সেই ভুল
তোমরা বারবার করিয়াছ। তাহারই জ্ঞাত আমার আপ্রাণ প্রয়াসগুলি
সত্যিকারের কোনও ব্যাপক অভ্যাস আজ পর্যন্ত আনিতে পারিল
না। মানুষকে তোমরা পশু ভাবিয়াছ। আমি চাহি, পশুকে মানুষ
ভাবিতে। দেবতাকে তোমরা মানুষ ভাবিয়াছ, আমি চাহিয়াছি
মানুষের মধ্যে দেবতাকে দেখিতে। অন্তরে একটু প্রেম থাকিলে
এ দেখা তোমরাও দেখিতে পারিবে। নিজেদের উচ্চবর্ণের অভিমান
পরিহার কর। বিশ্বগ্রাসী প্রেম লইয়া পৃথিবীকে বক্ষে আলিঙ্গন
কর। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৪ই মার্চ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পত্নীদি তোমার পাইতেছি। প্রাপ্তি-স্বীকার করিবারও অবসর

প্রতিধ্বনি

ধৃতং প্রেম্যা

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১১৩৮

পাই না। ভগবান আমাকে জোর করিয়া অনবসর করিয়াছেন। তাঁহার উপর নিজের জোর খাটাইতে পারিতেছি না বলিয়াই অবসর করিয়া চিঠি দেই না। ইহাকে তোমরা আমার স্নেহের অভাব বলিয়া মনে করিও না।

চতুর্দিকের প্রাণগুলি তুমি গলাইতে পারিতেছ না। প্রশ্ন হয়, তুমি নিজে গলিয়াছ কি? নিজে না গলিলে অপরকে গলান যায় না। সম্ভ্রতি তোমাদের জেলাটার সামগ্রিক আচরণ হইতে যে-কোন ব্যক্তির ইহাই অনুমান হইবে যে, আমার বিগত বহু বৎসরের উদ্দাম পরিশ্রম সার্থক হয় নাই। তোমরা যে যাহা করিয়াছ, তাহাতেই ক্লান্ত হইয়াছ। ইহা সার্থকতার লক্ষণ নহে। তবে আমি ক্লান্ত হই নাই। শ্রম করিয়া সময়ে কুলাইতে পারি না, ইহাই আমার একমাত্র ক্রটি। নতুবা হতাশা আমার আসে নাই। আজও আমি মনে প্রাণে ষোল বৎসরের যুবক রহিয়াছি এবং পুপুন্যকীতে ষোল বৎসরের যুবকের মতনই শারীরিক শ্রম করিতেছি। রাত্রি তিনটায় উঠিয়া চিঠিপত্র লিখিতে বসি, সাতটায় ডাক বিদায় করিয়া স্নান করিতে যাই, আটটায় কিছু গলাধঃকরণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হই। কোন দিন বিকাল ছটায় ফিরি, কোন দিন রাত্রি দশটায়। দুই একদিন রাত্রি এগারটা বায়টাও হইয়াছে। তবে, উহা নিয়ম নহে, নিয়মের ব্যতিক্রম। এই শ্রমশীলতার মধ্যে কি হতাশার কোনও চিহ্ন পাইবে? মৃত্যু আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া হৃদপিণ্ডে নিয়ত জানানি দিয়া যাইতেছে। দৈহিক বিনাশের সম্ভাবনাকে আমি ভয়ের দৃষ্টিতে দেখি নাই। হাসিমুখে ডাক দিয়া আমি বলিয়াছি, থাম ভাই, একটু দেরী আছে।

তোমার গৃহে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি আজও শেষ হইল না। সর্ব-সাধারণের ত্যাগ এবং সহযোগের দ্বারা ইহা সমাপ্ত হইতে পারে।

চৈত্র, ১৩৬৭]

ধৃতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১১৩৯

তিনসুকিয়ার বড়পাথারের অথগু-মন্দির যেভাবে অথগুমগুলীর হস্তে গ্রাস্ত হইতে বাইতেছে, তোমার ওখানকার মন্দিরটির সম্পর্কে উদ্ভূত চিন্তা করিয়া দেখিও। একার শক্তিতে কম মানুষই খুব বড় কাজ করিতে পারে। অথগু-মন্দিরে সর্বসাধারণ ব্যয় করিবার অধিকার চাহিতে পারে। সেবার অধিকার, সেবার দায়িত্ব, সেবার যোগ্যতা এই তিনটি পরস্পর অঙ্গাদ্বী ভাবে জড়িত। ব্যক্তিগত মালিকানা ত্যাগ করা যায় কিনা, তুমি চিন্তা করিয়া দেখিও। একটা ব্যক্তির চেষ্টায় এ জগতে স্থায়ী বা বিরাট জনসেবা অতি অল্পই সম্ভব। সর্বজনকে দায়িত্বের সহিত সংযোজিত করিবার জন্ত অধিকারকে সর্বজনীন করা প্রয়োজন।

পুত্রকন্ঠার বিবাহ দিয়াছ। আর কেন সাংসারিক জটিলতায় মনকে আচ্ছন্ন রাখিবে? কর্মত্যাগ করিতে বলি না, কিন্তু ঈশ্বর-মননের উদ্দেশ্য লইয়াই প্রত্যেকটি কর্ম কর। তাহাতে সর্বজীবে অপার প্রেম, সর্বমানবে অসীম সৌভ্রাত্য এবং সর্বযুগের প্রতি অমিত শ্রদ্ধার উদয় হইবে। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭১১)

হরি-ওঁ

পুণ্ড্রকী

১৪ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা প্রহ্লাদ, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পিতামাতা তোমাকে প্রহ্লাদ নামটি দিয়াছেন, এই নামটি এত সুন্দর যে, তোমার নামটি যেদিন শুনিয়াছি, সেদিনই তোমাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি। হস্তপদতলে পড়িয়াও যাহার অন্তরের প্রেম ম্লান

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

১১৪০

হয় না, পর্বত-শৃঙ্গ হইতে নিষ্কিপ্ত হইয়াও বাঁহার প্রাণে ভয় জাগে না, সমুদ্র-তরঙ্গের আক্রুষ্ট গর্জনকে যিনি মনে করিতে পারেন তুচ্ছাতিতুচ্ছ, তাঁহার মতন আদর্শ পুরুষ জগতে আর কে আছেন? তাঁহার নামটি তুমি পাইয়াছ। দেখিও যেন জীবনে একটি দিনের জন্তও, একটি ক্ষণের তরেও তোমার মন ঈশ্বর-বিমুখ না হয়।

ছোটদের পল্লীতে বাস করিতেছ, বড়দের আর বাবুদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া আছ, কখনও কখনও অভিজাত সম্প্রদায়ের অবহেলাও তোমরা পাইয়া থাক। কিন্তু ইহা যেন তোমাদিগকে উচ্চ জাতির প্রতি বিদ্বেষে প্ররোচিত না করে। বিদ্বেষ দুর্বলতার লক্ষণ। প্রেমই সবলতার পরিচয়। দুর্বলেরাই অধিকতর বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়া থাকে। অভ্যাস-দোষে সবলেরাও কখনও কখনও পরবিদ্বেষী হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা নিজেদিগকে অচিরকাল মধ্যে সংযতও করিয়া লয়। সবল বা দুর্বল কাহারও পক্ষেই বিদ্বেষপরায়ণতা প্রশংসার বস্তু নহে।

তোমরা ছোটরা বাহারি এক জায়গায় জড় হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধ-কুঠরীর মধ্যে বাস করিতেছ, তাহারাও অধিকাংশেই পরস্পরের প্রতি প্রেমশীল নহে। ইহার মত দুঃখের ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না। বড়রা তোমাদের অবজ্ঞা করে ছোট বলিয়া আর তোমারা নিজেদিগকে আরও ছোট করিতেছ পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষ করিয়া। লোকের চোখে ছোট রহিয়াছ, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু অকারণ বিদ্বেষে নিজের কাছে নিজে যে ছোট হইয়া যাইতেছ, ইহার চাইতে শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? জগতের উচ্চতম আদর্শের তোমরা সন্ধান পাইয়াছ, তবু নিজেদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি, ঘেঁষপরায়ণতা এবং দোষদৃষ্টি দূর করিতে পার নাই। সেই জন্তই গতবার তোমাদের ওখানে গিয়া প্রাণে কোনও আনন্দ পাই নাই। তোমাদের মত

১চত্র, ১৩৬৭]

ধ্বতং প্রেম্না

প্রতিধ্বনি

১১৪১

ছোটদের ঘরেই বারবার প্রাণ ছুটিয়া বাইতে চাহে। কিন্তু হৃদয়ানন মলিন করিলে ভগবানও আসিতে পরাঙ্মুখ হন, আমি বাইব কি করিয়া?

স্বজাতি, বিজাতি, ছোট, বড়, উচ্চ-নীচ, সকলকে ভালবাসিবার জ্ঞান কৃত-সংকল্প হও। অবশ্য চেষ্টা করিয়া ভালবাসা যায় না। ভালবাসা স্বভাব হইতে আসে। ভগবানের নিকটে নিয়ত আকুল প্রার্থনা জানাইতে থাক।—“হে ভগবান, আমাকে ভালবাসিতে শিখাও। আমাকে প্রেমিক কর। আমার সকল চিত্ত-মালিগা, সকল দুর্বলতা দূর করিয়া দিয়া তোমার প্রেমে সরল কর, বিহ্বল কর।” ভগবানের প্রেমে পাগল না হইতে পারিলে মানুষকে ভালবাসা যায় না। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৪ই মাঘ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা হ——, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার নামীয় আলাদা পত্রখানা পাঠ করিয়া সকল বিষয় অবগত হইবে। প্রহ্লাদকে একখানা আলাদা পত্র দিয়াছি। উহা অবশ্যই পাঠ করিবে।

তোমাদের গুণে গন্তব্য গিয়া কোন শান্তি অনুভব করি নাই। তোমাদের মধ্যে পরস্পরের দোষানুসন্ধানের জ্ঞান যে আগ্রহ ছিল, দেশ, সমাজ বা ভগবানের দিক তাকাইয়া তাহার শতাংশের একাংশ ব্যাকুলতা

প্রতিধ্বনি

ধ্বতং প্রেরা

[৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

১১৪২

ছিল না। কে ছোট, কে বড়, এই প্রশ্নটাকে তোমরা তোমাদের জীবনের নাট্যমঞ্চ হইতে একেবারে নির্বাসিত কর। এ জগতে কেহই কাহারও ছোট নহে, কেহই কাহারও বড় নহে। সকলেই একমাত্র নিখিল প্রভুর শ্রীচরণের দাস। অগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে হইলে বলিব, সকলে একই স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বরাট প্রভুর সহিত একাত্ম ও অভিন্ন সত্তা। ভ্রমের বশে নিজেদের মধ্যে ছোট-বড়র ভেদবুদ্ধি করিয়া তোমরা অশান্তি কুড়াইতেছ, অপরকে অশান্তি দিতেছ। পৃথিবীর একটি লোকেও তোমরা ভালবাসিতে পার নাই। কারণ, সেই একজনকে ভালবাস নাই। জগতে বাহার জন্ত তোমরা সর্ব্বদা দিতে পার, এমন একটা মানুষের নাম কর ত? পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, মাতা, পিতা, গুরু ইহাদের এক জনের জন্তও সর্ব্বদা দিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। কারণ, তোমরা ভালবাসিতে পার নাই। ভালবাসার যে কি শক্তি, তাহা তোমাদের জীবনে অনুভূত হইল না। ইহাতে আমার অন্তরে যে কি দুঃখ, তাহা তোমরা কি করিয়া বুঝিবে? তোমরা যে আমাকেও ভালবাস না। ভালবাসার অতুল সম্পদে বাহার জীবন হইয়াছে সমৃদ্ধ, সে যে পৃথিবীর কি অমূল্য রতন, তাহা ভাবিতে বসিলেও অন্তরে আমার সুখ-বসন্তের মলয়-পবন মূহুর্নিম্নে বহিতে থাকে; নিমেষের মধ্যে পিককুল-কুঞ্জে হৃদয়-কুঞ্জ ভরিয়া যায়, ভ্রমর-গুঞ্জে সকল চেতনা অবশ হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়ে, কোটি কুসুমের কোমল কোরক একটি নিমেষে চক্ষু মেলিয়া মিটি মিটি হাসিয়া স্নমধুর রোলে কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে বারতা শুনায়ে, দীপ্তর আছেন। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দের মন্ত্রবাণী

প্রত্যেকখানা দুই আনা। বারোখানা একত্রে এক টাকা। ডাকব্যয়াদি
এক টাকা। মোট দুই টাকা পাঠাইলে ১২খানা একত্রে পাঠান হয়।

ডাকে বারোখানার কম পাঠান হয় না।

- ১। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই স্বার্থ সৌন্দর্য্য
- ২। জগতের প্রত্যেক রমণী তোমার জননী
- ৩। পবিত্রতাই পূর্ণতা, নিলে'ভতাই শ্বশিষ্ট
- ৪। সাধনাই সৌভাগ্যের প্রসূতি
- ৫। দুঃখই জীবনের স্পর্শমণি
- ৬। নারীর সতীত্ব জাতির অমূল্য সম্পদ
- ৭। কুসঙ্গই ভুজঙ্গ
- ৮। ব্রহ্মচর্য্যই সকল তপস্যার মেরুদণ্ড
- ৯। ব্রহ্মচর্য্যই মহাশক্তির মূল উৎস
- ১০। ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র
- ১১। স্বাবলম্বনই শক্তিমানের পরিচয়-পত্র
- ১২। পরার্থই পরমার্থ, স্বার্থপরতাই
আত্মহত্যা

ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত আর্টপেপারে মুদ্রিত নিম্নলিখিত বাণীসমূহঃ—

১। জপের শত্রু বহুমন্ত্র, ২। সত্যই জয়ী হবে, মিথ্যা নয়,

৩। যার যার ইষ্টই তার তার কৃষ্ণ।

প্রত্যেকখানার মূল্য ১৬০ আনা। তিনখানা একত্রে ১২ টাকা।

সুন্দর, শক্ত পাল্লবোড়ে মুদ্রিত ১১" X ৭।০" সাইজের

ওঙ্কার-বিগ্রহ। প্রত্যেকখানার মূল্য চারি আনা মাত্র।

ত্রিবর্ণ মুদ্রিত অখণ্ড-পতাকা প্রত্যেক জোড়া দুই আনা মাত্র।

অস্বাচক আশ্রম, বারানসী।

PRATIDHWANI Regd. No. A 970.
MARCH—1961.

CHAITRA
1367 B. S.

[Registered with the Registrar of Newspapers
for India under No. 2364/57.]

হিষ্টিরিয়া, মূগী ও উন্মাদ রোগীর সুচিকিৎসার্থীদের প্রতি

ছাপান প্রসঙ্গত্রে যে সকল প্রশ্ন মুদ্রিত আছে, তাহার প্রত্যেকটি
সুবিস্তারিত উত্তর দিয়া পত্র-দিলে হিষ্টিরিয়া, মূগী ও উন্মাদ রোগীর ব্যবস্থা
ও ঔষধের মূল্যাদি জানান হয়। রোগ-বিবরণ সর্বদা বেনারস ঠিকানায়ই
দিবেন। পত্র লিখিলেই ছাপান প্রশ্নপত্র পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীবাবামাণর বড় ত্রিবর্ণ-ছবি

১নং বাষ্ট (আবক্ষ) ফটো ১০" x ১৩" ইঞ্চি
মূল্য প্রতিখানা ১৮০ আনা, একত্র ৬খানা ৩৮০ আনা, একত্র এক ডজন
১২৮ টাকা। ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

২নং উপবিষ্ট অবস্থায় ১০।০" x ১৩।০" ইঞ্চি
মূল্য প্রতিখানা ১৮০ আনা, একত্র ৬খানা ৩৮০ আনা, একত্র এক ডজন
১২৮ টাকা। ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র। এই বকমে মিলিয়া মোট
এক ডজনের কম ডাকে পাঠান হয় না।

অযাচক আশ্রম, ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী।

Printed and Published by Snehamay Brahmachary
at the Ayachak Ashrama Printing Works, D 46/19A,
Swarupananda Street (Ramapura), Varanasi and
edited by Brahmacharini Sadhana Devi from the
same address.

